উপনিষদ

প্রধান আটটি উপনিষদের শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

উপনিষদ

প্রথম ভাগ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ঘরে ঘরে বেদান্ত পৌঁছে দিতে। তাঁর বিশ্বাস, এতে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হবে। বেদান্তের বাণী কি? আমাদের সকলের মধ্যে যে ঈশ্বরীয় সত্তা বিদ্যমান, সেই সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা—প্রাত্যহিক জীবনে। যদি একজন বুদ্ধ হতে পারেন, তবে আমরা সবাই বুদ্ধ হতে পারি। এই সত্যকে কথায় এবং কাজে পরিণত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। বেদান্ত বলে, নিজেকে যা ভাববে, তুমি তাই হবে। পাপী ভাবলে পাপীই হবে। নিজেকে পাপী ভাবাই পাপ।

'উপনিষদ' বেদান্ত-গ্রন্থের সার। প্রধান কয়েকটি উপনিষদ এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল—যথাসম্ভব শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করে এবং সহজ সরল ভাষায়। এবিষয়ে অনেকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

সূচিপত্র

ঈশ উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: অদঃ (সেই [অর্থাৎ কারণ-ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে 'সেই' বলা হচ্ছে যেহেতু ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত]); পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী, অনন্ত); ইদম্ (এই [অর্থাৎ কার্যরূপে ব্রহ্ম—এখানে ব্রহ্ম এই দৃশ্যমান জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই ব্রহ্মকে 'এই' বলা হচ্ছে]); পূর্ণম্ (স্বরূপত, সর্বব্যাপী, অনন্ত); পূর্ণাৎ (কারণ-ব্রহ্ম থেকে); পূর্ণম্ (কার্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ এই দৃশ্যমান আপেক্ষিক জগৎরূপে ব্রহ্ম); উদচ্যতে (প্রকাশিত হয়েছেন); পূর্ণস্য ([যদি] কারণ-ব্রহ্ম থেকে); পূর্ণম্ (এই জগৎরূপে প্রকাশিত ব্রহ্ম); আদায় (সরিয়ে দেওয়া হয় [অর্থাৎ জগৎ আরোপিত উপাধি মাত্র, অতএব মিথ্যা এই জেনে জগৎকে ত্যাগ করলে]); পূর্ণমেব (পূর্ণই অর্থাৎ অনন্ত ও সর্বব্যাপী ব্রহ্মই); অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)।

ওঁ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ কীটপতঙ্গ, হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি থেকে শান্তি])।

সরলার্থ: ব্রহ্ম অনন্ত। এই জগৎও অনন্ত। কিন্তু 'এই' জগৎ 'সেই' ব্রহ্মের উপর আরোপিত সত্তা মাত্র। 'এই' জগৎকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় (তথাপি) 'সেই' ব্রহ্ম অনন্তই থাকেন। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: এই দৃশ্যমান জগতের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। ব্রহ্ম একে ধারণ করে আছেন বলে এ দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত ব্রহ্মের ওপর এ ন্যস্ত। সন্ধ্যায় রাস্তায় চলতে চলতে দড়ি দেখে আমরা সাপ বলে ভুল করতে পারি। বস্তুত এটা একটা দৃষ্টিভ্রম—দড়ি দেখে সাপ মনে করা। এই ভুল যখন ভাঙ্গে তখন দেখি সাপ নেই। সাপ যেন দড়িতে মিশে গেছে।

ব্রহ্ম যেন দড়ি, এই দৃশ্যমান জগৎ যেন সাপ। যখন জ্ঞান হয় তখন এই জগৎ ব্রহ্মে অর্থাৎ আত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়।

ঈশ উপনিষদ

'উপনিষদ' শব্দটি বলতে কোন গ্রন্থ বোঝায় না, বোঝায় জ্ঞান। এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়, অতি উচ্চকোটির জ্ঞান, যে জ্ঞান শান্তি ও আনন্দ এনে দেয়, মানুষ কৃতার্থ বোধ করে। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে আচার্যের কাছে যেতে হবে—যে আচার্য স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী। যে নিজে অন্ধ সে পথ চেনবার জন্য নিশ্চয়ই আর এক অন্ধের কাছে যাবে না। সেই ভাবেই যে আচার্য নিজে এই আত্মজ্ঞান অর্জন করেননি তাঁর কাছে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষার্থী অতি বিনীতভাবে এই জ্ঞানী আচার্যের কাছে উপস্থিত হবেন। আচার্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অর্থ প্রত্যাশা করেন না কিন্তু শিষ্য বিনয়ী এবং ধৈর্যশীল শ্রোতা হবেন, এই প্রত্যাশা তাঁর থাকে। তিনি আরও আশা করেন যে শিষ্য বিষয়টি সম্পর্কে অনুরাগী এবং শ্রদ্ধাশীল হবেন। সত্যের জন্য শিষ্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে এবং যথাসাধ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পরই তিনি আচার্যের কাছে যাবেন।

'ঈশ' এই শব্দটি দিয়ে এই উপনিষদ শুরু হয়েছে, তাই এই উপনিষদের নাম ঈশ উপনিষদ। ঈশ কথাটির অর্থ ঈশ্বর, যিনি সর্ববস্তুর অন্তরস্থ আত্মা। অন্যান্য উপনিষদ থেকে ঈশ উপনিষদের পার্থক্য এই যে—এটি সম্পূর্ণ শ্লোকে লেখা, এবং অনেকের মতে উপনিষদ-সমূহের মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং সর্বোৎকৃষ্ট। এই উপনিষদ শুক্লযজুর্বেদে পাওয়া যায়। বেদের সংহিতা অংশ প্রধানত কর্মকাণ্ড বিষয়ক, ঈশ উপনিষদ সংহিতার অঙ্গ হলেও কেবলমাত্র অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনাই এখানে আছে। যাগযজ্ঞকর্মাদির সঙ্গে এই উপনিষদের কোন সম্পর্ক নেই।

সাধারণভাবে জ্ঞান-অজ্ঞান, সত্য-অসত্য, এক-বহু ইত্যাদি বিতর্ক দিয়ে উপনিষদ-সমূহ ভরা। কিন্তু ঈশ উপনিষদে অতি স্পষ্টভাবে এই বিতর্কের মীমাংসা করা হয়েছে। আপেক্ষিক সত্য পরম সত্যে বিলীন হয়—এই উপনিষদে তাই দেখানো হয়েছে। এই পরমসত্য নামরূপহীন। সাধারণ ভাষায় ব্রহ্ম (বৃহত্তম) বা পরমাত্মা (বিশ্বাত্মা) বলে ইনি অভিহিত। ইনিই আমাদের সকল সত্তার সারস্বরূপ এবং সকল বস্তুর আশ্রয়। নাম এবং রূপেই যত বৈচিত্র, মূলত সকলের মধ্যে সেই একই সত্তা। এই একের স্বরূপ ও তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই এই উপনিষদের অনুসন্ধানের বিষয়।

ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥১

অন্বয়: জগত্যাম্ (জগতে); যৎ কিঞ্চ (যা কিছু); জগৎ (পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল); ইদং সর্বম্ (এই সবকিছু); ঈশা বাস্যম্ (ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদিত); তেন (সেই হেতু); ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা); ভুঞ্জীথা (পালন কর [অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বত্র এবং সর্বভূতে আছেন এই চেতনাকে বলিষ্ঠ কর]); কস্য স্বিৎ (কারও); ধনম্ (ধনে); মা গৃধঃ (লোভ করো না)।

সরলার্থ: পরিবর্তনশীল এই জগতে সবকিছুরই ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। তথাপি সব কিছু পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত। ত্যাগ অনুশীলন কর এবং সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। অপরের ধনে লোভ করো না।

ব্যাখ্যা: এই জগৎ এবং জগতের সব কিছু সর্বদা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু যিনি এই জগৎকে ধরে রেখেছেন তিনি অপরিবর্তিত। তিনি সদা অবিচল। তিনিই পরমেশ্বর। তিনি সকল বস্তুর আশ্রয়। এ জগৎ যেন পর্দার ওপর ফেলা চলমান ছায়াছবি। চিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু পর্দার কোন পরিবর্তন নেই। একই ভাবে এই দৃশ্যজগৎ পরমেশ্বরের উপর আরোপিত মাত্র, যেমন অন্ধকার রাত্রে দড়িকে আমরা সাপ বলে ভুল করি। সাপের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। দড়ির কারণেই সাপের অস্তিত্ব এবং আলো আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই সাপের অস্তিত্ব লোপ পায়। তখন তা দড়িতে লীন হয়ে যায়। সেইভাবেই যখন ব্রহ্মকে জানা যায় তখন এই দৃশ্যজগৎও ব্রহ্মে লীন হয়। তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমি এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এই জ্ঞানলাভই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এই জ্ঞানলাভের পর জগতের কোন মলিনতা আর আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। চন্দনকাঠ বহুদিন জলে থাকলে তাতে এক ধরনের দুর্গন্ধ হয়। সাময়িকভাবে তার সুগন্ধ চাপা পড়ে। কিন্তু অল্প ঘষলেই সেই গন্ধ চলে যায় এবং চন্দনকাঠের স্বাভাবিক সুগন্ধ ফিরে আসে। সেরকমভাবেই আমাদের জগতের প্রতি যে আসক্তি সেটাও সাময়িক। তা স্থায়ী হতে পারে না। ব্রহ্মরূপে, বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে নিজেকে চিন্তা করতে হবে। গভীরভাবে নিরন্তর এই চিন্তা করলে সব আসক্তি দূর হবে।

কিন্তু কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব? ত্যাগের অনুশীলন দ্বারা। সর্বদা মনে রাখতে হবে এই জগৎ এবং তার নানা প্রলোভন সত্য নয়; সত্য নয় এই অর্থে যে তা অনিত্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ ব্রহ্ম অবিনশ্বর। অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা চিরতরে ত্যাগ করে ব্রহ্মে মনকে একাগ্র করতে হবে। আমরা সোনা দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু তা নশ্বর। যা ক্ষণস্থায়ী

তার পেছনে ছোটা, অপরের ধনে লোভ করা বা নিজের ধনেও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যিনি জানেন এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাঁর কাছে ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ নিতান্তই তুচ্ছ। ব্রহ্মকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে জানতে হবে এবং ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। 'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং আমিই সেই ব্রহ্ম', এই জ্ঞান নিরন্তর অন্তরে জাগ্রত রেখে অন্য সবকিছুর প্রতি উদাসীন থাকতে হবে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি
জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি
ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।২

অন্বয়: কর্মাণি (শাস্ত্রীয় কর্মসমূহ); কুর্বন্ এব (করেই); ইহ (এখানে, এই জগতে); শতং সমাঃ (শত বৎসর); জিজীবিষেৎ (যদি বাঁচার ইচ্ছা হয়); এবম্ (এইভাবে); ত্বয়ি নরে (ওহে মানুষ তোমাতে); কর্ম ন লিপ্যতে (কর্মের ফল লিপ্ত হবে না); অন্যথা ন অস্তি (আর কোন পথ নেই)।

সরলার্থ: শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার ফলে কোন ব্যক্তি শত বৎসর বাঁচতে ইচ্ছুক হতে পারেন। এভাবে যিনি কাজ করেন তিনি তাঁর কর্মফলে লিপ্ত হন না। এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

ব্যাখ্যা: আগের মন্ত্রটিতে ত্যাগের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে জাগতিক সুখের পিছনে ছোটা অর্থহীন। কেননা এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। তবু যদি আমরা এই সুখ লাভের জন্যই লালায়িত হই, তাহলে নিজেরাই নিজেদের দুঃখ ডেকে আনব। কেননা এই জাগতিক সুখের স্থায়িত্ব স্বল্পকাল। কিন্তু সকলের পক্ষে তো ত্যাগের পথ বেছে নেওয়াও সম্ভব নয়। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই জীবনকে উপভোগ করতে চান এবং এই মন্ত্র তাঁদের উদ্দেশেই বলা হয়েছে। তাঁদের বলা হচ্ছে, যদি তাঁরা দীর্ঘ জীবন কামনা করেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনকি সেই দীর্ঘ জীবন একশ বছরও হতে পারে। তাঁরা দীর্ঘায়ু হতে পারেন কিন্তু তাঁদের জীবনের বাসনাসমূহ চরিতার্থ করার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে হবে। এর ফলে ক্রমে তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হবে, ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ধীরে ধীরে লোপ পাবে, বিবেকজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং আত্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হবে। যখন এই অবস্থায় পৌঁছনো যায় তখন সারাজীবন ধরে যে কাজ তাঁরা করেছেন সেই কর্মের ফলের দ্বারা তাঁরা আর আবদ্ধ হবেন না। তখন তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত।

যাঁরা মুহূর্তমধ্যে সব কিছু ত্যাগ করতে সক্ষম নন, তাঁদের জন্য এই একমাত্র পথ। তাঁরা যেন হতাশ না হন। তাঁদেরও সময় আছে। কিন্তু শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক তাঁদেরকেও এই ত্যাগের পথই গ্রহণ করতে হবে। এখানে যে পথের কথা বলা হয়েছে সেই পথই অনুসরণ করতে হবে।

অসুর্যা নাম তে লোকা
অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি
যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥৩

অন্বয়: অসুর্যাঃ (সূর্যহীন, অসুরোচিত); নাম (নামে পরিচিত); তে লোকাঃ (সেই সব লোক); অন্ধেন (আত্মজ্ঞানহীন বা অজ্ঞানরূপ); তমসা (অন্ধকারের দ্বারা); আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত); যে কে চ আত্মহনঃ (আত্মঘাতী, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়নি); জনাঃ (মানুষেরা); তে প্রেত্য (দেহত্যাগের পর); তান্ (সেই সকল লোকে); অভিগচ্ছন্তি (যান বা প্রবেশ করেন)।
সরলার্থ: এমন সব জগৎ আছে যা (সূর্যহীন) দানবদের যোগ্য আবাস। এই সব জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তি (অর্থাৎ যাঁরা আত্মজ্ঞান-রহিত) যেভাবে জগৎকে অনুভব করেন ঠিক সেই রকম। আত্মজ্ঞান অর্জনে উদাসীন হওয়া আত্মহত্যার সামিল। এই সব ব্যক্তি মৃত্যুর পর সূর্যহীন লোক অথবা অসুরলোক প্রাপ্ত হন।
ব্যাখ্যা: যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট নন এই শ্লোকে তাঁদের নিন্দা করা হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে তাঁরা আত্মঘাতী। জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে ইন্দ্রিয়সুখের দাস হওয়ার চাইতে নিকৃষ্ট আর কী হতে পারে? জীবনের উদ্দেশ্য হল আত্মসংযম। এর দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করতে হবে; নিশ্চিতভাবে জানতে হবে—আমিই সেই পরমাত্মা, যা শুদ্ধ চৈতন্য, নিত্যমুক্ত, নামরূপহীন এবং কোন নিয়মের অধীন নন। আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং এই আত্মা অনাদি, অনন্ত ও বাক্যমনাতীত। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। এই উপলব্ধিতেই মুক্তি। তখন আর জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দুলতে হয় না। নিজেকে জানার চেষ্টা না করা আত্মহত্যার সমান। এর ফলে ইহলোক ও পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্লুবন্ পূর্বমর্ষৎ।

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥৪

অন্বয়: অনেজৎ (নিষ্কম্প); একম্ (এক); মনসঃ (মনের চেয়ে); জবীয়ঃ (বেশী বেগবান); দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ); পূর্বম্ অর্ষৎ (সকলের আগে); এনৎ ন আপ্লুবন্ (এঁর নাগাল পায় না); তৎ (তিনি); তিষ্ঠৎ (স্থির থেকে); ধাবতঃ (চলমান); অন্যান্ (অন্য সকলকে); অতি এতি (অতিক্রম করে যান); তস্মিন্ (তিনি আছেন বলে); মাতরিশ্বা (বায়ু অর্থাৎ জগৎ বিধায়ক সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ); অপঃ (জল অর্থাৎ কর্মসমূহ); দধাতি (বিশেষরূপে পালন করেন)।
সরলার্থ: ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম একাধারে স্থির, আবার অপর দিকে চঞ্চল, মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী। তিনি সব সময়ই সবার আগে রয়েছেন। ইন্দ্রিয়সমূহও এঁর নাগাল পায় না। তিনি নিজে স্থির থেকেও অন্য সকলকে অতিক্রম করে যান। শূন্যের দেবতা হিরণ্যগর্ভরূপে তিনি এই স্থূল ও দৃশ্যমান জগতের সবকিছুকে ধরে রেখেছেন।
ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রহ্ম অচঞ্চল, সতত স্থির এবং অপরিবর্তিত। আবার মন অপেক্ষাও তিনি দ্রুতগামী। তিনি আছেন বলেই জগতের সব কিছু আছে, এবং তিনিই জগতের সব কিছুকে চালনা করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা মাতরিশ্বাকে শক্তি দান করেন। এই মাতরিশ্বার (যাঁর বাস অন্তরীক্ষে) দ্বারাই জগতে কার্য-কারণ ইত্যাদি সক্রিয় থাকে।

ব্রহ্মকে বর্ণনা করা যায় না। তিনি বাক্য ও মনের অতীত। তিনি সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে বিরাজিত। তিনি নিরাকার, আবার তিনিই সাকার। তাঁর কোন নাম নেই আবার সব নামই তাঁর নাম। বস্তুত তিনি অনন্য। এই ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেবার জন্যই উপনিষদ পরস্পরবিরোধী উক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। একবার বলা হচ্ছে ব্রহ্ম স্থির, ঠিক পরের মুহূর্তেই বলা হচ্ছে মন অপেক্ষাও ইনি দ্রুতগামী। এ কথার অর্থ কি?

এর উত্তর হল: ব্রহ্মের দুটি দিক আছে। একদিকে তিনি নির্গুণ। তিনি পরম। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য। তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনিই পরমাত্মা।

অপরদিকে ব্রহ্ম সগুণ। এটি ব্রহ্মের আপেক্ষিক দিক। এই দিক থেকে বলা যায়, তিনি সাকার, তিনি সগুণ; ভালমন্দ ছোটবড় সবই তিনি। এইসব গুণের পার্থক্যে তাঁর কোন শেষ নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এগুলি আত্মার ওপর আরোপিত গুণ বা উপাধি (অধ্যাস) মাত্র। এই গুণসকল ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। শিশুরা যে মুখোশ পরে এই গুণগুলিও অনেকটা সেই মুখোশের মতো।

মন নিজে নিষ্ক্রিয়। মন তখনই সক্রিয় হয় যখন আত্মা (ব্রহ্মেরই অপর নাম) তাতে প্রাণসঞ্চার করে। মন আত্মা অপেক্ষা দ্রুতগামী নয়। কারণ আত্মাই তাকে সচল করে তোলে এবং সেই আত্মা সর্বত্র বিরাজমান। শুধু মনেই নয় শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (এগুলিকে দেব বলা হয়, কারণ এগুলি ব্যক্ত) বেলাতে এবং প্রকৃতির সব উপাদান সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এই শক্তিই সকল কার্য ও কারণের পেছনে কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে বায়ুর দৃষ্টান্ত খুবই প্রাসঙ্গিক। বায়ু যখন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন বায়ুই জীবনীশক্তি, কিন্তু আলাদাভাবে বায়ু জীবনকে রক্ষা করতে পারে না। বায়ুকে মাতরিশ্বা বলা হয়। কারণ তা অন্তরীক্ষে অর্থাৎ শূন্যে (মাতরি) চলমান (শ্বা)। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্যষ্টি হিসাবে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ) অথবা সূত্রাত্মা (মালায় যেমন নানা ফুল এক সুতোতে গাঁথা থাকে, 'সূত্রে মণিগণা ইব')। এই ভাবে ব্রহ্ম এই দৃশ্য জগতের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন—'এঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সূর্য আলো দান করে, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু বা পঞ্চম ক্রিয়াশীল হয়।'

ব্রহ্ম ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না। কিন্তু কোন কিছুর দ্বারা ব্রহ্ম প্রভাবিত নন। এই দৃশ্যজগৎ ব্রহ্ম থেকেই এসেছে, ব্রহ্মেই স্থিত, আবার ব্রহ্মেই ফিরে যায়।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥৫

অন্বয়: তৎ (তিনি); এজতি (চলেন); তৎ (তিনি); ন এজতি (চলেন না); তৎ (তিনি); দূরে (দূরে); তৎ (তিনি); উ অন্তিকে (কাছেও); তৎ (তিনি); অন্তঃ (ভিতরে); অস্য সর্বস্য (এর অর্থাৎ জগতের); তৎ (তিনি); উ (আবার); অস্য (এর); সর্বস্য (সকলের); বাহ্যতঃ (বাইরে)।

সরলার্থ: তিনি (ব্রহ্ম) সচল হয়েও স্থির। তিনি দূরেও আছেন আবার কাছেও আছেন। তিনি (ব্রহ্ম) সব কিছুর ভেতরেও আছেন আবার সব কিছুর বাইরেও আছেন।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে বর্ণনা করার চেষ্টা যে কত বৃথা, এই মন্ত্রে তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম নামরূপহীন। কোন বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষিত করা যায় না। তিনি কিছু না হয়েও সব হয়েছেন। তিনি কিছু নন, কারণ তিনি বাক্যমনাতীত। তিনি সবকিছু কেননা সবকিছু তাঁরই ওপর ন্যস্ত। তিনি আছেন বলেই সব কিছু আছে। সব অস্তিত্বের সারাৎসারও তিনি। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু নাম রূপের পার্থক্যের জন্য তিনিই আবার বহু হয়েছেন। এই নাম এবং রূপ ব্রহ্মের ওপর আরোপিত মাত্র। তিনি অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি

কোন কিছুর অধীন নন অর্থাৎ স্বাধীন। তিনি একইসঙ্গে সকলের অন্তরে আছেন, আবার বাইরেও আছেন।

স্বরূপত ব্রহ্ম নিশ্চল এবং পরিবর্তনরহিত। তিনি সতত বিদ্যমান। কখনও কখনও মেঘের আড়ালে চাঁদকে গতিশীল বলে আমাদের মনে হয়। আসলে এ গতি চাঁদের নয়, মেঘের। সেইভাবে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সর্বদা এক এবং অপরিবর্তিত। তাঁর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। কিন্তু আত্মা যেহেতু দেহের সাথে যুক্ত তাই মনে হয় দেহের মতো আত্মারও জন্ম মৃত্যু ঘটে। আমরা নূতন কাপড় পরে থাকি, কিন্তু সে কাপড় যখন ছিঁড়ে যায় তখন আমরা তাকে ত্যাগ করি। কাপড়ের সঙ্গে দেহের যেরকম সম্পর্ক আত্মার সঙ্গেও দেহের সম্পর্ক সেইরূপ।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥৬

অন্বয়: যঃ তু (কিন্তু যিনি অর্থাৎ যে ব্যক্তি); আত্মনি এব (তাঁর মধ্যে); সর্বাণি (সকল); ভূতানি (ভূত সমূহ); অনুপশ্যতি (দেখেন); চ (এবং); সর্বভূতেষু (সর্বভূতে); আত্মানম্ (আত্মাকে); [অনুপশ্যতি (দেখেন)]; ততঃ (সেহেতু); ন বিজুগুপ্সতে (ঘৃণা করেন না)।

সরলার্থ: যিনি নিজের মধ্যে সকলকে দেখেন এবং সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেন, তিনি কোন কিছু ঘৃণা করেন না।

ব্যাখ্যা: একেই সমদর্শিতা বা সমদৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। সকলের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে এক, পার্থক্য শুধু নাম এবং রূপে। নাম এবং রূপ আত্মার ওপর আরোপিত মাত্র। নামরূপ সত্য নয়, অতএব এরা আত্মার অংশ নয়। নাম এবং রূপ যেন একটি স্বচ্ছ পর্দা যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে দেখি। ছোট ছেলেরা নানা রকমের মুখোশ পরে তাদের বন্ধুদের ভোলায়। প্রথমে হয়তো সে বাঘের মুখোশ পরে বাঘের মতো ব্যবহার করে, ফলে তার বন্ধুরা ভয় পায়। পরমুহূর্তেই সে বাঁদরের মুখোশ পরে, বাঁদরের মতো লাফ দেয়। এতে আবার বন্ধুরা মজা পায়। এভাবে কিছুক্ষণ খেলা চলে। শেষপর্যন্ত সে যখন সব মুখোশ সরিয়ে দেয়, তখন তার আসল চেহারা প্রকাশ পায়। ছেলেরা তখন বোঝে মুখোশ পরা ছেলেটি তাদেরই বন্ধু। আসলে তো সে বরাবরই এক, মুখোশের জন্য তাকে নানারকম মনে হচ্ছিল। ঠিক সেইরকম আমরাও সকলে এক ও অভিন্ন। শুধুমাত্র নামরূপের বিভিন্নতার জন্য আমাদের পৃথক দেখায়।

এই শ্লোকে আমরা যে স্বরূপত এক, একথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সর্বত্র সেই একই সত্তা বিরাজিত। কিছু খণ্ডিত অংশকে একত্রিত করে এই ঐক্যের সৃষ্টি হয়নি। কারণ আত্মা সকলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। আমি যদি কাউকে আঘাত করি, তা হলে এমন হবে, তার দ্বারা যেন আমি আমাকেই আঘাত করেছি। সকলে সুখী হলেই আমরা সুখী। মানুষ, পশু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ আমরা সবাই এক। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে এই একত্বকে উপলব্ধি করা। এই একের উপলব্ধি হলে মনে আর কোন বিদ্বেষ বা গোপনতার স্থান থাকে না। তখন থাকে শুধু সকলের প্রতি প্রেম।

যস্মিন্সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥৭

অন্বয়: যস্মিন্ (যখন); আত্মা এব (একমাত্র আত্মা); সর্বাণি (সকল); ভূতানি (ভূত সমূহ); অভূৎ (হয়েছে); তত্র (তখন); বিজানতঃ (যিনি এটা জানেন); একত্বম্ (একরূপে); অনুপশ্যতঃ (দেখেন যিনি); কঃ (কোথায়); মোহঃ (মোহ); কঃ (কোথায়); শোকঃ (শোক)।
সরলার্থ: যখন কোন ব্যক্তি সব কিছুর মধ্যে এক আত্মাকেই দেখেন এবং জানেন যে তিনি নিজেই সব কিছু হয়েছেন, তখন তিনি কোন কিছুকে ঘৃণাও করেন না বা কোন কিছুর প্রতি আসক্তও হন না।
ব্যাখ্যা: সবকিছুর সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই আত্মজ্ঞানের যথার্থ পরীক্ষা হয়। আমি সর্বত্র এবং সর্বভূতে রয়েছি। সেখানে 'এক' ভিন্ন 'দুই' নেই। সেই 'এক'ই হল স্বয়ং 'আমি'। এই একত্বকে উপলব্ধি করাই হল জীবনের পরম লক্ষ্য। ব্যবহারিক জীবনে যে বৈচিত্র আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু নামরূপের বিভিন্নতার জন্যই এই বৈচিত্র। আর এই নামরূপ আমাদের মনেরই কল্পনা মাত্র। এতে আমার কোন পরিবর্তন হয় না। আমি সেই অপরিবর্তিত এক সত্তামাত্র।

যখন আমরা এই একত্বকে উপলব্ধি করতে পারব, তখন আমাদের আসক্তি, ঘৃণা, বা দুঃখ বলে কিছু থাকবে না। দ্বৈত বোধ আসে অজ্ঞানতা থেকে। আত্মজ্ঞান লাভে অর্থাৎ অদ্বৈতের উপলব্ধিতে এই অজ্ঞানতা সমূলে বিনষ্ট হয়।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-

র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

অন্বয়: সঃ পর্যগাৎ (তিনি [অর্থাৎ পরমাত্মা] সর্বব্যাপী); শুক্রম্ (শুভ্র, উজ্জ্বল); অকায়ম্ (রূপহীন); অব্রণম্, (সম্পূর্ণ, অর্থাৎ অক্ষত); অস্নাবিরম্ (শিরাহীন) [অর্থাৎ দেহহীন]; শুদ্ধম্ (পবিত্র); অপাপবিদ্ধম্ (দোষরহিত [অর্থাৎ অজ্ঞানতার লেশমাত্র নেই]); কবিঃ (প্রাজ্ঞ); মনীষী (সর্বজ্ঞ, মনের নিয়ন্তা); পরিভূঃ (উত্তম বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকলের উপরে তাঁর স্থান); স্বয়ম্ভূঃ (স্বত বিদ্যমান; তিনি সৃষ্ট নন, নিজের ইচ্ছাতেই নিজেকে প্রকাশ করেন); শাশ্বতীভ্যঃ (চিরন্তন); সমাভ্যঃ (কাল ব্যাপী); অর্থান্ (কর্মের ফলসমূহকে); যাথাতথ্যতঃ (যথাযথরূপে); ব্যদধাৎ (বিধান করেন)।

সরলার্থ: তিনি (আত্মা) সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, নিরবয়ব, অক্ষত, অচ্যুত, নির্মল, সর্বজ্ঞ, নিজ মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভূ এবং চিরন্তন। তিনি প্রত্যেকের জন্য যথাকর্তব্য বিধান করেন।

ব্যাখ্যা: আমরা কিভাবে শান্তিলাভ করব সেকথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে দুই বোধ থাকে, ততক্ষণ আমার শত্রু ও মিত্র দুই-ই থাকতে পারে। আমি যেন সেই মনের অধিকারী হতে পারি, যে মন আকাশের মতো উদার এবং সমগ্র পৃথিবীকে নিজের বলে গ্রহণ করে। সেই মন শুদ্ধ, উজ্জ্বল, উদার, মুক্ত এবং সর্বগ্রাহী। এ অবস্থা আমরা তখনই লাভ করতে পারব যখন আমরা উপলব্ধি করব যে, আমিই সকলের মধ্যে রয়েছি।

অদ্বৈতবাদীদের বিশ্বাস, এটিই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। যদি আত্মাকে অন্যরকম বলে মনে হয় তবে তা আরোপিত গুণের জন্য। সেটা কিন্তু আত্মার স্বরূপ নয়। আত্মা সাক্ষী মাত্র। এই দৃশ্যমান জগতের কোন কিছুর সঙ্গেই আত্মা যুক্ত নন। অথচ তাঁরই প্রভাবে এই জগতের সব কিছু ঘটে চলেছে। এ যেন প্রদীপের মতো। প্রদীপ আলো দেয়। আলো ছাড়া ভাল বা খারাপ কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সেই আলোতে ভাল বা মন্দ যে কাজই করি না কেন, তাতে প্রদীপটির কিছু যায় আসে না। আত্মার সঙ্গে দৃশ্যজগতের সম্পর্কও ঠিক সেরকম।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯

অন্বয়: অন্ধম্ (দৃষ্টিহীন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাবে দৃষ্টিহীন); তমঃ (অজ্ঞানতার অন্ধকার অর্থাৎ অহংতা [আমি], মমতা [আমার], অহঙ্কার ইত্যাদি); প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন); যে (যাঁরা); অবিদ্যাম্ উপাসতে (অবিদ্যাকে উপাসনা করেন অর্থাৎ যন্ত্রের মতো যাগযজ্ঞ করেন); ততঃ ভূয়ঃ ইব (তা থেকে আরও বেশী); তমঃ (অন্ধকারে); [প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন)]; য উ (কিন্তু যিনি); বিদ্যায়াং রতাঃ (দেবদেবীর পূজা করেন)।

সরলার্থ: যাঁরা যান্ত্রিকভাবে যজ্ঞাদি কর্ম (অবিদ্যা) করেন তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁরা শুধু দেবদেবীর উপাসনা করেন (বিদ্যা) তাঁরা আরো গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা: 'দৃষ্টিহীন অন্ধকার' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে অজ্ঞানতা। যাঁরা দেবদেবীর পূজা করেন তাঁরা আরো গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কারণ তাঁরা তাদের উপাসনাদি কর্মের প্রতিদানে পুরস্কার কামনা করেন। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে এই 'আমি' এবং 'আমার' বোধ থাকে ততক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যখন 'আমি', 'আমার' বলি তখন আমরা নিজেদের দেহ-মনের সঙ্গে এক করে ফেলি। এর দ্বারা নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ যা বিশুদ্ধচৈতন্য, যা সকলের আত্মা, সে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। 'আমি', 'আমার' এ দুটি অজ্ঞানের লক্ষণ। অজ্ঞান ব্যক্তি 'আমি অমুক', 'আমার সম্পত্তি' এরকম কথা বলে থাকেন।

যে অজ্ঞান, তার মনে নানা বাসনা থাকে এবং এই বাসনা পূরণের জন্য তাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাকে দেহধারণ করতেই হয়, নয়তো বাসনা পূরণ সম্ভব হয় না। কিন্তু যত সে বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করে ততই বাসনাসমূহ তাকে পেয়ে বসে। অনন্তকাল ধরে এই ধারা চলতে থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যেই চিন্তা, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি আছে। তাই সে শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে, ভোগের পথে শান্তি নেই। সে তখন বুঝতে পারে যে, তাকে অন্য পথ অর্থাৎ ত্যাগের পথ অনুসরণ করতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ত্যাগের সাধনা করে, ততক্ষণ অন্ধব্যক্তির মতো সে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় ও দুঃখভোগ করে।

পৃথিবীতে দু-ধরনের মানুষ দেখা যায় যারা অন্ধকারে ঘুরে মরে। এক ধরনের মানুষ অবিদ্যার (অজ্ঞান) উপাসনা করে। অর্থাৎ তারা যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম করে। কিন্তু কেন যে তারা এই কর্মানুষ্ঠান করে তা তারা নিজেরাও জানে না। সুতরাং তারা যে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায় তাতে আর বিস্ময়ের কি? এই সত্য যদি তারা না বোঝে এবং বুঝেও সেভাবে না চলে তবে তাদের বিনাশ অনিবার্য। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাদের আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে।

আর এক ধরনের মানুষ আছে যারা বিদ্যার উপাসনা করে; তাদের অবস্থা আরও খারাপ। 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ সাধারণত জ্ঞান, কিন্তু এখানে দেবদেবীকে বোঝানো হয়েছে। কিছু মানুষ এই আশায় দেবদেবীর উপাসনা করে যে একদিন তারা দেবত্ব লাভ করবে এবং তাদের সব কামনা বাসনা পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু এর দ্বারা তাদের মুক্তিলাভে আরও দেরী হয়। এই কারণেই উপনিষদ বলেন যে, তারা আরও গভীরতর অন্ধকারে নিমগ্ন হবে।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥১০

অন্বয়: অন্যৎ (ভিন্ন [ফেল]); এব (-ই); আহুঃ (বলেন); বিদ্যয়া (দেবতা উপাসনার দ্বারা); অন্যৎ(ভিন্ন [ফল]); আহুঃ (বলেন); অবিদ্যয়া (যজ্ঞকর্মের দ্বারা); যে নঃ (যাঁরা আমাদেরকে); তৎ (তা); বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করেছেন); ইতি (এইরূপ); শুশ্রুম (আমরা শুনেছি); ধীরাণাম্ (জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে)।

সরলার্থ: পণ্ডিতেরা বলেন—অবিদ্যার পথ (অগ্নিহোত্র এবং অন্যান্য যজ্ঞকর্ম) এবং বিদ্যার পথ (দেবদেবীর উপাসনা) ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এই কথা সমর্থন করেন।

ব্যাখ্যা: বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই আত্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়, কিন্তু বিদ্যা অবিদ্যা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'বিদ্যা' শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এখানে এর অর্থ হল দেবদেবীর উপাসনা করা। দেবদেবীর উপাসনার দ্বারা মৃত্যুর পরে আমরা দেবলোকে যেতে পারি। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের কি লাভ হবে? বরং দেবলোকে অবস্থানের ফলে আমাদের সময় নষ্ট হবে। কারণ যদি দেবলোকে অবস্থান না করতাম তবে সেই সময়টুকুও আমরা আমাদের জীবনের যা লক্ষ্য—আত্মজ্ঞান লাভ, তা অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করতে পারতাম। দেবলোকে কিন্তু তা সম্ভব নয়। সেখানে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা আর থাকে না। ফলে এই বিদ্যার পথ মানুষকে গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

অবিদ্যা হচ্ছে কর্মকাণ্ড, সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভের পথে এও একটা বাধা। কর্ম হল—অগ্নিহোত্র বা অন্যান্য যাগ করা। এই পথ আমাদের সোজাসুজি চিত্তশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায় না। এ যেন অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানো। তবে বিদ্যার পথের মতো এই পথে সময় এবং শক্তি অপচয়ের তত বেশি মাশুল দিতে হয় না।

এক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের চূড়ান্ত নির্দেশ হল : কর্ম এবং উপাসনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই দুটি পথ একত্রিত হলে আমরা আত্মজ্ঞানের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে

যেতে পারব। কারণ এই সমন্বয় আমাদের চিত্তশুদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। এর ফলে ক্রমে আমাদের ভোগের প্রতি আসক্তি হ্রাস পাবে এবং 'আমি' 'আমার' বোধ মুছে যাবে। আচার্য শঙ্কর একেই 'ক্রমমুক্তি'র পথ বলেছেন।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥১১

অন্বয়: যঃ (যিনি); বিদ্যাম্ (বিদ্যা); চ (এবং); অবিদ্যাম্ (অবিদ্যা); তৎ উভয়ং সহ (উভয়কে একত্রে); বেদ (জানেন); অবিদ্যয়া (অবিদ্যার দ্বারা); মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে); তীর্ত্বা (অতিক্রম করে); বিদ্যয়া (বিদ্যার দ্বারা); অমৃতম্ (অমৃত); অশ্নুতে (লাভ করেন)।

সরলার্থ: যিনি দেবদেবীর উপাসনা করেন (বিদ্যা), আবার যাগযজ্ঞাদি কর্মও করেন (অবিদ্যা), তিনি যজ্ঞকর্মের দ্বারা (অবিদ্যা) অমরত্ব লাভ করেন এবং দেবদেবীর উপাসনার (বিদ্যা) দ্বারা আনন্দ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: উপাসনা এবং যজ্ঞকর্ম উভয়ক্ষেত্রেই শর্ত হল, মানুষকে এই কাজ করতে হবে নিষ্কাম ভাবে। তিনি কর্মের কোন ফল কামনা করবেন না। এমনকি স্বর্গলাভ হবে, এ কামনাও তিনি করবেন না।

আগেই বলা হয়েছে এখানে 'বিদ্যা' শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দেবদেবীর উপাসনা করা। সেরকম অবিদ্যারও বিশেষ অর্থ আছে। তা হল কর্ম— অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম। এই কর্ম অবশ্যকরণীয়। কিন্তু যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে এই কর্ম করা যায় তবে তার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম এবং উপাসনার সমন্বয়ের দ্বারাই মানুষ ক্রমমুক্তি লাভ করে। যারা ত্যাগের জন্য নিজেদেরকে এখনও প্রস্তুত করতে পারেনি তাদের জন্য শঙ্করাচার্য এই পথের কথা বলেছেন।

কিন্তু ধরা যাক, দুটি পথ পৃথকভাবে গ্রহণ করা হল। অবিদ্যার পথে অগ্রসর হলে মানুষ মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যাবে (যে লোকে তার পিতৃপুরুষরা গেছেন)। এই পিতৃলোক অন্ধকারের রাজ্য কারণ আত্মজ্ঞান থেকে এই জগৎ বহুদূরে। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তাকে এখনও অনেক অপেক্ষা করতে হবে। আর বিদ্যার (দেবদেবী) উপাসনা করলে মানুষ গভীরতর অন্ধকারের জগতে পৌঁছবে এবং আত্মজ্ঞান লাভে আরো দেরী হবে। কিন্তু এর কারণ কি?

মৃত্যুর পর মানুষ দেবলোক (স্বর্গলোক, সেখানে দেবদেবীদের বাস) গেলে সেখানকার সুখভোগে মত্ত হয়ে থাকে। পুণ্যকর্মের ফল নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে থাকতে

পারে। তারপর আবার তার মানুষরূপে জন্ম হয় এবং আগের বার যেখানে সংগ্রাম শেষ হয়েছিল ঠিক সেখান থেকেই নতুন করে সংগ্রাম শুরু করতে হয়। এ জন্যই বিদ্যাকে নিকৃষ্টতর বলা হয়।

কিন্তু যদি এই দুই পথকে একই সঙ্গে গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ কামনাশূন্য হয়ে যাগযজ্ঞাদি অবশ্য কর্ম এবং স্বর্গলাভের আশা ত্যাগ করে দেবতার উপাসনা করা যায়, তা হলে মোক্ষ এবং পরমানন্দ দুই-ই লাভ করা যায়। যাদের মন ত্যাগের জন্য এখনও প্রস্তুত নয় তাদের জন্য এই পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২

অন্বয়: যে অসম্ভূতিম্ (যাঁরা অব্যক্তকে); উপাসতে (উপাসনা করেন); অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি (অন্ধকার লোকে প্রবেশ করেন, যেখানে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অন্ধ); যে সম্ভূত্যাং রতাঃ (যাঁরা ব্যক্তকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন); ততঃ ভূয়ঃ ইব তে তমঃ (তার ফলে তাঁরা যেন আরও বেশী অন্ধকারে); প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন)।

সরলার্থ: যাঁরা অব্যক্তকে (জগতের কারণ অবস্থা) উপাসনা করেন তাঁরা অন্ধের মতো অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁরা ব্যক্তকে (অর্থাৎ চতুর্দিকের দৃশ্যজগৎ) উপাসনা করেন তাঁরা আরো গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা: অসম্ভূতি—অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত। সম্ভূতি—ব্যক্ত বা প্রকাশিত। ভারতীয় দর্শন সৃষ্টি তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ শূন্য থেকে 'কিছু' সৃষ্টি হয় একথা ভারতীয় দর্শন স্বীকার করে না। কার্য থাকলে অবশ্যই তার পূর্বে কারণ থাকবে। কারণ দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব কোন না কোন সময়ে থাকবেই। যেমন একটি বিশাল বটগাছ। কোথা থেকে এই গাছটির জন্ম হল? মাটির নীচে নিহিত কোন বীজ থেকে। বীজটিকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু নিশ্চয়ই বীজটি কোথাও না কোথাও ছিল। বীজ ছিল না, একথা বলা যায় না। পূর্বে গাছটি বীজরূপে অব্যক্তভাবে ছিল। এখন গাছ রূপে প্রকাশিত হল। আমাদের চারপাশে যা দেখি—গাছ, আকাশ, পর্বত, সমতল, নদী, অরণ্য, মানুষ, পশু—সব এককালে অব্যক্ত অবস্থায় অর্থাৎ অসম্ভূতির অংশ রূপে ছিল। 'অসম্ভূতি' এবং প্রকৃতি একই। এ এমন অবস্থা যখন সব শক্তিগুলি একে অপরের সঙ্গে সাম্য অবস্থায় থাকে। ভারতীয় দর্শন প্রধানত সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি শক্তির উল্লেখ করেছেন। যখন এই তিনটি শক্তি সাম্য অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তিনটিই সমানভাবে থাকে, তখন কোন প্রকাশ থাকে না। তখনকার অবস্থা

বর্ণনা করা কঠিন। এ এক অনির্দিষ্ট সত্তা—যেন তরঙ্গবিহীন সমুদ্র যা অনন্ত, এক ও অভেদ।

কিন্তু কোন ভাবে কোন একসময় এই সাম্য অবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। কেন ঘটে কেউ জানে না। সম্ভবত বস্তুর প্রকৃতিগত কারণেই এই বিক্ষেপের সৃষ্টি হয়। এখানেই 'সম্ভূতি' বা প্রকাশের সূত্রপাত। এক বহুতে পরিণত হয়। বহু একে নিহিত ছিল। এবারে তা প্রকাশ পেল। প্রথম প্রকাশকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ অথবা 'প্রথমজাত'।

'অসম্ভূতি' বা 'সম্ভূতি'—যারই উপাসনা করা যাক না কেন ফল কিন্তু একই। এ যেন অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানো। 'অসম্ভূতি' সম্পর্কে কিছু না জেনেও তাকে উপাসনা করা যায়। হয়তো ভয় থেকে অথবা কিছু পাওয়ার আশা করে এই উপাসনা করা হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ অন্ধ, অসহায় এবং অজানা আশঙ্কায় ভীত।

'সম্ভূতি' বা ব্যক্ত জগতের উপাসনা আরও নিকৃষ্ট কারণ সেখানে এমন কিছু জিনিস আছে যা ভীতিপ্রদ, আবার এমনও আছে যা লোভনীয়। কিন্তু এর কোনটিই পরিণামে সুখের নয়। মানুষ এখানে অসহায় ক্রীতদাস মাত্র। এই অবস্থাকে বোঝাবার জন্যই বলা হয়েছে সম্ভূতির উপাসনা আমাদেরকে গভীরতর অন্ধকারে নিয়ে যায়।

কিন্তু বেদান্ত বলেন, বাইরে কিছু নয় সবই তোমার ভেতরে আছে। তোমার আত্মাই সর্বোচ্চ। বাইরের কোন বস্তুর দাসত্ব স্বীকার করলে কখনও সুখী হওয়া যায় না। নিজেকেই নিজের প্রভু হতে হবে, এই বেদান্তের বক্তব্য।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥১৩

অন্বয়: সম্ভবাৎ (ব্যক্তপ্রকৃতি থেকে, হিরণ্যগর্ভ থেকে); অন্যৎ এব (ভিন্ন [ফল]); আহুঃ (পণ্ডিতেরা বলেন); অসম্ভবাৎ (অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে); অন্যৎ (অন্য, অন্য প্রকার ফল); আহুঃ (পণ্ডিতেরা বলেন); ইতি (এই); শুশ্রুম.(আমরা শুনেছি); ধীরাণাম্ (জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে); যে (যাঁরা); নঃ (আমাদেরকে); তৎ (প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভকে উপাসনার ফল); বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করেছেন)।

সরলার্থ: পণ্ডিতেরা বলেন সম্ভূতির (হিরণ্যগর্ভ) এবং অসম্ভূতির (প্রকৃতি) উপাসনা পৃথক পৃথক ফল দান করে। জ্ঞানীরা তা সমর্থন করেন।

ব্যাখ্যা: ব্যক্ত এবং অব্যক্ত প্রকৃতিকে উপাসনা করা যে নিরর্থক আচার্য শঙ্কর তা পূর্বেই বলেছেন। ব্যক্ত প্রকৃতিকে (হিরণ্যগর্ভ) উপাসনা করে আমরা বড় জোর কিছু অসামান্য

শক্তি লাভ করতে পারি। প্রকৃতির কার্যকলাপ অতি বিস্ময়কর। প্রকৃতিকে উপাসনা করে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য বিভূতির কিছুটা হয়তো আমাদের মধ্যে আসতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু অব্যক্ত প্রকৃতিকে উপাসনা করে আমরাও অব্যক্ত হয়ে যাই। অব্যক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাই। হিন্দুদের বিশ্বাস, আমরা যার উপাসনা করি তাই হয়ে যাই।

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥১৪

অন্বয়: সম্ভূতিং চ বিনাশং চ (অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ব্যক্ত প্রকৃতি [হিরণ্যগর্ভ]); যঃ তৎ উভয়ং সহ বেদ (যিনি উভয়কে জানেন); বিনাশেন (ব্যক্তের, হিরণ্যগর্ভের উপাসনার দ্বারা); মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে); তীর্ত্বা (অতিক্রম করে); অসম্ভূত্যা (অব্যক্তের উপাসনার দ্বারা); অমৃতম্ (অমরত্ব); অশ্নুতে (লাভ করেন)।

সরলার্থ: যিনি অব্যক্তকে (অসম্ভূতি) এবং ব্যক্তকে (সম্ভূতি) একই সঙ্গে উপাসনা করেন তিনি অব্যক্তের উপাসনা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন এবং ব্যক্তের উপাসনা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করেন।

ব্যাখ্যা: প্রথম 'সম্ভূতি'কে 'অসম্ভূতি' বলে পাঠ করতে হবে—অর্থাৎ অব্যক্ত। 'অ' এখানে ছন্দের কারণে অনুক্ত। বিনাশ বা মৃত্যু হল হিরণ্যগর্ভ, যা সম্ভূতির প্রথম প্রকাশ। হিরণ্যগর্ভের নাম বিনাশ কারণ একসময় পুরোপুরি তার লয় হবে। যা ব্যক্ত তাই পুনরায় অব্যক্তে পরিণত হতে পারে।

পরমসত্য, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই-ই হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, তা ব্যক্ত বা অব্যক্ত যাই হোক না কেন। যদি আমরা আমাদের উপাসনা ব্যক্ত বা সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভ দিয়ে শুরু করি, তবে আমরা কিছু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মানুষ কি না করতে পারে। মানুষ জীবনের অনেক সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করতে পারে, এমনকি মৃত্যুভয়কেও জয় করতে পারে। যদি আমরা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করি তাহলে আমরা তাঁর মতোই হয়ে যাব। হিরণ্যগর্ভ মৃত্যুর অধীন। কারণ যার উৎপত্তি আছে তার লয়ও আছে। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই মৃত্যুই শেষ নয়, এ একটা অবস্থান্তর মাত্র। যখন আমরা তা.হৃদয়ঙ্গম করি তখন আমাদের অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণা হয় এবং আমরা মৃত্যুকে জয় করি।

অব্যক্তের উপাসনাতেও আমাদের অনুরাগী হতে হবে। যখন আমরা অব্যক্তকে ভালবাসতে শিখি তখন আমরা অব্যক্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। অব্যক্তই প্রকৃতি এবং

প্রকৃতিই চিরন্তন। এভাবে আমরাও চিরন্তন হয়ে উঠি। সম্ভূতি, অসম্ভূতি উভয়ই আমাদের অমরত্বের বোধ এনে দিতে পারে, কিন্তু সেই অমরত্ব আপেক্ষিক। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ হলে মৃত্যুকে সম্পূর্ণ জয় করা সম্ভব হয়।

বিদ্যা, অবিদ্যা, সম্ভূতি, অসম্ভূতি—এ সবই অজ্ঞানতার এলাকার মধ্যে পড়ে।

এ সব আমাদের কিছুকালের জন্য মুক্তির স্বাদ দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা স্থায়ী মুক্তি নয়। আমরা তখনও কর্মপাশে আবদ্ধ।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥১৫

অন্বয়: পূষন্ (হে সূর্য, জগতের ধারক); হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা); সত্যস্য মুখম্ (সত্যের মুখ); অপিহিতম্ (আবৃত); ত্বং তৎ (তুমি তা); অপাবৃণু (দয়া করে সরিয়ে দাও); সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে (যাতে সত্যের অনুসন্ধানী আমি তা দেখতে পাই)।

সরলার্থ: সত্যের মুখ উজ্জ্বল সোনার পাত্রের দ্বারা আবৃত। জীবন ও জগতের ধারক হে সূর্য, তুমি সেই আবরণটি দয়া করে সরিয়ে দাও যাতে সত্যজিজ্ঞাসু আমি, সত্যকে দর্শন করতে পারি।

ব্যাখ্যা: সূর্যকে এখানে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্য সবকিছুর ধারক। তিনি জীবন এবং যাবতীয় বস্তুর উৎস। সূর্য নিজে উজ্জ্বল এবং সূর্যের কিরণেই অন্য সব বস্তু আলোকিত হয়। তাঁর উজ্জ্বলতা আমাদের চোখে ধাঁধা লাগায়। উপনিষদ বলেছেন, সূর্যের অন্তরালে সত্য আছে এবং সেই সত্যই ব্রহ্ম। আমরা সবাই সেই সত্যকে, ব্রহ্মকে খুঁজে চলেছি। কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না। কারণ সূর্যের আলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সূর্য যেন একটি উজ্জ্বল সোনার পাত্র, সত্যকে আড়াল করে আছে। আমরা তাই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করি তিনি সেই আড়ালটি সরিয়ে দিন, আমরা যাতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারি অর্থাৎ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বস্তু এভাবেই যেন এক সোনার পাত্রের দ্বারা ঢাকা। আর সেই জন্যই আমরা সেদিকে আকৃষ্ট হই। কিন্তু এই বস্তুসমূহ সত্য নয়, যদিও সত্য বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। যেমন অন্ধকার স্থানে দড়িকে সাপ বলে ভুল করি। যখন আলো আসে তখন দড়িকে দড়ি বলে চিনতে পারি। সেইরকম সত্যকে দেখার জন্যও আলোর প্রয়োজন। সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য দরকার বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির। দৃশ্যমান জগৎ সত্য নয়; সত্য নয় এই অর্থে যে, তা সদা পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু সত্যের কখনও পরিবর্তন হয় না। সত্য ধ্রুব এবং অক্ষয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মই আত্মা, এই আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। অজ্ঞানতার জন্য আমরা ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে চিরস্থায়ী মনে করে তাতে আসক্ত হই। অচিরেই যখন তার বিনাশ হয় তখন আমরা শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আমরা এই যে ভুল করি তার কারণ এইসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আমাদের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। মনে হয় বস্তুগুলি যেন সোনা দিয়ে মোড়া; কিন্তু আসলে তা সোনা নয়। তাই উপনিষদের ঐকান্তিক প্রার্থনা—যথার্থ সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হোক, আমরা যেন অসার এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মোহে বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে না চলি। সূর্যই আলো; আলোই জ্ঞান; জ্ঞানই সত্য; সত্যই জ্ঞান।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥১৬

অন্বয়: পূষন্ (হে পূষন্, হে সূর্য, হে জগতের পালক); একর্ষে (একাকী বিচরণকারী); যম (হে যম, হে সর্বনিয়ন্তা); সূর্য (হে সূর্য); প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতির পুত্র); রশ্মিন্ ব্যূহ (কিরণ সংবরণ কর); সমূহ তেজঃ (তোমার তেজ সংবরণ কর); যৎ তে (যাতে তোমার); কল্যাণতমং রূপম্ (কল্যাণতম রূপ); তৎ পশ্যামি (তা আমি দেখতে পাই); যঃ (যিনি); অসৌ (আদিত্য মণ্ডলে); অসৌ পুরুষ (ঐ পুরুষ); সঃ অহম্ অস্মি (তিনিই আমি)।

সরলার্থ: হে পষন্, হে নিঃসঙ্গ পথচারী, হে সর্বনিয়ন্তা, হে প্রজাপতি-নন্দন সূর্য, অনুগ্রহ করে তুমি তোমার কিরণরাশি সংহত কর। তোমার তেজ সংবরণ কর। আমি তোমার কল্যাণতম রূপটি দেখতে চাই। তোমার মধ্যে সেই পুরুষ রয়েছেন; আমিই সেই পুরুষ।

ব্যাখ্যা: সূর্য জগতের পালক এবং নিঃসঙ্গ পথচারী অর্থাৎ স্বনির্ভর। তিনি যম নামেও পরিচিত, কারণ তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রজাপতি সব প্রাণীর প্রভু এবং সূর্য প্রজাপতির পুত্র। সূর্য জগতের সর্বত্র আলো দেন। এখানে সূর্যকে তাঁর কিরণ কিছুটা সংবরণ করার জন্য প্রার্থনা জানানো হচ্ছে : তুমি আমার দৃষ্টির পক্ষে অতি উজ্জ্বল। অনুগ্রহ করে তোমার উজ্জ্বল জ্যোতি আমার প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ ম্লান করো। আমি তোমাকে কল্যাণতম রূপে দেখতে চাই। আমি ভিক্ষা প্রার্থনা করছি না। তার প্রয়োজন নেই। কারণ আমি অনুভব করি যিনি তোমার রাজ্যের অধিপতি তিনিই আবার আমি।

সূর্য ব্রহ্মেরই প্রতীক। প্রথমে সূর্যকে দেবতারূপে উপাসনা করা হয়। তার ফলে তাঁর শক্তি এবং সৌন্দর্যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। তার থেকেই আকাঙ্ক্ষা জাগে—সেই শক্তি এবং সৌন্দর্যের কিঞ্চিৎ যেন আমরা অর্জন করতে পারি। পরে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করি যে, তিনি এবং আমি এক। এই উপলব্ধি বহু বৎসরের সংযম, ত্যাগ এবং ধ্যানের ফলেই সম্ভব হয়।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥১৭

অন্বয়: [আমার মৃত্যু আসন্ন] অথ (সেই হেতু); বায়ুঃ ([আমার] প্রাণবায়ু); অমৃতম্ অনিলম্ (মহাবায়ুতে মিলিত হোক); ইদং শরীরম্ (আমার এই স্থূল শরীর); ভস্মান্তম্ (ভস্মীভূত হোক); ওম্ (ব্রহ্মকে স্মরণ করা হচ্ছে); ক্রতো (হে আমার মন); স্মর ([স্মরণীয়কে] স্মরণ কর); কৃতং স্মর (জীবনে যা কিছু করেছ তা স্মরণ কর); ক্রতো স্মর কৃতং স্মর (পুনঃ পুনঃ স্মরণার্থে)।

সরলার্থ: এখন সেই মৃত্যু আসন্নপ্রায়। আমার প্রার্থনা যেন আমার প্রাণবায়ু বিশ্বপ্রাণে বিলীন হয়। যেন আমার দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হে মন, সারা জীবনে তুমি যা কিছু করেছ তা চিন্তা কর। নিজের কৃতকর্ম স্মরণ কর।

ব্যাখ্যা: মৃত্যু আসন্ন হলে অনেক চিন্তা আমাদের মনে এসে ভিড় করে। আমরা সারা জীবন যেভাবে কাটিয়েছি সেই অনুরূপ চিন্তাই আমাদের মনে জাগে। আমাদের সেই সময় বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে কেবল শুভ চিন্তাই আমরা করতে পারি। আমরা যা চিন্তা করি তাই হয়ে যাই। আমাদের চিন্তাই আমাদের সৃষ্টি করে। এই কারণেই বারবার চেষ্টা করতে হয় যাতে মন শুধু ভাল চিন্তাই করে। আর এইজন্যই আত্মীয়-পরিজনও মৃত্যুর সময়ে বিশেষ প্রার্থনা করে থাকেন।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥১৮

অন্বয়: অগ্নে (হে অগ্নি); রায়ে (শুভ কর্মফল লাভের উদ্দেশ্যে); অস্মান্ সুপথা (আমাদেরকে সুপথে); নয় (নিয়ে যাও); বিশ্বানি বয়ুনানি (সকল কর্ম এবং চিত্তবৃত্তি); বিদ্বান্ ([আপনি] জানেন); অস্মৎ (আমাদের কাছ থেকে); জুহুরাণম্ এনঃ (সকল অশুভ কর্মের ফল); যুযোধি (দূর করুন); তে (আপনাকে); ভূয়িষ্ঠাম্ (বার বার); নমঃ নমস্কার); উক্তিম্ (বচন); বিধেম (উচ্চারণ করি)।

সরলার্থ: হে অগ্নি, যা হিতকর তা লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সুপথে চালিত কর। হে দেব, আমাদের সব কৃতকর্ম এবং চিন্তা তুমি জান। আমাদের মধ্যে যা কিছু অশুভ, অনুগ্রহ করে তা দূর কর। আমরা তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা: অগ্নির কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, যাতে তিনি আমাদের ব্রহ্মের দিকে চালিত করেন। মৃত্যুকালে স্থূল শরীর আগুনে পুড়ে যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকে। সূক্ষ্ম শরীর সতেরটি অংশের সমষ্টি পাঁচটি প্রাণবায়ু, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি। এইসবই জড় কিন্তু অতি সূক্ষ্মরূপে থাকে। আমাদের সব কর্ম এবং চিন্তার ছাপ মনে থেকে যায়।

মৃত্যুকালে জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। যার যেমন কর্মফল সেই অনুযায়ী আত্মা পিতৃলোকে বা দেবলোকে যায়। সেখানে সে কতকাল থাকবে তাও আমাদের কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তারপরে আত্মা পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, কেননা তখনও তার বাসনার নিবৃত্তি হয়নি।

এইভাবে জন্মমৃত্যুর মধ্যে আত্মার আসা যাওয়া চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই যাতায়াতের অসারতা বুঝতে পারে। তখন মানুষ ত্যাগের পথ অনুসরণ করে। একমাত্র ত্যাগের পথেই মানুষের মুক্তি। তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যান।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

কেন উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষু: শ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং
ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ;
অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে
য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: মম অঙ্গানি (আমার অঙ্গসমূহ); বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ (বাক্‌শক্তি, প্রাণবায়ু, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং বল); সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি চ (এবং সকল ইন্দ্রিয়); আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক); সর্বম্ ঔপনিষদং ব্রহ্ম (সকলই ব্রহ্ম, এই কথাই সমস্ত উপনিষদ বলে); অহং ব্রহ্ম মা নিরাকুর্যাম্ (আমি যেন ব্রহ্মের কথা শুনতে উদাসীন না হই) ব্রহ্ম মা মা নিরাকরোৎ (ব্রহ্ম যেন কখনও আমাকে সরিয়ে না দেন); অনিরাকরণম্ অস্তু (আমিও যেন তাঁর কাছ থেকে সরে না আসি); মে অনিরাকরণম্ অস্তু (তিনিও যেন আমায় তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে না দেন); উপনিষৎসু (উপনিষদসমূহে); যে ধর্মাঃ (যে সকল ধর্ম আছে); তে (তারা); তৎ আত্মনি নিরতে ময়ি (আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞান লাভের সাধনায় রত আমার); সন্তু (হোক); তে ময়ি সন্তু (সেগুলি যেন আমার আয়ত্তে আসে); শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ কীটপতঙ্গ, হিংস্রপ্রাণী প্রভৃতি-কৃত বিঘ্নের শান্তি])।

সরলার্থ: আমার সমস্ত অঙ্গ যেন পুষ্ট হয়। তার সঙ্গে আমার প্রাণবায়ু, বাক্‌শক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং অন্যান্য সব ইন্দ্রিয়গুলিও যেন শক্তিশালী হয়। ব্রহ্মের কথাই সব উপনিষদ বলে। আমি যেন কখনও ব্রহ্মের কথা শুনতে উদাসীন না হই। ব্রহ্মও যেন কখনও আমাকে সরিয়ে না দেন। আমি তাঁর কাছ থেকে সরে আসব না, তিনিও যেন আমাকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে না দেন। আমি বিশেষ করে এই চাই যে, আমি যেন সরে না আসি। আমি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে পড়াশুনা করছি। কি কি গুণ থাকলে স্বরূপ-জ্ঞান হয়, তা উপনিষদ বলে দিয়েছেন। আমি যেন সেই গুণগুলি আয়ত্ত করতে পারি।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

ব্যাখ্যা: এই মঙ্গলাচরণ যেন একটা প্রার্থনা—শক্তির জন্যে। কিন্তু কেন? উপনিষদ বুঝতে গেলে শক্তি চাই। ব্রহ্মতত্ত্ব তথা সত্য কি বুঝতে গেলে শক্তি চাই। উপনিষদ সত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি সেই সত্যই জানতে চাই। উপনিষদ যে তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা আমি জানতে চাই। মুণ্ডক উপনিষদ বলেছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো'—যারা দুর্বল তারা কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না (মু. উ. ৩১|২|৪)। অর্থাৎ যারা দেহে, মনে এবং চরিত্রের শক্তিতে শক্তিমান, তারাই পারে। উপনিষদ বেশ দুর্বোধ্য, আবার সূক্ষ্মও বটে। দুর্বলের পক্ষে ব্রহ্মকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই এই প্রার্থনা এবং এই প্রার্থনার তাৎপর্য বিশেষ অর্থবহ।

কেন উপনিষদ

এই উপনিষদের নাম 'কেন উপনিষদ'; তার কারণ এই, এটি শুরু হয়েছে একটি বিশেষ শব্দ দিয়ে। শব্দটি হচ্ছে 'কেন', অর্থাৎ 'কার দ্বারা'। উপনিষদ প্রশ্ন করছেন, 'কার দ্বারা এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত?' এর উত্তর—ব্রহ্ম। এই তত্ত্বটি বোঝানোর জন্য এখানে একটি গল্প বলা হয়েছে যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে ব্রহ্ম ছাড়া দেবতারা একান্ত অসহায়; দেবতাদের যদি কোন শক্তি থেকে থাকে তার উৎসও ব্রহ্ম। জীবনের লক্ষ্য সেই এককে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। কেন উপনিষদ বলছেন, একমাত্র এই একত্বের জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে। বস্তুত সব উপনিষদেরই এই এক সুর, 'একের' আলোচনা। সকলেই বলছেন ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই। ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাই তাকে পরা বিদ্যা বলা হয়েছে। এই জ্ঞান পরম সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান হল অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় নিকৃষ্ট বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বোত্তম, কারণ এই জ্ঞান হলে আপনি ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করেন। এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কারণ তা মানুষকে অপার শান্তি ও আনন্দে ভরপুর করে দেয়।

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥১

অন্বয়: কেন ইষিতম্ [কেনেষিতম্ (কার ইচ্ছায়); প্রেষিতম্ (কার নির্দেশে); মনঃ পততি (মন পড়ে [স্ববিষয়ে অর্থাৎ স্ববিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়]); কেন (কার দ্বারা); প্রাণঃ (প্রাণবায়ু); প্রথমঃ (প্রথম); প্রৈতি (যায়, ধাবিত হয়); যুক্তঃ (কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে); ইমাং বাচম্ (এই কথা [শব্দ]); বদন্তি ([মানুষ] বলে); চক্ষুঃ (চোখ); শ্রোত্রম্ (কান); কঃ (কোন্); দেবঃ (দেবতা [দেবতা অর্থাৎ যিনি আলোকপ্রদ]); যুনক্তি (চালনা করেন)।
সরলার্থ: (শিষ্য)—কার ইচ্ছায় মন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়? প্রাণের প্রথম লক্ষণ, শ্বাসবায়ু, কার নির্দেশে কাজ করে? কার নির্দেশে মানুষ কথা বলে? চোখ, কান [এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে] কোন্ দেবতা চালনা করেন?
ব্যাখ্যা: একটি মূল প্রশ্ন দিয়ে এই উপনিষদ শুরু হয়েছে: 'কে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন?' এই প্রশ্নের আর একটি তাৎপর্য: 'কে এই জগৎকে চালান?' স্পষ্টই বোঝা যায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। তা যদি হত, তাহলে শেষপর্যন্ত যা ক্ষতিকর এমন কোন কাজ তারা করতে পারত না। অতএব দৃশ্যমান এই জগতের কার্যকলাপ অবশ্যই কারও দ্বারা পরিচালিত বলে মনে হয়। কে সেই পরিচালক?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥২

অন্বয়: শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (কানেরও কান [অর্থাৎ, প্রকৃত যে শক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়কে চালনা করে]); মনসঃ মনঃ (মনেরও মন [অর্থাৎ, প্রকৃত যে শক্তির দ্বারা মন কাজ করে]); যদ্

বাচো হ বাচম্ (যা বাগিন্দ্রিয়ের বাক্ [অর্থাৎ, প্রকৃত যে শক্তি বাগিন্দ্রিয়কে পরিচালনা করে]); সঃ উ প্রাণস্য প্রাণঃ (তিনি প্রাণবায়ুরও প্রাণ [অর্থাৎ, প্রকৃত যে শক্তি প্রাণবায়ুকে চালনা করে]); চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চোখেরও চোখ [অর্থাৎ, প্রকৃত যে শক্তি চোখকে চালনা করে]); ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান বা বিচারশীল ব্যক্তিরা); অতিমুচ্য (ত্যাগ করে [অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে]); প্রেত্য (নিবৃত্ত হয়ে); অস্মাৎ লোকাৎ (এই জগৎ থেকে); অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ: (আচার্য)—এই (ব্রহ্মই) কানের প্রকৃত কান, মনের যথার্থ মন, কথার প্রকৃত শক্তি, শ্বাসের প্রকৃত শ্বাস, চোখের প্রকৃত চোখ। তাই জ্ঞানীরা দেহে আত্মবুদ্ধি না করে এই জগৎকে ত্যাগ করেন এবং অমর হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: আত্মার শক্তিতেই ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিমান। মৃত্যুর সময় আত্মা তাঁর সেই শক্তি প্রত্যাহার করে নেন, তাই অক্ষত থাকলেও ইন্দ্রিয়গুলি অকেজো হয়ে পড়ে। 'প্রেত্য' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'মৃত্যুর পর'। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে কথাটির অর্থ 'নিবৃত্ত হয়ে' বা 'ত্যাগ করে'। কি ত্যাগ করতে হবে? দৃশ্যমান এই জড়জগৎ, নামরূপের এই প্রাতিভাসিক জগৎ। কেন? কারণ কেবলমাত্র প্রাতিভাসিক জগৎকে ত্যাগ করেই সেই পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ঈশ উপনিষদও আমাদের সেই নির্দেশ দিচ্ছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' অর্থাৎ ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে পুষ্ট করো (ঈশ. উ. ১)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অন্তর্নিহিত যে ব্রহ্মসত্তা তাঁকে কেবলমাত্র ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং অমর হতে পারি। 'প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি'—এই বাক্যের দ্বারা কেন উপনিষদ আমাদের সেই কথাই বলতে চাইছেন। চারপাশে যা ঘটছে তা দেখে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আমাদের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে মনে হয় এবং এই জগৎও নিঃসন্দেহে খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু আমরা যেন বিচারবুদ্ধি না হারাই; সত্যের প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে।

'কেনেষিতম্', কার নির্দেশে এই জগৎ সত্য বলে প্রতিভাত হয়? জগতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন যে ব্রহ্ম, তাঁরই নির্দেশে। ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান হয়ে আছেন বলেই এই জগৎকে সত্য মনে হয়। মাটিতে দড়ি পড়ে আছে বলেই সেটিকে সাপ বলে মনে হয়। সাপটা একটা চাপানো জিনিস। দড়িটি থাকাতেই সাপের অধ্যাস সম্ভব। দড়িটি সরিয়ে নিলে আর সাপ দেখা যাবে না। ঠিক সেইরকম, ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগতের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥৩

অন্বয়: তত্র (সেখানে [অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্ম আছেন]); চক্ষুঃ ন গচ্ছতি (চোখ যেতে পারে না); ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ (যা বাক্য এবং মনের অতীত); ন বিদ্মঃ (আমরা জানি না [এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি); যথা (কি ভাবে); এতৎ (এই [ব্রহ্ম]); অনুশিষ্যাৎ (গুরু শিষ্যের কাছে ব্যাখ্যা করেন); ন বিজানীমঃ ([তাও] আমাদের কাছে দুর্বোধ্য [অর্থাৎ আমরা জানি না])।

সরলার্থ: ব্রহ্ম যেখানে, সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছতে পারে না। তা আমাদের বাক্য এবং মনেরও অতীত। আচার্য এ দুরূহ তত্ত্ব কিভাবে শিষ্যের কাছে ব্যাখ্যা করেন তা আমরা জানি না।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তাঁর সম্পর্কে তাই আমরা কিছুই বলতে পারি না। তিনি অসীম—এতই বিশাল যে, আমাদের মন তাঁর ধারণা করতে পারে না। তাই আচার্য বলছেন, 'ন বিদ্মঃ ন বিজানীমঃ'—আমরা জানি না, আমরা জানি না। কেন আমরা জানি না? কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নন। আমাদের থেকে আলাদা একটা বস্তুকে আমরা জানতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে পারি না। কারণ আমরাই ব্রহ্ম। আমাদের থেকে যা পৃথক তাকেই আমরা জানতে পারি, কিন্তু নিজের আত্মাকে আমরা কখনই দেখতে পাই না। ব্রহ্ম সর্বদাই জ্ঞাতা, বিষয়ী। তিনি কখনও জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় হতে পারেন না। বস্তুত যা কিছু আছে, সব ব্রহ্ম। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর পার্থক্য অথবা বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, অ আমাদের কল্পনা।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥৪

অন্বয়: অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো [অন্যৎ এব, তৎ বিদিতাৎ অথো] (সব পরিচিত অথবা জানা জিনিস থেকে আলাদা); অবিদিতাদধি [অবিদিতাৎ অধি] ([এমনকি) অজানা বস্তুসমূহেরও অতীত); ইতি শুশ্রুম (এই আমরা শুনেছি); পূর্বেষাম্ (প্রাচীন আচার্যদের কাছ থেকে); যে (যাঁরা); নঃ (আমাদের কাছে); তৎ (সেই [ব্রহ্ম]); ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করেছিলেন)।

সরলার্থ: সব পরিচিত ও জ্ঞাত বস্তু থেকে 'তৎ' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম স্বতন্ত্র; ব্রহ্ম অজ্ঞাত বস্তু থেকেও স্বতন্ত্র। প্রাচীন (আচার্য) যাঁরা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা—আমরা তাঁদের কাছ থেকে একথা শুনেছি।

ব্যাখ্যা: এ জগতে এমন কিছু বস্তু আছে যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু জানি, আবার এমন সব বস্তুও আছে যাদের সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের কোন তুলনা হয় না। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত দুই শ্রেণীর বস্তুরই উর্ধ্বে তিনি।

ব্রহ্মজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, নিজের স্বরূপকে জানা। অনেক বই পড়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় না; এ অঙ্ক শেখা নয় যে, শিক্ষক বুঝিয়ে দিলেন আর ছাত্র অমনি বুঝে গেল। ব্রহ্মজ্ঞান এমনই জ্ঞান যা পরম্পরাগতভাবে গুরু থেকে শিষ্যে আসে। বলা হয়, এ যেন একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বালানো। এই জ্ঞান সাধকের অন্তরে হঠাৎই একদিন দপ করে জ্বলে ওঠে। কেমন করে যে এটা সম্ভব হয় তা বুঝিয়ে বলা যায় না। এই জ্ঞান তাই অনির্বচনীয়। আপনি হয়তো খুবই বুদ্ধিমান, অগাধ পাণ্ডিত্য আপনার। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে আপনি ব্রহ্মকে বুঝে ফেলবেন তা নয়। তাই উপনিষদ বলছেন, আগে নিজেকে তৈরী করো। জমি তৈরী হলে যথাসময়ে গুরু তোমাকে এই জ্ঞান দেবেন। তিনিই তোমাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় বলে দেবেন। এসব সত্ত্বেও এই উপনিষদ বলছেন যে, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। তাঁকে আমরা জানতে পারি না, কারণ তিনিই আমাদের আত্মা। প্রথমে জমি তৈরী করে ঐ জ্ঞান ধারণের উপযুক্ত হতে হবে। তারপর হঠাৎ একদিন ঐ জ্ঞান আপনিই এসে উপস্থিত হবে এবং তখন তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।

যদ্‌বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৫

অন্বয়: যৎ (যিনি); বাচা (বাক্যের দ্বারা); অনভ্যুদিতম্ (অপ্রকাশিত); যেন (যাঁর দ্বারা); বাক্ (বাক্য); অভ্যুদ্যতে (স্ফূর্ত হয়, প্রকাশের মাধ্যম হয়); তৎ এব ব্রহ্ম (তিনিই নিশ্চিত ব্রহ্ম); ত্বং বিদ্ধি (তুমি জানো); ন ইদম্ (এঁকে নয়); যৎ ইদম্ উপাসতে (যাঁকে লোক পূজা করে)।
সরলার্থ: একমাত্র তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জেনো যাঁকে বাক্য দিয়ে বর্ণনা করা যায় না, বরং যাঁর দ্বারা বাক্যই ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্বজনপূজ্য জগৎ থেকে এই ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।
ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম বা আত্মাকে কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কেন যায় না? কারণ আত্মাই বাক্যকে প্রকাশ করে। আত্মা না থাকলে বাক্যের অস্তিত্বই অসম্ভব। তাই কেন উপনিষদের শুরু হয়েছে এই প্রশ্নটি দিয়ে—'এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দৃশ্যমান জগতের পেছনে কে আছেন?' এই বাহ্যজগৎ আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপেও আমরা চমৎকৃত। তাই আমরা প্রশ্ন করি—'এসবের নেপথ্যে কে বা কোন্ শক্তি কাজ করছে?' বিজ্ঞানীরা কখনও কখনও বলেন, যদি স্রষ্টা বলে কেউ একজন থাকেন তবে তিনি অবশ্যই একজন মস্ত গণিতজ্ঞ, কারণ জগতের সমস্ত কিছুই অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, অঙ্কের মতো নিখুঁত। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন, জগৎ-স্রষ্টা একজন অসাধারণ এঞ্জিনীয়ার। বাস্তবিক

এই জগতের সবকিছুই এমন নিখুঁত ছন্দে চলছে যে সময়ে সময়ে আমরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কার জন্যে এটা সম্ভব হচ্ছে? তার উত্তর এই—ব্রহ্মের জন্যেই এইসব সম্ভব হচ্ছে। এই উপনিষদ সেই ব্রহ্মকে জানার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে বলছেন।

এই দৃশ্যমান স্থূলজগৎ আমাদের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে মনে হয়। তাই আমরা জাগতিক ভোগসুখের পেছনে মোহগ্রস্তের মতো ছুটে চলি। জগতে যত ভোগের বস্তু, বস্তুত আমরা যেন তারই পুজো করি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই জগৎ অসার, অনিত্য; এর কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। পার্থিব বস্তুর পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা অনিত্য বস্তুর পেছনে ছুটে বেড়াই। আর তার জন্যই আমাদের যত কষ্ট, যত জ্বালা-যন্ত্রণা। এই দৃশ্যমান জগতের নেপথ্যে রয়েছেন সেই পরম সত্য, ব্রহ্ম, যাঁর সঙ্গে আমরা অভিন্ন। অজ্ঞানতার মোহজাল ছিঁড়ে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, এবং ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৬

অন্বয়: যৎ (যাঁকে [অর্থাৎ ব্রহ্মকে]); মনসা (মনের দ্বারা); ন মনুতে (বোঝা যায় না); যেন (যাঁর দ্বারা); আহুঃ (তাঁরা [অর্থাৎ ঋষিরা] বলেন); মনঃ (মন); মতম্ ([অনুপ্রাণিত হয়, কাজ করে] মন হিসাবে)।

সরলার্থ: একমাত্র তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জেনো, মন যাঁকে বুঝতে পারে না কিন্তু ঋষিদের মতে যিনি মনকে কর্মক্ষম করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্বজনপূজ্য জগৎ থেকে এই ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।

ব্যাখ্যা: নিজেদের মনকে আমরা কতই না শক্তিমান মনে করি। কিন্তু এই মনের ক্ষমতাও সীমিত, কারণ এই মন দিয়ে আমরা ব্রহ্মের ধারণা করতে পারি না। কেন? কারণ ব্রহ্ম আছেন বলেই মন কাজ করে। ব্রহ্ম ছাড়া মন শক্তিহীন। তাই যে ব্রহ্ম আমাদের আত্মার সঙ্গে অভিন্ন তাঁকে উপলব্ধি করাই আমাদের ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত। সবকিছু ত্যাগ করে আমাদের মন ব্রহ্মে নিবিষ্ট হোক।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিমুপাসতে॥৭

অন্বয়: যৎ (যাঁকে [অর্থাৎ ব্রহ্ম]); চক্ষুষা (চোখ দিয়ে); ন পশ্যতি (দেখা যায় না); যেন (যাঁর সাহায্যে); চক্ষুংষি (চোখদুটি); পশ্যতি (দেখে)।

সরলার্থ: তিনিই ব্রহ্ম যাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু যাঁর শক্তিতে চোখ দেখতে পায়। এই ব্রহ্ম কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সকলের উপাস্য জগৎ থেকে স্বতন্ত্র।
ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার চোখ, কান এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও অক্ষত থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি আর কাজ করতে পারে না। তার চোখ আর দেখে না, কান আর শোনে না। কেন? কারণ ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব কোন শক্তি নেই। কাজ করার জন্য তাদের শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তিটি কি? সেটি সকল শক্তির উৎস। সেই শক্তিকেই ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়েছে।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৮

অন্বয়: যৎ (যাঁকে [অর্থাৎ ব্রহ্মকে]); শ্রোত্রেণ (কান দিয়ে); ন শৃণোতি (শোনা যায় না); যেন (যাঁর সাহায্যে); ইদং শ্রোত্রম্ (এই শ্রবণেন্দ্রিয়); শ্রুতম্ (শুনতে পায়, কাজ করে)।
সরলার্থ: একমাত্র তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জেনো যাঁকে কান দিয়ে শোনা যায় না, কিন্তু যাঁর শক্তিতে কান শুনতে পায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্বজনপূজ্য জগৎ থেকে এই ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।
ব্যাখ্যা: অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতো ব্রহ্ম কানেরও গোচর নন, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। বরং ব্রহ্মের শক্তিতেই কান শুনতে পায়। এই জগৎকে সত্য ভেবে মানুষ তার পেছনে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু এর মতো ভুল আর নেই। কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং ব্রহ্মের জন্যেই এই জগৎ সত্য বলে মনে হয়। ব্রহ্মই নামরূপাত্মক এই জগতের অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম যেন একটা পর্দা, যার ওপর চলচ্চিত্রের নানান ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৯

অন্বয়: যৎ (যাঁকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে); প্রাণেন (শ্বাসের দ্বারা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে); ন প্রাণিতি (কেউ আঘ্রাণ করতে পারে না); যেন (যাঁর দ্বারা); প্রাণঃ (শ্বাসবায়ু, ঘ্রাণেন্দ্রিয়); প্রণীয়তে (শ্বাস নেয়, আঘ্রাণ করে [অর্থাৎ কাজ করে])।
সরলার্থ: একমাত্র তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জেনো যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর নন, অথচ যাঁর শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণ নেয়, কাজ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্বজনপূজ্য জগৎ থেকে এই ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।

ব্যাখ্যা: যে শ্লোকগুলি এতক্ষণ পড়া হল তার মর্মার্থ এই যে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু নন। ব্রহ্মের সাহায্য ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজের নিজের কাজ করতে পারে না। ব্রহ্মই সব শক্তির উৎস। ব্রহ্মই পরম সত্তা বা তত্ত্ব যাঁর উপর সবকিছু অধ্যস্ত, অর্থাৎ নির্ভরশীল। এখন আমাদের এটাই অনুভব করতে হবে যে, এই ব্রহ্মই আমাদের সকলের আত্মা।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই স্থূলজগৎ নিয়ে আমরা এমনই মত্ত যে, এটা যে সত্য নয় একথা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। জগৎ সত্য নয়, একথার অর্থ হল এই যে, জগৎ পরিবর্তনশীল। বেদান্তমতে, যা কিছু পরিবর্তনশীল তা-ই মিথ্যা, অর্থাৎ 'অনিত্য'। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বা 'নিত্য' কারণ ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। এই জগৎ যে সত্য বলে মনে হয় তার একমাত্র কারণ এই জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত। ব্রহ্মকে বাদ দিলে এই জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

কেন উপনিষদের প্রথম খণ্ড এইখানে সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

যেভাবে জগতের আর পাঁচটা বস্তুকে জানা যায়, ব্রহ্মকে সেইভাবে জানা যায় না। এর কারণ ব্রহ্ম কোন জ্ঞেয় বস্তু নন। সাধারণভাবে কোন বস্তুকে জানতে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন : 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ যে বস্তুটিকে জানতে চাই; 'জ্ঞাতা' অর্থাৎ যিনি জানবেন এবং 'জ্ঞান' অর্থাৎ যা জানা হল। কিন্তু যেহেতু তিনটি নিয়েই ব্রহ্ম, সেইহেতু ব্রহ্মকে জানার প্রশ্নই ওঠে না। আগুন অন্য বস্তুকে পোড়াতে পারে, কিন্তু নিজেকে কি পোড়াতে পারে? ব্রহ্মও ঐরকম।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥১

অন্বয়: যদি (যদি); মন্যসে (তুমি মনে করো); সুবেদেতি [সুবেদ ইতি] (আমি ভালভাবে জানি [অর্থাৎ, আমি ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে জানি]); দভ্রম্ (অল্প [পাঠান্তরে 'দহরম্'। 'দভ্রম্' ও 'দহরম্'-এর একই অর্থ]); এব অপি নূনম্ (নিশ্চিতভাবে); ত্বং বেত্থ (তুমি জানো); ব্রহ্মণঃ রূপম্ (ব্রহ্মের স্বরূপ); যদস্য [যৎ অস্য] (ব্রহ্মের); ত্বং (তুমি [জানো]); যদস্য [যৎ অস্য] (ব্রহ্মের); দেবেষু (দেবতাদের মধ্যে বর্তমান); অথ নু (অতএব); তে (তোমার কাছে); মীমাংস্যম্ এব (গভীরভাবে বিচার্য); মন্যে (আমার মনে হয় [অর্থাৎ শিষ্য মনে করেন]); বিদিতম্ (এঁকে [ব্রহ্মকে] জেনেছি)।

সরলার্থ: যদি কেউ মনে করেন যে, আমি ব্রহ্মকে ভালমতো জেনে ফেলেছি, তবে একথা নিশ্চিত যে, তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। তিনি জীবাত্মা, দেবতাদের ও দৃশ্যমান জগতে ব্রহ্মের প্রকাশকেই কেবল জেনেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। (শিষ্য): আমার মনে হয়, আমি (ব্রহ্মকে) জানি।

ব্যাখ্যা: আচার্য শিষ্যকে এক সম্ভাব্য ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। নিজের মধ্যে (জীবাত্মায়), দেবতাদের ও দৃশ্য জগতের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখে শিষ্য হয়তো মনে করতে পারেন যে, ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা আছে। কিন্তু নিজের মধ্যে ও অন্যত্র

যা প্রকাশিত, ব্রহ্ম তার চেয়েও অনেক অনেক বড়। সব বস্তুর সারাৎসার, সকলের অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম। তাই তাঁকে বোঝার সব চেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। শিষ্যের প্রতি আচার্যের এই সাবধান-বাণীর প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ শিষ্য মনে করতে পারেন—ব্রহ্মকে আর পাঁচটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাধাবণ জিনিসের মতো দেখা যায়, ছোঁয়া যায়। এইজন্যেই গুরু শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্পর্কে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শিষ্য বলছেন যে, তিনি জানেন। শুধু 'জানি' বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে, নিজেকে পরীক্ষা করে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন স্বরূপত তিনি ব্রহ্মই। শিষ্যের এই গভীর আত্মপ্রত্যয় বলে দিচ্ছে তিনি ব্রহ্মকে জানেন। উপলব্ধিজাত এই প্রত্যয় এতই জোরালো যে কোন তর্কবিতর্ক শিষ্যকে টলাতে পারবে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেব নো ন বেদেতি বেদ চ॥২

অন্বয়: নাহং মন্যে (আমি মনে করি না); সুবেদেতি [সুবেদ ইতি] (আমি সম্যক্ রূপে একে জানি); নো ন বেদেতি [বেদ ইতি] (এও নয় যে আমি জানি না); বেদ চ (এবং আমি জানি); নঃ (আমাদের মধ্যে [শিষ্যদের মধ্যে]); যঃ (যে কেউ); তৎ (সেই উক্তি [অর্থাৎ সেই উক্তির অর্থ]); নো ন বেদেতি [বেদ ইতি] বেদ চ (জানি না তাও নয়, জানি তাও বলতে পারি না); বেদ (তিনি জানেন); তদ্ (সেই [অর্থাৎ ব্রহ্মকে]); বেদ (জানেন)।

সরলার্থ: (ব্রহ্মকে) সম্যক্ জেনেছি এমন কথা আমি মনে করি না। জানি না তাও নয়, আবার জানি—তাও বলতে পারি না। শিষ্যদের মধ্যে উপরি-উক্ত বাক্যের অর্থ যিনি জানেন, তিনিই (ব্রহ্মকে) সঠিক জানেন।

ব্যাখ্যা: 'নো ন বেদ ইতি, বেদ চ'—এই বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদি কেউ একথা বলেন, তবে বুঝতে হবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। আমরা দেখেছি এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ হল, 'এমন নয় যে আমি ব্রহ্মকে জানি না, আবার জানি এ কথাও বলতে পারি না'। এখন প্রশ্ন হল, যদি তিনি সত্যই ব্রহ্মকে জেনে থাকেন, তবে একথা কেন বলছেন, 'আমি ব্রহ্মকে জানি, এ কথাও বলতে পারি না'? আসলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝাতে চাইছেন যে, ব্রহ্ম বই বা আসবাবপত্রের মতো কোন জ্ঞেয় বস্তু নন। স্থূল কোন বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায়, কিন্তু ব্রহ্মকে ঠিক সেইভাবে জানা যায় না, কারণ ব্রহ্মই মানুষের অন্তরাত্মা, অন্তরতম সত্তা। ব্রহ্মকে জানার অর্থ হল, ব্রহ্মই যে আমাদের আত্মা সেটি জানা। যখন

কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, 'নো ন বেদ ইতি, বেদ চ' তখন বুঝতে হবে—তিনি জানেন যে তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥৩

অন্বয়: যস্য অমতম্ (যিনি বলেন যে তিনি জানেন না); তস্য মতম্ (তিনিই জানেন); যস্য মতম্ (যিনি বলেন তিনি জানেন); সঃ ন বেদ (তিনি জানেন না); অবিজ্ঞাতম্ (অজ্ঞাত); বিজানতাম্ (তাঁদের কাছে যাঁরা বলেন তাঁরা জানেন); বিজ্ঞাতম্ (জ্ঞাত); অবিজানতাম্ (তাঁদের কাছে যাঁরা বলেন তাঁরা জানেন না)।

সরলার্থ: যিনি বলেন যে, তিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন; যিনি বলেন যে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। যাঁরা বলেন যে, তাঁরা জানেন না, এ তত্ত্ব তাঁদেরই জানা; যাঁরা বলেন যে, তাঁরা জানেন, এ তত্ত্ব তাঁদের অজানা।

ব্যাখ্যা: যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না, তখন বুঝতে হবে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, অর্থাৎ তিনি জানেন যে, ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। উভয় ক্ষেত্রেই 'জানা', এই ক্রিয়াপদটির সাহায্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। যখন অজ্ঞ কেউ বলেন, 'আমি জানি' তখন তিনি শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতাকেই বোঝান। যাকে তিনি ব্রহ্ম বলে মনে করছেন, আসলে তা ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। কিন্তু যখন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না, তখন সে কথার অর্থ হল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হিসাবে তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। তিনি জানেন যে, ব্রহ্মকে এভাবে জানা যায় না; কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই তাঁকে জানা যায়। তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায় তিনি যথার্থই ব্রহ্মকে জেনেছেন।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥৪

অন্বয়: প্রতিবোধ-বিদিতম্ (ব্যক্তিচেতনার সর্বস্তরে জ্ঞাত); [প্রতিবোধ (প্রতিটি চেতনা, প্রতিটি মানসিক অভিজ্ঞতা)]; মতম্ ([সম্যক্ রূপে] জ্ঞাত); হি (কেননা); বিন্দতে (লাভ করেন); অমৃতত্বম্ (অমরত্ব, যা জন্মমৃত্যুর অতীত); আত্মনা (আত্মার সাহায্যে [অর্থাৎ

আত্মজ্ঞানের দ্বারা]); বিন্দতে (লাভ করেন); বীর্যম্ (শক্তি); বিদ্যয়া (জ্ঞানের দ্বারা [অর্থাৎ, আত্মজ্ঞানের দ্বারা, স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা]); বিন্দতে (লাভ করেন); অমৃতম্ (অমরত্ব)।

সরলার্থ: যখন কেউ ব্রহ্মকে চেতনার সর্বস্তরে, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করেন তখন তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন এবং জন্মমৃত্যুর পারে চলে যান। আত্মজ্ঞানের দ্বারা মানুষ শক্তি অর্জন করে; প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে মানুষ অমর হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: মণিমালার প্রতিটি রত্ন যেমন একই সুতোয় গাঁথা, ঠিক তেমনি চৈতন্য (বুদ্ধি) রূপে ব্রহ্মও আমাদের সকল মানসিক অভিজ্ঞতার সর্বস্তরে বিরাজ করছেন। যেমন ধরা যাক, ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের ভিতরে হয়তো অনেক জিনিসপত্র আছে। কিন্তু সবকিছুই ঐ এক প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত। ঠিক তেমনি মন, তা সে যে কাজই করুক না কেন, সর্বসময় ব্রহ্ম বা চৈতন্যের আলোয় আলোকিত। ব্রহ্ম না থাকলে আমরা কোনকিছুই অনুভব করতে পারতাম না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন; সর্বদাই এক এবং অপরিবর্তনীয়। আমাদের সব মানসিক অভিজ্ঞতার নেপথ্যে তিনি আছেন, অথচ তিনি নির্লিপ্ত—আমাদের কোন অভিজ্ঞতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যখন আমরা এই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করি, তখন আমরা অমর হয়ে যাই।

ভাবটা হচ্ছে, আমাদের অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আত্মা অপরিবর্তনীয়। সিনেমার পর্দার উপমাটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। পর্দাটি সব অবস্থায় স্থির, অপরিবর্তিত। তার ওপর প্রতি মুহূর্তে কত রকমের ছবি ফেলা হচ্ছে, কিন্তু পর্দা পর্দাই আছে, তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। ঠিক তেমনিভাবে পরমাত্মা আমাদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘূর্ণায়মান স্রোতের পিছনে নির্লিপ্ত দ্রষ্টা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর কোন বিকার নেই। তিনি অপরিবর্তনীয়, সবকিছুর সাক্ষী-মাত্র।

এই উপনিষদ আরও বলছেন, যখন কেউ তার প্রকৃত স্বরূপ, তার আত্মাকে জানে, তখন সে 'বীর্য' তথা শক্তির অধিকারী হয়। সাধারণত আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার দাস। ভাল অভিজ্ঞতা হলে আমরা সুখী, আর মন্দ অভিজ্ঞতা হলে দুঃখী—এই আমাদের অবস্থা। এরকম হওয়ার কারণ ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা নিজেদের একাত্মতা অনুভব করি। কিন্তু বস্তুত এই জাতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের স্বরূপের কোন সম্পর্কই নেই; স্বরূপত আমরা যা তাই আছি। যখন আমরা এই সত্য জানতে পারি, যখন আমাদের স্বরূপ-জ্ঞান হয় তখন আমরা ঠিক ঠিক শক্তিমান হয়ে উঠি। যখন আমরা উপলব্ধি করি ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরমাত্মার কোন সম্পর্কই নেই, আমরা সাক্ষী-মাত্র, চারপাশের ঘটনাবলী দেখে যাচ্ছি—তখনই আমরা নিজেদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে সচেতন

হয়ে উঠি। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক এবং অভিন্ন, এটি জানার নামই আত্মজ্ঞান। পরমাত্মার জন্ম নেই এবং সেই কারণে তাঁর মৃত্যুও নেই। তিনি অমর। তাই যখন আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করি, তখন আমরাও অমর হয়ে যাই (অমৃতম্)।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥৫

অন্বয়: ইহ (এখানে [অর্থাৎ এই জীবনে]); চেৎ (যদি); অবেদীৎ (কেউ জানেন [অর্থাৎ আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানেন]); অথ (তাহলে); সত্যম্ (সত্য, পরম সত্য); ন চেৎ ইহ অবেদীৎ (যদি কেউ এই পরম সত্য না জানেন); অস্তি (বর্তমান, আছে); মহতী বিনষ্টিঃ (অশেষ যন্ত্রণা); ভূতেষু ভূতেষু (সর্ববস্তুতে এবং সর্বজীবে [অর্থাৎ সর্বত্র]); বিচিত্য (জেনে [ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন জেনে]); ধীরাঃ (জ্ঞানীরা, বিচারশীল ব্যক্তিরা); প্রেত্য (প্রত্যাহার করে, ত্যাগ করে); অস্মাৎ লোকাৎ (এই জগৎ থেকে); অমৃতাঃ ভবন্তি (অমর হন)।

সরলার্থ: কেউ যদি এ জীবনেই আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানতে পারেন, তবে তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হন। এই জ্ঞান ছাড়া অশেষ দুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, যিনি এই সত্য জানেন যে, ব্রহ্ম সকল বস্তু ও সকল জীবের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন, তিনি নিজেকে এই জগৎ থেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং মুক্ত হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: এখানে সার কথাটা হল—এই জীবনেই আত্মজ্ঞান সম্ভব, কিন্তু একমাত্র মনুষ্য শরীরেই তা সম্ভব। কারণ মানুষ চিন্তা করতে পারে, বিচার করতে পারে, জীবনের একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে নিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। পশুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। কাজেই মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যদি আমরা আত্মজ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা না করি, তবে তার মতো ক্ষতি আর হয় না। এই উপনিষদ তাই সাবধান করে দিয়ে বলছেন, আত্মজ্ঞান লাভের উদ্যোগ না করলে আমাদের অশেষ দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হবে। কখনও ভাল, কখনও মন্দ অবস্থার শিকার হয়ে জন্মমৃত্যুর আবর্তে বারবার ঘুরপাক খেতে হবে।

মজার কথা হল আমরা অমর হয়েই আছি। এই নয় যে, আমাদের অমর হতে হবে, বা একটা উচ্চতর অবস্থায় আমরা উঠছি। না, তা নয়। আমরা প্রথম থেকেই ব্রহ্ম, তাই আমাদের মৃত্যু নেই। আমরা অমর। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এ সত্য আমরা জানি

না। একটা অবগুণ্ঠন আমাদের স্বরূপ বা প্রকৃত পরিচয়টি ঢেকে রেখেছে। আমাদের কাজ হল এই আবরণটিকে সরানো।

যিনি জ্ঞানী, তিনি 'ভূতেষু ভূতেষু' অর্থাৎ, পুরুষ, স্ত্রী, জীবজন্তু, এককথায় সর্বভূতে নিজের আত্মাকে দেখেন। যখন কেউ নিজের মধ্যে সবাইকে ও সবকিছুকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেন (অর্থাৎ, এক সত্তা বা একত্ব অনুভব করেন), তখন তিনি সকলকে না ভালবেসে পারেন না। তখন কেউই তাঁর পর নন। শোনা যায় বিখ্যাত বেদান্তবাদী রামতীর্থ কোন বক্তৃতা দিতে গেলে শ্রোতাদের এই বলে সম্বোধন করতেন—'আমি, যে আমি সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়া সকলের মধ্যে বিরাজমান'। ভাবটা হল এই যে, আমার আত্মাই সকলের আত্মা যিনি সর্বত্র বিরাজ করছেন। যিনি বলছেন আর যাঁরা শুনছেন, সবাই সেই এক এবং অভিন্ন আত্মা। যেন আত্মায় আত্মায় কথা হচ্ছে। তফাৎ শুধু নাম আর রূপের। অস্তিত্বের এই একত্ব, এই ঐক্যই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা সকলে এক। পার্থক্য কেবলমাত্র প্রকাশের তারতম্যে।

কেন উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড এইখানে সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

আমরা যাতে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কিছুটা বুঝতে পারি সেইজন্য উপনিষদ এখানে একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন। আমরা শক্তির প্রকাশ দেখি, কিন্তু এই শক্তির উৎস কি? ব্রহ্ম। জগতে যতকিছু শক্তি আছে ব্রহ্মই সেই সবের উৎস। আলোচ্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বটিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

একবার দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হন এবং নিজেদের শক্তিতেই এই বিজয় সম্ভব হয়েছে মনে করে খুব গর্ববোধ করতে থাকেন। বস্তুত ব্রহ্মের জন্যই এই জয় সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দেবতারা সেকথা জানতেন না। ব্রহ্ম তাই দেবতাদের দর্প চূর্ণ করতে চাইলেন।

বিজয়োল্লাসে মত্ত দেবতারা যখন পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন ঠিক তখনই তাঁদের সামনে এক অদ্ভুত মূর্তির আবির্ভাব। তিনি যে কে তা দেবতারা বুঝতে পারলেন না। তাই প্রথমে তাঁরা অগ্নিকে ঐ মূর্তির কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় জেনে আসতে বললেন। অগ্নি তো গেলেন। কিন্তু মূর্তির কাছাকাছি আসতেই তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' অগ্নি বললেন, 'আমি অগ্নি।' মূর্তিটি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি করতে পারেন?' অগ্নি বললেন, 'আমি সবকিছু পুড়িয়ে ফেলতে পারি।' অগ্নির এই কথা শোনামাত্র সেই মূর্তি একটি তৃণখণ্ড অগ্নির সামনে রেখে বললেন, 'এটিকে পোড়ান দেখি।' অগ্নি বারবার চেষ্টা করেও সেটিকে পোড়াতে পারলেন না। লজ্জিত হয়ে দেবতাদের কাছে ফিরে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমি ওঁর পরিচয় জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না।

এরপর দেবতারা পবনদেব অর্থাৎ বায়ুকে পাঠালেন। তিনি কাছে যেতেই মূর্তিটি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' বায়ু উত্তর দিলেন, 'আমি বায়ু।' মূর্তিটি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি করতে পারেন?' বায়ু বললেন, 'আমি সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারি।' মূর্তিটি তখন সেই একই তৃণখণ্ড বায়ুর সামনে রেখে বললেন, 'বেশ তো, এই তৃণখণ্ডটিকে উড়িয়ে দিন দেখি।' বারবার চেষ্টা করেও বায়ু তৃণখণ্ডটিকে একচুল নড়াতে পারলেন না। তখন লজ্জিত হয়ে বায়ুও ফিরে গেলেন। অবশেষে মূর্তিটির পরিচয় জানতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। কিন্তু তিনি মূর্তিটির কাছে পৌঁছবার আগেই সেই মূর্তি অদৃশ্য হলেন এবং তাঁর জায়গায় আবির্ভূতা হলেন পরমা সুন্দরী, সালঙ্কারা এক দেবী। তিনি উমা হৈমবতী।

ইন্দ্র তাঁকে অদ্ভুত মূর্তিটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় উমা জানালেন, উনি ব্রহ্ম। উমা আরও বললেন, ব্রহ্মের জন্যই দেবতারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, দেবতাদের নিজেদের কোন শক্তি নেই, ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। দেবদেবী এবং যেখানে যত কিছু শক্তি আছে সকলের একটাই উৎস। তিনি ব্রহ্ম।'

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ
ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং
মহিমেতি॥১

অন্বয়: ব্রহ্ম হ (প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, একমাত্র); দেবেভ্যঃ (দেবতাদের পক্ষে); বিজিগ্যে (জয়লাভ করেছিলেন); তস্য হ (সেটা নিশ্চিতভাবে তাঁরই [অর্থাৎ সে জয় অবশ্যই ছিল তাঁর]); ব্রহ্মণঃ বিজয়ে (ব্রহ্মের বিজয়ে); দেবাঃ অমহীয়ন্ত (দেবতারা গর্ব বোধ করেছিলেন); তে ঐক্ষন্ত (তাঁরা ভেবেছিলেন); অস্মাকম্ এব (বস্তুত আমাদেরই); অয়ং বিজয়ঃ (এই জয়); অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা ইতি (এই কৃতিত্ব কেবল আমাদেরই)।
সরলার্থ: দেবতাদের পক্ষে স্বয়ং ব্রহ্মই এই যুদ্ধ জয় করেছিলেন। এই জয় ব্রহ্মেরই, কিন্তু এই জয় নিজেদের মনে করে দেবতারা অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভাবলেন, 'এ জয় আমাদেরই—এর সব কৃতিত্ব আমাদের প্রাপ্য।'
ব্যাখ্যা: ব্রহ্মের কাছ থেকে পাওয়া শক্তিতেই দেবতারা যুদ্ধে জয়ী হন; কিন্তু তাঁরা মনে করেছিলেন যে, নিজেদের শক্তিতেই তাঁরা যুদ্ধে জিতেছেন। তাই এই জয় তাঁদের অহঙ্কারী করেছিল, এবং তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁদেরই।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥২

অন্বয়: তদ্ধৈষাম্ [তৎ হ এষাম্] (তিনি অবশ্যই এই সব [অর্থাৎ দেবতাদের মিথ্যা দর্প]); বিজজ্ঞৌ (জানতে পেরেছিলেন); তেভ্যো হ (শুধু তাঁদের জন্যই); প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূত হয়েছিলেন); তৎ (তাঁকে [অর্থাৎ তাঁকে দেখে]); কিম্ (কি); ইদং যক্ষম্ (এই দিব্যমূর্তি), ইতি ন ব্যজানত (তা [তাঁরা] বুঝতে পারলেন না)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম অবশ্যই দেবতাদের মিথ্যা অভিমানের কথা জেনে তাঁদেরই কল্যাণার্থে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই দিব্যমূর্তিকে দেবতারা চিনতে পারলেন না।

ব্যাখ্যা: চরম জ্ঞানলাভের পথে অহঙ্কার যে কত বড় বাধা এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সে কথাই বোঝানো হয়েছে। দেবতারাও অহঙ্কার মুক্ত নন। আর এই কারণেই অজ্ঞান জীবের মতো তাঁদের মধ্যেও নানান ত্রুটিবিচ্যুতি, নানান অসম্পূর্ণতা থাকে। পূর্বজন্মের শুভকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাঁরা কিছুকালের জন্য দেবতার পদ লাভ করেছেন। কিন্তু শুভকর্মের ফলভোগ শেষ হলেই তাঁরা তাঁদের পদ থেকে সরে যাবেন। দেবতা হিসেবে তাঁদের কিছু বিশেষ গুণ এবং ক্ষমতা থাকে বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তাঁরা সাধারণ আর পাঁচজন মর্ত জীবেরই মতো। ব্রহ্মোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ প্রাণীর মতো তাঁরাও বদ্ধ।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি॥৩

অন্বয়: তে অগ্নিম্ অব্রুবন্ (তাঁরা অগ্নিকে বললেন); জাতবেদ (হে জাতবেদ [অর্থাৎ যিনি সব সৃষ্ট পদার্থকে জানেন। এটা অগ্নির আর এক নাম]); এতৎ বিজানীহি (এটা জেনে আসুন); কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই দিব্যমূর্তি কে); তথা ইতি (তাই হবে)।

সরলার্থ: তাঁরা অগ্নিকে বললেন, 'হে সর্বজ্ঞ জাতবেদ, এই দিব্য সত্তার পরিচয় জেনে আসুন।' (উত্তরে অগ্নি বললেন :) 'তাই হবে।'

ব্যাখ্যা: সামনে অদ্ভুত মূর্তিটিকে দেখে দেবতারা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি যে স্বয়ং ব্রহ্ম দেবতারা সে কথা বুঝতে পারলেন না। ব্রহ্ম স্বরূপত নিরাকার, তাঁর কোন রূপ নেই। কিন্তু গল্পের খাতিরে এখানে ব্রহ্মের একটা রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি অগ্নির্বা
অহমস্মীত্যব্রীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি॥৪

অন্বয়: তৎ (তাঁর কাছে [অর্থাৎ দিব্যমূর্তির কাছে]); অভ্যদ্রবৎ (গেলেন [অর্থাৎ অগ্নি গেলেন]); তম্ অভ্যবদৎ (তাঁকে বললেন [অর্থাৎ সেই দিব্যমূর্তি অগ্নিকে বললেন]); কঃ অসি ইতি (আপনি কে); অব্রবীৎ অগ্নিঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি ([অগ্নি] বললেন, আমিই অগ্নি); জাতবেদাঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি (আমিই জাতবেদ [সর্বজীবের জ্ঞাতা])।

সরলার্থ: অগ্নি দিব্যমূর্তির কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' উত্তরে অগ্নি বললেন, 'আমি অগ্নি, আমি সামান্য নই। আমিই জাতবেদ (অর্থাৎ, সব প্রাণীকেই আমি জানি)।'
ব্যাখ্যা: অগ্নির কথার ভঙ্গিতে অহঙ্কারের ছাপ স্পষ্ট।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি অপীদং
সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥৫

অন্বয়: তস্মিন্ (তাতে [অর্থাৎ যেহেতু আপনি এত অসাধারণ]); ত্বয়ি (আপনার ভিতর); কিং বীর্যম্ ইতি (কি ধরনের শক্তি); ইদং সর্বম্ অপি দহেয়ম্ (আমি এই সমস্তই পুড়িয়ে ফেলতে পারি); পৃথিব্যাম্ ইদং যৎ ইতি (এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে)।
সরলার্থ: দিব্যসত্তা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো দেখছি অসাধারণ। কিন্তু আপনার মধ্যে কোন্ বিশেষ শক্তি আছে?' (অগ্নি বললেন :) 'এই পৃথিবীর সবকিছু আমি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি।'
ব্যাখ্যা: ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে অগ্নি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর শক্তি ব্রহ্মের কাছ থেকেই পাওয়া।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি; তদুপপ্রেয়ায়
সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্, স তত এব
নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥৬

অন্বয়: তস্মৈ (তাঁর সামনে); তৃণং নিদধৌ (একটি তৃণ রাখলেন); এতৎ দহ ইতি (এটিকে পোড়ান); তৎ উপপ্রেয়ায় (তার দিকে ধেয়ে গেলেন); সর্বজবেন (দ্রুত বেগে [অর্থাৎ, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে]); তৎ ন শশাক দগ্ধুম্ (সেটিকে পোড়াতে পারলেন না); সঃ ততঃ এব নিববৃতে (তাঁর কাছ থেকে [অর্থাৎ, দিব্যমূর্তির কাছ থেকে] তিনি [অগ্নি] ফিরে এলেন); ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুম্ (আমি জানতে পারলাম না); যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই দিব্যমূর্তি কে)।
সরলার্থ: (দিব্যমূর্তিটি) অগ্নির সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেন, 'এটিকে পোড়ান তো।' (অগ্নি) সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সেটি পোড়াতে পারলেন না। দিব্যমূর্তির কাছ থেকে ফিরে গিয়ে তিনি (দেবতাদের বললেন: 'ওই দিব্যমূর্তির পরিচয় জানতে আমি ব্যর্থ হয়েছি।'

অথ বায়ুমব্রুবন্বায়বেতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি॥৭

অন্বয়: অথ (তখন); বায়ুম্, অব্রুবন্ ([দেবতারা] বায়ুকে বললেন); বায়ো এতৎ বিজানীহি (হে বায়ু, সঠিক জানুন); এতৎ যক্ষং কিম্ ইতি (এই দিব্যমূর্তি কে); তথা ইতি (তাই হবে)।
সরলার্থ: তখন দেবতারা বায়ুকে বললেন, 'হে বায়ু, এই দিব্যমূর্তির পরিচয় ভালভাবে জেনে আসুন।' (বায়ু বললেন:) 'তাই হবে।'

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎকোঽসীতি বায়ুর্বা
অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥৮

অন্বয়: তৎ অভ্যদ্রবৎ (তাঁর কাছে গেলেন); তম্ অভ্যবদৎ (তাঁকে প্রশ্ন করলেন); কঃ অসি ইতি (আপনি কে); অব্রবীৎ বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি (আমিই বায়ু); মাতরিশ্বা বৈ অহম্ অস্মি ইতি (আমিই সেই মাতরিশ্বা [যিনি আকাশে বিচরণ করেন])।
সরলার্থ: বায়ু সেই দিব্যমূর্তির কাছে গেলে মূর্তি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' বায়ু বললেন, 'আমি বায়ু, আমি সামান্য নই; আমিই মাতরিশ্বা (যিনি শূন্যে বিচরণ করেন)।'

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি অপীদং
সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি॥৯

অন্বয়: তস্মিন্ (তাতে [অর্থাৎ যেহেতু আপনি এত অসাধারণ]); ত্বয়ি (আপনার ভিতর); কিং বীর্যম্ ইতি (কি ধরনের শক্তি); ইদং সর্বম্ অপি আদদীয় (আমি নিতে পারি [অর্থাৎ উড়িয়ে দিতে পারি] সমস্ত কিছু); পৃথিব্যাম্ ইদং যৎ ইতি (এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে)।
সরলার্থ: (দিব্যমূর্তি প্রশ্ন করলেন:) 'আপনি সত্যিই অসামান্য। কিন্তু আপনি কোন্ শক্তির অধিকারী?' বায়ু বললেন, এই বিশ্বে যা কিছু আছে, সব আমি উড়িয়ে দিতে পারি।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি; তদুপপ্রেয়ায়
সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্; স তত এব নিববৃতে
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥১০

অন্বয়: তস্মৈ (তাঁর সামনে); তৃণং নিদধৌ (একটি তৃণ রাখলেন); এতৎ আদৎস্ব ইতি (এটি গ্রহণ করুন [অর্থাৎ উড়িয়ে নিয়ে যান]); তৎ উপপ্রেয়ায় (তার প্রতি ধাবিত হলেন); সর্বজবেন (সবেগে [অর্থাৎ তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে]); তৎ ন শশাক আদাতুম্ (সেটিকে ওড়াতে ব্যর্থ হলেন); সঃ ততঃ এব নিববৃতে (তাঁর কাছ থেকে [অর্থাৎ সেই দিব্যমূর্তির কাছ থেকে] তিনি [অর্থাৎ বায়ু] ফিরে এলেন); ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুম্ (আমি জানতে পারলাম না); যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই দিব্যমূর্তি কে)।
সরলার্থ: (দিব্যমূর্তি) বায়ুর সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেন, 'এটিকে উড়িয়ে নিয়ে যান তো।' (বায়ু) সবেগে ধেয়ে গেলেন এবং তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তবুও তৃণটিকে নড়াতে পারলেন না। তাই ফিরে এসে তিনি (দেবতাদের বললেন :) 'এই দিব্যমূর্তি যে কে তা আমি বুঝতে পারলাম না।'

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্
যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাৎ
তিরোদধে॥১১

অন্বয়: অথ (তখন); ইন্দ্রম্ অব্রুবন্ ([দেবতারা] ইন্দ্রকে বললেন); মঘবন্ এতৎ বিজানীহি (হে মঘবা, সঠিক জেনে আসুন); এতৎ যক্ষং কিম্ ইতি (কে এই দিব্যমূর্তি); তথা ইতি (তাই হবে); তৎ অভ্যদ্রবৎ ([ইন্দ্র তাঁর কাছে গেলেন); তস্মাৎ (তাঁর সামনে থেকে [অর্থাৎ ইন্দ্রর সামনে থেকে]); তিরোদধে ([দিব্যমূর্তি] অদৃশ্য হলেন)।
সরলার্থ: তখন দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, 'হে মঘবা, এই দিব্যমূর্তির সঠিক পরিচয় জেনে আসুন।' (ইন্দ্র বললেন:) 'তাই হবে।' কিন্তু ইন্দ্র কাছে যেতেই সেই দিব্যমূর্তি অদৃশ্য হলেন।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥১২

অন্বয়: সঃ (তিনি); তস্মিন্ এব আকাশে (সেই আকাশে); আজগাম (এলেন, আবির্ভূত হলেন); স্ত্রিয়ং হৈমবতীং বহুশোভমানাম্ উমাম্ (সালঙ্কারা এক নারীমূর্তি, উমা হৈমবতী); তাং হ উবাচ (এবং তাঁকে বললেন); কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি (ঐ দিব্যমূর্তি কে?)।
সরলার্থ: ঐ আকাশে (যেখানে দিব্যমূর্তিকে দেখা গিয়েছিল) সালঙ্কারা এক নারীমূর্তি দেখা গেল। তিনি উমা হৈমবতী। ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই দিব্যমূর্তির স্বরূপ

কি?’

ব্যাখ্যা: পুরাণমতে, উমা হৈমবতী হিমালয়-কন্যা। তিনি আত্মজ্ঞানের মূর্ত প্রতীক।

কেন উপনিষদের তৃতীয় খণ্ড এইখানে সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে
মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥১

অন্বয়: সা ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ ('উনি ব্রহ্ম', তিনি বললেন); ব্রহ্মণঃ বৈ এতৎ বিজয়ে (এই জয় প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই); মহীয়ধ্বম্ ইতি (তোমরা উল্লসিত হচ্ছ); ততঃ হ এব (বস্তুত তা থেকেই [অর্থাৎ উমার কথা থেকেই]); বিদাঞ্চকার ([ইন্দ্র] জানতে পারলেন); ব্রহ্ম ইতি (উনি ব্রহ্ম)।

সরলার্থ: তিনি (উমা হৈমবতী) বললেন, 'উনি ব্রহ্ম। যে বিজয়ের জন্য তোমরা এত উল্লসিত হয়েছিলে, তা আসলে ব্রহ্মের জয়।' তখন ইন্দ্র জানতে পারলেন যে, ওই দিব্যমূর্তি আসলে ব্রহ্ম।

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্—
যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ
প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥২

অন্বয়: যৎ অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ (যেহেতু অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র); তে হি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ [পাঠান্তরে পস্পৃশুঃ] (তাঁর [ব্রহ্মের] ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন); তে হি প্রথমঃ এনৎ ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (তাঁরাই তাঁকে সর্বপ্রথম ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন); তস্মাৎ (সেইজন্য); এতে বৈ দেবাঃ (এই দেবতারা); অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব (অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ)।

সরলার্থ: যেহেতু অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁরাই প্রথম ব্রহ্মকে জেনেছিলেন, সেইজন্য দেবতাদের মধ্যে এই তিন জনের স্থান সর্বোচ্চ।

ব্যাখ্যা: এখানে স্পর্শ বলতে দৈহিক সান্নিধ্য বোঝানো হচ্ছে না, দেবতাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথাই বলা হচ্ছে। ঐসব গুণের জন্যেই অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ব্রহ্মের মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন। বলা হচ্ছে, তাঁরা যেন ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন। ইন্দ্র দেবরাজ। পদমর্যাদা অনুসারে অগ্নি এবং বায়ুর স্থানও উচ্চে। বলা বাহুল্য, আধ্যাত্মিক গুণের

জন্যেই তাঁদের এই পদমর্যাদা। তার ওপর উমা হৈমবতীর কাছ থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হওয়ায় তাঁদের মহিমা আরো বেড়ে গেল। কাজে কাজেই তাঁরা যে দেবতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য বিবেচিত হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স
হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার
ব্রহ্মেতি॥৩

অন্বয়: তস্মাৎ বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ ইব অন্যান্ দেবান্ (সেইজন্যই ইন্দ্র অন্য দেবতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ); সঃ হি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (তিনি ব্রহ্মকে নিকটতম এবং প্রিয়তমরূপে স্পর্শ করেছিলেন); সঃ হি এনৎ প্রথমঃ বিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ইতি (তিনিই অন্য সকলের আগে তাঁকে ব্রহ্ম বলে চিনতে পেরেছিলেন)।

সরলার্থ: যেহেতু ইন্দ্র ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তিনিই প্রথম তাঁর (দিব্যমূর্তির) পরিচয় জেনেছিলেন, সেহেতু দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান সর্বোচ্চ।

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রের কাছেই উমা হৈমবতী দিব্যমূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করেন। যেহেতু ইন্দ্রই প্রথম ব্রহ্মের পরিচয় এবং ব্রহ্মই যে সব শক্তির উৎস একথা জেনেছিলেন, সেহেতু তিনি দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা
ইতীন্ন্যমীমিষদা—ইত্যধিদৈবতম্॥৪

অন্বয়: তস্য এষঃ আদেশঃ (এখানে ব্রহ্ম সম্পর্কে একটি নির্দেশ); যৎ এতৎ বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ (তিনি যেন এক ঝলক বিদ্যুতের মতো); আ (তার মতে); ইৎ (এবং, সদৃশ); ন্যমীমিষৎ (পলকপাত); আ (তার মতে); ইতি অধিদৈবতম্ (দৃশ্যমান জগৎ থেকে এই উপমা দুটি দেওয়া হয়েছে)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম সম্পর্কে এখানে একটা নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। ব্রহ্ম যেন এক ঝলক বিদ্যুতের মতো অথবা পলকপাতের মতো; দৃশ্যমান জগৎ থেকে এই দুটি উপমা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা: বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি হঠাৎ আত্মজ্ঞানের উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানতার সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে ব্রহ্মের চোখের পলকে সৃষ্টি, চোখের পলকেই প্রলয়। এর থেকে ব্রহ্মের

অপরিমেয় শক্তির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই শ্লোকে ব্যবহৃত দুটি উপমাই প্রকৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে।

অথাধ্যাত্মং—যদেতদ্‌গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্নং সঙ্কল্পঃ ॥৫

অন্বয়: অথ (এখন); অধ্যাত্মম্ (যা জীবাত্মার মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত); মনঃ এতৎ যং গচ্ছতি ইব চ (মন যেন তাঁতে [ব্রহ্মে] গমন করে [প্রবেশ করে]); চ অনেন (এবং এর দ্বারা); এতৎ অভীক্ষ্নম্ উপস্মরতি ([সাধক] নিরন্তর তাঁর [ব্রহ্মের] ধ্যান করেন); সঙ্কল্পঃ ([এইভাবেই তাঁর উচিত] মনকে চালনা করা)।

সরলার্থ: এখানে ব্রহ্ম সম্পর্কে যে নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে তা জীবাত্মার মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; মনই যেন ব্রহ্মে পৌঁছায় এবং মন দিয়েই সাধক নিরন্তর ব্রহ্মের মনন করেন। এই ভাবেই মনকে চালানো উচিত।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মার ক্ষেত্রে তার মনই ব্রহ্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মনের অসীম শক্তি। কেন মনকে শক্তিমান বলা হচ্ছে? কারণ এই মন ব্রহ্মের দিকে ধেয়ে যায়, ব্রহ্মকে ধরার চেষ্টা করে। দুরূহ হলেও এই মন দিয়েই সাধক ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। মনই ব্রহ্মকে আত্মারূপে ধ্যান করতে পারে। কিন্তু মনের এই ক্ষমতাও ব্রহ্ম থেকেই আসে। বিদ্যুতের মতো, মনের শক্তির উৎসও ব্রহ্ম। আমরা ব্রহ্মের চিন্তা করতে পারি না তার কারণ আমাদের মন অশুদ্ধ এবং তাতে বড্ড বেশী আমিত্ব। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের মন শুদ্ধ এবং ইচ্ছাশক্তি প্রবল ('সঙ্কল্প')। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর শুদ্ধ মনে আমিত্বের লেশ মাত্র ছিল না। এমন মনের শক্তি অসীম। এ মন ব্রহ্মের খুব কাছাকাছি। তাই এই উপনিষদ জীবাত্মার (অধ্যাত্ম) অভিজ্ঞতা থেকে এই দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য
এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬

অন্বয়: তৎ হ (তিনি অবশ্যই [অর্থাৎ, সেই ব্রহ্ম অবশ্যই]); তদ্বনম্ [তৎ+বনম্] (এই বরণীয়); নাম (নাম); ইতি উপাসিতব্যম্ (এইভাবে উপাসনা করা উচিত); সঃ যঃ এতৎ এবং বেদ (যিনি তাঁকে [ব্রহ্মকে] এইভাবে জানেন); সর্বাণি ভূতানি এনম্ অভিসংবাঞ্ছন্তি হ

(সকল জীব অবশ্যই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে [অর্থাৎ পূজা করে] ['অভি' শব্দটি এখানে 'সংবাঞ্ছন্তি'র সঙ্গে যুক্ত হবে])।

সরলার্থ: সেই (ব্রহ্ম) নিঃসন্দেহে বরণীয়। (সুতরাং) বরণীয় (তদ্বনম্) বলেই তাঁর আরাধনা করা উচিত। যিনি ব্রহ্মকে এইভাবে জানেন, তিনি সকলেরই পূজ্য।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইটুকুই শুধু বলা যায় যে, তিনি বরণীয়। তিনি বরণীয় কারণ সবকিছুর উৎসই তিনি। তিনি বরণীয় বলেই তাঁকে বরণ করা উচিত। এছাড়া আর কোন কারণ দেখানো সম্ভব নয়। যদি কেউ ব্রহ্মকে নিজের সঙ্গে অভিন্ন, একান্ত আপনার বলে জানেন, তাহলে তিনিও সকলের আদরণীয়, সকলের পূজ্য। আমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের স্বরূপ জেনে থাকেন, নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানেন, তবে আমরা সকলেই তাঁকে ভালবাসি, তাঁর পূজা করি। তিনি আমাদের আদর্শ। আমরা তাঁকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং
বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥৭

অন্বয়: ভোঃ উপনিষদং ব্রূহি (হে [আচার্য], অনুগ্রহ করে আমাকে উপনিষদ [-এর উপদেশগুলি] বলুন); ত ([অর্থাৎ তে] তোমাকে); উপনিষদ্ উক্তা (উপনিষদ [-এর সারমর্ম] বলা হয়েছে); ব্রাহ্মীং বাব উপনিষদম্ ত [অর্থাৎ তে] অব্রূম ইতি (আমি তোমাকে উপনিষদ সম্বন্ধে [সবকিছুই] বলেছি যা অবশ্যই ব্রহ্মবিষয়ক)।

সরলার্থ: (শিষ্য)—'হে আচার্য, অনুগ্রহ করে আমাকে উপনিষদের বাণীর (এবং শিক্ষার) কথা বলুন।' (আচার্য)—'উপনিষদের বাণী তোমাকে এর মধ্যেই বলা হয়েছে। উপনিষদে ব্রহ্মসংক্রান্ত যে-তত্ত্ব আছে তার সবই তোমাকে বলেছি।'

ব্যাখ্যা: শিষ্য এখন বলছেন, উপনিষদের বাণী কি অনুগ্রহ করে তা আমাকে বলুন। শিষ্য যা বলতে চাইছেন, এখনও পর্যন্ত আচার্য কেবলমাত্র ব্রহ্ম এবং আত্মা সম্পর্কেই বলেছেন। এখন তিনি জানতে চান উপনিষদের আর কিছু বক্তব্য আছে কিনা? উত্তরে আচার্য বলছেন, আমি তোমাকে এর মধ্যেই উপনিষদের সারকথা, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে বলেছি। উপনিষদ কেবলমাত্র ব্রহ্মের কথাই বলেন। ব্রহ্মই উপনিষদের একমাত্র বিষয়।

শিষ্যের মনে হয়তো অনুশীলন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন জেগেছিল। একথা সত্য, আচার্য তাঁকে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু সেটাই কি সব? কর্ম বা সাধন সম্পর্কে কি উপনিষদের বলার কিছু নেই?

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি
সত্যমায়তনম্॥৮

অন্বয়: তস্যৈ [অর্থাৎ, তস্যাঃ] (এই বিষয়ে [অর্থাৎ, ব্রহ্ম অথবা আত্মজ্ঞান]); তপঃ (কৃচ্ছ্রসাধন); দমঃ (আত্মনিগ্রহ); কর্ম (কাজ, আধ্যাত্মিক অনুশীলন); প্রতিষ্ঠা (ভিত্তি); বেদাঃ (বেদসমূহ); সর্বাঙ্গানি (সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ); সত্যম্ (সত্য); আয়তনম্ (আবাস)।
সরলার্থ: কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মসংযম ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন, এই তিনটি হল আত্মজ্ঞানের ভিত্তি। বেদসমূহ এই জ্ঞানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সত্য এই জ্ঞানের আবাস।
ব্যাখ্যা: উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মকে জানতে গেলে আমাদের কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মসংযম এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশাসনের অনুশীলন করতে হবে। কারণ এগুলিই আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বা মূলভিত্তি। বেদ এই জ্ঞানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কারণ, বেদ পড়লে আমাদেব সংশয় দূর হয়ে যায়। আত্মসংযম, নিষ্কাম কর্ম, শাস্ত্রচর্চা—এগুলি সবই হচ্ছে উপায়, যার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের পবিত্রতা আসে। যখন অহংবোধ চলে যায় এবং মন শুদ্ধ হয়, তখনই সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করে।

সবথেকে প্রয়োজনীয় জিনিস হল সত্য। উপনিষদ বলছেন, আত্মজ্ঞানের নিবাস হল সত্য। সত্যের স্থান তাই সবার ওপরে। কেউ হয়তো সংযমী ও পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু সত্য ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ তাঁর পক্ষেও সম্ভব হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, 'জগৎ-জননীকে সবকিছু দিয়েছিলাম, শুধু সত্য দিতে পারিনি।'

এখন প্রশ্ন, সত্য কি? সত্য বলতে ঠিক কি বোঝায়? 'অমায়িতা', এবং 'বাঙ্‌মনঃকায়ানাম্ অকুটিল্যম্'—এই হচ্ছে সত্যের উপাদান। সহজ করে বললে বলতে হয়, সত্য হচ্ছে চিন্তা, কথা ও কাজে সরলতা, সততা ও আন্তরিকতা। মন, মুখ এক করতে হবে; কথা ও কাজে সঙ্গতি আনতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, সত্য কথাই কলির তপস্যা, শ্রেষ্ঠ সাধন। তিনি বলতেন, আমাদের চিন্তা, কথা এবং কাজে যেন মিল থাকে। বস্তুত সত্যিকারের সৎ মানুষ কখনও সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। তিনি যা বলেন তাই সত্য হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন। যদি তিনি একবার বলতেন যে, এই কাজটা করব, তাহলে যত বাধাবিঘ্নই আসুক না কেন তিনি তা করতেন। অন্যদেরও তিনি সেই শিক্ষাই দিতেন এবং যাতে তাঁরা কঠোরভাবে সত্য পালন করেন সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। 'করব' বলে কেউ যদি সেই কাজটা না করতেন, কিংবা ঠাট্টার ছলেও কেউ অসত্য কথা বলতেন, তাহলে তাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

সাধারণ মানুষ বলে, সততাই শ্রেষ্ঠ পথ। গান্ধীজী আরও একধাপ এগিয়ে বলতেন, সততাই একমাত্র পথ।

যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥৯

অন্বয়: যঃ বৈ এতাম্ এবং বেদ (যিনি তাঁকে [অর্থাৎ ব্রহ্মকে] এইভাবে জানেন); পাপ্মানম্ অপহত্য (সব পাপ অতিক্রম করে [অর্থাৎ অজ্ঞানতা জয় করে]); অনন্তে জ্যেয়ে স্বর্গে লোকে (শ্রেষ্ঠ অনন্ত দিব্যধামে [অর্থাৎ অনন্ত আনন্দে); প্রতিতিষ্ঠতি (দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন)।

সরলার্থ: যিনি ব্রহ্মকে এইভারে জানেন, তিনি সব অজ্ঞানতা অতিক্রম করে অসীম আনন্দে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন।

ব্যাখ্যা: এইভাবে যিনি ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ, এই উপনিষদ যেভাবে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করলেন সেইভাবে যিনি ব্রহ্মকে জানেন—তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন। সব অজ্ঞানতার ঊর্ধ্বে উঠে তখন তিনি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যান। এখন আমরা সকলেই এই জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা। আমরা জন্মাই, সময় হলে মারা যাই, আবার জন্মাই। জন্ম এবং মৃত্যু অনিবার্যভাবে একটার পর আরেকটা আসে আর যায়। কিন্তু যখন আমাদের স্বরূপজ্ঞান হয়, যখন আমরা আমাদের আত্মাকে জানতে পারি, যখন বুঝি আমরা কে—তখনই আমরা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করি। অজ্ঞানতাবশত এখন আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন বলে মনে করি, আর সেইজন্যেই অশেষ দুঃখভোগ করি। কিন্তু যখন জানবো যে আমরা দেহ নই, ইন্দ্রিয়াদি নই, যখন জানবো যে আমরা ইন্দ্রিয়াদি তথা সবকিছুর পারে, তখন আর আমাদের এ জগতে ফিরে আসতে হবে না। জন্মমৃত্যু চক্র চূর্ণ করে তখন আমরা মুক্ত হয়ে যাই। 'স্বর্গ' বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি এই শ্লোকে 'স্বর্গ' বলতে তা বোঝাচ্ছে না। আমরা যাকে স্বর্গ বলি তা অনিত্য। কিন্তু এখানে স্বর্গ বলতে অবিমিশ্র, নিত্য আনন্দ এবং সুখের একটা অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যে অবস্থা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বোধ করলেই লাভ করা সম্ভব। এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কেন উপনিষদের চতুর্থ খণ্ড এইখানে সমাপ্ত।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো

বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্।
মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ;
অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি
নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

কঠ উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: [ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য উভয়কে]); সহ (সমানভাবে); অবতু (রক্ষা করুন); নৌ (উভয়কে); সহ (সমভাবে); ভুনক্তু ([বিদ্যার সুফল] ভোগ করান [অর্থাৎ গ্রহণ করার যোগ্যতা দান করুন]); সহ (সমানভাবে); বীর্যম্ ([বিদ্যালাভের] সামর্থ্য, শক্তি); করবাবহৈ ([যেন] লাভ করতে পারি); নৌ (আমাদের দুজনের); অধীতম্ (লব্ধ বিদ্যা); তেজস্বি (বীর্যশালী, ফলপ্রদ); অস্তু (হোক); [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই); শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত বিঘ্নের শান্তি])।

সরলার্থ: ওঁ। ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন গুরু ও শিষ্য আমাদের উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করেন। তেমনি সমানভাবে যেন আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আবার যা শিখলাম, তার তাৎপর্যও যেন সমানভাবে ধরতে পারি। আবার এই শিক্ষাও যেন সমানভাবে আমাদের কাছে ফলপ্রসূ হয়। আমরা যেন একজন আরেকজনকে হিংসা না করি।

শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ পড়ার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—সত্যকে জানা। গুরু শিষ্য উভয়েই এই সত্যকে মিলিতভাবে জানতে চেষ্টা করবেন। তাঁদের চেষ্টার মধ্যে থাকবে পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা আর দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা। শুধু পাণ্ডিত্য দেখানো এর উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য সত্য কি তা জানা এবং তা জেনে কৃতকৃতার্থ বোধ করা। তা সম্ভব হবে যদি গুরু-শিষ্য মিলিতভাবে চেষ্টা করেন। তাই মিলিত চেষ্টার উপর এত জোর দেওয়া হচ্ছে।

কঠ উপনিষদ

কঠ উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় অংশের অন্তর্গত। মৃত্যুর অধিপতি যমের সঙ্গে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কিশোর নচিকেতার কথোপকথনকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী—তারই মাধ্যমে এই উপনিষদ আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন।

নচিকেতার পিতা বাজশ্রবস একটি যজ্ঞ করেছিলেন; নিজের যা কিছু আছে—সর্বস্ব দান করাই হল এই যজ্ঞের বিধি। কিন্তু এই বিধি অনুসারে তিনি কেবল পুরাতন ও অসার বস্তুগুলি দান করছিলেন। তিনি যে-সমস্ত গাভীগুলি দান করবেন বলে ঠিক করেন তা জরাজীর্ণ ও অসার। পিতার এই সব ত্রুটি নচিকেতা লক্ষ্য করছিলেন। যজ্ঞের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পিতা নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। নচিকেতা ভাবলেন, পুত্র হিসাবে পিতাকে সতর্ক করে দেওয়া তাঁর কর্তব্য। তাছাড়া পুত্র হিসাবে তিনি নিজেও পিতার সম্পত্তির অঙ্গ, সুতরাং তাঁকেই বা কেন পিতা কারো কাছে অর্পণ করবেন না? পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে নচিকেতা জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমাকে আপনি কার কাছে অর্পণ করছেন?' পিতার অধর্মাচরণের বিরুদ্ধে নচিকেতার এ এক প্রতিবাদ। স্বাভাবিকভাবেই পুত্রের এই আচরণে পিতা রুষ্ট ও বিরক্ত হলেন। পিতাকে নিরুত্তর দেখে নচিকেতা তিনবার ধরে এই একই প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে নচিকেতার পিতা উত্তর দেন, 'আমি তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম।'

পিতৃবাক্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে নচিকেতা যমালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। পিতা পুত্রকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নচিকেতা তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে, ব্রাহ্মণ হিসাবে সত্য রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। অবশেষে পিতার অনুমতি নিয়ে নচিকেতা গৃহত্যাগ করেন এবং যমালয়ে উপস্থিত হন। যমের সঙ্গে মিলিত হবার পর নচিকেতা জানতে চান—মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? মৃত্যুর পর আদৌ কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? এই ছিল নচিকেতার বিশেষ জিজ্ঞাস্য। তখন শুরু হয় দুজনের মধ্যে দীর্ঘ. কথোপকথন। যার ফলস্বরূপ আমরা পাই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা দার্শনিক তত্ত্ব। যম সিদ্ধান্তে জানান যে, আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত, অজর, অমর ও অবিনাশী।

কঠ উপনিষদ খুব সহজবোধ্য। আর এই কারণের জন্যই এই উপনিষদ এত জনপ্রিয়।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥১

অন্বয়: বাজশ্রবসঃ হ বৈ (প্রাচীন ঋষি বাজশ্রবার বংশের); উশন্ ([যজ্ঞের ফল] স্বর্গসুখ কামনা করে); সর্ববেদসম্ (সর্বস্ব); দদৌ (দান করলেন অর্থাৎ যে যজ্ঞে যজ্ঞকারীকে সর্বস্ব দান করতে হয়, সেই বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করলেন); তস্য (তাঁর [সেই বাজশ্রবসের]); হ নচিকেতাঃ নাম (নচিকেতা নামধারী); পুত্রঃ (পুত্র); আস (ছিল)।
সরলার্থ: বাজশ্রবসের আর এক নাম ঔদ্দালক। ইনি প্রাচীন ঋষি এবং দানবীর বাজশ্রবার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গে প্রভূত পুরস্কারের আশায় এই বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞের নিয়ম হল যজ্ঞকারীকে সর্বস্ব দান করতে হয়। বাজশ্রবসের একটি বালক পুত্র ছিল। তাঁর নাম নচিকেতা।
ব্যাখ্যা: বাজশ্রবস নামে এক ঋষি ছিলেন। বাজশ্রবা নামে এক উদার মহাঋষির বংশে তিনি জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম বাজশ্রবস। উদ্দালকের পুত্র বলে তাঁকে ঔদ্দালকও বলা হত।

বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। যথাসর্বস্ব দান করাই ছিল এই যজ্ঞের নিয়ম। স্বর্গে প্রভূত পুরস্কার লাভের আশায় তিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু
নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত॥২

অন্বয়: দক্ষিণাসু (দক্ষিণার উদ্দেশ্যে গবাদি দানসামগ্রী); নীয়মানাসু (যা নিয়ে আসা হচ্ছিল [এই যজ্ঞে যেসব দানসামগ্রী উৎসর্গ করা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের]); তং হ কুমারং সন্তম্ ([তখন] বয়সে তরুণ সেই কুমারের [নচিকেতার] মধ্যে); শ্রদ্ধা (বিশ্বাস); আবিবেশ (প্রবেশ করল [অর্থাৎ নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হল—শাস্ত্রে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল]); সঃ (তিনি); অমন্যত (চিন্তা করতে লাগলেন)।

সরলার্থ: দক্ষিণাস্বরূপ দেবার জন্য পিতার দানসামগ্রী নচিকেতা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বয়সে তরুণ হলেও শাস্ত্রে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার আলোকেই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

ব্যাখ্যা: নচিকেতা বয়সে তরুণ হলেও শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন এবং শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার আলোকেই তিনি তাঁর পিতার দানসামগ্রীর বিচার করেছিলেন। এখানে 'শ্রদ্ধা' শব্দটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দটির অর্থ—সত্যের প্রতি অনুরাগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। 'শ্রদ্ধা' বলতে আত্মবিশ্বাসকেও বোঝায়। নচিকেতা এক অসামান্য প্রকৃতির বালক। তিনি ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধা সকলকে মুগ্ধ করত। সেই জন্যই পিতার কাজের ত্রুটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ খুবই দুরূহ। তাঁর পিতা এই যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যিনি এই যজ্ঞ করবেন তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব দান করবেন। নচিকেতা ভাবছেন যে, পিতা এ কি করছেন! তিনি তাঁর পিতাকে ভালবাসতেন। তাই পিতার কাজের সমালোচনা না করে তিনি থাকতে পারেননি।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥৩

অন্বয়: পীতোদকাঃ (যাদের জলপান শেষ হয়েছে [অর্থাৎ গাভীগুলি এত বৃদ্ধ ও দুর্বল যে জলপানেরও শক্তি নেই]); জগ্ধতৃণাঃ (যাদের তৃণভোজন শেষ হয়েছে [বার্ধক্যের ভারে এতই ক্ষীণ যে ঘাস খেতেও অসমর্থ]); দুগ্ধদোহাঃ (যাদের শেষবারের মতো দুধ দেওয়া হয়ে গেছে [অর্থাৎ বয়সের জন্য দুগ্ধদানের শক্তি নিঃশেষিত]); নিরিন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়হীন [অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ]); তাঃ (এরকম অর্থাৎ সেই সকল গাভীগুলিকে); দদৎ ([যে যজমান] দান করেন); সঃ (তিনি [অর্থাৎ সেই দাতা]); অনন্দাঃ (আনন্দহীন); নাম (নামক); তে লোকাঃ (সেই লোকসমূহ); তান্ গচ্ছতি (সেখানে গমন করেন)।

সরলার্থ: এই গাভীগুলি এত বৃদ্ধ ও দুর্বল যে, জন্মের মতো জলপান করেছে, আর করবে না। জন্মের মতো তৃণভোজন করেছে আর করবে না, শেষবারের মতো দুধ দোহা হয়েছে। এরা ইন্দ্রিয়শক্তিহীন ও সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ। যে যজমান দক্ষিণাস্বরূপ এমন গাভী দান করেন তিনি মৃত্যুর পর 'অনন্দা' নামক আনন্দহীন লোকে গমন করেন।

ব্যাখ্যা: পিতার কাজে নচিকেতা ব্যথিত হলেন। কারণ এ তো দান নয়। তিনি যেন দানের ভান করছেন। দান কাকে বলে? দান বলতে বোঝায় যোগ্য ব্যক্তিকে উত্তম ও প্রয়োজনীয়

জিনিস দেওয়া। দাতা ত্যাগের মনোভাব নিয়ে দান করবেন। অপরকে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু দান করায় নিজেকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। দানের সময়ে দাতা কিভাবে দিচ্ছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দাতা বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কেবলমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন দান করবেন।

ধর্ম অনুষ্ঠানের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দান। দান ছাড়া কোন অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না। নচিকেতার পিতা স্বর্গলাভের আশায় এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে যজমানকে সর্বস্ব দান করতে হয়। কিন্তু নচিকেতার পিতা এ কি করছেন? দাতা এবং গ্রহীতা দু-এর পক্ষেই যা অসার শুধু সেরকম বস্তুই দান করছেন। এই শ্রদ্ধাহীন কাজের যে মাশুল তাঁর পিতাকে ভবিষ্যতে দিতে হবে সে কথা মনে করে নচিকেতা ভীত এবং চিন্তিত হলেন। নচিকেতা ভাবলেন, এই সকল গাভীদানে পিতার স্বর্গলাভ তো হবেই না, বরং তিনি মৃত্যুর পর আনন্দহীন দুঃখবহুল (অনন্দা) লোকে যাবেন। কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ শ্রদ্ধাহীন দানে পুণ্য হওয়া তো দূরের কথা বরং প্রত্যবায় হয়।

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥৪

অন্বয়: সঃ হ উবাচ (তিনি [অর্থাৎ নচিকেতা] বললেন); পিতরম্ (পিতাকে); তত ([অর্থাৎ তাত] হে পিতা); মাম্ (আমায়); কস্মৈ (কাকে); দাস্যসি (দান করবেন); [উত্তর না পেয়ে] দ্বিতীয়ম্ (দ্বিতীয়বার); তৃতীয়ম্ (তৃতীয়বার [পিতাকে একই প্রশ্ন করলেন]); তং হ (তাঁকে [অর্থাৎ নচিকেতাকে]); উবাচ ([পিতা] বললেন); ত্বা ([অর্থাৎ ত্বাম্] তোমায়); মৃত্যবে (যমকে); দদামি (দেব)।

সরলার্থ: নচিকেতা তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমাকে কাকে দান করবেন?' পিতার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করলেন। অবশেষে পিতা উত্তর দিলেন: 'তোমায় আমি মৃত্যু বা যমকে দেব।'

ব্যাখ্যা: নচিকেতা শ্রদ্ধাবান বালক। তাই তিনি পিতাকে এরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রপাঠ করে মর্মার্থকে গ্রহণ করেছেন। তাই এই অসার গাভীগুলিকে দান করে পিতা যে ভুল করছেন এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। দানের মূল নীতিটিকে না মেনে পিতা নিজের দুঃখকেই ডেকে আনছেন। নচিকেতা ভাবলেন পুত্র হিসাবে পিতাকে সতর্ক করে দেওয়া তাঁর কর্তব্য। বিশেষত পিতা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করছেন, তখন আমাকে দান করাও তাঁর কর্তব্য। কারণ পুত্রও তো পিতার সম্পত্তি। এইজন্যই নচিকেতা পিতার কাছে গিয়ে বললেন : আমাকে আপনি কাকে দেবেন? পিতাকে অপমান করার জন্য তিনি এ প্রশ্ন

করেননি। পিতার এই অধর্মাচরণের বিরুদ্ধে এ নচিকেতার এক প্রতিবাদ। পিতাকে বারবার একই প্রশ্ন করায় পিতা রেগে গিয়ে বললেন : 'তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করলাম।' পিতা এতই বিরক্ত হয়েছেন যে পুত্রের মৃত্যুও তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ।

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্যমস্য কর্তব্য অন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি ॥৫

অন্বয়: বহূনাম্ এমি প্রথমঃ (বহু পুত্র বা শিষ্যের মধ্যে আমি প্রথম [অর্থাৎ সৎ আচরণে শ্রেষ্ঠ]); বহূনাম্ এমি মধ্যমঃ ([প্রথম না হলেও] অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম); যমস্য কিং স্বিৎ কর্তব্যম্ (যমের এমন কি প্রয়োজন আছে); যৎ (যা); ময়া অদ্য করিষ্যতি (আমার দ্বারা আজ করবেন [অর্থাৎ আমাকে দান করে পিতা আজ সম্পন্ন করবেন])।

সরলার্থ: পিতার সন্তান ও শিষ্যদের মধ্যে আমি 'অবশ্যই প্রথম'। আর প্রথম না হলেও আমি তাদের মধ্যে অবশ্যই দ্বিতীয়। অর্থাৎ কোন বিচারেই আমি অধম নই। যমের কাছে পাঠিয়ে পিতা আমাকে যমরাজের কোন্ সেবায় লাগাবেন?

ব্যাখ্যা: পিতার রূঢ় উত্তর শুনে প্রথমে নচিকেতা ঘাবড়ে যান। পরে তাঁর মনে হল : 'পিতা অবশ্যই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু এমন ক্ষোভ তাঁর কেনই বা হল? তবে কি আমি ভুল করলাম?' এর মাধ্যমেই নচিকেতার শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং নচিকেতার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি কোন শাস্ত্রবিরোধী কাজ এ পর্যন্ত করেননি। পুত্র এবং শিষ্য হিসাবে তাঁর আচরণ যে কোন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। যে কোন বিচারেই শিষ্য বা পুত্রদের মধ্যে নচিকেতা শ্রেষ্ঠ। আর যদি শ্রেষ্ঠ নাও হন তবে তিনি অন্তত মধ্যম। তিনি কখনই অধম নন। নচিকেতা ভাবলেন : তবে পিতার ক্রোধের কারণ কি? পিতাকে কি তবে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করাতে তিনি অপ্রসন্ন হয়েছেন? কিন্তু পিতা যদি ভুল করেন তবে সন্তান হিসাবে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া কি পুত্রের কর্তব্য নয়? বিশেষ করে এমন মারাত্মক ভুলের ফলে পিতার যখন অনিষ্ট হতে পারে।

নচিকেতা আরো ভাবতে লাগলেন : আমাকে বোধহয় যমরাজের প্রয়োজন তাই পিতা আমাকে যমের কাছে পাঠাচ্ছেন। কারণ যাই হোক না কেন, পিতার যখন এমনই ইচ্ছা, সেহেতু নচিকেতা যমরাজের কাছে যাবেন বলেই স্থির করলেন।

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।

সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥৬

অন্বয়: পূর্বে (পূর্বপুরুষ [অর্থাৎ আপনার পিতৃপিতামহগণ]); যথা (যেরূপ [সত্যনিষ্ঠ ছিলেন]); অনুপশ্য (তা আলোচনা করুন [অর্থাৎ চিন্তা করুন]); তথা অপরে (বর্তমানে মহাত্মাগণ [যেরূপ জীবনযাপন করেন]); প্রতিপশ্য ([তাও] বিবেচনা করুন); মর্ত্যঃ (মরণশীল মানুষ); সস্যম্ ইব পচ্যতে (শস্যের মতো জীর্ণ হয়ে প্রাণত্যাগ করে); সস্যম্ ইব (শস্যের মতো); আজায়তে পুনঃ (পুনরায় জন্মগ্রহণ করে [সুতরাং অনিত্য সংসারে সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে পিতা যেন তাঁকে যমের কাছেই অর্পণ করেন])।

সরলার্থ: নচিকেতা তাঁর পিতাকে বললেন : আপনার পূর্বপুরুষেরা কেমন জীবন যাপন করে গেছেন তা আপনি চিন্তা করুন। বর্তমান মহাত্মাদের জীবনও আলোচনা করুন। শস্যের মতোই মানুষ সময় হলে মারা যায় আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা: পিতা নচিকেতাকে বলেছিলেন, 'তোমায় আমি যমের কাছে পাঠাব।' প্রকৃত অর্থে তিনি একথা বলুন বা না বলুন, নচিকেতা পিতার মুখের কথাকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়ে যমালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এর ফলে নচিকেতার পিতা স্বভাবতই বিচলিত হলেন এবং পুত্রকে নিবৃত্ত করতেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু নচিকেতা অতীতের ও বর্তমানের সেইসব ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্ত দিলেন যাঁরা সত্যনিষ্ঠ। পিতাকে এভাবে সত্যপালনে উৎসাহিত করে নচিকেতা আবার তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় দিলেন। তিনি পিতাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, এ জগতের সবই নশ্বর অর্থাৎ বিনাশশীল। কোন না কোন দিন নচিকেতারও মৃত্যু হবে। একমাত্র সত্যই চিরন্তন। সুতরাং তাঁর পিতা যেন কখনই সত্য থেকে বিচ্যুত না হন। যমের কাছে নচিকেতাকে অর্পণ করবেন—একথা তিনি যখন একবার বলে ফেলেছেন তখন ব্রাহ্মণ হিসাবে তা পালন করে সত্যরক্ষা করা পিতার কর্তব্য।

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥৭

অন্বয়: ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ (যখন ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে আসেন); বৈশ্বানরঃ গৃহান্ প্রবিশতি (যেন অগ্নিরূপে গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন); তস্য এতাং শান্তিং কুর্বন্তি ([গৃহস্থেরা] সেই অতিথির উপযুক্ত সমাদর করে তাঁকে প্রসন্ন করেন); বৈবস্বত (হে সূর্যপুত্র, যম); উদকং হর ([অতিথির পা ধুয়ে দেবার জন্য] জল নিয়ে আসুন)।

সরলার্থ: গৃহীর ব্রাহ্মণ অতিথিকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করা উচিত। তাঁকে যথাবিহিত উপচারে প্রসন্ন করা প্রয়োজন। অতএব, হে বৈবস্বত, অতিথিকে পা ধুইয়ে দেবার জন্য জল নিয়ে আসুন।

ব্যাখ্যা: নচিকেতার পিতা কোন চিন্তা ভাবনা না করেই বলেছিলেন : যমের কাছে দিলাম। পরে তিনি বললেন যে, সত্যিসত্যিই পুত্রকে যমের কাছে পাঠাবার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিল না। তখন নচিকেতা তাঁকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন : একবার তিনি যে কথা বলে ফেলেছেন তা যদি ভুলবশতও হয় তবুও সেকথা তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। শেষপর্যন্ত পিতা নচিকেতাকে যমালয়ে যাবার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

ঘটনাচক্র এমনই হল যে, নচিকেতা যখন যমালয়ে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন যমরাজ বাড়িতে ছিলেন না। যমরাজের অনুপস্থিতির জন্য নচিকেতাকে পরপর তিনদিন উপোস করে কাটাতে হল। যম যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে নচিকেতার কথা বললেন। তাঁরা যমকে মনে করিয়ে দিলেন যে, ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নির সমান। অতিথি কোন কারণে অপ্রসন্ন হলে গৃহস্বামীর অকল্যাণ হতে পারে। সুতরাং যথাযথভাবে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হবে। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে অতিথির পা ধুইয়ে দেবার জন্য তাঁরা যমকে পরামর্শ দিলেন (গৃহস্বামীর প্রথম কর্তব্য জল দিয়ে ব্রাহ্মণ অতিথির পা ধুয়ে দেওয়া)।

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।।৮

অন্বয়: যস্য গৃহে (যার গৃহে); ব্রাহ্মণঃ অনশ্নন্ বসতি (ব্রাহ্মণ অতিথি অনাহারে বাস করেন); অল্পমেধসঃ পুরুষস্য ([সেই] অল্পবুদ্ধি পুরুষের); আশা (অপ্রত্যাশিত বিষয়-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা); প্রতীক্ষে ([প্রত্যাশিত বিষয়-প্রাপ্তির জন্য] প্রতীক্ষা); সঙ্গতম্ (সাধু-সঙ্গের ফল); সূনৃতাং চ (এবং সকথার ফল); ইষ্টাপূর্তে (যজ্ঞানুষ্ঠান ও জলাশয় খনন ইত্যাদি পুণ্যকার্যের ফল); পুত্রপশূন্ (সন্তানাদি ও পশু প্রভৃতি); সর্বান্ (সমস্তকেই); এতৎ (অতিথির অনশনরূপ এই পাপ); বৃঙ্‌ক্তে (বিনাশ করে)।

সরলার্থ: কোন গৃহস্থের বাড়িতে যদি কোন ব্রাহ্মণ অতিথি উপবাসী থাকেন, তবে সেই নির্বোধ গৃহস্থের সব আশা-প্রত্যাশা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ,

যজ্ঞানুষ্ঠান, নিজের এবং অপরের উপকারের জন্য কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন, এমনকি নিজের সন্তান ও পশুসকল অতিথি উপবাসী থাকার কারণে বিনষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা: যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই যত্নসহকারে অতিথি আপ্যায়ন করা উচিত। যেহেতু চারশ্রেণীর (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ সেহেতু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ অতিথিকে বিশেষ আদর-যত্ন করা হয়। নৈতিক গুণাবলীর দিক থেকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কারোরই তুলনা হতে পারে না। ব্রাহ্মণই সমাজের শ্রেষ্ঠ আচার্য এবং নেতা। ব্রাহ্মণকে নিজ গৃহে অতিথিরূপে পেলে গৃহীরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন। কিন্তু এমন অতিথিকে যিনি অবহেলা করেন তিনি নেহাতই মূর্খ। তিনি যেন আগুন নিয়ে খেলা করছেন। আগুন সবকিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। অনুরূপ ভাবে ব্রাহ্মণ অতিথি যদি অপ্রসন্ন হন তবে তাঁর দ্বারা গৃহস্থের খুবই অমঙ্গল হতে পারে। সব দিক থেকে গৃহস্বামী সজ্জন ব্যক্তি হতে পারেন; এমনকি তিনি বহু সৎকর্মও করে থাকতে পারেন। এসবের জন্য তিনি পুরস্কার আশা করতেই পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতিথি অপ্রসন্ন হলে গৃহস্বামীর সমস্ত পুরস্কারের আশা সমূলে বিনষ্ট হয়। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর সব সম্পদ এবং সন্তান পর্যন্ত হারান।

যমের এসব কথা অজানা নয়। কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীও বটে। তাই তাঁরা যমকে এই সব কথা মনে করিয়ে দিলেন। কারণ গৃহস্থের বাড়িতে ব্রাহ্মণ অতিথি তিনদিন ধরে উপোস করে রয়েছেন, এ কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপার নয়। যমালয়ে এই ঘটনাই ঘটেছে। কারণ নচিকেতা এখানেই তিনদিন অনাহারে কাটিয়েছেন।

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে
মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥৯

অন্বয়: ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ); অতিথিঃ (অতিথি [অর্থাৎ যেহেতু তুমি অতিথি]); নমস্যঃ ([সেহেতু] সম্মানীয়); যৎ (যেহেতু); মে গৃহে (আমার গৃহে); তিস্রঃ রাত্রীঃ (তিন রাত্রি); অনশ্নন্ (উপবাসী, আহার না করে); অবাৎসীঃ (বাস করেছ); তস্মাৎ (সেহেতু); ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ); তে (তোমায়); নমঃ অস্তু (নমস্কার); মে স্বস্তি অস্তু (আমার মঙ্গল হোক); প্রতি (প্রত্যেক [তিন রাত্রির জন্য]); ত্রীন্ বরান্ (তিনটি বর [অর্থাৎ অনাহারে যে তিন রাত্রি আমার বাড়ি কাটিয়েছ, তার প্রত্যেকটির জন্য একটি করে মোট তিনটি বর]); বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)।

সরলার্থ: (নচিকেতাকে সম্বোধন করে যম বললেন:) হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার অতিথি এবং তুমি ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করি। আমি তোমায় নমস্কার করি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যাতে আমি উন্নতি লাভ করতে পারি। ব্রাহ্মণ, তুমি আমার গৃহে তিনদিন উপোস করে কাটিয়েছ। অনাহারে যে তিন রাত তুমি আমার বাড়িতে ছিলে, তার প্রতিটির জন্য তুমি আমার কাছে একটি করে মোট তিনটি বর প্রার্থনা কর।

ব্যাখ্যা: আত্মীয়রা নচিকেতার উপস্থিতির বিষয়ে যমকে জানালে পরে যম স্বভাবতই চিন্তিত হলেন। একে অতিথি তাতে ব্রাহ্মণ, আবার যমেরই বাড়িতে তিনদিন ধরে উপবাসী। নিঃসন্দেহে গৃহস্বামী হিসাবে এটি যমের মস্ত বড় ত্রুটি। তিনি দ্রুত নচিকেতার কাছে গেলেন এবং বিধিমতো নচিকেতার পা ধুয়ে দিলেন এবং নানাভাবে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যমের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ কাজ করতে লাগল। কারণ নচিকেতা যে তাঁরই গৃহে তিনদিন উপবাসী ছিলেন। তাই এই আতিথেয়তা তাঁর ত্রুটির তুলনায় যথেষ্ট নয়। একথা মনে করে যম নচিকেতার তুষ্টির জন্য আরো তৎপর হলেন। গৃহস্বামী হিসাবে নিজের ত্রুটি সংশোধন করার জন্য তিনি নচিকেতাকে বর দিতে চাইলেন। তিনি নচিকেতাকে বললেন : তুমি আমার গৃহে তিনরাত্রি উপোস করে কাটিয়েছ। এরজন্য আমি তোমাকে তোমার পছন্দমতো তিনটি বর দিতে চাইছি। তুমি তা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎপ্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥১০

অন্বয়: মৃত্যো (হে মৃত্যু); গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম); শান্তসংকল্পঃ (দুশ্চিন্তামুক্ত); সুমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত); মা অভি (আমার প্রতি); বীতমন্যুঃ (ক্রোধশূন্য); যথা স্যাৎ (যাতে হন); প্রতীতঃ ([আমাকে] চিনতে পেরে); ত্বৎ-প্রসৃষ্টং (তোমার দ্বারা প্রেরিত); মা অভিবদেৎ (আমাকে সাদর-সম্ভাষণ করেন); এতৎ (এইটি); ত্রয়াণাম্ (তিনটি বরের মধ্যে); প্রথমম্ (প্রথম); বরম্ (বর); বৃণে (আমি প্রার্থনা করি)।

সরলার্থ: (উত্তরে নচিকেতা বললেন :) হে মৃত্যু, অনুগ্রহ করে আপনি এই বর দিন : আমার পিতা গৌতম যেন দুশ্চিন্তামুক্ত ও প্রসন্নচিত্ত হন, আমার ওপর তাঁর যেন আর রাগ না থাকে, আপনার কাছ থেকে স্বগৃহে ফিরে গেলে তিনি যেন আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে

পারেন এবং যেন পূর্বের মতোই আমাকে সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনটির মধ্যে এইটিই আমার প্রার্থিত প্রথম বর।

ব্যাখ্যা: নচিকেতার এই প্রথম বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং পিতৃভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নচিকেতা জানতেন যে, পিতা তাঁকে সত্যিসত্যিই যমের কাছে পাঠাতে চাননি। নচিকেতার আচরণে বিরক্ত হয়ে, তাঁর ওপর রেগে গিয়েই তিনি একথা বলেছিলেন, আর বলে ফেলে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই অনুতাপের আগুনে তিনি আজও দগ্ধ। নচিকেতার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তারও শেষ ছিল না। তাই নচিকেতা যমের কাছে প্রথমেই পিতার মানসিক শান্তি ও প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর পিতা যেন সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হন। স্বগৃহে ফিরে গেলে কি রকম অভ্যর্থনা তিনি পিতার কাছ থেকে পাবেন এ ব্যাপারেও নচিকেতা নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি হয়তো পুত্রকে চিনতেই পারবেন না এবং তাঁকে হয়তো আগের মতো সস্নেহ সম্ভাষণে গ্রহণ করবেন না। তাই প্রথম বর হিসাবে এই সব বিষয়ে নচিকেতা যমের কাছ থেকে আশ্বাস প্রার্থনা করলেন।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥১১

অন্বয়: ঔদ্দালকিঃ (ঔদ্দালক [উদ্দালকের পুত্র]); আরুণিঃ (অরুণের পুত্র [অর্থাৎ তোমার পিতা]); পুরস্তাৎ (পূর্বে [অর্থাৎ যমালয়ে আসার আগে]); যথা (যেরূপ ছিলেন); প্রতীতঃ (তোমাকে [চিনতে পেরে]); ভবিতা ([সেরূপ স্নেহশীল] হবেন); মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ থেকে); প্রমুক্তম্ (মুক্ত); ত্বাম্ (তোমাকে); দদৃশিবান্ (দেখে); মৎ-প্রসৃষ্টঃ (আমার ইচ্ছানুসারে) বীতমন্যুঃ (ক্রোধশূন্য হয়ে); সুখম্ (প্রসন্নমনে); রাত্রীঃ শয়িতা (রাত্রি শয়ন করবেন [অর্থাৎ তাঁর সুনিদ্রা হবে])।

সরলার্থ: (উত্তরে যম বললেন:) তোমার পিতা, অরুণের পুত্র ঔদ্দালক তোমার প্রতি আগেও স্নেহশীল ছিলেন। এখন আমার নির্দেশে তুমি গৃহে ফিরে যাচ্ছ। তোমাকে চিনতে পেরে তাঁর স্নেহ-ভালবাসার এতটুকুও ঘাটতি হবে না। তুমি গৃহে ফিরে যাবার পর থেকে তিনি সুখনিদ্রায় রাত কাটাবেন। আর তোমাকে মৃত্যুদ্বার থেকে ফিরে যেতে দেখে তাঁর রাগ প্রশমিত হবে এবং তিনি প্রসন্নতা লাভ করবেন।

ব্যাখ্যা: নচিকেতার আশঙ্কা ছিল যে, যমালয় থেকে গৃহে ফিরে যাবার পর পিতা হয়তো তাঁকে আগের মতো স্নেহ করবেন না। এমনকি মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত নচিকেতাকে দেখে তিনি প্রসন্ন নাও হতে পারেন। পুত্রের জন্য দুশ্চিন্তায় তাঁকে অনেক রাত্রিই না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে—এমন দুর্ভাবনাও নচিকেতার মনে ছিল। এর কোনটির জন্যই নচিকেতার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই—একথা বলে যম নচিকেতাকে আশ্বস্ত করলেন।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥১২

অন্বয়: স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে); কিঞ্চন ভয়ং ন অস্তি (কোনও ভয় নেই); তত্র (সেখানে); ত্বং ন (আপনি নেই. [অর্থাৎ যমের সেখানে কোন প্রভাব নেই]); ন জরয়া বিভেতি (কেউ বার্ধক্যের ভয়ে ভীত হয় না); অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা); উভে তীর্ত্বা (উভয়কে অতিক্রম করে); শোকাতিগঃ (শোকাতীত হয়ে); স্বর্গলোকে (স্বর্গধামে); মোদতে (আনন্দ উপভোগ করে)।

সরলার্থ: (প্রথম বর প্রাপ্তির পর নচিকেতা যমকে বললেন :) স্বর্গে ভয় পাবার মতো কিছু নেই। হে মৃত্যু, সেখানে আপনার কোন প্রভাবও নেই। তাই সেখানে জরাগ্রস্ত হবার আশঙ্কাও নেই। সেখানে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা এসব বোধ থাকে না। সমস্ত শোক ও মানসিক দুঃখকে অতিক্রম করে মানুষ স্বর্গে জীবনকে উপভোগ করে।

ব্যাখ্যা: নচিকেতা এখন যমের কাছে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন। নচিকেতা প্রথম বরে তাঁর পিতার মানসিক শান্তি এবং তাঁদের পুনর্মিলন যাতে শান্তিতে হয় তা প্রার্থনা করেছিলেন। এখন তিনি স্বর্গলোক অথবা ব্রহ্মলোক সম্পর্কে জানতে চান, যেখানে মানুষ কিছু সময়ের জন্য অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু আমরা পরে দেখব যে, নচিকেতা এই ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানলাভে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। নচিকেতা লক্ষ্য করেছেন যে, এই দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয়। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষ রোগ-ব্যাধি এবং দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে। এ জগক্তে অল্পসময়ের জন্য মানুষ সুখভোগ করে বটে কিন্তু অচিরেই তাকে দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। এ জগতের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষ কি এই শোক-দুঃখ, রোগ-ব্যাধিকে অতিক্রম করতে পারে? উপনিষদ বলেন, হ্যাঁ, পারে। যখন আমরা নিজেদের পরিচয় জানি অর্থাৎ আত্মার

প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করি তখন আমরা সকল দুঃখ-কষ্টের পারে চলে যাই। উপনিষদ আমাদের আত্মজ্ঞান লাভের শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। বর্তমানে আমি নিজেই নিজের কাছে অপরিচিত। উপনিষদই সেই আত্মার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। নচিকেতার অনুরোধে যম সেই আত্মারই বর্ণনা দেবেন। নচিকেতা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন করেছেন, কেমন করে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়? ব্রহ্মলোকে জীব মোক্ষের কাছাকাছি অবস্থায় আসে। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই জীব মোক্ষলাভ করে। সুতরাং মোক্ষের চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু নিয়ে যেন আমরা তৃপ্ত না হই। আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মলোক চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তু এই লোকও চিরস্থায়ী নয়। তাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হতে পারে না।

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥১৩

অন্বয়: মৃত্যো (হে মৃত্যু); সঃ ত্বম্ (আপনিই); স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্ (স্বর্গলাভের উপায় যে অগ্নিবিদ্যা, তাকে); অধ্যেষি (জানেন); শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ (শ্রদ্ধাবান আমাকে); ত্বং প্রব্রূহি (সবিস্তারে বলুন); [যার দ্বারা] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গবাসিগণ); অমৃতত্বম্ (অমরত্ব); ভজন্তে (লাভ করেন); এতৎ (এই [এই অগ্নিবিদ্যা]); দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বর দ্বারা); বৃণে (প্রার্থনা করি)।

সরলার্থ: (নচিকেতা বললেন :) হে মৃত্যু, স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ যে অগ্নিবিদ্যা আছে, আপনি তা জানেন। অনুগ্রহ করে সেই বিদ্যা আমার কাছে সবিস্তারে বলুন। আমি শ্রদ্ধাবান। মৃত্যুর পর যাঁরা স্বর্গলোকে যান, তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন। আমি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ এই অগ্নিবিদ্যাই দ্বিতীয় বর হিসাবে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।

ব্যাখ্যা: যম পূর্বে আমাদের মতোই মরণশীল মানুষ ছিলেন। অগ্নিবিদ্যা অভ্যাস করেই তিনি স্বর্গলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যমের পদও অধিকার করেছেন। অতএব নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যমই সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। একথা নচিকেতা জানতেন এবং সেইজন্যই তিনি যমের কাছে দ্বিতীয় বর হিসাবে এই অগ্নিবিদ্যাই শিখতে চেয়েছিলেন।

হিন্দুমতে, দেবদেবীগণ আসলে আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন। আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করে তাঁরা ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। পুরাণে দেখা যায়, মৃত্যুর পর এইসব ব্যক্তিই স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক অথবা দেবলোকে যান। সাধারণভাবে সেখানে তাঁদের

জীবন খুব সুখেই কাটে। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ যমের মতো উচ্চপদও অধিকার করেন। যম মৃত্যুর অধিপতি। সেইভাবে, অন্য দেবতারা অন্যান্য পদ অধিকার করেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সব পদ লোভনীয় হতে পারে, কিন্তু এই পদসকলও ক্ষণস্থায়ী। তাদের মেয়াদ হতে পারে দশ লক্ষ বছর বা আরো বেশী। কিন্তু একদিন না একদিন এই দশ লক্ষ বছরও শেষ হবে। অর্থাৎ এই জগতের সব কিছুই অনিত্য। এমনকি স্বর্গ, স্বর্গীয় বস্তু এবং স্বর্গের অধিপতিরাও বিনাশশীল। নির্দিষ্ট সময় ফুরালে দেবদেবীরাও আবার মানুষ হয়ে এই মর্তেই ফিরে আসেন। এইরকম আসা-যাওয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা তথাকথিত স্বর্গজীবনের অসারতা অনুভব করে আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হন। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানেই মোক্ষলাভ সম্ভব। তাই এই জ্ঞান আমাদের অমৃতত্ব দান করে। স্বর্গলোকে মানুষ যে অমৃতত্ব লাভ করে তাও ক্ষণস্থায়ী। এই অমৃতত্ব বলতে দীর্ঘ জীবন বোঝায়। সেইভাবেই স্বর্গের সব আকর্ষণীয় বস্তুই আপেক্ষিক। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানে মানুষ যে অবস্থা লাভ করে তাই একমাত্র চিরন্তন ও শাশ্বত।

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥১৪

অন্বয়: নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ (স্বর্গলাভের উপায় যে অগ্নিবিদ্যা তা বিশেষরূপে জেনে); তে প্রব্রবীমি তৎ উ (তা তোমাকে সবিস্তারে বলছি); মে নিবোধ (আমার কথা একাগ্রচিত্তে বোঝার চেষ্টা কর); ত্বম্ (তুমি); এতম্ (এই অগ্নিবিদ্যাকে); অনন্তলোকাপ্তিম্ (স্বর্গলোক প্রাপ্তির [অর্থাৎ অমরত্ব লাভের] উপায়স্বরূপ); অথো প্রতিষ্ঠাম্ (এবং জগতের আশ্রয়); গুহায়াম্ নিহিতম্ (গুহায় নিহিত [অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের শুদ্ধ বুদ্ধিরূপ গুহাতে]); বিদ্ধি (জেনো)।

সরলার্থ: (যম বললেন :) হে নচিকেতা, স্বর্গলাভের উপায় স্বরূপ যে অগ্নিবিদ্যা তা আমি জানি। আমি তোমাকে তা বিস্তারিতভাবে বলব। অনুগ্রহ করে, সতর্কতার সঙ্গে একথা শোন এবং তা বুঝতে চেষ্টা কর। দয়া করে মনে রেখো, অমরত্ব লাভের পথ হল এই অগ্নি এবং এই অগ্নিই জগতের আশ্রয়। জ্ঞানী ব্যক্তির মনের গভীরে এই অগ্নি প্রচ্ছন্ন রূপে থাকেন।

ব্যাখ্যা: এখানে ‘অগ্নি’ কথাটির অর্থ হল সবকিছুর সারস্বরূপ। এইজন্যই এঁকে জগতের আশ্রয় বলা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, যে যাঁর উপাসনা করে সে তাঁর মতোই হয়ে যায়।

অর্থাৎ উপাসক তার উপাস্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়। যদি আমি অগ্নির উপাসনা করি তবে আমি অগ্নির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করব। অর্থাৎ আমি সবকিছুর সারস্বরূপের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাব। আর তখনই আমি অবিনশ্বর হয়ে উঠব। এইজন্যই এখানে বলা হচ্ছে যে, অগ্নি-উপাসনার দ্বারা মানুষ অমরত্ব লাভ করে।

বেদান্তমতে শুদ্ধ চৈতন্যই পরমসত্য। এই শুদ্ধ চৈতন্যকে কেউ বর্ণনা করতে পারে না। এই পরমসত্য সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই হল এই পরমসত্য। একে 'পরমব্রহ্ম' এবং 'পরমাত্মন্'ও বলা হয়। এই সব নামের প্রয়োগ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই তত্ত্বকে বর্ণনার চেষ্টা করাই বৃথা। আসল কথা হল 'পরমতত্ত্ব' বা 'পরমসত্য' বাক্যমনাতীত। এই তত্ত্ব এক ও অভিন্ন। যেহেতু পরমসত্য এক ও অদ্বিতীয় সেহেতু তাঁকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর কোন্ শব্দই বা এঁর ব্যাখ্যা করতে সমর্থ? কোন বিশেষণের দ্বারা পরমসত্যকে বিশেষিত করা যায় না, বরং তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে বিকৃত করা হয়। যদি বলা যায়, পরমতত্ত্বটি ভাল, তবে মন্দ কি? তাহলে মন্দ বলে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। তখনই দ্বৈতবাদ এসে যায়। অদ্বৈতমতে এক বৈ দুই কিছু নেই। আর সেই 'একই' সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে বিরাজমান।

আমরা আমাদের চারদিকে নানা বৈচিত্র দেখে থাকি, কিন্তু আসলে বৈচিত্র বলে কিছুই নেই। সেই 'এক' সত্যই আছেন, শুধু সেই 'এক'। নাম-রূপের দরুন সেই একই বহু হয়েছেন। তার ফলেই আমরা বৈচিত্র দেখি। অবিদ্যার জন্যই আমরা বহু দেখে থাকি। ব্যবহারিক জীবনে এই বৈচিত্রকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু এই বৈচিত্র চূড়ান্ত সত্য নয়। সৎ গুরুর উপদেশ, নিত্য-অনিত্য বস্তুবিচার, তীব্র বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা এই 'আমি-তুমি'র ভেদ চিরতরে ঘুচে যায়। তখন সব ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল—একমাত্র 'আমি', সেই এক 'আত্মা' যা সকলের মধ্যে বিদ্যমান। গলার হারের মুক্তোগুলো যেমন একটি সুতোয় গাঁথা থাকে ঠিক তেমনি এক আত্মাই সকলের মধ্যে রয়েছেন। এই শ্লোকে সর্বভূতের এই অন্তরাত্মাকেই অগ্নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, প্রজাপতি, ব্রহ্মা—এই সব নামেও এই অগ্নিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ হল এই অগ্নি। এই অবস্থায় ব্রহ্ম মায়ার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু পরমতত্ত্ব বা শুদ্ধ চৈতন্য হিসাবে ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ গুণরহিত। এই নির্গুণ ব্রহ্মকে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।

স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥১৫

অন্বয়: তস্মৈ (তাঁকে [নচিকেতাকে]); লোক-আদিম্ (সৃষ্টির আদি [অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথম প্রকাশিত]); তম্ অগ্নিম্ (সেই অগ্নির বিষয়ে); উবাচ (বললেন); যাঃ (যেরূপ); যাবতীঃ বা (অথবা যতসংখ্যক); ইষ্টকাঃ (ইষ্টকসমূহ [যজ্ঞের বেদী নির্মাণে ব্যবহার করা হয়]); যথা বা (এবং যে প্রকারে [অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হয়]); সঃ চ অপি (সে-ও [অর্থাৎ নচিকেতাও]); যথোক্তম্ (যেরূপ বলা হল); তৎ প্রত্যবদৎ (তা পুনরাবৃত্তি করলেন); অর্থ (অনন্তর); মৃত্যুঃ (যম); অস্য (নচিকেতার এই নির্ভুল পুনরুক্তিতে); তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট হয়ে); পুনঃ এব (পুনরায়); আহ (বললেন)।
সরলার্থ: (যম নচিকেতাকে বললেন :) সৃষ্টির শুরুতে প্রথম প্রকাশিত জগৎ বা প্রথম শরীরী সত্তা হল অগ্নি। কেমন করে এই অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদন করতে হয় যম এখানে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন, যজ্ঞবেদী কি ভাবে তৈরী করতে হবে, কি ধরনের ইট এবং কতসংখ্যক ইট এই বেদী তৈরীতে লাগবে এবং সেগুলি কি ভাবেই বা বিন্যস্ত হবে, যজ্ঞের আগুন কি ভাবে জ্বালাতে হবে—ইত্যাদি তথ্য এই বর্ণনায় পাওয়া যায়। যম যা যা বললেন নচিকেতা তা নির্ভুলভাবে পুনরায় বললেন। যম এতে সন্তুষ্ট হলেন।
ব্যাখ্যা: প্রথম শরীরী সত্তাকে হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট বলেও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এর আরও অন্য নাম আছে—ঈশ্বর, প্রজাপতি, অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য। প্রতিটি নাম জগতের সূচনাকেই চিহ্নিত করে। প্রতিটি নাম ভিন্ন হলেও তা সেই এক বস্তুকেই বোঝায়।

এই অগ্নি কিন্তু আমরা নিত্য যে আগুন ব্যবহার করি তা নয়। এই অগ্নি নিত্যব্যবহৃত অগ্নিসহ সব কিছুর উৎস।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥১৬

অন্বয়: প্রীয়মাণঃ (সন্তুষ্ট হয়ে); মহাত্মা (মহাত্মা যমরাজ); তম্ (তাঁকে [অর্থাৎ নচিকেতাকে]); অব্রবীৎ (বললেন); ইহ (এই); অদ্য (ইদানীং); তব (তোমাকে); ভূয়ঃ (পুনরায়, আর একটি); বরম্ (বর); দদামি (দিচ্ছি); অয়ম্ অগ্নিঃ (এই অগ্নি); তব এব নাম্না

(তোমারই নামে); ভবিতা ([প্রসিদ্ধ] হবে); চ (এবং); ইমাম্ (এই); অনেকরূপাং সৃঙ্কাম্ (বিচিত্র শব্দময়ী কণ্ঠহার [অথবা উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে কাজ করার পদ্ধতি]); গৃহাণ (গ্রহণ কর)।

সরলার্থ: মহাত্মা যম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নচিকেতাকে বললেন : 'তোমাকে আমি আরও একটি বর দিতে চাই। এখন থেকে এই অগ্নি তোমার নামেই খ্যাত হবে। এই কণ্ঠহারটিও তুমি গ্রহণ করো।'

ব্যাখ্যা: এখন থেকে এই অগ্নি 'নচিকেতা অগ্নি' নামে প্রসিদ্ধ হবে। যম খুশী হয়ে এই চতুর্থ বরটি নচিকেতাকে দিয়েছিলেন। এর আগে যম নচিকেতাকে তিনটি বর দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যমকে এখানে 'মহাত্মা' বলা হয়েছে। কোন্ অর্থে যম 'মহাত্মা'? অথবা 'মহাত্মা' কাকে বলে? তিনিই মহাত্মা যাঁর মন সবসময় উঁচু সুরে বাঁধা থাকে। দেবতারূপী যম অবশ্যই এমন বিশেষণের উপযুক্ত।

'সৃঙ্কা' শব্দটির দুটি অর্থ। এক অর্থে—'গলার হার'। একে 'বহু আকৃতি'ও বলা হয়েছে যার অর্থ বিশেষ ধরনের কণ্ঠহার। কণ্ঠহারের রত্নগুলি নানা আকারের ও নানা রং-এর হতে পারে এবং এই হার পরে চলাফেরা করলে হয়তো সুরেলা শব্দ শোনা যায়।

শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হল যজ্ঞের বিধি অনুযায়ী কাজ করা এবং তার উপযুক্ত ফললাভ করা। এ ব্যাপারেও যম নচিকেতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আচার্য শঙ্কর এখানে শব্দের দ্বিতীয় অর্থটিকেই অনুমোদন করেছেন।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥১৭

অন্বয়: ত্রিভিঃ (তিনের সঙ্গে [অর্থাৎ মাতা, পিতা ও আচার্যের সঙ্গে]); সন্ধিম্ এত্য (মিলিত হয়ে [অর্থাৎ তাঁদের দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে অথবা বেদ, স্মৃতি অধ্যয়ন করে বা সজ্জন ব্যক্তির প্রভাবে থেকে]); ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন); ত্রিকর্মকৃৎ (যিনি যজ্ঞ, দান ও বেদ অধ্যয়ন এই তিন প্রকার কর্ম করেন); জন্ম-মৃত্যু (জন্ম ও মৃত্যু); তরতি (অতিক্রম করেন); ব্রহ্ম-জ-জ্ঞম্ : ব্রহ্ম-জ (ব্রহ্মা থেকে জাত [অর্থাৎ বিরাট]); জ্ঞ (সর্বজ্ঞ); [ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ যখন স্থূলভাবে প্রথম প্রকাশিত হন তা-ই বিরাট। সেহেতু বিরাটকে ব্রহ্মার থেকে জাত বলা হয়। বিরাট সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ]; ঈড্যম্ (বরণীয়);

দেবম্ (জ্যোতিস্বরূপ দেবতাকে); বিদিত্বা ([শাস্ত্র থেকে] জেনে); নিচায্য (আত্মরূপে উপলব্ধি করে); ইমাং শান্তিম্ (প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত শান্তি); অত্যন্তম্ (বিশেষরূপে); এতি (লাভ করেন)।

সরলার্থ: মাতা, পিতা এবং আচার্যের দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে যে-ব্যক্তি নাচিকেত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দান ও বেদ অধ্যয়ন—এই তিনটি বিষয় অভ্যাস করেন, তিনি জন্মমৃত্যুর পারে যান।

ব্যাখ্যা: সাধককে প্রথমেই শাস্ত্র থেকে 'বিরাট'-এর বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে হবে। এই 'বিরাট'—সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, শ্রদ্ধেয় হিরণ্যগর্ভ থেকে জাত। এরপর বিরাটের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে সাধক পরা শান্তি লাভ করেন। এটি কিন্তু মোক্ষ নয়। মোক্ষলাভের পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ মাত্র। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই মোক্ষ-লাভ হয়। আর অন্য কোন পথে মোক্ষলাভ করা যায় না। বিরাটের সঙ্গে একাত্মবোধই সাধককে মোক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আচার্য শঙ্কর জ্ঞান এবং উপাসনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিরোধী ছিলেন। এই সমন্বয়ের অর্থ হল দুটি বিপরীত মেরু যথা দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় করা। তবে আচার্য শঙ্কর ক্রমমুক্তির ধারণাকে মেনে নিয়েছিলেন। এই শ্লোকটিই তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি ক্রমমুক্তির ধারণাকে নিন্দা করেননি। তাঁর এই মনোভাবের পেছনে হয়তো এই কারণ ছিল যে, পূর্ণমুক্তি এবং ক্রমমুক্তির পথে সাধনার ধারা প্রায় এক—শাস্ত্র অধ্যয়ন, সদ্‌গুরুর নির্দেশ এবং ধ্যান। ক্রমমুক্তির ক্ষেত্রে এর সঙ্গে শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনাকে যুক্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণমুক্তির পথে আনুষ্ঠানিক উপাসনার কোন প্রয়োজন নেই। ধ্যানমগ্নতাই ধীরে ধীরে উপাসনার স্থান গ্রহণ করে। প্রকৃত উপাসনা এবং ধ্যান এক ও অভিন্ন। ধ্যানবর্জিত উপাসনা অর্থহীন।

বর্তমান শ্লোকটিতে যেখানে পূর্ণমুক্তি লাভ করা সম্ভব নয় সেখানে ক্রমমুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥১৮

অন্বয়: যঃ (যিনি); এতৎ (পূর্বোক্ত); ত্রয়ম্ (এই তিন বিষয় [অর্থাৎ ইটের সংখ্যা এবং ইটের প্রকার ও যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন-প্রণালী]); বিদিত্বা (জেনে); ত্রিণাচিকেতঃ (তিনবার নাচিকেত অগ্নিযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন); এবং (এভাবে [অর্থাৎ নাচিকেত অগ্নির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে]); বিদ্বান্ (জেনে); নাচিকেতম্ চিনুতে (নাচিকেত অগ্নির ধ্যান করেন বা চয়ন করেন); সঃ (তিনি); পুরতঃ (শরীর ত্যাগের পূর্বেই); মৃত্যুপাশান্ (অধর্ম, অজ্ঞান, আসক্তি ইত্যাদি বন্ধনকে); প্রণোদ্য (ছিন্ন করে); শোকাতিগঃ (শোকাতীত হয়ে); স্বর্গলোকে মোদতে (স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন [অর্থাৎ বিরাটের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করে আনন্দে থাকেন])।

সরলার্থ: যিনি অগ্নিবিদ্যার সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন যেমন যজ্ঞবেদী তৈরীর জন্য ব্যবহৃত ইটের প্রকৃতি ও তার সংখ্যা, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন-ক্রিয়া এবং যিনি তিনবার নাচিকেত যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন (যজমান এখানে সবসময় বিরাটের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করেন) এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুর আগেই মানসিক দুর্বলতা ও অজ্ঞানতা-জনিত সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হন। সব মানসিক দুর্গতিকে অতিক্রম করে তিনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন এবং নিজের সঙ্গে বিরাটের অভিন্নতা বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকেন।

ব্যাখ্যা: যজমান এই নাচিকেত অগ্নির মাধ্যমেই বিরাটের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করেন। এই অগ্নির নিজস্ব তত মূল্য নেই। এই 'নাচিকেত অগ্নি' যজমানকে গভীর ধ্যানে মগ্ন করে। যার ফলস্বরূপ তিনি বিরাটের সঙ্গে মিলিত হন।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব॥১৯

অন্বয়: নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); যম্ (যে [অগ্নিবিদ্যা]); দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরের দ্বারা); অবৃণীথাঃ (তুমি প্রার্থনা করেছিলে); তে (তোমাকে); এষঃ স্বর্গ্যঃ অগ্নিঃ (স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ এই অগ্নিবিদ্যা [দান করা হল]); জনাসঃ (লোকেরা); এতম্ অগ্নিম্ (এই অগ্নিকে); তব এব প্রবক্ষ্যন্তি (তোমারই [নামে] বলবে); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); তৃতীয়ং বরম্ (তৃতীয় বর); বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)।

সরলার্থ: যম বললেন, হে নচিকেতা, দ্বিতীয় বর হিসাবে তুমি আমার কাছ থেকে অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করেছিলে। আমি এখন সেই বর তোমাকে দিলাম। এখন থেকে সবাই এই অগ্নিকে

তোমার নামে অভিহিত করবে। এবার তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

ব্যাখ্যা: 'অগ্নি' বলতে কখনও কখনও সেই বিরাটকে বোঝায়, কখনও আবার সেই যজ্ঞকে বোঝায় যা বিরাটের সঙ্গে যজমানকে একাকার করে দেয়। প্রথমটি হল উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয়টি হল এর উপায়।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে-
হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥২০

অন্বয়: প্রেতে মনুষ্যে (মানুষ মৃত হলে); যা ইয়ং বিচিকিৎসা (এই যে সংশয় [আছে]); একে (কেউ কেউ [বলেন]); অস্তি ইতি ([মৃত্যুর পরে আত্মার] অস্তিত্ব আছে); চ একে (এবং কেউ কেউ [বলেন]); অয়ম্ (এই আত্মা); ন অস্তি ইতি (অস্তিত্ব নেই); ত্বয়া (আপনার দ্বারা); অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হয়ে); অহম্ এতৎ বিদ্যাম্ (আমি এই বিষয়ে জানতে চাই); বরাণাম্ (তিনটি বরের মধ্যে); এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (এটি তৃতীয় বর)।

সরলার্থ: (যমের কথা শুনে নচিকেতা বললেন:) মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তার মনে এই সংশয় জাগে যে, মৃত্যুর পরে আত্মার কোন অস্তিত্ব আছে কি না। কেউ কেউ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে আবার কেউ কেউ বলেন আত্মা থাকে না। আমি আপনার কাছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চাই। এটি আমার প্রার্থিত তৃতীয় বর।

ব্যাখ্যা: এ পর্যন্ত উপনিষদ আমাদের যা শিক্ষা দিলেন তা গৌণ। এমনকি বিরাটের সঙ্গে একাত্মতালাভও যথেষ্ট নয়। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা। নচিকেতার প্রশ্ন থেকে যে আলোচনার শুরু হল তা হল বেদান্তের মূল কথা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কি, কি ভাবে এই জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং এই জ্ঞান আমাদের কোন উপকারে আসে কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে যম নচিকেতাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি প্রকৃত জিজ্ঞাসু কিনা। তিনি নচিকেতাকে নানা সুখপ্রদ বস্তু দিতে চাইলেন। কিন্তু নচিকেতা সব কিছু প্রত্যাখ্যান করলেন। নচিকেতা কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান। নচিকেতার এই মনোভাব দেখে যম সন্তুষ্ট হলেন এবং শেষপর্যন্ত নচিকেতাকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করলেন।

আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুরের অগ্রভাগের মতোই তীক্ষ্ণ। একমাত্র দুঃসাহসী, সবল ও দৃঢ়সংকল্প মানুষই এই পথের পথিক হতে পারে। এই পথ খুবই দুর্গম কিন্তু এই জ্ঞানই

সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র আত্মজ্ঞানই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। এর ফলে মানুষ অপরিসীম আনন্দ ও পরম শান্তি লাভ করে থাকে।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥২১

অন্বয়: অত্র (এই বিষয়ে); দেবৈরপি পুরা বিচিকিৎসিতম্ (দেবগণও পূর্বে সন্দেহ করেছেন); হি (যেহেতু); এষঃ ধর্মঃ অণুঃ (এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম); [সেহেতু] ন সুবিজ্ঞেয়ম্ (সহজবোধ্য নয়); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); অন্যং বরং বৃণীষ্ব (অন্য বর প্রার্থনা কর); মা (আমাকে); মা উপরোৎসীঃ (উপরোধ [অর্থাৎ পীড়াপীড়ি] করো না); মা (আমার প্রতি); এনম্ (এই বর [অর্থাৎ আমার কাছে এই বর প্রার্থনা]); অতি-সৃজ (ছেড়ে দাও)।
সরলার্থ: (যম বললেন :) হে নচিকেতা, তুমি যে প্রশ্ন করেছ সে বিষয়ে পূর্বে দেবতাদেরও সন্দেহ ছিল। এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। এ তত্ত্বকে আয়ত্ত করা কঠিন। তুমি এছাড়া অন্য যে কোনও বর চাইতে পার। এই বিষয়ে আমাকে আর পীড়াপীড়ি কর না। এই দায়িত্ব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।
ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় বর হিসাবে যম নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। নচিকেতা যদি এই যজ্ঞ তিনবার সম্পন্ন করে ধ্যানমগ্ন হন, তবে তিনি বিরাটের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। এ অতি উচ্চ অবস্থা ঠিকই, কিন্তু নচিকেতার কাছে এই অবস্থাও যথেষ্ট নয়। কারণ এই অবস্থা শাশ্বত নয়, ক্ষণস্থায়ী। এই অবস্থা যদি শাশ্বতও হত তাহলেও নচিকেতার কাছে তা গ্রহণীয় হত না। যদিও এই অবস্থায় প্রভূত শক্তির অধিকারী হওয়া যায় কিন্তু এই অবস্থাও এক ধরনের বন্ধন। নচিকেতার একমাত্র কাম্য মুক্তি। মুক্তি ছাড়া আর অন্য কিছুই তিনি চান না। এইজন্যই তিনি আত্মার স্বরূপ জানতে চান। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন মৃত্যুই কি সব কিছুর চরম পরিণতি? যদি তা না হয়, তবে মৃত্যুর পরে কি থাকে? আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তবে তার স্বরূপ কি? নচিকেতা তৃতীয় বর হিসাবে এই প্রার্থনাই যমের কাছে করেছিলেন।

প্রথমে যম নচিকেতাকে নানাভাবে পরীক্ষা করছেন। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন সর্বস্ব ত্যাগ। যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে সক্ষম তিনিই একমাত্র আত্মজ্ঞান অর্জন করেন। যম দেখতে চান নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত কিনা।

অন্য নানা ভাবেও যম নচিকেতাকে পরীক্ষা করেন। এমনকি তিনি নচিকেতাকে নিরুৎসাহিতও করেন। তিনি বলেন নচিকেতার জিজ্ঞাস্য বিষয় আত্মতত্ত্ব অতীব দুরূহ। এমনকি দেবতাদের পক্ষেও এই জ্ঞান অর্জন করা সহজ নয়। আত্মাকে দেখা, শোনা বা স্পর্শ করা যায় না অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। কিন্তু এসব বলেও যম নচিকেতাকে নিরুৎসাহিত করতে পারেননি।

নানাভাবে যম নচিকেতাকে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিটি পরীক্ষাতেই নচিকেতা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই আত্মতত্ত্ব অতীব দুর্বোধ্য এবং সাধক তখনই এই তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যখন তীব্র আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা তাঁর মন প্রস্তুত হয়েছে। উপরি-উক্ত শ্লোকে একথা বোঝাবার জন্যই যম নচিকেতাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যা
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥২২

অন্বয়: মৃত্যো (হে মৃত্যু); অত্র (এই বিষয়ে); দেবৈঃ অপি (দেবতাদের দ্বারাও); কিল (নিশ্চয়ই); বিচিকিৎসিতম্ (সন্দেহ করা হয়েছিল); যৎ (যেহেতু); ত্বং চ (এবং আপনিও); আত্থ (বলছেন); ন সুজ্ঞেয়ম্ (সহজবোধ্য নয়); অস্য (এই [আত্মতত্ত্ব বিষয়ের]); বক্তা চ (উপদেষ্টা); ত্বাদৃক্ (আপনার মতো); অন্যঃ ন লভ্যঃ (আর কাউকে পাওয়া যাবে না); এতস্য তুল্যঃ (এর সমান); অন্যঃ কশ্চিৎ (অন্য কোনও); বরঃ ন(বর নেই)।

সরলার্থ: (উত্তরে নচিকেতা বললেন :) হে মৃত্যু, এমনকি দেবতারাও অতীতে এ বিষয়ে তর্কে নিযুক্ত ছিলেন একথা আপনার কাছ থেকেই জানলাম। আপনি আরো বললেন, আত্মাকে উপলব্ধি করা সহজ কাজ নয়। আবার আপনার মতো আচার্য পাওয়াও সহজ কাজ নয়। অতএব অন্য কোন বরই এই বরের তুল্য হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: আত্মার স্বরূপ জানা অতীব দুরূহ—এ কথা বলে যম নচিকেতাকে নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। এই বিষয়টি কতখানি দুর্বোধ্য তার আভাস দিতে গিয়ে যম বললেন —এই জ্ঞান দেবতাদেরও সম্পূর্ণ আয়ত্তে নয়। যম অবশ্য নচিকেতাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু এসব শুনেও নচিকেতা নিজের লক্ষ্য থেকে একটুও সরে গেলেন না। তিনি বললেন বিষয়টি যদি সহজই হত তবে তিনি যমকে এত চাপ দিতেন না। তাছাড়া বিষয়টি মৃত্যুসংক্রান্ত। আত্মা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে মৃত্যুর পরেও কি তার অস্তিত্ব

থাকে? এমন একটি প্রশ্ন যা নিয়ে শুধু মানুষই নয় দেবতারাও নিজেদের মধ্যে তর্কযুদ্ধে যুক্ত। মৃত্যুর অধিপতি যম অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। এই জন্যই নচিকেতা যমের অনুরোধ সত্ত্বেও অন্য বর প্রার্থনা করতে রাজী হননি। নচিকেতা আরও জানতেন যে এই বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর কোনকিছুর সাথেই আত্মজ্ঞানের তুলনা করা চলে না। নচিকেতার চরিত্রের অসাধারণ দিক হল তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং ঘৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥২৩

অন্বয়: শতায়ুষঃ (শতবৎসর যাদের আয়ু এরূপ); পুত্রপৌত্রান্ (পুত্র ও পৌত্রগণ); বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর); বহূন্ (অনেক); পশূন্ (গবাদি পশুসমূহ); হস্তি-হিরণ্যম্ (হাতি ও স্বর্ণসম্পদ); অশ্বান্ (অশ্বসমূহ); ভূমেঃ (পৃথিবীর); মহৎ (বিস্তীর্ণ); আয়তনম্ (ভূখণ্ড, সাম্রাজ্য); বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর); স্বয়ং চ (এবং তুমি নিজে); যাবৎ শরদঃ (যত শরৎ ঋতু [অর্থাৎ যত বৎসর]); ইচ্ছসি ([বাঁচতে] ইচ্ছা কর); জীব ([ততদিন] বেঁচে থাক)।
সরলার্থ: (যম নচিকেতাকে বললেন:) তুমি শতবর্ষ পরমায়ুবিশিষ্ট পুত্র এবং পৌত্রাদি প্রার্থনা করতে পার। বহু সংখ্যক গবাদি পশু, হাতি, ঘোড়া এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণসম্পদও প্রার্থনা করতে পার। এমনকি বিশাল সাম্রাজ্যও প্রার্থনা করতে পার। সুস্থ সবল দেহে তুমি যতদিন ইচ্ছা পরমায়ু ভোগ কর।
ব্যাখ্যা: আত্মজ্ঞান বড়ই দুর্বোধ্য। প্রথমে এই কথা বলে যম নচিকেতাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন। তাতে খুব একটা সাড়া পাওয়া গেল না দেখে তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। যম তখন বিবিধ প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। এই ভাবেই নচিকেতার পরীক্ষা চলল। প্রকৃত আচার্য এই ভাবেই শিষ্যের যোগ্যতা যাচাই করে দেখেন।

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥২৪

অন্বয়: যদি (যদি); এতৎ-তুল্যম্ (এর সমান); বরম্ (বর [অর্থাৎ অন্য কোন বর]); মন্যসে (বিবেচনা কর); বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর); বিত্তম্ (প্রভূত সম্পদ); চিরজীবিকাং চ (এবং চিরজীবন [অর্থাৎ দীর্ঘায়ু]); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); ত্বম্ (তুমি); মহাভূমৌ (বিশাল

ভূখণ্ডে); এধি ([রাজা]হও); ত্বা (তোমাকে); কামানাম্ ([মানুষ ও দেবতার] আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের); কামভাজম্ (ভোগে সমর্থ); করোমি (করছি)।

সরলার্থ: যম আরো বললেন, আমি তোমাকে যে বর দিতে চাইলাম এর তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি চাও তবে তাও প্রার্থনা করতে পার। সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু, সাম্রাজ্য এবং দেবতা ও মানুষের কাম্য অন্য যে কোন বস্তুই তুমি প্রার্থনা করতে পার। তুমি যাতে এই সব বস্তু নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পার আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব।

ব্যাখ্যা: যম এখনও নচিকেতাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে চলেছেন। তিনি নচিকেতাকে অনেক লোভনীয় বস্তু দিতেও চেয়েছেন। এসব ছাড়াও যদি নচিকেতা এর তুল্য অন্য কোন বস্তু লাভে ইচ্ছুক হন তবে তা দিতেও যম প্রস্তুত। দীর্ঘ আয়ু, অগণিত পুত্র, পৌত্রাদি, ধনসম্পদ, সাম্রাজ্য—এইসব তিনি আগেই দিতে চেয়েছেন। এককথায় দেবতা ও মানুষের ভোগ্য যা কিছু কামনার জিনিস আছে নচিকেতা চাইলেই তা পেতে পারেন। আর নচিকেতা যাতে এইসব বস্তু নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারেন যম সেই আশ্বাসও দিলেন।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ॥২৫

অন্বয়: মর্ত্যলোকে (এই পৃথিবীতে); যে যে কামাঃ (যে সকল ভোগ্যবস্তু); দুর্লভাঃ (দুষ্প্রাপ্য); [সেই] সর্বান্ (সকল); কামান্ (কাম্যবস্তু); ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে); প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর); ইমাঃ (এই সকল); স-রথাঃ (রথে আরূঢ়া); স-তূর্যাঃ (বীণাবাদন রতা); রামাঃ (অপ্সরাগণ [তোমার সম্মুখে]); ঈদৃশাঃ (এরূপ রমণীবৃন্দ); মনুষ্যৈঃ (মানুষের দ্বারা); লম্ভনীয়াঃ ন হি (লাভ করা সম্ভব নয়); মৎ প্রত্তাভিঃ (আমার প্রদত্ত); আভিঃ (এদের দ্বারা [অর্থাৎ এই তরুণীদের দ্বারা]); পরিচারয়স্ব (নিজের সেবা করাও); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); মরণম্ (মৃত্যুবিষয়ে [অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে]); মা অনুপ্রাক্ষীঃ (প্রশ্ন করো না)।

সরলার্থ: যম আরো বলে চললেন, যে-সব ভোগ্যবস্তু দুর্লভ তুমি যদি সেইসব বস্তু পেতে চাও তবে তুমি তাও পেতে পার। যেমন, রথে উপবিষ্টা বীণাবাদনরতা তরুণী। সাধারণ

মানুষের পক্ষে এরকম বস্তু পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি চাইলে এই রকম তরুণীরা তোমার সেবা করবে। কিন্তু হে নচিকেতা, মৃত্যু সংক্রান্ত প্রশ্ন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না (অর্থাৎ মৃত্যুই কি সবকিছুর শেষ পরিণতি, নাকি মৃত্যুর পরও আত্মা বলে কিছু থাকে?)।

ব্যাখ্যা: যম নচিকেতাকে নানাভাবে যাচাই করে দেখছেন। অধিকাংশ মানুষের কাছে যা অত্যন্ত লোভনীয় এবং দুষ্প্রাপ্য তিনি তা নচিকেতাকে দিতে চান। যম নচিকেতাকে বললেন, 'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব আছে, কি নেই, তা জেনে তোমার কি লাভ?' এরূপ প্রশ্ন সত্যি অর্থহীন। কাকের দাঁত আছে কিনা জানতে চাওয়া যেমন অর্থহীন তোমার এই প্রশ্নও ঠিক সেইরকমই নিরর্থক। যম নচিকেতাকে কত ভাবেই না প্রলুব্ধ করছেন, তা বোঝাতেই আচার্য শঙ্কর এই সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেৰ, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥২৬

অন্বয়: অন্তক (হে মৃত্যু, যমরাজ, আপনার কথিত ভোগ্য বস্তু সকল); শ্বঃ (আগামীকাল); অভাবাঃ (থাকবে না); মর্ত্যস্য (মানুষের); সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ (সকল ইন্দ্রিয়ের); যৎ এতৎ তেজঃ (এই যে শক্তি [এই সকল ভোগ তাকে]); জরয়ন্তি (ক্ষয় করে); অপি (অধিকন্তু); সর্বম্ (সকল); জীবিতম্ (জীবন); অল্পম্ এব (নিতান্তই অল্প); বাহাঃ (রথাদি বাহন সকল); তব এব (আপনারই থাকুক); নৃত্যগীতে (নৃত্য ও সঙ্গীত); তব (আপনারই)।

সরলার্থ: (নচিকেতা বললেন:) হে মৃত্যু, আপনি যে সকল ভোগ্যবস্তু আমাকে দিতে চান সে সবই ক্ষণস্থায়ী—আজ আছে, কালই হয়তো থাকবে না। এই সব ভোগ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে ক্ষয় করে। আর আপনি যে দীর্ঘজীবন আমাকে দিতে চান, অনন্তকালের তুলনায় তা নিতান্তই স্বল্প। অতএব রথ, নর্তকী, গায়িকাকুল—এসব আপনারই থাকুক।

ব্যাখ্যা: এবারে নচিকেতা যথার্থ সাহসের পরিচয় দিলেন। যমের সব লোভনীয় প্রস্তাবকে যুক্তির সাহায্যে উড়িয়ে দিলেন। নচিকেতা বললেন, এ জগতে সবকিছুই 'শ্বোভাবা'—ক্ষণস্থায়ী। যা আজ আছে কাল হয়তো তা নেই অর্থাৎ এদের স্থায়িত্ব কতদিন তা কেউ জানে না। যা অনিত্য তা তিনি চান না। যা নিত্য তাই শুধু তিনি চান।

নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচারের দ্বারা অনিত্য বস্তুকে ত্যাগ করে নিত্য বস্তুকে গ্রহণ করতে হবে। নচিকেতা তাই সব অনিত্য বস্তুকে উপেক্ষা করেছিলেন। আত্মজ্ঞান লাভকেই তিনি তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত বলে মনে করেছেন। এই লক্ষ্যে তিনি অচল, অটল। এই লক্ষ্যপথের সমস্ত বাধাকে তিনি নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনূষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥২৭

অন্বয়: মনুষ্যঃ (মানুষ); বিত্তেন (ধনসম্পদের দ্বারা); ন তর্পণীয়ঃ. (তৃপ্তিলাভ করে না); ত্বা (আপনাকে); চেৎ (যখন); অদ্রাক্ষ্ম (দেখেছি); বিত্তম্ (ধনসম্পদ); লপ্স্যামহে (পাব); স্বম্ (আপনি); যাবৎ (যতদিন); ঈশিষ্যসি (শাসন করবেন [অর্থাৎ যমপদে বর্তমান থাকবেন]); জীবিষ্যামঃ (বেঁচে থাকব); তু (কিন্তু); সঃ বরঃ এব (সেই বরই); মে (আমার); বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়)।

সরলার্থ: ধনসম্পদ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। আপনাকে যখন দেখেছি তখন আমি নিশ্চয়ই ধনসম্পদের অধিকারী হব। আর যতদিন আপনি যমপদে অধিষ্ঠিত থেকে শাসন করবেন ততদিন আমরা নিশ্চয়ই জীবিত থাকব। সুতরাং এরজন্য অন্য কোন বর চাইবার দরকার নেই। কাজেই আত্মার তত্ত্ব বিষয়ক বরই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।

ব্যাখ্যা: নচিকেতা যুক্তির সাহায্যে যমের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করছেন। যম তাঁকে ধনসম্পদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নচিকেতা জানেন যে, ধনসম্পদ মানুষকে কখনও চিরস্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। ধনী ব্যক্তিমাত্রই যে সুখী হবেন এমন কোন কথা নেই। পার্থিব জীবনের উন্নতি সম্পর্কে নচিকেতার মনে বিন্দুমাত্র মোহ নেই, কারণ পার্থিব বস্তু স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী। ইন্দ্রিয়-ভোগসুখ দুদিনের জন্য। তাই এ জাতীয় বস্তু লাভে নচিকেতা আগ্রহী নন। যা চিরন্তন যা শাশ্বত তা লাভ করাই নচিকেতার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

যেহেতু ভাগ্যক্রমে নচিকেতা যমরাজকে সামনাসামনি দেখেছেন, সেহেতু ধনসম্পদ বা যে কোন পার্থিব সুখের বস্তু তিনি ইচ্ছা করলেই পেতে পারেন। এই কারণের জন্যই যম তাঁকে যে ধনরত্ন দিতে চেয়েছিলেন তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জানেন যমরাজ তাঁর প্রতি প্রসন্ন। তিনি প্রসন্ন থাকলে সব বস্তুই নচিকেতার হাতের মুঠোর মধ্যে। তাছাড়া, যতদিন যমরাজ শাসন করবেন : ততদিন নচিকেতা মৃত্যুকেও ভয় করেন না। মনে রাখতে হবে যে যমরাজ নিজেই ছিলেন আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। সৎ কাজ করার ফলেই তিনি মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করেন। দেবতা হিসাবে তিনি কিছু শক্তিরও অধিকারী, কিন্তু তাও ক্ষণস্থায়ী।

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্

অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥২৮

অন্বয়: ক্বধঃস্থঃ [কু-অধঃ-স্থঃ] (স্বর্গাদি লোক অপেক্ষা নিম্নতর অর্থাৎ পৃথিবীতে অবস্থিত); জীর্যন্ মর্ত্যঃ (জরামরণশীল মানুষ); অজীর্যতাম্ (জরাশূন্য, অজর); অমৃতানাম্ (অমর [দেবগণের]); উপেত্য (নিকট উপস্থিত হয়ে); প্রজানন্ (সম্যক্‌রূপে জেনে [তাঁদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ হতে পারে জেনে]); বর্ণ-রতি-প্রমোদান্ (শারীরিক সৌন্দর্য ও ক্রীড়া-কৌতুকজনিত সুখ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখ]); অভিধ্যায়ন্ (অনিত্যতা চিন্তা করে); অতিদীর্ঘে (অতি দীর্ঘ); জীবিতে (জীবনে); কঃ (কে); রমেত (আনন্দ অনুভব করে)।

সরলার্থ: এই পৃথিবীতে সকল প্রাণীই জরা এবং মৃত্যুর অধীন এবং ইন্দ্রিয়সুখমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, এ কথা জেনেশুনে কে আর দীর্ঘজীবন কামনা করে? বিশেষত যখন জানতে পেরেছি যে, এইসব অমর দেবতা আরও উৎকৃষ্ট বস্তু (যথা আত্মজ্ঞান) দিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা: অনিত্য বস্তু কারোরই কাম্য হওয়া উচিত নয়—এখানে একথাই স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে। যম নচিকেতাকে নানা লোভনীয় বস্তু দিতে চাইলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তিনি জানেন, এসব নশ্বর। কোন এক দিন তাঁর নিজেরও মৃত্যু হবে এবং ধনসম্পদ, ভোগ্যবস্তু-সমূহ বিনষ্ট হবে। এসব বস্তু চিত্তাকর্ষক হলেও চিরস্থায়ী নয়। এইসকল বস্তুর অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করে এই ভোগ্যবস্তু-সমূহের প্রতি নচিকেতার তীব্র অনীহা জন্মে। যমকে দেখার পরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি তাঁর ঘৃণা আরো বেড়ে গেছে। এতদিন তিনি মর্তবাসীদের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। এই প্রথম তিনি একজন দেবতার দর্শন পেয়েছেন। যম ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে সক্ষম একথা জেনেও নচিকেতা যদি ভোগ্যবস্তুর পেছনে ছোটেন তবে তা নেহাৎই বোকামি। মূল্যবান রত্ন ফেলে কেউ কি মেকি গয়না নিতে চান? নিত্য-অনিত্যের পার্থক্য জানার পর কোন বুদ্ধিমান লোকই অনিত্য বস্তু ভোগ করার জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করেন না।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥২৯

অন্বয়: মৃত্যো (হে মৃত্যু); যস্মিন্ (যে বিষয়ে); ইদম্ (এই অর্থাৎ মৃতার পরে আত্মার অস্তিত্বকে); বিচিকিৎসন্তি ([লোকে] সন্দেহ করে থাকে); (সেই) মহতি সাম্পরায়ে (মহান

পরলোক বিষয়ে); যৎ (যে জ্ঞান); তৎ নঃ ব্রূহি (তা আমাদের বলুন); অয়ং যঃ বরঃ (এই যে বর); গূঢ়ম্ (নিগূঢ়); অনুপ্রবিষ্টঃ (সাধারণের বোধগম্য নয়); তস্মাৎ (তা থেকে); অন্যম্ (ভিন্ন কিছু); নচিকেতা ন বৃণীতে (নচিকেতা প্রার্থনা করে না)।

সরলার্থ: হে মৃত্যু, আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে মানুষের মধ্যে নিরন্তর তর্ক-বিতর্ক চলছে। আত্মার অস্তিত্বের বিষয়টি এক রহস্য। এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে মুক্তি বা মোক্ষের প্রশ্ন। আপনি অনুগ্রহ করে এই রহস্যই (আত্মতত্ত্ব) আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন। নচিকেতা এছাড়া অন্য কোন বর চায় না।

ব্যাখ্যা: নচিকেতার একমাত্র কাম্য আত্মজ্ঞান। ইন্দ্রিয়সুখ বা অন্য কোন অনিত্য বস্তুতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? নচিকেতা কেবলমাত্র এই প্রশ্নেরই উত্তর জানতে চান। মৃত্যু কি মানুষের জীবনের শেষ কথা, নাকি এক পরিবর্তন মাত্র—এই ছিল নচিকেতার জিজ্ঞাস্য। নচিকেতা বললেন : 'আত্মজ্ঞান ছাড়া আমি আর অন্য কিছু চাই না।' এ কিন্তু নচিকেতার দম্ভোক্তি নয়। একথার মধ্য দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নচিকেতার তীব্র ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥১

অন্বয়: শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর বস্তু); উত (এবং); প্রেয়ঃ (সুখকর বস্তু); অন্যৎ এব (নিঃসন্দেহে ভিন্ন); তে উভে (তারা উভয়ে); নানার্থে (উদ্দেশ্যের বিভিন্নতায়); পুরুষম্ (মানুষকে); সিনীতঃ (আবদ্ধ করে); তয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে); শ্রেয়ঃ আদদানস্য (যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন); সাধু ভবতি (মঙ্গল হয়); যঃ (যিনি); প্রেয়ঃ উ (প্রেয়কেই); বৃণীতে (বরণ করেন); অর্থাৎ (পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ থেকে); হীয়তে (ভ্রষ্ট হন)।

সরলার্থ: 'শ্রেয়' বা কল্যাণকর এবং 'প্রেয়' বা সুখকর—এ দুই ভিন্ন বস্তু। তারা যে উদ্দেশ্য সাধন করে তা-ও ভিন্ন। কিন্তু দুটিই বন্ধন, যদিও বন্ধন কথাটি এখানে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর মঙ্গল হয়। কিন্তু যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি জীবনের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যান।

ব্যাখ্যা: জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী? মোক্ষলাভ। আমরা জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ। আমরা বারবার জন্মাই, বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হই। কারণ আমরা অজ্ঞান। নিজেদের প্রকৃত পরিচয় আমরা জানিনা। ফলে আমাদের মধ্যে সবসময়ই একটা অভাববোধ কাজ করে। সবসময়েই আমরা কিছু না কিছু চাইছি। আমাদের হয়তো অনেক আছে, কিন্তু তাতেও আমরা খুশি নই। আমাদের বাসনার কোন শেষ নেই। ফলে আমরা কখনও সুখী হতে পারি না। আর আমাদের এই অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করতে গেলেই একটি শরীর থাকতে হবে, আর শরীর থাকার অর্থই হল জন্ম নেওয়া। রাত্রি যেমন দিনকে অনুসরণ করে, মৃতও তেমনি জন্মকে অনুসরণ করে। এইভাবে জন্মমৃত্যুর দোলায় আমরা দুলতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা উপলব্ধি করি আত্মাতেই সব রয়েছে, আমাদের আর চাইবার কিছু নেই। নিজ আত্মাকে জানলেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। আমাদের জীবনের লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা।

মানবজীবনের এই হল পরমপুরুষার্থ বা পরমকল্যাণ। 'শ্রেয়' বলতে যম এই পরমপুরুষার্থকেই বোঝাচ্ছেন।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছু চান না। যম যাকে 'প্রেয়' বা. আপাতসুখকর বলেছেন তার প্রতি তাঁদের কোন মোহ নেই। তাঁরা বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল। তাই তাঁরা 'প্রেয়'কে ত্যাগ করেন। তাঁরা জানেন 'প্রেয়' অর্থাৎ যা আপাতমধুর তা ক্ষণস্থায়ী। তাঁরা একমাত্র নিত্য বস্তুই পেতে চান। কিন্তু এই নিত্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা করাও তো একরকমের বন্ধন। কিন্তু এই বন্ধনই মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেয়। এই পথ খুবই দুর্গম। মোক্ষলাভেই মানুষ চিরন্তন আনন্দ ও শান্তি লাভ করে।

আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা সুখপ্রদ বা 'প্রেয়'কে চান। ইন্দ্রিয়সুখ সহজেই এইসব মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা খুব অল্পসময়ের জন্য সুখী হন। তাঁরা অনিত্য অর্থাৎ যা ক্ষণস্থায়ী সেই সব বস্তুই পেতে চান।

নচিকেতা প্রথম শ্রেণীর দলভুক্ত। তবু যম তাঁকে সতর্ক করেছেন যাতে নচিকেতা ভবিষ্যতেও কোনদিন প্রলোভনে না পড়েন। একটা কথা আছে না, 'স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।'

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥২

অন্বয়: শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (মঙ্গলকর এবং সুখপ্রদ [অর্থাৎ আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব]); মনুষ্যম্ (মানুষের কাছে); এতঃ (উভয়ে একসঙ্গে উপস্থিত হয়); ধীরঃ (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); তৌ সম্পরীত্য (উভয়কে সম্যক্ বিচার করে); বিবিনক্তি (পৃথক করেন); ধীরঃ (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); প্রেয়সঃ (প্রিয় থেকে); শ্রেয়ঃ হি অভিবৃণীতে (শ্রেয়কে উত্তম জেনে বরণ করেন); মন্দঃ (অদূরদর্শী ব্যক্তি); যোগক্ষেমাৎ ([দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের] বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য); প্রেয়ঃ (আপাতসুখকর বস্তু); বৃণীতে (বরণ করেন)।

সরলার্থ: মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—"শ্রেয়' (শুভ) এবং 'প্রেয়' (সুখপ্রদ)। সূক্ষ্মভাবে এদের গুণাগুণ বিচার করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রেয়র পথকেই গ্রহণ করেন। অদূরদর্শী ব্যক্তি কিন্তু প্রেয় বা আপাতসুখপ্রদ বস্তুকেই গ্রহণ করেন। কারণ তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা।

ব্যাখ্যা: এখানে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের যে পথ অর্থাৎ শ্রেয়র পথকেই গ্রহণ করেন। একে 'শ্রেয়' বলা হয় কারণ চূড়ান্ত বিচারে এই হল পরমকল্যাণ। শ্রেয়র পথ সহজসাধ্য নয়, এ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই পথই গ্রহণ করেন। কারণ একমাত্র এই পথেই চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। এই পথ মানুষকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় যার থেকে মহৎ আর কিছু নেই। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমাদের এই চারিত্রিক পূর্ণতা অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ইন্দ্রিয়সুখেই মত্ত। কারণ এই সুখ আপাতমধুর এবং খুব চিত্তাকর্ষক। এই ভোগ্যবস্তু-সমূহ সহজলভ্য। কিন্তু চারিত্রিক পূর্ণতা এত সহজে লাভ করা যায় না। এর জন্য মানুষকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষরা এই পূর্ণতা অর্জনে আগ্রহী নন। কারণ এঁরা নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ।

এই দুই শ্রেণীর মানুষের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। প্রথম শ্রেণীর মানুষেরা সংখ্যায় নিতান্তই অল্প কিন্তু এঁরাই মানবজাতির গৌরব। মৃত্যুর পরেও বহুকাল পর্যন্ত তাঁদের প্রভাব থেকে যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁরা সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো; মৃত্যুর পরে মানুষ সহজেই তাঁদের ভুলে যায়।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥৩

অন্বয়: নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); সঃ ত্বম্ (সেই তুমি [অর্থাৎ আমি বারবার প্রলুব্ধ করা সত্ত্বেও তুমি সব প্রত্যাখ্যান করেছ]); প্রিয়ান্ (প্রিয়জন); প্রিয়রূপান্ চ (এবং আপাতসুখপ্রদ); কামান্ (ভোগ্যবস্তুসমূহের); অভিধ্যায়ন্ (অসারত্ব বিবেচনা করে); অত্যস্রাক্ষীঃ (প্রত্যাখ্যান করেছ); এতাম্ (এই); বিত্তময়ীং সৃঙ্কাম্ (জাগতিক ভোগবিলাসের পথ); যস্যাম্ (যাতে); বহবঃ (অনেক); মনুষ্যাঃ (মানুষ); মজ্জন্তি (নিমজ্জিত হয়, মগ্ন হয়); ন অবাপ্তঃ ([তা] তুমি গ্রহণ করনি)।

সরলার্থ: হে নচিকেতা, আমি তোমাকে নানাভাবে বারবার প্রলুব্ধ করতে চেয়েছি কিন্তু বারবারই তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। প্রিয়জন বা আকর্ষণীয় কোন বস্তুই তোমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এ জগৎসংসার যে অনিত্য একথা তোমার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি

সহজেই উপলব্ধি করে থাকে। তাই তুমি সবকিছু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জাগতিক ভোগবিলাসে মগ্ন। কারণ তাদের কাছে এই জগৎসংসারই একমাত্র সত্য।

ব্যাখ্যা: 'সঃ ত্বম্—সেই তুমি'। এই উক্তির মধ্য দিয়ে যম নচিকেতার নির্লোভ স্বভাবের প্রশংসা করছেন। এই জগতের মানুষ যে সব বস্তু পাবার জন্য লালায়িত সে সবই যম নচিকেতাকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নচিকেতা তা প্রত্যাখ্যান করতে একটুও ইতস্তত বোধ করেননি। 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়'—এই দুইকে কখনও একসঙ্গে লাভ করা যায় না। যদি কেউ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নত হতে চায় তবে তাকে বিষয় বাসনা ত্যাগ করে আত্মসংযম অভ্যাস করতে হবে। খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়, বন্ধু—এ সবই দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন করে। মানুষের এই সব বিষয়ের প্রতি দুর্বলতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এককথায় বিলাসের সব উপকরণই মানুষের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করে। দেহমনের সীমার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে সেকথা তারা ভাবতেই পারে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন—নচিকেতা। স্থূল ইন্দ্রিয়সুখে এই শ্রেণীর মানুষের কোন আগ্রহ নেই। কারণ তা ক্ষণস্থায়ী। তাঁরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হতে চান। কারণ এ সম্পদ নিত্য, শাশ্বত। এই সম্পদের (ব্রহ্মানন্দ) কাছে জাগতিক ভোগ সুখ তাঁদের আলুনি বলে বোধ হয়। প্রথমটিকে পেতে গেলে দ্বিতীয়টিকে ছাড়তে হবে। তাই তাঁরা সানন্দে ক্ষণস্থায়ী সুখকে ত্যাগ করেন। ত্যাগের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে ত্যাগ করা।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত॥৪

অন্বয়: অবিদ্যা (জাগতিক বিদ্যা [যা শুধু ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধান দেয়]); যা চ বিদ্যা (এবং যা অধ্যাত্মবিদ্যা [যা মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়]); এতে (এই দুটি); দূরম্ (অত্যন্ত); বিপরীতে (পরস্পর ভিন্ন); বিষূচী (ভিন্নফলপ্রদ); ইতি (এভাবে); জ্ঞাতা (পরিচিত); নচিকেতসম্ (নচিকেতাকে); বিদ্যাভীপ্সিনম্ (বিদ্যাভিলাষী); মন্যে (মনে করি); (যেহেতু) বহবঃ (অনেক); কামাঃ (চিত্তাকর্ষক ভোগ্যবস্তুসকল); ত্বা (তোমাকে); ন অলোলুপন্ত (প্রলুব্ধ করেনি)।

সরলার্থ: জাগতিক বিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যা হল দুটি বিপরীত মেরু। এই বিষয় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের ফলও পৃথক। একথা সর্বজনবিদিত। নচিকেতা, আমি তোমাকে অধ্যাত্মবিদ্যা লাভে আগ্রহী বলেই মনে করি। কারণ আমি তোমাকে নানা চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে বিষয়ে তোমার কোন আগ্রহ দেখিনি।

ব্যাখ্যা: 'বিদ্যা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান এবং 'অবিদ্যা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল অজ্ঞান। জ্ঞান বলতে এখানে 'আত্মজ্ঞান'কে বোঝান হয়েছে, যে-জ্ঞান মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই জ্ঞানলাভেই মানুষ মুক্তি লাভ করে এবং এর ফলেই মানুষ পরা শান্তি ও অপরিসীম আনন্দ লাভ করে। বিবেক বৈরাগ্য এবং আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারা এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কিন্তু অবিদ্যা হল ঠিক এর বিপরীত। এই অবস্থায় মানুষ কামনা-বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছোটে। এসব মানুষের জীবনে বিবেক-বৈরাগ্য বা আত্মসংযমের কোন স্থান নেই। এরকম মানুষ শুষ্ক পণ্ডিত হতে পারে কিন্তু সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়। এই পাণ্ডিত্যে দ্বারা সে তার অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করে।

যম এখানে নচিকেতার প্রশংসা করছেন। এর মাধ্যমে তিনি ত্যাগেরই মহিমা কীর্তন করছেন। ঈশ্বর এবং বিষয়, এই দুইকে একসঙ্গে ভজনা করা যায় না। যিনি বিষয়ানন্দকেই জীবনের সব বলে মনে করেছেন তিনি ব্রহ্মানন্দকে লাভ করতে পারেন না। আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং পার্থিব সুখ—এ দুটো এক সঙ্গে লাভ করা যায় না। যদি কেউ একটিকে পেতে চায়, তবে তাকে অন্যটি ছাড়তে হবে। অর্থ, নাম, যশ, স্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি যদি কারো কাম্য হয়, তবে বুঝতে হবে আত্মজ্ঞানলাভে সে আগ্রহী নয়। বিদ্যার পথ অর্থাৎ ত্যাগের এই দুর্গম পথ তার জন্য নয়।

এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে কোনরকম সামঞ্জস্য করা কি সম্ভব? আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তা কি ভাবে সম্ভব? যখন কেউ মনে করেন এই জগৎসংসারে ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু, আর তিনি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ তখনই এই সামঞ্জস্য সম্ভব। আর ত্যাগেরই আর এক নাম অনাসক্তি। অর্থাৎ এই জগৎ সংসারের সবকিছু ঈশ্বরের। অনাসক্তি ছাড়া এই ভাব আয়ত্ত করা যায় না। এই শ্লোকে যম তাই ত্যাগের মাহাত্ম্যই বর্ণনা করেছেন।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৫

অন্বয়: অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অজ্ঞানে); বর্তমানাঃ (ডুবে আছে [অর্থাৎ জাগতিক ভোগসুখে নিমজ্জিত]); স্বয়ম্ (তারা নিজেরাই); ধীরাঃ (বুদ্ধিমান); পণ্ডিতং মন্যমানাঃ (নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ বলে মনে করে); মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ); দন্দ্রম্যমাণাঃ (সংসারের [নানা কুটিল পথ প্রাপ্ত হয়ে]); পরিয়ন্তি (ইতস্তত ভ্রমণ করে [অর্থাৎ বারবার যাওয়া আসা করে]); যথা (যেরূপ); অন্ধেন এব (অন্ধেরই দ্বারা); নীয়মানাঃ (পরিচালিত); অন্ধাঃ (অন্ধগণ)।

সরলার্থ: যারা জাগতিক ভোগসুখে মগ্ন তারা নিজেদের বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ বলে মনে করে। তারা সেই সব অন্ধ ব্যক্তির মতো যারা নিজেরাই অপর অন্ধের দ্বারা চালিত হয় এবং দুঃখতাড়িত হয়ে বারবার যাওয়া আসা করে।

ব্যাখ্যা: এখানে সংসারী লোকেদের দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ অবিদ্যার পথ অর্থাৎ প্রেয়র পথ অনুসরণ করে। পার্থিব সুখভোগই তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য। জাগতিক বিষয়ই তাদের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। যদিও তারা নিজেদের বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ বলে মনে করে কিন্তু আসলে তারা মূর্খ। এরা অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়। এ যেন এক অন্ধ ব্যক্তি আর এক অন্ধ ব্যক্তিকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ সংসারের কত দুঃখই না তাদের ভোগ করতে হয়। মৃত্যু, ব্যাধি, দারিদ্র, দুর্ভাগ্য —এইসব তাদের পিছনে সবসময় ধাওয়া করে বেড়ায়। এই জগতে তাদের যাত্রাপথ বিপদসঙ্কুল। তবু তারা এই পথকেই বেছে নেয়। ভাগ্যের পরিহাস এমনই।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥৬

অন্বয়: প্রমাদ্যন্তম্ (সংসারে আসক্তচিত্ত); বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ (ধনমোহে আচ্ছন্ন); বালং প্রতি (অপরিণত-বুদ্ধি বিবেকহীন লোকের নিকট); সাম্পরায়ঃ (পরলোক-প্রাপ্তির সাধন); ন ভাতি (প্রতিভাত হয় না); অয়ং লোকঃ (এই দৃশ্যমান জগৎ [কেবল আছে]); পরঃ (পরলোক); ন অস্তি (নেই); ইতি মানী (এরূপ যে মনে করে); পুনঃ পুনঃ (বারে বারে); মে (আমার); বশম্ (বশ্যতা, অধীনতা); আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ: যম বলছেন, সংসারী মানুষ মাত্রই নিজ নিজ পরিবারের প্রতি অতিশয় আসক্ত। অনেক সময়েই তারা তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে গর্ব অনুভব করে। সংসার তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। তাদের বুদ্ধি অপরিণত। তারা তাদের চারপাশের জগৎকেই একমাত্র সত্য বলে

মনে করে। এর বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, সে খোঁজ তারা রাখে না। ইহলোকই আছে পরলোক বলে কিছু নেই—যে-ব্যক্তি এ কথা মনে করে সে বারবার আমার অধীন হয়। অর্থাৎ তার পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ঘটে থাকে।

ব্যাখ্যা: কিছু সংসারী মানুষ আছে যারা কখনও পরলোকের কথা চিন্তা করে না। পরলোক বলে যে কিছু আছে তা তারা বিশ্বাস করে না। কাজেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য কোন প্রস্তুতি তাদের নেই। কেবলমাত্র ইহলোক নিয়েই তারা মত্ত। যে জগৎকে তারা দেখতে পায়, স্পর্শ করতে পারে এবং যেখানে তাদের জীবন কাটে, একমাত্র সেই জগৎকেই তারা সত্য বলে মনে করে। যেহেতু অন্য জগৎকে তারা দেখতে পায় না, সেহেতু তাদের কাছে সে জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথাও নেই। তাদের সন্তানসন্ততি, ধনদৌলত ইত্যাদি আছে। এছাড়াও ভোগ্যবস্তুর বিপুল আয়োজন তাদেরই জন্য এবং তা পেয়েই তারা সুখী। এই জগতের যাদুস্পর্শে তারা নিজেদের স্বরূপকে ভুলে রয়েছে। তাদের অবস্থা চিন্তাশক্তিহীন শিশুর মতো। জীবনের উদ্দেশ্য যে 'আত্মজ্ঞান'লাভ একথা তারা স্বীকার করে না। অথচ মানুষই একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম। মানুষ চিন্তা করতে পারে, বিচার বুদ্ধির দ্বারা সত্য-অসত্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মানুষই প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করতে পারে। যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট নয় তার মানবজন্ম বৃথা। ইন্দ্রিয়সুখভোগে জীবন কাটানো আত্মহত্যারই সামিল। জন্মমৃত্যুর চক্রে তাকে ঘুরপাক খেতে হয়। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় মনে রাখেন। আর এই লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ। তিনি কোন অবস্থাতেই এই লক্ষ্য থেকে সরে আসেন না। যে সব মানুষ এইভাবে জীবনকে চালনা করতে অক্ষম, তারা নির্বোধ ও অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাঽঽ-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।৭

অন্বয়: যঃ (যিনি [অর্থাৎ আত্মা]); বহুভিঃ (অনেকের পক্ষে); শ্রবণায় অপি (শ্রবণের নিমিত্তও); ন লভ্যঃ (সুলভ নন [অর্থাৎ আত্মার বিষয়ে অনেকে শোনারও সুযোগ পান না]); যম্ (যাঁর বিষয়ে); শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করেও); বহবঃ (অনেকে); ন বিদ্যুঃ (বুঝতে পারেন না); অস্য (এই আত্মার); বক্তা (উপদেষ্টা, আচার্য); আশ্চর্যঃ (বিরল); কুশলঃ (নিপুণ

ব্যক্তিই); লব্ধা (আত্মজ্ঞান লাভ করেন); কুশল-অনুশিষ্টঃ (নিপুণ আচার্যের দ্বারা উপদিষ্ট); আশ্চর্যঃ (বিরল কোন বিশেষ অধিকারীই); জ্ঞাতা (জ্ঞানবান হন)।

সরলার্থ: আত্মার বিষয়ে অনেকে শোনারও সুযোগ পান না। আবার শুনেও অনেকে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেন না। আসলে আত্মা সম্পর্কে শিক্ষাদানের যোগ্যতা অতি অল্প সংখ্যক মানুষেরই থাকে। কাজেই এই আত্মজ্ঞান অতি নিপুণ শিক্ষার্থীই লাভ করতে পারেন। এই কারণেই নিপুণ আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা সত্যিই বিরল।

ব্যাখ্যা: এই জগতে অধিকাংশ মানুষই প্রেয় বা ক্ষণস্থায়ী সুখের পিছনে ছুটে বেড়ান। অতি অল্পসংখ্যক মানুষই শ্রেয়কে চান। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার অযোগ্য। নচিকেতার মতো খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য ‘প্রেয়’ বা সুখপ্রদ বস্তুকে ত্যাগ করতে সক্ষম। অধিকাংশ মানুষই শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত। দেহমনের বাইরে অন্য কোনকিছুর অস্তিত্বকে তাঁরা স্বীকার করেন না। আত্মা সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় তাঁরা ক্লান্তি বোধ করেন অথবা এ তত্ত্বকে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। যাঁরা শ্রেয় এবং প্রেয়র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, যাঁরা প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করেছেন এবং আত্মসংযম আয়ত্ত করেছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন।

যোগ্য আচার্যের নির্দেশ ছাড়া আত্মতত্ত্ব আয়ত্ত করা যায় না। আবার যোগ্য আচার্য পাওয়া সত্যিই বিরল। কারণ যিনি আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করেননি তিনি এবিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন না। যে নিজেই অন্ধ সে আর এক অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাবে কেমন করে? একটি দীপই আর একটি দীপকে জ্বালাতে পারে। অতএব যোগ্য আচার্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার্থী ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু এইরকম মানুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। অধিকাংশ মানুষই স্থূল বস্তু লাভে ইচ্ছুক, সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি আগ্রহ খুব কম লোকেরই থাকে। সূক্ষ্ম বস্তু সমূহের মধ্যে আবার আত্মা সূক্ষ্মতম কারণ আত্মা নির্গুণ। আত্মাই আমাদের অন্তরতম সত্তা। নিজসত্তার বাইরের কোন বস্তুকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু নিজসত্তাকে ব্যাখ্যা করব কেমন করে? যেহেতু আত্মাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেহেতু এই আত্মতত্ত্ব বড়ই দুর্বোধ্য।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥৮

অন্বয়: অবরেণ (হীন, জড়বাদী-বুদ্ধিসম্পন্ন); নরেণ (ব্যক্তির দ্বারা); প্রোক্তঃ (উপদিষ্ট হলে); এষঃ (এই আত্মা); সুবিজ্ঞেয়ঃ ন (সম্যক্‌রূপে জানা যায় না); [যেহেতু] বহুধা (নানাভাবে [অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি, কর্তা-অকর্তা, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি]); চিন্ত্যমানঃ (এঁকে চিন্তা করা হয়); অনন্য-প্রোক্তে ('আমি ব্রহ্ম থেকে পৃথক নই' এই আত্মজ্ঞান যিনি লাভ করেছেন [এরূপ আচার্যের দ্বারা] উপদিষ্ট হলে); অত্র (আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে); গতিঃ ন অস্তি (কোন সংশয় থাকে না); অণুপ্রমাণাৎ (যুক্তির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম প্রমাণিত হলেও [তিনি অপরের দ্বারা] তার থেকেও); অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর [প্রমাণিত হতে পারেন]); হি (প্রকৃতপক্ষে); অতর্ক্যম্ (তর্কের বিষয় নন)।

সরলার্থ: হীন জড়বাদী মানসিকতা নিয়ে কেউ যদি আত্মতত্ত্বকে বোঝাবার চেষ্টা করেন তবে তার দ্বারা আত্মাকে সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। কারণ এই আত্মার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণাও রয়েছে। যিনি নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানেন তিনিই প্রকৃত আচার্য। এইরকম আচার্য যখন শিক্ষা দান করেন তখন শিষ্যের সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়। কেউ যুক্তি-তর্কের দ্বারা আত্মাকে সূক্ষ্ম বলে মনে করতে পারেন, আবার অপর কেউ আত্মাকে সূক্ষ্মতর রূপেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু যুক্তি-তর্কের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না।

ব্যাখ্যা: যে আচার্য নিজে আত্মজ্ঞান লাভ করেননি তিনি আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দানের যোগ্য নন। অন্য সব দিক থেকে তিনি যোগ্য হতে পারেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ, আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। আত্মতত্ত্ব এক বিতর্কিত বিষয়। এবিষয়ে নানা মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এই দেহটাই আত্মা। আবার আর এক মতে আত্মা বলে কিছু নেই। আবার কারো কারোর মতে আত্মাই কর্তা। এই সম্পর্কে এরকম অনেক স্ববিরোধী কথা শোনা যায়। এদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক তা জানা যায় কি ভাবে? প্রকৃত আচার্যের সাহায্যে। প্রকৃত আচার্য কে তা চিনব কেমন করে? যিনি সকলের মধ্যে নিজ আত্মাকে দেখেন এবং ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করেন তিনিই প্রকৃত আচার্য, শাস্ত্র একথাই বলে থাকেন। আচার্য যখন এই তত্ত্বকে বোধে বোধ করেন তখন তাঁর সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এর ফলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না। সমস্ত জগৎ সংসার হয়তো তাঁকে নির্বোধ বলে মনে করে, এমনকি ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করতে পারে, কিন্তু তিনি জানেন কোন্ ধনে তিনি ধনী। কারণ তিনি তো তাঁর স্বরূপকে জেনেছেন। এ জানা অবশ্য বুদ্ধির কচকচানি নয়, এ তো তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এমন আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারলে শিষ্যও ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। তবে এমন আচার্য পাওয়া সত্যিই বিরল।

আত্মাকে তর্ক করে জানা যায় না। এ হল প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ব্যাপার। যুক্তি-তর্কের দ্বারা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে কোন এক সিদ্ধান্তে হয়তো আসা গেল। আবার এর চেয়ে প্রবল কোন যুক্তির দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত হয়তো বাতিল হল। সুতরাং যুক্তি-তর্কের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
পোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি।
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।।৯

অন্বয়: প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম); ত্বম্ (তুমি); যাম্ (আত্মবিষয়ে যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি); আপঃ (লোভ করেছো); এষা মতিঃ (এই বুদ্ধি); তর্কেণ (যুক্তিবিচারের দ্বারা); ন আপনেয়া (পাওয়া যায় না); অন্যেন এব (অন্যের দ্বারা [অর্থাৎ তার্কিক থেকে ভিন্ন শাস্ত্রের মর্মার্থ-দর্শী আত্মজ্ঞানী আচার্যের দ্বারা]); প্রোক্তা (উপদিষ্ট হলে [এই মতি]); সুজ্ঞানায় (আত্মজ্ঞানের কারণ হয়); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); সত্যধৃতিঃ বত অসি (আত্মার স্বরূপ বিষয়ে তোমার যথার্থ ধারণা হয়েছে); নঃ (আমাদের নিকট); প্রষ্টা (জিজ্ঞাসু); ত্বাদৃক্ (তোমার মতো); ভূয়াৎ (হোক [অর্থাৎ আসুক])।

সরলার্থ: হে প্রিয়তম, আত্মা সম্পর্কে তোমার যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আছে, তা তুমি কোন যুক্তিবিচারের দ্বারা লাভ করনি। তা তুমি আয়ত্ত করেছ আচার্যের কাছ থেকে যিনি যুক্তিতর্ক না করে শাস্ত্র-অধ্যয়ন এবং তপস্যার দ্বারা আত্মজ্ঞান অর্জন করেছেন। নচিকেতা, আত্মার স্বরূপবিষয়ে তোমার যথার্থ ধারণা হয়েছে। তোমার মতো প্রকৃত জিজ্ঞাসুই যেন আমাদের কাছে আসে।

ব্যাখ্যা: আত্মাকে জানতে গেলে যোগ্য আচার্যের কাছে যেতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যোগ্য আচার্য কে? তিনিই যোগ্য আচার্য যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে আত্মাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা জানা যায় না। যুক্তির দ্বারা আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যুক্তিবিচার ভাল, কিন্তু তর্কের জন্যই তর্ক ভাল নয়। শাস্ত্রের মর্মার্থকে বুঝতে গেলে তর্কবিচারেরও দরকার আছে, একথা সত্য। কিন্তু তা হতে হবে গঠনমূলক। শাস্ত্র আমাদের সেই সত্য শিক্ষা দেন যার ভাষ্য মহান ব্যক্তিরা লিখেছেন। এই সত্যকে কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেই চলবে না এর মর্মার্থকে উপলব্ধি করতে হবে। যে এই সত্যকে অস্বীকার করে সে নেহাতই নির্বোধ। একথা বলতে গিয়ে সে তার বোকামির

পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, তার যুক্তিকে খণ্ডন করাও সময়ের অপচয় মাত্র। মিষ্টি না খেলে যেমন মিষ্টির স্বাদ বোঝা যায় না, তেমনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া আত্মাকে জানা যায় না। এ বিষয়ে যম নচিকেতাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। নচিকেতার ব্যাকুলতা দেখে যম প্রসন্ন হয়েছেন। নচিকেতা যোগ্য শিষ্য বলেই তিনি তাঁর উপযুক্ত পথপ্রদর্শক খুঁজে পেয়েছেন। যোগ্য অধিকারী পেলে সব আচার্যই খুশি হন। নচিকেতার মতো একজন উত্তম শিষ্য পেয়ে যম স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি। তাই তিনি নচিকেতার মতো আরও বহু শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন।

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥১০

অন্বয়: শেবধিঃ (ধনসম্পদ, কর্মফল); অনিত্যম্ (ক্ষণস্থায়ী); হি (কেননা); তৎ (সেই); ধ্রুবম্ (চিরন্তন [অর্থাৎ নিত্যধন পরমাত্মা]); ন প্রাপ্যতে (পাওয়া যায় না); অধ্রুবৈঃ (অনিত্য বস্তুসমূহের দ্বারা); ইতি (ইহা); হি (যেহেতু); অহম্ (আমি); জানামি (জানি); ততঃ (সুতরাং [জেনেশুনেও]); ময়া (আমার দ্বারা); অনিত্যৈঃ (অনিত্য); দ্রব্যৈঃ (বস্তুসমূহের দ্বারা [অর্থাৎ যজ্ঞের নানা উপকরণাদি এমনকি পশু প্রভৃতির দ্বারা]); নাচিকেতঃ (নাচিকেত নামক); অগ্নিঃ (অগ্নি [অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নি]); চিতঃ (চয়ন করা হয়েছে); নিত্যম্ (নিত্য [অর্থাৎ আপেক্ষিক অর্থে নিত্য এই যমত্ব, যমপদ]); প্রাপ্তবান্ অস্মি (প্রাপ্ত হয়েছি)।

সরলার্থ: আমি জানি যে, ধনসম্পদ কর্মফলের মতোই ক্ষণস্থায়ী। আর অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। একথাও আমি জানি। এসব জেনেশুনেও আমি নাচিকেত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি এবং তারই ফলস্বরূপ যমপদ লাভ করেছি। কারণ আপেক্ষিক অর্থেই এই পদ শাশ্বত।

ব্যাখ্যা: যম কি ভাবে স্বর্গে গেলেন এবং যমপদ লাভ করলেন, এখানে যমরাজ নিজেই তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি নাচিকেত যজ্ঞ করেছেন। এই যজ্ঞের উপকরণ হিসাবে পশুসহ নানা ক্ষণস্থায়ী বস্তু লাগে। অনিত্য উপায়কে অবলম্বন করলে 'অনিত্য ফল'ই লাভ করা যায়। নাচিকেত যজ্ঞ ঠিকঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারলে স্বর্গলাভ করা যায় এবং কিছু বিশেষ ক্ষমতাও ভোগ করা যায়। কিন্তু এগুলি নামেই নিত্যবস্তু। প্রকৃতপক্ষে এগুলি শাশ্বত নয়। একদিন না একদিন স্বর্গে যমের রাজত্বকালও শেষ হবে। একসময়ে যে তিনি স্বর্গবাস

করতে চেয়েছেন বা যমপদ লাভ করতে চেয়েছেন তার জন্য তিনি আজ অনুতপ্ত। আত্মজ্ঞানের কাছে এই সব খুবই তুচ্ছ। এমন সামান্য বস্তুর জন্য যে তিনি একসময় লালায়িত হয়েছিলেন সেজন্য তিনি আজও দুঃখিত। যমের তুলনায় নচিকেতা বিচক্ষণ। যা ক্ষণস্থায়ী নচিকেতা তাকেই নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বর্গলাভ বা দেবত্ব এ দুটোর কোনটাই নচিকেতাকে বিচলিত করতে পারেনি। তার জন্য যম নচিকেতার প্রশংসা করছেন। কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে এক চুলও সরে আসেননি। এর মধ্য দিয়ে নচিকেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥১১

অন্বয়: নচিকেতঃ (হে নচিকেতা); কামস্য (বাসনার); আপ্তিম্ (পরিসমাপ্তি বা পরাকাষ্ঠা [অর্থাৎ পরমকাম্য বিষয়কে]); জগতঃ (জগতের [অর্থাৎ মানুষ বা অধ্যাত্ম, অধিভূত -ও অধিদৈব সমস্ত বস্তুর]); প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়কে); ক্রতোঃ (যজ্ঞফলের): আনন্ত্যম্ (অনন্ত ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভপদকে [হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ]); অভয়স্য (অভয়ের); পারম্ (পরাকাষ্ঠা [যদিও এই অভয় অবস্থাও সাময়িক]); স্তোম-মহৎ (প্রশংসনীয়, অতিপ্রাকৃত শক্তির ঐশ্বর্যে মহীয়ান); উরুগায়ম্ (বিস্তীর্ণ এবং অনেককাল স্থায়ী); প্রতিষ্ঠাম্ (অবস্থাকে [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদকে]); ধৃত্যা (ধৈর্য সহকারে); দৃষ্ট্বা (অনুধাবন করে); ধীরঃ (সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে); অত্যস্রাক্ষীঃ (প্রত্যাখ্যান করেছ)।

সরলার্থ: হে নচিকেতা, তুমি যথার্থই বিচক্ষণ। সেই জন্যই তুমি বিষয়তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পেরেছ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মানুষ, পশু ও পরিবেশকে ঘিরে যে এই জগৎ রয়েছে তুমি তাকেও প্রত্যাখ্যান করেছ। যজ্ঞ ঠিকঠিকভাবে করতে পারলে বহু কাম্য বস্তু এমনকি, হিরণ্যগর্ভের পদও লাভ করা যায়; হিরণ্যগর্ভ—যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পালক এবং বিনাশকারী। এই যজ্ঞের ফলে মানুষ এমন লোকে যায় যেখানে মানুষ সাময়িকভাবে অভয়পদ লাভ করে। এছাড়াও মানুষ নানারকমের অতিপ্রাকৃত শক্তি (যথা—অণিমা, লঘিমা, প্রভাব বিস্তার করা যায় এমন নানা ঘটনা, অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা ইত্যাদি) অর্জন করে থাকে। এর প্রত্যেকটি তুমি অগ্রাহ্য করেছ। কারণ এ সবই অনিত্য। তোমার মতো বিচক্ষণ মানুষের কাছ থেকেই তো এটা আশা করা যায়।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্ব ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥১২

অন্বয়: দুর্দর্শং (সহজে দেখা যায় না [সূক্ষ্মতার জন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নন]); গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টং (অতিসূক্ষ্মভাবে সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট); গহ্বরেষ্ঠং (ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গমস্থানে স্থিত); গুহাহিতম্ (জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত); পুরাণম্ (সনাতন, কালাতীত); তং দেবম্ (সেই স্বপ্রকাশ আত্মাকে); অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (অধ্যাত্মযোগের অনুশীলন দ্বারা [বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহার করে আত্মায় সমাহিত করে]); মত্বা ([আত্মাকে] মনন করে); ধীরঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি); হর্ষশোকৌ (সুখ এবং দুঃখ); জহাতি (অতিক্রম করেন)।

সরলার্থ: প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরে যিনি রয়েছেন, প্রত্যেকের বুদ্ধিরূপ গুহাতে যিনি নিহিত এবং যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, সেই সনাতন আত্মাকে সহজে দেখা যায় না। নিজের ভেতরে আত্মাকে উপলব্ধি করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সুখদুঃখের পারে যান।

ব্যাখ্যা: আত্মাকে দেখা যায় না। কারণ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। সাধককে এর জন্য দীর্ঘকাল ধরে আত্মসংযম অভ্যাস করতে হয়। যেমনভাবে বাইরের বস্তুকে দেখা যায় তেমনভাবে আত্মাকে দেখা যায় না। কারণ যখন আমরা বাইরের বস্তু দেখি তখন দ্রষ্টা এবং দৃষ্টবস্তু এক নয়। কিন্তু আত্মা তো দ্রষ্টা থেকে পৃথক কোন বস্তু নন। ইনি সকলের অন্তরতম সত্তা। যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মা সাধকের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মাকে কেউ দেখতে পায় না। এ যেন আয়নাতে নিজেকে দেখা। পরিষ্কার আয়নায় নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়সুখ থেকে মনকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হয়। আর সেই স্বচ্ছ মনে তখন আত্মা নিজেকে ধরা দেন। হ্রদের জল যখন স্থির, তরঙ্গহীন, তখন তার তলদেশে পড়ে থাকা মুদ্রাকে দেখা যায়। একইভাবে মন যখন শান্ত হয় তখনই আত্মা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। আত্মা আমাদের ভেতরেই রয়েছেন। কিন্তু অশান্ত মনে আত্মা নিজেকে ধরা দেন না। এখন প্রশ্ন হল আমাদের মন অশান্ত কেন? কামনা বাসনার জন্য। বিষয় থেকে মনকে তুলে নিয়ে যদি আত্মাতে সমাহিত করা যায় তবে মন আর এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায় না। একেই বলে চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান আপনা আপনিই ফুটে ওঠে। এই জ্ঞান অর্জন করতে পারলে মানুষ সুখদুঃখের পারে যান। আত্মজ্ঞান লাভ হলে আর বিপথে পা পড়ে না।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্তঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥১৩

অন্বয়: মর্ত্যঃ (মানুষ); এত (এই [অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব]); শ্রুত্বা ([আচার্যের কাছে] শ্রবণ করে); সম্পরিগৃহ্য ('আমিই আত্মা' এইভাবে তাঁকে সম্যক্ গ্রহণ করে); ধর্ম্যম্ (ধর্ম-অনুমোদিত বস্তুকে); প্রবৃহ্য ([ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর থেকে] পৃথক করে [অর্থাৎ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে]); অণুম্ (সূক্ষ্ম); এতম্ (এই আত্মাকে); আপ্য (প্রাপ্ত হয়ে); সঃ (সেই মানুষ); মোদনীয়ম্ (আনন্দের কারণ-স্বরূপকে); লব্ধ্বা (লাভ করে); মোদতে (আনন্দিত হন); হি (নিশ্চিতভাবে); নচিকেতসম্ (নচিকেতার প্রতি); সদ্ম (ব্রহ্মরূপ); বিবৃতম্ (উন্মুক্ত [অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যোগ্য]); মন্যে (মনে করি)।

সরলার্থ: যোগ্য আচার্যের কাছ থেকে আত্মতত্ত্ব শুনতে হবে। শুধু শুনলেই হবে না, আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। আত্মতত্ত্ব যদিও অতি সূক্ষ্ম কিন্তু এই আত্মাতেই নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধর্মরূপে এই আত্মাই হল জগতের আশ্রয়। ধর্মের ওপর মানুষকে আস্থা রাখতে হবে। মানুষ যখন উপলব্ধি করেন তিনিই সেই আত্মা তখন তাঁর আর চাওয়ার কিছু থাকে না। তিনি তখন আপ্তকাম, পূর্ণকাম। এ অবস্থায় তিনি আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠেন। আর এই আনন্দের উৎস তো তাঁর নিজের আত্মা। আমি মনে করি, হে নচিকেতা, তুমি এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছ।

ব্যাখ্যা: নিজের প্রকৃত পরিচয় জানি না বলেই আমরা জন্মমৃত্যুর শিকার। আমরা নিজেকে এই দেহ বলে মনে করি এবং আমাদের অপূর্ণ বাসনা পূর্তির জন্য এই দেহকেই কাজে লাগাই। আমাদের এই. অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই আমাদের বারবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বিচক্ষণ। বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাঁরা প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়র পথই বেছে নেন। তারপর তাঁরা শোনেন আত্মা এক ও অভিন্ন এবং তিনি নিজেই 'সেই আত্মা'। এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন এমন যোগ্য আচার্যের সঙ্গে তখন তাঁরা বাস করেন। এরকম আচার্যের শিক্ষা ও উপদেশ মতো তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে আত্মসংযম অভ্যাস করেন। অবশেষে সব অনিত্য বস্তুকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা আত্মচিন্তাতেই ডুবে যান। তাঁরা তখন সেই আত্মার সাথে একাত্মতা অনুভব করেন, যে-আত্মা চিরন্তন সত্য।

যম বলছেন, নচিকেতা এখন সকল বাসনা থেকে মুক্ত। তিনি এখন জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থার দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥১৪

অন্বয়: ধর্মাৎ অন্যত্র (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে ভিন্ন); অধর্মাৎ অন্যত্র (অধর্ম থেকে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধ থেকে ভিন্ন); অস্মাৎ (এই [অর্থাৎ দৃশ্যমান]); কৃত-অকৃতাৎ অন্যত্র (কার্য ও কারণ থেকে ভিন্ন); ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ (অতীত [বর্তমান] ও ভবিষ্যৎ থেকে); অন্যত্র (ভিন্ন); যৎ তৎ (সেই যে বস্তু); পশ্যসি (আপনি দেখছেন [অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে জানেন]); তৎ বদ (তা বলুন)।
সরলার্থ: (নচিকেতা বললেন, আমার প্রশংসা করার কোন দরকার নেই। আপনি যদি আমার প্রতি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে আমাকে যোগ্য বলে মনে করেন, তবে) আপনি আমাকে যতদূর সম্ভব সেই বিষয়ে শিক্ষা দিন যা ধর্মাধর্মের ঊর্ধ্বে, যা কার্যকারণের অতীত এবং যা তিনকালের ঊর্ধ্বে।
ব্যাখ্যা: নচিকেতা আত্মতত্ত্ব জানতে চান। আত্মাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই আত্মা আমাদের ভেতরে আছেন আবার বাইরেও আছেন অর্থাৎ তিনিই সর্বত্র রয়েছেন। এই জগতের মধ্য দিয়ে আত্মা নিজেকেই প্রকাশ করেন। কিন্তু এতেই তিনি ফুরিয়ে যান না। তিনি এই জগতের অতীত এবং স্বাধীন। তিনি কোন বিধি নিষেধের দ্বারা বদ্ধ নন। আবার আত্মা কোন কিছুর কার্য নন আবার কারণও নন। আত্মা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনকালের ঊর্ধ্বে।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ॥১৫

অন্বয়: সর্বে বেদাঃ (সকল বেদসমূহ [অর্থাৎ উপনিষদসমূহ]); যৎ (যে); পদম্ (পরম লক্ষ্যকে [অর্থাৎ স্বরূপকে]); আমনন্তি (কীর্তন করেন); সর্বাণি তপাংসি (সকল তপস্যা); যৎ বদন্তি (যাঁকে ব্যক্ত করে); যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁকে পাওয়ার ইচ্ছে করে); ব্রহ্মচর্যং চরন্তি (সাধক

ব্রহ্মচর্য পালন করেন); তে (তোমায়); তৎ পদম্ (সেই পরম ঈপ্সিত বস্তু); সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে); ব্রবীমি (বলছি); ওম্ ইতি এতৎ (ওম্ই সেই পদ)।

সরলার্থ: (যম বললেন:) উপনিষদে যে পরম লক্ষ্যের গুণকীর্তন করা হয়েছে। তাঁকে কেবলমাত্র তপস্যার দ্বারা লাভ করা যায়। তাঁকে পাবার জন্যই সাধকরা ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁর কথাই তোমাকে বলব, তিনি হলেন—অউম্ (ওঁ)।

ব্যাখ্যা: অউম্ (ওম্)-কে শব্দব্রহ্ম বা প্রণব বলা হয়। হিন্দুদের কাছে 'অউম্' শব্দটি খুবই পবিত্র। কারণ 'ওম্' ব্রহ্মের প্রতীক।

ব্রহ্মকে কোনভাবেই বর্ণনা করা যায় না। তিনি বাক্যমনাতীত। কেবলমাত্র প্রতীকের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে খানিকটা ধারণা করা যায়। ব্রহ্ম যদি শব্দরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তবে সেই শব্দ হল 'অউম্' (ওম্)। ব্রহ্মের স্বরূপকে বোঝার পক্ষে এটিই উপযুক্ত প্রতীক। যদিও প্রতীক এবং যে বিষয়ের প্রতীক এ দুটো এক জিনিস নয়। তবুও এদের মধ্যে কতগুলি সাধারণ মিল আছে। সব কিছু ব্রহ্মের কাছ থেকেই এসেছে। অন্যদিকে সমগ্র ধ্বনিজগৎও এই 'অউম্'-এর অন্তর্গত। 'আহত' এবং 'অনাহত' দুই-ই এর অন্তর্গত। অউম্-এর প্রতিটি অক্ষর এই জগতের এক একটি অবস্থাকে চিহ্নিত করে যথা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। এই তিন অক্ষরের পারে হল তুরীয় অবস্থা। অউম্ (ওম্) সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের—এই দুই অবস্থারই প্রতীক।

যেহেতু 'অউম্' (ওম্) ব্রহ্মের প্রতীক সেহেতু 'অউম্'-কে ধ্যান করলে ব্রহ্মেরই ধ্যান করা হয়। সাধকের কাছে তখন 'ওম্' কেবলমাত্র প্রতীক নয় স্বয়ং ব্রহ্ম। এই ধ্যানের মাধ্যমে, সাধক ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। সাধক যদি 'অউম্'কে (ওম্) কেবলমাত্র প্রতীক বলে মনে করেন তবে তা হবে মূর্তিপূজার সামিল।

এতদ্ধ্যেক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১৬

অন্বয়: হি (অতএব); এতৎ (এই); অক্ষরম্ (অক্ষর, শব্দ [ওম্]); ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই [সগুণ ব্রহ্ম]); হি (অতএব); এতৎ (এই); অক্ষরম্ (ওঁকার); পরম্ এব (পরব্রহ্মই [নির্গুণ ব্রহ্মা); এতৎ এব হি অক্ষরম্ (নিশ্চিতভাবে এই ওঁকারকে); জ্ঞাত্বা (জেনে); যঃ (যিনি); যৎ ইচ্ছতি (যা ইচ্ছে করেন); তস্য (তাঁর); তৎ (তাই [অর্থাৎ সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়)।

সরলার্থ: (অ-উ-ম ও তার উপাসনাকে প্রশংসা করে যম বললেন:) এই 'অক্ষরম্' হল (অউম্) সগুণ ব্রহ্ম। আবার এই 'অক্ষরম্'কে নির্গুণ ব্রহ্মও বলা হয়। যে ব্যক্তি এই

অউম্‌কে জানেন তাঁর সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই হতে পারেন। সগুণ ব্রহ্মই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সগুণ ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট—এই তিনটি ব্রহ্মেরই আর এক নাম। প্রথম নামটি ব্রহ্মের নিমিত্ত বা কারণ অবস্থা, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মের সূক্ষ্মাবস্থা এবং তৃতীয়টি ব্রহ্মের স্থুলাবস্থাকে সূচিত করে। ব্রহ্ম কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয়। এই গুণগুলি ব্রহ্মের ওপরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না, এরা ব্রহ্মে আরোপিত মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। ছোট ছেলেমেয়েরা একটার পর একটা মুখোস পরে খেলে। বিভিন্ন মুখোসের জন্য তাদের নানারকম দেখায়। আসলে কিন্তু মুখোসের আড়ালে রয়েছে সেই এক বালক। সগুণ ব্রহ্মও যেন ঠিক তাই।

'অ-উ-ম্' (ওম্)—সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম এই দুয়েরই প্রতীক। 'অ-উ-ম্'-কে জানলে ব্রহ্মকেই জানা যায়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৭

অন্বয়: এতৎ (এই [ওঁকার]); আলম্বনম্ (সগুণ বা অপরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়); শ্রেষ্ঠম্ (শ্রেষ্ঠ); এতৎ (এই [ওঁকার]); আলম্বনং পরম্ (পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়); এতৎ আলম্বনং জ্ঞাত্বা (এই উপায় বা আশ্রয়কে জেনে [অর্থাৎ উপাসনা করে]); ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হন [অর্থাৎ অপরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মস্বরূপ হন])।

সরলার্থ: ব্রহ্মকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল অউম্ (ওম্)। অপরা ব্রহ্ম (সগুণ) এবং পরা ব্রহ্ম (নির্গুণ) উভয়কেই এই পথে পাওয়া যায়। অপরা ব্রহ্মের সাধনার দ্বারা মানুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। এই লোকে মানুষ ব্রহ্মের সমমর্যাদা লাভ করে। পরা ব্রহ্মের দ্বারা মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: আগে বলা হয়েছে, যদি কেউ ব্রহ্মের ধ্যান করেন তবে তাঁর সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এই কথাটিকেই আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মকে লাভ করার সকল পথের মধ্যে অউম্-এর পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ 'অউম্'কে ধ্যান করলে পরা ব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম) ও অপরা ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম) এ দুই-ই লাভ করা যায়। এজন্য 'অউম্'কে পরা ও অপরা ব্রহ্মও বলা হয়।

'পরা ব্রহ্ম' বলতে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং 'অপরা ব্রহ্ম' বলতে সগুণ ব্রহ্মকে বোঝায়। কিন্তু নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে চিন্তা করা কঠিন। অধিকাংশ মানুষ তাই অপরা ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ

ব্রহ্মের চিন্তা করেন। অউম্-এর ধ্যান করলে পরা ব্রহ্ম এবং অপরা ব্রহ্ম উভয়কেই পাওয়া যায়। সাধক প্রথমে অপরা অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যান। কিন্তু কালে এই 'অউম্'কে ধ্যান করেই সাধক ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥১৮

অন্বয়: বিপশ্চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ, সর্বজ্ঞ); ন জায়তে (জাত হন না); বা (কিংবা); [ন] ম্রিয়তে (বিনষ্ট হন না); অয়ম্ (এই আত্মা); কুতশ্চিৎ (কোন কিছু থেকে); ন বভূব (হননি); কশ্চিৎ ন [বভূব] (এঁর থেকেও] কোন কিছু উৎপন্ন হয়নি); অয়ম্ (এই আত্মা); অজঃ (জন্মরহিত); নিত্যঃ (চিরন্তন); শাশ্বতঃ (অপরিবর্তনীয়, ক্ষয়রহিত); পুরাণঃ (সবসময় বিদ্যমান); শরীরে হন্যমানে (শরীর হত হলেও); [অয়ম্ (এই আত্মা)]; ন হন্যতে (হত হন না)।
সরলার্থ: আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মার কোন উৎপত্তি নেই, আবার আত্মা থেকেও কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। আত্মা জন্মরহিত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং সদা বিরাজমান। দেহের নাশ হয়, কিন্তু আত্মা অবিনাশী।
ব্যাখ্যা: অউম্-এর (ওম্) উপাসনা কিভাবে মানুষকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায় যম এতক্ষণ তারই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন তিনি নচিকেতাকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন। ব্রহ্ম ও আত্মা এক এবং অভিন্ন। বেদান্তমতে এই একাত্মতা উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। যেহেতু আত্মা জ্ঞানস্বরূপ সেহেতু আত্মা সর্বজ্ঞ (বিপশ্চিৎ)। আত্মার জন্ম নেই। কোন বস্তুর প্রথম উৎপত্তিকে আমরা জন্ম বলে থাকি। আত্মার এ জাতীয় কোন জন্ম নেই। আত্মার আদি অন্ত বলে কিছু নেই। অর্থাৎ আত্মা নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন।

আবার আত্মার মৃত্যুও নেই। কারণ যাঁর জন্ম হয়নি তাঁর মৃত্যুও হতে পারে না। আত্মা কোন কিছুর কার্য নয়। প্রত্যেক কার্যেরই কোন না কোন কারণ থাকে। সুতরাং কার্য-কারণ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কারণ না থাকলে কার্যও থাকতে পারে না। আত্মা অনাদি। অর্থাৎ সব কিছুর আদি কারণ হল এই আত্মা।

আত্মা থেকে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। একমাত্র যা পরিবর্তনশীল তাই কোন কার্যের কারণ হতে পারে। যেমন দুধ দই-এ পরিণত হতে পারে। কিন্তু আত্মা অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়। আত্মার কোন ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই। আত্মা শাশ্বত, এক ও অভিন্ন। আত্মা একযোগে প্রাচীন ও নবীন দুই-ই। দেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মা অবিনাশী।

মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা নচিকেতা যমের কাছে এই প্রশ্নই করেছিলেন। এখানে যম নচিকেতাকে তারই উত্তর দিলেন।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হত।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯

অন্বয়: হন্তা (হত্যাকারী); চেৎ (যদি); হন্তুম্ (হত্যা করতে); মন্যতে (ইচ্ছা করে [অর্থাৎ 'আমি হত্যা করব' মনে করে]); হতঃ চেৎ (হত ব্যক্তি যদি); [আত্মানম্] হতং মন্যতে ([আত্মাকে] নিহত মনে করে); উভৌ তৌ (তারা দুজনেই); ন বিজানীতঃ (জানে না); অয়ম্ (এই আত্মা); ন হন্তি (কাউকে হত্যা করেন না); ন হন্যতে (স্বয়ং নিহত হন)।

সরলার্থ: হত্যাকারী যদি কাউকে হত্যা করবে বলে মনে করে এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে সে নিহত—তবে বলতে হয়, তাদের দুজনের কেউই আত্মার স্বরূপ জানে না। কারণ আত্ম হত্যাও করেন না, হতও হন না।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মা অবিকারী, স্বতন্ত্র এবং নির্গুণ। আত্মা অকর্তা। এই দৃশ্যমান জগতে যা কিছু ঘটে থাকে আত্মা তার নির্লিপ্ত সাক্ষী-মাত্র।

যদি কোন মানুষ নিজেকে দেহ বলে মনে করে, তবে সে অজ্ঞান। ঘাতক কোন ব্যক্তির দেহকেই হত্যা করতে পারে আত্মাকে নয়। সেইভাবে নিহত ব্যক্তির আত্মাও অবিনাশী; তার দেহেরই মৃত্যু হয়। উভয়ক্ষেত্রেই আত্মা অবিকারী। আত্মা দ্রষ্টা, সাক্ষী-মাত্র। আত্মা আছেন বলেই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু শরীরের দ্বারা আত্মা প্রভাবিত হন না।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥২০

অন্বয়: অণোঃ (সূক্ষ্মতম বস্তুর থেকেও); অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর); মহতঃ (বৃহত্তম বস্তুর থেকেও); মহীয়ান্ (বৃহত্তর); আত্মা অস্য জন্তোঃ (আত্মা এই জীবের); গুহায়াং নিহিতঃ (হৃদয়গুহাতে অবস্থিত); অক্রতুঃ (যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করেছেন); ধাতুপ্রসাদাৎ (মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে); আত্মনঃ (আত্মার); তম্ (সেই); মহিমানম্ (মহিমাকে); পশ্যতি (দর্শন করেন [অর্থাৎ 'আমিই সেই আত্মা' এরূপ অনুভব করেন]); বীতশোকঃ (শোকাতীত হন)।

সরলার্থ: আত্মা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর এবং বৃহতের চেয়েও বৃহত্তর। অন্তরাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়গুহাতে তিনি বিরাজ করেন। যে সব মানুষ সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন এবং নিজ মন ও ইন্দ্রিয় যাঁর বশে, তিনিই এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন। তখন তাঁরা সকল সংশয়ের পারে যান।

ব্যাখ্যা: ছোট, বড় সব বস্তু আত্মা থেকেই এসেছে। বস্তুত আত্মাই সবকিছু হয়েছেন। এইজন্যই এই আত্মাকে অণুর চেয়েও অণু এবং মহতের চেয়েও মহৎ বলা হয়।

এই জগৎরূপে আত্মা নিজেকেই প্রকাশ করেন। এক আত্মাই আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন। এ যেন গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কোন বস্তুর মতো। যোগীরা নিজ হৃদয়-গুহায় এই আত্মাকে উপলব্ধি করেন। তাঁরা বুদ্ধির দ্বারা এই আত্মাকে অনুভব করেন এবং জ্যোতিরূপে এই আত্মাকে নিজ হৃদয়ে দর্শন করেন। যেহেতু বুদ্ধির স্থান এই হৃদয়ে, সেহেতু এই হৃদয়েই আত্মা বিরাজ করেন।

এই আত্মা অতি সূক্ষ্ম। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগসুখে মগ্ন সেই ব্যক্তি এই আত্মাকে কখনও উপলব্ধি করতে পারে না। আত্মা এই সব মানুষের থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন। যে ব্যক্তির মন শান্ত, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই আত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। মন কখন শান্ত হয়? যখন মানুষের কোন কামনা বাসনা থাকে না। অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ হলেই মানুষ নিজেকে সুখী বলে মনে করে এবং তা না হলেই সে নিজেকে অসুখী বলে বোধ করে। এই দুই অবস্থাই মনে চাঞ্চল্য আনে। চঞ্চল মন তরঙ্গায়িত হ্রদের মতো। তরঙ্গ থাকলে যেমন জলের তলদেশে কি আছে তা দেখা যায় না। কিন্তু শান্ত, তরঙ্গহীন হ্রদের তলদেশে যদি একটি মুদ্রাও পড়ে থাকে, তবে তাও আমাদের নজরে আসে। অনুরূপভাবে শান্ত মনেই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। এ যেন পরিষ্কার আয়নায় নিজেকে দেখা।

এর পরে সাধক আবিষ্কার করেন তাঁর আত্মাই সকলের মধ্যে রয়েছে। সাধকের সাধনার এই হল সর্বোচ্চ পরিণতি।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।

কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥২১

অন্বয়: [এই আত্মা] আসীনঃ ([যদিও] উপবিষ্ট [অর্থাৎ অচল, গতিহীন]); দূরং ব্রজতি (দূরদূরান্তে যাওয়া-আসা করেন [অর্থাৎ দেহমনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মাকে সচল বোধ হয়]); শয়ানঃ (শায়িত [অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত হয়েও]); সর্বতঃ (সর্বত্র); যাতি (গমন করেন [অর্থাৎ ক্রিয়াশীল থাকেন]); তম্ (সেই); মদ-অমদং দেবম্ (একই সঙ্গে আনন্দময় এবং আনন্দহীন আত্মাকে); মৎ-অন্যঃ (আমার মতো সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, বিবেকী মানুষ ছাড়া); কঃ (কে); জ্ঞাতুম্ (জানতে); অর্হতি (সমর্থ হয়)।

সরলার্থ: আত্মা অচল হয়েও সচল, নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়। আত্মা সুখী আবার দুঃখী। আমার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া কে এই আত্মাকে বুঝতে পারে?

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে আত্মার মহিমা কীর্তন করে আত্মতত্ত্ব যে অতি সূক্ষ্ম এ কথা বলা হয়েছে। আত্মার দুটি অবস্থা—এক অবস্থায় তিনি স্থির, অচল ও অটল আবার আর এক অবস্থায় তিনি সচল, সক্রিয় ও গতিশীল। আত্মা একই সঙ্গে সুখী ও দুঃখী। আত্মাই সকল বিপরীত ভাবের মিলন সেতু। আত্মাই সব কিছুর আশ্রয় এবং সব বৈচিত্রের মূল ঐক্য। আত্মা যেন পর্দার ওপর ফেলা চলমান ছায়াছবি।

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এখানে 'শুদ্ধ' বলতে 'নির্গুণ' অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। আত্মা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। অথচ এই আত্মাই সবকিছু হয়েছেন। অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তরতম সত্তা হলেন এই আত্মা। আমাদের সকলের মধ্যে সেই এক ও অভিন্ন আত্মা রয়েছেন। এই আত্মাই একসাথে এক ও বহু হয়েছেন। নামরূপের দ্বারা এই এক আত্মাই বহু হয়েছেন। নামরূপ আত্মার ওপর আরোপিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু আত্মা অবিকারী।

শুদ্ধ চৈতন্য সক্রিয়ও নয় আবার নিষ্ক্রিয়ও নয়। কিন্তু মানুষের জাগ্রত অবস্থায় এই শুদ্ধ চৈতন্যকে সক্রিয় বলে মনে হয়। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয় এবং আত্মাকেই তখন কর্তা বলে মনে করে। আত্মাই যেন সব কিছু করছেন। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জন্যই আমাদের এই ধারণা হয়। আত্মা কিছু করেন না। তিনি নির্লিপ্ত, সাক্ষী, দ্রষ্টাস্বরূপ। আমাদের আর একটি অবস্থা হল স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি। সুষুপ্তি ভাঙ্গার পর আমরা বলে থাকি 'আমি বেশ ঘুমিয়েছি'। জেগে ওঠা মাত্রই এটা বুঝে ওঠা যায় না—আমরা কোথায় আছি, এটা দিন না রাত্রি! এই অবস্থা ভঙ্গের পরে মনে হয় যেন কিছু সময়ের জন্য আমাদের মৃত্যু হয়েছিল এবং এইমাত্রই আবার জীবন ফিরে পেয়েছি। আসলে তখন শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মা আরোপিত দেহমনের প্রভাব থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত ছিল। এই অবস্থায় আত্মা অচল (আসীনঃ, শয়ানঃ)। আবার জাগ্রত

অবস্থায় আত্মা যখন দেহমনের সঙ্গে যুক্ত তখন তা সচল (দূরং ব্রজতি)। এই আত্মা একযোগে সুখী ও দুঃখী। আসলে আত্মা সবসময়েই এক ও অভিন্ন, যা নির্গুণ ও বিশুদ্ধ।

'আমার মতো মানুষ ছাড়া এই আত্মাকে কে বুঝতে পারে'—এ কথার মধ্য দিয়ে যম কি বোঝাতে চাইলেন? যে সব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছেন একমাত্র তাঁরাই আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম। যম এখানে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥২২

অন্বয়: শরীরেষু (বিভিন্ন দেহে); অশরীরম্ (দেহবিহীন [অর্থাৎ অরূপ]); অনবস্থেষু (অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে); অবস্থিতম্ (নিত্য, অবিকৃত); মহান্তম্ (বৃহৎ); বিভুম্ (সর্বব্যাপী); আত্মানম্ (আত্মাকে); মত্বা ('আমিই সেই আত্মা' এই একাত্মতা অনুভব করে); ধীরঃ (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); ন শোচতি (শোক করেন না [অর্থাৎ দুঃখকে অতিক্রম করেন])।

সরলার্থ: আত্ম নিরাকার হয়েও সাকার। সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে তিনিই একমাত্র নিত্য; এই আত্মা বৃহৎ এবং সর্বব্যাপী। এই আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শোক-দুঃখকে অতিক্রম করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মার কোন রূপ নেই। আবার এ জগতের সব রূপই তাঁর রূপ। আত্মা আকাশের মতো সর্বব্যাপী। সেই এক ও অভিন্ন আত্মাই নামরূপের দ্বারা বহু হয়েছেন। এই 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য'ই হল আমাদের জীবনের মূল কথা। নামরূপের পরিবর্তন ও বিনাশ হবেই হবে। কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর এবং সতত অভিন্ন। আত্মা মুক্ত, স্বতন্ত্র এবং অনন্ত। সর্ববস্তুতেই আত্মা রয়েছেন তবু এতেই তিনি শেষ হয়ে যাননি। সবকিছুকে অতিক্রম করেও তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যেমন কোন ঘট জলের মধ্যে ডোবালে ঘটের ভেতরেও জল থাকে আবার বাইরেও জল থাকে। আত্মাও যেন ঠিক তাই। তিনি আমাদের ভেতরে আছেন আবার বাইরেও আছেন। অর্থাৎ তিনিই সর্বত্র রয়েছেন।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজেকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। তিনি শুধু একথা চিন্তাই করেন না, তিনি এই জীবনেই তা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি হলে মানুষ জন্মমৃত্যুর পারে যায়। জীবাত্মা তখন পরমাত্মায় লীন হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্‌॥২৩

অন্বয়: অয়ম্‌ (এই); আত্মা (আত্মা); প্রবচনেন (বেদ অধ্যয়ন দ্বারা [অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের দ্বারা]); ন লভ্যঃ (লাভ করা যায় না); ন মেধয়া (বুদ্ধি বা বিচার শক্তি দ্বারাও নয়); বহুনা (অনেক); শ্রুতেন (শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও); ন (নয়); এষঃ (এই আত্মা); যম্‌ এব (যাঁকেই, যে সাধককেই); বৃণুতে (অনুগ্রহ করেন, নির্বাচন করেন); তেন লভ্যঃ (তাঁর দ্বারাই প্রাপ্ত হন); তস্য (তাঁর নিকট); এষঃ আত্মা (এই আত্মা); স্বাং তনূম্‌ (নিজ প্রকৃতি [অর্থাৎ পারমার্থিক স্বরূপ]); বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ: পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির দ্বারা নয়। আবার শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। যাঁকে তিনি অনুগ্রহ করেন, কেবলমাত্র তিনিই আত্মাকে বুঝতে সক্ষম। একমাত্র তাঁর কাছেই আত্মা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন হল আত্মা যদি নির্গুণ নিরাকার হন তবে তাঁকে জানা যায় কি ভাবে? এই শ্লোকে সে প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে।

শাস্ত্র পাঠ করে আত্মাকে জানা যায় না। কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান হতে পারেন এমনকি যুক্তিবিচারে পারঙ্গমও হতে পারেন—তা সত্ত্বেও তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হতে পারেন। আত্মা সম্পর্কে অনেক শোনার পরেও আত্মতত্ত্বকে দুর্বোধ্য বলেও তাঁর মনে হতে পারে। এই ভাবে আত্মাকে বোধে বোধ করা যায় না। এই সকল উপায়ের দ্বারা বড় জোর একটা পরোক্ষ ধারণা জন্মাতে পারে কিন্তু আত্মার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। আত্মা আমার থেকে পৃথক কোন বস্তু নন। আমাদের অন্তরতম সত্তা হলেন আত্মা, যা অহঙ্কারের আবরণে আবৃত। কিন্তু দীর্ঘদিনের কঠোর তপস্যা এবং সৎ গুরুর নির্দেশে সেই আবরণ মিলিয়ে যায়, অজ্ঞানতার মেঘ কেটে গেলে আত্মা তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করেন। তখন মানুষ নিজ আত্মাকেই সকলের মধ্যে দেখেন এবং নিখিল জগতের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন।

এই আত্মতত্ত্ব যেন মানুষের কাছে কারোর অনুগ্রহ রূপে প্রকাশ পায়। আসলে বাইরের কেউ দয়া বা অনুগ্রহ করেন না। এই অন্তরাত্মা নিজেই নিজেকে স্বমহিমায় প্রকাশ করেন, বিদ্যুৎ চমকের মতো এই প্রকাশ আপনা আপনিই ঘটে থাকে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥২৪

অন্বয়: দুশ্চরিতাৎ (দুষ্কর্ম থেকে); অবিরতঃ (যে নিবৃত্ত নয়); ন (আপ্লুয়াৎ] (সে এই আত্মাকে পায় না); অশান্তঃ ন (ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিও পায় না); অসমাহিতঃ ন (একাগ্রতাহীন, চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিও নয়); অশান্তমানসঃ বা অপি ন (নিজ কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাবশত যার মন সর্বদা অশান্ত সেও [এই আত্মাকে] পায় না); এনম্ (এই আত্মাকে); প্রজ্ঞানেন ([কেবল] জ্ঞানের দ্বারা); আপ্লুয়াৎ (লাভ করা যায়)।

সরলার্থ: দুষ্ট ব্যক্তি আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। যার মন বশে নয়, ইন্দ্রিয় সুখভোগে মত্ত অথবা যে নিজ কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে, এমন ব্যক্তিও আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়।

ব্যাখ্যা: এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ কোন্ গুণ থাকলে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়? আত্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি কখনও কোন অবস্থাতেই খারাপ কাজ করবে না। খারাপ কাজ বলতে কি বোঝায়?—সেই সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রীয় এই সব বিধান ঠিক কিভাবে পালন করতে হবে? ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। এই ইন্দ্রিয়সুখকে উপেক্ষা করতে হবে এবং মনকে আত্মাতে সমাহিত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। ইন্দ্রিয়সুখে যে আনন্দ লাভ করা যায় তা ক্ষণস্থায়ী। আত্মচিন্তায় বিভোর হলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা গভীর এবং চিরস্থায়ী। ব্রহ্মানন্দের স্বাদ যিনি পেয়েছেন বিষয়ানন্দ তাঁর কাছে আলুনি বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির চাবিকাঠি হল আত্মসংযম। যেভাবেই হোক আমাকেই আমার চালক হতে হবে। আধ্যাত্মিক পথে সাধক যত এগিয়ে যেতে থাকবেন ততই তাঁর জীবনটা বদলে যেতে থাকে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি নিজেই নিজের পুরস্কার।

পবিত্র জীবন যাপনে মন সম্পূর্ণ নিজের বশে থাকে। তখন আর ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। সাধকের তখন এই জগৎ সম্পর্কে তীব্র অনীহা জন্মায়। আত্মতত্ত্বই সাধকের তখন ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। আত্মজ্ঞানের উদয় তখন আপনা আপনিই হয়।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥২৫

অন্বয়: যস্য (যে পরমাত্মার); ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে); ওদনঃ (অন্ন, আহার্য); ভবতঃ (হন); মৃত্যুঃ যস্য (মৃত্যু যাঁর); উপসেচনম্ ([শাকাদি] ব্যঞ্জনরূপ উপকরণ); সঃ যত্র (সেই আত্মা [স্বমহিমায়] যেখানে অবস্থিত); ইত্থা (এই প্রকারে [অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানীর ন্যায়]); কঃ (কে [অর্থাৎ কোন্ সাধারণ-বুদ্ধি মানুষ]); বেদ (জানতে পারে)।

সরলার্থ: মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাঁরাও আত্মার কাছে খাদ্যের সমান। মৃত্যুর কাছে সকলেই পরাস্ত; কিন্তু সেই মৃত্যুও আত্মার কাছে মুখরোচক খাদ্য মাত্র। আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষ তার সীমিত শক্তি দিয়ে আত্মার মহিমা বর্ণনা করতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা পারেন।

ব্যাখ্যা: আত্মাই পরম বা সর্বোচ্চ। এই পরম সত্যকে বোঝাবার জন্যই এই শ্লোকে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, সব কিছুই আত্মায় লীন হয়ে যায়। যেমন ভোজ্যবস্তু ভোক্তার দেহে লীন হয়।

আত্মা অনন্য। আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। আত্মাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, অনন্ত, নির্গুণ।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥১

অন্বয়: লোকে (এই জগতে); সুকৃতস্য ঋতং পিবন্তৌ (কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগকারী); পরমে পরার্ধে (পরম হৃদয়াকাশে); [যৌ (যে দুইজন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীবাত্মার সাহচর্যবশত পরমাত্মাকেও কর্মফলভোগী বলা হয়েছে)]; গুহাং প্রবিষ্টৌ (বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন); ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞানী); [তৌ (তাঁদেরকে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে)]; ছায়াতপৌ বদন্তি (ছায়া ও আলোর ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলেন); যে চ (এবং যাঁরা); পঞ্চাগ্নয়ঃ (পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপাসক অর্থাৎ গৃহস্থরা); ত্রিণাচিকেতাঃ (যাঁরা তিনবার নাচিকেত যজ্ঞ চয়নকারী); [তে অপি বদন্তি (তাঁরাও ঐরূপ বলেন)]।

সরলার্থ: জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বুদ্ধিরূপ হৃদয়গুহায় বাস করেন এবং নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করেন। এই হৃদয়াকাশই আত্মাকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ স্থান। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে আলো-ছায়ার মতো পরস্পরের সঙ্গে নিত্য যুক্ত বলেন। যে সব গৃহী পঞ্চ-অগ্নির উপাসনা করে থাকেন এবং তিনবার নাচিকেত যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন তাঁরাও একই কথা বলেন।

ব্যাখ্যা: এই জগতের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেছেন। একদিক থেকে বলা যায় ব্রহ্মই এই জগতের স্রষ্টা। অবশ্য রূপক অর্থে। বস্তুত ব্রহ্ম কিছুই করেন না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই ব্রহ্ম। জীবাত্মারূপে ব্রহ্ম বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। ইনি কর্ম করেন এবং সেই কর্মের ফলও ভোগ করেন। পরমাত্মা আছেন বলেই জীবাত্মার পক্ষে এইসব কর্ম করা সম্ভব হয়।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা আলো-ছায়ার মতো সবসময় একসঙ্গে থাকেন। পরমাত্মা কোন কর্ম করেন না। জীবাত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য মনে হয় যেন পরমাত্মা সক্রিয়। এই প্রতিভাস আপেক্ষিক অর্থে সত্য, চূড়ান্ত সত্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা

উভয়কেই কর্তা এবং কর্মফল ভোক্তা বলে মনে হয়। যদিও আপেক্ষিক অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক, কিন্তু মূলত তাঁরা এক ও অভিন্ন।

'ঋতম্'—কথাটির অর্থ 'সত্য'। কথাটির অন্য অর্থ 'অব্যর্থ বিধান'। কিন্তু এখানে ঋতম্ কথার অর্থ 'কর্মফল'। কাজ করলে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই 'কর্মফল' অর্থে এখানে 'ঋতম্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'সুকৃতস্য'—কথাটির অর্থ 'সৎকাজের', অপর অর্থ হল 'নিজের কৃতকর্মের'। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে কাজ সম্পন্ন হয় তা কল্যাণকর এবং সকলকে আনন্দ দেয়। স্রষ্টা নিজের আনন্দে সৃষ্টি করে চলেন এবং এই আনন্দের ফলও আনন্দ। ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসাবে যদি কেউ কাজ করেন তবে সে কাজের ফল ভাল হয়। এভাবে কাজ করে তিনি নিজেও আনন্দ পান, অপরকেও আনন্দ দেন। কিন্তু তিনি যদি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন, তবে তার ফল অশুভ হতে পারে—শুধু তাঁর নিজের পক্ষেই নয়, অপরের পক্ষেও বটে।

কাজ করার সময় জীব যেন স্মরণে রাখে যে, সে ও পরমাত্মা স্বরূপত এক, আলাদা নয়। এতে তার কর্মফলে আসক্তি দূর হয়। এই হল কর্ম করার কৌশল।

'পরমে' কথাটির অর্থ 'উন্নততর'; শরীরের অন্যান্য অংশ বা বাইরের যে কোন স্থানের চেয়ে হৃদয়ের স্থান ঊর্ধ্বে। কেননা এখানেই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়ে থাকে।

'পরার্ধে' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'দেহের অপেক্ষাকৃত উন্নত অংশ'। এখানে এর অর্থ হৃদয়াকাশ, যেখানে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি॥২

অন্বয়: ইজানানাং যঃ সেতুঃ (যিনি যাজ্ঞিকগণের ভবসমুদ্র অতিক্রম করার সেতু [যাজ্ঞিকগণ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের অনুসারী গৃহস্থেরা]); [তং] নাচিকেতম্ (সেই নাচিকেত যজ্ঞকে); [বিয়ং জ্ঞাতুম্] শকেমহি (আমরা জানতে এবং চয়ন করতে সমর্থ হয়েছি); তিতীর্ষতাম্ (উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট); অভয়ং পারম্ (অভয়পারে [ভবসমুদ্র পারের অর্থাৎ সংসার সাগরের ভয়শূন্যপারে যাওয়ার চাবিকাঠি]); অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্ (তাঁদের পরম আশ্রয় নির্গুণ ব্রহ্ম)।

সরলার্থ: যাগযজ্ঞ করে যাঁরা সংসার সমুদ্র অতিক্রম করতে চান তাঁদের পক্ষে নাচিকেত যজ্ঞই উপযুক্ত সেতু। আমরা এই যজ্ঞের কথা জানি এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানেও সক্ষম;

ভবসমুদ্রের অভয়পারে যাওয়ার পথও আমরা জানি। সেই পারে যেতে পারলে পরা ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে আমরা এক হয়ে যাই এবং সমস্ত ভয় মুক্ত হই।

ব্যাখ্যা: যাঁরা যাগযজ্ঞ করেন, তাঁরা ভবসমুদ্র পারের সেতু হিসাবে নাচিকেত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন। এর দ্বারা কালে তাঁরা স্বর্গলাভ করেন। সেখানে বিরাটের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরা যমরাজের মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে থাকেন। কিন্তু এই পদমর্যাদা তাঁদের তৃপ্ত করতে পারে না। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁরা ক্লান্ত বোধ করেন এবং কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান। এক সময়ে তাঁদের এই প্রয়াস সফল হয় অর্থাৎ তাঁরা মোক্ষ লাভ করেন। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা এত ঘুরপথ পছন্দ করেন না। স্বর্গে যাওয়াকে তাঁরা সময়ের অপচয় বলে মনে করেন। কারণ স্বর্গ বা অন্য কোথাও এমন কিছু নেই যা তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে। তাঁরা সোজাসুজি আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান। মৃত্যুর পর এই সব মানুষ ব্রহ্মে সম্পূর্ণভাবে লীন হয়ে যান। এই অবস্থায় কেবলমাত্র একত্বের বোধ থাকে। যেহেতু দুইবোধ চিরতরে ঘুচে যায়, অতএব কাকে আর তিনি ভয় করবেন? তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ভয়মুক্ত হন। সর্বত্র তাঁরা ব্রহ্ম দর্শন করেন।

এই শ্রেণীর মানুষ পরা ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করেন। আর পূর্বোক্ত গোষ্ঠী অপরা ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥৩

অন্বয়: আত্মানম্ (আত্মাকে অর্থাৎ শরীরী আত্মাকে); রথিনং বিদ্ধি (রথী বলে জেনো); শরীরম্ (দেহকে); রথম্ এব তু (রথ বলে জেনো); বুদ্ধিং তু (বুদ্ধিকে); সারথিং বিদ্ধি (সারথি বলে জেনো); মনঃ চ (এবং মনকে); প্রগ্রহম্ এব (বল্গা অর্থাৎ লাগাম বলে জেনো])।

সরলার্থ: জীবাত্মাকে রথের রথী এবং শরীরকে রথ বলে জেনো; বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা বলে জেনো।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মা, মন, বুদ্ধি এবং দেহের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে একটি চমৎকার উপমা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মা দৃশ্যত কিছু করেন না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই দেহ, মন ও বুদ্ধি কর্মক্ষম হয়। এগুলির কোনটিই স্বতন্ত্র নয়—আত্মার ইচ্ছার অধীন।

আত্মা বলতে এখানে জীবাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। স্বরূপত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন; কিন্তু যতক্ষণ জীবাত্মা মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত না হন, ততক্ষণ তিনি স্বাধীন নন।

প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা মুক্ত, কিন্তু তিনি নিজেকে বদ্ধ মনে করেন। এই ভ্রান্তি দূর করতে জীবাত্মাকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়। নিজের গাড়ী চালিয়ে মানুষ ভালমন্দ যে কোন স্থানেই যেতে পারে। ঠিক তেমনি, নিজের দেহকে মানুষ মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, না সংসারজালে বদ্ধ করবে তা সম্পূর্ণ তার নিজের হাতে। চালক রূপে বুদ্ধির ভূমিকা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধি সজাগ থাকলে কখনও সঙ্কটে পড়তে হয় না।

মানুষ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) সমষ্টি। এ ছাড়া আছে চারটি অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত (হৃদয়) এবং অহঙ্কার (অহংবোধ)। মনে সঙ্কল্প-বিকল্প আছে কিন্তু বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। হৃদয়ে সব অতীত সংস্কার সঞ্চিত থাকে; আর অহংবুদ্ধি জীবাত্মাকে দেয় কর্মপ্রেরণা। এই সবকিছুর মধ্যে আবার বুদ্ধিই প্রধান।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরয়ান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥৪

অন্বয়: মনীষিণঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ); ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ (ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব বলে থাকেন); তেষু বিষয়ান্ গোচরান্ আহুঃ (ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের [রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি] বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বিচরণ পথ বলে থাকেন); আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা); ইতি [আহুঃ] (এইরূপ বলে থাকেন)।

সরলার্থ: প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং শরীরকে রথরূপে বর্ণনা করেছেন। [রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি] ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেন সেই অশ্বের রাজপথ। দেহ, মন, ও ইন্দ্রিয় যুক্ত আত্মাই স্বয়ং ভোক্তা।

ব্যাখ্যা: দেহ যদি রথ হয়, তবে সেই রথ টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ঘোড়ার। ইন্দ্রিয়সমূহই এই ঘোড়া। উপমাটি যথার্থ। ঘোড়ার মতোই ইন্দ্রিয় সদা চঞ্চল। উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ। ভালমন্দ নির্বিচারে সব বস্তুই ইন্দ্রিয়কে সহজে আকৃষ্ট করে। ইন্দ্রিয় ভালমন্দ বিচারে অক্ষম। মন কিন্তু ভালমন্দ বিচার করতে পারে। এই মনই ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। ঘোড়া যেমন বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে, ইন্দ্রিয়সমূহও তেমনি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর দিকে ধাবিত হয়।

প্রশ্ন হল—কর্তা কে? শরীরের যাবতীয় কর্ম কে সাধন করে? দেহ, মন অথবা ইন্দ্রিয়? কোন্‌টি? উত্তর হল—দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় যুক্ত আত্মাই কর্তা। এই আত্মাকে 'জীব' বা 'জীবাত্মা'ও বলা হয়। আমাদের প্রকৃত আত্মা হলেন পরমাত্মা, যা শুদ্ধ চৈতন্য। মায়ার

প্রভাবে পরমাত্মা নানা গুণে বিশেষিত হয়ে জীবাত্মা রূপে প্রতিভাত হন। তপস্যার দ্বারা এইসব আরোপিত গুণ মুছে ফেলা যায়। মনই এইসব গুণ আরোপ করে, আবার মনেই তার বিনাশ হয়। মন সম্পূর্ণ সংযত হলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কল্পিত ভেদ মুছে যায়। মানুষের মনই বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ের জন্য দায়ী।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।।৫

অন্বয়: যঃ তু (যে বুদ্ধি [যে বুদ্ধিরূপ সারথি]); অযুক্তেন মনসা (অসংযত মনের সঙ্গে); সদা (সর্বদা [যুক্ত হয়ে]); অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীন); ভবতি (হয়); সারথেঃ দুষ্টাঃ অশ্বাঃ ইব (রথচালকের অসংযত অশ্বের ন্যায়); তস্য ইন্দ্রিয়াণি অবশ্যানি (তার ইন্দ্রিয়সকল অসংযত হয়)।

সরলার্থ: বুদ্ধি যদি উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয় এবং একইসঙ্গে সে যদি অসংযত মনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে বুদ্ধির অবস্থা সেই সারথির মতো যাকে কতগুলি দুরন্ত ঘোড়ার সাহায্যে রথ চালনা করতে হচ্ছে।

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় বিচার করতে অক্ষম, সে তার নিজ প্রবৃত্তির দাস। সে এমন সব কাজ করে ফেলে যা অনুচিত, অন্যায়, যা তার পক্ষে ক্ষতিকর। তার উপর যদি তার মনও অসংযত হয়, তবে আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। তখন তার অবস্থা সেই সারথির মতো যে নিজে নির্বোধ, অজ্ঞ, উপরন্তু তার রথের ঘোড়াগুলিও দুরন্ত ও অবাধ্য।

এখানে মানুষের বিচার শক্তি এবং নিজ মনকে বশে রাখার ক্ষমতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে এই দুটি গুণেরই অভাব সে করুণার পাত্র।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।।৬

অন্বয়: যঃ তু (কিন্তু যাঁর বুদ্ধিরূপ সারথি); সদা (সর্বদা); যুক্তেন মনসা (সংযত মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে); বিজ্ঞানবান্ ভবতি ([প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে] বিবেকবান হন); তস্য ইন্দ্রিয়াণি (তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ); সারথেঃ সদশ্বাঃ ইব (রথ-চালকের সুসংযত অশ্বসমূহের ন্যায়); বশ্যানি (বশীভূত হয়)।

সরলার্থ: যখন কোন ব্যক্তি বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন হন, সেই বুদ্ধি যখন সংযত মনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহও যখন বশে থাকে, তখন তাঁর বুদ্ধিরূপ সারথি যেন সুশিক্ষিত ঘোড়ার সাহায্যে রথ চালনা করছেন।
ব্যাখ্যা: আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলমন্ত্র হল আত্মসংযম। সর্বাগ্রে শুভ এবং বিবেকী বুদ্ধি থাকা চাই। তারপরে প্রয়োজন সংযত মন। যাঁর মধ্যে বিবেকবুদ্ধি এবং সংযত মনের যোগাযোগ ঘটে তিনি হলেন সেই সারথির মতো যিনি সুনিয়ন্ত্রিত ঘোড়ার সাহায্যে রথ চালনা করেন। সংযত মন ও ইন্দ্রিয় মানুষকে কখনও বিপথে চালিত করে না। আত্মজ্ঞান লাভের পথে এরকম মানুষের অগ্রগতি সুনিশ্চিত। আত্মজ্ঞান লাভ হলে জাগতিক প্রলোভন তাঁকে আর আকৃষ্ট করতে পারে না। তখন তিনি আদর্শ মানুষ হিসেবে গণ্য হন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥৭

অন্বয়: যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ (যে ব্যক্তির বুদ্ধি-সারথি বিবেকহীন); অমনস্ক (যাঁর মন অসংযত); সদা অশুচিঃ (সর্বদা অপবিত্র [যেহেতু অসংযত মন ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ সেহেতু সদা অপবিত্র]); ভবতি (হয়); সঃ (সেই ব্যক্তি); তং পদং ন আপ্নোতি (সেই পরমপদ [অর্থাৎ আত্মজ্ঞান] লাভ করতে পারেন না); চ সংসারম্ অধিগচ্ছতি (পরন্তু সংসারে জড়িয়ে পড়েন [অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়েন])।
সরলার্থ: যাঁর বুদ্ধি উচিত-অনুচিত বিচারে অক্ষম, যাঁর অসংযত মন অপবিত্র ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে না, এমন মানুষের আত্মজ্ঞানে অধিকার নেই। উপরন্তু এরকম মানুষ জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়েন।
ব্যাখ্যা: যিনি উচিত-অনুচিত বিচার করে কাজ করতে পারেন না, তাঁর অবস্থা কি হয় সেকথাই এখানে বলা হয়েছে। তাঁর বুদ্ধি অপরিণত; মনকেও সংযত করতে তিনি ব্যর্থ। তিনি তাঁর নিজের প্রভু নন, মনের ক্রীতদাস। ফলে তিনি এমন সব বস্তুর পিছনে ছোটেন যা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু তিনি নিরুপায়। এককালে আত্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর মনেও ছিল। কিন্তু অপরিণত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। তাঁর দৃষ্টি এখন জগতের দিকে। অতএব জন্মমৃত্যুর চক্রে বদ্ধ হওয়াই তাঁর নিয়তি।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥৮

অন্বয়: যঃ তু (কিন্তু যিনি [যে রথী]); বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবান); সমনস্কঃ (সংযতমনা); সদা শুচিঃ ভবতি ([এবং] সর্বদা পবিত্র হন); সঃ তু তৎ পদম্ আপ্নোতি (তিনি সেই পরমপদ লাভ করেন); যস্মাৎ ভূয়ঃ ন জায়তে (যে স্থান থেকে তিনি আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না)।

সরলার্থ: যাঁর বিবেক আছে এবং মনও যাঁর সংযত তিনি (কায়মনোবাক্যে) সদাপবিত্র। এমন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই তাঁর লক্ষ্যে (আত্মজ্ঞানলাভ) পৌঁছতে সক্ষম। (এই লক্ষ্যে পৌঁছলে) তিনি আর জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়েন না।

ব্যাখ্যা: সবসময় ভালমন্দ বিচার করে যিনি কাজ করেন তাঁর কি লাভ হয় সে কথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি মন্দকে ত্যাগ করে ভাল দিকে মনকে চালিত করতে সচেষ্ট হন। প্রথমে কঠিন মনে হলেও নিরন্তর প্রয়াসের ফলে ক্রমশ তিনি নিজের মনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেন। মন বশে এলে লক্ষ্য আর বেশী দূরে থাকে না। আত্মসংযমেই ধর্মের আরম্ভ ও পরিণতি। শুদ্ধ মনে পরমাত্মা স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৯

অন্বয়: যঃ নরঃ তু বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকবুদ্ধি যাঁর সারথি); মনঃ প্রগ্রহবান্ (সংযত মনরূপ বল্গা সমন্বিত [অর্থাৎ যাঁর বল্গাস্থানীয় মন বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ]); সঃ (তিনি); অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি (সংসারমার্গের পরপার প্রাপ্ত হন [অর্থাৎ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন]); তৎ (সেই [সর্বোচ্চ] অবস্থা); বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (বিষ্ণুর পরম পদ [অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হন])।

সরলার্থ: উত্তম সারথির মতো বুদ্ধি যাঁকে সঠিক পথে চালিত করে, যাঁর মন বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এ দুয়ের যোগে যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন তিনি এই সংসারমার্গের পারে যেতে সক্ষম। সেখানে তিনি বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন অর্থাৎ তিনি পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন।

ব্যাখ্যা: এখানে একটি রূপকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, আমরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। নিজেকেই নিজের প্রভু হতে হবে। বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় যন্ত্রমাত্র; এইসব

যন্ত্রকে আমরা নিজেদের রুচিমতো ভাল কিংবা মন্দ কাজে ব্যবহার করে থাকি। এই সব যন্ত্রের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। যন্ত্রগুলি যেন আমাদের না চালায়, আমরাই তাদের চালনা করব। নিজেদের কল্যাণে আমরা তাদের ব্যবহার করব। বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে সঠিক পথ দেখাবার জন্য। বুদ্ধি মাঝে মাঝেই ভুল করে। সেজন্য তাকে সতর্ক করতে হবে যাতে ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বুদ্ধিকে নির্দেশ দিতে হবে। কখনও কখনও মন হয়তো বিদ্রোহ করবে। কিন্তু বুদ্ধি সজাগ থাকলে মনকে বশে আনা সহজ হবে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান। মন যদি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে, তবে বহিরিন্দ্রিয়গুলি কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না। এইভাবে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কি? পথের শেষে পৌঁছানই লক্ষ্য। এখন আমরা পথের যে-প্রান্তে রয়েছি সেখানে শুধুই বন্ধন; সেখানে জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, হাসিকান্নার বেড়াজালে আমরা আবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু পথের অপর প্রান্ত অর্থাৎ মোক্ষলাভ। সেখানে জন্মমৃত্যু, আসা-যাওয়ার পরিসমাপ্তি। 'আমি আর তুমি আলাদা'—এই পৃথক বোধই বন্ধন। আর এই বন্ধন থেকে মুক্তিই হল মোক্ষ। মোক্ষলাভ হলে মানুষ সকলের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। জীবাত্মা তখন পরমাত্মায় মিলিত হন। জলবিন্দু সমুদ্রে পড়ে সমুদ্রই হয়ে যায়। এইরকম একত্বে প্রতিষ্ঠিত মানুষ অপার আনন্দের অধিকারী হন।

মোক্ষ এবং বন্ধন, দুই-ই মনের অবস্থা বিশেষ। মন যদি আমাদের বশে থাকে তবেই আমরা মুক্ত। মন অসংযত হলে আমরা বদ্ধ। মক্তিই আনন্দ। বন্ধনই আমাদের সকল দুঃখের কারণ। মন সংযত হলে শত প্রলোভনের মধ্যেও আমরা মুক্ত। ধর্ম বলতে এইরকম সংযত মনকেই বোঝায়।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥১০

অন্বয়: হি (নিশ্চয়ই); ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে); অর্থাঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু [অর্থাৎ রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়সমূহ]); পরাঃ (শ্রেষ্ঠ [অর্থাৎ সূক্ষ্মতর, ব্যাপক, আত্মার অধিকতর নিকটবর্তী]); অর্থেভ্যঃ চ মনঃ পরম্ (বিষয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ); মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); বুদ্ধেঃ মহান্ আত্মা পরঃ (মহান আত্মা বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ)।
সরলার্থ: ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (রূপ, রস, ইত্যাদি); ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন; মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি; বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই মহান আত্মা (যিনি বুদ্ধির

সমষ্টিরূপ)।

ব্যাখ্যা: এখানে 'শ্রেষ্ঠ' কথাটির অর্থ 'সূক্ষ্মতর', 'আরও ব্যাপক'; এবং 'আত্মার আরও কাছাকাছি'।

ইন্দ্রিয় দুইপ্রকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়।

'বস্তু' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে 'পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ' (যথা রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি)। বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে ঠিকই; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া কোন বস্তুকে চেনা সম্ভব নয়। যেন সেই উদ্দেশ্যেই বাইরের বস্তুসকল ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করেছে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের অর্থাৎ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা কার্যকারণ সম্পর্কের মতো। কার্য কারণকে নির্ভর করে থাকে। সুতরাং কার্যের চেয়ে কারণ শ্রেষ্ঠ। এই অর্থে ইন্দ্রিয়ের চেয়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয় শ্রেষ্ঠ।

একই যুক্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ। বস্তুর মতোই মনও পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত। কিন্তু বস্তুর চেয়ে মন সূক্ষ্মতর, অতএব শ্রেষ্ঠ। যেহেতু মন আরও সূক্ষ্ম সেহেতু মনের ব্যাপ্তিও বেশি এবং তা আত্মারও নিকটতর। বস্তুর চেয়ে মনের শ্রেষ্ঠত্বের এইটি হল আর এক কারণ।

মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কারণ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। মন সদা চঞ্চল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। কিন্তু বুদ্ধি মনকে সঠিকপথে চালিত করে। মনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

মনোজগৎ বলতে বোঝায়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার। এদের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র কাজের বিভিন্নতায়। আগেই বলা হয়েছে মন সবসময় কিছু করতে চায়, কিন্তু কি করা উচিত তা স্থির করতে পারে না। বুদ্ধি তাই মনের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চিত্ত বা হৃদয়ের কাজ আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং স্মৃতিতে সব কিছু ধরে রাখা। অহঙ্কারই মনোজগতে সকল কাজের প্রেরণা যোগায়। এর অপর নাম অহংবোধ।

বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহান আত্মা। এই মহান আত্মা কি? সমষ্টিরূপে প্রকাশিত চৈতন্য। এই মহান আত্মাই শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্মের প্রথম সূক্ষ্ম প্রকাশ। এঁর অপর নাম হিরণ্যগর্ভ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥১১

অন্বয়: মহতঃ (মহান আত্মা থেকে [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ থেকে]); অব্যক্তম্ (অব্যক্ত [অর্থাৎ প্রকৃতি, মায়া]); পরম্ (শ্রেষ্ঠ); অব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ (অব্যক্ত থেকে পুরুষ [অর্থাৎ

পরমাত্মা] শ্রেষ্ঠ); পুরুষাৎ পরং ন কিঞ্চিৎ (পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই); সা কাষ্ঠা (তিনিই পরাকাষ্ঠা, চূড়ান্ত পরিণতি); সা পরা গতিঃ (তিনিই শ্রেষ্ঠ গতি বা গন্তব্যস্থান)।

সরলার্থ: মহান আত্মার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত; অব্যক্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা। পরমাত্মার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু হতে পারে না। জীবের সমস্ত বিকাশের এখানেই চূড়ান্ত পরিণতি। পরমাত্মাই মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

ব্যাখ্যা: আমাদের ক্রমবিকাশ নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, কার্য থেকে কারণে। পূর্ববর্তী ও বর্তমান শ্লোক দুটি এই তত্ত্বই নির্দেশ করে। যে কোন ভাবে হোক আমাদের সেই মূল কারণে পৌঁছাতে হবে। সেই মূলই হল ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। 'আমিই পরমাত্মা' 'আমিই ব্রহ্ম'—এই তত্ত্ব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

ব্রহ্মকে জানা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ। আবার ব্রহ্ম সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে বিরাজিত। যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আছেন বলেই সব কিছু আছে। ব্রহ্ম যে এই সব কিছুর স্রষ্টা তা নয়, সব কিছুর মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকেই প্রকাশ করেন। আর যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন তার নাম মায়া। দুধ এবং তার ধবলত্ব যেমন অবিচ্ছেদ্য, ব্রহ্ম এবং মায়াও তেমনি অভিন্ন।

মায়া ব্রহ্মেরই ক্রিয়াশক্তি। মায়া ব্যতীত কোন প্রকাশ সম্ভব নয়। হিরণ্যগর্ভ বা মহান আত্মাকে (অর্থাৎ মহৎকে) ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ বলা হয়। মায়াশক্তির সাহায্যেই এই প্রথম প্রকাশ সম্ভব হয়ে থাকে। এইজন্য মায়া হিরণ্যগর্ভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু মায়া নিজে কিছু করতে পারেন না। ব্রহ্ম সাক্ষী-রূপে আছেন বলেই মায়া সক্রিয় হন। তাই ব্রহ্ম মায়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মই মহত্তম, সূক্ষ্মতম, অন্তরতম। জীবের সমস্ত বিকাশের চূড়ান্ত পরিণতি ব্রহ্মে। ব্রহ্মই পরমাত্মা। এই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়াই মানুষের লক্ষ্য। এই মিলনের মধ্য দিয়ে জীবাত্মাই পরমাত্মা হয়ে ওঠেন।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥১২

অন্বয়: এষঃ আত্মা (এই আত্মা); সর্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতে অর্থাৎ বস্তুতে); গূঢ়ঃ (প্রচ্ছন্ন); ন প্রকাশতে (প্রকাশিত হন না); তু (কিন্তু); অগ্রয়া (একাগ্রতাযুক্ত); সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা (সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা); সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ কর্তৃক); দৃশ্যতে ([ইনি] দৃষ্ট হন)।

সরলার্থ: পরমাত্মা সকল বস্তুতে প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছেন। তিনি সকলের অগোচরে আছেন। যাঁরা সূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁরাই কেবল তীক্ষ একাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

ব্যাখ্যা: পরমাত্মাকে নিজ আত্মারূপে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। পরমাত্মা সকলের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে আমরা কেউ দেখতে পাই না কেন? কারণ কোন কিছুই আমরা তলিয়ে দেখি না, ভাসাভাসা দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। আমরা যা কিছু করি সবই আমাদের দেহ, মন ও বুদ্ধির কাজ বলে মনে করি। আসলে দেহ, মন, বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র। তাদের সব কাজ অদৃশ্য নিয়ন্তার অধীন। যেমন পুতুলনাচে পুতুলকে অভিনয় করতে দেখা যায়—কিন্তু বাস্তবে পুতুল কিছু করে না। সূক্ষ্ম তারে পুতুলগুলির হাত-পা বাঁধা থাকে। আড়াল থেকে কেউ সেই তার ধরে টানে। তাতেই মনে হয় পুতুলগুলি নাচছে। আমাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় দেখি, কিন্তু তারা স্বতন্ত্রভাবে কিছু করে না। আত্মা অদৃশ্যভাবে অন্তরে আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করে। সেইজন্যেই মৃত্যুর পরে আমাদের সূব অঙ্গ অক্ষত থাকলেও তাদের কর্মক্ষমতা থাকে না। এর কারণ আত্মা তখন দেহ ছেড়ে চলে যান। তাঁর উপস্থিতিতেই এতদিন ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল ছিল। লোহার টুকরো যেমন চুম্বককে অনুসরণ করে, এও ঠিক তেমনি।

বিবেকবুদ্ধি ও ব্যাকুলতা থাকলে সেই ব্যক্তির হৃদয়ে পরমাত্মা আত্মপ্রকাশ করেন। এহেন মানুষই বস্তুর মর্মার্থ গ্রহণে সক্ষম। বস্তুর বাইরের রূপ দেখে তাঁরা প্রতারিত হন না। বরং কোন্ বস্তু আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে কতটা সহায়ক, তাই হল তাঁদের বস্তুবিচারের মাপকাঠি। তাঁরা জানেন স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ এপথের অন্তরায়। অতএব তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের মন উচ্চতর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণতা প্রাপ্তিকে তাঁরা সর্বোচ্চ স্থান দেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় কঠোর জীবন যাপন করেন। নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁরা যে কোনরকম কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত। তাঁদের মূলমন্ত্র আত্মসংযম। জাগতিক কোন প্রলোভন তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। তাঁদের ইচ্ছাশক্তি লৌহকঠিন। কোন বস্তু তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অনুকুল না প্রতিকূল তা বিচার করার ক্ষমতা তাঁরা অর্জন করেন। সাধনার প্রতিকূল বস্তুকে তাঁরা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন। এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন।

যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥১৩

অন্বয়: প্রাজ্ঞঃ (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); বাক্ (বাগিন্দ্রিয়কে অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে); মনসী (মনে); যচ্ছেৎ (অর্পণ করবেন); তৎ (উক্ত মনকে); জ্ঞানে আত্মনি (প্রকাশরূপ আত্মাতে [অর্থাৎ বুদ্ধিতে]); যচ্ছেৎ (অর্পণ করবেন); জ্ঞানম্ (উক্ত বুদ্ধিকে); মহতি আত্মনি (মহান আত্মাতে [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভে]); নিযচ্ছেৎ (সমর্পণ করবেন); তৎ (উক্ত মহান আত্মাকে); শান্তে আত্মনি (শান্ত আত্মাতে [অর্থাৎ নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় শান্ত পরমাত্মাতে]); যচ্ছেৎ (সমর্পণ করবেন)।

সরলার্থ: প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে, মনকে প্রকাশরূপ বুদ্ধিতে, প্রকাশরূপ বুদ্ধিকে সমষ্টিবুদ্ধি বা মহান আত্মা. হিরণ্যগর্ভে, এবং সমষ্টিবুদ্ধিকে শুদ্ধ আত্মায় প্রত্যাহার করে নেন।

ব্যাখ্যা: এখানে লক্ষণীয় যে, বাক্‌কে সব ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

সকল ইন্দ্রিয়কে যোগসিদ্ধ প্রথায় আত্মায় প্রত্যাহার করার ক্রমিক প্রক্রিয়াটি এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মাই পরম সত্তা। আত্মা প্রভু, ইন্দ্রিয় তাঁর দাস। তাই আত্মার ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করে। এখানে সম্পূর্ণ ক্রমবিন্যাসটি দেওয়া হয়েছে। আত্মা বুদ্ধির নিয়ামক, বুদ্ধি মনের নিয়ামক, মন ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। আত্মাই প্রকৃত সত্তা। অন্য সব কিছু আত্মায় আরোপিত গুণমাত্র। কোন গুণ স্থূল, কোন গুণ সূক্ষ্ম, কিন্তু স্থূল বা সূক্ষ্ম নির্বিশেষে সব গুণই বর্জন করতে হবে। এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়া চলে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, কার্য থেকে কারণে। সব শেষে থাকেন আত্মা, যিনি আদি কারণ। সেখানে পৌঁছলে দেখা যায় আমি ও আত্মা অভিন্ন। তখন উপলব্ধি হয়, অন্তরে ও বাইরে সেই একই আত্মা বিরাজমান। আমিই সর্বত্র রয়েছি। তখনই মানুষ 'শান্ত' হয়। বাইরে আর কিছু চাইবার থাকে না, কারণ সবই তার ভিতরে রয়েছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥১৪

অন্বয়: উত্তিষ্ঠত ([হে জীবগণ] ওঠো [অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখী হও]); জাগ্রত (জাগো [অর্থাৎ মোহনিদ্রা থেকে জাগো]); বরান্ প্রাপ্য (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রাপ্ত হয়ে); নিবোধত (অবগত হও [অর্থাৎ আত্মার সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর]); ক্ষুরস্য নিশিতা ধারা (ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ); দুরত্যয়া ([যেরূপ] দুর্গম হয়); তৎ পথঃ ([সেইরূপ] সেই পথকে); কবয়ঃ (বিবেকবান ব্যক্তিগণ); দুর্গং বদন্তি (দুর্গম বলেন)।

সরলার্থ: হে মনুষ্যকুল, ওঠো জায়গা। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভ কর এবং তাঁদের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর। পণ্ডিতেরা বলেন, আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে চলার মতোই কঠিন।

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের প্রতি এ এক উদাত্ত আহ্বান। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে বৃহত্তর সুখ আর কিছু জানে না। উপনিষদ কৃপাপরবশ হয়ে তাদের জাগাচ্ছেন, মোহনিদ্রা ত্যাগ করতে বলছেন। স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই অধিকাংশ মানুষের কাছে শেষ কথা। কিন্তু এ আমাদের ভুল ধারণা। ইন্দ্রিয়গোচর নয় এমন অনেক উচ্চতর বস্তু আছে, যা হয়তো আরো বেশী, আরো স্থায়ী আনন্দের সন্ধান দিতে পারে। সর্বোচ্চ, মহত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর জন্য ব্যাকুল হও। যা অবিনাশী তা লাভ করার চেষ্টা কর। নিত্য বস্তু আছে, কিন্তু তা তুমি জান না। যাঁরা জানেন তাঁদের শরণাপন্ন হও। তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। শীঘ্র করো। 'আমি যা চাই সব পেয়ে গেছি'—এই ভেবে অযথা সময় নষ্ট করো না। তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে আছ। এ মোহজাল ছিন্ন করো।

যোগ্য আচার্যের শরণ নাও। তাঁরাই তোমার পথ নির্দেশ করবেন। সে পথ আত্মজ্ঞানের পথ। এ পথ দুর্গম। ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে চলার মতোই এ পথ দুরূহ। কিন্তু তা নিয়ে ভেবো না। কিছু মানুষও যদি এই পথে লক্ষ্যে পৌঁছে থাকেন, তবে তুমিও পারবে—একথা নিশ্চিত। আচার্যকে জিজ্ঞাসা করো। তাঁরা তাঁদের সাফল্যের গোপন রহস্য তোমাকে জানাবেন। উৎসাহ, কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়ই হল এই রহস্য। মূল্য যতই উচ্চ হোক, তা দিতে প্রস্তুত থেকো। আত্মজ্ঞান সহজলভ্য হবেই বা কেন? উপনিষদ কোথাও বলেননি এই জ্ঞান লাভ করা সহজ। বরং বারবার এই পথকে দুরূহ বলেই চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত পরম প্রাপ্তির পথ কঠিনতম। আর কঠিন বলেই এই জ্ঞান এত মূল্যবান এবং আত্মজ্ঞানলাভে এত গভীর পরিতৃপ্তি। তবে কঠিন হলেও এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নয়। সকলেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রয়োজন হল প্রকৃত উৎসাহ, কঠোর পরিশ্রম এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়। হীরক খণ্ড ফেলে কি কেউ কাচ নিয়ে ভুলে থাকতে চায়? আসল কথা হল সঠিক লক্ষ্য স্থির করা এবং কঠোর পরিশ্রম করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো।

যে মোহের কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে তার অর্থ হল মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করা। যেমন, আমরা মরীচিকাকে জল বলে এবং দড়িকে অন্ধকারে সাপ বলে ভুল করি। এইভাবেই অজ্ঞান ব্যক্তি অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখকেই নিত্য বলে মনে করে। মানুষের সকল দুর্গতির মূল কারণ এই ভ্রান্তি।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথাহ্‌রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥১৫

অন্বয়: যৎ (যে আত্মা); অশব্দম্ (শব্দবিহীন); অস্পর্শম্ (স্পর্শবিহীন); অরূপম্ (রূপবিহীন); অব্যয়ম্ (ক্ষয়রহিত); তথা (অনুরূপে); অরসম্ (রসবিহীন); নিত্যম্ (নিত্য বা শাশ্বত); অগন্ধবৎ চ (গন্ধশূন্য এবং); অনাদি (উৎপত্তি-রহিত); অনন্তম্ (অন্তহীন); মহতঃ পরম্ (মহৎ থেকে শ্রেষ্ঠ [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের থেকে]); ধ্রুবম্ (নিশ্চল); তম্ (সেই আত্মাকে); নিচায্য (জেনে); মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ([জীব] মৃত্যুকে অতিক্রম করে)।
সরলার্থ: যা শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, গন্ধহীন, যা শাশ্বত ও অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত, যা হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং নিত্যবস্তু—সেই আত্মাকে জেনে মানুষ মৃতকে অতিক্রম করে।
ব্যাখ্যা: মানুষের জীবনের লক্ষ্য আত্মাকে জানা। কিন্তু আত্মা বলতে কি বোঝায়? আত্মাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কারণ আত্মা নির্গুণ এবং আমাদের পরিচিত কোন বস্তুর সঙ্গে এঁর সাদৃশ্য নেই। তাই আত্মার ইতিবাচক বর্ণনা সম্ভব নয়। আত্মর বর্ণনায় তাই কেবল নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে—রূপহীন, শব্দহীন, স্বাদহীন, ইত্যাদি। বস্তুত আত্মা বাক্য-মনের অতীত। আত্মাকে হিরণ্যগর্ভের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আত্মা কারণ, হিরণ্যগর্ভ তাঁর কার্য। কার্য সর্বদাই কারণের ওপর নির্ভরশীল। সেই জন্যই কারণ কার্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আত্মজ্ঞানের পথ দুর্গম। কিন্তু উপনিষদ ও প্রাচীন ঋষিগণের মতে এই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেন তিনি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যান।

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৬

অন্বয়: মৃত্যুপ্রোক্তম্ (যম কর্তৃক কথিত); নাচিকেতম্ (নচিকেতা সম্বন্ধীয়); সনাতনম্ উপাখ্যানম্ (সনাতন উপাখ্যান); উক্ত্বা শ্রুত্বা চ (বলে এবং শুনে); মেধাবী (বিবেকবান ব্যক্তি); ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে); মহীয়তে (মহীয়ান হন [অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হয়ে পূজিত হন])।

সরলার্থ: যম নচিকেতাকে সনাতন বৈদিক উপাখ্যান শুনিয়েছেন। যদি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই উপাখ্যান বারবার শোনেন ও অন্যের কাছে বর্ণনা করেন, তবে তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন, এবং ব্রহ্মরূপেই সম্মানিত হন।
ব্যাখ্যা: এই শ্লোক এবং পূর্ববর্তী শ্লোকে আত্মজ্ঞানের প্রশস্তি করা হয়েছে। বস্তুত আত্মজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করার জন্যই যম ও নচিকেতার কাহিনী উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনী চিরন্তন, কারণ এর আলোচ্য বিষয় হল শাশ্বত আত্মা। নচিকেতার কাছে যম যেন অনন্তকাল ধরে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে চলেছেন। যার সেই কান আছে সে-ই শুনতে পায়।

কিন্তু এই কাহিনী শুনে সকলেই যে উপকৃত হবেন তা নয়। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে এমন আচার্যের কাছ থেকে এই আত্মতত্ত্ব শুনে একজন প্রকৃত বিবেকবান ব্যক্তিই তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। এমন মানুষ রূপান্তরিত হয়ে ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে।
তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি॥১৭

অন্বয়: যঃ (যে কেউ); প্রয়তঃ (কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে); ইমম্ (এই); পরমম্ (অতিশয়); গুহ্যম্ (গোপনীয় [উপাখ্যান); ব্রহ্মসংসদ (ব্রাহ্মণ সমাজে); বা (অথবা); শ্রাদ্ধকালে (শ্রাদ্ধকালৈ, প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি সম্মানের প্রতীক হিসাবে আত্মীয়বর্গ যখন দান করেন); শ্রাবয়েৎ (শ্রবণ করান); তৎ (উক্ত শ্রবণকার্য); আন্যায় (অনন্ত ফল প্রদানে); কল্পতে (সমর্থ হয়)।
সরলার্থ: শুদ্ধ মন ও স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণদের (বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুদের) সভায় যম ও নচিকেতার কাহিনী আবৃত্তি করেন, অথবা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে (যখন প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি সম্মানের প্রতীক হিসাবে আত্মীয়বর্গ নানা উপহার প্রদান করেন) যদি কেউ এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তবে আবৃত্তিকার এবং শ্রোতা উভয়েই এর দ্বারা অশেষ সুফল লাভ করেন। তাঁদের অনন্ত ফল লাভ হয়। 'এই সুকর্ম অনন্ত ফলপ্রসূ হবে' এই কথাটির উপর জোর দিতেই শ্লোকের শেষে এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।
ব্যাখ্যা: আত্মার স্বরূপ অতি দুরূহ বিষয়। এ তত্ত্ব কঠিন ও রহস্যময়। অতএব যে কোন স্থানে এ তত্ত্ব আলোচনা করা উচিত নয়। কেবলমাত্র আত্মসংযমী ব্যক্তির কাছেই এই তত্ত্ব আলোচনা করা চলে; তা না হলে এই দুরূহ বিষয় লোকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান মূলত আত্মতত্ত্বের আলোচনা। যম যেভাবে নচিকেতাকে বলেছেন সেইভাবে এই কাহিনী যদি কেউ আবৃত্তি করেন তবে তাঁর অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে; আর যাঁরা এই আবৃত্তি শুনবেন তাঁদেরও মঙ্গল হবে। কিন্তু বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই সংযমী হতে হবে। আত্মসংযম অভ্যাস করলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, তাঁর চিন্তাও স্বচ্ছ হয়। যাঁর মন এরূপ শুদ্ধ ও সংযত, তিনি সহজেই আত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপ ধারণা করতে সক্ষম হন।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃত্বমিচ্ছন্॥১

অন্বয়: স্বয়ম্ভূঃ (পরমেশ্বর [অর্থাৎ যিনি সর্বদা স্বতন্ত্র]); খানি (ইন্দ্রিয়সমূহকে); পরাঞ্চি ব্যতৃণৎ ([যেন আক্রোশবশত] বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন); তস্মাৎ (সেই হেতু); পরাঙ্ পশ্যতি ([জীব] বাহ্য বিষয়সমূহ দর্শন করে); অন্তরাত্মন্ ন (অন্তরাত্মাকে দেখতে পায় না); কশ্চিৎ ধীরঃ (কোন জ্ঞানী ব্যক্তি); অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্ (অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা করে); আবৃত্তচক্ষুঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে); প্রত্যক্-আত্মানম্ (অন্তরস্থ আত্মাকে); ঐক্ষৎ (দর্শন করেন)।

সরলার্থ: স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে দোষযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এই সব ইন্দ্রিয়ের একটি সহজাত ত্রুটি হল, ইন্দ্রিয়রা সতত বহির্মুখী। সেইজন্য মানুষ বাইরে দেখে, অন্তরস্থ আত্মাকে দেখতে পায় না। কদাচিৎ কোন অমৃতসন্ধানী বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাইরের বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্তরস্থ আত্মাকে দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মা আমাদের অন্তরে আছেন। তবু তাঁকে আমরা দেখতে পাই না কেন? এর কারণ ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবত বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি বাইরের দিকে, অন্তরের খবর সে পায় না। আমাদের দেহ-মনের প্রভু স্বয়ং আত্মা। তিনি আমাদের অন্তরে লুকিয়ে আছেন। শুধু তাই নয়,আত্মার স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যজগতের স্থূল বস্তু অনুভব করতে পারে। কিন্তু অন্তরতম আত্মার সন্ধান তারা পায় না। এই আত্মাকে লাভ করবার একমাত্র উপায় হল ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্জগৎ থেকে গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী করে তোলা। এ যেন নদীর গতিকে বিপরীত দিকে চালনা করে তাকে উৎসমুখে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো। কাজটি অত্যন্ত কঠিন হলেও অসাধ্য নয়। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা এ সম্ভব হতে পারে। এই কাজে যাঁরা সফল হন তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥২

অন্বয়: বালাঃ (অল্পবুদ্ধি লোকেরা [অর্থাৎ বালকের ন্যায় অবিবেকী যে সকল ব্যক্তি]); পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি (বাইরের কাম্য বিষয়সমূহের অনুসরণ করে); [তস্মাৎ (সেহেতু)]; তে (তারা); বিততস্য মৃত্যোঃ পাশং যন্তি (মৃত্যুর বিস্তৃত জালে আবদ্ধ হয়); অথ (এই কারণে); ধীরাঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণ); ধ্রুবম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা (নিত্য অমৃতত্বকে জেনে); ইহ (এই পৃথিবীতে); অধ্রুবেষু (অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে); ন প্রার্থয়ন্তে (কিছুই প্রার্থনা করেন না)।

সরলার্থ: অপরিণত-বুদ্ধির মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পিছনে ছোটে। ফলে অনিবার্যভাবে তারা মৃত্যুর বিস্তৃত জালে ধরা পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিত্যবস্তুর খোঁজ পেয়েছেন। তাই পার্থিব বস্তুকে অনিত্য জেনে তাঁরা সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা: জগতে অনেক প্রলোভন আছে। ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই তাতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে হবে। নতুবা আমরা পদে পদে পরাস্ত হব। এক বাসনা থেকে আসে আর এক বাসনা, তার থেকে আবার আর একটা—এইভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। পরিণামে (এই বাসনাজাল থেকে) পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃত অর্থে মৃত্যু তো একেই বলে। যেন মৃত্যু আমাদের ওপর জাল বিস্তার করে চলেছে এবং আমরা সেই জালে বদ্ধ হচ্ছি। অদূরদর্শী মানুষের এ-ই নিয়তি। শিশুর মতো তাদের বুদ্ধিও অপরিণত। প্রবৃত্তির স্রোতে তারা গা ভাসিয়ে দেয়। ভালমন্দ বিচারে তারা অক্ষম। তাদের জীবনে দুঃখ অনিবার্য।

কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চিন্তাশীল এবং বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করেন। এই জগৎ যে একান্তই ক্ষণস্থায়ী একথা তাঁরা জানেন। তাই জাগতিক কোন প্রলোভনে তাঁদের তীব্র অনীহা। এমনকি পরলোক অর্থাৎ স্বর্গের কোন বিষয়ও তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। আত্মাই একমাত্র সত্য। অতএব আত্মাই তাঁদের একমাত্র সাধনার ধন। আত্মাকে জেনে তাঁরা আত্মার সাথে অভিন্ন বোধ করেন। তাঁরা আত্মারাম, আত্মবতি। কারণ শান্তি ও আনন্দ বাইরের জিনিস নয়, আমাদের ভেতরেই রয়েছে।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥৩

অন্বয়: যেন এতেন এব (যে এই আত্মার দ্বারা); রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ); মৈথুনান্ চ (এবং মিলনজনিত সুখানুভব); বিজানাতি ([লোক] বিশেষভাবে জানতে পারে); অত্র (এই সংসারে [অথবা এই আত্মজ্ঞান বিষয়ে]); কিং পরিশিষ্যতে (আর কি জানবার অবশিষ্ট থাকে [অর্থাৎ সেই আত্মার অজ্ঞেয় কিছুই নেই]); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা)।

সরলার্থ: আত্মার দ্বারাই মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মিলনসুখ অনুভব করে। অতএব (সর্বজ্ঞ) আত্মার অজ্ঞাত আর কি থাকতে পারে? নচিকেতা এই আত্মা সম্পর্কেই জিজ্ঞাসু।

ব্যাখ্যা: যদিও মানুষের ধারণা ইন্দ্রিয়সমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করে, কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের এই দেহমন আত্মার অধীন। আত্মা আছেন বলেই ইন্দ্রিয়রা যে যার কর্ম করে। মৃত্যুর পর মানুষের ইন্দ্রিয় অক্ষত থাকতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষম থাকে না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলির যাবতীয় কর্মক্ষমতা আত্মা থেকেই আসে। এই আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, অতএব সর্বজ্ঞ। আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতা, বাকি সব জ্ঞেয়। আমাদের চারপাশের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আমাদের সচেতন করাই ইন্দ্রিয়ের কাজ। কিন্তু বস্তুসমূহ পরস্পরকে জানতে অক্ষম। বস্তুমাত্রই জড়, ইন্দ্রিয়গুলিও তাই। যা জড় তা স্বভাবতই দেখতে পায় না, স্পর্শও করতে পারে না। কিন্তু আত্মার সঙ্গে যুক্ত হলে মনে হয় যেন জড়বস্তুও দর্শন-স্পর্শনে সক্ষম। একটি তপ্ত লোহার বল আমাদের ত্বক পুড়িয়ে দিতে পারে। আসলে কিন্তু লোহার বলটি পোড়ায় না, পোড়ায় তার উত্তাপ।

এই দৃশ্যমান জগতের যেখানে যা কিছু ঘটে, সবকিছুর পেছনে আত্মা রয়েছেন। বস্তুত এই জগৎ আত্মারই প্রকাশ। নচিকেতা এই আত্মাকেই জানতে চান।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥৪

অন্বয়: স্বপ্নান্তম্ (স্বপ্নের মধ্যে যা কিছু অভিজ্ঞতা); জাগরিতান্তং চ (এবং জাগ্রতাবস্থায় যা কিছু অভিজ্ঞতা); উভৌ (এই উভয় বিষয়ই); যেন অনুপশ্যতি ([লোকে] যাঁর দ্বারা দেখে); মহান্তং বিভুম্ আত্মানম্ ([সেই] মহান সর্বব্যাপী আত্মাকে); মত্বা (মনন করে [অর্থাৎ এই মহান আত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে]); ধীরঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি); ন শোচতি (শোক করেন না [অর্থাৎ দুঃখাতীত হন])।

সরলার্থ: নিদ্রিত অথবা জাগ্রত যে কোন অবস্থাতেই মানুষের যা কিছু অভিজ্ঞতা হয় তা সম্ভব হয় এই মহান ও সর্বব্যাপী আত্মার উপস্থিতিতে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই মহান আত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে শোকাতীত হন।

ব্যাখ্যা: আমাদের তিনটি অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় দেহমন দুই-ই সক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ যা অনুভব করে তা মনের কাছে পৌঁছে দেয়। মন সেগুলির সমন্বয় সাধন করে—যেন মনই ইন্দ্রিয়ের প্রভু। কিন্তু মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে হলেও প্রকৃত নিয়ন্তা কিন্তু মন নয়, আত্মা। মনও আত্মার শক্তিতেই শক্তিমান। আবার স্বপ্নাবস্থায় আমাদের শরীর নিশ্চল থাকলেও মন সক্রিয় থাকে। স্বপ্নে আমরা হয়তো দেখি কতদূরে চলেছি, কত মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে ইত্যাদি। এইভাবে, জাগ্রত অবস্থায় যা করি স্বপ্নেও তাই করছি বলে মনে হয়। এর থেকে বোঝা যায় মন দেহ থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু মনও আত্মার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। সুষুপ্তি অবস্থায় মন নিষ্ক্রিয় থাকে। কারণ সুষুপ্তিতে আত্মা তাঁর শক্তি মন থেকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নেন। এই অবস্থায় দেহমন উভয়েই মৃতবৎ—আত্মা যেন তাদের অতিরিক্ত মনে করে বর্জন করেছেন। সুষুপ্তি থেকে আমরা যখন জেগে উঠি তখন ভাবি এ কোথায় আছি, এটা সকাল না বিকাল ইত্যাদি। অর্থাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগে। যদিও দেহমনে আমরা তখন খুব সতেজ বোধ করি। এর কারণ স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) সাময়িকভাবে হলেও আত্মা তাঁর স্বরূপে অবস্থান করেন। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা আবার আমাদের এই জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং জীবনসংগ্রামের আবর্তে আমরা পুনরায় বদ্ধ হই।

বিবেকী ব্যক্তিরা জানেন, এই তিন অবস্থার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আত্মাকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে, যদিও আত্মার উপর এইসব অভিজ্ঞতার কোন প্রভাব পড়ে না। আত্মা এইসব অভিজ্ঞতার সাক্ষী-স্বরূপ। আত্মা যেন মঞ্চের পর্দা যার ওপর চলমান ছবিগুলি দেখানো হয়। কিন্তু এইসব ছবি পর্দার উপর কোন স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে না। বিবেকী মানুষ আত্মার সঙ্গে নিজেদের অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। জীবনে যা কিছু ঘটুক না কেন, তাঁরা সাক্ষী-স্বরূপ নির্লিপ্ত থাকেন। এইজন্যই তাঁরা সব দুঃখকে অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥৫

অন্বয়: যঃ (যে ব্যক্তি); মধ্বদম্ (মধুভোজী [অর্থাৎ কর্মফলভোগী]); ইমং জীবম্ আত্মানম্ (এই জীবরূপী আত্মাকে); ভূতভব্যস্য ঈশানম্ (ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তারূপে [অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই সর্বকালের নিয়ন্তা রূপে]); অন্তিকাৎ (অতি নিকটে [অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে]); বেদ (জানতে পারেন); [সঃ (তিনি)]; ততঃ ন বিজুগুপ্সতে (অতঃপর [অর্থাৎ সেই জ্ঞানের পর] কিছুই গোপন করতে ইচ্ছা করেন না); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা)।

সরলার্থ: জীবাত্মা নিজকর্মফল ভোগ করেন। তা সত্ত্বেও জীবাত্মা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের অধীশ্বর। যে ব্যক্তি একথা জানেন এবং জীবাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন, তিনি সর্বভয় মুক্ত হন। এই সেই আত্মা যাঁর সম্পর্কে নচিকেতা জিজ্ঞাসু।

ব্যাখ্যা: মূল কথাটি হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে জীবাত্মা সংসার জালে বন্ধ। সে কর্ম করে এবং কর্মফল ভোগ করে। ফল সবসময় ভাল না হলেও জীব কর্ম ছাড়তে পারে না। এই জীবকে তার কাছে উপভোগ্য বলে মনে হয়। সে এইভাবেই জীবনযাপন করতে ভালবাসে। এ আসলে অজ্ঞানতারই নামান্তর; কিন্তু জীব নিরুপায়। যদিও এই কারণে জীবের স্বভাব বা স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এবং সব অবস্থায় সে ব্রহ্মই থাকে। জগতের প্রতি জীবের আসক্তি ক্ষণিকের ভ্রান্তিমাত্র। যে কোন মুহূর্তে নিজেকে সে সংশোধন করতে পারে। ধুলোময়লা সোনাকে ঢেকে দিতে পারে বটে, তবু সোনা সোনাই থাকে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য। একই আত্মা সর্বভূতে ও সর্বত্র রয়েছেন। নামরূপের প্রভাবে এই এক আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হন। মানুষ যখন সবকিছুর মধ্যে এই একত্ব উপলব্ধি করেন, তখন তিনি সব ভয়কে অতিক্রম করেন। তখন তাঁর আর নিজেকে গোপনে রাখার কোন দায় থাকে না। কারণ তিনি তখন এক বৈ দুই দেখেন না। আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। 'আমিই সেই আত্মা'—এই বোধে তিনি তখন অটল। কাকে তিনি ভয় করবেন? এই আত্মাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ॥৬

অন্বয়: যঃ (যে পুরুষ); অদ্ভ্যঃ পূর্বম্ (জলের পূর্বে [অর্থাৎ পঞ্চভূতের পূর্বে]); অজায়ত (জন্মগ্রহণ করেছিলেন); পূর্বং তপসঃ জাতম্ (তপস্যার দ্বারা [অর্থাৎ গভীর চিন্তার দ্বারা]

চৈতন্য থেকে প্রথমজাত [অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ হিরণ্যগর্ভ]); গুহাং প্রবিশ্য (সর্বভূতের হৃদয়গুহাতে প্রবেশ করে); ভূতেভিঃ তিষ্ঠন্তম্ (পঞ্চভূতের সঙ্গে অবস্থিত); [তম্, সেই পুরুষকে]; যঃ ব্যপশ্যত (যিনি বিশেষভাবে দেখেন); [সঃ তৎ এব পশ্যতি, তিনি সেই ব্রহ্মকেই দেখেন]; এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: জল প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্বে প্রথম চৈতন্যজাত যে-সত্তা তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়গুহায় এবং (পঞ্চভূতের) পরিণামরূপ এই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন। এই সত্তাকে যিনি দর্শনে সক্ষম, তিনি ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। ইনিই সেই আত্মা যাঁর কথা জানতে নচিকেতা আগ্রহী।

ব্যাখ্যা: এই জগৎ ব্রহ্মেরই (অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যের) প্রকাশ। এই চৈতন্যের প্রথম প্রকাশ হিরণ্যগর্ভ; এমনকি জল প্রভৃতি পঞ্চভূতেরও পূর্বে তিনি জাত। এই হিরণ্যগর্ভ জগতের সমস্ত সত্তার সমষ্টিরূপ। তিনি সকল প্রাণীর আত্মা। আবার সকল প্রাণীর দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (পঞ্চভূতে গঠিত) সব অংশেই তাঁর অধিষ্ঠান। সর্বত্র সেই এক আত্মাকে দর্শন করাই জীবনের লক্ষ্য। এই আত্মাকেই জানতে নচিকেতা আগ্রহী।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়।
এতদ্বৈ তৎ॥৭

অন্বয়: যা দেবতাময়ী অদিতিঃ (সকল দেবতার আত্মা যে অদিতি [অদিতি অর্থ হল সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং কর্মফলের ভোক্তা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ]); প্রাণেন সম্ভবতি (প্রাণরূপে [অর্থাৎ সমষ্টি শক্তি বা হিরণ্যগর্ভরূপে] নিজেকে প্রকাশ করেন); যা ভূতেভিঃ ব্যজায়ত (যিনি পঞ্চভূত রূপে রয়েছেন); গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ ([তিনি] সর্বভূতের হৃদয়াকাশে প্রবেশপূর্বক অবস্থিত); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা)।

সরলার্থ: সকল দেবতার আত্মা অদিতি সমষ্টি শক্তি বা প্রাণরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি একমাত্র ভোক্তা, তিনিই আবার পঞ্চভূত রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সর্বভূতের অন্তরতম প্রদেশে তিনি অবস্থান করেন। যে সাধক অদিতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম উপলব্ধিতে সক্ষম হন। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা।

ব্যাখ্যা: সাধক যেন প্রাণ অর্থাৎ সমষ্টি শক্তির মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করতে সমর্থ হন, সেই ইঙ্গিতই এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। এই শক্তি সব দেবতা, এমনকি সকল বস্তুর অন্তরে

নিহিত রয়েছে। এই শক্তির নাম অদিতি (আক্ষরিক অর্থ 'ভক্ষক', কারণ এই শক্তি সব কিছুকে ভক্ষণ বা গ্রাস করে)। এই শক্তিই সংহার করে।

কিন্তু পঞ্চভূত (জড়) এই শক্তি থেকে পৃথক নয়। তারা সবসময় একসঙ্গে থাকে। তাদের কার্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তার ফলেই জাগতিক সকল বস্তুর উদ্ভব। সকল বস্তুর এবং সকল প্রাণীর অন্তরে এই শক্তি নিহিত রয়েছে। এরই অপর নাম হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি সত্তা।

যে সাধক এই হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন, তিনি ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করেন। প্রাণরূপে প্রকাশিত এই হিরণ্যগর্ভই স্বয়ং ব্রহ্ম।

অরণ্যোর্নিহিত জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ।।৮

অন্বয়: গর্ভিণীভিঃ গর্ভঃ ইব সুভৃতঃ (গর্ভস্থ শিশুসন্তানের প্রতি গর্ভবতী জননীর অসামান্য মনোযোগের ন্যায়); অরণ্যোঃ নিহিতঃ (অগ্নি-প্রজ্বলন কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত); জাতবেদাঃ অগ্নিঃ (জাতবেদা নামক যজ্ঞাগ্নি [যে যজ্ঞাগ্নি সব আহুতিকে গ্রাস করে। জাতবেদার এক অর্থ অগ্নি, 'জাতবেদা'র অপর অর্থ সমস্ত জাতবস্তুকে যিনি জানেন সেই সর্বজ্ঞ বিরাট পুরুষ। এই 'বিরাট' পুরুষকে গৃহস্থরা যজ্ঞীয় অগ্নিরূপে এবং যোগীরা হৃদয়স্থিত অগ্নিরূপে ধ্যান করেন]); জাগৃবদ্ভিঃ হবিষ্মদ্ভিঃ মনুষ্যেভিঃ (যে সমস্ত মানুষেরা নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং যাঁদের যজ্ঞের উপকরণ প্রস্তুত আছে তাঁদের দ্বারা); দিবে দিবে (প্রতিদিবসে); ঈড্যঃ (পূজনীয়); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

সরলার্থ: গর্ভস্থ শিশুসন্তানের প্রতি গর্ভবতী জননীর মনোযোগ অসামান্য; ঠিক তেমন ভাবেই যাঁরা নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং যাঁদের আহুতির জন্য ঘৃত ও অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত, তাঁরা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির (দুটি কাঠের মধ্যে নিহিত যে অগ্নি, যা যজ্ঞাগ্নি রূপে ব্যবহৃত হয়)। প্রতিও সেইভাবে মনোযোগী। তাঁরা প্রতিদিন অগ্নির উপাসনা করে থাকেন। এই অগ্নিই সর্বজ্ঞ বিরাট (ব্রহ্ম)। ইনিই সেই আত্মা যাঁকে নচিকেতা জানতে চান।

ব্যাখ্যা: প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রতি গৃহস্থ নিজ গৃহে সবসময় যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে রাখতেন এবং আহুতি প্রদান করে সেই অগ্নিকে প্রদীপ্ত রাখতেন। এই অগ্নির প্রতি তাঁদের যে মনোযোগ

তাকে গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি জননীর মনোযোগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুটি শুকনো কাঠ ঘষে সেই যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো হত। জ্বালাবার পর একটি কাঠের খণ্ডকে অপরটির ওপর রাখা হত এবং অতি যত্নে সেই অগ্নির সংরক্ষণ করা হত। গৃহস্থের কাছে এই যজ্ঞাগ্নি ছিল বিরাটের প্রতীক।

যোগীরা অবশ্য নিজ হৃদয়ে বিরাটের উপাসনা করেন। তাঁদের হৃদয়ের অগ্নিই বিরাট এবং তাঁরা এই বিরাটের ধ্যানেই মগ্ন থাকেন।

এই বিরাটই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥৯

অন্বয়: যতঃ চ সূর্যঃ উদেতি (যাঁর থেকে সূর্য উদিত হন); যত্র চ (এবং যাঁতে); অস্তং গচ্ছতি (অস্তমিত হন); তম্ (তাঁতেই [অর্থাৎ ব্রহ্মতেই]); সর্বে (সকল); দেবাঃ (দেবতারা); অর্পিতাঃ (সমর্পিত [অর্থাৎ দেবতারাও তাঁরই অর্থাৎ ব্রহ্মের উপরই নির্ভরশীল]); তৎ (তাঁকে); কঃ চন (কেউই); ন উ অত্যেতি (কখনই অতিক্রম করতে পারে না [অর্থাৎ তাঁকে ছেড়ে স্বতন্ত্র হতে পারে না]); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: যাঁর থেকে সূর্যোদয় হয় এবং যাঁর মধ্যে সূর্য অস্ত যায়, তাঁরই (অর্থাৎ ব্রহ্মের) উপর দেবতারাও নির্ভরশীল। তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন বস্তু থাকতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা যাঁকে জানতে নচিকেতা আগ্রহী।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে উপনিষদ বলছেন, এই দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। এই ব্রহ্ম অব্যক্ত নন। ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ বা বিরাটের কথা এখানে বলা হয়েছে। উপনিষদ বলেন, জগতের সব বস্তু ব্রহ্ম থেকে আসে, ব্রহ্মকে আশ্রয় করে থাকে এবং ব্রহ্মেই লয় হয়। এখানে সূর্য একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সূর্যের প্রবল শক্তিতে আমরা হতবাক হয়ে যাই। কিন্তু এ হেন সূর্যও ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। যত বৃহৎ বা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সকল বস্তুই ব্রহ্মকে অবলম্বন করে থাকে। সমুদ্র ও তার তরঙ্গ এবং চক্রের কেন্দ্র ও তার শলাকাসমূহ আরও দুটি দৃষ্টান্ত। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ অথবা চক্রনাভি ছাড়া শলাকাগুলি থাকতে পারে না না। তেমনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের উদাহরণও দেওয়া হয়—যেমন শরীর ছাড়া ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥১০

অন্বয়: যৎ এব ইহ (যা এখানে); তৎ অমুত্র (তা সেখানে); যৎ অমুত্র (যা সেখানে [অর্থাৎ যা ঐ আত্মাতে স্থিত]); তৎ অনু ইহ (এখানেও তারই অনুরূপ); যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি (যে ব্যক্তি 'যেন ভিন্ন' এরূপ দেখে [অর্থাৎ এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখে]); সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি (সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়ে])।
সরলার্থ: এখানে যা আছে, ওখানেও তা আছে; ওখানে যা আছে, এখানেও তা আছে। এই দুই-এর মধ্যে (অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে) যে পার্থক্য দেখে সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে গমন করে।
ব্যাখ্যা: এই জগৎ ব্রহ্ম থেকে যে বিচ্ছিন্ন নয় এই শ্লোকে সে কথাই বলা হয়েছে। জগৎ 'ঈশ্বরের (ব্রহ্ম) প্রকাশ' অর্থাৎ ঈশ্বরই জগৎ হয়েছেন। ব্রহ্মই জগতের মূল উপাদান।

জগৎকে ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখা অর্থাৎ জগৎকে সত্য (অর্থাৎ নিত্য) বলে মনে করা এক মারাত্মক ভুল। সেক্ষেত্রে এই জগতের নানা প্রলোভনে মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে। এই আসক্তিই বন্ধন। এর ফলে স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের বাইরে মানুষ আর কিছু দেখতে পায় না। জীবনের গতি তখন রুদ্ধ হয়ে যায়। আসলে আসক্তিও এক ধরনের মৃত্যু, বলা যায় আধ্যাত্মিক মৃত্যু যা দৈহিক মৃত্যুরও অধম। আধ্যাত্মিকতার যে আনন্দ তা একদিকে যেমন চিরন্তন, অন্যদিকে আবার মানুষকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হলে মানুষ সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয় মানুষ জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়ে এইভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥১১

অন্বয়: মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্ (কেবলমাত্র [শুদ্ধ] মনের দ্বারা ইহা [অর্থাৎ ব্রহ্ম] উপলব্ধি করা যায়); ইহ ন কিঞ্চন নানা অস্তি (এখানে কিছুই পৃথক নয় [অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে কিছুই পৃথক নয়]); যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি (যে ব্যক্তি এখানে 'যেন পৃথক' এরূপ দেখে); সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুং গচ্ছতি (সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ সে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়])।

সরলার্থ: কেবলমাত্র (শুদ্ধ) মনের দ্বারাই ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব। ব্রহ্ম থেকে পৃথক কিছু নেই। ব্রহ্ম থেকে পৃথক কিছুতে যে বিশ্বাস করে সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাত্রা করে (অর্থাৎ সে বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়)।

ব্যাখ্যা: এ জগতে কোন কিছু ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয়। বরং ব্রহ্ম আছে বলেই সব কিছুর অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম থেকে সব বস্তুর উদ্ভব, ব্রহ্মই তাদের আশ্রয় এবং পরিণামে তারা ব্রহ্মেই লয় হয়।

স্থূল মনের অধিকারী মানুষের পক্ষে এই তত্ত্ব ধারণার অতীত। যাঁর অনুভূতি সূক্ষ্ম তিনিই কেবল এই তত্ত্ব ধারণা করতে সক্ষম হন। এর জন্য দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করে বুদ্ধিকে শাণিত ও মনকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন। মন শুদ্ধ হলে সকল বস্তুর মধ্যে একত্বের অনুভব হয়। জগৎ যে ব্রহ্মের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, এই সত্য তখন উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে এই জগতের কোন অস্তিত্বই নেই।

যে মনে করে, এ জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক এক সত্তা, সে অজ্ঞান। এই অজ্ঞানতা হেতু তাকে পৃথিবীতে বারবার ফিরে আসতে হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥১২

অন্বয়: অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম); মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি (দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন); ভূতভব্যস্য ঈশানঃ ([তিনিই) অতীত [বর্তমান] ও ভবিষ্যৎ কালের নিয়ন্তা); ততঃ (এই জ্ঞান জন্মালে অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানলে); ন বিজুগুপ্সতে ([সাধক] আপনাকে গোপন করতে ইচ্ছা করেন না); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ (ব্রহ্ম) দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধক যখন ব্রহ্মকে জানেন তখন তিনি নিজেকে আর গোপন করেন না। এই আত্মাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন, সেকথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

মানুষের হৃদয়ের আকৃতি পদ্মফুলের মতো বলে মনে করা হয়। তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শূন্যস্থান আছে। জীবাত্মারূপে ব্রহ্ম সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্থান অধিকার করে থাকেন। ব্রহ্ম সর্ববস্তুতে এবং সর্বত্র বিরাজিত। সকল স্থান ব্রহ্মেই পূর্ণ। এজন্যই ব্রহ্মের এক নাম 'পুরুষ',

'যা পূর্ণ করে'। লক্ষণীয় যে, ব্রহ্ম একযোগে ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন। কোন কিছুর দ্বারাই ব্রহ্ম নিঃশেষিত হন না।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন, এই জ্ঞানই মানবজীবনের লক্ষ্য। এ জ্ঞান যিনি অর্জন করেছেন তিনি নিজেকে সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে দর্শন করেন। তাঁর আর দুই বোধ থাকে না। তিনি জানেন সর্বত্র সেই এক আত্মা রয়েছেন এবং তিনিই স্বয়ং সেই আত্মা। তখন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা তিনি সঙ্কোচ অনুভব করেন না। আর সেই কারণেই তাঁর আত্মগোপনের প্রশ্নই আসে না।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ॥১৩

অন্বয়: অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ (সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ); অধূমকঃ জ্যোতিঃ ইব (ধূমহীন [অর্থাৎ শুদ্ধ, নির্মল] অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ময় [যোগীদের হৃদয়ে প্রকাশমান]); ভূতভব্যস্য ঈশানঃ (তিনিই অতীত, [বর্তমান] ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের নিয়ন্তা); সঃ এব অদ্য (তিনি আজও আছেন); সঃ উ শ্বঃ (ভবিষ্যতেও তিনি থাকবেন); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষকে যোগীরা নিজ হৃদয়ে ধূমহীন অগ্নিশিখার মতো দেখেন। এই পুরুষ কালাধীশ—তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ামক। ইনি সতত বিদ্যমান—বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই আত্মাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মা পরমাত্মা ছাড়া যে আর কিছুই নন, এটিই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে বিরাজমান।

আত্মা এই চর্মচক্ষুর গোচর নন। যোগীরা ধ্যানে তাঁকে নিজ হৃদয়ে, ধূমহীন অগ্নিশিখা রূপে প্রত্যক্ষ করেন। আত্মা 'ধূমহীন' কারণ আত্মা শুদ্ধ, নির্গুণ। বস্তুত এই আত্মাই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম। তাঁকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলেও মনে করা হয়; কিন্তু একথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণীয় নয়। তাঁকে যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার কারণ হৃদয়মধ্যস্থিত শূন্য স্থানটি অতি ক্ষুদ্র। আর এই ক্ষুদ্র স্থানটিই পরমাত্মার আসন বলে চিহ্নিত।

ব্রহ্ম রূপে (অর্থাৎ মায়াশক্তি যুক্ত সগুণ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ রূপে) এই আত্মাই পরম এবং চূড়ান্ত সত্য। এই দৃশ্যমান জগতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছুরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি কালাধীশ কারণ তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিয়ামক।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবাণুবিধাবতি॥১৪

অন্বয়: দুর্গে (দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে); বৃষ্টম্ (বর্ষিত); উদকম্ (জল বা বৃষ্টিধারা); যথা (যেরূপ); পর্বতেষু (পার্বত্য নিম্নপ্রদেশসমূহে); বিধাবতি (বিকীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হয় [এবং পরিণামে বিনষ্ট হয়]); এবম্ (এইরূপে); ধর্মান্ (গুণসমূহকে [অর্থাৎ বিভিন্ন দেহের ধর্ম অনুসারে]); পৃথক্ পশ্যন্ (প্রত্যেক জীবে পৃথক আত্মা দর্শন করে); তান্ এব অনুবিধাবতি (তাদেরই [অর্থাৎ ঐ সকল শারীরিক ধর্মেরই] অনুগমন করে [এবং অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়])।

সরলার্থ: দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন বৃষ্টির জলধারা পর্বতচূড়া থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে নীচে পড়ে। অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষের দেহের গঠন আলাদা হওয়ায় তাদের আত্মাও পৃথক বলে মনে হয়। যে এইভাবে চিন্তা করে সে তার নিজ ভেদবুদ্ধির মতোই অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভিন্নতায় উপনিষদ আবার জোর দিচ্ছেন। যারা এই দুইকে ভিন্ন বলে মনে করে তারা করুণার পাত্র। এমন মানুষ বারবার জন্ম-মৃতর শিকার হয়।

বাইরের রূপ ও প্রকৃত সত্যের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে : পর্বতের বিভিন্ন অংশে যে বৃষ্টির জল পড়ে সেই জল বিশুদ্ধ। সেই জলের উৎস এক। কিন্তু পর্বতের গা বেয়ে সেই একই জল বিভিন্ন ধারায় নিম্নমুখী হয়। শুধু তাই নয়, মাটির সঙ্গে মিশে বিভিন্ন জলধারার রংও বদলাতে থাকে—কোনটি হলুদ, কোনটি ধূসর ইত্যাদি। সুতরাং জলধারাগুলিকে ভিন্ন এবং পৃথক বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে, যেহেতু প্রতিটি মানুষের দেহ পৃথক এবং দেহের গঠনও আলাদা সেহেতু প্রত্যেকের আত্মাও পৃথক বলে মনে হয়। কিন্তু দেহের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করাটা যে ভুল, এ বিষয়ে উপনিষদ আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন। দেহ উপাধি মাত্র, অতএব মিথ্যা। দেহ বিনাশশীল। যদি কেউ এই দেহকেই সত্য ভাবে এবং প্রত্যেকের দেহে পৃথক আত্মা আছে বলে মনে করে তবে সে অজ্ঞান; দেহের মতো সেও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, দেহের প্রতি আসক্তির কারণে তাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন, একথা উপনিষদ বারবার ঘোষণা করছেন। দেহ আলাদা বলেই জীবাত্মাকেও আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু দেহগুলি বাইরের রূপ মাত্র। একই বৃষ্টির জলকে পর্বতের গায়ে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত দেখায়। পর্বত ও পৃথিবী আছে

বলেই জলধারার এই পার্থক্য প্রতিভাত হয়। একইভাবে, দেহ আলাদা বলেই জীবাত্মাকে একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥১৫

অন্বয়: গৌতম (হে গৌতম); যথা (যেরূপ); শুদ্ধম্ উদকম্ (বিশুদ্ধ জল); শুদ্ধে (বিশুদ্ধ জলে); আসিক্তম্ (নিক্ষিপ্ত হলে [অর্থাৎ মিশ্রিত হলে]); তাদৃক্ এব ভবতি (তৎস্বরূপই হয় [অর্থাৎ একাকার হয়]); বিজানতঃ মুনেঃ আত্মা (আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত ঋষির আত্মাও); এবং ভবতি (এই প্রকার হয় [অর্থাৎ তিনিও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান])।

সরলার্থ: হে গৌতম, বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলের সঙ্গে মিশলে একাকার হয়ে যায়, তেমনই আত্মজ্ঞ ঋষির আত্মাও একই অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তিনিও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: কেউ সর্বত্র একই আত্মাকে দেখেন; আবার কেউ প্রত্যেক মানুষের আত্মা পৃথক বলে মনে করেন; এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তফাৎ কি? প্রথম জন আত্মাকে জানেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে অজ্ঞ। অজ্ঞ যিনি, তিনি সংসার জালে বদ্ধ। তিনি জগৎকেই সত্য বলে মনে করেন, এই জগৎকে ভোগ করতে চান। স্থূল ইন্দ্রিয়জগতের ঊর্ধ্বে তিনি কিছু চিন্তা করতে পারেন না। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে তিনি নিমজ্জিত। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি বিবেকী মানুষ। যা কিছু ক্ষণস্থায়ী তা তিনি ত্যাগ করেন। আর যা অবিনাশী, নিত্য তার সন্ধান করেন। এই কাজে তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। মনকে আয়ত্তে আনার জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আত্মজ্ঞান লাভের লক্ষ্যে তিনি স্থির। আত্মজ্ঞান ছাড়া তিনি আর কিছু চান না। কেবল আত্মজ্ঞানের বাসনা ছাড়া মনে যদি অন্য কোন বাসনা না থাকে, তবে সেই মন শুদ্ধ। সেই শুদ্ধ মনে আত্মজ্ঞান লাভ করা সহজ। এই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥১

অন্বয়: অজস্য অবক্রচেতসঃ (জন্মরহিত ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, অপরিবর্তনীয় [আত্মার]); একাদশদ্বারং পুরম্ (একাদশ দ্বার বিশিষ্ট নগরকে [অর্থাৎ দেহকে বা আত্মার আবাসস্থলকে]); অনুষ্ঠায় (এই দেহধারী আত্মার সেবায় নিযুক্ত রেখে এবং সর্বদা আত্মচিন্তায় মগ্ন থেকে); ন শোচতি ([সাধক] শোক করেন না); বিমুক্তঃ চ (এবং অহঙ্কারাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হন); বিমুচ্যতে (জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ করেন); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: এই দেহ একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এক নগর—যেখানে আত্মা বাস করেন। এই আত্মা অজাত, অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। সাধক এই দেহকে আত্মার সেবায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যবহার করেন এবং তার দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তখন তিনি সকল দুঃখের পারে যান। যেহেতু তিনি অজ্ঞানতা অতিক্রম করেছেন, নিজেকে আর দেহ বলে মনে করেন না, সেহেতু জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ইনিই সেই আত্মা যাঁকে জানতে নচিকেতা আগ্রহী।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ দেহকে একটি নগরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যাওয়া আসার জন্য নগরে ফটক বা দ্বার থাকে। দেহেরও সেরকম এগারটি দ্বার আছে———দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর, নাভি, উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), পায়ু (গুহ্যদ্বার) এবং মস্তকের কেন্দ্রে ব্রহ্মরন্ধ্র (যে পথ দিয়ে যোগী দেহত্যাগ করেন)। প্রত্যেক নগরে সবসময় একজন নগর রক্ষক থাকেন, যিনি সেই নগরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তেমনি দেহেরও একজন সর্বময় কর্তা আছেন। তিনি আত্মা। দেহের সকল ক্রিয়াই তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

বস্তুত এই আত্মাই পরমাত্মা তথা ব্রহ্ম। অতএব এই আত্মা জন্মরহিত (এবং মৃত্যুরহিতও বটে)। ইনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং অপরিবর্তনীয়। জীবাত্মা (জীব) অজ্ঞান, আর এই অজ্ঞানতার প্রভাবেই জীব নিজেকে দেহ বলে মনে করে। দেহের ক্ষতিকে জীবাত্মা

নিজের ক্ষতি বলে ভাবেন এবং দেহের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা তিনি নিজের ওপর আরোপ করেন। একইভাবে জীবাত্মা মনের খেয়ালখুশিরও অধীন। বাস্তবিকই জীব দেহমনের দাস।

কিন্তু জীবাত্মার এই নিয়তিই শেষ কথা নয়। জীবাত্মা যদি নিজের অধিকার দাবী করেন, নিজের স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন ঘোষণা করেন, তবে পুরো চিত্রটাই পাল্টে যায়। পরমাত্মা রূপে জীবাত্মা সদামুক্ত এবং সর্বভূতের অধীশ্বর। কি উপায়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে অভিন্ন বোধ করেন? প্রথম উপায় হল মনন। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা পরমাত্মা রূপে চিন্তা করেন, তবে তিনি প্রকৃতই পরমাত্মা হয়ে ওঠেন। দেহ ও মন যন্ত্র মাত্র; তাদের যে কোন ভাবে কাজে লাগানো যায়। জীব যতক্ষণ দেহমনের অধীন ততক্ষণ সে বদ্ধ; আবার দেহমন যখন জীবাত্মার অধীন তখন জীব মুক্ত। নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অজ্ঞ, তাঁর ওপর দেহমন কর্তৃত্ব করে। এ-হেন ব্যক্তি নিজেকে দেহমনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেন। দেহমনে যা কিছু ঘটে তার দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হন। কিন্তু মানুষ যদি একবার জানতে পারেন যে, তিনি ও পরমাত্মা অভিন্ন, অতএব তিনিই স্বয়ং দেহমনের অধিকর্তা, তবে মানুষ মুহূর্তে মুক্ত হয়ে যান। তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর—এই সত্যে তিনি জীবনের বাকি দিনগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং অসীম আনন্দ অনুভব করেন। মৃত্যুর পর আর তিনি জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হন না। তিনি তখন নিত্যমুক্ত।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥২

অন্বয়: [এই আত্মা] হংসঃ (সর্বত্র গমন করেন); শুচিষৎ (সূর্যরূপে স্বর্গবাসী); বসুঃ (ইনিই বসু অর্থাৎ ইনিই সকলের আশ্রয়); অন্তরিক্ষসৎ (স্বর্গমর্তের মধ্যবর্তী আকাশে ইনিই বায়ু); হোতা (অগ্নি); বেদিষৎ (পৃথিবীতে অবস্থিত); অতিথিঃ দুরোণসৎ (ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহবাসী [অথবা সোমরসরূপে কলসীতে অবস্থিত]); নৃষৎ (সমস্ত মানুষে স্থিত); বরসৎ (দেবদেবীদের মধ্যে স্থিত); ঋতসৎ (সত্যে প্রতিষ্ঠিত); ব্যোমসৎ (আকাশে অবস্থিত); অব্জা (জলজ প্রাণীতে); গোজা (গো অর্থাৎ পৃথিবীজাত ধান্য যবাদিতে); ঋতজা (যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যরূপে জাত); অদ্রিজা (পর্বতজাত নদী প্রভৃতিতে); ঋতম্ (সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে সত্য); বৃহৎ (মহত্তম, আদি কারণ)।

সরলার্থ: আত্মা সর্বত্র বিরাজিত। এই আত্মাই স্বর্গে সূর্য এবং ইনিই বসু কারণ ইনিই সকলের আশ্রয়। স্বর্গমর্তের মধ্যবর্তী আকাশে ইনি বায়ু। ইনি হোতা, কারণ ইনিই (যজ্ঞের) অগ্নি। ইনি যজ্ঞবেদীর অগ্নি, অথবা সমগ্র বসুন্ধরা এই অগ্নিরূপী আত্মার বেদীস্বরূপ। ইনি ব্রাহ্মণ অতিথি অথবা ইনিই কলসভরা সোমরস। মানুষের মধ্যে, সকল উত্তম বস্তুতে, এবং আকাশে একই আত্মা বিরাজমান। জলে ইনিই মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। আবার ধান, গম ও অন্যান্য ওষধি রূপে ইনিই পৃথিবীর বুকে বেড়ে ওঠেন। ইনি ঋতজা, কারণ ইনিই ঋত অর্থাৎ যজ্ঞের উপকরণ। পর্বত থেকে উৎসারিত হয়ে ইনি জলধারা এবং নদনদীরূপে প্রবাহিত হন। এই আত্মাই মহত্তম, এবং সর্ববস্তুর অন্তরস্থ সত্তা।
ব্যাখ্যা: সত্যরূপে আত্মা সকল বস্তুর অন্তরে ও বাইরে রয়েছেন। ইনি সর্বত্র বিরাজমান। ইনি বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র সকল বস্তুর মধ্যে আছেন। এই আত্মাই সকল বস্তুর সারাৎসার। ইনিই কারণ, ইনিই কার্য। সমগ্র জগতের ইনিই মূল উপাদান। আত্মা আছেন বলেই জগতের অস্তিত্ব আছে। ঋত, সত্য, আত্মা প্রভৃতি বহু নামে ইনি পরিচিত।

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥৩

অন্বয়: [যে আত্মা] প্রাণম্ ঊর্ধ্বম্ উন্নয়তি (প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করেন); অপানং প্রত্যক্ অস্যতি (অপান বায়ুকে অধোগামী করেন); মধ্যে (হৃদয়পদ্মে); আসীনম্ (অবস্থিত); [সেই] বামনম্ (উপাসনার যোগ্য বস্তু অর্থাৎ বরণীয় আত্মাকে); বিশ্বে (সকল); দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ); উপাসতে (উপাসনা করেন [অর্থাৎ তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন])।
সরলার্থ: আত্মা প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বে এবং অপান বায়ুকে নিম্নদিকে চালিত করেন। এই আত্মার আবাস হৃদয়ে, এবং যোগিগণ তাঁকে হৃদয়ে ধ্যান করেন। সকল ইন্দ্রিয় যেন নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রভু অর্থাৎ আত্মার বন্দনা করছে।
ব্যাখ্যা: আত্মাই যে দেহের সর্বময় কর্তা, এখানে আবার সে কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মার অধীন। 'বিশ্বে দেবাঃ উপাসতে'—মানুষ যেমনভাবে তার প্রভুর বন্দনা করে, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলিও নিখুঁতভাবে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে যেন তাদের প্রভুর অর্থাৎ আত্মার স্তবগান করে চলেছে।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।

দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥৪

অন্বয়: শরীরস্থস্য অস্য দেহিনঃ (শরীরে অবস্থিত এই আত্মা); বিস্রংসমানস্য ([শরীরের সঙ্গে] সম্পর্ক শূন্য হয়ে); দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য (দেহ থেকে বিচ্যুত হলে); অত্র কিং পরিশিষ্যতে (এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে [অর্থাৎ কিছুই থাকে না]); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: যখন এই শরীরে অবস্থিত আত্মা শরীর থেকে নিজেকে মুক্ত করে শরীর ত্যাগ করেন, তখন সেখানে আর কি অবশিষ্ট থাকে? (কিছুই না।) এই সেই আত্মা যা নচিকেতার জিজ্ঞাস্য।

ব্যাখ্যা: আত্মা শরীরের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। শরীরকে যদি নগরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে আত্মাই এই নগরের প্রভু। প্রভু নগর ত্যাগ করে গেলে নগরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোন কাজই আর ঠিকমতো হতে পারে না। আত্মা শরীর ত্যাগ করলেও একই ঘটনা ঘটে। শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি অটুট থাকলেও তাদের কর্মক্ষমতা থাকে না। আত্মাই ছিলেন তাদের শক্তির উৎস। আত্মার অন্তর্ধানের পর ইন্দ্রিয়সহ শরীরটিও একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥৫

অন্বয়: কশ্চন মর্ত্যঃ (কোন মরণশীল মানুষ); প্রাণেন ন জীবতি (প্রাণবায়ু [শ্বাসগ্রহণ] দ্বারা জীবনধারণ করে না); অপানেন ন (অপানবায়ু [নিঃশ্বাস ত্যাগ] দ্বারাও জীবন ধারণ করে না); ইতরেণ তু জীবন্তি (কিন্তু অন্য কারো দ্বারা জীবিত থাকে [অর্থাৎ আত্মার দ্বারা]); যস্মিন্ (যাতে); এতৌ উপাশ্রিতৌ (এই প্রাণ ও অপান উভয়েই আশ্রিত আছে)।

সরলার্থ: শুধুমাত্র প্রাণ বা অপান বায়ু দ্বারা কোন প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। তার জীবন ধারণের জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। এই 'আরও কিছু'র (অর্থাৎ পরমাত্মার) ওপর প্রাণ এবং অপান উভয়ই নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা: শরীরের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য পাঁচপ্রকার বায়ু আছে। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এই পঞ্চবায়ুর সাহায্যেই তাঁরা বেঁচে আছেন। দেহ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ুর থেকে স্বতন্ত্র যে এক আত্মা আছেন, এই ধারণাকে তাঁরা প্রথমেই বাতিল করে দেন। এই আত্মাই যে সমগ্র দেহমনের অধিকর্তা, এ কথা বিশ্বাস করা তাঁদের পক্ষে শক্ত। বস্তুত দেহ, মন, ইন্দ্রিয়,

পঞ্চবায়ু সবই আত্মার ওপর নির্ভরশীল। মৃত্যুকালে আত্মা যখন দেহত্যাগ করেন, তখন দেহমনরূপ যন্ত্রটি ভেঙ্গে পড়ে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অক্ষত থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি পৃথক বা যৌথ উভয়ভাবেই অকেজো হয়ে পড়ে। তার কারণ দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আত্মার শক্তিতেই শক্তিমান। এতক্ষণ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেন আত্মা তথা প্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিল। আত্মার অন্তর্ধানের সাথে সাথে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥৬

অন্বয়: গৌতম (হে গৌতম); হন্ত (ইদানীং); তে (তোমাকে); ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম (এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয়); মরণং প্রাপ্য (মৃত্যুর পর); আত্মা যথা চ ভবতি (আত্মার যেরূপ অবস্থা হয়); প্রবক্ষ্যামি ([আমি তা] বলব)।

সরলার্থ: হে গৌতম, এখন আমি তোমার কাছে এই গুহ্য এবং সনাতন ব্রহ্ম বিষয়ে ব্যাখ্যা করব, এবং মৃত্যুর পর আত্মার কি পরিণতি হয় তাও তোমাকে জানাব।

ব্যাখ্যা: যম বা মৃত্যু এখন নচিকেতার কাছে দুটি জিনিস ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমত, ব্রহ্মের স্বরূপ কি ও কিভাবে তাঁকে লাভ করা যায় এবং দ্বিতীয়ত, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা রহস্যবিদ্যা। এই বিদ্যা অধিকাংশ মানুষের ধারণার অতীত। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় মানুষই ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করতে সক্ষম। এই ব্রহ্ম 'গুহ্য' বলে বর্ণিত। কিন্তু মানুষ তাঁর সম্পর্কে জানুক বা না জানুক, ব্রহ্মই নিত্য ও সনাতন।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥৭

অন্বয়: অন্যে দেহিনঃ (কোন কোন শরীরী আত্মা); যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ (নিজ কর্ম ও নিজ জ্ঞান অনুসারে); শরীরত্বায় (শরীর ধারণের জন্য); যোনিম্ (মাতৃগর্ভ); প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়); অন্যে (অপর কেহ কেহ); স্থাণুম্ অনুসংযন্তি (বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ: নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে, কোন কোন জীবাত্মা পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে বারবার জীবদেহ প্রাপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ বৃক্ষ লতাদি স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা: মানুষের মৃত্যুর পর কি হয় সে কথাই এখানে যম নচিকেতাকে বলছেন। মানুষের ভাগ্য নির্দিষ্ট হয় তার জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী রূপে তার পুনর্জন্ম হতে পারে। আবার তার বৃক্ষাদি স্থাবরদেহও লাভ হতে পারে।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো
নির্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ।।৮

অন্বয়: [যখন সকল প্রাণী] সুপ্তেষু (নিদ্রিত); যঃ এষঃ পুরুষঃ (যে এই পুরুষ [আত্মা]); কামং কামং নির্মিমাণঃ (কাম্যবস্তু পরম্পরা নির্মাণ করে); জাগর্তি (জেগে থাকেন); তৎ এব শুক্রম্ (তিনিই শুদ্ধ [অর্থাৎ নির্গুণ]); তৎ ব্রহ্ম (তিনি ব্রহ্ম); তৎ এব অমৃতম্ উচ্যতে (তিনিই অবিনাশী বলে কথিত হন); সর্বে লোকাঃ তস্মিন্ শ্রিতাঃ (সমস্ত জগৎ তাঁতেই আশ্রিত আছে); কশ্চন তৎ উ ন অত্যেতি (কেহই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।
সরলার্থ: যখন সকল প্রাণী নিদ্রিত তখন একজন মাত্র জেগে থাকেন। তিনি একটির পর একটি বাসনা (এবং তদনুরূপ ভোগ্য বস্তু) উৎপন্ন করে চলেন। এই নিদ্রাহীন শুদ্ধ সত্তাই ব্রহ্ম; এবং তিনিই নিত্য বলে কথিত। সকল জগতের তিনিই আশ্রয়। কিছুই তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এই সেই আত্মা যা নচিকেতার জিজ্ঞাস্য।
ব্যাখ্যা: যম এখন ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেছেন। কারণ তিনি নচিকেতার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। আবার মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে কথাও যম নচিকেতাকে বলেছেন। দুটি প্রশ্নই দুরূহ, তবে প্রথমটি বেশী কঠিন। তাই এতক্ষণ পর্যন্ত যম দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করেছেন। এখন তিনি প্রথম প্রশ্নটি আলোচনা করবেন।

নিদ্রিত অবস্থায় আমরা যে সব স্বপ্ন দেখি তা একেবারেই অর্থহীন; এ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। হয়তো দেখছি আমাকে বাঘ তাড়া করেছে, আর আমি আপ্রাণ ছুটে চলেছি। কিন্তু এরকম স্বপ্ন উদ্ভট নয় কি? বিছানায় শুয়ে আছি অথচ ছুটছি, এও কি সম্ভব? আর ঘরের মধ্যে বাঘই বা আসে কোথা থেকে? এ সবই মনগড়া। এর থেকে বোঝা যায় দেহ থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই মন কাজ করতে পারে। কিন্তু স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার (সুষুপ্তির) অভিজ্ঞতাও তো আমাদের হয়। তখন মনে কি ঘটে আমরা জানি না, কিন্তু মন স্থির থাকে। এর থেকে প্রমাণিত হয় মনেরও অতীত কোন সত্তা আছে যা এই দেহমনকে

ধারণ করে রাখে। এই সত্তাই হলেন আত্মা যা সদা অতন্দ্র। এই আত্মা অবিদ্যা শক্তি যোগে দেহমনকে একত্রিত রাখেন এবং আপন ইচ্ছা অনুসারে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। অর্থাৎ দেহ এবং মন আত্মার হাতের যন্ত্রমাত্র।

এই আত্মাই স্বরূপত পরমাত্মা তথা ব্রহ্ম। এই জগৎ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে আছে। ব্রহ্মকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। তিনিই পরম সত্য, তিনিই শাশ্বত।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯

অন্বয়: যথা (যেরূপ); একঃ অগ্নিঃ (এক অগ্নি); ভুবনং প্রবিষ্টঃ (জগতে প্রবেশ করে); রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব (রূপে রূপে নানারূপ হয়েছেন [অর্থাৎ দাহ্য পদার্থের রূপ অনুসারে অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে প্রকাশিত হন]); তথা (সেইরূপ); একঃ সর্ব-ভূত-অন্তঃ-আত্মা (সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ [সেই] এক আত্মা); রূপং রূপং প্রতিরূপঃ (রূপে রূপে নানারূপ হয়েছেন [অর্থাৎ এই জগতে প্রত্যেক বস্তুতে প্রবেশপূর্বক ঐ বস্তুর রূপানুসারে তাঁরই প্রতিরূপ হয়ে প্রকাশ পান]); বহিঃ চ (এবং বাইরেও আছেন)।

সরলার্থ: জগতে প্রবেশ করে একই অগ্নি দাহ্য পদার্থের আকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। সেই ভাবে, একই আত্মা সর্বভূতের অন্তরে থেকে নানা রূপে প্রতিভাত হয়েছেন এবং তাদের বাইরেও আছেন।

ব্যাখ্যা: একই আত্মা সকল বস্তুর অন্তরে রয়েছেন। এই জগতে নানা প্রকার বস্তু আছে; তাদের রূপও বিচিত্র। অজ্ঞানতাবশত আমরা মনে করি এইসব বস্তুর আত্মাও বুঝি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। যেমন উপনিষদ বলেন, অগ্নি একই, কেবল দাহ্য বস্তুর আকৃতি অনুসারে অগ্নির পৃথক পৃথক রূপ প্রতিভাত হয়। আসলে অগ্নির কোন রূপই নেই। সেইরকম ভাবে, আত্মা স্বরূপত নিরাকার। তবু এই জগতে তিনি নানা রূপে প্রতিভাত হন। বিভিন্ন প্রাণী এবং বস্তুর মধ্য দিয়ে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়। আত্মা আকাশের মতো, তিনি সর্ববস্তুর অন্তরে ও বাইরে সর্বত্র রয়েছেন। আত্মা নিরাকার ও সর্বব্যাপী।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥১০

অন্বয়: যথা (যেরূপ); একঃ বায়ুঃ (এক বায়ু); ভুবনং প্রবিষ্টঃ (ভুবনে [প্রাণরূপে] প্রবেশ করে); রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব (রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন); তথা (সেইরূপ); একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের এক অন্তরাত্মা); রূপং রূপং প্রতিরূপঃ [বভূব] (রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন); বহিঃ চ (এবং তাদের বাইরেও আছেন)।

সরলার্থ: জগতে প্রবেশ করে একই বায়ু সকল প্রাণীর মধ্যে প্রাণবায়ু রূপে অবস্থান করেন। সেইভাবে, একই আত্মা সকল বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করে তাদের অন্তরে ও বাইরে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মা নিরাকার। যদিও তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন, কিন্তু এইসব রূপের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। কারণ রূপগুলি আত্মার ওপর আরোপিত। এই আত্মা সকল বস্তুর অন্তরে ও বাইরে রয়েছেন। এই সেই আত্মা যাঁর সম্বন্ধে জানতে নচিকেতা আগ্রহী।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥১১

অন্বয়: যথা (যেরূপ); সূর্যঃ (সূর্য); সর্বলোকস্য চক্ষুঃ (সর্বলোকের একমাত্র চক্ষু [হয়েও]); চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ (চক্ষুগ্রাহ্য বাইরের অশুচি বস্তুর দোষের দ্বারা); ন লিপ্যতে ([সূর্য] লিপ্ত হন না); তথা (সেইরূপ); একঃ সর্বভূত-অন্তঃ-আত্মা (এক আত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত থেকে); লোক-দুঃখেন ন লিপ্যতে (জীবের দুঃখ দ্বারা লিপ্ত হন না [অর্থাৎ জীবের দুঃখ পরমাত্মাকে ভোগ করতে হয় না]); বাহ্যঃ ([কেননা তিনি] বাইরেও অবস্থিত)।

সরলার্থ: সূর্য সকলের চক্ষু, কিন্তু তবু ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের চোখের দোষ) বা বস্তু-বিশেষের কোন ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই ভাবেই, আত্মা সকল বস্তুর অন্তরতম হয়েও, তাদের দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না; কারণ (সকল প্রাণী এবং বস্তুর অন্তরে যেমন তেমনি) বাইরেও আত্মা বিরাজিত।

ব্যাখ্যা: একই পরমাত্মা সকল প্রাণী ও বস্তুর অন্তরে বিরাজ করেন। এর ফলে মনে হতে পারে, জীবের ভালমন্দ বুঝি আত্মাকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। কথাটি

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে : পার্থিব সকল আলোর উৎস সূর্য। কিন্তু মলিন বস্তুকে আলোকিত করে সূর্য নিজে কখনও মলিন হন না। সেইভাবে সর্ববস্তুর অন্তরে থেকেও আত্মা কোন বস্তু বা জীবের ভালমন্দের দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীব সুখী বা দুঃখী হতে পারে, কিন্তু আত্মা নির্লিপ্ত। এখানে 'বাহ্য' শব্দটি 'ঊর্ধ্বে' বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মা সকল সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥১২

অন্বয়: সর্বভূত-অন্তঃ-আত্মা (সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মা); একঃ বশী (এক ও অভিন্ন হয়েও সকলের নিয়ন্তা); যঃ একং রূপং বহুধা করোতি (যিনি একরূপকে বহু করেন [অর্থাৎ এই এক আত্মা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন]); যে ধীরাঃ (যেসব প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); তম্ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি (তাঁকে [অর্থাৎ এই সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মাকে] নিজের আত্মারূপে দর্শন করেন); তেষাং শাশ্বতং সুখম্ (তাঁরাই শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন); ন ইতরেষাম্ (অপরেরা নয়)।

সরলার্থ: পরমাত্মা এক, তবু ইনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। ইনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। এই এক আত্মা বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। যে সব প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এই আত্মাকে নিজের অন্তরে দর্শন করেন তাঁরা শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন। অন্যেরা এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কি সম্পর্ক সে কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে। জগৎ-রূপে ব্রহ্মই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং সকল অস্তিত্বের অন্তরতম সত্তা এই ব্রহ্ম। সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ, ব্রহ্মও তেমনি জগৎ-রূপে প্রকাশিত। তরঙ্গরাজি সমুদ্র থেকে ওঠে, সমুদ্রকেই আশ্রয় করে থাকে এবং শেষে সমুদ্রেই লয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্র ব্যতীত তরঙ্গের অস্তিত্ব নেই। ঠিক তেমনি ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

জগৎ যে পরম সত্য নয়, এ কথা জানাই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্মই সত্য আর এই ব্রহ্মই মানুষের অন্তরাত্মা। এ কথা যিনি জানেন, তিনি শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন।

মানুষের আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। এই আত্মাই পরমাত্মা। ইনিই ব্রহ্ম, যিনি সকল বস্তুর নিয়ন্তা। আকাশের মতো এই আত্মা এক এবং শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা তথা ব্রহ্ম

নিজ মায়া শক্তি বলে নানা রূপ এবং নানা নাম ধারণ করে বহু রূপে প্রতিভাত হন। যেমন, একজন ব্যক্তির চারদিকে যদি অনেক আয়না থাকে, তবে সেই আয়নাতে তার বহু রূপ প্রতিফলিত হয়, যদিও মানুষটি একই থাকে। এই এক এবং অদ্বিতীয় আত্মাকে জানার নামই জ্ঞান, বহু দর্শন অজ্ঞান।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥১৩

অন্বয়: যঃ অনিত্যানাং নিত্যঃ (যিনি সকল অনিত্যের মধ্যে নিত্য); চেতনানাং চেতনঃ (চেতনগণের মধ্যে যিনি চৈতন্য); [যঃ] একঃ [সন্] (তিনি এক হয়েও); বহূনাং কামান্ বিদধাতি (সকল জীবের কাম্যবস্তুসকল বিধান করেন); যে ধীরাঃ তম্ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি (যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁকে স্বরূপে দর্শন করেন [অর্থাৎ যাঁরা এই পরমাত্মাকে নিজেদের আত্মারূপে দর্শন করেন]); তেষাম্ [এব] শাশ্বতী শান্তিঃ (কেবলমাত্র তাঁরাই [মনে] অপার শান্তিলাভ করেন); ন ইতরেষাম্ (অপরেরা নয়)।

সরলার্থ: সকল অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, সকল চেতন বস্তুর মধ্যে যিনি স্বয়ং চৈতন্য এবং যিনি একমাত্র সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণে সক্ষম, তিনিই পরমাত্মা। যে সব প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এই পরমাত্মাকে নিজ আত্মারূপে দর্শন করেন, কেবল তাঁরাই মনে অপার শান্তি লাভ করেন। অন্যেরা এই শান্তি থেকে বঞ্চিত হন।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি সম্পর্ক তা এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে পরমাত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু। তবে কি জীবাত্মা নিত্য নয়? না জীবাত্মা অনিত্য, পরমাত্মা আছেন বলেই জীবাত্মাকে নিত্য বলে মনে হয়। পরমাত্মাই নাম-রূপ আরোপিত হয়ে জীবাত্মা রূপে প্রতিভাত হন। জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। একইভাবে পরমাত্মাই জগতের যাবতীয় চেতনবস্তুর চেতনার উৎস। পরমাত্মা স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ।

জীবের বাসনা অসংখ্য এবং কোন না কোন ভাবে জীবাত্মা তার বাসনা চরিতার্থ করে। কিন্তু সে যা চায় তা লাভ করতে জীবাত্মাকে পরমাত্মার উপর নির্ভর করতে হয়। ব্রহ্ম রূপে পরমাত্মাই জীবাত্মার বাসনা পূর্ণ করেন।

মানুষই স্বয়ং ঈশ্বর, একথা উপলব্ধি করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। উপনিষদ বারবার এই সত্য ঘোষণা করেছেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মা যে অভিন্ন, এ সত্য জীবাত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মা নিজেকে ক্ষুদ্র, দুর্বল এবং অসহায় বলে বোধ করে। নিজেকে সে অসুখী মনে করে। কি এক অভাববোধ তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করলে জীব পূর্ণ হয়ে যায়। তখন সে সদানন্দ। শান্তি এবং আনন্দে তখন তার অক্ষয় অধিকার। অন্যেরা কিন্তু এই অপার আনন্দের সন্ধান পায় না।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥১৪

অন্বয়: [যৎ] অনির্দেশ্যং পরমং সুখম্ (যে নির্বিশেষ পরম আনন্দকে); তৎ এতৎ (এটি এই [অর্থাৎ ইনিই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম]); ইতি মন্যন্তে ([ঋষিগণ] এরূপ মনে করেন); তৎ কথং নু বিজানীয়াম্ (তাঁকে [অর্থাৎ এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে] আমি কি ভাবে জানব); কিমু ভাতি বিভাতি বা (তিনি কি আপনি প্রকাশ পান অথবা মন বুদ্ধির গোচর হয়ে প্রকাশিত হন)।

সরলার্থ: এই সেই সংজ্ঞাতীত পরমানন্দ যা বলতে গিয়ে ঋষিরা উল্লেখ করেন, 'সে-ই এই' অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আনন্দ'। এই আনন্দ (ব্রহ্ম) স্বপ্রকাশ নাকি মন ও বুদ্ধির দ্বারা লভ্য, তা আমি কেমন করে জানব?

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী শ্লোকে অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ অর্থাৎ পরমানন্দের কথা বলা হয়েছে। এই আনন্দের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। নিজ অন্তরে এই আনন্দ অনুভব করা যায়, কিন্তু অন্যকে এর অংশীদার করা যায় না। অন্যের কাছে এই আনন্দের স্বরূপও ব্যাখ্যা করা যায় না। এই আনন্দ এত গভীর যে ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আত্মা তথা ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ ঘটলে তখনই এই আনন্দের উপলব্ধি হয়। আত্মাই এই আনন্দের উৎস।

প্রশ্ন হল, কিভাবে এই আনন্দকে উপলব্ধি করা যায়? কোথা থেকে এত আনন্দ আসে? এই আনন্দ কি আমাদের সত্তার গভীরে লুকানো ছিল? হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে? অথবা আর পাঁচটা সাধারণ বস্তুর মতো এই আনন্দ এতদিন দৃষ্টির অগোচরে থেকে হঠাৎ আমাদের চোখে পড়েছে? উত্তরে বলা হয়, আমাদের আত্মাই আনন্দস্বরূপ। আনন্দ আমাদের অন্তরে সদা বিরাজিত; কিন্তু সে সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। সুদীর্ঘ কাল তপস্যার দ্বারা আত্মাকে জানা সম্ভব হয়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥১৫

অন্বয়: তত্র সূর্যঃ ন ভাতি (সেখানে [অর্থাৎ ব্রহ্মের উপস্থিতিতে] সূর্য দীপ্তি দান করেন না); ন চন্দ্র তারকম্ (চন্দ্র-তারকারাও নন); ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (এই বিদ্যুৎ সকলও দীপ্তি দান করেন না); অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (এই অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাবেন); তম্ এব ভান্তং সর্বম্ অনুভাতি (ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সব কিছু জ্যোতির্ময়); তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি (তাঁর দীপ্তিতেই সব কিছু দীপ্যমান)।

সরলার্থ: ব্রহ্মের উপস্থিতিতে সূর্য দীপ্তি দান করেন না; চন্দ্র তারকা, এমনকি বিদ্যুৎও নন। অতএব অগ্নির কা কথা! ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সব কিছু জ্যোতির্ময়; তাঁর আলোকেই সব কিছু আলোকিত।

ব্যাখ্যা: আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, একথা পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে। উপনিষদ এখন যোগ করছেন যে, ব্রহ্ম শুধু আনন্দই নন, ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিও বটে।

সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি থেকে আমরা আলো পাই, কিন্তু ব্রহ্মের উপস্থিতিতে এঁদের জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়। এ কথার তাৎপর্য এই যে, এইসব জ্যোতিষ্কের নিজস্ব কোন আলো নেই; ব্রহ্মের জ্যোতিতেই তাঁরা জ্যোতিষ্মান। ব্রহ্মই সকল আলোর উৎস। ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ।

কেবলমাত্র সূর্য, চন্দ্র, তারাই যে ব্রহ্মের আলোকে আলোকিত তা নয়, আমাদের সব ইন্দ্রিয়ও তাদের প্রকাশ-শক্তি ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা থেকে লাভ করে। সেই কারণে ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না। শুদ্ধ মনে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। শুদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ‘অহং বুদ্ধি’ (আমি) এবং ‘মমত্ব বুদ্ধি’ (আমার) থেকে যে-মন মুক্ত, তা-ই শুদ্ধ মন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥১

অন্বয়: এষঃ অশ্বত্থঃ (এই জগৎ অশ্বত্থ গাছের ন্যায়); ঊর্ধ্বমূলঃ (এই বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে অবস্থিত [অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ মূল থেকে ইহা উৎপন্ন]); অবাক্‌শাখঃ (এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা নিম্নমুখী [জগৎ-রূপ অশ্বত্থাগাছের শাখাপ্রশাখাগুলি অর্থাৎ নারী, পুরুষ, কীট, উদ্ভিদরূপী এই গাছের শাখাগুলি নিম্নদিকে বিস্তৃত]); সনাতনঃ (প্রবাহক্রমে নিত্য [তরঙ্গের উত্থান পতনের ন্যায় সৃষ্টি অনাদি]); তৎ এব শুক্রম্ (তিনিই অর্থাৎ জগৎ-রূপ অশ্বত্থগাছের মূলই শুদ্ধ); তৎ ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম); তৎ এব অমৃতম্ উচ্যতে (তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলে কথিত); তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে); সর্বে লোকাঃ শ্রিতাঃ (সমস্ত লোক আশ্রিত হয়ে আছে); কশ্চন তৎ উ ন অত্যেতি (তাঁকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না); এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ: এই জগৎ এক বিরাট অশ্বত্থ গাছের মতো। এই গাছ ঊর্ধ্বমূল অর্থাৎ ব্রহ্মে আশ্রিত; এবং (নারী, পুরুষ, পশু, কীট, উদ্ভিদ অর্থাৎ জগৎ-রূপী) এই গাছের শাখাপ্রশাখা নিম্নে বিস্তৃত। এই অশ্বত্থ (দৃশ্যমান জগৎ) কালাতীত (তরঙ্গের উত্থান পতনের মতো জগৎ আসে যায় অর্থাৎ চক্রাকারে আবর্তিত হয়—সেই অর্থে কালাতীত)। এই গাছের মূল ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং অবিনাশী। আমাদের এই গ্রহ সমেত অন্যান্য লোকও ব্রহ্মে আশ্রিত। কোন কিছু তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। এই আত্মাই নচিকেতার জিজ্ঞাস্য।

ব্যাখ্যা: এই জগৎকে অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাধারণ গাছের মূল থাকে নীচে, শাখাপ্রশাখা উপরে। কিন্তু জগৎ-রূপী এই অসাধারণ গাছটির শাখাপ্রশাখা নীচে এবং মূল উপরে। এই গাছের মূল আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। এর মূল কোথায়? এই বৃক্ষের মূল ব্রহ্মে। প্রথমে ব্রহ্ম ছিলেন অব্যক্ত; পরে এই জগতের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ

করেছেন। এই জগৎ-বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বলতে জীবজগৎ ও জড়জগৎ উভয়কেই বোঝায়। এই দৃশ্যমান জগৎ মূলত ব্রহ্মে আশ্রিত।

অশ্বত্থগাছের মতোই এই জগৎ বিনাশশীল। এর পরিবর্তন হয়। কিন্তু এর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায় না। চক্রাকারে এই জগতের আসা যাওয়া চলতে থাকে; আর এই অর্থেই জগৎপ্রবাহ নিত্য। কখন এই জগতের সূচনা, আর কখনই বা এর বিনাশ তা কেউ জানে না।

এই বৃক্ষের মূল ব্রহ্মে নিহিত। ব্রহ্ম অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয়। সব অবস্থাতেই ব্রহ্ম অবিকৃত। তিনি কিছুর দ্বারা প্রভাবিত নন। তিনি শুদ্ধ, তিনি অমৃত। জগতের সকল বস্তু ব্রহ্মে আশ্রিত ও ব্রহ্ম ব্যতীত কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥২

অন্বয়: যৎ ইদং কিং চ জগৎ (এই জগতে যা কিছু আছে [অর্থাৎ জাগতিক পদার্থসমূহ]); সর্বম্ (সমস্তই); [প্রাণেভ্যঃ (প্রাণ থেকে অর্থাৎ মায়াশক্তি যুক্ত ব্রহ্ম থেকে)]; নিঃসৃতম্ (নিঃসৃত); প্রাণে এজতি (এই প্রাণকে আশ্রয় করেই সকল বস্তু সক্রিয়); [তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম)]; উদ্যতং বজ্রম্ (উদ্যত বজ্রের ন্যায়); মহৎ ভয়ম্ (অতি ভয়ানক); যে এতৎ বিদুঃ (যাঁরা এঁকে [অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে] জানেন); তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন)।
সরলার্থ: এই জগতের সকল বস্তু প্রাণ থেকে (অর্থাৎ মায়াশক্তি যুক্ত ব্রহ্ম থেকে) এসেছে। আবার এই প্রাণকে আশ্রয় করেই সব বস্তু সক্রিয়। উদ্যত বজ্রের মতো এই ব্রহ্ম অতি ভয়ানক। যাঁরা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা মৃত্যুকে জয় করেছেন।
ব্যাখ্যা: ব্রহ্মই যে সকল অস্তিত্বের মূল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই জগতের সকল বস্তু ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, ব্রহ্মে আশ্রিত এবং ব্রহ্মের অধীন। এ জগৎ যেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। কিন্তু এই সমস্ত কর্মের শক্তি কোথা থেকে আসে? স্বয়ং ব্রহ্ম থেকে। ব্রহ্ম কিভাবে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন, কিভাবেই বা তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন তা একটি রূপকের সাহায্যে এখানে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্ম যেন এক স্বেচ্ছাচারী রাজা। তিনি নিজের খেয়াল খুশি মতো প্রজাদের চলতে বাধ্য করেন। রাজার হাতে রয়েছে বজ্র। কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা হলে তিনি সেই বজ্র দিয়ে আঘাত করবেন। প্রজারা তাঁর ভয়ে কম্পমান। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মকে এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসাবে জানেন তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

এই শ্লোক এবং পূর্ববর্তী শ্লোকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে নিত্যবস্তু অবশ্যই আছে—সে কথাই এখানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥৩

অন্বয়: ভয়াৎ অস্য অগ্নিঃ তপতি (এঁর ভয়ে [অর্থাৎ ব্রহ্মের ভয়ে] অগ্নি উত্তাপ দান করেন); ভয়াৎ সূর্যঃ তপতি (এঁর ভয়ে সূর্য কিরণ দান করেন); ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ ধাবতি (এঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু [অর্থাৎ যম] স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন)।
সরলার্থ: ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দেন, সূর্য কিরণ দান করেন এবং ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে তৎপর হন।
ব্যাখ্যা: অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র (বৃষ্টির দেবতা), বায়ু (বাতাসের দেবতা) এবং মৃত্যুর অধিপতি যম —এঁরা সকলেই অতি শক্তিমান দেবতা। কিন্তু ব্রহ্মের তুলনায় তাঁরা অকিঞ্চিৎকর। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্ম যে সর্বশক্তিমান, এই কথাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করাই এই শ্লোকের তাৎপর্য। দেবতাদের মধ্যে যমের ক্রমিক স্থান পঞ্চম—যথা অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু, যম।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥৪

অন্বয়: চেৎ (যদি); ইহ (এই পৃথিবীতে); শরীরস্য বিস্রসঃ প্রাক্ (শরীরের ধ্বংসের পূর্বে [অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে]); [জীবঃ—যে কেউ]; বোদ্ধুম্ অশকৎ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন [তবে তিনি এ জীবনেই মোক্ষলাভ করেন। অন্যথায় যদি জীবৎকালে ব্রহ্মকে জানতে অসমর্থ হন]); ততঃ (তখন); সর্গেষু লোকেষু (এই পৃথিবীতে অথবা অন্য কোন লোকে); শরীরত্বায় কল্পতে (আবার শরীর ধারণ করেন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেন)।
সরলার্থ: মৃত্যুর পূর্বেই যদি কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন, তবে তিনি এই জীবনেই মোক্ষলাভ করেন। অন্যথায় তিনি এই পৃথিবীতে অথবা অন্য কোন লোকে বারবার জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাখ্যা: জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মকে জানা। এই জীবনেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। সুতরাং মোক্ষলাভের জন্য আমাদের সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত।

ব্রহ্মকে জানলে কি হয়? সেই ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্মরূপে দেখেন। সকল প্রাণী ও সকল বস্তুর আত্মাকে তিনি নিজ আত্মারূপে দর্শন করেন। অর্থাৎ তখন তিনি সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এই একত্বের বোধই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। এ শুধু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয়, এ তাঁর ব্যক্তিগত অপরোক্ষ অনুভূতি। আর এই অভিজ্ঞতা এমন যে, এর প্রভাবে মানুষটাই পাল্টে যান। তিনি এক নতুন মানুষে পরিণত হন। জাতি, ধর্ম ও দেশের ব্যবধান অতিক্রম করে তিনি হয়ে ওঠেন 'এক বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব'। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হয়ে যান।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥৫

অন্বয়: আদর্শে (স্বচ্ছ দর্পণে); যথা (যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়); তথা আত্মনি (তেমনই শুদ্ধ, মনে [আত্মার দর্শন হয়]); স্বপ্নে যথা (স্বপ্নে যেরূপ); তথা পিতৃলোকে (পিতৃলোকে সেরূপ); অপ্সু যথা (জলে যেরূপ); তথা গন্ধর্বলোকে (সেরূপ গন্ধর্বলোকে [গন্ধর্বরা মানুষের থেকে উন্নতস্তরের, কিন্তু দেবদেবীদের তুলনায় নিম্নস্তরের, তারা সঙ্গীতে নিপুণ]); পরি দদৃশে ইব ([অস্পষ্টভাবেই আত্মা] পরিদৃষ্ট হন); ব্রহ্মলোকে (কিন্তু ব্রহ্মলোকে); ছায়া তপয়োঃ ইব (নিজ আত্মাকে আলো ও ছায়ার ন্যায় স্পষ্ট দেখা যায়)।

সরলার্থ: যেমন স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি শুদ্ধ মনে আত্মার দর্শন হয়। পিতৃলোকে নিজ আত্মাকে স্বপ্নবস্তুর মতো অস্পষ্ট দেখা যায়। গন্ধর্বলোকে জলে প্রতিবিম্বের মতো আত্মাকে ঝাপসা দেখায়। কিন্তু ব্রহ্মলোকে নিজ আত্মাকে আলো এবং ছায়ার মতো স্পষ্ট দেখা যায়।

ব্যাখ্যা: মনুষ্যজন্ম লাভের গুরুত্ব এখানে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ শুধুমাত্র মানবজন্মেই আত্মাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব। স্বচ্ছ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখার মতোই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হন। সুদীর্ঘকাল তপস্যার দ্বারা এই শুদ্ধ বুদ্ধি অর্জন করা যায়। প্রথমে যথাসাধ্য আত্মসংযম অভ্যাস করতে হবে। সবসময় ভালমন্দ বিচার করে, যা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক কেবল তাকেই গ্রহণ করতে হবে। পথপ্রদর্শক হিসাবে সদ্গুরুর আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র অধ্যয়নও বিশেষ সহায়তা করে। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাসনামুক্ত, অহংবুদ্ধি-বর্জিত

শুদ্ধ মন। শুদ্ধ মন স্বচ্ছ আয়নার মতো। আত্মজ্ঞান আমাদের মধ্যে সবসময় রয়েছে। চিত্তশুদ্ধি হলে আপনা আপনি তার প্রকাশ ঘটে; কারণ আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ।

মৃত্যুর পরেও পিতৃলোকে আত্মোপলব্ধি সম্ভব। কিন্তু সেখানে আত্মাকে স্বপ্নে দেখা বস্তুর মতো দুর্বোধ্য ও অসংলগ্ন দেখায়। আবার মৃত্যুর পর গন্ধর্বলোকে গিয়েও আত্মদর্শন হতে পারে। সেখানে এই দর্শন উন্নততর হলেও খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু ব্রহ্মলোকে অতি উত্তমরূপে আত্মাকে দর্শন করা সম্ভব। আলো এবং ছায়ার মধ্যে পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, ব্রহ্মলোকেও আত্মাকে তেমনি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তবে ব্রহ্মলোক লাভ করা সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় এবং উভয়কে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে সাধনা। দুর্লভ মানুষ-জন্মের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত, যাতে এই জীবনেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, মোক্ষ অর্জন করা যায়। মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষার কি প্রয়োজন?

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥৬

অন্বয়: পৃথক্ উৎপদ্যমানানাম্ ([আকাশাদি পঞ্চভূত থেকে] পৃথকভাবে উৎপন্ন); ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়সমূহের); পৃথক্ ভাবম্ ([আত্মা থেকে] পৃথক ভাব); উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ (এবং তাদের উদয় ও অস্ত অর্থাৎ জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থা [জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল এবং নিদ্রিতাবস্থায় এদের লয় হয়]); [এতৎ] মত্বা ([ইহা] জেনে); ধীরঃ ন শোচতি (জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না [কারণ জ্ঞানী জানেন যে আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ])।

সরলার্থ: পঞ্চভূত থেকে পৃথকভাবে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। ইন্দ্রিয়গুলি জাগ্রত অবস্থায় সক্রিয়; এবং নিদ্রিত অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। যথার্থ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি জানেন যে আত্মা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ; আর সেই কারণেই তিনি আর দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

ব্যাখ্যা: অজ্ঞান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সহ দেহকে নিজ আত্মা বলে মনে করে। নিঃসন্দেহে এ ধারণা ভুল। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। এগুলি আত্মার হাতের যন্ত্রমাত্র, এবং এই যন্ত্র আত্মা কখনও কখনও ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আত্মা সদা স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রিয়গুলি পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতি থেকে যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা উৎপন্ন হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ উপাদানের সাত্ত্বিক [সূক্ষ্ম] রূপ। এইগুলি হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চভূতের রাজসিক [স্থূল] রূপ—বাক্

[বাক্য], পাণি [হাত], পাদ [পা], পায়ু [গুহ্যদ্বার] ও উপস্থ [জননেন্দ্রিয়]। এইগুলিকে বলা হয় কর্মেন্দ্রিয়। আর পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক রূপের সমন্বয় হল মন বা অন্তঃকরণ।

পঞ্চভূতে গঠিত বলে ইন্দ্রিয়গুলি জড়। সেই কারণেই ইন্দ্রিয় বিনাশশীল। ইন্দ্রিয়ের আদি আছে, অন্তও আছে। মানুষের জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

আত্মা যে ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র, এই তত্ত্বটি সুনিশ্চিতভাবে ধারণা করতে হবে। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ জড়। আত্মার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় কর্মক্ষম হয়। মৃত্যুকালে আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলি অক্ষত থাকলেও তাদের কর্মক্ষমতা হারায়। এর থেকে বোঝা যায় যে আত্মাকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলি অসহায়।

আত্মার আদি নেই, অন্তও নেই। আত্মা অখণ্ড অপরিবর্তিত সত্তা। অজ্ঞান ব্যক্তি দেহমনের সমষ্টিকেই আত্মা বলে মনে করে। এই দেহমন সুখদুঃখের অধীন। যিনি নিজেকে দেহমনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, তিনিও সুখদুঃখের অধীন হন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে তিনি আত্মা, তিনি অপরিবর্তনীয় ও সুখদুঃখের অতীত। এমন ব্যক্তিকে দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥৭

অন্বয়: ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্ (ইন্দ্রিয় [এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সমূহ] থেকে মন শ্রেষ্ঠ); মনসঃ সত্ত্বম্ উত্তমম্ (মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); সত্ত্বাৎ মহান্ আত্মা অধি (বুদ্ধি থেকে মহান আত্মা [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, ইনি ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ এবং জীবের সমষ্টি বুদ্ধি] শ্রেষ্ঠ); মহতঃ অব্যক্তম্ উত্তমম্ (মহান আত্মা [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ] থেকে অব্যক্ত [প্রকৃতি বা মায়া] শ্রেষ্ঠ)।

সরলার্থ: ইন্দ্রিয়ের থেকে মন শ্রেষ্ঠ; মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধির থেকে মহান আত্মা হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ; হিরণ্যগর্ভের থেকে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত প্রকৃতি।

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। কারণ মন ইন্দ্রিয়ের থেকে সূক্ষ্মতর, যদিও দুই-ই স্থূল জড় উপাদানে গঠিত। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কারণ বুদ্ধি সূক্ষ্মতর ও নিশ্চয়াত্মিকা। অর্থাৎ কোন্‌টি উচিত কোন্‌টি অনুচিত বুদ্ধি তা স্থির করতে সক্ষম। মনের কিন্তু সেই ক্ষমতা নেই; মনে সঙ্কল্প-বিকল্প আছে। মহান আত্মা হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের

প্রথম প্রকাশ এবং জীবাত্মারূপে সকলের মধ্যে রয়েছেন। হিরণ্যগর্ভের চেয়ে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, কারণ অব্যক্ত সূক্ষ্মতর। অব্যক্তকে প্রকৃতি বা মায়াও বলা হয়।

আগে বলা হয়েছে, আত্মা ইন্দ্রিয়ের থেকে পৃথক। তার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয় শরীরের মধ্যে হলেও আত্মা শরীরের বাইরে কোথাও রয়েছে। আত্মা যদি বাইরে থাকত তবে আমাদের বাইরের জগতেই আত্মাকে খুঁজতে হত। এখানে এই অর্থ অভিপ্রেত নয়। সঠিক অর্থ হল আত্মা পরম সত্য। আত্মা থেকেই সব বস্তুর উদ্ভব। আত্মা আছে বলেই এই দেহমন সত্য বলে মনে হয়। দড়ি থাকলে তবেই দড়িকে সাপ বলে ভুল করা সম্ভব। তেমনি, আত্মাই প্রকৃত সত্তা এবং যদিও দেহ-মন আত্মার ওপর আরোপিত উপাধিমাত্র, তবুও তাদের সত্য বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দেহমন প্রতিভাস মাত্র। আত্মাই একমাত্র সত্য, দেহমন থেকে আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥৮

অন্বয়: ব্যাপকঃ অলিঙ্গঃ এব চ পুরুষঃ (সর্বব্যাপী ও সর্বপ্রকার লিঙ্গ বর্জিত পুরুষ [পুরুষঃ, সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মা]); অব্যক্তাৎ তু পরঃ (অব্যক্ত থেকে শ্রেষ্ঠ [অর্থাৎ মায়াযুক্ত ব্রহ্মই অব্যক্ত]); যং জ্ঞাত্বা (যাঁকে [অর্থাৎ সেই পুরুষকে] জেনে); জন্তুঃ মুচ্যতে (জীব মুক্ত হয়); অমৃতত্বং চ গচ্ছতি (এবং অমৃতত্ব লাভ করে)।

সরলার্থ: পুরুষ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) সর্বব্যাপী ও নিরাকার (তাই অজ্ঞেয়)। যদি কেউ তাঁকে জানতে পারে তবে (জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে) সে মুক্ত হয়ে যায় এবং (জীবৎ কালেই) অমরত্ব লাভ করে।

ব্যাখ্যা: পুরুষ (ব্রহ্ম) সর্বব্যাপী। এমনকি আকাশও পুরুষ থেকে উৎসারিত। পুরুষ নিরাকার, তাই তাঁকে জানার কোন উপায় নেই। তিনি বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। মায়াযুক্ত ব্রহ্মই অব্যক্ত, তাঁর প্রকাশ নেই। অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হন তখন তিনি হিরণ্যগর্ভ।

আমাদের অগ্রগতি স্থূল থেকে সূক্ষ্মে। প্রথমে স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয়কে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু মন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের থেকে সূক্ষ্ম, কারণ মনই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। মনের চেয়ে বুদ্ধি সূক্ষ্মতর। বুদ্ধিই মনের নিয়ামক। জীবাত্মা আবার বুদ্ধির চেয়ে সূক্ষ্ম; জীবাত্মা বুদ্ধির নিয়ন্তা। জীবাত্মার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি বুদ্ধি। হিরণ্যগর্ভ হলেন পরমাত্মা তথা ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। হিরণ্যগর্ভের চেয়েও সূক্ষ্ম অব্যক্ত। অব্যক্তকে মায়া বা প্রকৃতিও বলা হয়। সূক্ষ্মতম হলেন পুরুষ তথা পরমাত্মা তথা পরা ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম।

এই পরা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি জীবন্মুক্ত।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥৯

অন্বয়: অস্য রূপম্ (এঁর রূপ [অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরম পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ]); সংদৃশে ন তিষ্ঠতি ([আমাদের] প্রত্যক্ষ দৃষ্টির গোচর নয়); [অতঃ] কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি ([এই কারণে] কেউই এঁকে চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না [বা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না]); হৃদা: মনীষা (হৃদয়স্থ বিকল্প-বর্জিত বুদ্ধি দ্বারা [অর্থাৎ শুদ্ধ, নির্মল মনযুক্ত হৃদয়ে]); মনসা (নিরন্তর মনন দ্বারা); অভিক্লৃপ্তঃ ([ব্রহ্ম] প্রকাশিত হন); যে এতৎ বিদুঃ (যাঁরা এঁকে জানেন); তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

সরলার্থ: পরমাত্মা বা পুরুষ আমাদের দৃষ্টিগোচর নন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁকে জানা যায় না। যে ব্যক্তির মন শুদ্ধ এবং যিনি নিরন্তর তাঁরই স্মরণ-মনন করেন, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। এই পরমাত্মাকে যিনি প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করেন তিনি অমরত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লিখিত পুরুষ বা পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁকে জানা যায় না। সাধকের মন স্থির, একাগ্র ও শুদ্ধ হলে তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। বুদ্ধি প্রথমে অন্য সব কিছুকে অন্তরায় মনে করে ত্যাগ করে এবং মনকে আত্মায় একাগ্র করে। সেই একমুখী মনে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। এই আত্মজ্ঞান প্রকাশে ইন্দ্রিয়ের কোন ভূমিকা নেই। মেঘ সরে গেলে সূর্য আপনিই প্রকাশ পায়। হৃদয়ে আত্মার প্রকাশও সেইরকম। আমাদের বাসনাই মেঘরূপে আত্মাকে আবৃত করে রাখে। নিত্য-অনিত্য বিচার করে নিরন্তর আত্মার স্মরণ-মনন করলে সকল বাসনা দূর হয়। তখন মন স্বচ্ছ দর্পণের মতো হয়ে ওঠে। সেই দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব যেমন স্পষ্ট দেখায় আত্মাকেও ঠিক তেমনি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥১০

অন্বয়: যদা (যখন); পঞ্চ জ্ঞানানি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক); মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে (মনের সঙ্গে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করে); বুদ্ধিঃ চ ন বিচেষ্টতি (এবং বুদ্ধিও নিজ কর্ম থেকে বিরত হয়); [পণ্ডিতাঃ] তাং পরমাং গতিম্ আহুঃ (তাঁকেই [পণ্ডিতগণ] সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থা বলেন)।

সরলার্থ: পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন মনে লীন হয়ে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধিও কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে স্থির হয় সেই অবস্থাকেই পণ্ডিতেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থা বলে বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা: যোগ অভ্যাসের দ্বারা যোগী যে অবস্থা লাভ করতে চান সেই অবস্থার কথাই এখানে বলা হয়েছে। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করে মনে লয় করেন। বুদ্ধিকেও তিনি সম্পূর্ণ স্থির ও নিশ্চল করেন। যোগীরা এই অবস্থাকেই সাধনার উচ্চতম অবস্থা বলে বর্ণনা করে থাকেন।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥১১

অন্বয়: তাং স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্ (সেই স্থির অর্থাৎ অচল ইন্দ্রিয়ধারণাকে); [যোগিনঃ] যোগম্ ইতি মন্যন্তে (যোগিগণ যোগ বলে মনে করেন); তদা [যোগী] অপ্রমত্তঃ ভবতি (সেই অবস্থায় যোগী আর ভুল করেন না [অর্থাৎ আর মায়ার প্রভাবে মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করেন না]); হি যোগঃ প্রভবাপ্যয়ৌ (কিন্তু এই যোগাবস্থারও উত্থান পতন আছে)।

সরলার্থ: যোগিগণের মতে, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ স্থির ও অচঞ্চল হয় তাকে যোগাবস্থা বলে। এই অবস্থায় যোগী আর কখনও ভুল করেন না (অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের ফলে তিনি আর ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না)। কিন্তু এই অবস্থারও উত্থান পতন আছে।

ব্যাখ্যা: বর্তমান ও পূর্ববর্তী শ্লোকে যোগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মন ও বুদ্ধি সহ সকল ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণ স্থির, সেই অবস্থাকেই যোগীরা যোগাবস্থা বলেন। এই অবস্থায় যোগী আত্মার সঙ্গে যুক্ত হন। তখন জাগতিক প্রলোভন আর তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। যোগাবস্থার যেমন শুরু আছে, তেমনি শেষও আছে। উচ্চ যোগাবস্থার থেকে ব্যুত্থিত হয়ে যোগীকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়, যাতে মায়ার ছলাকলার ফাঁদে তিনি আবার ধরা না পড়েন। নিজ কর্ম ও চিন্তার দিকে যোগীকে সর্বদা

তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। বিচারের দ্বারা সাধনার অনুকূল বস্তু গ্রহণ এবং প্রতিকূল বস্তু ত্যাগ করার অভ্যাস নিরন্তর চালিয়ে যেতে হয়।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥১২

অন্বয়: [সঃ (সেই পরমাত্মা)]; বাচা প্রাপ্তুং ন শক্যঃ (বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না); মনসা ন (মনের দ্বারা ধারণা করা যায় না); চক্ষুষা ন (চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না); [সঃ (তিনি)]; অস্তি (আছেন); ইতি ব্রুবতঃ অন্যত্র (এই কথা যিনি বলেন তিনি ব্যতীত অন্য লোকেরা); কথং তৎ উপলভ্যতে (কি প্রকারে তাঁকে উপলব্ধি করবেন)?
সরলার্থ: আত্মা (ব্রহ্ম) বাক্যমনাতীত; চক্ষু (বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়) তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তবু (শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরুবাক্য শ্রবণ করে) কিছু মানুষ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু অবিশ্বাসীর কাছে তাঁর অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা যায়?
ব্যাখ্যা: আত্মা তথা ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। তবু কিছু মানুষ এই ব্রহ্ম বা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ও গুরুর সাহচর্যে তাঁদের এই বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁদের জন্য কি করণীয়? যেহেতু ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেহেতু অবিশ্বাসী মানুষ অনায়াসেই ব্রহ্মতত্ত্ব বাতিল করতে পারেন। এরকম মানুষের কাছে ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কোন উপায় আছে কি?

না, ব্রহ্ম কোন বস্তু নন যে, তাঁকে হাতে-কলমে প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই। এই জগৎ কোথা থেকে এল? ব্রহ্ম থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে। সকল অস্তিত্বের মূলে এই ব্রহ্ম। তিনিই আদি কারণ। কোথাও গাছ থাকলে, আগে যে সেখানে বীজ ছিল একথা ধরে নেওয়া যায়। শূন্য থেকে 'কিছু'র উৎপত্তি হতে পারে না। একটি সত্তা থেকেই আর একটি সত্তার উৎপত্তি হয়। যদি জগৎ সত্য হয় তবে তা কোন সত্যবস্তু থেকেই এসেছে। মিথ্যা থেকে সত্য উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের গোচর হন বা না হন, তিনি অবশ্যই সত্য। এই দৃশ্যমান জগৎ যে কোন মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই জগতের আশ্রয় অর্থাৎ জগতের পেছনে যে চৈতন্য তার কোন বিনাশ নেই। ব্রহ্মই সকল চৈতন্যের উৎস, সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য। কার্য অদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু কারণ অবিনাশী। কার্য কারণেই লয় হয়। বাইবেলে আছে, 'তুমি মৃত্তিকার সন্তান, আবার মৃত্তিকাতেই ফিরে যাবে।'

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥১৩

অন্বয়: অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ ([সর্বপ্রথম] 'পরমাত্মা আছেন' এভাবে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে); তত্ত্বভাবেন চ [উপলব্ধব্যঃ] (তারপর তত্ত্বভাবেও অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে); উভয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে [যাঁরা পরমাত্মা আছেন বলে বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা করেন না এই দুয়ের মধ্যে]); অস্তি ইতি উপলব্ধস্য এব (পরমাত্মা আছেন এভাবে যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁরই নিকট); তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি (তত্ত্বভাব অর্থাৎ পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়)।
সরলার্থ: সর্বপ্রথম, 'পরমাত্মা আছেন' একথা উপলব্ধি করতে হবে। এরপর আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে। পরমাত্মার অস্তিত্বে যাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসী এবং যাঁরা বিশ্বাসী নন, এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানুষের হৃদয়েই পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন।
ব্যাখ্যা: প্রথমত 'পরমাত্মা আছেন', এই দৃঢ় বিশ্বাস সাধকের থাকতে হবে। কিন্তু এ কেবল সূচনামাত্র। লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। যতদিন পর্যন্ত আত্মা নিজেকে প্রকাশ না করেন ততদিন কঠোর সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আত্মোপলব্ধি সাধকের ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ। এই উপলব্ধি হলে পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ, নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায়।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥১৪

অন্বয়: যে কামাঃ (যে সকল কামনা-বাসনা); অস্য হৃদি শ্রিতাঃ ([এখন] মানুষের হৃদয়কে আশ্রয় করে আছে); সর্বে যদা প্রমুচ্যন্তে (যখন সেইসকল [কামনা-বাসনা] বিনষ্ট হয়); অথ (তখন); মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি (মরণশীল মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়); অত্র (এই জীবনেই); ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়)।
সরলার্থ: যখন মানুষের হৃদয়ে সকল বাসনার নাশ হয়, তখনই সে অমরত্ব লাভ করে এবং এই জীবনেই সে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।
ব্যাখ্যা: জীবনের লক্ষ্য অমরত্ব লাভ—একথা কঠ উপনিষদ বারবার ঘোষণা করছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্যে পৌঁছব কি করে? পথে অনেক বাধা আর আমাদের বাসনাই এই বাধা।

কামনা-বাসনা মানুষকে সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। এই বাসনার পাশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ নির্বাসনা হলে আত্মা আপনিই নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করেন। এ যেন আয়নার ওপর থেকে ধুলো-ময়লা মুছে ফেলার মতো। ময়লা দূর হলে স্বচ্ছ আয়নায় মানুষের মুখ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তেমনি যখন সকল বাসনা নির্মূল হয়, তখন মানুষ নিজের স্বরূপ জানতে পারে। সে তখন পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। 'আমিই ব্রহ্ম'—এই জ্ঞান লাভ করে সে অমর হয়। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা এই জীবনেই লাভ করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন বিবেক-বৈরাগ্য। বিবেকের সাহায্যে মানুষ নিত্য-অনিত্য বিচার করে অনিত্যকে ত্যাগ করে। এইভাবে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়, সেই শুদ্ধ মনে আত্মা আপনা আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥১৫

অন্বয়: ইহ (এই পৃথিবীতেই); যদা (যখন); হৃদয়স্য সর্বে গ্রন্থয়ঃ (হৃদয়ের সমস্ত [অবিদ্যাজনিত] গ্রন্থি); প্রভিদ্যন্তে (বিনষ্ট হয় [অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রভাব থেকে মানুষের মন যখন মুক্ত হয়]); অথ (তখন); মর্তঃ অমৃতঃ ভবতি (মরণশীল মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হন); এতাবৎ হি অনুশাসনম্ (এ পর্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ [এর চেয়ে মহত্তর আর কিছুই নেই])।

সরলার্থ: যখন এই পৃথিবীতেই মানুষের মন অজ্ঞানতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন মরণশীল মানুষ নিজেকে অমর বলে অনুভব করতে শুরু করে। এই হল বেদান্তশাস্ত্রের বাণী (এর চেয়ে মহত্তর বাণী আর কিছু নেই)।

ব্যাখ্যা: বাসনাই মানুষের সকল দুঃখের মূল। এই বাসনা মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। একটা বাসনা পূর্ণ হলে আর একটা, তারপর আবার আর একটা—এই ভাবেই বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এই বাসনাই বন্ধন। গুটিপোকা নিজের জালে নিজেই বদ্ধ হয়। বাসনার উৎপত্তি অজ্ঞানতা থেকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে। এই অজ্ঞতাবশত আমরা নিজেদের দেহ বলে মনে করি। আমাদের সকল কর্ম এই দেহকে কেন্দ্র করে। কিন্তু দেহ আসলে আত্মায় আরোপিত সত্তা মাত্র। এই দেহবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। নিজেদের সর্বদা এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, আমরা স্বরূপত মুক্ত। আত্মাকে কোন বন্ধনে বাঁধা যায় না। এই আত্মাই সর্বোচ্চ, অন্য সব কিছু আত্মার অধীন। এই আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। এই আত্মা সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে বিরাজমান। এই আত্মাই

সবকিছু। আত্মাতে কোন অভাব বোধ নেই। আমাদের সকল বাসনার মূলে অজ্ঞানতা। বাসনা নির্মূল করাই আমাদের প্রধান কাজ। বাসনামুক্ত হলে আমরা এই জীবনেই মুক্ত হতে পারি। বাসনার জন্যই আমাদের পুনর্জন্ম হয়। তাই যেখানে বাসনা নেই, সেখানে পুনর্জন্ম নেই, অতএব মৃত্যুও নেই। একেই বলে অমরত্ব।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥১৬

অন্বয়: হৃদয়স্য শতং চ একা নাড্যঃ ([মানুষের] হৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত একশত একটি ধমনী বা নাড়ী আছে); তাসাম্ একা (তাদের মধ্যে একটি [অর্থাৎ সুষুম্ন]); মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (মূর্ধা [ব্রহ্মরন্ধ্র] ভেদ করে নিঃসৃত হয়েছে); তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ (সেটি দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করে [অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীবাত্মা এই ধমনী পথে বেরিয়ে এসে]); অমৃতত্বম্ এতি (অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন); বিষ্বক্ অন্যাঃ (অপরাপর নাড়ীসমূহ); উৎক্রমণে ভবন্তি (উৎক্রমণের [অর্থাৎ বিবিধ গতিলাভের] কারণ হয়)।

সরলার্থ: মানুষের হৃদ্যন্ত্রের সঙ্গে অসংখ্য ধমনী যুক্ত। এদের একটি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবাত্মা যখন এই পথে বেরিয়ে আসে, তখনই ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু অন্য ধমনীপথে বেরোলে জীবাত্মার পুনর্জন্ম হয়, আর এই সব জন্ম মনুষ্যকুলে অথবা মনুষ্যেতর কুলেও হতে পারে।

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন তিনি আর জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হন না। তিনি তখন মুক্ত। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁর কি হয়? মৃত্যুকালে তাঁর আত্মা সুষুম্না পথে নির্গত হয়। একটি বিশেষ ধমনী মানুষের হৃদ্যন্ত্রকে ব্রহ্মরন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত করে। এই ধমনীকে বলে সুষুম্না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি উন্নত তাঁদেরই কেবল এই ভাবে মৃত্যু হয়। ইহলোক বা পরলোকের কোন বস্তুর প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন না। বাসনাকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছেন।

অধিকাংশ মানুষেরই মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়; কারণ তাদের বহু বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। মানুষ, পশু অথবা উদ্ভিদ রূপে তাদের পুনর্জন্ম হতে পারে। মৃত্যুকালে তাদের আত্মা অন্য ধমনীপথে নিষ্ক্রান্ত হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥১৭

অন্বয়: অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অন্তরাত্মা পুরুষঃ (অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ); সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (সর্বদা সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান); মুঞ্জাৎ ইষীকাম্ ইব (মুঞ্জাতৃণ থেকে ইষীকা গ্রহণের ন্যায় [অর্থাৎ মুঞ্জাঘাস থেকে যেরূপ তন্মধ্যস্থ ইষীকাকে অর্থাৎ মধ্যের ডগাটিকে অতি যত্নে কোষমুক্ত করতে হয়, সেরূপ]); স্বাৎ শরীরাৎ ধৈর্যেণ তং প্রবৃহেৎ (ধৈর্যসহকারে স্বীয় শরীর থেকে তাঁকে [অর্থাৎ আত্মাকে], স্বতন্ত্র করতে হয়); তং শুক্রম্ অমৃতং বিদ্যাৎ (তাঁকে শুদ্ধ ও অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা বলে জানা যায়)।

সরলার্থ: অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তরাত্মা প্রত্যেকের হৃদয়ে সদা বিদ্যমান। মুঞ্জাঘাসের কোমল শীষকে যেমন অতি যত্নে কোষমুক্ত করতে হয়, ঠিক সেই ভাবে মুমুক্ষু ব্যক্তির উচিত আত্মাকে বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে দেহমনের থেকে আলাদা করা এবং সেই আত্মাকেই শুদ্ধ, অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার সাথে অভিন্ন বলে জানা।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, এক আত্মা সকল বস্তু ও সকল প্রাণীতে অবস্থান করছেন। এই আত্মা সবকিছু পূর্ণ করে রয়েছেন—এইজন্য তাঁর আর এক নাম পুরুষ (যা পূর্ণ করে)।

সকল বস্তুর হৃদয়ে আত্মা লুকিয়ে রয়েছেন। শরীর, ইন্দ্রিয় ও তাদের ক্রিয়াকলাপ আত্মাকে আবৃত করে রেখেছে। মুঞ্জাঘাসের অভ্যন্তরে কোষবদ্ধ অতি কোমল শীষের সঙ্গে এখানে আত্মার তুলনা করা হয়েছে। ঘাস থেকে শীষটা পেতে গেলে অতি যত্নে তাকে ঘাস থেকে আলাদা করতে হয়। তেমনি দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি থেকেও আত্মাকে অতি সতর্কতার সঙ্গে পৃথক করতে হয়। শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি আত্মার ওপর আরোপিত উপাধি মাত্র; তারা আত্মার ওপর নির্ভরশীল। আত্মা ছাড়া তারা মৃত। আত্মাই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সক্রিয় করে। বস্তুত আত্মাই একমাত্র কর্তা। তাঁরই আদেশে জগতে সকল বস্তু সচল ও সক্রিয় হয়। আত্মাই সর্বভূতের অন্তরতম সত্তা। সেইজন্যই তাঁকে দেখা যায় না। মুঞ্জাঘাসের বাইরের খোসা ছাড়িয়েই কোমল শীষ পাওয়া যায়; ঠিক তেমনিভাবে নেতি নেতি করে এই দেহমনের কোষকে ত্যাগ করতে হয়। সত্যকে তথা আত্মাকে লাভ করতে গেলে যথাসাধ্য বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়। কেবল তখনই আত্মাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। তখনই জানতে পারি আত্মা শুদ্ধ ও অবিনাশী, এই আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং আমার মধ্যেও সেই একই আত্মা বিরাজিত। অর্থাৎ আমি সকলের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। এই একত্বের উপলব্ধি হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব॥১৮

অন্বয়: অথ (এভাবে); নচিকেতঃ (নচিকেতা); মৃত্যুপোক্তাম্ (যম কর্তৃক কথিত); এতাং বিদ্যাং কৃৎস্নং যোগবিধিং চ (এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদয় যোগবিধি); লব্ধ্বা (লাভ করে [অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে]); ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হলেন); বিরজঃ বিমৃত্যুঃ [চ] অভূৎ (নির্মল এবং মৃত্যুঞ্জয় হলেন); অন্যঃ অপি যঃ (অন্য যে কেহ); অধ্যাত্মম্ এব এবং বিৎ (এই প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করলে [তিনিও এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হন])।
সরলার্থ: এইভাবে নচিকেতা মৃত্যু তথা যমের কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মই নচিকেতা তথা সর্বভূতের অন্তরাত্মা, এই জ্ঞান) এবং যোগসাধনার বিধি সহ যোগবিদ্যা লাভ করলেন। এই জ্ঞানের সাহায্যে নচিকেতা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শুদ্ধ ও মৃত্যুঞ্জয় হলেন। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেন তিনিই এই অবস্থা (অর্থাৎ শুদ্ধ ও অমর) প্রাপ্ত হন।
ব্যাখ্যা: উপনিষদ এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশস্তি করছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। উপনিষদ এই জ্ঞানের উপযোগিতার কথাও বলছেন। এই জ্ঞান যিনি অর্জন করেন তিনি শুদ্ধ, মুক্ত, এবং অমর হয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করেন, তিনি ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম তৃণটির মধ্যেও তিনি নিজেকেই দেখেন; নিখিল জগতের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। যেহেতু তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই তখন কাকে তিনি ভয় করবেন, কি-ই বা চাইবেন আর কার প্রতিই বা আসক্ত হবেন? এই বোধ যখন জাগে তখনই যথার্থ মুক্তি। তিনি তখন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা।

নচিকেতা এইভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করলেন। যে কেউ নচিকেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তিনিও এই অমৃতত্ব লাভ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

প্রশ্ন উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: দেবাঃ (হে দেবগণ); কর্ণেভিঃ (কান দিয়ে); ভদ্রম্ (ভাল যা কিছু); শৃণুয়াম (যেন তাই শুনতে পাই); যজত্রাঃ (হে পূজ্য দেবগণ); অক্ষভিঃ (চোখ দিয়ে); ভদ্রম্ (যা কিছু ভাল); পশ্যেম (যেন তাই দেখতে পাই); স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ (স্থির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা); তুষ্টুবাংসঃ (যেন তোমাদের স্তুতি করতে পারি); দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবগণ যে আয়ু বিহিত করে দিয়েছেন); ব্যশেম (তা যেন লাভ করতে পারি); শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ কীটপতঙ্গ, হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত বিঘ্নের শান্তি])।

সরলার্থ: দেবতাদের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা যে, আমরা যেন যা কিছু ভাল শুধু তাই-ই কান দিয়ে শুনি। দেবতাদের আমরা পুজো করি, আর তাঁদের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, চোখ দিয়ে আমরা যেন শুধু ভাল জিনিসই দেখি। আরো প্রার্থনা, কায়মনোবাক্যে যেন তাঁদেরই জয়গান করি। তাঁদের যেমন ইচ্ছা ততদিনই যেন বেঁচে থাকি—বেশি নয়, কমও নয়। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: আমরা যেন ভাল কথা শুনি। 'ভাল' বলতে কি বুঝায়? যা কল্যাণপ্রদ, যা অনুকূল। দর্শন একটা শক্ত বিষয়। এ বুঝতে গেলে গভীর মনোযোগ চাই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যা আমার পক্ষে কল্যাণকর, তাই শুধু আমরা দেখব। এতে আমাদের জ্ঞানার্জনের সুবিধা হবে এবং আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

এই প্রার্থনার মধ্যে আমাদের অঙ্গাদি স্থির থাকুক, এ কথাও বলা আছে। অঙ্গ বলতে শুধু বাইরের স্থূল অঙ্গ নয়, মনও ঐ সঙ্গে আছে বুঝতে হবে। শরীর ভাল থাকবে, মনও ভাল থাকবে। তবেই কাজে মন দিতে পারব। হয়তো শরীরের কোথাও একটা ব্যথা আছে। এতে মন বিক্ষিপ্ত থাকবে। মন যেন সর্বদা সজাগ থাকে; শরীরে বা মনে অবসাদ, জড়তা

এসব কিছু যেন না থাকে। শরীর ও মন দুই-ই যেন স্থির থাকে, আর আমাদের আয়ত্তে থাকে। আমরা এইভাবে চলব, তবে আমাদের আয়ু বিধাতার যেমন বিধান তেমনি হোক।

আমরা প্রশ্ন উপনিষদ পড়তে চলেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আমাদের শরীর-মন যেন সুস্থ থাকে। আমরা যেন আমাদের অধ্যয়নে ডুবে থাকতে পারি। বিধাতার যেমন ইচ্ছা ততদিন যেন এইভাবে বেঁচে থাকতে পারি।

প্রশ্ন উপনিষদ

প্রশ্ন উপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। প্রশ্ন কথার অর্থ হল জিজ্ঞাসা। এই উপনিষদের বিষয় কিছু প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই নামকরণ। আমাদের মনে সব সময়ই নানা প্রশ্ন জাগে। বিশেষত নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে। আমরা সবাই বলি 'আমি'। কিন্তু এই 'আমি'টি কে? ভারতের শিক্ষা হল সর্বপ্রথম নিজেকে জানা। তা হলেই দৈনন্দিন জীবনে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে।

এই উপনিষদের আরম্ভ কয়েকজন তরুণ শিক্ষার্থীকে নিয়ে। এই সব তরুণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। শুধু তাই নয়, সত্যকে জানার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম সংযম অভ্যাস করেছেন। কিন্তু এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও তাঁরা শাস্ত্রের মর্মার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম নন। তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তখন এই তরুণরা আচার্যের নির্দেশ লাভের জন্য ঋষি পিপ্পলাদের কাছে যাওয়া মনস্থ করলেন। পিপ্পলাদ ছিলেন সেই কালের একজন খ্যাতনামা আচার্য।

শাস্ত্র পরম সত্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়। কিন্তু সেই সত্য ধারণা করার জন্য এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে থাকা প্রয়োজন যিনি সেই সত্যকে জেনেছেন। এরকম গুরুগৃহে বাস হিন্দুদের রীতি। কিন্তু গুরু নিজে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন কি না তা জানা যাবে কি ভাবে? সত্যদ্রষ্টা আচার্য সূর্যের মতো। সূর্যকে যখন আমরা দেখি তখন কাউকে বলে দিতে হয় না যে এটা সূর্য। ঠিক সেরকম যখন সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি তখন তাঁর চরিত্রেই তাঁকে চেনা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান।

শিষ্যকে গুরুর কাছে যেতে হবে অত্যন্ত বিনীতভাবে। গুরু অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান করেন না। সুতরাং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রতীক হিসেবে শিক্ষার্থী সাধারণত কিছু উপহার নিয়ে যান। শিষ্য যদি প্রকৃত জিজ্ঞাসু হন তাহলে আচার্য প্রসন্ন হয়ে তাঁকে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু নিষ্ঠা এবং আগ্রহের প্রমাণ-স্বরূপ শিষ্য অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গুরুর নিকট উপস্থিত হবেন এবং প্রার্থনা জানাবেন : 'ভগবান, অনুগ্রহ করে আমায় শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করুন। আমি কিছুই জানি না'।

গুরু পিপ্পলাদের কাছে যে-ছাত্ররা এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রত্যেকেই খুব ভাল প্রশ্ন করছিলেন: কোথা থেকে আমরা এসেছি? জীবনের উৎস কি? কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎ আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে এবং প্রধান ইন্দ্রিয় কোন্‌টি? প্রাণের (প্রাণবায়ুর) উৎপত্তি কোথা থেকে? কি ভাবে প্রাণ শরীরে প্রবেশ করে এবং

কি ভাবেই বা শরীর ত্যাগ করে? কে ঘুমোন আর কেই বা জেগে থাকেন? স্বপ্নকালে কি ঘটে? আনন্দের উৎস কি? 'ওম্'কে ধ্যান করলে মানুষ কোথায় যায় এবং সে কি লাভ করে? এবং সবশেষে, পরম সত্তা কি? এবং তিনি কোথায়ই বা আছেন?

প্রশ্নগুলি সরাসরি ব্রহ্ম বিষয়ে নয়, তবে ব্রহ্মকে জানার জন্য প্রাসঙ্গিক। প্রশ্নগুলি বিশেষ ভাবে প্রাণকে নিয়ে। দৃশ্যমান জগতে সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রাণ। সেই প্রাণ হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি এবং সূত্রাত্মা নামেও পরিচিত। প্রাণ একাধারে স্থূল এবং সূক্ষ্ম, ভোক্তা এবং ভোগ্য, কারণ এবং কার্য। প্রাণই সবকিছু। মুণ্ডক উপনিষদ এবং প্রশ্ন উপনিষদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডক উপনিষদ যেন আকরগ্রন্থ এবং প্রশ্ন উপনিষদ তার ভাষ্য। মুণ্ডক উপনিষদের অধিকাংশই শ্লোকের আকারে লেখা হয়েছে। শুধু কয়েকটি অংশ গদ্যে লেখা। প্রশ্ন উপনিষদ ঠিক তার বিপরীত।

প্রশ্ন উপনিষদে এই সব প্রশ্নের আলোচনা ধাপে ধাপে করা হয়েছে। প্রথমে দৃশ্যমান জগৎ—সেখানে কত বিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ। কিন্তু যে ভাবেই হোক, সব বৈচিত্রের পিছনে একটি মূল কারণ আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু কি সেই কারণ? প্রথমে আমরা এই কারণকে বাইরে খুঁজি, পরে ফিরে তাকাই নিজের দিকে। অবশেষে দেখা যায় যা বাইরে আছে, তা-ই অন্তরে। যখন বাইরে আছে তখন বিশ্ব অর্থাৎ সমষ্টি। সেই একই জিনিস যখন ভেতরে, তখন তা জীব অর্থাৎ ব্যষ্টি। এই জীব ও অনন্ত সত্তা এক এবং অভিন্ন। এই হল সিদ্ধান্ত। আর এই সিদ্ধান্তই হল অদ্বৈত তত্ত্ব।

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ।।১

অন্বয়: ভারদ্বাজং সকেশা (ভরদ্বাজপুত্র সকেশা); শৈব্যঃ সত্যকামঃ চ (এবং শিবিপুত্র সত্যকাম); সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ চ (গর্গগোত্রীয় সূর্যপৌত্র); আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ চ (এবং অশ্বলপুত্র কৌসল্য); বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ (বিদর্ভ দেশীয় ভৃগুতনয়); কাত্যায়নঃ কবন্ধী (কত্যতনয় কবন্ধী); তে হ এতে (এঁরা সকলে); ব্রহ্মপরাঃ (ব্রহ্মে সমর্পিত); ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মে একাগ্র); পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ (পরব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছুক হয়ে); এষঃ হ বৈ (ইনি সেই ব্যক্তি); তৎ সর্বং বক্ষ্যতি (যিনি আমাদের সেই সব শিক্ষা দেবেন); ইতি (এভাবে স্থির করে); তে (তাঁরা); সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞের কাঠ হাতে নিয়ে); ভগবন্তং পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ (পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হলেন)।

সরলার্থ: ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রীয় সৌর্যায়ণী অশ্বলপুত্র কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভৃগুপুত্র ভার্গব, কত্যতনয় কবন্ধী—এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মে সমর্পিত প্রাণ। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু তাঁরা জানতেন না। ব্রহ্মকে তাঁরা সম্যক্ ভাবে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সকলে যজ্ঞের কাঠ হাতে নিয়ে গুরু পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা জানতেন গুরু পিপ্পলাদ তাঁদের ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান দিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা: এই উপনিষদের আরম্ভ ছয়জন যুবককে নিয়ে। এই ছয়জন যুবক হলেন: সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়ণী, কৌসল্য, ভার্গব এবং কবন্ধী। তাঁরা হয়তো কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। ভারতীয় ধারণায় সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা আসল তা হল তাঁদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান।

উপনিষদ তাঁদের 'ব্রহ্মপরাঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মে নিবেদিত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' এবং 'পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ' বলা হয়েছে। 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ'র অর্থ একান্ত ভাবে যাঁরা ব্রহ্মে অনুরাগী এবং 'পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ' হল পরব্রহ্মকে যাঁরা জানতে আগ্রহী। এঁরা সবাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। বেদান্তসারে বলা হয়েছে, যখন এরকম ব্যাকুলতা জাগে তখন মনে হয় সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে। গায়ে আগুন লাগলে

যেমন একটিই মাত্র চিন্তা থাকে কেমন করে একটু জল পাওয়া যায়, এঁদের ব্যাকুলতাও ছিল তেমনি একমুখী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একজন মানুষের মাথা যদি জোর করে জলের নীচে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তবে নিঃশ্বাস নেবার জন্য তার প্রাণ আঁকুপাঁকু করবে। ব্রহ্মের জন্যও এইরকম তীব্র ব্যাকুলতার নামই ব্রহ্মনিষ্ঠা।

আমাদের মনোভাব কি রকম হওয়া উচিত কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যান তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। একটি মাত্র বিষয়ে নচিকেতার আগ্রহ। তা হল আত্মাকে জানা। যম তাঁকে নানা ভাবে পরীক্ষা করছেন। তিনি বলছেন, 'হে বালক, মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয় তা জেনে তুমি কি করবে? তোমার বয়স অল্প, এখনও অনেক বছর বাঁচবে। জীবনটাকে তুমি উপভোগ কর। আমি তোমাকে সাহায্য করব। ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ-আহ্লাদ, যা তুমি চাইবে সব পাবে। কিন্তু তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করো না।' কিন্তু নচিকেতা ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁর মন ব্রহ্মে স্থির। নচিকেতা উত্তর দিলেন: 'ধনরত্ন, দীর্ঘ আয়ু, আমোদ-আহ্লাদ এসব আমার দরকার নেই। ওসব আপনারই থাক। মৃত্যুর পরে মানুষের কি গতি হয় আমি শুধু সেকথাই জানতে চাই। আমি আত্মতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক।'

এই উপনিষদে যে ছয়জন শিক্ষার্থীর নাম করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই সগুণ ব্রহ্মের কথা জানতেন। এখন তাঁরা পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের কথা জানতে আগ্রহী। এইজন্য তাঁরা ঋষি পিপ্পলাদের নিকটে যাওয়া স্থির করলেন। কেননা তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, ব্রহ্ম বিষয়ে যা কিছু জানবার আছে পিপ্পলাদ তাঁদের শেখাতে পারবেন। গুরুকে ভগবান বলা হয়, কারণ তিনি নানা গুণের অধিকারী। শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী এই ছয়জন যুবক যজ্ঞের জন্য শুকনো কাঠ হাতে নিয়ে, 'সমিৎপাণয়ঃ', গুরুর নিকট উপস্থিত হলেন। সেই কালে যজ্ঞকর্মের জন্য গুরুর জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন হত। গুরুর প্রতি এই অর্ঘ্যটুকু শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা, বিনয় এবং শিক্ষালাভের জন্য তীব্র আগ্রহের প্রতীক।

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি॥২

অন্বয়: সঃ ঋষিঃ (সেই ঋষি); তান্ হ উবাচ (তাঁদের বললেন); ভূয়ঃ এব (পুনরায়); তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া (কৃচ্ছ্রসাধন ও সংযম অভ্যাস করে এবং শাস্ত্র ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে); সংবৎসরং সংবৎস্যথ (একবছর একত্রে বাস কর); যথাকামম্ [অতঃপর]

(ইচ্ছানুযায়ী); প্রশ্নান্ পৃচ্ছত (প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করো); যদি বিজ্ঞাস্যামঃ (যদি আমি জানি); সর্বং হ বঃ বক্ষ্যামঃ ইতি (আমি তোমাদের সবকিছু বলব)।

সরলার্থ: ঋষি তাঁদের বললেন: 'আমার সঙ্গে একবছর থাক। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন ও সংযম অভ্যাস কর। তারপরে তোমাদের যা প্রশ্ন আছে করো। আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করব'।

ব্যাখ্যা: পিপ্পলাদ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বুঝেছিলেন এই তরুণরা সকলেই ছাত্র হিসেবে উত্তম। কাজেই তিনি তাঁদের একবছর তাঁর সঙ্গে বাস করার নির্দেশ দিলেন। গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিষ্য সেই মহাপুরুষের পবিত্র জীবন কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। তাই পিপ্পলাদ বললেন, 'আমি জানি তোমরা ইতিপূর্বেই আত্মসংযম অভ্যাস করেছ। তবু আমার ইচ্ছা তোমরা আরও একবছর কৃচ্ছ্রসাধন কর। তারপর তোমাদের যেমন খুশী প্রশ্ন করো। আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করব।'

আত্মজ্ঞান দানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ দান। পিপ্পলাদ চেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যরা সেই সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের যোগ্য অধিকারী হয়ে উঠুন। সেইজন্য তাঁদের সেখানে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মসংযম অভ্যাস করতে বললেন; গুরু ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ারও নির্দেশ দিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনে এই গুণগুলি অপরিহার্য।

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥৩

অন্বয়: অথ (একবছর পরে); কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেত্য (কত্যপুত্র কবন্ধী [পিপ্পলাদের নিকটে] উপস্থিত হলেন); পপ্রচ্ছ [এবং] (জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবন্ (প্রভু অথবা ভগবান); ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল প্রাণী [যাদের আমরা চারদিকে দেখি]); কুতঃ (কোথা থেকে); বা প্রজায়ন্তে ([তারা] আসে)?

সরলার্থ: একবছর পর কত্যপুত্র কবন্ধী পিপ্পলাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে ভগবান, এইসব প্রাণীরা কোথা থেকে আসে?'

ব্যাখ্যা: কবন্ধী প্রথম প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন। পরব্রহ্মের (পরম সত্য) কথা জানার জন্যই তরুণরা পিপ্পলাদের কাছে এসেছিলেন। কবন্ধী তাহলে জীবের (অর্থাৎ প্রাণীদের) বিষয়ে প্রশ্ন করলেন কেন? এই জগৎকে যে আমাদের সত্য বলে মনে হয় তার কারণ জগতে যা কিছু আছে সবই সেই পরব্রহ্মের প্রকাশ। সেইজন্য কবন্ধীর প্রথম প্রশ্ন এই জীবজগৎকে নিয়ে।

শিষ্যরা সগুণ ব্রহ্মের বিষয়ে জানেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের (পরব্রহ্ম) কথা তাঁরা কিছুই জানতেন না। সেই কারণেই কবন্ধী জগৎ বিষয়ে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে শিষ্যরা বুঝতে পারবেন এই দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য, পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥৪

অন্বয়: সঃ (তিনি) [পিপ্পলাদ]; তস্মৈ (তাঁকে) [কবন্ধীকে]; উবাচ (বললেন); সঃ প্রজাপতিঃ (সেই তিনি [যিনি] সমস্ত প্রাণীর প্রভু); প্রজাকামঃ (সন্তান কামনা করে); সঃ তপঃ অতপ্যত (তিনি তপস্যা করলেন [অর্থাৎ তিনি বিষয়টি চিন্তা করলেন]); তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা সম্পূর্ণ করে [অর্থাৎ বিষয়টি সবিশেষ চিন্তা করে]); এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতঃ (এই উভয়েই আমাকে বহু সন্তান সৃষ্টিতে সাহায্য করবে); ইতি [মত্বা] (এইরকম মনে করে); রয়িং চ প্রাণং চ (চন্দ্র [অন্নের প্রতীক] এবং সূর্য [অথবা অগ্নি, ভোক্তার প্রতীক]) মিথুনম্ উৎপাদয়তে (এই উভয়ে উৎপাদন করবে)।

সরলার্থ: পিপ্পলাদ তাঁকে বললেন—প্রজাপতির সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছে হল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যা শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যদি অন্ন [চন্দ্র বা রয়ি] থাকেন এবং সেই অন্ন গ্রহণ করার একজন ভোক্তা [সূর্য] থাকেন, তবে তাঁরা সম্মিলিতভাবে বহু সন্তান সৃষ্টি করতে পারবেন।

ব্যাখ্যা: প্রজাপতি শব্দটির অর্থ 'জগতে সব কিছুর প্রভু বা পিতা'। 'পতি' শব্দের অর্থ 'প্রভু' বা 'পিতা' এবং 'প্রজা' শব্দের অর্থ 'যা সৃষ্টি হয়েছে', 'যা জন্মেছে' অথবা 'যার অস্তিত্ব আছে'। প্রজাপতি পরম সত্য নন। যে কেউ প্রজাপতি হতে পারেন। প্রজাপতি একটি পদ। যে-কোন ব্যক্তি নিজেকে উন্নত করে এই পদ লাভ করতে পারেন। ধরা যাক, কেউ এ-জীবনে কঠোর তপস্যা করে কিছু শক্তি অর্জন করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করতে পারেননি। পরজন্মে হয়তো তিনি প্রজাপতি হলেন। তখন তাঁর মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকবে। প্রজাপতিকে হিরণ্যগর্ভ এবং ব্রহ্মাও বলা হয়।

হিন্দুরা নতুন নতুন 'যুগ' বা 'কল্পে'র ধারণায় বিশ্বাসী। প্রতি যুগে কত কিছু আসে যায়। কিন্তু কল্পান্তে সব কিছু আবার তার উৎসে মিলিয়ে যায় অর্থাৎ বীজাকারে ফিরে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন বুড়ীর উপমা দিতেন। সেই বুড়ী সব জিনিসের বীজ কুড়িয়ে একটা ঝুড়িতে সংগ্রহ করে রাখেন। সময় হলে সেগুলি মাটিতে ছড়িয়ে দেন। সেই বীজ থেকে

অঙ্কুর হয়ে গাছ জন্মায়। গাছ বড় হয়, ফল দেয়, তারপর একদিন মরে যায়। কিন্তু গাছগুলি মরে যাবার আগেই বুড়ী আবার সেই গাছের বীজ কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলে রাখেন এবং ঠিকসময়ে আবার তা মাটিতে ছড়িয়ে দেন। সেই বীজ থেকে আবার গাছ হয়।

জীবনও এইভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে—জন্ম থেকে মৃত্যু, আবার মৃত্যু থেকে জন্ম; কারণ থেকে কার্য, আবার কার্য থেকে কারণ। প্রাণের বিনাশ বলে কিছু নেই। প্রাণ সবসময় আছে, যদিও তা কারণরূপে বা বীজাকারেও থাকতে পারে।

বেদান্তমতে, সবকিছু এমনকি প্রজাপতিও ব্রহ্ম থেকে এসেছেন। কিন্তু ব্রহ্ম কিছু সৃষ্টি করেন না। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ কোন গুণ দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করা যায় না; এবং তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁর কোন রূপ নেই। সৃষ্টির কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাও তাঁর নেই। তাঁর যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকত তাহলে তিনি নির্গুণ হতেন না। কাজেই প্রজাপতির স্থান ব্রহ্মের এক ধাপ নীচে।

প্রজাপতি কিভাবে সৃষ্টি করেন? হিন্দুদের ধারণা এই জগৎ কারোর সৃষ্টি নয়, প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। কুম্ভকার যেভাবে ঘট সৃষ্টি করে সেভাবে এ জগৎ সৃষ্টি হয়নি। প্রজাপতি থেকে এই জগৎ প্রকাশিত হয় আবার প্রজাপতিতেই ফিরে যায়। কিন্তু জগৎকে প্রকাশের জন্য প্রজাপতি কোন চেষ্টা করেন না। তিনি কেবল সঙ্কল্প করেন অর্থাৎ গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁর সৃষ্টির সঙ্কল্প থেকেই সূর্য ও চন্দ্র (প্রাণ এবং রয়ি), এই যুগল বস্তু প্রকাশিত হয়। চন্দ্র অর্থাৎ রয়ি হল অন্ন বা খাদ্য। আবার চন্দ্রই আর্দ্রতা। এই আর্দ্রতা গাছ এবং অন্যান্য প্রাণীদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। আবার যদি অন্ন থাকে, সেই অন্নের ভোক্তাও থাকবে। সূর্য (প্রাণ) হল সেই ভোক্তা। আবার সূর্যই প্রাণ।

বেদান্তমতে প্রাণের প্রকাশ ত্রিবিধ: সূর্য, অগ্নি যা আমরা জ্বালাই (ভূতাগ্নি) এবং আর এক প্রকার অগ্নি যা আমাদের শরীরের ভেতরে আছে (অর্থাৎ জঠরাগ্নি)। এই জঠরাগ্নি আমাদের খাদ্যবস্তু হজমে এবং দেহধারণে সাহায্য করে। রয়ি (অন্ন বা চন্দ্র) এবং প্রাণ (সূর্য) পরস্পরকে ধারণ করে আছে। কিন্তু প্রাণ এবং রয়ি দুটি পৃথক বস্তু নয়; তাদের পার্থক্য শুধু নাম আর রূপে।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ ॥৫

অন্বয়: আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ (আদিত্য-ই [সূর্য] প্রাণ); রয়িঃ এব চন্দ্রমা (খাদ্য হল চন্দ্র); যৎ মূর্তম্ অমূর্তং চ (যা কিছু স্থূল [অর্থাৎ কার্য] অথবা সূক্ষ্ম [অর্থাৎ কারণ]); এতৎ বৈ সর্বং

রয়িঃ (এই সবই খাদ্য [অর্থাৎ কার্য]); তস্মাৎ মূর্তিঃ রয়িঃ এব (অতএব স্থূলই খাদ্য [কার্য])।
সরলার্থ: আদিত্যই (সূর্যই) প্রাণ; চন্দ্রই রয়ি অর্থাৎ অন্ন। স্থূল বা সূক্ষ্ম উভয়ই খাদ্য। খাদ্য (কার্য) ও খাদ্যের ভোক্তার (কারণ) মধ্যে যা পার্থক্য, স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে সেই একই পার্থক্য।

ব্যাখ্যা: এখানে উপনিষদের বক্তব্য হল—জগতে দুটি বস্তু আছে। আসলে বস্তু এক, কিন্তু কোন ভাবে এই এক ভাগ হয়ে দুই হয়েছে—একজন ভোক্তা বা প্রাণ এবং অপরটি খাদ্য বা জড়পদার্থ। সূর্যই প্রাণ। প্রাণ থাকলে সেই প্রাণকে ধারণ করার জন্য অন্নও থাকবে। রয়ি বা চন্দ্রই হল সেই অন্ন। আপাতদৃষ্টিতে প্রাণ আর রয়ি দুই হলেও বস্তুত তারা এক, আলাদা নয়।

কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্পর্ক জগতে সব যুগলবস্তুর মধ্যেই সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ সূক্ষ্ম এবং কার্য স্থূল। বেদান্তমতে, কারণ অধিকাংশ সময়েই নিরাকার অর্থাৎ 'অমূর্ত'। তাকে দেখা যায় না। কিন্তু কার্যকে দেখা যায় এবং তার রূপ আছে অর্থাৎ 'মূর্ত'।

অবশ্য কার্য ও কারণ এবং অন্ন ও অন্নভোক্তা পরস্পর সম্পর্ক বিনিময় করতে পারে। এ যে সম্ভব হয় তার কারণ তারা এক এবং অভিন্ন।

অথাদিত্য উদয়ন্যৎপ্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্ধ্বং যদন্তরা দিশো যৎ সর্বং প্রকাশয়তি তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে॥৬

অন্বয়: অথ (যেমন); আদিত্যঃ (সূর্য); উদয়ন্ (উদিত হয়ে); যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি (যেমন পূর্ব দিকে প্রবেশ করেন); তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে (তিনি নিজ কিরণের দ্বারা পূর্ব দিকে অবস্থিত সমস্ত প্রাণীকে প্রাণ দান করেন); যৎ দক্ষিণাম্ (যেমন দক্ষিণে); যৎ প্রতীচীম্ (পশ্চিমে); যৎ উদীচীম্ (উত্তরে [ভ্রমণ করেন]); যৎ অধঃ (নীচে); যৎ ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্বে); যৎ অন্তরা দিশঃ (দিকসমূহের মধ্যভাগে); যৎ সর্বং প্রকাশয়তি (অন্য সকলকে আলো দেন); তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে (নিজের আলোয় সকল প্রাণীকে আলিঙ্গন করেন)।

সরলার্থ: (ভোরবেলা) সূর্য উঠে পূর্বদিগন্তে প্রবেশ করে। তখন পূর্বদিকের সকল প্রকার প্রাণীকে সে আপন কিরণে আলিঙ্গন করে। একইভাবে দক্ষিণ, উত্তর, উপর, নীচ এবং

অন্তর্বর্তী দিকসমূহ—সর্বত্র সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সকল প্রাণীকে সূর্যই প্রকাশ করে, সঞ্জীবিত করে।

ব্যাখ্যা: সূর্যকে প্রাণের তথা সমস্ত কিছুর উৎস বলা হয়। আর প্রাণকে ধারণ করে থাকে চন্দ্র। রাত্রে আমরা সবাই ঘুমিয়ে থাকি, কোন কাজ করি না—যেন সবাই অচৈতন্য হয়ে থাকি। কিন্তু যে মুহূর্তে সূর্য উঠে দিনের সূচনা করে, আবার সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়। সবাই জেগে ওঠে, চলেফিরে বেড়ায়, কাজকর্ম শুরু করে। সূর্যই যেন তার কিরণ ছড়িয়ে সবকিছুকে চেতন করে। সূর্য সকলকে, সব প্রাণীকে আলো দেয়—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উপর, নীচ সর্বত্র। সূর্যালোক সর্বব্যাপী। যা কিছু আমরা দেখি সবার মধ্য দিয়েই সূর্য নিজেকে প্রকাশ করে।

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্॥৭

অন্বয়: সঃ এষঃ বৈশ্বানরঃ বিশ্বরূপঃ (তিনি সকল প্রাণীর অন্তরে নিহিত [সেই কারণে তাঁকে বলা হয় বৈশ্বানর], এবং এ জগতের সব রূপ তাঁরই রূপ [তাই তাঁকে বলা হয় বিশ্বরূপ]); প্রাণঃ অগ্নিঃ (তিনি প্রাণরূপী অগ্নি); উদয়তে (তিনি [দিগন্তে আদিত্য তথা সূর্যরূপে] উদিত হন), তৎ এতৎ ঋচা অভ্যুক্তম্ (একথাই ঋক্-মন্ত্রে বলা হয়েছে)।

সরলার্থ: সূর্য উদয় হচ্ছেন—সেই সূর্য যিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা; সব রূপই তাঁর রূপ। সূর্য একই সঙ্গে প্রাণ এবং অগ্নি দুই-ই অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি সব কিছু গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ করেন। একটি ঋক্-মন্ত্রে একথাই বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: এখানে সূর্যকে 'বৈশ্বানর', 'বিশ্বরূপ', 'প্রাণ', এবং 'অগ্নি' বলা হয়েছে। 'প্রাণঃ বৈশ্বানরঃ'—সূর্যকে (প্রাণকে) সকল জীবের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। 'নর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ মানুষ। কিন্তু এখানে শব্দটিকে প্রাণী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণীরূপে সূর্যকে বৈশ্বানর বলা হয়। সূর্যই যেন সব প্রাণী হয়েছেন। সূর্যকে আবার বিশ্বরূপও বলা হয় অর্থাৎ জগতে সব রূপই তাঁর রূপ।

উপনিষদ আরো বলেছেন—প্রাণই অগ্নি। সূর্যের তেজ ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। খাদ্য পরিপাক করে দেহকে সজীব রাখার জন্য আমাদের মধ্যেও এই অগ্নি থাকা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হলে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হয় তার অগ্নিমান্দ্য হয়েছে অর্থাৎ আগুনের তেজ দুর্বল হয়েছে। আমরা এও জানি মানুষের মৃত্যু হলে তার দেহ শীতল হয়ে যায়। অতএব দেহের উত্তাপ হল জীবনের লক্ষণ। আবার দেহরক্ষার জন্য আমরা যে খাদ্যদ্রব্য রান্না করি তার জন্যও প্রয়োজন অগ্নি। উপনিষদ বলেন—প্রাণই সূর্য,

প্রাণই অগ্নি অর্থাৎ দেহের বাইরের ও ভিতরের আগুন দুই-ই প্রাণ। যখন প্রাণকে সূর্যরূপে দেখি তখন তা আধিদৈবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক। যখন প্রাণ অগ্নিরূপে আছেন তখন আধিভৌতিক অর্থাৎ পদার্থগত। আবার যখন প্রাণই জীবন তখন আধ্যাত্মিক অর্থাৎ জীব-সম্পর্কিত। প্রাণই আয়ু আবার প্রাণই অগ্নি কারণ প্রাণ সবকিছুকে প্রকাশ করেন আবার গ্রহণও করেন।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ।।৮

অন্বয়: বিশ্বরূপম্ (সমস্ত রূপ); হরিণম্ (উজ্জ্বল); জাতবেদসম্ (সর্বজ্ঞ); পরায়ণম্ (সকলের আশ্রয়); একং জ্যোতিঃ (একমাত্র আলো); তপন্তম্ (যিনি উত্তাপ দেন); সহস্ররশ্মিঃ (সহস্রকিরণে); শতধা বর্তমানঃ (শতরূপে বিদ্যমান); প্রজানাং প্রাণঃ (প্রাণিকুলের প্রাণ); এষঃ সূর্যঃ উদয়তি (এই সূর্য উঠছেন)।

সরলার্থ: সহস্র কিরণ নিয়ে সূর্য উদিত হচ্ছেন। নানারূপে তাঁর প্রকাশ। তিনিই প্রাণিকুলের প্রাণস্বরূপ। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সূর্য সর্বত্র ও সকল রূপের মধ্যে রয়েছেন; তিনি সদা উজ্জ্বল, সর্বজ্ঞ, এবং সকলের আশ্রয়। তিনিই আলোর একমাত্র উৎস ও সকলকে তাপ দেন।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ এখানে ঋগ্-বেদ থেকে সূর্যের একটি প্রশস্তি মন্ত্র উল্লেখ করেছেন। 'বিশ্বরূপম্'-সূর্য সব রূপের মধ্যে রয়েছেন। আমরা যত রূপ দেখি সব রূপই তাঁর রূপ। 'হরিণম্' শব্দের অর্থ এখানে 'উজ্জ্বল' 'জ্যোতির্ময়' 'কিরণশালী'।

'জাতবেদসম্' অর্থ 'সর্বজ্ঞ', 'যিনি সবকিছু জানেন'। জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে অনেক সময় আলো অথবা আগুনের উল্লেখ করা হয়। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি জ্ঞানও অজ্ঞানতা দূর করে। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে নিয়ে চল। 'তমঃ' অর্থ অন্ধকার, অজ্ঞানতার অন্ধকার। অজ্ঞান হলে আমাদের পক্ষে কিছুই ধারণা করা সম্ভব হয় না; আমরা কিছুই জানি না। কাজেই আমাদের লক্ষ্য হল জ্ঞান।

গায়ত্রী মন্ত্রকে কোথাও কোথাও বেদের সার বলা হয়েছে, কারণ এই মন্ত্রে জ্ঞানের প্রতীক সূর্যের কাছে প্রার্থনা করা হয়। 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য

ধীমহি’—যেই দেবতার প্রতীক সূর্য, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা আমরা তাঁর উপাসনা করি। ‘ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ’—অনুগ্রহ করে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে চালিত করুন। আমরা যাতে বিপথে না চলি, আমাদের লক্ষ্য ভুলে না যাই—সেই জ্ঞানই আমরা প্রার্থনা করি। আমরা প্রত্যেকে জ্ঞান লাভ করতে চাই। জ্ঞান ছাড়া আমরা অন্ধ, অসহায়, যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। জ্ঞানই শক্তি, আর আত্মজ্ঞান হল মহত্তম শক্তি।

‘পরায়ণম্’—সূর্যকে সবকিছুর অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বলা হয়ে থাকে। তিনি সবকিছুকে ধারণ করে আছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে প্রায়ই ‘একম্’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এখানে ‘একম্’ শব্দের অর্থ অনন্য। সূর্য আমাদের কাছে অনন্য, অতুলনীয়।

‘তপন্তম্’—যিনি তাপ দেন। ‘তপঃ’ শব্দটি কৃচ্ছ্রসাধন বা কঠোর শ্রম বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। সেই পরম সত্যকে জানবার জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্রসাধন। আর এই তপস্যার জন্য আমরা বল ও শক্তি দুই-ই লাভ করি সূর্যের থেকে।

‘সহস্ররশ্মিঃ’—অর্থাৎ সহস্রকিরণ। সূর্যকিরণ কখনও নিঃশেষিত হয় না; সূর্য সবসময় আলো দেন। জ্ঞানও এই সূর্যালোকের মতোই অনন্ত।

‘শতধা বর্তমানঃ’—নানাভাবে নানারূপে সূর্য সবসময় রয়েছেন, সবার মধ্যে রয়েছেন।

‘প্রজানাং প্রাণঃ’—সূর্য সকল জীবের প্রাণস্বরূপ। অর্থাৎ প্রাণীরা সূর্য থেকেই জীবন ও পুষ্টি লাভ করে।

যখন আমরা নিজেকে সূর্যরূপে জানতে পারি, যখন বুঝতে পারি প্রকৃত আলোর উৎস আমার নিজের মধ্যেই রয়েছে তখনই আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি।

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্ঠাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসমেব পোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্তন্তে তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥৯

অন্বয়: সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ (প্রাণিকুলের প্রভুই সংবৎসর); তস্য দক্ষিণং চ উত্তরং চ অয়নে (তিনি দক্ষিণ এবং উত্তর, এই দুই পথে যাওয়া আসা করেন); তৎ (সেই কারণে); যে হ বৈ (যাঁরা); ইষ্টাপূর্তে ইতি (বিধিমতে বৈদিক যাগযজ্ঞ [ইষ্ট] এবং লোকহিতকর কর্ম [পূর্ত] যেমন কূপ খনন ইত্যাদি); কৃতং তৎ (‘এসব আমার করা হয়েছে’); উপাসতে (তিনি সবসময় এই প্রকার কর্মরত [এবং তিনি সর্বদা সচেতন যে তিনি এইসব কর্ম করছেন]); তে চান্দ্রমসম্ এব লোকম্ অভিজয়ন্তে (এরকম ব্যক্তি চন্দ্রলোক লাভ করেন); তে পুনঃ

আবর্তন্তে এব (তাঁরা এই জগতে [মর্তে] আবার ফিরে আসেন); তস্মাৎ (সেই কারণে); এতে প্রজাকামাঃ ঋষয়ঃ (এই ঋষিগণ যাঁরা কোন ফললাভের আশায় [যেমন সন্তান কামনায়] বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করেন); দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে (দক্ষিণদিকে গমন করেন); যঃ পিতৃযানঃ (পিতৃলোকের পথ); এষঃ হ বৈ রয়িঃ (এই হল চন্দ্র [খাদ্য])।

সরলার্থ: প্রজাপতি স্বয়ং সংবৎসর; তিনিই সৃষ্টিকর্তা। দুই পথে তাঁর আসা-যাওয়া—দক্ষিণ এবং উত্তর। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান এবং লোকহিতকর কর্মে সবসময় ব্যস্ত। তাঁরা এ ধরনের কর্ম করতে গর্ব বোধ করেন। মৃত্যুর পর এই শ্রেণীর মানুষ চন্দ্রলোকে যান। কিন্তু তা কিছুদিনের জন্য। আবার তাঁদের এই মর্তজগতে ফিরে আসতে হয়। সেইজন্যই সন্তান কামনায় যাঁরা যাগযজ্ঞ করেন তাঁরা দক্ষিণপথে যান। এই পথ পিতৃলোকের পথ, এই পথই রয়ি।

ব্যাখ্যা: সাধারণভাবে মানুষকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মানুষের কাছে জীবনের অর্থ গভীর। তাঁরা জ্ঞানলাভ করতে চান। জানতে চান সত্য কি, মানুষের স্বরূপ কি, এবং কোথা থেকে তাঁরা এসেছেন। এই শ্রেণীর মানুষ আত্মসংযম অভ্যাস করেন, ঈশ্বরচিন্তা করেন এবং নানা গুণাবলী আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। আবার অপর শ্রেণীর লোকদের ধারণা মানবজীবন শুধুই ভোগের জন্য। তাঁরা কেবলমাত্র ভোগেই মত্ত থাকতে চান। কিন্তু একসময় তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদেরও মৃত্যু অনিবার্য। যদি ভাল কাজ করে সাধুজীবন যাপন করতে পারেন, তাহলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হবে এবং সেখানেও সুখভোগ করতে পারবেন।

এই দুই শ্রেণীর মানুষ একই ধরনের কাজ করতে পারেন, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা একেবারে গোড়ায়। যিনি জ্ঞানলাভ করতে চান, জাগতিক ভোগসুখকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কিন্তু যাঁরা বিষয়সুখে আসক্ত তাঁদের জ্ঞানলাভের ইচ্ছাই হয় না। বিষয়ী মানুষ সৎকর্ম করলেও তা করেন ইহকাল বা পরকালে কিছু পুরস্কার লাভের আশায় (সকাম কর্ম)।

যিনি প্রকৃতই আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান, কোন অনিত্য বস্তু তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে না। নিত্যকে লাভ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজের জন্য কোনরকম ফলের আশা না করে তিনি সব কর্ম করেন। যা কিছু তিনি করেন তা ঈশ্বরার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে অথবা লোকহিতার্থ অর্থাৎ লোককল্যাণের জন্য। তাঁর কাছে কর্মই উপাসনা। সমাজ তাঁকে স্বীকৃতি দিল কিনা, সংবাদপত্রে তাঁর নাম বেরোল কিনা, ঈশ্বর তাঁকে পুরস্কার দেবেন কিনা এসব নিয়ে তিনি আদৌ চিন্তিত নন। তিনি ভাল কাজ করেন কারণ তিনি ভাল কাজ করতে ভালবাসেন।

অতএব উপনিষদ বলেন—যেমন এই দুই শ্রেণীর মানুষ আছেন তেমনি পথও দুটি। একটি দক্ষিণায়ন, অপরটি উত্তরায়ণ। সূর্য যখন দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে তখন দক্ষিণায়ন। একে চন্দ্রের পথও বলা হয়। আর সূর্য যখন উত্তর গোলার্ধে তখন তাকে বলে উত্তরায়ণ। এই পথ সূর্যের পথ। এখন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, এই যে দুভাগ করা হয়েছে এসবই রূপক অর্থে। উপনিষদে বলা হয়েছে—সময়ের এই যে বিভাগ তাও প্রজাপতি।

যাঁরা জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক তাঁদের সূর্যের পথ অর্থাৎ জ্ঞানের পথই গ্রহণ করতে হবে। আলো জ্ঞানের প্রতীক। কাজেই প্রথম শ্রেণীর মানুষ যাঁরা জ্ঞানের পথে চলেন তাঁরা মৃত্যুর পর সেই জ্যোতির্লোকে যান বলে বিশ্বাস। কিন্তু যাঁরা ভোগবিলাসী, তাঁরা উপনিষদের মতে, চন্দ্রের পথ অনুসরণ করেন। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। তাই তাকে অন্ধকারের প্রতীক বলে ধরা হয়।

অধিকাংশ মানুষই চন্দ্রের পথ বেছে নেন কারণ তাঁরা ভোগে আসক্ত। উপনিষদ বলেন—এঁরা দুরকমের কাজ করেন, ইষ্ট এবং পূর্ত। ইষ্ট অর্থ দৈনন্দিন অবশ্যকর্তব্য যেমন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ যা প্রাচীনকালে অনুষ্ঠিত হত এবং অতিথি সৎকার ও পশুপাখীর সেবা। সৎ হওয়ার চেষ্টাও এ জাতীয় কর্মের মধ্যেই পড়ে। আর 'পূর্ত' অর্থ লোককল্যাণের জন্য বিশেষ সেবাকর্মের অনুষ্ঠান যেমন কুয়ো বা পুকুর খনন, মন্দির নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ বা দরিদ্রকে বিনামূল্যে অন্নবিতরণের জন্য রন্ধনশালার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

এসব কর্ম অতি উত্তম সন্দেহ নেই। যাঁরা তা করেন তাঁদের উপনিষদ ঋষি আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে এ জাতীয় কর্ম করা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে মানুষের মধ্যে একটা গর্ববোধ আসে, 'আমি এতসব কাজ করেছি'। অর্থাৎ মানুষ নামযশের আকাঙ্ক্ষা করে। এছাড়া সে নিজেকে কোন বিশেষ পুরস্কার যেমন সন্তান, বা ধনসম্পদ বা পরকালে স্বর্গলাভ ইত্যাদি পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করে।

তখন কি হয়? এই ব্যক্তি মৃত্যুর পরে চন্দ্রের পথ অনুসরণ করে। আগেই বলা হয়েছে চন্দ্রই অন্ন; চন্দ্র প্রাণকে ধারণ করে রাখে। চন্দ্র ভোগের প্রতীক। কাজেই মানুষ যখন চন্দ্রের পথ বা 'দক্ষিণ'পথ অনুসরণ করে তখন সে পিতৃলোক বা চন্দ্রলোকে যায়। এই পথ অন্ধকারের পথ, অবিদ্যার পথ। সেখানে মানুষের কিছুদিন সুখভোগ হয় ঠিকই, কিন্তু তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। পুণ্যকর্মের পুরস্কারও ক্ষণস্থায়ী। ভাল কাজের ফল যখন নিঃশেষ হয়ে আসে তখন এই পৃথিবীতে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়।

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া
বিদ্যয়াঽঽত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে।

এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ
পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ॥১০

অন্বয়: অথ (কিন্তু [অনেকে আছেন যাঁরা]); তপসা ব্রহ্মচর্যেণ (কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারা); শ্রদ্ধয়া ([গুরু এবং শাস্ত্রের প্রতি] বিশ্বাসের দ্বারা); বিদ্যয়া (শাস্ত্র অধ্যয়ন করে); আত্মানম্ অন্বিষ্য (আত্মাকে জানতে চেয়ে); উত্তরেণ [মার্গেন] (উত্তরপথ অনুসরণ করে); আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে (সম্পূর্ণভাবে আদিত্যের পদ লাভ করে); এতৎ বৈ প্রাণানাম্ আয়তনম্ (ইনি সকল প্রাণের আশ্রয়); এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ (ইনি, অমৃত, অভয়); এতৎ পরায়ণম্ (সর্বোত্তম অবস্থা লাভ করে); এতস্মাৎ ন পুনঃ আবর্তন্তে (মর্তে আর ফিরে আসতে হয় না); এষঃ নিরোধঃ (এই হল [যাত্রার] শেষ); তৎ এষঃ শ্লোকঃ ([সেই বিষয়ে] এই শ্লোক আছে)।

সরলার্থ: কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মসংযম অভ্যাস করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে তাঁদের অগাধ বিশ্বাস। এইসকল গুণের অধিকারী হয়ে তাঁরা আত্মার অনুসন্ধান করেন। এই আত্মাই হলেন সূর্য। মৃত্যুর পরে এইসব মানুষ উত্তরমার্গ অনুসরণ করেন এবং কালে আদিত্যপদ লাভ করেন। আদিত্য সকল প্রাণীর আশ্রয়। আদিত্যপদ প্রাপ্ত হলে মানুষ অমর হয়, অভয়পদ লাভ করে। এই হল মানুষের সর্বোত্তম অবস্থা। একবার এই অবস্থা লাভ হলে কেউ আর এই মর্তজগতে ফিরে আসে না। এখানেই যাত্রা শেষ। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: 'আত্মানম্ অন্বিষ্য'—'আত্মাকে জানতে চেয়ে'। আমরা প্রত্যেকেই বলি 'আমি' 'আমি'। কিন্তু এই 'আমি'টি কে? এর দ্বারা কাকে বোঝান হয়? এই জগতের সব কিছু হয়তো আমরা জানি, কিন্তু নিজেকে জানি না। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা শুধু আত্মাকেই জানতে চান। তাঁরা সত্যের অনুসন্ধান করে চলেছেন। অবিনাশী বা চিরন্তন কিছু আছে কি না তা-ই তাদের জিজ্ঞাসা। ভোগের ইচ্ছা তাঁদের নেই, শুধু জ্ঞানলাভই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হল, কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব? উপনিষদ বলেন, 'তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা'। বুদ্ধের জীবন কৃচ্ছ্রসাধনা এবং দৃঢ়সঙ্কল্পের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। বহু বছর গভীর ধ্যান-চিন্তা অভ্যাস করার পর তিনি একটি গাছতলায় বসে শপথ নিলেন, 'আমার দেহ শুকিয়ে যাক, চামড়া খসে পড়ুক, তথাপি যতদিন সেই দুঃসাধ্য বোধিলাভ না হয় এই আসন ত্যাগ করব না।'

উপনিষদ বলেন, যিনি আত্মাকে জানতে চান তাঁকে ব্রহ্মচর্য, মিতাচার এবং আত্মসংযম অবশ্য পালন করতে হবে। এর সঙ্গে অপরিহার্য হল গুরুবাক্য ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও

বিশ্বাস। সাধক যদি এগুলিকে অস্বীকার করেন তাহলে তাঁর পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

সূর্য যেহেতু জ্ঞানের প্রতীক, যাঁরা জ্ঞানের পূজারী তাঁরা মৃত্যুর পরে সূর্যের পথ অনুসরণ করেন। 'এতৎ বৈ প্রাণানাম্ আয়তনম্'—সূর্যই প্রাণীদের আশ্রয়। তিনি অমৃত, অবিনাশী এবং নিত্য। চাঁদ কিন্তু সবসময় বদলাচ্ছে। একদিন পূর্ণচন্দ্র, তারপর দিনে দিনে ছোট হতে থাকে। কিন্তু সূর্যের কোন ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, সবসময় একরকম।

'অভয়ম্' অর্থাৎ 'ভয়কে অতিক্রম করা'। আমরা যদি মৃত্যুর অধীন হই তবে মৃত্যুভয় সবসময় আমাদের তাড়া করে বেড়াবে। কিন্তু যদি জানি, 'আমি দেহ নই, আত্মা যা শাশ্বত এবং অমর'—তখন বুঝতে পারি আমার মৃত্যু হতে পারে না। তখনই আমরা সম্পূর্ণ নির্ভয় হই।

তখন 'পরায়ণম্' অর্থাৎ পরাগতি বা ব্রহ্মলোক লাভ হয়। 'এতস্মাৎ ন পুনঃ আবর্তন্তে'—সেখান থেকে আর কখনও ফিরে আসতে হয় না। একেই বলে মোক্ষলাভ।

সুতরাং উপনিষদ বলেন—আমরা কি চাই এবং আমাদের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে নিজেদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমরা কি করছি এবং কেন করছি সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই হবে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ 'ঈশ্বরের পূজা করছি' এই বুদ্ধিতে সব কাজ করতে হবে। এভাবেই আমরা আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারি। উপনিষদ আমাদের ধীরে ধীরে সেই লক্ষ্যের দিকে চালনা করছেন।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি॥১১

অন্বয়: [যাঁরা ত্রিকালকে জানেন তাঁরা আদিত্যের বর্ণনায় বলেছেন যে তাঁর] পঞ্চপাদম্ (পাঁচটি পা [ঋতু]); দ্বাদশাকৃতিম্ (বারটি আকৃতি [বার মাস]); দিবঃ পরে অর্ধে (স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী স্থানের ঊর্ধ্বে [অবস্থিত]); পুরীষিণম্ (জল বর্ষণ করে); পিতরম্ আহুঃ ([তাঁরা] তাঁকে পিতা বলেন [কারণ তিনি জগতের স্রষ্টা]); অথ উ (অপরপক্ষে); অন্যে ইমে পরে (অন্যরা [পণ্ডিতেরা বলেন]); বিচক্ষণম্ (সর্বজ্ঞ [আদিত্য যিনি রথ চালনা করেন]);

সপ্তচক্রে (সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথ); ষড়রে ([প্রতি চক্রে] ছয়টি শলাকা সহ); অর্পিতম্ ইতি আহুঃ (এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত বলা হয়)।

সরলার্থ: পণ্ডিতেরা বলেন, আদিত্যের পাঁচটি ঋতু এবং বারটি মাস আছে। তিনি সকলের পিতা, স্বর্গে থাকেন এবং তিনিই বৃষ্টির কারণ। আরেক দল পণ্ডিতের মতে, সেই আদিত্য সর্বজ্ঞ এবং তিনি একটি সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথ চালনা করেন। সেই চক্রের প্রতিটি আবার ছয়টি শলাকার সঙ্গে সংযুক্ত। এই আদিত্যেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা: সূর্যের উদ্দেশে উপনিষদ ঋগ্বেদ থেকে আর একটি প্রশস্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। এই মন্ত্রে রূপকের সাহায্যে আদিত্যকে বর্ণনা করা হয়েছে। আদিত্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, জগৎকে ধারণ করে আছেন। 'পঞ্চপাদম্'—এর আক্ষরিক অর্থ পাঁচটি পা। এখানে পাঁচ ঋতু বোঝানো হয়েছে। ভারতবর্ষে সাধারণত ছয়টি ঋতুর কথা বলা হয়। কিন্তু এই শ্লোকে হেমন্ত, শিশির অর্থাৎ শরতের শেষভাগ যা স্বল্পকাল স্থায়ী এবং শীতকে একত্র করে একটি ঋতু ধরা হয়েছে। 'দ্বাদশাকৃতিম্' অর্থ বছরের বারটি মাস।

'দিবঃ' অর্থ স্বর্গ এবং মর্তের মধ্যবর্তী আকাশ, তারও উপরে 'দিবঃ পরে অর্ধে', অর্থাৎ যেখানে সূর্য জলকে আকর্ষণ করে নেয়। জল একবার উপরে স্বর্গলোক পর্যন্ত যায়, আবার বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। মনে হয় যেন সূর্য থেকেই বর্ষণ হচ্ছে।

'সপ্তচক্র' অর্থ সাতটি চাকা। কখনও কখনও সূর্যকে দেবতারূপে কল্পনা করা হয়; সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথে তিনি বসে আছেন। সাতটি চাকার তাৎপর্য হল আলোর সাতটি রঙ। 'ষড়র' কথাটির অর্থ চাকার ছয়টি শলাকা যা ছয়টি ঋতুর প্রতীক। এখানে ছয়টি ঋতুকে স্বীকার করা হয়েছে। 'অর্পিতম্'—এই সবকিছু সূর্যে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন হল, আমরা যে সময়ের কথা বলি সেই 'সময়' বলতে আমরা কি বুঝি? একটি বছর, একটি মাস, একটি ঋতু, দিন ও রাত্রি সকলেরই সম্বন্ধ সূর্যের সঙ্গে। আমাদের সময়বোধ সূর্য থেকেই আসে। কিন্তু সময়ের এইসব বিভাগের উৎস একই—তিনি প্রজাপতি।

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেত
ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥১২

অন্বয়: মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ (মাসও প্রজাপতি); তস্য কৃষ্ণপক্ষঃ এব রয়িঃ (এর মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ অন্ন); শুক্লঃ প্রাণঃ (শুক্লপক্ষ প্রাণ); তস্মাৎ (এই কারণে); এতে ঋষয়ঃ (ঋষিগণ);

শুক্লে ইষ্টং কুর্বন্তি (শুক্লপক্ষে তাঁদের ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করেন); ইতরে (অন্যরা); ইতরস্মিন্ (অন্যপক্ষে [অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে])।

সরলার্থ: বৎসরের মতো মাসও প্রজাপতির প্রতীক। কৃষ্ণপক্ষ তাঁর অন্ন (চন্দ্র), শুক্লপক্ষ তাঁর প্রাণ (আদিত্য যিনি সেই অন্ন গ্রহণ করেন)। এই কারণেই ঋষিরা, যাঁরা প্রাণ অনুসন্ধান করছেন তাঁরা শুক্লপক্ষে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন। অন্যরা সেইসব অনুষ্ঠান কৃষ্ণপক্ষেই করেন।

ব্যাখ্যা: সমগ্র পৃথিবী প্রজাপতিকে আশ্রয় করে আছে। এর আগে প্রজাপতিকে বৎসর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রজাপতিকে একটি মাস হিসেবে ধরা হয় তবু প্রজাপতি প্রজাপতিই থাকেন। প্রজাপতির দুটি ভাগ—প্রাণ (জীবন) এবং রয়ি (অন্ন)। তেমনি মাসেরও দুটি ভাগ—শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ।

যাঁরা যাগযজ্ঞ করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান। তাঁরা এইসব আচার-অনুষ্ঠান শুক্লপক্ষে করা পছন্দ করেন। অন্যরা যাঁরা স্বর্গকামনা করেন অথবা যাঁদের অন্য কোন বাসনা আছে তাঁরা এইসব অনুষ্ঠান করার জন্য কৃষ্ণপক্ষকেই বেছে নেন।

বস্তুত যার যেমন ভাব, সে সেইভাবে যজ্ঞকর্মের উপযুক্ত সময় বেছে নেয়। ইন্দ্রিয়সুখই যাঁর উদ্দেশ্য তাঁর কাছে শুক্লপক্ষই কৃষ্ণপক্ষ হয়ে ওঠে। আবার আত্মজ্ঞান লক্ষ্য হলে সেই ব্যক্তির জন্য কৃষ্ণপক্ষও শুক্লপক্ষে পরিণত হয়।

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ
প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্যমেব
তদ্যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥১৩

অন্বয়: অহোরাত্রঃ বৈ প্রজাপতিঃ (দিন এবং রাত্রি একত্রে প্রজাপতি); তস্য অহঃ এব প্রাণঃ (দিন তাঁর প্রাণ); রাত্রিঃ এব রয়িঃ (রাত্রি তাঁর খাদ্য); যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে (যাঁরা দিনের বেলায় [অর্থাৎ কাজের সময়] ইন্দ্রিয়সুখকে প্রশ্রয় দেন); এতে প্রাণং বৈ প্রস্কন্দন্তি (জীবনকে ধ্বংস করেন); যৎ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে (যাঁরা তা রাত্রিভাগে [বিশ্রামের সময়] সম্পন্ন করেন); তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব (তা ব্রহ্মচর্য তুল্য [তাঁরা আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন])।

সরলার্থ: দিন এবং রাত্রি প্রজাপতির দুটি অংশ। দিন তাঁর প্রাণ, রাত্রি খাদ্য। যাঁরা দিনের বেলায় (কঠোর পরিশ্রমের সময়) ইন্দ্রিয়সুখকে প্রশ্রয় দেন, তাঁরা নিজের জীবনকে ধ্বংস করেন। কিন্তু যাঁরা রাত্রিবেলায় তা সম্পন্ন করেন তাঁরা আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ব্যাখ্যা: 'অহোরাত্র', দিন এবং রাত্রি—এ সবই প্রজাপতির ব্যক্ত রূপ। দিন যেন প্রাণ, এবং রাত্রি রয়ি বা অন্ন। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, দিনের বেলায় পৃথিবী কর্মচঞ্চল। এই কর্মচাঞ্চল্য জীবনের লক্ষণ। কাজেই তখন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য সময় অপচয় করা কোনভাবেই উচিত নয়। তার জন্য রাত্রিবেলাই নির্দিষ্ট রাখা উচিত। একেই বলে আত্মসংযম।

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥ ১৪

অন্বয়: অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ (অন্নই প্রজাপতি), ততঃ হ বৈ তৎ রেতঃ (সেই অন্ন থেকে আসে প্রাণের বীজ); তস্মাৎ (তার [বীজ] থেকে); ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে (এইসব প্রাণীদের জন্ম)।

সরলার্থ: অন্নই প্রজাপতি। এই অন্ন থেকে আসে প্রাণের বীজ। এই বীজ থেকে সমস্ত প্রাণীর জন্ম। কবন্ধী পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করেছিলেন—এই হল পিপ্পলাদের উত্তর।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম সব কিছুর কারণ। ব্রহ্মই নানারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সবকিছুর উৎস সেইজন্য তাঁকে বলা হয় প্রজাপতি অর্থাৎ যা কিছুর জন্ম হয়েছে তিনি তার প্রভু।

সূর্য (প্রাণ) এবং চন্দ্র (খাদ্য) প্রজাপতির প্রথম ব্যক্ত রূপ। তারপর সংবৎসর, মাস, দিন-রাত্রি সবশেষে প্রাণবীজে তাঁর প্রকাশ। প্রাণের সেই বীজ থেকেই সমস্ত অস্তিত্বের জন্ম। এ ভাবেই সেই এক বহু হয়েছেন।

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে।
তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং
প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫

অন্বয়: তৎ (সেহেতু); যে হ বৈ (যাঁরা); তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি (প্রজাপতির নিয়ম পালন করেন); তে মিথুনম্ উৎপাদয়ন্তে (সন্তানের জন্ম দেন); তেষাম্ এব এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (তাঁরাই শুধু ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন); যেষাং তপঃ ব্রহ্মচর্যম্ (যাঁরা কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং সংযত জীবন যাপন করেন); যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ (যাঁরা সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ: এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাঁদের বিবাহিত জীবন প্রজাপতির জীবনাদর্শে গড়া। তাঁরা প্রজাপতির মতোই নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সন্তানের জন্ম দেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ

আবার কঠোর ও সংযত জীবন যাপন করে থাকেন। তাঁরা সত্যেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর পর এরকম ব্যক্তি চন্দ্রলোক অর্থাৎ পিতৃলোকে যান। তাঁদের পক্ষে এটিই ব্রহ্মলোক।

ব্যাখ্যা: তপস্যা ও আত্মসংযম (ব্রহ্মচর্য) অভ্যাস করে এবং কায়মনোবাক্যে (অর্থাৎ কর্মে, চিন্তায় ও কথায়) সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্) থেকে গৃহস্থ ব্রহ্মলোক (বস্তুত চন্দ্রলোক) লাভ করতে পারেন। গৃহস্থই হোন বা সন্ন্যাসী, সকলকেই সত্যপালন করতে হবে। এখানে 'ব্রহ্মচর্য' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল আত্মসংযম। এমনকি বিবাহিত জীবনেও আত্মসংযমের প্রচুর অবকাশ আছে। প্রজাপতির দৃষ্টান্তই গৃহস্থদের অনুসরণ করতে হবে।

আত্মাই ব্রহ্ম এবং সেই আত্মাকে উপলব্ধিই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য। কেউ গৃহস্থ হতে পারেন, তাঁর পরিবার-পরিজনও থাকতে পারে কিন্তু তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই; শুধু সকলকে তাঁদের লক্ষ্য ঠিক রেখে চলতে হবে।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি॥১৬

অন্বয়: যেষু (যাঁদের মধ্যে); জিহ্মম্ (কুটিলতা); অনৃতম্ (মিথ্যাচার, সততার অভাব); [চ] ন (অনুপস্থিত); মায়া চ ন (কপটতাও নেই); তেষাম্ (শুধু তাঁদেরই); অসৌ বিরজঃ ব্রহ্মলোকঃ (এই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক)।

সরলার্থ: যাঁদের মধ্যে মিথ্যাচার, কুটিলতা বা কপটতার লেশমাত্র নেই তাঁরাই শুধু ব্রহ্মলোকে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

ব্যাখ্যা: আমরা বলতে পারি আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করতে চাই। কিন্তু তখনই প্রশ্ন জাগে, আমরা কি রকম জীবন যাপন করছি?

উপনিষদ বলেন, সেই পরমকে লাভ করতে হলে একান্ত প্রয়োজন পবিত্রতা। রজঃ শব্দের অর্থ মলিনতা, কালিমা। 'বিরজ' অর্থ শুদ্ধ বা নির্মল। তারপর প্রয়োজন ঋজুতা অর্থাৎ সরলতার। আমার মধ্যে কোন কুটিলতা থাকবে না (ন জিহ্মম্), থাকবে না কোন মিথ্যাচারও। 'ঋতম্' অর্থ 'সত্য'। 'অনৃতম্' অর্থ 'মিথ্যা'। হিন্দুশাস্ত্রমতে সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই।

আমরা হয়তো লক্ষ্য করেছি যে, এখানে বিশেষ কোন আচার-অনুষ্ঠান পালন বা কোন বিশেষ দেবতার উপাসনার কথা বলা হয়নি। কোন প্রার্থনা বা মন্ত্রোচ্চারণের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র পবিত্র, সৎ এবং সরল হতে বলা হয়েছে। এইজন্যই স্বামী

বিবেকানন্দ বলতেন—ধর্ম হল 'হওয়া এবং হয়ে ওঠা'। মানুষকে শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে উঠতে হবে।

যে প্রশ্ন দিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম তা হল, 'এই সকল প্রাণী কোথা থেকে আসে?' উত্তর হল—প্রজাপতি থেকে। প্রজাপতিই বহু হয়েছেন। জগতে কত রকম বস্তু রয়েছে। সব মূলত এক। কিন্তু তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—কারণ এবং কার্য, প্রাণ এবং রয়ি, জীবন এবং জীবনধারণ, অন্ন এবং তার ভোক্তা।

জীবনের সূচনা প্রজাপতি (প্রাণ) থেকে এবং রয়ির (খাদ্য) দ্বারা তা পুষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মসংযম এবং সত্যপালনের দ্বারা পিতৃলোক (চন্দ্রলোক) প্রাপ্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। কিন্তু পিতৃলোকও যাত্রার শেষ নয়। অর্থাৎ তখনও মুক্তিলাভ হয়নি। মুক্তিলাভের জন্য তাকে ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) হতে হবে—কেননা একমাত্র সন্ন্যাসীরই মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় না। তিনি নির্মল জীবন যাপন করেন। প্রাণের (প্রজাপতির) সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান।

এখানেই প্রশ্ন উপনিষদের প্রথম প্রশ্ন সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি॥১

অন্বয়: অথ হ (অতঃপর); এনম্ (তাঁকে [পিপ্পলাদকে]); ভার্গবঃ বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ (বিদর্ভদেশীয় ভার্গব [ভৃগুপুত্র] জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবন্ কতি এব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে (হে ভগবান, কয়টি বা কয়জন ইন্দ্রিয় প্রাণীর দেহকে ধারণ করে); কতরে (তাদের মধ্যে কারা); এতৎ প্রকাশয়ন্তে (দেহকে প্রকাশ করে); এষাং কঃ পুনঃ (আবার তাদের মধ্যে কোন্‌টি); বরিষ্ঠঃ ইতি (প্রধানতম)?

সরলার্থ: অতঃপর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব তাঁকে (পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করলেন, 'ভগবান, কয়টি ইন্দ্রিয় প্রাণীর দেহকে ধারণ করে থাকে? তার মধ্যে কোন্‌টি দেহকে প্রকাশ করে এবং কোন্‌টি প্রধানতম?'

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন ভৃগুবংশীয় ভার্গব। 'বৈদর্ভিঃ' অর্থ বিদর্ভদেশের লোক। বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশের একটি জনপদ। ভার্গবের প্রশ্ন ইন্দ্রিয় বিষয়ে। 'দেব' শব্দের অর্থ যা প্রকাশ করে, উজ্জ্বল করে অথবা ব্যক্ত করে। দিব্ ধাতু থেকে 'দেব' শব্দটি এসেছে। দিব্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা। এখানে 'দেবাঃ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ। কয়টি ইন্দ্রিয় বাইরের বস্তুকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে? কয়টি আমাদের দেহকে ধারণ করে আর কয়টিই বা এই দেহকে প্রকাশ করে? কোন্ ইন্দ্রিয় প্রধানতম?

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্‌বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ॥২

অন্বয়: তস্মৈ (তাঁকে [ভার্গবকে]); সঃ হ উবাচ (তিনি [পিপ্পলাদ] বললেন); আকাশঃ এষঃ দেবঃ হ বৈ (আকাশই এই দেবতা); চ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী (বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীও); বাক্ (কথা এবং অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয়); মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ (মন, চোখ, কান এবং [অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ]); প্রকাশ্য (তাদের নিজ শক্তি প্রকাশ করে); অভিবদন্তি (দর্পভরে বলা

আরম্ভ করলেন); বয়ম্ এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ (আমরাই দেহকে বলিষ্ঠ করি এবং ধারণও করি)।

সরলার্থ: পিপ্পলাদ ভৃগুপুত্রকে বললেন—আকাশই এই দেবতা। তেমনি বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চোখ এবং কানও দেবতা। তাঁরা সকলেই দর্পভরে নিজ নিজ ক্ষমতার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সকলের দাবি তাঁরাই দেহকে বলিষ্ঠ করেছেন এবং দেহকে ধারণও করে আছেন।

ব্যাখ্যা: এখানে দেহকে 'বাণম্' বলা হয়েছে কারণ দেহ চিরস্থায়ী নয়। কর্ম শেষ হলে দেহের বিনাশ হয়। আচার্য শঙ্করের মতে, এই দেহ কার্য-কারণের ফল। কারণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অতএব এই দেহ কর্মেরই ফল। যখন আমাদের কর্ম নিঃশেষ হয়, তখন দেহেরও অবসান হয়।

হিন্দুমতে, এই দেহ পাঁচটি উপাদানে গঠিত : যথা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী। আমাদের কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এই একই উপাদানে তৈরী। কর্মেন্দ্রিয় হল যথাক্রমে বাক্-বাগিন্দ্রিয়, পাণি—দুই হাত, পাদ—দুই পা, পায়ু—মলমূত্রদ্বার; উপস্থ—জননেন্দ্রিয়। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় হল শ্রোত্র—কান, ত্বক—স্পর্শেন্দ্রিয়, চক্ষু—চোখ, জিহ্বা—জিভ, নাসিকা—নাক। এছাড়া আর একটি ইন্দ্রিয় আছে, তা হল মন। আর সবশেষে হল প্রাণ বা জীবনীশক্তি। প্রাণই প্রধানতম, সব কিছুর উৎস। মৃত্যু হলে আমাদের দেহ এবং ইন্দ্রিয় অবিকৃত থাকতে পারে, কিন্তু তথাপি আমরা মৃত কারণ জীবনীশক্তি বা প্রাণ এই দেহ ত্যাগ করে গেছে।

এই ইন্দ্রিয়গুলিকে অনেকসময় দেবম্ বা দেবতা বলা হয়। 'দেব' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'যা প্রকাশ করে'। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করে। যেমন, জল ঠাণ্ডা না গরম তা আমরা স্পর্শ করে অর্থাৎ ত্বক দিয়ে বুঝতে পারি। আবার দেহের প্রতিটি উপাদানের এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরও এক একটি দেবতা রয়েছেন।

পিপ্পলাদ এখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটি কাহিনী বলছেন। একদা দেবতাদের (ইন্দ্রিয়সমূহের) মধ্যে বিবাদ শুরু হল। নির্বোধের মতো তাঁরা ভাবলেন তাঁরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। এই নিয়ে তাঁরা দম্ভ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন: 'এই দেহ আমরাই ধারণ করি। দেহ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়; কাজেই মাঝখানে থেকে আমরা একে একত্র রাখি।' ইন্দ্রিয়দের ধারণা প্রাসাদ যেমন বড় বড় স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনিভাবে তাঁরাও এই দেহকে ধারণ করে আছেন। তাঁরা বলতে চাইছেন : 'আমরা যদি সরে যাই এই দেহের পতন ঘটবে।'

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথ অহমেবৈতৎ পঞ্চধাঽঽত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ॥৩

অন্বয়: বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ (প্রাণ, যিনি প্রধান); তান্ উবাচ (ইন্দ্রিয়সমূহকে বললেন); মোহং মা আপদ্যথ ([তোমরাই দেহকে ধারণ করে আছ এই চিন্তা করে] ভুল করো না); অহম্ এব এতৎ (আমিই একাজ করি [অর্থাৎ আমি দেহকে ধারণ করি, তোমরা নও]); আত্মানং পঞ্চধা (আমি আমার পাঁচটি শক্তি [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান] প্রয়োগ করি); প্রবিভজ্য (যার যা কাজ তাকে তা ভাগ করে দিয়ে); এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি (দেহের যত্ন নিয়ে আমি তাকে ধারণ করি); তে ([কিন্তু] তাঁরা [ইন্দ্রিয়সমূহ]); অশ্রদ্ধধানাঃ বভূবুঃ ([প্রধান ইন্দ্রিয় প্রাণকে] বিশ্বাস করতে পারলেন না)।

সরলার্থ: প্রাণ, যিনি প্রধান, ইন্দ্রিয়সমূহকে বললেন : 'এভাবে অহঙ্কার করো না। আমি নিজেকে পাঁচটি বিভিন্ন শক্তিতে ভাগ করেছি এবং দেহকে সচল রাখতে তাদের নিয়োগ করেছি। দেহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি দায়ী।' ইন্দ্রিয়সমূহ সেকথায় কর্ণপাত করলেন না।

ব্যাখ্যা: এবার প্রাণ প্রতিবাদ জানালেন : 'মা মোহম্ আপদ্যথ'—'সাবধান, মোহগ্রস্ত হয়ো না'। আমরা প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে এ ধরনের ভুল করে থাকি। নিজেদের সম্বন্ধে যা নয় তাই ভেবে বসি। ফলত নিজেদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এই হল মোহ।

কাজেই প্রাণ তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই নিজেকে ঠকাচ্ছ, নির্বোধের মতো কথা বলছ। নিজেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে কেবলমাত্র আমিই এই দেহ ধারণ করে আছি।' এই পাঁচটি ভাগ কি কি? এরা হল—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। প্রাণের কাজ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা এবং অপানের কাজ খাদ্যের অসার পদার্থ বর্জন করা। ব্যান দেহের সকল স্নায়ুতে ছড়িয়ে রয়েছে। আবার উদান দেহের তাপ রক্ষা করে এবং সমান খাদ্য হজম ও পরিপাকে সাহায্য করে। এই পাঁচটি শক্তির দ্বারা প্রাণ আমাদের শরীরকে সচল রাখে, কাজ করার শক্তি যোগায়।

প্রাণের এসব কথা ইন্দ্রিয়দের উপর কোন প্রভাব ফেলল না। অহঙ্কারবশত তাঁরা প্রাণের কথা মেনে নিতে পারলেন না।

সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রামত ইব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা

মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব
প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি॥৪

অন্বয়: সঃ অভিমানাৎ (তিনি [প্রাণ] অভিমানবশতঃ); ঊর্ধ্বম্ উৎক্রামতে ইব (শরীর ছেড়ে যাবার উপক্রম করলেন); তস্মিন্ উৎক্রামতি (যেমনি তিনি [প্রাণ] ছেড়ে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন); অথ (তৎক্ষণাৎ); ইতরে সর্বে এব উৎক্রামন্তে (অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহও ছেড়ে যাবার উপক্রম করলেন)। তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে (এবং যখন তিনি [প্রাণ] স্থির হলেন) সর্বে এব প্রাতিষ্ঠন্তে (তাঁরাও যে যাঁর জায়গায় ফিরে এলেন)। তৎ যথা (এ যেন); মধুকর-রাজানম্ (মৌমাছির রাণীকে); উৎক্রামন্তম্ (উড়ে যাচ্ছে [দেখে]); সর্বাঃ এব মক্ষিকাঃ উৎক্রামন্তে (সমস্ত মৌমাছিই উড়ে যায়); তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে (যতক্ষণ রাণী মৌমাছি নিজের জায়গায় স্থির থাকে); সর্বাঃ এব প্রাতিষ্ঠন্তে (সব মৌমাছিই যে যার জায়গায় থাকে); বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ (বাক্, মন, চোখ, কান এবং অন্য সকল ইন্দ্রিয়); এবম্ (একইভাবে [আচরণ করেন]); তে (ইন্দ্রিয়সমূহ); প্রীতাঃ (প্রীত হলেন [প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে]); প্রাণং স্তুন্বন্তি (এবং প্রাণের স্তব করতে লাগলেন)।

সরলার্থ: প্রধান ইন্দ্রিয় প্রাণ অভিমানবশত উঠে যাওয়ার অর্থাৎ শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়রাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। আবার প্রাণ নিজের জায়গায় ফিরে এলে অন্যরাও যে যাঁর জায়গায় ফিরে এলেন। এ যেন রানী মৌমাছির মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো। রানী চাক ছেড়ে বেরিয়ে গেলে গোটা মৌমাছির দল তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে আবার রানী থাকলে অন্যরাও থাকে। বাক্, মন, চোখ, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি মৌমাছির দলের মতো। প্রাণের উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁরা প্রাণের স্তব করতে লাগলেন।

ব্যাখ্যা: অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের অশ্রদ্ধা দেখে প্রাণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, 'ওরা ভাবছে আমার কোন গুরুত্বই নেই। ঠিক আছে, আমি ওদের বুঝিয়ে দেব।' এই ভেবে প্রাণ শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভান করলেন। যেই প্রাণ বেরোতে শুরু করেছেন সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়রা তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। প্রাণ আবার স্থির হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলে তাঁরাও যে যাঁর জায়গায় ফিরে এলেন। উপনিষদ বলছেন, এ যেন রানী মৌমাছির চাক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো। রানী মৌচাক ত্যাগ করলে গোটা মৌমাছির দল তাকে অনুসরণ করে। রানী মৌমাছিই তাদের নেত্রী। নেত্রী ছাড়া তারা কাজ করতে পারে না। তার ওপর গোটা দলটাই নির্ভর করে আছে। একইভাবে অন্যান্য

ইন্দ্রিয়রা প্রাণের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণ ছাড়া তাঁরা কাজ করতে পারেন না। এমন কি মনও স্বাধীন নয়।

'তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তন্বন্তি'—অতএব ইন্দ্রিয়রা তুষ্ট হয়ে প্রাণের স্তব করতে লাগলেন।

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য
এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ
সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥৫

অন্বয়: এষঃ (এই [প্রাণ]); অগ্নিঃ (অগ্নি রূপে); তপতি (তাপ দেন); এষঃ (এই প্রাণ); সূর্যঃ (সূর্য [অর্থাৎ সূর্যরূপে আলো দেন]); এষঃ (এই প্রাণ); পর্জন্যঃ (মেঘ [অর্থাৎ মেঘরূপে বৃষ্টি দেন]); এষঃ মঘবান্ (এই প্রাণ ইন্দ্ররূপে সব কিছু পালন করেন [ইন্দ্র হলেন দেবরাজ]); এষঃ বায়ুঃ (এই প্রাণ বায়ু [অর্থাৎ বায়ু রূপে সর্বত্র বিদ্যমান]); এষঃ দেবঃ (ইনি প্রকাশ করেন); পৃথিবী (পৃথিবী); রয়িঃ (চন্দ্র); সৎ (স্থূলকার্য); অসৎ (সূক্ষ্মকারণ); চ অমৃতম্ (এবং অমর); চ [অপি] যৎ (এই সবই প্রাণ)।

সরলার্থ: এই প্রাণই অগ্নি এবং অগ্নিরূপে ইনি তাপ দেন। সূর্য, মেঘ, ইন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী এবং চন্দ্র [যাঁদের তিনি প্রকাশও করেন] সবই এই প্রাণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে [কার্যরূপে] তিনিই স্থূল এবং [কারণরূপে] তিনিই সূক্ষ্ম। আবার তিনি অমরও বটে। এই সবই প্রাণ।

ব্যাখ্যা: বিস্ময়কর যা কিছু আমরা দেখি সবই প্রাণের প্রকাশ। প্রাণই বাইরের অগ্নি, আবার দেহের উত্তাপ অর্থাৎ ভেতরের অগ্নিও প্রাণ। মানুষ মারা গেলে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সুতরাং দেহের উত্তাপ জীবনের লক্ষণ। প্রাণই এই উত্তাপ।

সূর্যরূপে প্রাণ আমাদের তাপ ও আলো দেন; আর মেঘরূপে দেন বৃষ্টি। ইন্দ্র হয়ে তিনি দেবতাদের রাজা এবং বায়ুরূপে প্রাণ সর্বত্র রয়েছেন। যে পৃথিবী আমাদের আশ্রয়, আমাদের পালন করছেন তাও এই প্রাণ।

প্রাণই রয়ি অর্থাৎ চন্দ্র। চন্দ্র এখানে অন্নের প্রতীক। একদিক থেকে প্রাণই জীবন বা ভোক্তা অর্থাৎ যে খাদ্য গ্রহণ করে। আর এক দিক থেকে আমরা যে খাদ্য খাই তাও প্রাণ। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের খাদ্য প্রয়োজন। আবার মারা গেলে মানুষই অন্য জীবের খাদ্য হতে পারে। এই ধারা চক্রাকারে চলছে। আসলে সবই এক। একই বস্তু বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছে।

'সৎ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'যার অস্তিত্ব আছে'। কিন্তু এখানে যা স্থূল, যা দেখা যায় তা বোঝাতেই 'সৎ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সৎ-ই কার্য। 'অসৎ' অর্থ যা দেখা যায় না। অসৎ-ই কারণ। সৎ-অসৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম, কার্য-কারণ—উভয়ই প্রাণ। প্রাণকে অমৃত [অর্থাৎ অমরত্বের যে সুধা দেবদেবীদের ধারণ করে আছে] বলা হয়েছে। প্রাণ সকল মানুষ এবং সকল দেবদেবীর আশ্রয়।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥৬

অন্বয়: অরাঃ ইব রথনাভৌ (যেখানে রথচক্রে শলাকাগুলি চক্রের কেন্দ্রে নিবদ্ধ); প্রাণে ([সেইরকম] প্রাণে); সর্বম্ (এই [জগতে] সবকিছু); প্রতিষ্ঠিতম্ (দৃঢ়ভাবে স্থাপিত); ঋচঃ যজূংষি সামানি (তিন বেদ—ঋক্, যজুঃ এবং সাম); যজ্ঞঃ (বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান); ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয় [দ্বিতীয় বর্ণাশ্রম]); ব্রহ্ম চ (এবং ব্রাহ্মণ [প্রাণকে আশ্রয় করে আছেন])।
সরলার্থ: অন্যান্য বস্তু তো বটেই এমনকি ঋক্, যজুঃ এবং সাম বেদ, বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সকলেই প্রাণকে আশ্রয় করে আছেন। রথচক্রে শলাকাগুলি যেমন চক্রের কেন্দ্রকে আশ্রয় করে থাকে, এও ঠিক তেমনি।
ব্যাখ্যা: প্রাণকে এখানে রথচক্রের নাভি বা কেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চাকার কেন্দ্রবিন্দু এবং বাইরের বৃত্তের মাঝে থাকে অনেকগুলি শলাকা। এই নাভি বা কেন্দ্র ছাড়া কোন শলাকা বা চাকা থাকা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়রা প্রাণকে বলছেন, 'এই বিশ্ব, এই জগৎ এক বিশাল চাকার মতো এবং আমরা তার শলাকা। সেই চাকার কেন্দ্রকে আমরা সবাই আশ্রয় করে আছি। সেই কেন্দ্র তুমি। আর শুধু আমাদের কেন, সবকিছুকেই তুমি ধারণ করে আছ।' সবকিছু প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত (প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিত)।

'ঋচঃ যজূংষি সামানি'—ঋগ্ বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ। বেদই জ্ঞান। কে এই জ্ঞানকে ধারণ করে আছেন? প্রাণ। এখানে 'যজ্ঞ' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ধরা যেতে পারে। যজ্ঞ বলতে শুধুমাত্র বৈদিক যাগযজ্ঞ বোঝায় না। আমরা যা কিছু করি তা-ই একরকমের যজ্ঞ। আমাদের কোন কিছুই ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়। আমরা যা কিছু করি তা প্রাণ আছে বলেই সম্ভব হয়। 'ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ'—যে বর্ণাশ্রমেরই হই না কেন আমরা প্রত্যেকেই প্রাণের উপর নির্ভরশীল, কেউ স্বাধীন নই। ব্রাহ্মণ পরাবিদ্যা এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সংরক্ষণ করেন, কিন্তু তিনিও স্বাধীন নন। আবার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের মানুষকে রক্ষা করেন। সমস্ত সমাজ ক্ষত্রিয়ের উপর নির্ভর করে অথচ ক্ষত্রিয় স্বয়ং প্রাণের উপর নির্ভরশীল।

শঙ্করাচার্য বলেন—আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সব প্রাণের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি॥৭

অন্বয়: ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ গর্ভে চরসি (তুমিই প্রজাপতি এবং এইরূপে তুমি [মাতৃ] গর্ভে নড়েচড়ে বেড়াও); প্রতিজায়সে (তোমার মা-বাবার প্রতিরূপ হয়ে [অর্থাৎ মা-বাবার মতো চেহারা নিয়ে] জন্মগ্রহণ কর); প্রাণ (হে প্রাণ); যঃ (যে তুমি); প্রাণৈঃ (চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে); প্রতিতিষ্ঠসি (প্রতি শরীরে বাস কর); তুভ্যং তু (তোমার জন্য); ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রাণিসমূহ); বলিং হরন্তি (ভোগ্যবস্তু আহরণ করে)।
সরলার্থ: তুমি প্রজাপতিরূপে মাতৃগর্ভে নড়েচড়ে বেড়াও। তুমি তোমার মা-বাবার মতো চেহারা নিয়ে জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ, তুমি সব শরীরে ইন্দ্রিয়দের প্রধান হয়ে রয়েছ। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করে) তোমাকে উপহার দেয় (তাদের পক্ষে এটাই সঠিক কাজ)।
ব্যাখ্যা: 'প্রজাপতি' শব্দের অর্থ সবকিছুর (প্রজাদের) প্রভু (পতি); ব্রহ্মার আর এক নাম প্রজাপতি। প্রাণের প্রশস্তি করে ইন্দ্রিয়রা বলছেন, 'তুমি প্রজাপতি এবং তুমিই মাতৃগর্ভে নড়েচড়ে বেড়াও (প্রজাপতি চরসি গর্ভে)।'

'ত্বম্ এব প্রতিজায়সে'—তোমার মা-বাবার অনুরূপ চেহারা নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ কর। **শঙ্করাচার্য** বলেন, 'হে প্রাণ, যেহেতু তুমি প্রজাপতি, সব দেহে সব প্রজন্মে সেই এক তুমিই রয়েছ। তোমার চেহারা তোমার মা-বাবার অনুরূপ, আবার তোমার মা-বাবাও তোমার অনুরূপ। এ ঘটনা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে কারণ সেই এক তুমিই বারবার আসা-যাওয়া করছ।'

'তুভ্যং প্রাণ প্রজাঃ ইমাঃ বলিং হরন্তি'—ইন্দ্রিযরা তোমার জন্য উপহার নিয়ে আসে। 'বলি' শব্দের অর্থ উপহার। এই উপহার দেবতার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন। আমরা যখন কিছু দেখি, আমাদের চোখ কিছু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। কিন্তু তা সে নিজের জন্য করে না, প্রাণকে জানিয়ে দেয়। একইভাবে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়রাও তাদের অভিজ্ঞতা প্রাণকে উপহার দেয়। 'যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি' অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণের উপর নির্ভরশীল।

'তারা তোমাকেই আশ্রয় করে আছে। তাই তোমার প্রশস্তি গাইছে। এটাই তাদের পক্ষে উপযুক্ত কাজ।'

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি॥৮॥

অন্বয়: দেবানাং বহ্নিতমঃ অসি ([তুমি] দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত যজ্ঞীয় আহুতির শ্রেষ্ঠ বাহক); পিতৃনাং প্রথমা স্বধা (পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রথম নিবেদিত অন্ন); ঋষীণাং চরিতং সত্যম্ (তুমি সেই সত্য যা ঋষিরা পালন করেন); অঙ্গিরসাম্ অথর্বা অসি (অঙ্গিরস ঋষিদের [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের] মধ্যে তুমি অথর্বা [প্রাণ]) [অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়দের সঠিকভাবে চালনা কর]।

সরলার্থ: হে প্রাণ, দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতির তুমি শ্রেষ্ঠ বাহক। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রথম নিবেদিত অন্ন তুমিই গ্রহণ কর। ঋষিরা যে সত্য অনুশীলন করেন তাও তুমি। আবার তুমিই ইন্দ্রিয়দের নিজের নিজের কাজে সঠিকভাবে চালনা কর।

ব্যাখ্যা: 'বহ্নিতমঃ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'দ্রুততম বাহক'। এটি অগ্নিরই আর এক নাম। কেন অগ্নিকে বাহক বলা হয়? কারণ বৈদিক যাগযজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি অগ্নিই দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যান। ইন্দ্রিয়রা এখানে বলছে : প্রাণই দেবতা; আবার সেই দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতিও বহন করে আনে প্রাণ।

'পিতৃণাং প্রথমা স্বধা'—অর্থাৎ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে প্রথম নিবেদিত অর্ঘ্য। প্রথা অনুযায়ী শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রথম আহুতি দেওয়া হয় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। আমরা তাঁদের স্মরণ করলে তাঁরা তুষ্ট হন। এখন ইন্দ্রিয়রা প্রাণকে বলছে : 'বস্তুত এই প্রথম আহুতি তোমাকেই নিবেদিত। এই অর্ঘ্য তোমারই উদ্দেশে।'

'ঋষিণাম্'—ঋষি কে? যিনি দেখেছেন। কি দেখেছেন? সত্যকে! যিনি সত্যকে দেখেছেন, সত্যের জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই ঋষি। ঋষিরা আমাদেরও সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। সেই কারণে আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। তাঁরা আমাদের আচার্য।

এখানে ইন্দ্রিয়দের ঋষি বলা হয়েছে, কারণ আমরা ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমেই দেখি। সত্য উপলব্ধি করতে হলে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা প্রয়োজন। তারাই আমাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়সহায়ে আমরা বুঝতে পারি জগতে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর। বাস্তবিক, এছাড়া জীবন আর কিসের জন্য? আমরা বেঁচে আছি কেন? এই জীবনের গুরুত্ব এই যে,

সত্যকে, ঈশ্বরকে জানার জন্য জীবন অপরিহার্য। মানবজন্ম লাভ করে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করি। আর তখনই বুঝতে পারি আমরা যা কিছু দেখছি সব ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং ইন্দ্রিয়রা প্রাণকে বলছে: 'তুমিই সেই প্রাণশক্তি যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করে। তুমি ইন্দ্রিয়দের সঠিকভাবে চালিত করছ যাতে সত্যকে জানা যায়। শাস্ত্রে আছে তুমিই সেই অথর্বা যাকে অঙ্গিরা প্রমুখ ঋষিরা উপাসনা করে থাকেন।'

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ॥৯

অন্বয়: প্রাণ (হে প্রাণ); ত্বম্ ইন্দ্রঃ (তুমি ইন্দ্র [দেবরাজ]); তেজসা রুদ্রঃ অসি (সংহারকারী শক্তিতে তুমিই স্বয়ং রুদ্র); পরিরক্ষিতা ([একই সঙ্গে] তুমি সকলকে রক্ষা কর); ত্বম্ অন্তরিক্ষে চরসি (তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বেড়াও); ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ সূর্যঃ (তুমিই সূর্য, সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভু)।

সরলার্থ: হে প্রাণ, তুমিই ইন্দ্র, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা। তুমি রুদ্ররূপে সকলের সংহার কর। আবার তুমিই সকলের রক্ষক। সূর্যরূপে তুমি আকাশে বিচরণ কর এবং তুমি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভু।

ব্যাখ্যা: 'হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্র'। শঙ্করাচার্য বলেন, ইন্দ্র পরমেশ্বর, সকলের প্রভু। শিবের আর এক নাম রুদ্র। রুদ্র নিজের তেজে, 'তেজসা', সবকিছু সংহার করেন। শুধু তাই নয়, তিনি রক্ষাও করেন, 'পরিরক্ষিতা'। 'পরি' অর্থ সবকিছু। তিনি সবকিছু সংহারও করেন, রক্ষাও করেন। 'অন্তরিক্ষে চরসি'—'তুমি স্বর্গলোকে বিচরণ কর' অর্থাৎ তুমি সর্বত্র রয়েছ। 'তুমি সূর্য'—অন্তরীক্ষে কত গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে, কিন্তু তুমি উজ্জ্বলতম।

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি॥১০

অন্বয়: প্রাণ (হে প্রাণ); ত্বং যদা অভিবর্ষসি (যখন [মেঘরূপে] তুমি বর্ষণ কর); অথ (বর্ষণের পরে); তে (তোমার); ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রাণীরা [মনে করে]); কামায় অন্নং ভবিষ্যতি (আমরা যত খাদ্য চাই তত পাব); ইতি (এই কারণে); আনন্দরূপাঃ তিষ্ঠন্তি (তারা উৎফুল্ল হয়)।

সরলার্থ: হে প্রাণ, যখন মেঘরূপে তুমি বর্ষণ কর তখন সমস্ত প্রাণীরা (যারা তোমার সন্তান) উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারণ তারা তখন মনে করে, 'এখন থেকে আমরা নিজেদের জন্য যত খাদ্য চাই তত পাব।'

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয়রা এখন বলছে প্রাণই বৃষ্টির উৎস। বর্ষা হলে প্রাণীরা উৎফুল্ল হয়। এর কারণ কি? কারণ ভাল বৃষ্টি হলে ফসলও ভাল হবে। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যও পাওয়া যাবে। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'তে ইমা প্রজাঃ'—এই সব প্রাণী তোমারই সন্তান। তারা তোমার থেকে পৃথক নয়।

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥১১

অন্বয়: প্রাণ (হে প্রাণ); ত্বং ব্রাত্যঃ (তুমি পতিত [যেহেতু তুমিই প্রথম পুরুষ, তোমাকে পৈতে দেওয়ার কেউ ছিল না]); একর্ষিঃ (একর্ষি নামক অগ্নি); অত্তা (যজ্ঞের হবি বা ঘি যে গ্রহণ করে); বিশ্বস্য সৎপতিঃ ([এবং] জগতের পরম পতি); বয়ম্ (আমরা [ইন্দ্রিয়সমূহ]); আদ্যস্য (প্রথমে যার জন্ম হয়েছে অর্থাৎ তোমার); দাতারঃ ([তুমি যে হবি গ্রহণ কর] আমরা তার দাতা); মাতরিশ্ব ত্বং নঃ পিতা (হে মাতরিশ্বা, তুমি আমাদের পিতা [অথবা, ত্বং মাতরিশ্বনঃ পিতা, তুমি মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুরও পিতা])।

সরলার্থ: হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, অশুদ্ধ (কারণ তোমার উপনয়ন হয়নি)। তথাপি তুমিই সেই একর্ষি নামক অগ্নি এবং (যজ্ঞে প্রদত্ত) হবির ভোক্তা। তুমি জগতের পরমপতি। তুমিই প্রথম জন্মগ্রহণ করেছ। আমরা ইন্দ্রিয়রা তোমার প্রয়োজনীয় খাদ্য তোমাকে দিই। হে মাতরিশ্বা, তুমি আমাদের পিতা (অথবা তুমি মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর পিতা)।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক ব্রাহ্মণ বংশে কোন বালকের জন্ম হয়েছে। নির্দিষ্ট বয়সে তার উপনয়ন হওয়ার কথা। কিন্তু কোন কারণে যদি তাকে উপনয়ন দ্বারা সংস্কার না করা হয় তাহলে সে হবে ব্রাত্য। 'ব্রাত্য' শব্দের আক্ষরিক অর্থ পতিত। আবার কেউ যদি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁকেও 'ব্রাত্য' বলা হবে। কিন্তু এখানে তো ইন্দ্রিয়রা প্রাণের প্রশস্তি করছিল। তাহলে কেন 'ব্রাত্য' কথাটা ব্যবহার করা হল? কারণ প্রাণ যেহেতু প্রথম সত্তা তাঁর উপনয়ন অনুষ্ঠান করার মতো দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সুতরাং তাঁর উপবীত নেই, তাই তিনি 'ব্রাত্য'। কিন্তু স্বভাবত প্রাণ চিরপবিত্র, উপবীত থাকুক বা নাই থাকুক।

'বিশ্বস্য সৎপতিঃ'—তুমি এই জগতের একমাত্র পতি। তুমিই প্রথম প্রকাশ। তোমার থেকে আমরা সবাই এসেছি। আমরা উপাসনা করলে তোমারই উপাসনা করি। যজ্ঞে

আহুতি দিলে সে আহুতি বস্তুত তোমাকেই দিই। যা কিছু আমরা করি সব তোমারই উদ্দেশে নিবেদিত।

'পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ'—হে মাতরিশ্বা, তুমি আমাদের পিতা। বায়ুকে মাতরিশ্বা বলা হয়। ইন্দ্রিয়রা প্রাণকে বায়ুর সঙ্গে তুলনা করছে কারণ বাতাস ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তাই ইন্দ্রিয়রা বলছে, 'আমরা সবাই তোমার সন্তান, তোমার উপরে নির্ভর করে আছি।'

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥১২

অন্বয়: তে যা তনূঃ (তোমার যে অংশ); বাচি প্রতিষ্ঠিতা (আমার কথায় প্রতিষ্ঠিত); যা শ্রোত্রে (আমার শ্রবণে); যা চ চক্ষুষি (আমার চোখে); যা চ মনসি (আমার মনে); সন্ততা (একযোগে); তাং শিবাং কুরু (তাদের কল্যাণ কর); মা উৎক্রমীঃ (তাদের পরিত্যাগ করো না)।

সরলার্থ: আমাদের কথা বলা, শোনা, দেখা, চিন্তা করা এবং মনের অন্যান্য কর্মে তোমার যেসব অংশ উপস্থিত—সেগুলিকে একযোগে তুমি কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত কর। দয়া করে তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না।

ব্যাখ্যা: প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় করেন। প্রাণ ছাড়া ইন্দ্রিয়রা অকেজো। আমাদের এই প্রার্থনা যে প্রাণ সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং ইন্দ্রিয়দের সুপরিচালিত করুন। ইন্দ্রিয়রা শুধু যে কাজ করবে তাই নয়, এমন ভাবে করবে যাতে অন্যের উপকার হয়।

এই প্রার্থনার মূল সুর হল—যদি আমরা বেঁচে থাকি তবে পরহিতার্থে বাঁচব।

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি॥১৩

অন্বয়: ইদং সর্বম্ (এই সব); প্রাণস্য বশে (প্রাণের অধীনে); ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ (স্বর্গে যা কিছু আছে); মাতা ইব পুত্রান্ রক্ষস্ব (মাতা যেমন সন্তানকে রক্ষা করেন সেইভাবে অনুগ্রহ করে আমাদের রক্ষা করুন); নঃ শ্রীঃ চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি (আমাদের সৌভাগ্য এবং জ্ঞান দান করুন)।

সরলার্থ: জগতে যা কিছু আছে সব প্রাণই নিয়ন্ত্রণ করেন। মা যেমন সন্তানকে রক্ষা করেন, প্রাণও তেমনি আমাদের রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা। তিনি আমাদের সৌভাগ্য ও জ্ঞান দান করুন।

ব্যাখ্যা: প্রাণই প্রজাপতি, যিনি সকল কিছুর উৎস। প্রাণের কাছে আমাদের বিশেষ প্রার্থনা তিনি আমাদের সৌভাগ্য ও জ্ঞান দান করুন। এই দুটি জিনিস লাভ করলে আমরা সফল হবই।

এখানেই প্রশ্ন উপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্শরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি॥১

অন্বয়: অথ হ (তারপরে); কৌসল্যঃ আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্র কৌসল্য); এনং পপ্রচ্ছ (তাঁকে [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবন্ কুতঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে (ভগবান কোথা থেকে এই প্রাণ এসেছেন); অস্মিন্ শরীরে কথম্ আয়তি (এই শরীরে তিনি কিভাবে আসেন); আত্মানং প্রবিভজ্য (নিজেকে বিভক্ত করে); কথং বা প্রাতিষ্ঠতে (কিভাবে তিনি থাকেন); কেন উৎক্রমতে (কিভাবে তিনি [শরীর] পরিত্যাগ করেন); কথং বাহ্যম্ অভিধত্তে (কিভাবে তিনি বাইরের বস্তু অর্থাৎ জীবজন্তু ও পদার্থসমূহকে ধারণ করেন); কথম্ অধ্যাত্মম্ ইতি (অথবা শরীরের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি [কিভাবে ধারণ করেন])?

সরলার্থ: অতঃপর অশ্বলপুত্র কৌসল্য ঋষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে ভগবান, প্রাণ কোথা থেকে আসেন? শরীরে তিনি কিভাবে প্রবেশ করেন? কিভাবে তিনি নিজেকে সারা দেহে ছড়িয়ে দেন এবং কিভাবেই বা নিজের কর্ম সম্পাদন করেন? কি কৌশলে তিনি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যান? কিভাবে তিনি বাইরের বস্তু অর্থাৎ প্রাণী ও পদার্থসমূহকে ধারণ করেন? ইন্দ্রিয় ইত্যাদি শরীরের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিই বা কিভাবে তাঁকে আশ্রয় করে থাকে?

ব্যাখ্যা: এতক্ষণ আমরা প্রাণের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। কিন্তু এই প্রাণের উৎপত্তি কোথা থেকে হল? এঁর উৎস কি এবং আরম্ভই বা কোথায়? এই জগতের স্রষ্টা কে? প্রশ্নটি অতি সঙ্গত। বেদান্ত মতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। 'শূন্য' থেকে কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না। যদি দেখি কিছু আছে তাহলে ধরে নিতে হবে তার পূর্বেও কিছু ছিল। বেদান্তমতে ব্রহ্ম সদা বিদ্যমান এবং ব্রহ্মই এই জগতের আশ্রয়। বস্তুত ব্রহ্মই একমাত্র আছেন।

তাহলে প্রাণ কিভাবে শরীরে প্রবেশ করেন ও শরীর ত্যাগ করেন? পিপ্পলাদ আগেই বলেছেন, প্রাণ নিজেকে পাঁচটি অংশে ভাগ করেন। এই বিভাগ কেমন করে সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন অংশের কাজই বা কি? প্রাণকে আমরা প্রাণী, কীটপতঙ্গ ও নানা পদার্থের মধ্যে দেখতে পাই। এই দৃশ্যমান জগতে প্রতিটি পদার্থ, প্রতিটি অংশ এবং প্রতিটি প্রাণীর নির্দিষ্ট

কর্তব্য আছে। প্রাণ কিভাবে এই সবকিছুকে চালনা করেন? কিভাবেই বা প্রাণ দেহের ভিতরের ও বাইরের বিষয়সমূহকে ধারণ করে থাকেন?

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি
তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥২

অন্বয়: তস্মৈ সঃ হ উবাচ (তিনি তাঁকে বললেন); অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি (তুমি দুরূহ সব প্রশ্ন করছ); ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি ([কিন্তু] তুমি ব্রহ্মে সমর্পিত); তস্মাৎ তে অহং ব্রবীমি (সুতরাং আমি [তোমার প্রশ্নের] উত্তর দেব)।
সরলার্থ: ঋষি পিপ্পলাদ কৌসল্যকে বললেন, 'অত্যন্ত কঠিন বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করছ। কিন্তু যেহেতু তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'
ব্যাখ্যা: ছাত্র সঠিক প্রশ্ন করলে গুরু প্রসন্ন হন। তাই পিপ্পলাদ কৌসল্যকে বললেন : তুমি আমাকে 'অতিপ্রশ্নান্' অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন সব প্রশ্ন করছ। প্রাণ বিষয়টি অতি দুরূহ এবং তোমার সব প্রশ্নই প্রাণকে নিয়ে। তুমি 'ব্রহ্মিষ্ঠ', অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে তোমার একান্ত নিষ্ঠা। বিষয়টি তুমি গভীরভাবে চিন্তা করেছ। আর.সেইজন্যই তুমি এইসব প্রশ্ন করছ। পিপ্পলাদ বললেন, 'আমি সানন্দে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

আধ্যাত্মিক বিষয়ে অধিকাংশ মানুষের কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। তাঁরা বলেন, 'ঈশ্বর আছে কি নেই এ বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই। এ প্রশ্ন আমার কাছে নিরর্থক।' বস্তুত উদাসীন হওয়ার থেকে নাস্তিক হওয়া ভাল। বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, সেটা বরং বোঝা যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বর নিয়ে কোন ভাবনা-চিন্তাই করেন না, সেটাই পরিতাপের বিষয়। তাঁরা বিষয়টিকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলেন। ফলে সত্য তাঁদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে যথৈষা পুরুষে ছায়েতস্মিন্নেতদাততং
মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে॥৩

অন্বয়: এষঃ প্রাণঃ আত্মনঃ জায়তে (এই প্রাণ আত্মা থেকে আসেন); পুরুষে যথা ছায়া (যেমন দেহের একটি ছায়া আছে); [একই ভাবে] এতৎ (এই [প্রাণ]); এতস্মিন্ (আত্মাতে); আততম্ (অন্তর্নিহিত); মনোকৃতেন (ইচ্ছা হলে); অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (এই স্থূল দেহে আসেন)।

সরলার্থ: প্রাণ আত্মা থেকে আসেন। দেহকে আশ্রয় করে যেমন ছায়া থাকে তেমনি আত্মায় প্রাণ নিহিত রয়েছেন। ইচ্ছা হলে এই প্রাণ স্থূল শরীর ধারণ করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মা থেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে প্রাণের উৎপত্তি। সবকিছু সেই এক আত্মা থেকে আসে আবার আত্মাতেই ফিরে যায়। সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে, কিছুক্ষণ থেকে আবার তা সমুদ্রেই মিশে যায়। এই তরঙ্গরাশিকে কি সমুদ্র থেকে আলাদা করা যায়? না, তা সম্ভব নয়।

উপনিষদ প্রাণকে ছায়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের শরীর আছে এবং তার ছায়াও আছে। এই ছায়া কোথা থেকে আসে? শরীর থেকে। অনুরূপভাবে প্রাণ আত্মা থেকে আসেন। প্রাণকে আত্মা থেকে পৃথক করা যায় না—যেমন তরঙ্গকে সমুদ্র থেকে বা ছায়াকে দেহ থেকে পৃথক করা যায় না। আচার্য শঙ্কর বলেন, এই ছায়া 'অনৃত' অর্থাৎ অসত্য। ছায়ায় কোন বস্তু নেই, অতএব তা স্বতন্ত্র নয়। ঠিক সেইরকম প্রাণ সম্পূর্ণভাবে আত্মার উপর নির্ভরশীল এবং সেই অর্থে অসত্য বা মিথ্যা। প্রাণকে যে সত্য বলে মনে হয় তার কারণ প্রাণ সত্যকে অর্থাৎ আত্মাকে আশ্রয় করে আছেন। আবার একই অর্থে জগৎও সত্য যেহেতু সত্যই জগৎকে ধরে আছেন। সেই সত্যস্বরূপই জগতের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হন।

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল—প্রাণ কিভাবে শরীরে প্রবেশ করেন? উপনিষদ বলেন, আমাদের মনের গতি (মনোকৃতেন) অর্থাৎ আমাদের প্রবণতা, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কল্প ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের দেহের গঠন হয়। মনই শরীরকে সৃষ্টি করে। কেউ হয়তো সবল, সুন্দর দেহের অধিকারী; আবার কারোর দেহ জীর্ণ, দুর্বল। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণী ও কীটপতঙ্গ তো আছেই। আবার মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন যাঁরা নরোত্তম।

সুন্দর মনই সুন্দর দেহ সৃষ্টি করে। যে মন সবসময় সৎ চিন্তা করে, ঘৃণা ক্রোধ ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দেয় না সেই মনই সুন্দর। আর যাঁরা সুন্দর মনের অধিকারী তাঁরা বলেন, 'এই শরীর ভোগের জন্যে নয়, বাসনা চরিতার্থ করার জন্যেও নয়। শরীর থাকলে আমরা শাস্ত্রপাঠ করতে পারি, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে পারি। শরীর না থাকলে সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব নয়।' কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের মনকে সংযত করতে পারেন না। তাঁরা লোভ ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর বশীভূত হয়ে ভিন্ন ধরনের শরীর লাভ করেন।

এই শরীরকে কখনও কখনও 'ভোগায়তন' অর্থাৎ 'ভোগের স্থান' বলে উল্লেখ করা হয়, কারণ দেহ ছাড়া আমরা বাসনা চরিতার্থ করতে পারি না। আমাদের মনে ভালমন্দ নানারকম আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। হয়তো কোন কারণে সেই বাসনা এই জীবনে অপূর্ণই থেকে গেল। কিন্তু যেহেতু সেই আকাঙ্ক্ষা মনে থেকেই যায়, পরজন্মে আবার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযুক্ত শরীর লাভ হয়। উপনিষদ প্রকারান্তরে বলতে চাইছেন, 'তুমিই তোমার ভাগ্যবিধাতা।'

পুনর্জন্মের এই ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদান্তদর্শনে শরীরকে বলা হয়েছে 'জলৌকাবৎ' অর্থাৎ জোঁকের মতো। জোঁক যেমন গাছের এক পাতা থেকে আর এক পাতায় যায়, প্রাণও তেমনি এক দেহ থেকে অন্য দেহে যান। আমাদের কামনা-বাসনাই বারবার আমাদের এই জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্ক্তে।
এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্
প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে॥৪

অন্বয়: যথা সম্রাট এব অধিকৃতান্ বিনিযুঙ্ক্তে (সম্রাট যেমন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করেন); এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব ইতি ('অমুক অমুক গ্রামে যাও এবং তাদের দেখাশোনা কর'—এই বলে); এবম্ এব এষঃ প্রাণঃ (একই ভাবে এই প্রাণ); ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধত্তে (তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের অর্থাৎ চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকে তাদের যথানির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত করেন)।
সরলার্থ: সম্রাট যেমন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করে বলেন—'অমুক অমুক গ্রামে যাও এবং তাদের দেখাশোনা কর'—ঠিক সেইভাবে প্রাণ তাঁর অধীনস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে যথানির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত করেন।
ব্যাখ্যা: প্রাণের কাজ কি? প্রাণকে এখানে সম্রাট বলা হয়েছে। এই সম্রাট এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। সম্রাট থাকলে সম্রাটের অধীনস্থ বহু শাসকও থাকেন। রাজ্যের এক একটি অংশের শাসনভার এক একজন শাসকের হাতে দিয়ে সম্রাট বলেন—'যাও, শাসন কর।' এইভাবে তাঁদের দিয়েই সম্রাট সাম্রাজ্য শাসন করেন। সেইরকম দেহে ইন্দ্রিয়সমূহও প্রাণের অধীন। প্রাণ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ কর্তব্য ও এলাকা ভাগ করে দেন। তারা কিন্তু শাসন করে প্রাণেরই নির্দেশে। প্রাণের আদেশ তারা মেনে চলে। এই অধীনস্থ ইন্দ্রিয়গুলি হল চোখ, কান, নাক ইত্যাদি।

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং
প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি
তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি॥৫

অন্বয়: পায়ু উপস্থে অপানম্ (প্রাণ গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ের তত্ত্বাবধান করতে অপানকে নিযুক্ত করেন); মুখ-নাসিকাভ্যাং চক্ষুঃ-শ্রোত্রে স্বয়ং প্রাণঃ প্রাতিষ্ঠতে (মুখ, নাক, চোখ এবং কানে প্রাণ নিজে অবস্থান করেন); মধ্যে তু সমানঃ (পাকস্থলীর দেখাশোনা করে সমান); হি (সুতরাং); এষঃ (এই [সমান]); হুতম্ (ভুক্ত, যা খাওয়া হয়েছে); অন্নম্ (খাদ্য); সমং নয়তি (সমভাবে খাদ্যকে সারবস্তুতে [যেমন রক্তে] রূপান্তরিত করে); তস্মাৎ ([প্রাণের অগ্নি] থেকে); এতাঃ সপ্ত (এই সাত [ইন্দ্রিয় যথা দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কান এবং জিভ]); অর্চিষঃ ভবন্তি (অগ্নিশিখার মতো প্রকাশ পায়) [আমাদের সঠিক জ্ঞান দেয়]।

সরলার্থ: এই প্রাণ গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ের তত্ত্বাবধান করতে অপানকে নিযুক্ত করেন। চোখ, কান, মুখ ও নাসারন্ধ্রে প্রাণ নিজে অবস্থান করেন। শরীরের কেন্দ্রীয় অংশের তত্ত্বাবধান করে সমান। সমান খাদ্যকে পরিপাক করে সার পদার্থে পরিণত করে (যেমন রক্তে)। প্রাণের অগ্নি (যা পাকস্থলীর মধ্যে) থেকে সাতটি শিখা নির্গত হয় (যা হল সাতটি ইন্দ্রিয় : যথা দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র এবং জিভ)।

ব্যাখ্যা: উপনিষদে আগেই বলা হয়েছে প্রাণ নিজেকে পাঁচভাগে ভাগ করেন : যথা প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান এবং উদান। এই পাঁচ অংশের পাঁচরকম কাজ। প্রাণ মুখ্য বায়ুরূপে শরীরের প্রধান কাজগুলি যেমন শ্বাসক্রিয়া, শোনা, দেখা ইত্যাদি নিজের দায়িত্বে রাখেন। শরীরের আবর্জনা বের করার জন্য গুহ্য ইন্দ্রিয়ের ভার অপানের উপর ন্যস্ত। জননেন্দ্রিয়ের তত্ত্বাবধানও অপানই করে।

জঠর অর্থাৎ পাকস্থলীর ভিতর রয়েছে ‘সমান’। ‘সমান’ খাদ্য ও পানীয়কে সারা শরীরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। জঠরে অগ্নি আছে। আমরা যা কিছু খাদ্য গ্রহণ করি তা জঠরাগ্নিতে পরিপাক হয়। হিন্দুমতে, আহার করা যেন একটি যজ্ঞ যেখানে জঠরাগ্নিতে খাদ্যরূপ আহুতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই লোভের বশে খায় এবং বেশী খেয়ে ফেলে। যতটা খাদ্য আমরা হজম করতে পারি, ঠিক সেই পরিমাণই আমাদের খাওয়া উচিত।

এই অগ্নির সঙ্গে থাকে সাতটি শিখা (সপ্ত অর্চিষঃ)। এই সাত শিখা হল : দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র এবং জিভ। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় জিভ তা কথা দিয়ে প্রকাশ করে। যেখানেই অগ্নি আছে সেখানে এই সাতটি শিখার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করে। অগ্নি না থাকলে অথবা সেই অগ্নিতে আহুতি না দিলে চোখ দেখতে পায় না, কান শুনতে পায় না, নাক কোন গন্ধ পায় না এবং জিভ কথা বলতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যা দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি॥৬

অন্বয়: হৃদি হি এষঃ আত্মা (হৃদয়েই আত্মা বাস করেন); অত্র (এই হৃদয়ে); নাড়ীনাম্ এতৎ একশতম্ (একশ এক ধমনী বিদ্যমান); তাসাম্ একৈকস্যাঃ শতং শতম্ (প্রতি ধমনীর একশত শাখা); প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ ভবন্তি (প্রতি শাখার বাহাত্তর হাজার উপশাখা আছে); আসু (এরমধ্যে [শাখা প্রশাখায়]); ব্যানঃ চরতি (ব্যান বিচরণ করে)।

সরলার্থ: হৃদয়ই আত্মার আসন। এই হৃদয়ে একশ একটি ধমনী রয়েছে। প্রতিটি ধমনীর একশ শাখা এবং প্রতিটি শাখার বাহাত্তর হাজার উপশাখা। ব্যান এই ধমনী ও তার শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়ে চলাচল করে।

ব্যাখ্যা: হৃদয় শরীরের প্রধানতম অঙ্গ। বেদান্তদর্শনে বলা হয় আত্মার স্থান হৃদয়ে। আচার্য শঙ্কর বলেন, হৃদয়মধ্যস্থ আকাশে (হৃদয়াকাশে) আত্মা রয়েছেন। হৃদয়ের মধ্যে আকাশ আছে। সেই আকাশ অধিকার করে আছেন আত্মা তথা প্রাণ। হৃদয়েই প্রাণের অধিষ্ঠান। প্রাণ বেরিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। হৃদয়ের আকৃতি পদ্মকুঁড়ির মতো বলা হয়। সেইজন্য হৃদয় বোঝাতে 'হৃদয়পদ্ম' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

শিরা, ধমনী ও স্নায়ু বোঝাতে এখানে একটি সাধারণ শব্দ 'নাড়ী' ব্যবহার করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ড থেকে বহু ধমনী ও শিরা বেরোয়। সেগুলির মধ্যে দিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সমপরিমাণে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শঙ্করাচার্য এই শিরা ও ধমনীগুলিকে সূর্যকিরণের সাথে তুলনা করেছেন—সূর্য থেকে বেরিয়ে কিরণরাশি যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এ-ও ঠিক তেমনি। প্রাণের যে-অংশ শরীরের সর্বত্র সমানভাবে রক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করে তাকে বলা হয় ব্যান। উপনিষদ বলেন, হৃদয়ে একশ একটি নাড়ী আছে, প্রতিটি নাড়ীর একশটি শাখা। আবার প্রতি শাখার বাহাত্তর হাজার প্রশাখা। এই সংখ্যা অবশ্য আক্ষরিকভাবে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রতিটি শিরা, ধমনী, স্নায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে যদিও তা হয়তো আমাদের কাছে এখনও তত স্পষ্ট নয়।

অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্॥৭

অন্বয়: অথ (এবং); একয়া (একটি ধমনী দ্বারা [অর্থাৎ সুযুম্না]); ঊর্ধ্বঃ (ঊর্ধ্বগামী হয়ে); উদানঃ (প্রাণের অধীনস্থ উদানবায়ু); পুণ্যেন (পুণ্যকর্মের দ্বারা); পুণ্যং লোকং নয়তি ([যে ব্যক্তি এরূপ পুণ্যকাজ করে তাকে] পুণ্যলোকে নিয়ে যায়); পাপেন পাপম্ (পাপকর্মের ফলে পাপলোকে); উভাভ্যাম্ এব (যখন পুণ্য এবং পাপকর্ম উভয়ই সমান); মনুষ্যলোকম্ (মানুষ সাধারণত যেই লোকে যায় তাকে সেই লোকে নিয়ে যায়)।

সরলার্থ: যদি কোন মানুষ পুণ্যকর্ম করে থাকে তবে মৃত্যুকালে উদান তাকে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে পুণ্যলোকে নিয়ে যায়। আবার যদি মানুষ পাপকর্ম করে তাহলে উদান তাকে পাপলোকে নিয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ পাপ-পুণ্য উভয়বিধ কর্ম সমপরিমাণে করে থাকে তবে উদানের সাহায্যে সে মনুষ্যলোকে যায়।

ব্যাখ্যা: উদানের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুকালে উদান জীবাত্মাকে দেহের বাইরে নিয়ে যায়। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনটি ধমনী রয়েছে। কেন্দ্রের ধমনী অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্য দিয়ে আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মানুষের আত্মা যখন দেহত্যাগ করে, সেই সময় উদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি কেউ পুণ্যকর্ম করে, সৎ জীবন যাপন করে তবে উদান তাকে পুণ্যলোকে নিয়ে যায়। আবার যে মানুষ পাপকাজে জীবন অতিবাহিত করে তাকে উদান পাপলোকে নিয়ে যায়। তেমনি যে মানুষ ভাল-মন্দ দুই কাজই সমপরিমাণে করেছে উদান তাকে নিয়ে যায় সাধারণ মনুষ্যলোকে। সেখানে তার জন্য না থাকে পুরস্কার, না থাকে শাস্তি।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং
প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা
পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ॥৮

অন্বয়: আদিত্যঃ হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ (সূর্য বাইরের প্রাণ); এষঃ হি (এই সূর্য); এনং চাক্ষুষং প্রাণম্ অনুগৃহ্ণানঃ (চক্ষুমধ্যস্থ প্রাণকে অনুগ্রহ করে); উদয়তি (উদিত হয়); পৃথিব্যাং যা দেবতা (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা); সা এষা (সেই দেবতা); পুরুষস্য অপানম্ অবষ্টভ্য (অপান বায়ুকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে) [অপান অর্থাৎ যে নিঃশ্বাস আমরা ত্যাগ করি এবং যা আমাদের ভূমিতে ধরে রাখে, উপরে উঠে যেতে দেয় না]; অন্তরা যৎ আকাশঃ (দ্যুলোক এবং ভূলোকের মধ্যস্থ আকাশে যে বায়ু); সঃ সমানঃ (তাকেই বলা হয় সমান); বায়ুঃ ব্যানঃ (সাধারণ বায়ুকে বলা হয় ব্যান)।

সরলার্থ: সূর্যই বাইরের প্রাণ। চোখকে অনুগ্রহ করতেই যেন সূর্যের উদয় হয়, যাতে চোখ সব কিছু দেখতে পায়। এই প্রাণই পৃথিবীর অধিপতি দেবতা এবং তিনি তাঁর অধীনস্থ অপানকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই কারণেই কোন বস্তু উপরেও উঠে যায় না আবার মাটিতেও পড়ে না; অপান সব কিছুকে নিজের নিজের জায়গায় ধরে রাখে। দ্যুলোক এবং ভূলোকের অন্তর্বর্তী আকাশে বায়ু রয়েছে। সেই বায়ুই সমান এবং তা প্রাণের অধীন। প্রাণের অপর এক অধীনস্থ বায়ু হল ব্যান যা শরীরের ভিতরে বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ব্যাখ্যা: সব কিছুর ভিতরে এবং বাইরে সেই একই প্রাণ রয়েছেন, যদিও তাঁর নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন। বাইরের জগতে সূর্যই প্রাণ, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে চোখও প্রাণ। অপানরূপে প্রাণ পৃথিবীকে এবং প্রতিটি বস্তুকে নিজের নিজের জায়গায় ধরে রাখেন; উপরে উঠে যেতে দেন না আবার নীচে পৃথিবীতেও পড়তে দেন না। আবার ব্যানরূপে প্রাণ শরীরের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন।

প্রাণ প্রজাপতিরূপে ছোট-বড়, ভিতর-বার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ। পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ॥৯

অন্বয়: তেজঃ হ বৈ উদানঃ (অগ্নিই উদান); তস্মাৎ (সুতরাং); উপশান্ততেজাঃ (যার দেহের আগুন নিভে গেছে [অর্থাৎ যখন তার মৃত্যু হয়েছে]); মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয় তার মনে সংহত হয়); পুনর্ভবম্ [প্রতিপদ্যতে] (পুনর্জন্ম হয়)।

সরলার্থ: অগ্নিই উদান। মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তার শরীর শীতল হয়ে যায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন মনে লীন হয় এবং সে জন্মান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়।

ব্যাখ্যা: মৃত্যুর লক্ষণ কী? প্রথমে আমরা বাক্‌শক্তি হারাই। এই অবস্থায় দেখা বা শোনা হয়তো সম্ভব হয়, কিন্তু কথা বলা সম্ভব হয় না। তারপরে একে একে সব ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, যদিও শেষপর্যন্ত মন সচেতন থাকে। মনও যখন শরীর ত্যাগ করে তখন আমরা চেতনা হারাই। অবশ্য যতক্ষণ শরীরের উত্তাপ থাকে ততক্ষণ আমরা জীবিত। মৃত্যুর লক্ষণ হল শরীরে উত্তাপের অভাব।

মৃত্যুকালে আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে যায় তখন সে একা যায় না। মন এবং সূক্ষ্ম অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় আত্মাকে অনুসরণ করে। সাধারণত নাসারন্ধ্র অথবা মুখগহ্বরের ভিতর দিয়ে আত্মা শরীর ত্যাগ করে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ মস্তকের শীর্ষদেশের ছিদ্র দিয়েও আত্মা বেরিয়ে যেতে পারে।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি। প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা
যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি॥১০

অন্বয়: এষঃ (এই ব্যক্তি); যৎ চিত্তঃ ([মৃত্যুকালে] যেমন সে চিন্তা করে); তেন প্রাণম্ আয়াতি ([সেই চিন্তা নিয়ে] সে প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়); প্রাণঃ তেজসা সহ যুক্তঃ (প্রাণ তখন অগ্নির [উদান] সঙ্গে যুক্ত হয়); আত্মনা যথা সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি (জীবাত্মাকে তার অভীষ্ট লোকে নিয়ে যায় [এবং তারপরে আত্মা নূতন জন্ম গ্রহণ করে]।
সরলার্থ: মৃত্যুকালে জীবাত্মা প্রাণে প্রবেশ করে। সঙ্গে থাকে মন এবং সেই সময়কার মনের যত চিন্তা ও বাসনা সমূহ। প্রাণ তখন অগ্নি অর্থাৎ উদানের সঙ্গে যুক্ত হয় (কেননা উদানই তাকে দেহের বাইরে নিয়ে যায়)। আত্মা যে লোক কামনা করে প্রাণ তাকে সেই লোকেই নিয়ে যায়। তারপরে আত্মা নতুন জন্ম গ্রহণ করে।
ব্যাখ্যা: মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তখন দুর্বল হয়ে আসে। মৃত্যুকালেও মানুষের অনেক অপূর্ণ বাসনা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি চরিতার্থ হবার আর কোন উপায় থাকে না। অতএব, মন ও তার অপূর্ণ বাসনা এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে জীবাত্মা প্রাণে প্রবেশ করে। প্রাণ তখন তার অধীনস্থ উদানের (উত্তাপ) সাহায্যে আত্মাকে তার অভীষ্ট লোকে নিয়ে যায়। জীবাত্মা সেখানে কিছুকাল থেকে আবার নতুন জন্ম নেয়।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি
তদেষঃ শ্লোকঃ॥১১

অন্বয়: বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি); যঃ প্রাণম্ এবম্ বেদ (এইভাবে যিনি প্রাণকে জানেন); অস্য প্রজাঃ ন হ হীয়তে (তিনি কখনও তাঁর সন্তানকে হারান না); অমৃতঃ ভবতি (তিনি অমরত্ব লাভ করেন); তৎ এষঃ শ্লোকঃ (এখানে এই তত্ত্বের প্রতিপাদক একটি শ্লোক আছে)।
সরলার্থ: যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণকে এইভাবে জেনেছেন (অর্থাৎ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভরূপে) তিনি কখনও সন্তানকে হারান না (কেননা তিনি জানেন প্রজাপতির সঙ্গে তিনি অভিন্ন) এবং তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন। এই তত্ত্বকে সমর্থন করে একটি শ্লোক আছে।
ব্যাখ্যা: প্রাণকে প্রাণাত্মা, প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভও বলা হয়। এ হল সমষ্টি মনে প্রকাশিত চৈতন্য। প্রাণকে জানলে মানুষ প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করে। তখন সে জানে প্রাণরূপে সে কারো পিতামাতা হতে পারে না, সুতরাং তার সন্তানও থাকতে পারে না।

সন্তান থাকলে কালে তার মৃত্যু হবেই। এককথায় বলতে গেলে, সে তখন অনুভব করে সে অমর।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বং চৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি॥১২

অন্বয়: প্রাণস্য উৎপত্তিম্ (প্রাণের উৎপত্তি); আয়তিম্ (শরীরে আসে অর্থাৎ শরীর ধারণ করে); স্থানম্ (শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান); পঞ্চধা বিভুত্বং চ এব (পাঁচটি অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে); অধ্যাত্মং চ এব (শরীরের ভিতরে [যেমন চোখে] এবং বাইরে [যেমন সূর্যরূপে]); বিজ্ঞায় অমৃতম্ অশ্নুতে (প্রাণকে এভাবে জেনে তুমি অমৃতত্ব লাভ কর) [শেষ কথাটি বার বার বলা হয়েছে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেবার জন্য এবং অধ্যায়ের সমাপ্তি বোঝাবার জন্য]।

সরলার্থ: প্রাণ পরমাত্মা থেকে আসে। তারপর বাসনা পূরণের জন্য উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে নিজেকে স্থাপন করে। প্রাণের প্রতিটি অংশের জন্য আবার পৃথক পৃথক কাজ ভাগ করা থাকে। বাইরের প্রাণই সূর্য; আবার শরীরের মধ্যে চোখই প্রাণ। প্রাণ ও তার কার্যকলাপ বুঝতে পারলে মানুষ অমর হয় (কারণ তখন সে জানে সে-ই স্বয়ং প্রাণ)।

ব্যাখ্যা: প্রাণের (সমষ্টি শক্তি) উৎপত্তি আত্মা থেকে। বস্তুত প্রাণ আত্মারই বিকার। মনে বাসনা থাকলে প্রাণ শরীর গ্রহণ করে। শরীরে সে নিজেকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান)। প্রতিটি ভাগকে শরীরের একটি বিশেষ অংশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন অপান পায়ু (বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের অঙ্গ) এবং উপস্থের (জননেন্দ্রিয়) ভারপ্রাপ্ত। প্রাণ স্বয়ং চোখ ও কানকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমানের উপর থাকে শরীরের মধ্যভাগের দায়িত্ব। ব্যান ধমনীসমূহকে ও উদান সুষুম্না নাড়ীকে নিয়ন্ত্রণ করে। মৃত্যুকালে প্রাণ উদানের সাহায্যেই দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

শরীরের বাইরে প্রাণ সূর্যরূপে প্রকাশিত। আর দেহের ভিতরে চক্ষুরূপে। বস্তুত প্রাণ শরীরের ভিতরের ও বাইরের সমস্ত উপাদান যথা ক্ষিতি, তেজ, বায়ু ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাণকে জানলে মানুষ প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করে। সেই অবস্থায় সে জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যায়, অর্থাৎ অমর হয়।

এখানেই প্রশ্ন উপনিষদের তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

চতুর্থ প্রশ্ন

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি কস্যৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি॥১

অন্বয়: অথ হ (তারপরে); সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ (গর্গ বংশের সৌর্যায়ণী); এনং পপ্রচ্ছ (তাঁকে [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবন্ (ভগবান); এতস্মিন্ পুরুষে (এই শরীরে); কানি স্বপন্তি (কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায়); অস্মিন্ কানি জাগ্রতি (একই শরীরের কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জেগে থাকে); কতরঃ এষঃ দেবঃ [এই দুই দেবতার মধ্যে কোন্‌টি] (একটি নিদ্রিত এবং অপরটি জাগ্রত); স্বপ্নান্ পশ্যতি (স্বপ্ন দেখে); কস্য এতৎ সুখং ভবতি (কে সেই [সুষুপ্তির] আনন্দ উপভোগ করে); কস্মিন্ নু (কার উপর); সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি ইতি (এই সকলে আশ্রয় গ্রহণ করে)?

সরলার্থ: তারপরে গর্গ বংশের সৌর্যায়ণী পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করলেন, হে ভগবান, মানুষের শরীরে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায় এবং বিশ্রাম গ্রহণ করে? কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ই বা জেগে থাকে এবং কাজ করে? এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে (একটি সক্রিয়,অপরটি নিষ্ক্রিয়).কোন্‌টি বা স্বপ্ন দেখে? সুষুপ্তির আনন্দই বা কে উপভোগ করে? সুষুপ্তির অবস্থায় সকল ইন্দ্রিয় কোথায়ই বা যায়?

ব্যাখ্যা: সমগ্র জীবকুলই এই নিদ্রা নামক অভিজ্ঞতার অধীন। শুধুমাত্র মানুষই নয়, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই ঘুমোয়। কিন্তু আমাদের দেহের কোন্ অংশটি ঘুমোয়? দেহ? ইন্দ্রিয়? কিংবা আর কিছু? এটা খুব সহজ প্রশ্ন। বস্তুত আমাদের সকলেরই এই তিন রকম অভিজ্ঞতা হয়—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এখন প্রশ্ন হল, কে স্বপ্ন দেখে? এই দেহের মধ্যে কোন অংশটি জেগে থাকে? আমরা বলে থাকি, 'আমি অমুক'। আমরা সকলেই এই 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এই 'আমি'ই বা কে?

যখন আমরা জেগে থাকি তখন আমাদের শরীর এবং মন দুই-ই সক্রিয় থাকে। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় আমাদের শরীর কোন কাজ করে না কিন্তু মন তখনও সক্রিয় থাকে। আমরা হয়তো বিছানায় শুয়ে আছি কিন্তু দেখছি আমি কাশী গেছি। আবার সুষুপ্তি অবস্থায়

আমাদের দেহ, মন, দুই-ই তখন নিষ্ক্রিয়। উভয়ই তখন স্থির থাকে। তখন ইন্দ্রিয়সকল মনে লয় হয়, তাদের আর কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

বিভিন্ন নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়লে নদীর যেমন কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, এও যেন ঠিক তাই। এই গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবশ্যই মুক্তি বা মোক্ষ নয়—কারণ অজ্ঞানতা তখনো বিদ্যমান। কাজেই সুষুপ্তি ভাঙ্গার পর আমরা যখন জেগে উঠি তখন পূর্বে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে আসি। এইমাত্র লাভ হয় যে, গভীর নিদ্রার পরে জাগ্রত হয়ে আমরা অত্যন্ত সতেজ বোধ করি।

আচার্য শঙ্কর বলেছেন, পূর্বের প্রশ্নগুলি অপরা বিদ্যা সংক্রান্ত। এটাই স্বাভাবিক, প্রথমে আমাদের আগ্রহ থাকে এই শরীর ও জগৎকে ঘিরে। আমরা হয়তো বিজ্ঞান, ইতিহাস, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। এইসব জানা ভাল। কিন্তু এই জ্ঞানই শেষ নয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন অর্থাৎ পরা বিদ্যা লাভ করাই হল প্রকৃত জ্ঞান।

ধীরে ধীরে আমরা এই জাগতিক বিষয় থেকে দূরে সরে যাই, কারণ আমরা অনুভব করি এই দৃশ্যমান জগৎই সব নয়। এই জগতের বাইরেও আরও কিছু আছে যা ইন্দ্রিয়াতীত। এমন কিছু আছে যা এই জগৎকে ধরে রেখেছে। এই বিশ্ব সতত পরিবর্তনশীল। এই ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই জগতের এমন কোন আশ্রয় আছে যা নিত্য এবং অপরিবর্তনীয়। এমন কোন সত্তা অবশ্যই আছেন যা আমাদেরও ধরে রেখেছেন। সেই সত্তাটি কি? সেই অপরিবর্তনীয় সত্তা হল—'আত্মা'।

আত্মা আমাদের বাইরেও আছেন আবার ভেতরেও আছেন। বেদান্ত বলেন—যা বাইরে তাই অন্তরে। সমষ্টির ক্ষেত্রে যা সত্য ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও তা সত্য। যে বিরাট ও বৈচিত্রময় জগৎ বাইরে আছে সেই জগৎই আবার ক্ষুদ্ররূপে আমাদের মনেও আছে। বস্তুত বাহির এবং অন্তর বলে আসলে কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে বেদান্ত একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি পাত্রকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ পাত্রটির ভেতরে জল আছে, আবার বাইরেও আছে। আপাতদৃষ্টিতে পাত্রটি জলকে দুইভাগে ভাগ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে এক জলই পাত্রটির ভিতরে ও বাইরে আছে। ঠিক সেরকমভাবে একই আত্মা এই জগৎকে এবং আমাদের দেহকেও ধরে রেখেছেন।

আত্মা এবং এই দৃশ্যমান জগতের বস্তুসমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে মুণ্ডক উপনিষদ অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সব বস্তুই আত্মা থেকে এসেছে আবার আত্মাতেই ফিরে যাবে। বস্তুসমূহের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই।

তস্মৈ স হোবাচ। যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে॥২

অন্বয়: তস্মৈ সঃ হ উবাচ (তিনি তাঁকে বললেন); গার্গ্য (হে গার্গ্য); যথা অস্তং গচ্ছতঃ অর্কস্য (সূর্য যখন অস্ত যায়); সর্বাঃ মরীচয়ঃ (সমস্ত রশ্মি); এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে একীভবন্তি (এই জ্যোতির্মণ্ডলে এক হয়ে যায়); পুনঃ উদয়তঃ (পুনরায় যখন সূর্য উদিত হয়); তাঃ (সেই কিরণরাশি); পুনঃ প্রচরন্তি (পুনরায় বিকীর্ণ হয়); এবং হ বৈ (একই ভাবে); তৎ সর্বম্ (সব ইন্দ্রিয়); পরে দেবে মনসি (শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে, মনে); একীভবতি (এক হয়ে যায়); তেন (সেই কারণে); তর্হি (সেই মুহূর্তে); এষঃ পুরুষঃ (এই পুরুষ); ন শৃণোতি (শোনে না); ন পশ্যতি (দেখে না); ন জিঘ্রতি (ঘ্রাণ নেয় না); ন রসয়তে (আস্বাদন করে না); ন স্পৃশতে (স্পর্শ করে না); ন অভিবদতে (অভিবাদন করে না); ন আদত্তে (গ্রহণ করে না); ন আনন্দয়তে (ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে না); ন বিসৃজতে (মলমূত্র ত্যাগ করে না); ন ইয়ায়তে (কোথাও গমন করে না); স্বপিতি ([শুধু] নিদ্রা যায়); ইতি আচক্ষতে (তার সম্পর্কে লোকে এই কথা বলে)।

সরলার্থ: পিপ্পলাদ তখন তাঁকে বললেন: হে গার্গ্য, সূর্যাস্তের সময় সূর্যের রশ্মিসকল সূর্যেই ফিরে যায়। কিন্তু সূর্যোদয়ে সেই রশ্মিগুলি পুনরায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল তাদের দেবতা মন, তাতে ফিরে যায় এবং মনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন ইন্দ্রিয়সকল কোন কাজ করে না। এর ফলে সুষুপ্তি অবস্থায় মানুষ (স্থূলদেহ) শোনে না, দেখে না, ঘ্রাণ নেয় না, স্বাদ গ্রহণ করে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, কোন কিছু গ্রহণ করে না, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে না, মলমূত্র ত্যাগ করে না, চলাফেরাও করে না। অন্যেরা তখন তার সম্পর্কে বলে থাকে, 'সে ঘুমিয়ে আছে'।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ বলেন, দিনের বেলা সূর্যের কিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায় তখন সেই কিরণরাশিই আবার সূর্যে ফিরে আসে। একইভাবে, আমরা যখন রাত্রিতে ঘুমাই তখন ইন্দ্রিয়সকল মনে ফিরে যায় (পরে দেবে মনসি একীভবতি)। ইন্দ্রিয়গুলি তখন মনে লীন হয়ে যায়। সেই অবস্থায় চোখ দেখে না, কান শোনে না, জিভ স্বাদ গ্রহণ করে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল তখন কোন কাজ করে না, তারা তখন তাদের সমস্ত কার্যকলাপ মনের কাছে সমর্পণ করে।

এখানে মনকে 'দেব' বলা হয়েছে। অর্থাৎ যা আলো দান করে, যা প্রকাশ করে। 'পর' অর্থ শ্রেষ্ঠ। মনই সকল ইন্দ্রিয়ের নেতা। অর্থাৎ মনই সব ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো
ব্যানোঽন্বাহার্যপচনো যদগার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ॥৩

অন্বয়: এতস্মিন্ পুরে (এই শরীরে যা একটি নগরের সমান); প্রাণাগ্নয়ঃ এব জাগ্রতি (অগ্নিস্থানীয় এ প্রাণই সবসময় জেগে থাকে); এষঃ অপানঃ হ বৈ গার্হপত্যঃ (অপানই গার্হপত্য নামক অগ্নি); ব্যানঃ অন্বাহার্যপচনঃ (ব্যান বায়ুই দক্ষিণাগ্নি); যৎ (যেহেতু); গার্হপত্যাৎ (গার্হপত্য অগ্নি থেকে); প্রণীয়তে (পৃথকরূপে গৃহীত); প্রণয়নাৎ (এই পৃথক করার দ্বারা); প্রাণঃ আহবনীয়ঃ (প্রাণকেই আহবনীয় বলা হয়ে থাকে)।
সরলার্থ: এই দেহ একটি নগরের মতো। আমরা যখন ঘুমোই তখন অগ্নির সমান যে প্রাণ তা জেগে থাকে। অপান হল গার্হপত্য অগ্নি। আর ব্যান হল 'অন্বাহার্যপচনঃ' অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি। কারণ প্রাণকে গার্হপত্য অগ্নি থেকে নেওয়া হয়েছে।
ব্যাখ্যা: এই দেহকে কখনও কখনও পুর বা নগর বলা হয়ে থাকে। কারণ নগরের ভেতর ঢোকার জন্য অনেক দরজা থাকে। শরীরের দরজা বলতে দুটি চোখ, দুটি কান ও নাসারন্ধ্র ইত্যাদি বোঝায়। এই জগৎ সম্পর্কে যা কিছু অভিজ্ঞতা তা আমরা এই দরজার মাধ্যমেই লাভ করে থাকি।

প্রাচীনকালে গৃহস্থরা নির্দিষ্ট কিছু যাগযজ্ঞ করতেন। কোন কোন যন্ত্র প্রতিদিন করা হত আবার কোন কোন যজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সময়ে করা হত। এই যজ্ঞসকল বিশাল, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। আজকাল আর এইসব যাগযজ্ঞ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু উপনিষদ বলেন, এর বিকল্পও আছে। যেমন মানসপূজা অর্থাৎ মনে মনে পূজা করা। আমরা দেবতাকে মনে মনে ফল ফুল ইত্যাদি নানা অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকি। ঠিক তেমনি শ্বাসকার্য এবং প্রাণের অন্যান্য কাজকর্মকে আমরা যাগযজ্ঞ বলে মনে করতে পারি। উপনিষদে 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞের কথা আছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করতে হলে তিন রকমের অগ্নির প্রয়োজন, যথা—গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি (অন্বাহার্যপচনঃ)। গার্হপত্য অগ্নির আগুন কখনও নেভে না। যজ্ঞের সময় গার্হপত্য অগ্নি থেকে আগুন নিয়ে আহবনীয় অগ্নিকে জ্বালানো হয়। অর্থাৎ অন্য অগ্নি থেকে এই আগুন নেওয়া হয় বলে এর নাম আহবনীয়। দক্ষিণাগ্নিও গার্হপত্য থেকে নেওয়া হয়। যজ্ঞবেদীর দক্ষিণ ভাগে থাকে বলে এর নাম দক্ষিণাগ্নি।

একইভাবে আমাদের দেহে প্রাণাগ্নি সবসময় জ্বলতে থাকে অর্থাৎ সবসময়ই তা সক্রিয়; যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি ততক্ষণ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং ইন্দ্রিয়সকল প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকে। অপান হল শ্বাসবায়ু ত্যাগ করা। অপানবায়ু যেহেতু সবসময়ই রয়েছে এবং এটা অপরিহার্য তাই একে গার্হপত্যের সাথে তুলনা করা হয়। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন প্রাণবায়ু অপানবায়ুর জায়গা দখল করে এবং মুখ ও নাসাপথে বেরিয়ে আসে। এই কারণেই প্রাণবায়ুকে আহবনীয় অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ব্যানকে দক্ষিণাগ্নিও বলা হয় কারণ ব্যান দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয় (যা দক্ষিণদিকরূপে মনে করা হয়)।

যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি প্রাণের এই অগ্নিসকল তখনও কাজ করে চলে, মনে হয় আমরা যেন যজ্ঞ করছি। আমাদের শরীরের নানা ইন্দ্রিয় ও তাদের কার্যকলাপকে অন্তরস্থ আত্মার (আমাদের সকলের মধ্যে যে আত্মা আছেন) উপাসনা করছি বলে মনে করতে হবে।

এখানে একটা আশ্চর্য কথা বলা হয়েছে। যদি আমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে থাকি তখন আমার আর কোন প্রার্থনা, যাগযজ্ঞ, মূর্তিপূজা ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। এমনকি তীর্থভ্রমণ ও শাস্ত্রপাঠেরও তখন আর দরকার হয় না। সমগ্র জীবনই প্রার্থনায় পরিণত হয়। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক এই দুই-এর মধ্যে তখন কোন ভেদ থাকে না। সবই তখন আধ্যাত্মিক। আমাদের শ্বাসক্রিয়াও তখন পূজায় পরিণত হয়।

যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ। স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি॥৪

অন্বয়: যৎ (যেহেতু); এতৌ উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসৌ (এই প্রশ্বাস নিঃশ্বাস); আহুতি (দুটি আহুতি); সমং নয়তি (সমানভাগে বণ্টন করে); ইতি (এই কারণে); সঃ সমানঃ (সেই সমানই [হোতা]); মনঃ হ বাব যজমানঃ (মনই সেই ব্যক্তি যার জন্য যজ্ঞ করা হয়); উদানঃ এব ইষ্টফলম্ (এই যজ্ঞের ফল হল উদান); [সেইজন্য] সঃ (সেই [এই উদান]); এনং যজমানম্ (এই মনরূপ যজমানকে); অহরহঃ (প্রতিদিন [শ্বাসহীন গভীর নিদ্রায়; সুষুপ্তিতে]); ব্রহ্ম গময়তি (ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়)।

সরলার্থ: সমান হল হোতা বা পুরোহিত। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে হোতা যেমন আহুতিকে দুটি সমান ভাগে দান করেন ঠিক সেরকম আমাদের শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে সমানবায়ুও নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসকে সমপরিমাণে ভাগ করে। মন সেই ব্যক্তি যার জন্য যজ্ঞ করা হয়। উদান অভীষ্ট ফল, কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় উদানই মনকে ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: এখানে উপনিষদ বলছেন, সমানবায়ু যেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞের হোতা বা পুরোহিত। সমান নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াকে দেখাশোনা করে। এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞে পুরোহিত যে দুটি আহুতি দান করেন তার সাথে তুলনা করা হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে পুরোহিত সমানভাবে আহুতি দুটি দান করেন। অনুরূপভাবে, শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য সমানবায়ু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে সমতা বজায় রাখে।

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর আর অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করার দরকার হয় না। তাঁর শরীরে আপনা আপনিই এই যজ্ঞ চলতে থাকে। এরকম ব্যক্তি কিন্তু অলস নন। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তিনি কাজ করে চলেন। মনই তাঁর যজমান (অর্থাৎ যার জন্য যজ্ঞ করা হয়) এবং তা সবসময়ই সক্রিয়। মানুষ স্বর্গলাভের আশায় এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করে থাকেন। কিন্তু আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা স্বর্গলাভে ইচ্ছুক নন, আত্মজ্ঞান লাভ করাই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ তাঁদের মনের অধীন। মন এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেই তাকে 'যজমান' বলা হয়।

এই যাগযজ্ঞ ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন হলে উদানবায়ু কার্যকরী হয়ে ওঠে। উদানবায়ুকে যজ্ঞের যে ফল তার সঙ্গে তুলনা করা হয়। উদানবায়ুই মন ও ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় সুষুপ্তি। যজমানের পক্ষে এ স্বর্গলাভের সামিল।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং
শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ
প্রত্যনুভবতি দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চাননুভূতং চ
সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি॥৫

অন্বয়: এষঃ দেবঃ (এই দেবতা; মন); অত্র স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থা); মহিমানম্ অনুভবতি (তিনি তাঁর শক্তি অনুভব করেন); যৎ দৃষ্টং দৃষ্টম্ অনুপশ্যতি (যা কিছু তিনি আগে দেখেছেন তা তিনি আবার দেখেন); শ্রুতং শ্রুতম্ এব অর্থম্ অনুশৃণোতি (আগে যা শুনেছেন তা তিনি পুনরায় শোনেন); দেশদিগন্তরৈঃ চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি (বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেশে যা তিনি অনুভব করেছেন তা তিনি পুনরায় অনুভব করেন); দৃষ্টম্ অদৃষ্টং চ (দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট); শ্রুতম্ অশ্রুতং চ (শ্রুত অথবা অশ্রুত); অনুভূতং চ অননুভূতং চ (অনুভূত অথবা অননুভূত); সৎ চ অসৎ চ (সত্য বা মিথ্যা); সর্বং পশ্যতি (সব দর্শন করেন); সর্বঃ পশ্যতি (তিনিই সব হয়েছেন এই ভাবেই তিনি সব দেখেন)।

সরলার্থ: স্বপ্নবস্থায় আমাদের মন তার নিজের মহৎ শক্তিকে অনুভব করে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা দেখে থাকি স্বপ্নে তা ধরা পড়ে। ঠিক সেরকম, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা শুনে থাকি স্বপ্নে যেন তাই শুনতে পাই। আমরা হয়তো বহু জায়গায় বা বহু দেশে গিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু স্বপ্নে যেন আমরা সেই সব স্থানেই আবার যাই। যা দেখেছি বা দেখিনি, যা শুনেছি বা শুনিনি, যা অনুভব করেছি বা করিনি, সত্য এবং অসত্য—এমন সব বস্তুই আমরা দেখে থাকি। সবকিছুর সঙ্গেই আমরা তখন একাত্মতা অনুভব করি।

ব্যাখ্যা: এখানে 'দেব' শব্দটি দ্বারা মনকে বোঝানো হয়েছে। আমরা সকলেই মনের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। যেমন, মন খুব কম সময়ের মধ্যে অনেক দূরের পথ বেড়িয়ে আসতে পারে। এখন হয়তো আমরা কলকাতায় আছি কিন্তু আমাদের মন হয়তো কাশীতে রয়েছে। এমন সময় কেউ যদি আমাকে ডাকে সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার মন কলকাতাতে ফিরে আসে। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নবস্থাতেই মন তার শক্তিকে অনুভব করে। জাগ্রত অবস্থায় যেসব জায়গায় আমরা গেছি স্বপ্নে যে কেবল সেসব জায়গা দেখি তা নয়। এমন সব স্থানেও মন আমাদের নিয়ে যায় যা আমরা আগে কখনও দেখিনি। মাঝে মাঝে আমাদের এমন সব অভিজ্ঞতাও হয় যা আগে কখনও হয়নি। স্বপ্নে আমরা সৎ অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে এবং অসৎ অর্থাৎ যা কাল্পনিক এ দুই-ই দেখে থাকি (সৎ চ অসৎ চ)। মন সর্বশক্তিমান, সবকিছু করতে সক্ষম।

এসবের ব্যাখ্যা করা কঠিন। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমরা হয়তো আগের জন্মে সেইসব স্থান, সেইসব বস্তুকে দেখেছি, অথবা এই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা কল্পনামাত্র। কিংবা হয়তো আমাদের অপূর্ণ বাসনাসকলই স্বপ্নে ধরা পড়ে। মন যেন একটি হ্রদ। আমাদের মনে নানারকমের বাসনা আছে। আবার মনের গভীরে এমন বহু আকাঙ্ক্ষা থাকে যার সম্পর্কে আমরা আদৌ সচেতন নই। এইসব কামনা-বাসনাই স্বপ্নে ধরা দেয়।

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ
তদৈতস্মিঞ্শরীর এতৎ সুখং ভবতি॥৬

অন্বয়: সঃ (এই মন); যদা (যখন); তেজসা অভিভূতঃ ভবতি (আত্মার আলোয় অভিভূত); অত্র (স্বপ্নহীন এই নিদ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে); এষঃ দেবঃ (মন); স্বপ্নান্ ন পশ্যতি (স্বপ্ন দেখে না [কারণ যে দ্বারপথে বাসনাসমূহ আমাদের মনে প্রবেশ করে তখন সাময়িকভাবে সেই দরজা বন্ধ থাকে]); অথ তদা (সেই সময় [অর্থাৎ স্বপ্নহীন নিদ্রায় বা

সুষুপ্তিতে]); এতস্মিন্ শরীরে (এই শরীরে); এতৎ সুখং ভবতি (সমস্ত শরীরে এবং মনে এক প্রশান্তি বিরাজ করে)।

সরলার্থ: আত্মার মহিমায় মন যখন অভিভূত অর্থাৎ মনের মধ্যে বাসনা প্রবেশের দরজা যখন বন্ধ, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় মন কোন স্বপ্ন দেখে না। এই সুষুপ্তি ভাঙ্গার পর আমাদের দেহ ও মন খুব সতেজ হয়।

ব্যাখ্যা: জাগ্রত অবস্থায় আমাদের শরীর, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি বা স্বপ্ন দেখি তখন আমাদের শরীর নিষ্ক্রিয় থাকলেও মন কিন্তু তখনও কাজ করে চলে। এমন স্বপ্নও আমরা দেখি যে, আমরা অনেক কাজ করছি। কিন্তু আসলে আমি তো তখন বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্তু মনে করছি কত কাজ করছি। এমনকি এটা যে অবাস্তব কল্পনা, একথা আমাদের একবারও মনে হয় না।

কখনও কখনও গভীর নিদ্রায় আমাদের মন এবং শরীর কোনটাই কাজ করে না। তখন কোন কিছু আছে বলেই আমাদের মনে হয় না। আবার ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝে উঠতে পারি না আমরা কোথায় আছি বা তখন দিন না রাত অর্থাৎ চারপাশের সবকিছুকে বুঝে উঠতে আমাদের সময় লাগে। যদিও তখন আমরা অত্যন্ত সতেজ এবং প্রসন্ন বোধ করি। তাহলে তখন কি ঘটেছিল? মৃত্যু? না। এরকম অবস্থাকে বলা হয় সুষুপ্তি।

বেদান্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বরূপত আত্মা দুই নয়, এক ও অদ্বিতীয়। পরমাত্মা যখন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে যুক্ত তখনই তা জীবাত্মা। নামরূপের বিভিন্নতার জন্য আমরা নিজেদেরকে একে অপরের থেকে আলাদা বলে মনে করি। আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো লম্বা আবার কেউ বেঁটে, কেউ ফরসা কেউ বা কালো, আবার কেউ ভারতীয় কেউ বা বিদেশী—এরকম থাকতেই পারে। আমাদের মধ্যে এই যে পার্থক্য এর ফলে আমরা নিজেদের একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের মধ্যে একই সত্তা রয়েছে। সেই অনন্ত সত্তাই হলেন পরমাত্মা। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন নামরূপের দ্বারা এই এক পরমাত্মাই চিহ্নিত হয়েছেন। এবং তখন তাঁকে বলা হয় জীবাত্মা।

বেদান্ত বলেন, সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বিষয়বোধ অর্থাৎ কোন দুই বোধ থাকে না। যে অজ্ঞানতার জন্য আমরা নিজেদের দেহ এবং মনের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি, সেই অজ্ঞানতা তখন সাময়িকভাবে দূর হয়। এবং সবকিছু তখন চৈতন্যময় হয়ে ওঠে।

জাগ্রতাবস্থাতেও আমাদের মধ্যে চৈতন্য থাকে। হয়তো তা খুবই সামান্য, যার দ্বারা আমরা দেখি, শুনি, বা কথা বলি। এ যেন একটি বাতিকে জ্বালাবার জন্য অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মতো। কিন্তু উপনিষদ বলেন, সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা চৈতন্যের

আলোয় অভিভূত হই (তেজসা অভিভূতঃ)। সেই সময় জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। জীবাত্মার আলাদা কোন অস্তিত্ব বোধ থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় মানুষ পরিপূর্ণ আনন্দ ও সুখ অনুভব করে।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥৭

অন্বয়: সোম্য (হে সৌম্য); সঃ (সে একটি দৃষ্টান্ত); যথা (ঠিক যেমন); বয়াংসি (পাখীরা); বাসোবৃক্ষম্ (যে গাছে তারা বাস করে); সংপ্রতিষ্ঠন্তে (ফিরে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে); এবং হ বৈ (একই প্রকারে); তৎ সর্বম্ (সব বস্তু); পরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে (পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়)।

সরলার্থ: হে সৌম্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পাখীরা যেমন গাছে তাদের বাসার দিকে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি এ জগতের সবকিছুই পরমাত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: সুষুপ্তিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয় এবং আমরা তখন আনন্দ অনুভব করি। কিন্তু এটি শুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা নয় এবং এর মাধ্যমে আমরা মুক্তিলাভও করতে পারি না। সুষুপ্তি অবস্থা, সমাধি অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য অবস্থার মতো হলেও দুটি অবস্থা পুরোপুরি এক নয়। সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একটা ভেদ থাকে। এই ভেদই হল অজ্ঞানতা। এই অবস্থাতেও আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতা থাকে কিন্তু তখন তা নিষ্ক্রিয়। সুষুপ্তি ভাঙ্গার পর আমরা যখন জেগে উঠি তখন আমরা আবার সেই আগের অবস্থাতেই ফিরে যাই। অর্থাৎ নিদ্রার পূর্বে যেখানে ছিলাম। যেখানে সংগ্রাম শেষ হয়েছিল আবার সেখান থেকেই আমাদের সংগ্রাম শুরু হয়। কারণ আত্মা সম্পর্কে আমরা তখনও অজ্ঞ। সুষুপ্তিতে দুই বোধ সাময়িকভাবে দূর হয় বটে কিন্তু অজ্ঞানতা তখনও পুরোমাত্রায় থাকে।

সুষুপ্তির অবস্থা বোঝাতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অনেকক্ষণ যাবৎ পাখীরা হয়তো উড়ে বেড়াচ্ছে। উড়তে উড়তে ক্লান্ত হওয়ায় তারা বাসায় ফিরে যাবে স্থির করল। একই কথা আমাদের বেলাতেও সত্য। পাখীদের মতো আমরাও চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। তারপর একসময়ে আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যেতে চাই। সুষুপ্তিতে আমরা পরমাত্মার সাথে মিলিত হই এবং আনন্দ অনুভব করে থাকি।

আচার্য শঙ্করের মতে, জাগ্রত অবস্থায় আমরা অবিদ্যা, কামনা-বাসনা এবং কর্মের অধীন। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা আছে বলেই আমাদের কামনা-বাসনা আছে। এই বাসনা

থেকেই কর্মের সৃষ্টি। অর্থাৎ অপূর্ণ বাসনা মেটাতেই আমরা কাজ করে থাকি। আমরা ভাল বা খারাপ দু-রকমেরই কাজ করতে পারি। ভাল কাজ করলে আমরা ভাল ফল লাত করি। আবার খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল ভোগ করি। অর্থাৎ আমরা কর্মফলের অধীন। এভাবেই আমরা কার্য-কারণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ি।

সুষুপ্তি অবস্থায় কামনা-বাসনা অর্থাৎ দুই বোধ সাময়িকভাবে দূর হয় এবং আমাদের দেহ ও মন তখন কোন কাজ করে না। আমাদের উপাধিসমূহ যেমন 'অহংতা' (আমি) আর মমতা (আমার) ইত্যাদি আমাদের সীমাবদ্ধ করে। এইসব উপাধির জন্য আমরা নিজেদেরকে লম্বা-বেঁটে, সুখী-অসুখী বলে মনে করে থাকি। সুষুপ্তিতে এইসব বোধ থাকে না। শঙ্করাচার্যের মতে সুষুপ্তিতে আমরা 'অদ্বয়ম্ একম্ শিবং শান্তম্' অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই অবস্থায় কোন দুই বোধ থাকে না (অদ্বয়ম্)। থাকে কেবল এক চৈতন্য। এবং এই চৈতন্য শান্তি (শান্তম্)। আমাদের অজ্ঞানতাপ্রসূত এই জগতের অস্তিত্ব তখন লোপ পায়।

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ
বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ শ্রোত্রং চ
শ্রোতব্যং চ ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ রসশ্চ রসয়িতব্যং চ ত্বক্ চ
স্পর্শয়িতব্যং চ বাক্ চ বক্তব্যং চ হস্তৌ চাদাতব্যং
চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ পদৌ চ গন্তব্যং চ
মনশ্চ মন্তব্যং চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চাহংকারশ্চাহংকর্তব্যং চ চিত্তং চ
চেতয়িতব্যং চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ॥৮

অন্বয়: পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ (পৃথিবী এবং তার সূক্ষ্ম রূপ); আপঃ চ আপোমাত্রা চ (জল এবং তার সূক্ষ্ম রূপ); তেজঃ চ তেজোমাত্রা চ (অগ্নি এবং তার সূক্ষ্ম রূপ); বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ (বায়ু এবং তার সূক্ষ্ম রূপ); আকাশঃ চ আকাশমাত্রা চ (আকাশ এবং তার সূক্ষ্ম রূপ); চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং চ (চোখ এবং চোখ যা দেখে); শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ (কান এবং কান যা শোনে); ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ (নাক এবং নাক যা গন্ধ গ্রহণ করে); রসঃ চ রসয়িতব্যং চ (জিভ এবং জিভ যা স্বাদ গ্রহণ করে); ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ (ত্বক এবং ত্বক যা স্পর্শ করে); বাক্ চ বক্তব্যং চ (বাগিন্দ্রিয় এবং বক্তব্য বিষয়); হস্তৌ চ আদাতব্যং চ (হাত এবং হাত যা গ্রহণ করে); উপস্থঃ চ আনন্দয়িতব্যং চ (উপস্থ এবং তার ভোগ্য বিষয়); পায়ুঃ চ বিসর্জয়িতব্যং চ (পায়ু এবং মলমূত্রাদি বর্জন); পাদৌ চ গন্তব্যং চ (পা এবং তার গন্তব্যস্থল); মনঃ চ মন্তব্যং চ (মন এবং তার মনন); বুদ্ধিঃ চ বোদ্ধব্যং চ (বুদ্ধি এবং বুদ্ধির

বিষয়); অহঙ্কারঃ চ অহঙ্কর্তব্যং চ (অহঙ্কার এবং তার বিষয়); চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ (স্মৃতি এবং তার বিষয়); তেজঃ চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ (জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়); প্রাণঃ চ বিধারয়িতব্যং চ (প্রাণ এবং প্রাণ যা ধারণ করে) [এই সবকিছু পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে]।

সরলার্থ: পৃথিবী ও তার সূক্ষ্ম রূপ (গন্ধ), জল ও তার সূক্ষ্ম রূপ (স্বাদ বা রস), অগ্নি ও তার সূক্ষ্ম রূপ (রূপ), বায়ু ও তার সূক্ষ্ম রূপ (স্পর্শ), আকাশ ও তার সূক্ষ্ম রূপ (শব্দ), চোখ এবং চোখ যা দেখে, কান এবং কান যা শোনে, নাক এবং নাক যা গন্ধ নেয়, জিভ এবং জিভ যা স্বাদ গ্রহণ করে, ত্বক এবং ত্বক যা স্পর্শ করে, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হাত এবং হাত যা গ্রহণ করে, জননেন্দ্রিয় ও তার ভোগ্য বিষয়, পায়ু এবং মলমূত্রাদি বর্জন, পা এবং তার গন্তব্যস্থল, মন এবং তার মনন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধির বিষয়, অহঙ্কার ও তার বিষয়, স্মৃতি এবং তার বিষয়, জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়, প্রাণ ও প্রাণ যা ধারণ করে—এই সবকিছুই পরমাত্মাতে বিলীন হয়।

ব্যাখ্যা: হিন্দুদর্শন অনুসারে, এই জগৎ পাঁচটি উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলি হল: ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। এই উপাদানগুলির আবার দুটি দিক আছে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম। উপাদানগুলি বিভিন্ন মাত্রায় একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করে।

পৃথিবী স্থূলরূপে পাঁচটি গুণবিশিষ্ট—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে পৃথিবী একটি গুণবিশিষ্ট এবং তা হল গন্ধ।

সূক্ষ্ম উপাদান থেকে স্থূল উপাদানে পরিণত হওয়ার উপায়টি হল: প্রত্যেকটি উপাদান দুই ভাগে বিভক্ত। ধরা যাক, পৃথিবী এই উপাদানটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তারপর এর (পৃথিবী উপাদান) এক ভাগ নিয়ে, তার সঙ্গে চারটি উপাদানের প্রত্যেকটির থেকে এক অষ্টমাংশ নিয়ে যোগ করা হল, তখন এই সূক্ষ্ম পৃথিবী স্থূল পৃথিবীতে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি উপাদানই সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে পরিণত হবে যদি উপাদানগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর উপাদানগুলির সাথে মিলিত হয়।

সূক্ষ্ম অবস্থায় উপাদানগুলিকে বলা হয় 'তন্মাত্র' অর্থাৎ শুধু সেটিই থাকে। একে 'অপঞ্চীকৃত'ও বলা হয়ে থাকে। 'অপঞ্চীকৃত' যা অন্য কোন উপাদানের সাথে মিলিত নয় অর্থাৎ যা অবিমিশ্র। এই অবস্থায় উপাদানগুলিকে শুধুমাত্র তার গুণের দ্বারা চেনা যায়; যেমন গন্ধের দ্বারা পৃথিবীকে, রস বা স্বাদের দ্বারা জলকে, রূপের দ্বারা অগ্নিকে, স্পর্শ দ্বারা বায়ুকে, এবং শব্দের দ্বারা আকাশকে। সমস্ত উপাদানগুলির যোগ বিয়োগই হচ্ছে এই দৃশ্যমান জগৎ।

আমাদের ইন্দ্রিয় আছে এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ও আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চোখ এবং চোখের বিষয়, অর্থাৎ চোখ দিয়ে আমরা যেসব বস্তু দেখে থাকি।

কিন্তু আমাদের অবশ্যই অন্তরিন্দ্রিয়ও আছে যা বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই অন্তরিন্দ্রিয় হল মন। মনের কাজ কি? মন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় বিচার করে দেখে। মন প্রত্যেকটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে। এক অবস্থায় মনকে বুদ্ধি বলা হয়ে থাকে। আমাদের কি করা উচিত বুদ্ধিরূপে মনই তা স্থির করে।

মনকে আবার হৃদয় বলেও উল্লেখ করা হয়। হৃদয়রূপে এই মনেই আমাদের অনুভূতি, আবেগ ও অভিজ্ঞতাসমূহ সঞ্চিত থাকে। মনের আর একটি দিক হল অহঙ্কার অর্থাৎ আমিত্ববোধ। এই 'অহংতা'র ফলেই আমরা নিজেদেরকে 'আমি ধনী, আমি বিদ্বান' ইত্যাদি মনে করে থাকি।

তেজঃ কথার অর্থ হল যা আলোকিত করে। প্রাণঃ কথার অর্থ হল যা আমাদেরকে ধারণ করে রাখে। এখানে প্রাণ বলতে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভকে বোঝানো হয়েছে।

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেহক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥৯

অন্বয়: এষঃ (এই জীবাত্মা); হি (নিশ্চিতভাবে); দ্রষ্টা (যিনি দেখেন); স্প্রষ্টা (যিনি স্পর্শ করেন); শ্রোতা (যিনি শোনেন); ঘ্রাতা (যিনি ঘ্রাণ গ্রহণ করেন); রসয়িতা (যিনি আস্বাদন করেন); মন্তা (যিনি চিন্তা করেন); বোদ্ধা (যিনি প্রত্যক্ষ করেন); কর্তা (কর্তা); বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ (জীবাত্মা যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচালনা করেন); সঃ (তিনি, সেই জীবাত্মা); পরে (শ্রেষ্ঠ); অক্ষরে (অক্ষর, নিত্য); আত্মনি (পরমাত্মায়); সম্প্রতিষ্ঠতে (বাস করেন)।

সরলার্থ: যিনি দেখেন, স্পর্শ করেন, শোনেন, স্বাদ গ্রহণ করেন, চিন্তা করেন, অনুভব করেন এবং যিনি কর্তা ও ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক তিনিই জীবাত্মা বলে পরিচিত। এই জীবাত্মাই অক্ষর পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা: 'এষঃ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা'— এই শ্লোকের দ্বারা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। 'এষ' কথার অর্থ হল এই অর্থাৎ জীবাত্মা, যখন আমি দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, ঘ্রাণ গ্রহণ করি, তখন আমার ইন্দ্রিয়সকল সক্রিয় থাকে। আমি চিন্তা করতে পারি, বুঝতে পারি এবং 'আমি কর্তা' এই বোধও আমার থাকে (মন্তা বোদ্ধা কর্তা)। এ সমস্ত মনেরই কাজ, 'কর্তা' বলতে বোঝায় 'আমিই কাজ করছি', 'এই সমস্ত কিছুই আমার' 'আমিই প্রভু'। অর্থাৎ আমি (অহংতা) ও আমার (মমতা) বোধই হল কর্তা।

কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন সবেরই একদিন না একদিন বিনাশ ঘটবে। যেহেতু আমরা নিজেদেরকে শরীর এবং মনের সাথে অভিন্ন ভাবি সেহেতু মনে করি আমাদেরও বিনাশ হবে—আমরা নিজেদের নির্দিষ্ট দেহ ও মনের অধীন বলে মনে করি। এর ফলে আমরা প্রত্যেকেই আলাদা ব্যক্তিতে পরিণত হই। এই চিন্তাই আমাদের বন্ধনের কারণ। কিন্তু এই জীবাত্মা যখন পরব্রহ্মে পরমাত্মাতে মিলিত হয় তখন তিনি সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম। যার ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয় নেই তাই অক্ষর। এই পরমাত্মা অপরিবর্তিত, চিরন্তন এবং নিত্য। 'পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে'— আত্মা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 'পর অক্ষর'— এই হল আমাদের যথার্থ অবস্থা, আমাদের প্রকৃত সত্তা। এই অবস্থায় সমস্ত ভেদ ঘুচে যায়। আমরা তখন পরমাত্মাতে লীন হয়ে যাই এবং মুক্তি লাভ করি।

এ যেন সূর্য এবং তার রশ্মি। দিনের বেলায় সূর্যের রশ্মিগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই রশ্মিসকল সূর্যের কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু এগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে। আবার সন্ধ্যাবেলায় এই রশ্মিসকল যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যায়। অর্থাৎ সূর্যের সাথে এক হয়ে যায়। ঠিক তেমনি, আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখী। কিন্তু যখন আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে ভেতরের দিকে চালনা করতে পারব, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল যখন অন্তর্মুখী হবে তখন সেখানে কেবলমাত্র পরমাত্মাই বিরাজ করবেন।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং
বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ॥১০

অন্বয়: সোম্য (হে সৌম্য); যঃ হ বৈ (তিনি-ই যিনি); তৎ (সেই); অচ্ছায়ম্ (উজ্জ্বল); অশরীরম্ (শরীরহীন); অলোহিতম্ (লাল নয় অর্থাৎ বর্ণহীন); শুভ্রম্ (বিশুদ্ধ); অক্ষরম্ (অক্ষয়); বেদয়তে (জানেন); সঃ পরম্ অক্ষরম্ এব প্রতিপদ্যতে (তিনি পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যান); যঃ তু (তিনি—যিনি) [এই জানেন]; সঃ (তিনি); সর্বজ্ঞঃ (সবকিছু জানেন); সর্বঃ ভবতি (সকলের সাথে এক হয়ে যান); তৎ এষঃ শ্লোকঃ (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে)।

সরলার্থ: হে সৌম্য, আত্মা নিরঞ্জন, নামরূপহীন, বর্ণহীন,শুদ্ধ এবং নিত্য। যিনি এই আত্মাকে জানেন তিনি আত্মাতে মিলিত হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমর। এরকম

ব্যক্তি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সকলের সঙ্গে এবং সবকিছুর সাথে একাত্মতা অনুভব করে থাকেন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: 'পরম' অর্থাৎ সর্বোচ্চ অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে একাত্মতা অনুভব করে। বর্তমানে আমরা নিজেদেরকে রক্তমাংসের দেহ বলে মনে করে থাকি। কিন্তু এই দেহের ক্ষয় অনিবার্য এবং একদিন তা ধ্বংস হয়ে যাবেই। তবে আমরা এরকম ভাবি কেন? যে আত্মা কোন শর্তের অধীন নন এবং নিত্যমুক্ত তাঁকে আমরা দেহ বলেই বা ভুল করি কেন? অজ্ঞানতার জন্য আমরা এমন ভুল করে থাকি। আত্মা সার্বভৌম। আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রভু। কিন্তু এই প্রভুই নিজেকে দাস বলে মনে করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সিংহশাবকের গল্প বলতেন। শাবকটি একটি মেষের দলের সঙ্গে থাকত। মেষদের সাথে থাকতে থাকতে সে নিজেকে মেষ বলেই মনে করত এবং মেষের মতো হাবভাব করত। একদিন সেখানে একটি সিংহ এসে উপস্থিত। সিংহটি তখন এ মেষ-সিংহটির ঘাড় ধরে একটি পুকুরের ধারে নিয়ে গেল। জলে মেষ-সিংহটির যে ছায়া পড়েছে তা দেখিয়ে, সিংহটি তাকে বলল: দ্যাখ, তুমি আর আমি এক; তুমিও সিংহ। গুরু এই কাজই করে থাকেন। তিনি আমাদের এই শিক্ষাই দেন। 'তৎ ত্বম্ অসি'— অর্থাৎ তুমিই সেই। তুমিই ব্রহ্ম। আমরা সকলেই এই শুভমুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে আছি, যখন আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারব।

আমরা নিজেদের সম্পর্কে তখন কি আবিষ্কার করি? 'অচ্ছায়ম্'— এর আক্ষরিক অর্থ হল ছায়াহীন। কিন্তু এখানে এই শব্দটির সাহায্যে বোঝানো হয়েছে আত্মা দেহের (অবস্থার) পরিবর্তন ও দৈহিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। আমাদের শরীর যখন সুস্থ থাকে তখন আমরা বলে থাকি, আমি ভাল আছি। আবার শরীর যখন অসুস্থ, হয়তো কোন রোগে ভুগছি তখন বলে থাকি, আমি ভাল নেই। এই সব অসম্পূর্ণতা আসে অজ্ঞানতা থেকে। এসবই মোহ। আমরা তখন মোহগ্রস্ত। কেউ যেন আমাদেরকে সম্মোহিত করেছে, যার জন্য আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় ভুলে গেছি। সেসময়ে কেউ যদি এসে আমাকে বলেন যে, 'তুমিই ব্রহ্ম—তুমি সব বন্ধন থেকে মুক্ত, তুমি কখনও বদ্ধ ছিলে না'; তখন আমি বলে উঠি : 'এসব বাজে কথা, আমি সবসময়ই বদ্ধ, আমি কখনও মুক্ত নই। আমার এই দেহ আছে, এই মন আছে।' এই সব অসম্পূর্ণতাকে আমরা সত্য বলে মনে করি এবং ভাবি এই দেহ-মনই হল আমাদের প্রকৃত সত্তা।

কিন্তু যখন আমি আত্মজ্ঞান লাভ করি তখন উপলব্ধি করি আমি 'অশরীরম্'। অর্থাৎ আমার কোন দেহ নেই। এই দেহ যেন একটি জামা। যে জামাটি আমি পরে আছি সেই

জামাটি তো কখনও ‘আমি’ নই; জামাটি আমার উপর আরোপিত মাত্র। আমি যেমন জামাটিকে বদলাতে পারি ঠিক তেমনি এই দেহকেও আমি ত্যাগ করতে পারি।

‘অলোহিতম্’ কথার আক্ষরিক অর্থ হল যা লাল নয়। আত্মা বর্ণহীন। অর্থাৎ আত্মা গুণ বা উপাধিবর্জিত, নির্গুণ। লাল-কালো, ভাল-খারাপ, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূখ এসবই উপাধিমাত্র। দেশ, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি উপাধি দিয়ে আমরা নিজেদেরকে খুব সংকীর্ণ করে ফেলি। এই কারণেই উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন অচ্ছায়ম্, অশরীরম্, অলোহিতম্ ইত্যাদি। উপনিষদ বলেন, আত্মা এটি নয়, আত্মা ওটি নয় অর্থাৎ নেতি, নেতি।

তারপরে উপনিষদ বলছেন, যখন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারব, আমাদের সত্য পরিচয় কি তা জানতে পারব তখন আমাদের অজানা আর কিছুই থাকবে না। সেটা কিভাবে সম্ভব? যখন আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করি তখন আমরা আবিষ্কার করে থাকি ঘরের কীটের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন আমাদের মধ্যেও সেই একই আত্মা রয়েছেন। এ কীটটির মধ্যেও আমি আবার জঙ্গলের হাতিটির মধ্যেও আমি। অর্থাৎ ‘আমি’ই সর্বত্র রয়েছি। এবং এই আমিই সবকিছু হয়েছি। ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’— ‘আমি’ই ব্রহ্ম। ‘আমি’ই সব, ‘আমি’ ছাড়া আর কিছুই নেই। এক আত্মাই বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। নামরূপের বিভিন্নতার জন্যই আমরা বহু দেখে থাকি।

আমাদের প্রত্যেকেরই নাম এবং রূপ (অর্থাৎ শরীর) আছে। নামরূপের বিভিন্নতার জন্যই আমরা নিজেদেরকে একে অপরের থেকে আলাদা বলে মনে করি। কিন্তু এসবই উপাধিমাত্র যা আত্মার উপর আরোপিত। যদি এই উপাধিসকল সরিয়ে নেওয়া যায় তবে যা অবশিষ্ট থাকে তা হল শুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, মানুষ-পশু অর্থাৎ সকলের মধ্যে একই পরমাত্মা রয়েছেন।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্য সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ ইতি॥১১

অন্বয়: সোম্য (হে সৌম্য); বিজ্ঞানাত্মা (জীবাত্মা [যিনি সবসময় সচেতন]); প্রাণাঃ (দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক); ভূতানি চ (উপাদানসমূহ যেমন পৃথিবী); সর্বৈঃ দেবৈঃ সহ (সকল ইন্দ্রিয়সহ); যত্র (যার মধ্যে অবিনাশী আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা); সম্প্রতিষ্ঠন্তি (বিশ্রাম গ্রহণ করে); তৎ অক্ষরম্ (সেই পরমাত্মা); যঃ তু বেদয়তে (যিনি জানেন); সঃ (তিনি); সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ); সর্বম্ এব আবিবেশ (সকল বস্তুতে প্রবেশ করেন)।

সরলার্থ: হে সৌম্য, সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ও তার ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল, এবং উপাদানসমূহ অক্ষর পরমাত্মায় বিশ্রাম গ্রহণ করে। জাগ্রত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি পরমাত্মার সাথে নিজেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন তখন তিনি নিখিল জগতের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন এবং সবকিছুর মধ্যে তিনিই বিরাজ করেন।

ব্যাখ্যা: আমাদের দেহ এবং মনের নানা কার্যকলাপের উৎস হলেন এই পরমাত্মা। বিজ্ঞানাত্ম হল চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা। এখানে 'দেব' শব্দটির দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে। 'দেব' কথার অর্থ হল যা প্রকাশ করে। আমার চোখ আছে বলেই আমি তোমাকে দেখতে পাই। চোখ দিয়েই আমরা সবকিছুকে দেখে থাকি। একইভাবে, কান আছে বলেই আমরা শুনতে পাই। এখানে 'প্রাণা' শব্দটির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতাদের বোঝানো হয়েছে। 'ভূতানি' হল উপাদানসমূহ, যেমন— ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। আমাদের দেহ এই পাঁচটি উপাদানের সমষ্টি। উপনিষদ বলেন যে, জীবাত্মার এইসব উপাদানগুলি পরমাত্মায় স্থিত। পরমাত্মাই এদেরকে ধারণ করে আছেন। আবার পরমাত্মাই এ সবের বিশ্রাম স্থান।

এই এক ও অভিন্ন পরমাত্মাই আমাদের সকলের মধ্যে আছেন। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা এই পরমাত্মা নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন, কিন্তু তিনি সার্বভৌম। তিনি যেন রাজপ্রাসাদে সভাসদ্ পরিবেষ্টিত সম্রাট। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন হল আত্মার সভাসদ্‌বর্গ।

যখন আমি পরমাত্মার সাথে অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারব তখন আমিই 'সর্বম্'। অর্থাৎ তখন সবকিছুই আমি। কোন জলবিন্দু সমুদ্রে গিয়ে পড়লে জলবিন্দুর যেমন কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, সমুদ্রের সাথে মিলেমিশে তা একাকার হয়ে যায়, এও যেন ঠিক তাই। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সসীম অসীম হয়ে যায়। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়।

এখানেই প্রশ্ন উপনিষদের চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত।

পঞ্চম প্রশ্ন

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি। তস্মৈ স হোবাচ॥১

অন্বয়: অথ (অতঃপর); এনং হ (তাঁকে [অর্থাৎ পিপ্পলাদকে]); শৈব্যঃ (শিবিপুত্র); সত্যকামঃ (সত্যকাম); পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবন্ (ভগবান); মনুষ্যেষু (মানুষের মধ্যে); সঃ যঃ হ বৈ (তিনি যিনি); প্রায়ণান্তম্ (মৃত্যু পর্যন্ত); তৎ ওঙ্কারমভিধ্যায়ীত (ওম্‌কে ধ্যান করেন); কতমং বাব লোকং সঃ জয়তি (কোন বিশেষ লোক তিনি প্রাপ্ত হন); তেন (তার [ধ্যান] দ্বারা); তস্মৈ সঃ হ উবাচ (তিনি তাঁকে বললেন)।

সরলার্থ: অতঃপর শিবিপুত্র সত্যকাম ঋষি পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করলেন: 'ভগবান, যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত জীবন ওম্‌কে ধ্যান করেন তাহলে তিনি এই ধ্যানের দ্বারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হবেন?' পিপ্পলাদ তাঁকে বললেন :

ব্যাখ্যা: জগৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন দিয়েই এই উপনিষদের শুরু। এই দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে আমরা আগ্রহী হব—এটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের চারপাশের এই দৃশ্যমান জগতের নানা বস্তুকে দেখে আমরা মুগ্ধ হই। এভাবেই আমাদের ইন্দ্রিয়সকল কাজ করে থাকে। এই ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখী। উপনিষদ ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে আমাদের বাইরের জগৎ থেকে মনের জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সর্বশেষে এই দুই জগতের ঊর্ধ্বে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

পঞ্চম প্রশ্নটি করেছিলেন সত্যকাম। 'সত্যকাম' নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হল যিনি সত্যকে জানতে চান। আমরা সকলেই সত্যের কথা শুনে থাকি। কিন্তু এই 'সত্য' কি? আমরা সেই সত্যকে জানতে ইচ্ছুক। সত্যকামের প্রশ্নটি ছিল 'ওম্'কে নিয়ে। তিনি জানতে চান : কোন কোন মানুষ সারা জীবন ধরে 'ওম্'-এর ধ্যান করেন, মৃত্যুর পরে তাঁরা কোথায় যান? মৃত্যুর পর তাঁরা কোন্ লোক প্রাপ্ত হন?

এ বিষয়ে শঙ্করাচার্যের মন্তব্য হল : এমন অনেক আশ্চর্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'ওম্'-এর ধ্যান করেন। কি ভাবে করেন? প্রথমে তাঁরা মনটাকে এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে পুরোপুরি তুলে নেন, তারপর ব্রহ্মের প্রতীক 'ওম্'কে চিন্তা করে তাতে

মন স্থির করেন। তখন তাঁরা ওম্-এর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। তাঁদের মন ভক্তিতে পূর্ণ এবং একমুখী হয়ে ওঠে। এরকম ধ্যান যেন জ্ঞান ও অনুরাগের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যা মনকে ধ্যেয় বস্তুর সাথে যুক্ত করে। আচার্য শঙ্কর এখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি এরকম ধ্যানকে নিবাত (বাতাসহীন) নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই শিখাটি সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী ও স্থির। ঠিক সেরকমভাবে, মনও সবসময় তার লক্ষ্যের অভিমুখী।

আমরা কেমনভাবে এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারি? আচার্য শঙ্কর বলেন, 'যম' এবং 'নিয়ম' অভ্যাসের দ্বারা; অর্থাৎ আত্মসংযম অনুশীলনের দ্বারা আমরা এই অবস্থা লাভ করতে পারি। 'যম' এবং 'নিয়ম হল যথাক্রমে শারীরিক ও মানসিক সংযম। 'যম' বলতে বোঝায় অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এ কিন্তু কোন নেতিবাচক মানসিকতা নয় বরং তা ইতিবাচক। অহিংসা বলতে বোঝায় সকলের প্রতি ভালবাসা এবং সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা। তারপরেই সত্য অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে (কথায়, কাজে এবং আচরণে) সত্যকে ধরে থাকা। 'অস্তেয়'—চুরি না করা। 'ব্রহ্মচর্য' অর্থাৎ আত্মসংযম, কিন্তু কথাটির অন্য তাৎপর্য হল ব্রহ্মনিষ্ঠ মন। 'অপরিগ্রহ'—অপরের দান গ্রহণ না করা।

'নিয়ম'-এর অন্তর্গত অভ্যাসগুলি হল: 'শৌচ'—পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ শরীরের ও মনের পবিত্রতা; 'সন্তোষ'—তৃপ্তি; 'তপস্'—কৃচ্ছ্রসাধন; স্বাধ্যায়—শাস্ত্রপাঠ এবং 'ওম্' বা ঈশ্বরের প্রতীক অন্য কোন মন্ত্র জপ করা; 'ঈশ্বরপ্রণিধান' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ভালবাসা।

সত্যকাম জিজ্ঞাসা করছেন: সারাটা জীবন ধরে কৃচ্ছ্রসাধন এবং শারীরিক ও মানসিক সংযম অভ্যাসের দ্বারা আমরা কি লাভ করে থাকি? সত্যকামের এ প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। এরকম ধ্যানের উপকারিতাই বা কি? ওম্কে ধ্যান করলে আমরা কোন্ বিশেষ লোকই বা প্রাপ্ত হই? অনেক লোকের মধ্যে কোন্টি আমরা 'ওম্'-এর দ্বারা লাভ করতে পারি?

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥২

অন্বয়: সত্যকাম (হে সত্যকাম); যৎ (যেহেতু); ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার); এতৎ বৈ (প্রসিদ্ধ); পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম (নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্ম); তস্মাৎ (সেইজন্য); বিদ্বান্ (যিনি জানেন); এতেন এব আয়তনেন (এর [প্রতীক] সাহায্যে); একতরম্ (উভয়ের মধ্যে একটিকে) [পরব্রহ্ম অথবা অপরব্রহ্ম]; অন্বেতি (অনুসরণ করেন)।

সরলার্থ: হে সত্যকাম, ওম্ নির্গুণ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) এবং সগুণ ব্রহ্ম (অপরব্রহ্ম) এই দুই-এরই প্রতীক। যিনি একথা জানেন তিনি ওম্‌কে ব্রহ্মের প্রতীক রূপে ধ্যান করেন। পরিণামে তিনি যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা: বেদান্ত মতে ব্রহ্মের দুটি দিক আছে: পর অর্থাৎ পরম বা নির্গুণ ব্রহ্ম। আর অপর অর্থাৎ আপেক্ষিক বা সগুণ ব্রহ্ম। আমরা অনেক সময়েই ঈশ্বর দয়ালু, ঈশ্বর মঙ্গলময়—এ কথা বলে থাকি। এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তাও তিনি। তখন তিনি অপরব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম এখানে মায়ার দ্বারা বিশেষিত। নির্গুণ ব্রহ্ম যেন সগুণ ব্রহ্ম হয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম পরিবর্তিত হয়েছেন। ব্রহ্ম সব সময় ব্রহ্মই থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সাপের উদাহরণ দিতেন। সাপটি রাস্তায় শুয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় সাপটি মৃত। কিন্তু সাপটির কাছে গেলে সে ফণা তুলে ভয় দেখায়। সাপটি যখন রাস্তায় নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকে তখন সে নির্গুণ। কিন্তু যখন সক্রিয় অর্থাৎ ফণা তুলে ফোঁস করে তখন ঐ সাপটিই সগুণ। দুটো অবস্থাতেই সেখানে কিন্তু একটি সাপই রয়েছে। ঠিক একইরকম ভাবে, পর এবং অপর, সগুণ এবং নির্গুণ উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হল সমুদ্র এবং তার তরঙ্গ। তরঙ্গহীন সমুদ্রকে আমরা এক বিশাল জলরাশি বলে মনে করতে পারি। ঠিক তেমনি পরব্রহ্মই হলেন অনন্ত ও অদ্বিতীয় সত্তা। সমুদ্রের তরঙ্গের মতো এই অনন্ত সত্তা কখনও কখনও রূপ ধারণ করে থাকেন।

ব্রহ্ম যখন নিজেকে জগৎরূপে প্রকাশ করেন তখন তিনিই হলেন অপরব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্মের আপেক্ষিক দিক। বেদান্ত একথা কখনই বলেন না যে, ব্রহ্মই এ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশমাত্র—সমগ্র জগৎ তাঁরই প্রকাশ। কিন্তু তা বলে এ জগৎ তাঁকে নিঃশেষ করতে পারেনি। এ জগতের সর্বত্রই তিনি রয়েছেন। সূর্য, গ্রহ, গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ সকলের মধ্যেই তিনি বিদ্যমান। এ জগতের ভেতরে এবং বাইরে তিনিই রয়েছেন।

অধিকাংশ মানুষই ওম্‌কে ব্রহ্মের প্রতীক বলে মনে করেন। এখানে উপনিষদ বলছেন, 'ওম্' ব্রহ্মের আপেক্ষিক বা সগুণ এবং পরম বা নির্গুণ—এই দুটি অবস্থারই প্রতীক। ব্রহ্মের প্রতীক রূপে ওম্‌কে ধ্যান করলে যে-কোন একটি অবস্থা (পর বা অপর ব্রহ্ম) লাভ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা প্রতীক ব্যবহার করি কেন? মনে করা যাক, একজন 'জল' এই শব্দটি বলল। সঙ্গে সঙ্গে জল বলতে যা বোঝায় তা যেন আমাদের মনের মধ্যে ভেসে

ওঠে। আমরা যখন ব্রহ্ম এই শব্দটা বলি তখন এটা কি আমাদের নির্দিষ্ট কিছু মনে করিয়ে দেয়? আমরা কি মানসচক্ষে এমন কিছু দেখতে পাই যা ব্রহ্ম নামে পরিচিত? না। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং ইন্দ্রিয়াতীত। নির্দিষ্ট নাম ও রূপ আছে বলে আমি কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য বলে কিছু নেই।

প্রতীককে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই এবং তাতে মনকে একাগ্র করতে পারি। আমরা যে মূর্তি বা ছবি পুজো করে থাকি এও যেন ঠিক তাই, আমরা কিন্তু মাটি বা কাগজকে পূজা করি না। এই মূর্তি বা ছবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা আমাদের মনকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন : তোমার আঙ্গুলে একটি কাঁটা ফুটেছে। তুমি কেমন করে এই কাঁটাটিকে বার করবে? তুমি আর একটি কাঁটা নেবে এবং এর সাহায্যে প্রথম কাঁটাটিকে তুলে আনবে, তারপর দুটো কাঁটাকেই ছুড়ে ফেলে দেবে। ঠিক তেমনি, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রহ্মকে ধ্যান করার জন্য আমরা প্রতীকের সাহায্য নিয়ে থাকি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রতীক প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন সাহায্য করে কি? শাস্ত্রমতে, প্রতীক আমাদের অবশ্যই সাহায্য করে।

কিন্তু ব্রহ্মের প্রতীক হিসাবে 'ওম্'কেই বেছে নেওয়া হয়েছে কেন? কারণ ব্রহ্মই 'সব' এবং তিনিই 'সব' কিছু হয়েছেন। ব্রহ্ম যে 'সব' একথা ধারণা করা কঠিন। আবার এই 'সব'কে বর্ণনা করাও সহজ কাজ নয়। শব্দরূপে 'ওম্'ই সকল শব্দের মধ্যে রয়েছেন। সব শব্দের প্রতীকই হলেন এই 'ওম্'। যখন আমরা 'ওম্' উচ্চারণ করি তখন গলার পেছনদিক থেকে বদ্ধ ওষ্ঠ পর্যন্ত প্রতিটি অংশকেই আমরা স্পর্শ করে থাকি। অ, উ এবং ম— একযোগে সব শব্দের উৎস। এই কারণের জন্যই 'ওম্' ব্রহ্মের সব থেকে উপযুক্ত প্রতীক। এই কারণেই 'ওম্'কে শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম বলা হয়ে থাকে। আমরা যদি ব্রহ্মকে কোন শব্দরূপে কল্পনা করে থাকি তবে ওম্ই হলেন সেই শব্দ। ওম্‌কে ধ্যান করলে ব্রহ্মকেই ধ্যান করা হয়। 'ওম্' আমাদের সবসময় মনে করিয়ে দেন আমরাই ব্রহ্ম।

শঙ্করাচার্য ওম্‌কে বিষ্ণুর সাথে তুলনা করেছেন; ভক্তরা অনুরাগের সাথে যাঁর (বিষ্ণুর) ধ্যান করেন। একইভাবে, কেউ যদি অনুরাগের সাথে ওম্-এর ধ্যান করেন তাহলে ব্রহ্ম তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'ইতি অবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ'—একথা শাস্ত্রও বলে থাকেন।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব
জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা

ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমামনুভবতি॥৩

অন্বয়: সঃ যদি (তিনি যদি); একমাত্রম্ অভিধ্যায়ীত (সবসময় অউম-এর যে-কোন একটি অক্ষর ধ্যান করেন); সঃ (তিনি); তেন এব (তার দ্বারা); সংবেদিতঃ (জ্ঞানলাভ হবে); তূর্ণম্ এব (শীঘ্রই); জগত্যাম্ (এই জগতে); অভিসম্পদ্যতে (জাত হবেন); তম্ ঋচঃ মনুষ্যলোকম্ উপনয়ন্তে (যদি তিনি ঋগ্বেদকে অর্থাৎ অউম্-এর অ-কে ধ্যান করেন তাহলে তিনি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করবেন); সঃ (তিনি); তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নঃ (শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য, তপস্যার ফলের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে); তত্র (সেখানে); মহিমানম্ অনুভবতি (মহিমা লাভ করেন)।

সরলার্থ: যিনি 'অউম্'-এর যে কোন একটি অক্ষর (যেমন অ)-এর ধ্যান করেন, সেই ধ্যানই তাঁর জাগতিক জ্ঞানলাভের পক্ষে যথেষ্ট। শীঘ্রই তিনি আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন। 'অউম্'-এর 'অ' ঋগ্বেদের প্রতীক। 'অ'-এর ধ্যানের দ্বারা তিনি মনুষ্যজন্ম লাভ করেন। তখন তিনি তপস্যায় মগ্ন হন ও ব্রহ্মচর্য, আত্মসংযম অভ্যাস করেন। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে তখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। এই সকল গুণের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ বলেন, 'ওম্' শব্দটি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। কিভাবে? 'ওম্' হচ্ছে অ, উ এবং ম এই তিনটি বর্ণের সমষ্টি। উপনিষদের মতে, অ, উ এবং ম এই তিনটি বর্ণ যথাক্রমে 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ'—এই তিনটি লোকের প্রতীক। 'ভূঃ' হল পৃথিবী, 'ভুবঃ'—পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যবর্তী লোক এবং 'স্বঃ' হচ্ছে স্বর্গলোক।

কিন্তু আমরা 'অউম্' শব্দটিকে তিনটি অক্ষরে ভাগ করি কেন? আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য যে, যখন আমরা এই পৃথিবী এবং তার চারপাশের বস্তুকে দেখি তখন আমরা আসলে ব্রহ্মকেই দেখি। বেদান্ত বলেন যে, এই দৃশ্যমান জগৎকে আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে দেখে থাকি। কারণ অবস্থাটি একটি ধারণার মতো। সমষ্টির ক্ষেত্রে যা সত্য ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও তা-ই সত্য। কেননা সবকিছু ব্রহ্মের অন্তর্গত। স্থূল অবস্থায় আমরা জেগে থাকি, সূক্ষ্ম অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি এবং কারণ অবস্থায় আমরা সুষুপ্তিতে থাকি।

এখানে স্থূল জগৎ অর্থাৎ এই পৃথিবীই আলোচ্য বিষয়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা এই জগৎকে দেখতে পাই। 'অউম্'-এর 'অ'কারই হচ্ছে এই জগৎ। 'অ'কে ধ্যান করলে ব্রহ্মের প্রকাশরূপে এই জগৎকেই ধ্যান করা হয়। কাজেই 'অ'কার বলতে এই জাগ্রত অবস্থা ও

তার প্রত্যক্ষ অনুভূতিসকল বোঝায়। জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীও এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

কিন্তু উপনিষদ বনে, 'অ'কে ব্রহ্মের প্রতীক মনে না করে আলাদাভাবে যদি ধ্যান করি তবে আমরা এই জাগ্রত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং জড়জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ি। আমরা সৎ হতে পারি এমন কি সাধু জীবনযাপনও করতে পারি। কিন্তু এই অবস্থায় আমাদের উন্নতি ঐ পর্যন্তই। তাই মৃত্যুর পর আমরা শীঘ্রই এই পৃথিবীতে ফিরে আসি এবং জীবনের সংগ্রাম যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করি। আমরা শুধুমাত্র দেহ এবং এ জড় জগতেরই একজন এরকম যেন মনে না করি।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে॥৪

অন্বয়: অথ যদি (কিন্তু যদি); সঃ (তিনি); দ্বিমাত্রেণ (অউম-এর দ্বিতীয় অক্ষরকে অর্থাৎ উ-কে [ধ্যান করেন]); মনসি সম্পদ্যতে (মনকে সমৃদ্ধ করেন); যজুর্ভিঃ (যজুর্বেদের দ্বারা); অন্তরিক্ষং সোমলোকম্ উন্নীয়তে (অন্তরিক্ষের মধ্য দিয়ে তিনি চন্দ্রলোকে যান); সঃ সোমলোকে বিভূতিম্ অনুভূয় (তিনি সেই লোকের সমস্ত উত্তম বস্তু উপভোগ করেন); পুনঃ আবর্ততে (তখন তিনি আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন)।

সরলার্থ: সাধক যদি 'অউম্'-এর দ্বিতীয় অক্ষরের ('উ'কার) ধ্যান করেন, তবে এর দ্বারা তিনি মনকে উন্নত করেন (অর্থাৎ সাধক এই অক্ষরটির সাথে একাত্মতা অনুভব করেন)। মৃত্যুর পর এই বর্ণই ('উ'কার) সাধককে অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়ে চন্দ্রলোকে নিয়ে যায়। অন্তরীক্ষ হল স্বর্গ এবং মর্তের মধ্যবর্তী আকাশ। 'অউম্'-এর দ্বিতীয় বর্ণ 'উ' যজুর্বেদের প্রতীক। সাধক চন্দ্রলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করে পুনরায় মানুষ রূপে এই মর্তলোকে ফিরে আসেন।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক, সাধক 'উ'কারের ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। 'উ'কার-এর দ্বারা ভুবঃ বা স্বর্গ এবং মর্তের মধ্যবর্তী স্থান এবং স্বপ্নের জগৎকে বোঝানো হয়েছে। উপনিষদ বলেন যে, 'উ'কারের ধ্যান করার ফলে সাধক মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে যান। যে জগতে আমরা এখন বাস করি তার তুলনায় চন্দ্রলোক সূক্ষ্ম ও উন্নততর।

'অউম্'-এর দ্বিতীয় বর্ণ উ, যজুর্বেদের প্রতীক। যখন আমরা 'উ'কারের ধ্যান করি তখন আমরা যজুর্বেদের প্রভাব অনুভব করে থাকি। আমরা তখন আর এই পার্থিব ভোগসুখের প্রতি আসক্ত হই না। বরং আমরা তখন পরহিতকর কর্ম যেমন কূপখনন, বৃক্ষরোপণ,

রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজে আনন্দ পাই। এইসব কাজ করার ফলেই আমরা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হই। যজুর্বেদের প্রতীক 'উ' বর্ণটি যেন আমাদেরকে অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়ে (স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী আকাশ) চন্দ্রলোকে নিয়ে যায়। এই লোকে আমরা নানা পার্থিবসুখ ভোগ করে থাকি এবং সুখে জীবনযাপন করি। আমরা দেবদেবীর সান্নিধ্য ও পূর্বপুরুষদের সঙ্গ লাভ করে থাকি। কিন্তু এই লোকে আমরা কতদিন থাকব, আমাদের কর্মই তা স্থির করে দেয়। সময় ফুরিয়ে গেলে এই পৃথিবীতে আমরা মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় ফিরে আসি।

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ॥৫

অন্বয়: যঃ পুনঃ (কিন্তু যে ব্যক্তি); ওম্ ইতি এতেন এব ত্রিমাত্রেণ অক্ষরেণ (তিন অক্ষরের শব্দ 'অউম্'-এর মধ্য দিয়ে); এতং পরং পুরুষম্ (এই পরম পুরুষকে) [সূর্যের মধ্যে]; অভিধ্যায়ীত (ধ্যান করেন); সঃ (তিনি); তেজসি সূর্যে সম্পন্ন (জ্যোতির্ময় সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে যান); যথা (যেমন); পাদোদরঃ (সাপ); ত্বচা বিনির্মুচ্যতে (ত্বক থেকে মুক্ত হয়); এবং হ বৈ (ঠিক সেইভাবে); সঃ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ (তিনি নিজেকে সব ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত করেন); সামভিঃ (সামমন্ত্রের মধ্য দিয়ে); সঃ ব্রহ্মলোকম্ উন্নীয়তে (তিনি ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন); সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্ (জীবের সমষ্টি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের চেয়েও তিনি শ্রেষ্ঠ); পুরিশয়ম্ (হৃদয়পদ্ম); পুরুষম্ (পরমাত্মা); ঈক্ষতে (ধ্যানের মাধ্যমে দেখেন); তৎ এতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ (এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে)।

সরলার্থ: যিনি পরমাত্মার প্রতীকরূপে তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'অউম্'-এর ধ্যান করেন তিনি জ্যোতির্ময় সূর্যে লীন হয়ে যান। সাপ যেমন জীর্ণ খোলস ত্যাগ করে ঠিক তেমনি এরূপ ব্যক্তিও নিজেকে সব পাপ থেকে মুক্ত করেন। সামমন্ত্র তখন তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়, সেখানে তিনি ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। এমনকি সাধক তখন নিজেকে হিরণ্যগর্ভ থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে থাকেন। তখন তিনি জানেন তিনিই এ জগতের সবকিছু হয়েছেন। এ বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: সূর্যের মধ্যেও সেই পরমপুরুষ রয়েছেন। পরমপুরুষের প্রতীক রূপে যিনি 'অউম্'-এর ধ্যান করেন তিনি সূর্যে লীন হয়ে যান। সূর্য জ্ঞান, জ্যোতি, আনন্দ ও পবিত্রতার

প্রতীক। সূর্যের মতো সাধকও এইসব গুণের অধিকারী। চিত্তশুদ্ধির ফলে সাধক তখন আত্মজ্ঞান লাভ করেন। মৃত্যুর পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত ব্যক্তির মতো তিনি আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন না। সামমন্ত্রের দ্বারা সাধক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোক—হিরণ্যগর্ভের জগৎ; যে হিরণ্যগর্ভ সমস্ত প্রাণীর আত্মা। সাধক তখন সবকিছুর সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। কিন্তু এটাই শেষ অবস্থা নয়, সাধক তখন আরো এগিয়ে যান। পরিশেষে তিনি পরব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যান। অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম হয়ে যান।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ॥৬

অন্বয়: তিস্রঃ মাত্রাঃ ('অউম্'-এর তিনটি অক্ষর); প্রযুক্তাঃ (পৃথকভাবে); মৃত্যুমত্যঃ (মৃত্যুর অধীন); অন্যোন্যসক্তাঃ (যদি তারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়); অনবিপ্রযুক্তাঃ (সঠিক কাজ); বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু ক্রিয়াসু (বাহ্য, অভ্যন্তর, এবং মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান করে); সম্যক্ প্রযুক্তাসু (সঠিকভাবে); জ্ঞঃ ন কম্পতে (যিনি পরমাত্মাকে জানেন তিনি কখনও বিচলিত হন না)।

সরলার্থ: যিনি 'অউম্'-এর তিনটি অক্ষরকে আলাদাভাবে ধ্যান করেন তিনি মৃত্যুর অধীন। কিন্তু এই তিনটি অক্ষরকে একত্রে ধ্যান করতে পারলে সেই ধ্যানই যথার্থ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আলাদা নন, এক। যিনি সঠিকভাবে এই দেবতার ধ্যান করেন তিনিই 'অউম্'-এর প্রকৃত অর্থ জানতে পারেন। যিনি এই 'অউম্'কে ঠিক ঠিক ভাবে জানেন তিনি অভয়পদ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: আমরা সকলেই এই তিন অবস্থার অধীন—বাহ্য অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থা, অভ্যন্তর বা সুষুপ্তি অবস্থা এবং মধ্য বা স্বপ্নাবস্থা। উপনিষদ বলেন, যিনি ওম্‌কে এই তিন অবস্থার সাথে যুক্ত করে ধ্যান করেন তিনি নিখিল বিশ্বের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। সাধক যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন সব অবস্থাতেই তিনি ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা বোধ করেন। এর ফলে তিনি নিজেকে কখনও অপরের থেকে আলাদা বলে মনে করেন না। এবং তিনি সবরকম ভয় থেকে মুক্ত। ভয় করার মতো কে-ই বা তাঁর আছে? তখন থাকে শুধুই প্রেম।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, যিনি 'ওম্'কে এইভাবে জেনেছেন তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। 'ন কম্পমান'—তাঁর আর বিপথে পা পড়ে না। 'কুতো বা চলেৎ'—কোথায়ই বা যাবেন তিনি? তিনি কি নিজের থেকে দূরে যেতে পারেন? তিনিই সর্বত্র রয়েছেন।

**ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং
পরং চেতি॥৭**

অন্বয়: ঋগ্‌ভিঃ (ঋক্-মন্ত্রের সাহায্যে); এতম্ (এইজগৎ [নরনারীর]); যজুর্ভিঃ (যজুঃ মন্ত্রের দ্বারা); অন্তরিক্ষম্ (চন্দ্রলোক); সামভিঃ (সামমন্ত্রের সহায়ে); তৎ (সেই [ব্রহ্মলোক]); যৎ কবয়ো বেদয়ন্তে (জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন); তম্ (এই ত্রিবিধ লোক); ওঙ্কারেণ এব আয়তনেন (অউম প্রতীকের মধ্য দিয়ে); বিদ্বান্ অন্বেতি (জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাপ্ত হন); তৎ যৎ (সেই যা); শান্তম্ (শান্ত); অজরম্ (জরাহীন); অমৃতম্ (অমৃত); অভয়ম্ (ভয়ের ঊর্ধ্বে); পরং চ (সর্বোচ্চ)।

সরলার্থ: সাধক যদি ব্রহ্মরূপে 'অউম্'কে ধ্যান করেন, তবে তিনি ঋক্-মন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যলোক, যজুঃমন্ত্রের দ্বারা চন্দ্রলোক এবং সামমন্ত্রের সহায়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ওম্‌কে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারলে সাধক পরম শান্তি অনুভব করেন। সাধক তখন জরা, ব্যাধি এবং সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত। তখন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন এবং পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: অ, উ, ম এই তিন অক্ষরের সমষ্টি হল 'ওম্'। এর প্রতিটি অক্ষরকে বলা হয় মাত্রা। এই মাত্রা তিনটির ঊর্ধ্বে হল তুরীয় বা বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা। 'অ' অক্ষরটি এই জগৎ, ঋগ্বেদ এবং জাগ্রত অবস্থার প্রতীক। 'উ' অক্ষরটি স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী আকাশ, যজুর্বেদ এবং স্বপ্নাবস্থার প্রতীক। স্বর্গলোক, সামবেদ এবং সুষুপ্তি অবস্থার প্রতীক হল 'ম'।

যদি আমরা এই তিনটি অক্ষরকে পৃথকভাবে ধ্যান করি তবে আমরা পৃথক লোক প্রাপ্ত হই। পরমাত্মারূপে 'অ'কে ধ্যান করলে এই জগৎকে লাভ করা যায়। 'উ'কে ধ্যান করলে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায়। এ দুটি লোকই অজ্ঞানতার অধীন এবং তা নশ্বর। এই দুটি অক্ষরকে ধ্যান করার পর যদি আমরা 'ম'-এর ধ্যান করি তবে আমরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। যাঁরা জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাই একমাত্র ব্রহ্মলোকে যেতে সক্ষম। সাধক ব্রহ্মলোকে অপরব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। এই নিখিল বিশ্বের সাথে তিনি তখন এক হয়ে যান। সাধক যদি সেখানেও (ব্রহ্মলোকে) 'অউম্'-এর ধ্যানে মগ্ন থাকেন তবে তিনি তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। সাধক তখন পরব্রহ্ম বা শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক হয়ে যান। তুরীয় অবস্থায় সাধক সমস্ত লোক এবং সকলপ্রকার বন্ধনের ঊর্ধ্বে চলে যান।

কাজেই সিদ্ধান্তটি হল—'শান্তম্'। সাধক তখন শান্ত, স্থির। এই অবস্থায় তিনি তখন প্রশান্তি লাভ করেন। তিনি কখনও বিচলিত হন না। 'অজরম্'—কোন বার্ধক্য বা জরা

তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তিনি অসীম ও স্বতন্ত্র। তিনি সবসময়ই এক অর্থাৎ পরিবর্তন রহিত। 'অমৃতম্'—তাঁর মৃত্যু নেই। যাঁর জন্ম হয়নি তাঁর তো কখনও মৃত্যু হতে পারে না। 'অভয়ম্'—তিনি সকলপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত। মৃত্যু, দুর্ভাগ্য, ইত্যাদি নানারকমের ভয়ে আমরা সবসময়ই ভীত। আমরা ভয়ের দ্বারা তাড়িত। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করলে আর কোনও ভয় থাকে না। সাধক তখন স্থির, শান্ত ও সমাহিত। কোন কিছুই তখন তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না।

'পরং চ ইতি'—এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। পরম হল সর্বোচ্চ অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষ পৌঁছাতে চায়। এ অবস্থায় কোন কিছুই সাধককে স্পর্শ করতে পারে না। কেউ প্রশংসা করলে আমরা খুশি হয়ে উঠি আবার কেউ নিন্দা করলে আমরা হতাশ হই। কিন্তু সাধক যখন এই অবস্থা (তুরীয় অবস্থা) প্রাপ্ত হন তখন তিনি নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে চলে যান। তিনি তখন নিরপেক্ষ। মন বশে থাকলে সাধকের কাছে এ জগৎ মজার কুটি। সেই অবস্থায় প্রশংসা বা নিন্দা দুটোই তাঁর কাছে কৌতুকের বিষয়। সাধক তখন মনে করেন, তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। আবার নিজেই নিজেকে দোষী বলে মনে করছেন। তিনিই ভিন্ন নাম এবং ভিন্ন রূপ নিয়ে সকলের মধ্যে রয়েছেন। সাধক যখন পরম অবস্থা লাভ করেন তখনই তাঁর মধ্যে এই একত্বের বোধ ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সাধক তখন সকলের মধ্যে এক আত্মাকে দেখেন।

শিষ্য গুরু পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সারাজীবন ধরে এই 'ওম্'-এর ধ্যান করেন। এর দ্বারা তাঁরা কি লাভ করেন? গুরু বললেন—তাঁরা এই পরম সত্যকে লাভ করেন।

এখানেই প্রশ্ন উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত।

ষষ্ঠ প্রশ্ন

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ। তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ। যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি॥১

অন্বয়: অথ হ (তারপর); এনম্ (তাঁকে [পিপ্পলাদকে]); ভারদ্বাজঃ সুকেশা (ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা); পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবন্, (ভগবান); কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ হিরণ্যনাভঃ (কোসলদেশীয় রাজপুত্র হিরণ্যনাভ); মাম্ উপেত্য এতং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত (আমার কাছে এসে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন); ভারদ্বাজ (হে ভরদ্বাজপুত্র); ষোড়শকলং পুরুষং বেত্থ (ষোড়শকলা বিশিষ্ট পুরুষকে আপনি জানেন কি?); অহং তং কুমারম্ অব্রুবম্ (আমি রাজকুমারকে বলেছিলাম); ন অহম্ ইমং বেদ (আমি এই পুরুষকে জানি না); যদি অহম্ ইমম্ অবেদিষম্ (যদি আমি তাঁকে জানি); কথং তে ন অবক্ষ্যম্ (তবে কেন আপনাকে তা বলব না); যঃ অনৃতম্ অভিবদতি (যিনি মিথ্যা বলেন); এষঃ সমূলঃ পরিশুষ্যতি (তিনি সমূলে শুষ্ক [অর্থাৎ বিনষ্ট] হন); তস্মাৎ (সেই কারণে); অনৃতং বক্তুং ন অর্হামি (আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না); সঃ (তিনি, রাজপুত্র); তূষ্ণীম্ (শান্তভাবে); রথম্ আরুহ্য প্রবব্রাজ (রথে চড়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন); তং ত্বা পৃচ্ছামি (এখন আমি আপনাকে সেই [পুরুষ] বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি); ক্ব অসৌ পুরুষঃ (কোথায় সেই পুরুষ)?

সরলার্থ: তারপর ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা পিপ্পলাদকে বললেন: ভগবান, কোসলদেশীয় রাজপুত্র হিরণ্যনাভ একসময়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে ভরদ্বাজপুত্র, ষোলকলাবিশিষ্ট পুরুষকে আপনি জানেন কি?' আমি সেই কুমারকে বললাম, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। যদি আমি জানতাম তবে আপনাকে বলব না কেন?' যে লোক মিথ্যা কথা বলে সে সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না।' এই কথা শুনে তিনি নীরবে রথে চড়ে চলে গেলেন। এখন আমি আপনাকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি, 'সেই পুরুষ কোথায়?'

ব্যাখ্যা: ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা এই ষষ্ঠ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি পিপ্পলাদকে বললেন, একসময়ে কেমন করে কোসলদেশীয় এক রাজপুত্র তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ষোলকলাবিশিষ্ট পুরুষকে আপনি জানেন কি?' অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সেই পুরুষকে তিনি জানেন কিনা। ষোল আনায় যেমন এক টাকা তেমনি তিনি ষোলকলাবিশিষ্ট এক পূর্ণসত্তা।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সুকেশা বিদ্বান ব্যক্তি বলেই রাজপুত্র তাঁর কাছে এসেছিলেন। রাজপুত্র তো তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। রাজপুত্র অত্যন্ত বিনীতভাবে সুকেশার নিকট উপস্থিত হলেন। এভাবেই সত্যলাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী গুরুর কাছে যান। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গুরুকে প্রশ্ন করেন।

সুকেশার মধ্যে কোন কপটতা ছিল না। তাই তিনি খোলাখুলি বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি জানেন না। রাজপুত্র শিষ্য হবার পক্ষে অনুপযুক্ত তাই সুকেশা জেনেও না জানার ভান করছেন—পাছে রাজপুত্র এমন কথা মনে করেন তাই সুকেশা বলছেন, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থাকলে তোমায় বলব না কেন?'

শিষ্য অনেকসময়ই গুরুকে প্রশ্ন করে থাকেন। প্রশ্নের ধরন দেখে গুরু বুঝে নেন শিষ্য কি প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করছেন, না তিনি প্রকৃতই জিজ্ঞাসু। শিশুরাও কখনও কখনও প্রশ্ন করে থাকে। প্রশ্ন শুনে বেশ বোঝা যায় তারা এ ব্যাপারে মনোযোগী নয় এবং এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তাই সে প্রশ্নের উত্তর শুনলেও তারা কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু শিষ্য যদি আন্তরিকতার সাথে গুরুকে প্রশ্ন করেন এবং গুরু যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে না চান তাহলে তিনি খুব অন্যায় করবেন। উপনিষদ বলেন, এরকম অবস্থায় তাঁর সকল জ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়। শুকিয়ে গেলে গাছের যেরকম অবস্থা হয়, এও যেন ঠিক তাই। এমনও অনেক গুরু আছেন যিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞান শিষ্যকে দান করেন না অর্থাৎ জেনেও না জানার ভান করে মিথ্যা কথা বলেন। তখন তাঁর জীবনে অভিশাপ নেমে আসে। তাঁর সমস্ত জ্ঞান লোপ পায়।

সুকেশা দেখলেন রাজপুত্র নীরবে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। রাজকুমারের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার জন্য সুকেশার ভীষণ খারাপ লাগল। তখন থেকেই তিনি সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে সচেষ্ট হলেন। আচার্য শঙ্কর বলছেন, জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনে হয় তাঁর হৃদয়ে যেন তীর গেঁথে আছে। ব্যথায় তিনি ছটফট করছেন। বেদান্তসারে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির মাথায় আগুন জ্বললে তিনি যেমন জলের জন্য ছটফট করতে থাকেন শিষ্যের আত্মজ্ঞান লাভের ব্যাকুলতাও ঠিক সেইরকম, তাঁকে অবশ্যই এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সেজন্য শিষ্য আদর্শ গুরুর খোঁজ করবেন যিনি পথ দেখাবেন।

এই ষষ্ঠ প্রশ্নটি আত্মার সম্বন্ধে করা হয়েছে, যে আত্মা নিজেকে জগৎরূপে প্রকাশ করেছেন। আত্মাকে এখানে ‘পুরুষ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ইনিই সকলের অন্তরস্থ আত্মা। এখানে এই আত্মাকে ষোলকলাবিশিষ্ট পুরুষ বলা হয়েছে। ষোলকলা বলতে সম্ভাব্য সকল বৈশিষ্ট্য বা উপাধিকে বোঝায়। এই সকল উপাধির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই, এরা আত্মার ওপর আরোপিত মাত্র। এ সকল উপাধি অনিত্য।

শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন সমগ্র বিশ্ব (সমস্তং জগৎ) এই কার্যকারণের যোগবিয়োগ বা তার পরিণতি ছাড়া আর কিছুই না। সুষুপ্তিতে (স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায়) আমরা কোথায় যাই? জাগ্রত অবস্থায় আমরা চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন। স্বপ্নাবস্থায় আমরা বিছানায় শুয়ে থাকলেও আমাদের মন কিন্তু পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় দেহ, মন কোনটিই কাজ করে না। মনে হয় আমরা যেন মৃত। সুষুপ্তি ভাঙ্গার পর আমরা যখন জাগ্রত হই তখন পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে আমাদের একটু সময় লাগে। ‘এটি সকাল না সন্ধ্যা? আমি কোথায় আছি? আমার কি হয়েছিল?’—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তখন আমাদের মনে এসে ভীড় করে।

আচার্য শঙ্করের মতে, সবকিছুই তার উৎসে ফিরে যায়। সেই উৎসটি তাহলে কি? পরমাত্মা। পরমাত্মা চৈতন্য ও জ্ঞানস্বরূপ। আমরা যখন জেগে থাকি তখন পরমাত্মা মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। তখনই সেই আত্মা জগতের সংস্পর্শে আসেন। আমরা কোন কিছু দেখি কিভাবে? এই চোখ কিছুই না, এমনকি মনও কোন কাজ করে না। আত্মা আছেন বলেই আমরা দেখতে পাই। আত্মা মনের মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকেন এবং মন কাজ করে চোখের মধ্য দিয়ে। পরমাত্মা তখনই সবকিছু দেখেন।

শঙ্করাচার্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, পরমাত্মা সবকিছুর উৎসই শুধু নন, সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেন। পরমাত্মা নিজেকে হিরণ্যগর্ভ (সমষ্টি মন) এবং বিরাটরূপে (সমষ্টি দেহ) ব্যক্ত করেন। পরমাত্মা থেকেই সব কিছু এসেছে আবার পরমাত্মাতেই সবকিছু ফিরে যায়। কোন কিছুর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই।

জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আমরা অনেক কিছু দেখি ও অনুভব করে থাকি। এই সবকিছুর আশ্রয় হল পরমাত্মা। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা কিছু দেখি না বা অনুভব করতে পারি না। সবকিছু তখন কোথায় যায়? সাময়িকভাবে এসবই পরমাত্মায় লীন হয়। কার্য কারণে ফিরে যায়। জগতের যখন লয় হয় তখন তা আত্মায় ফিরে যায়।

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো
যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি॥২

অন্বয়: সঃ তস্মৈ হ উবাচ (তিনি [পিপ্পলাদ] তাঁকে বললেন); সোম্য (হে সৌম্য); ইহ এব অন্তঃশরীরে (এখানে হৃৎপদ্মাকাশে); সঃ পুরুষঃ (সেই পরমাত্মা [আছেন]); যস্মিন্ (যাতে); এতাঃ ষোড়শকলাঃ (এই ষোড়শকলা যেমন প্রাণ); প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ: পিপ্পলাদ তাঁকে বললেন, হে সৌম্য, দেহের মধ্যে হৃৎপদ্মকাশে পরমাত্মা বিরাজিত। এই ষোলকলা (যেমন প্রাণ) পরমাত্মার কাছ থেকেই এসেছে।

ব্যাখ্যা: 'পুরুষ' কথার অর্থ হল 'অন্তরতম সত্তা', যা আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে। 'পুর' শব্দের অর্থ আবাস। আর 'শী' অর্থ হল যা শায়িত বা বিশ্রাম নিচ্ছে। হৃদয়কে অনেকসময় 'হৃৎপদ্ম' বলা হয় কারণ মনে করা হয় হৃদয়ের আকৃতি পদ্মের মতো। 'পুরুষ' এই হৃদয়াকাশেই বিরাজ করেন। ঘটাকাশ আর পটাকাশ, একই আকাশ ঘটের মধ্যেও রয়েছে আবার বাইরেও রয়েছে। ঠিক তেমনি পুরুষ বা ব্রহ্ম প্রত্যেকের ভেতরেও রয়েছেন আবার বাইরেও রয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই সর্বত্র বিরাজ করছেন।

এই পুরুষই ষোলকলাবিশিষ্ট। 'কলা' শব্দটির অর্থ হল অঙ্গ বা অংশ। এ যেন বীজ যার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে। পুরুষ হলেন সেই বীজ যা থেকে এই ষোলকলা-বিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এরা (এই জগৎ) বীজ থেকে আলাদা নয়। ব্রহ্ম নিজেকে এই জগদ্রূপে প্রকাশ করেছেন।

উপনিষদ এখানে ষোলকলাবিশিষ্ট পুরুষ বলতে সগুণ ব্রহ্মের কথা বলেছেন। বস্তুত এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের উপাধিমাত্র। এ জগৎ ব্রহ্মের ওপর আরোপিত (অধ্যারোপ)। ব্রহ্মই এ জগতের আশ্রয়।

শঙ্করাচার্য একথাই আমাদেরকে বিশেষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কোনকিছুই ব্রহ্মকে প্রভাবিত করতে পারে না। ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, যা নির্গুণ, নিরাকার। কোনও বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষিত করা যায় না। যদিও এ জগৎরূপে তিনি নিজেকেই প্রকাশ করে থাকেন। এ জগৎ ব্রহ্মের কাছ থেকেই আসে। আবার ব্রহ্মেই লয় হয়।

স ঈক্ষাংচক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্বা
প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি॥৩

অন্বয়: সঃ (সেই [ষোলকলা বিশিষ্ট] পুরুষ); ঈক্ষাং চক্রে (চিন্তা করলেন); কস্মিন্ উৎক্রান্তে (কে শরীর ত্যাগ করেন); অহম্ উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি (যার জন্য আমি ত্যাগ করি); কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে কে থাকেন); প্রতিষ্ঠাস্যামি (যার জন্য আমি থাকব)।

সরলার্থ: সেই পুরুষ চিন্তা করলেন : যখন আমি এই শরীর ছেড়ে চলে যাই তখন আসলে কে শরীর ত্যাগ করেন? একইভাবে কার জন্যই বা আমি অনুভব করি যে, আমি এই দেহে আছি?

ব্যাখ্যা: এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই 'পুরুষ' কে? ইনিই অন্তরতম সত্তা, যিনি আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন। আমরা কি তাঁকে দেখতে পাই? না, কিন্তু যোগীরা ধ্যানে তাঁকে উপলব্ধি করেন। তাঁরা তাঁকে আপন হৃদয়ে জ্যোতিরূপে দেখেন। আমাদের মধ্যে এই পুরুষ আছেন বলেই আমাদের এই 'আমি'বোধ আছে। এমনকি ছোট কীটের মধ্যেও এই 'অহং'বোধ রয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই 'আমি' কে? কখনও কখনও এই 'আমি' দেহ ধারণ করেন। তখন তিনি সগুণ ও চিন্তা করতে সক্ষম। এই সকল গুণকে বলা হয় কলা বা অংশ। এ শুদ্ধ 'আমি' নয়। এই 'আমি' দেহ, মন ও বুদ্ধির অধীন। কিন্তু শুদ্ধ 'আমি'র কোন কলা বা অংশ থাকে না।

সুতরাং 'কলা' আর 'পুরুষের' মধ্যে সম্পর্ক কি? বেদান্তমতে এই কলাসমূহ পুরুষের কাছ থেকেই এসেছে আবার পুরুষেই ফিরে যাবে। এরা পুরুষের ওপর আরোপিত মাত্র। আমাদের সকলের মধ্যেই সেই এক ও অভিন্ন 'আমি' রয়েছে। কলাসমূহ এই 'আমি'র ওপরেই আরোপিত। এর ফলেই আমরা নিজেদেরকে একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে করি, যেমন লম্বা-বেঁটে, সুখী-অসুখী ইত্যাদি। আমাদের দেহের ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং শাশ্বত।

কিন্তু এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন কি ভাবে? তিনি কেমন করে এই কলা, দেহ এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন? উপনিষদ বলেন, 'স ঈক্ষাং চক্রে'—তিনি চিন্তা করেন। ঈক্ষ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দেখা। কিন্তু এখানে এর অর্থ হল চিন্তা করা। শুধুমাত্র চিন্তার দ্বারা তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নিজের মধ্য থেকেই সবকিছুকে প্রকাশ করেন। বাইবেলেও আছে : 'ভগবান বললেন, আলো হোক এবং আলো প্রকাশিত হল।'

'কস্মিন্ অহম্ উৎক্রান্তে উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি'—কে শরীর থেকে চলে গেলে আমার মনে হয় আমি শরীর ত্যাগ করেছি? যখন কেউ মারা যান তখন আসলে শরীর ছেড়ে কে বেরিয়ে যান? যার জন্য আমরা বলে থাকি তিনি এই শরীর ত্যাগ করেছেন অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কে আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যান? আবার কার জন্যই বা আমরা জীবিত আছি?

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং

মনঃ। অন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকা লোকেষু চ
নাম চ॥৪

অন্বয়: সঃ (তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম); প্রাণম্ (হিরণ্যগর্ভ); অসৃজত (সৃষ্টি করলেন); প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্ (প্রাণ থেকে শ্রদ্ধা [অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা]); খম্ ([শ্রদ্ধা থেকে] আকাশ); বায়ুঃ ([আকাশ থেকে] বাতাস); জ্যোতিঃ (অগ্নি); আপঃ (জল); পৃথিবী (পৃথিবী); ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়); মনঃ (মন); অন্নম্ (খাদ্য); অন্নাৎ (খাদ্য থেকে); বীর্যম্ (বীর্য); তপঃ (তপস্যা); মন্ত্রাঃ (বেদসমূহ); কর্ম (যজ্ঞকর্ম); লোকাঃ (কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত লোকসমূহ); লোকেষু চ নাম চ (এবং সেই লোকসমূহে বিভিন্ন নামরূপ)।

সরলার্থ: সেই পুরুষ (সগুণ ব্রহ্ম) হিরণ্যগর্ভকে (প্রাণাত্মা) সৃষ্টি করলেন। হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ থেকে সৃষ্টি হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং ইন্দ্রিয় এল (সৃষ্টি হল)। তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন মন এবং অন্ন। অন্ন থেকে ক্রমে বীর্য, বেদসমূহ, কর্ম (যাগযজ্ঞ), স্বর্গ এবং অন্যান্য লোক, এবং লোকসমূহে বিভিন্ন নাম বা পদসমূহ এল (সৃষ্টি হল)।

ব্যাখ্যা: মৃত্যুর সময় আমাদের দেহ ছেড়ে কে বেরিয়ে যান? উত্তরটি হল প্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি। এই প্রাণকে হিরণ্যগর্ভও বলা হয়। হিরণ্যগর্ভই হল ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। এঁর অপর নাম হল সূত্রাত্মা। সূত্র অর্থ সুতো। বিভিন্ন প্রাণীকে ইনি একই সুতোয় গেঁথে রাখেন। কোন মানুষ হয়তো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তার ইন্দ্রিয়সকলও হয়তো অক্ষত। কিন্তু মৃত্যুর পর তার আর কোন ইন্দ্রিয়ই কাজ করতে পারে না। কারণ প্রাণ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

উপনিষদ বলেন, শ্রদ্ধা আসে এই প্রাণ থেকেই। শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ হল বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস বা আত্মশ্রদ্ধা। কিন্তু এর অপর অর্থ হল আস্তিক বুদ্ধি, গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রে বিশ্বাস। শ্রদ্ধা শব্দের দ্বারা সৎ ইচ্ছাকেও বোঝানো হয়। শ্রদ্ধা যেন একরকমের সংগ্রাম, ভাল থেকে ভালতর, ভালতম হওয়ার সংগ্রাম। এই শ্রদ্ধা শুধুমাত্র মানুষেরই থাকে।

তারপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রাণশক্তি থেকে একে একে পাঁচটি উপাদান প্রকাশ পায়। প্রথম হল 'খম্'—যা আকাশ হিসেবে পরিচিত। প্রতিটি উপাদানেরই নির্দিষ্ট গুণ আছে যেমন আকাশের গুণ হল শব্দ। আকাশ থেকে আসে বাতাস। বায়ুর দুটি গুণ। এর প্রধান গুণ হল স্পর্শ। কিন্তু আকাশের গুণ শব্দও এর সাথে জড়িত। এর পরের উপাদান হল জ্যোতি যাকে অগ্নিও বলা হয়। এর নিজস্ব গুণ হল রূপ কিন্তু শব্দ ও স্পর্শ গুণও অগ্নির সাথে যুক্ত। বায়ুকে দেখা যায় না কিন্তু এর শব্দ শোনা যায় এবং একে অনুভব করা যায়। আবার আগুনকে দেখা যায়, শোনা যায় এবং স্পর্শ করা যায়।

জল আসে আগুনের কাছ থেকে। জলের নিজস্ব গুণ হল রস (স্বাদ)। তবে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণই এর মধ্যে রয়েছে। তারপর জল থেকে আসে এই পৃথিবী বা ক্ষিতি। পৃথিবীর মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এ সকল গুণই রয়েছে। গন্ধ হল পৃথিবীর নিজস্ব গুণ। কাজেই এই প্রকাশ সূক্ষ্ম থেকে ধীরে ধীরে স্থূল হয়।

কর্ম ছাড়া জীব এ সংসারে থাকতে পারে না। তাই উপাদান থেকে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়—প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পরে কর্মেন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হল—কান (শ্রোত্র), চোখ (চক্ষু), নাসিকা (ঘ্রাণ), জিভ (জিহ্বা), ত্বক (স্পর্শেন্দ্রিয়)। এগুলো আবার উপাদানের বিভিন্ন গুণ যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-এর অনুরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল খুবই সূক্ষ্ম। তারপরে আসে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যা অপেক্ষাকৃত স্থূল। কর্মেন্দ্রিয়গুলি হল বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

এখন প্রশ্ন হল, এই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে কে? মনঃ অর্থাৎ মন। এই মনকে অন্তঃকরণও বলা হয়ে থাকে। মনের চারটি দিক আছে। মন শব্দটি প্রথম দিককে অর্থাৎ মনের বিষয়কে প্রকাশ করে। এই দিকটি যেন সবসময়ই দুলছে। যেমন—আমি এটা করব না ওটা করব? বুদ্ধিই সিদ্ধান্ত নেয়। এটাই হল বোধশক্তি। 'আমি কি করব, আমার কি করা উচিত'—বুদ্ধি তা স্থির করে। 'চিত্ত' হল মনের আর একটি দিক যাতে অনুভূতি, আবেগ ও স্মৃতি জমা থাকে। তারপর হচ্ছে অহঙ্কার অর্থাৎ আমিত্ব বোধ। এই আমিত্ব বোধ থেকেই জীবের উৎপত্তি। ব্যক্তি মাত্রেই এই অহংবোধ থাকে।

পরবর্তী প্রকাশ হল অন্ন বা খাদ্য। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য থেকেই আসে বীর্য ও তেজ। বীর্য থেকেই আসে তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রতা। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা ক্রমশ বুঝতে পারি এ জগতে কিছু লাভ করতে গেলে শক্তি, কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মসংযমের প্রয়োজন। এর জন্য একজন পথপ্রদর্শক প্রয়োজন, যিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা এই সমাজের জন্য কিছু করতে চাই এবং আমাদের মধ্যে হয়তো সে ক্ষমতাও আছে। তা সত্ত্বেও একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন যিনি আমাদের নেতৃত্ব দেবেন। তারপর আসে মন্ত্র। মন্ত্র বলতে এখানে বেদকে বোঝানো হয়েছে। শাস্ত্রের নির্দেশমতো আমাদের চলা উচিত।

মন্ত্র থেকেই কর্মের উৎপত্তি। বেদের বিধান অনুসারে আমরা যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য কার্যকলাপ করতে পারি। এর ফলস্বরূপ আমরা বিভিন্ন লোক প্রাপ্ত হই। লোক অর্থাৎ জগৎ। তপস্যা, আত্মসংযম, শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারি। আমরা ভাল আছি কিন্তু আরো ভাল হতে পারি। আবার লোক শব্দের দ্বারা আমাদের অবস্থা বোঝানো হয়ে থাকে। যদি আমি সৎ, সাধু, দয়ালু ও নিঃস্বার্থপর হই

এবং সৎসঙ্গে জীবন কাটাই তবে তা হবে স্বর্গবাসের সমান। ঠিক সেরকমভাবে আমি যদি বাজে কাজ করি, অসৎসঙ্গে দিন কাটাই তাহলে সবসময়ই আমাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং অসুখী হব। একেই নরকবাস বলা হয়ে থাকে। লোক বলতে এখানে চৈতন্যের স্তর, অস্তিত্বের স্তরকে বোঝানো হয়েছে। তারপর এই জগৎ থেকেই নামের সৃষ্টি হয়েছে। নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা একে অপরের থেকে আলাদা অর্থাৎ স্বতন্ত্র।

কাজেই নির্গুণ, নিরাকার পুরুষ থেকেই এই ষোলকলা এসেছে। তারা পুরুষ থেকে পৃথক নয়। পুরুষ এইভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি
ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য
পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি,
ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং পোচ্যতে স এমোঽকালো-
ঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥৫

অন্বয়: সঃ (এর দৃষ্টান্ত রূপে); যথা (যেমন); ইমাঃ (এইগুলি); সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রের পথে); স্যন্দমানাঃ (বয়ে চলেছে); নদঃ (নদীসমূহ); সমুদ্রং প্রাপ্য (সমুদ্রে গিয়ে); অস্তং গচ্ছন্তি (অদৃশ্য হয়); তাসাং নামরূপে (তাদের নাম এবং রূপ); ভিদ্যেতে (লোপ পায়); [তদা (তখন থেকে)]; সমুদ্রঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে (সমুদ্র রূপে পরিচিত); এবম্ এব (ঠিক এইরূপে); অস্য পরিদ্রষ্টুঃ (যিনি সবকিছু জানেন [সূর্য সবকিছু দেখেন]); পুরুষায়ণাঃ (পুরুষের দিকে যাচ্ছে); ইমাঃ ষোড়শকলাঃ (এই ষোল কলা); পুরুষং প্রাপ্য (লাভ করে); অস্তং গচ্ছন্তি (অদৃশ্য হন); চ আসাং নামরূপে ভিদ্যেতে (তাঁদের নাম এবং রূপ লোপ পায়); পুরুষঃ ইতি এবং পোচ্যতে (তখন তাঁদের পুরুষ বলা হয়); সঃ এষঃ (সেই জ্ঞানী ব্যক্তি); অকলঃ অমৃতঃ ভবতি (সকল গুণের ঊর্ধ্বে এবং অমর); তৎ এষঃ শ্লোকঃ (এখানে এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে)।

সরলার্থ: দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সমুদ্রে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত নদীসমূহ বইতে থাকে। সমুদ্রে মিলিত হবার পর তাদের আর কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, অর্থাৎ তাদের নামরূপ লোপ পায়। তখন তারা সমুদ্রই হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তি যখন নিজেকে জানেন তখন তিনি ‘পুরুষ’ হয়ে যান। এর ফলে তাঁর সমস্ত উপাধি লোপ পায়। তখন থেকে তিনি নিজেই পুরুষ যিনি নির্গুণ এবং অমর। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: এই সকল কলা কি গতি লাভ করে থাকে? জীবনের উদ্দেশ্য কি? উপনিষদ এখানে সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন। আমরা যেন সকলেই এক একটি নদী, তুমি একটি নদী, আমি হয়তো আর একটি—এভাবে প্রত্যেকেই এক একটি নদীর মতো। এরকম অসংখ্য নদী দ্রুতবেগে সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে। তারা যেন বলছে : 'আমি বৃহৎ হতে চাই, আমি অসীম হতে চাই।' ক্ষীণ জলধারা হয়ে গঙ্গানদী হিমালয় থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা নদীর রূপ নেয় এবং ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। তার যেন সবসময় একটা তাড়া থাকে যে, 'আমাকে সমুদ্রে মিলিত হতে হবে।' সে অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে সমুদ্র হতে চায়।

আমরা বৃহৎ হতে চাই কেন? কারণ আমরা যে স্বরূপত অসীম। যদিও আমরা নিজেদেরকে ক্ষুদ্র, দুর্বল বলে মনে করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই। আমরা অনন্ত। আমরা অসীম।

নদী যখন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তখন কি হয়? 'অস্তং গচ্ছন্তি'—তাদের পৃথক অস্তিত্ব তখন লোপ পায়। সমুদ্রের সাথে তারা মিলিত হয়। অর্থাৎ তারা সমুদ্রই হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, আত্মজ্ঞান লাভ হলে জীবাত্মা পরমাত্মাই হয়ে যান। 'নাম-রূপে ভিদ্যেতে'—তাদের নামরূপ লোপ পায়। সেই গঙ্গা এখন কোথায়? কোথায় বা সেই যমুনা? সেই নামরূপে তারা আর এখন নেই। আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা নাম এবং রূপ আছে। সেই নামরূপের বিভিন্নতার জন্যই আমরা একে অপরের থেকে আলাদা। কিন্তু এই সবই উপাধিমাত্র। আমি তো কোন নাম নিয়ে জন্মাইনি। নামকরণ হয়েছিল জন্মের পরে। ছোট শরীর নিয়ে আমি জন্মেছিলাম। এবং ক্রমশ তা বড় হয়েছে। প্রথমে আমার যে গঠন ছিল এখন আর তা নেই। এই নামরূপ চিরস্থায়ী নয়।

'পরিদ্রষ্টুঃ' অর্থ হল প্রকৃত দর্শক, জ্ঞানী ব্যক্তি, চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'পরি' অর্থাৎ নির্ভুলভাবে এবং 'দ্রষ্টুঃ' অর্থাৎ দর্শক বা পর্যবেক্ষক। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি মনোযোগের সাথে নিজেকে লক্ষ্য করেন তবে তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে তিনি দেহ নন। তিনি দেহ অপেক্ষা অনেক বেশি কিছু। তখন তিনি অনুভব করেন এই সকল কলা আরোপিত মাত্র। তারা পুরুষের কাছ থেকেই এসেছে, পুরুষকে আশ্রয় করেই আছে এবং পুরুষেই লয় হয়ে যাবে। তাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

সাধক যখন এই সত্যকে উপলব্ধি করেন তখন তিনি পুরুষে লীন হয়ে যান। 'পুরুষ'ই ব্রহ্ম, এটাই হল আমাদের প্রকৃত পরিচয়। সাধক তখন উপলব্ধি করেন। তিনি কেবলমাত্র এই দেহতেই সীমাবদ্ধ নন। তিনি অসীম, তিনি পূর্ণ। 'অকলঃ'— তিনি উপাধিরহিত, নির্গুণ। তিনি তখন অমর হয়ে যান—'অমৃতঃ ভবতি'। এ দেহের মৃত্যু ঘটে কিন্তু তিনি তো আর দেহ নন। তিনি আত্মা। তিনি ব্রহ্ম।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥৬

অন্বয়: রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) [কেন্দ্রবিন্দু]; অরাঃ ইব (শলাকার মতো); যস্মিন্ (যে পুরুষে); কলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ (গুণসকল [যেমন প্রাণ ইত্যাদি] আরোপিত); তং বেদ্যং পুরুষম্ (সেই পুরুষকে [সেই পরমাত্মাকে] জানতে হবে); বেদ (তাঁকে জান); যথা (যাতে); মৃত্যুঃ বঃ মা পরিব্যথাঃ ইতি (মৃত্যু তোমাদের ব্যথা দিতে না পারে)।

সরলার্থ: রথনাভিতে (রথচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে) রথচক্রের শলাকাগুলি প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে জীবাত্মার উপাধিসকলও পুরুষের (পরমাত্মার) ওপর আশ্রিত। সেই পুরুষকে জানতে চেষ্টা কর। তাঁকে জানতে পারলে মৃত্যু আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। চক্রের মধ্যে শলাকা থাকে। সেই শলাকাগুলি একটি কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ রথচক্রের নাভি থেকেই এসেছে এবং নাভির ওপরেই আশ্রিত। এখানে কলা বা উপাধিসকলকে রথচক্রের শলাকার সাথে এবং ব্রহ্মকে রথচক্রের কেন্দ্রবিন্দুর (নাভি) সাথে তুলনা করা হয়েছে। এমন কোন একটা আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের প্রয়োজন যার ওপর এই জগৎ স্থিত। আর সেই আশ্রয়ই হলেন ব্রহ্ম। রথচক্রের শলাকাগুলি যেমন তার নাভির ওপর আশ্রিত ঠিক তেমনি এ জগৎ ব্রহ্মে স্থিত।

'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ'—'তুমিই সেই পুরুষ, তুমিই আত্মা'—একথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। 'আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা'—এই জ্ঞান অর্জন করতে পারলে মৃত্যুভয় আর আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা তখন উপলব্ধি করি, 'আমি পূর্ণ, আমিই পৃথিবীর সবকিছু হয়েছি' এবং 'আমি অমর'।

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি॥৭

অন্বয়: তান্ উবাচ হ [পিপ্পলাদ] (তাদের [অর্থাৎ শিষ্যদের] বললেন); অহম্ (আমি); এতৎ পরং ব্রহ্ম (এই পরব্রহ্ম); এতাবৎ এব (এই পর্যন্ত); বেদ (জানি); অতঃ পরম্ (এর চেয়ে উচ্চতর); ন অস্তি (আর নাই)।

সরলার্থ: পিপ্পলাদ শিষ্যদের বললেন : 'পরব্রহ্মকে আমি এই পর্যন্তই জানি। তাঁর সম্পর্কে জানবার আর কিছু নেই।'

ব্যাখ্যা: এই হল গুরুর শেষ কথা। আমাদের মনে পড়বে, একদল তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী ঋষি পিপ্পলাদের কাছে এসেছিলেন। এই সকল তরুণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও পরম সত্য

সম্পর্কে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছিল না। শাস্ত্রের শব্দার্থ তাঁরা বুঝেছিলেন কিন্তু মর্মার্থকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। তাই এইসব শিক্ষার্থীরা পিপ্পলাদকে বলেছিলেন : ‘সবকিছু (শাস্ত্র) পড়েও আমাদের মনে হচ্ছে আমরা কিছুই জানি না। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের শিক্ষা দিন। আমরা ব্রহ্মকে জানতে চাই।’

তখন পিপ্পলাদ সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন। সবশেষে তিনি বললেন : ‘এই হল পরমতত্ত্ব। এর অতিরিক্ত আমি আর কিছুই জানি না এবং আমি মনে করি এর বাইরে আর কিছুই নেই।’ মুণ্ডক উপনিষদে আছে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি সব কিছু জানেন। আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, কিন্তু সে জ্ঞানই চূড়ান্ত নয়। যতক্ষণ ব্রহ্মকে জানতে না পারি ততক্ষণ আমরা কিছু জানি না। আমাদের মধ্যে তখন শূন্যতার বোধ জন্মায়। ঋষি পিপ্পলাদ বললেন: ‘পরব্রহ্ম ছাড়া আর জানবার কিছুই নেই। আমি তোমাদেরকে এই পরব্রহ্মের কথাই বলেছি। এছাড়া পরব্রহ্ম সম্পর্কে আর কিছু বলবার নেই।’

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত। পরব্রহ্মকে জানাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। তুমি হয়তো একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে তোমার অগাধ পাণ্ডিত্যও আছে। কিন্তু পাণ্ডিত্য এবং ব্রহ্মজ্ঞান এক নয়। শাস্ত্রনিহিত সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে না পারলে তা হবে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ মাত্র। আত্মজ্ঞান লাভ হলে মানুষের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। তিনি এক অন্য মানুষে পরিণত হন। এটাই জ্ঞানের পরীক্ষা। আমরা শাস্ত্র নিয়ে নানা আলোচনা করতে পারি, এমনকি তা থেকে উদ্ধৃতিও দিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি নীচ, স্বার্থপর ও অসৎ হই তবে এই সকল আলোচনা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনই আমাদের বলে দেয় তিনি পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর চরিত্র আমাদের আকৃষ্ট করে। তাঁকে ভগবান বলে মনে হয়। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু আগুনকে কি কখনও লুকিয়ে রাখা যায়? শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারেন না। আমরা তাঁকে দেখে আনন্দ পাই। কারণ তিনি যে আনন্দস্বরূপ। এই লক্ষণ দেখেই ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিকে চেনা যায়।

তে তমর্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥৮

অন্বয়: তে (ঐ শিষ্যেরা); তম্ অর্চয়ন্তঃ (তাঁকে অর্চনা করতে আরম্ভ করলেন); ত্বং হি নঃ পিতা ([তাঁরা বললেন] আপনিই আমাদের পিতা); যঃ ([কারণ আপনি) যিনি); অস্মাকম্ (আমাদের); অবিদ্যায়াঃ পরং পারম্ (অবিদ্যার পরপারে); তারয়সি (নিয়ে গেলেন); নমঃ

পরম-ঋষিভ্যঃ (আমরা মহান ঋষিদের প্রণাম করি); নমঃ পুরম-ঋষিভ্যঃ ([পুনরায়] আমরা মহান ঋষিদের প্রণাম করি)।

সরলার্থ: শিষ্যরা গুরুর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁরা বললেন : 'আপনি আমাদের পিতা, কারণ আপনিই আমাদের অজ্ঞানতার পরপারে নিয়ে গেছেন। আমরা সেই মহান ঋষিদের বারবার প্রণাম করি।'

ব্যাখ্যা: শিষ্যরা এখন সবকিছু জেনেছেন। তাই তাঁরা গুরুর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আত্মজ্ঞানই সর্বোচ্চ দান। অর্থদানও দান। কিন্তু অর্থ তো চিরস্থায়ী নয়। আবার শিক্ষাদানও যথেষ্ট নয়। কারণ শিক্ষার সাহায্যেও সব সমস্যার সমাধান হয় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। তাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে শিষ্যরা গুরুকে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন।

'ত্বং হি নঃ পিতা'—আপনিই আমাদের পিতা। পিতা যেমন ধনসম্পদ তাঁর সন্তানদের দিয়ে যান ঠিক তেমনি আপনি আমাদের এই সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেছেন।

আমরা গুরুকে পিতা বলি কেন? শঙ্করাচার্য বলেন : যিনি তোমাকে এই শরীর দিয়েছেন তিনিই তোমার পিতা। এই কারণে তিনি পূজনীয়। আমরা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমরা তাঁকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখান, যিনি আমাকে অভয়ধামে পৌঁছে দেন তাঁকে আমরা কোন্ স্থান দেব? তিনি কি আমাদের পিতা নন?

'অস্মাকম্ অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি'—তিনি আমাদের অজ্ঞান নদীর পরপারে নিয়ে যান। প্রায় সবধর্মেই এই নদীর ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। এই সেই নদী যার পরপারে আমাকে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে অপর পারে যাব আমি তা জানি না। এই নদীটি কি? এ অজ্ঞানতার নদী। কে আমাদের এই নদীর অপর পারে পৌঁছে দেবেন? গুরু, তিনিই তো আমাদের কর্ণধার।

'নমঃ পরমঋষিভ্যঃ'—এবার আমরা সকল গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করি, যাঁরা এই জ্ঞান—আত্মজ্ঞান বা পরমজ্ঞান আমাদের দান করেছেন। কিন্তু এখানে 'নমঃ পরমঋষিভ্যঃ' কথাটি দুবার বলা হয়েছে কেন? গুরুর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

এখানেই প্রশ্ন উপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্ন সমাপ্ত।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মুণ্ডক উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: দেবাঃ (হে দেবগণ), কর্ণেভিঃ (কান দিয়ে); ভদ্রম্ (ভাল যা কিছু); শৃণুয়াম (যেন তাই শুনতে পাই); যজত্রাঃ (হে পূজ্য দেবগণ); অক্ষভিঃ (চোখ দিয়ে); ভদ্রম্ (যা কিছু ভাল); পশ্যেম (যেন তাই দেখতে পাই); স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ (স্থির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা); তুষ্টুবাংসঃ (যেন তোমাদের স্তুতি করতে পারি); দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবগণ যে আয়ু বিহিত করে দিয়েছেন); ব্যশেম (তা যেন লাভ করতে পারি); শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ কীটপতঙ্গ, হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত বিঘ্নের শান্তি])।

সরলার্থ: দেবতাদের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা যে আমরা যেন যা কিছু ভাল শুধু তা-ই কান দিয়ে শুনি। দেবতাদের আমরা পুজো করি, আর তাঁদের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, চোখ দিয়ে আমরা যেন শুধু ভাল জিনিসই দেখি। আরো প্রার্থনা, কায়মনোবাক্যে যেন তাদেরই জয়গান করি। তাঁদের যেমন ইচ্ছা ততদিনই যেন বেঁচে থাকি—বেশি নয়, কমও নয়। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: আমরা যেন ভাল কথা শুনি। 'ভাল' বলতে কি বুঝায়? যা কল্যাণপ্রদ, যা অনুকূল। দর্শন একটা শক্ত বিষয়। এ বুঝতে গেলে গভীর মনোযোগ চাই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যা আমার পক্ষে কল্যাণকর, তাই শুধু আমরা দেখব। এতে আমাদের জ্ঞানার্জনের সুবিধা হবে এবং আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

এই প্রার্থনার মধ্যে আমাদের অঙ্গাদি স্থির থাকুক, এ কথাও বলা আছে। অঙ্গ বলতে শুধু বাইরের স্থূল অঙ্গ নয়, মনও ঐ সঙ্গে আছে বুঝতে হবে। শরীর ভাল থাকবে, মনও ভাল থাকবে। তবেই কাজে মন দিতে পারব। হয়তো শরীরের কোথাও একটা ব্যথা আছে। এতে মন বিক্ষিপ্ত থাকবে। মন যেন সর্বদা সজাগ থাকে; শরীরে বা মনে অবসাদ, জড়তা

এসব কিছু যেন না থাকে। শরীর ও মন দুই-ই যেন স্থির থাকে, আর আমাদের আয়ত্তে থাকে।

আমরা এইভাবে চলব, তবে আমাদের আয়ু বিধাতার যেমন বিধান তেমনি হোক।

আমরা মুণ্ডক উপনিষদ পড়তে চলেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আমাদের শরীর-মন যেন সুস্থ থাকে। আমরা যেন আমাদের অধ্যয়নে ডুবে থাকতে পারি। বিধাতার যেমন ইচ্ছা ততদিন যেন এইভাবে বেঁচে থাকতে পারি।

মুণ্ডক উপনিষদ

অন্যান্য উপনিষদের মতো মুণ্ডক উপনিষদও পরম সত্যের আলোচনা করেন। এই পরম সত্য কি? আচার্য শঙ্করের মতে, কয়েকটি মাত্র শব্দ দিয়েই এই সত্যকে বোঝানো যায়, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং এই জগৎ মিথ্যা। সত্য বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, 'যা চিরন্তন সত্য'। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন বস্তু সত্য হতে পারে, কিন্তু বস্তুটির যদি সবসময় পরিবর্তন হতে থাকে তবে বস্তুটি সত্য নয় অর্থাৎ মিথ্যা। একই কথা স্থানের বেলাতেও খাটে। যদি কোন বস্তু একটি বিশেষ স্থানে সত্য হয়, কিন্তু অন্যত্র যদি না হয়, তবে মিথ্যা। 'জগৎ মিথ্যা'—এই জগৎ বলতে যে জগৎকে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি তাকে বোঝানো হয়েছে। আমরা সকলে এই জগৎকে দেখতে পাই। এমন কথা আমরা বলতে পারি না যে, এ জগৎকে দেখা যায় না। এই জগতের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু তা একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্য সত্য। পরমুহূর্তেই এই জগতের পরিবর্তন হয় এবং তার আগের অস্তিত্ব লোপ পায়। জগতের ধর্মই এই এবং এই অর্থেই এ জগৎকে মিথ্যা বলা হয়েছে। যা সত্য তা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অবিনাশী এবং তিনিই ব্রহ্ম। তাই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—'ব্রহ্ম সত্যম্'।

আমাদের সকলের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন অর্থাৎ এই জীবাত্মাও যে ব্রহ্ম, এটি উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা স্বরূপত ব্রহ্ম। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই। এই অজ্ঞানতার জন্যই আমরা যাবতীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে থাকি। উপনিষদ আমাদের এই অজ্ঞানতা দূর করতে সচেষ্ট। কারণ উপনিষদ বলেন, 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। অর্থাৎ তুমিই সেই পরমসত্তা, তুমিই ব্রহ্ম। তুমি এই দেহ নও, মন নও, তুমি সেই সত্য। তুমি অমর, অবিনাশী আত্মা। আত্মার মৃত্যু নেই, জন্মও নেই। তুমি অপরিবর্তনীয়, শোকদুঃখ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি আনন্দস্বরূপ। এই হল উপনিষদের বাণী। সব উপনিষদ বিশেষত মুণ্ডক উপনিষদ মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন।

মুণ্ডক শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যিনি মুণ্ডিত। একদিক থেকে বলতে গেলে, মুণ্ডক উপনিষদে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা মুণ্ডিত মস্তক তথা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্য। কিন্তু প্রসঙ্গত 'মুণ্ডক' কথাটির অন্য একটি অর্থও আছে—'দূর করা'। এক্ষেত্রে এটিই প্রাসঙ্গিক। এই জ্ঞান আমাদের অজ্ঞতা দূর করে। কিসের অজ্ঞতা? নিজের এবং জগতের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা। আমরা ব্রহ্ম, আমরা স্বরূপত দেবতা, যে কোন কারণেই

হোক আমরা একথা জানি না। এই না জানাটাই অজ্ঞতা। আর এই অজ্ঞতা দূর করাই মুণ্ডক উপনিষদের লক্ষ্য।

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম অধ্যায়

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥১

অন্বয়: ব্রহ্মা (ব্রহ্মা); দেবানাম্ (দেবতাগণের মধ্যে); প্রথমঃ (প্রথমে); সংবভূব (সম্যক্-রূপে অভিব্যক্ত হলেন); সঃ (তিনি); বিশ্বস্য (জগতের); কর্তা (স্রষ্টা); ভুবনস্য (সৃষ্টির); গোপ্তা (পালয়িতা); সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্ (সকল বিদ্যার আশ্রয় স্বরূপ); ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা [তিনি]); জ্যেষ্ঠপুত্রায় (জ্যেষ্ঠপুত্র); অথর্বায় (অথর্বাকে); প্রাহ (বলেছিলেন)।

সরলার্থ: দেবগণের মধ্যে যিনি প্রথম প্রকাশিত তিনিই ব্রহ্মা। তিনিই এই জগৎ চরাচরের স্রষ্টা ও আশ্রয়। ব্রহ্মজ্ঞানই অপর সকল জ্ঞানের উৎস। ব্রহ্মা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে এই জ্ঞান দান করেন।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তিনি নামরূপহীন। তিনি বাক্যমনাতীত। তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। তিনি নির্গুণ এবং অব্যক্ত।

কিন্তু মায়াশক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। এই জগতে যা কিছু আছে তিনিই তার আদি কারণ এবং তাঁরই অপর নাম ব্রহ্মা বা প্রজাপতি। ব্রহ্মার জন্ম হয়নি। কারণ ব্রহ্মা 'জাত' হলে তাঁর নিশ্চয়ই পিতামাতা আছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, এই পিতামাতারও আবার পিতামাতা আছে। আবার তাঁরও আছে, এভাবে চলতেই থাকবে। ব্রহ্মাই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ এবং দেবগণের মধ্যেও ইনি প্রথম। তিনিই এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, আবার তাঁকে আশ্রয় করেই এ জগৎ রয়েছে।

যেহেতু বেদসমূহ ব্রহ্মার কাছ থেকে এসেছে সেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানের তিনিই উৎস। ঋষিদের মধ্যে অথর্বাই প্রথম ঋষি। তাই তাঁকে ব্রহ্মার প্রথম সন্তান বলা হয়। কথিত আছে, ব্রহ্মা এই জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) অথর্বাকে দান করেন। সকল জ্ঞানের উৎস বা ভিত্তি হল এই ব্রহ্মজ্ঞান। তাই তাকে 'সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্' বলা হয়। ব্রহ্মই পরমসত্য। তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। তিনি আছেন বলেই সব কিছু আছে। ব্রহ্মই সকল জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্বা
তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহার প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥২

অন্বয়: ব্রহ্মা (ব্রহ্মা); যাম্ (যে ব্রহ্মবিদ্যা); অথর্বণে (অথর্বাকে); প্রবদেত (বলেছিলেন); অথর্বা (অথর্বা); তাম্ (সেই); ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা); অঙ্গিরে (অঙ্গিরকে); পুরা (পুরাকালে); উবাচ (বললেন); সঃ (তিনি); ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজ গোত্রীয়); সত্যবহায় (সত্যবহকে); প্রাহ (বললেন); ভারদ্বাজঃ (ভারদ্বাজ অর্থাৎ সত্যবহ); পরাবরাম্ ([পরা—শ্রেষ্ঠ, প্রবীণ, যেমন গুরু, এবং অবরাম্—নিকৃষ্ট, তরুণ, যেমন ছাত্র] গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরায়); অঙ্গিরসে [প্রাহী] (অঙ্গিরসকে বললেন)।

সরলার্থ: পুরাকালে ব্রহ্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বাকে দিয়েছিলেন, অথর্বা আবার সেই জ্ঞান ঋষি অঙ্গিরকে দিয়ে যান। অঙ্গির আবার সেই জ্ঞান ভরদ্বাজ-বংশীয় সত্যবহকে দেন। গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই জ্ঞান সত্যবহ আবার অঙ্গিরসকে দিয়ে যান।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মজ্ঞান গুরুমুখী বিদ্যা। এই জ্ঞান (এই মৌখিক বিদ্যা) পিতা থেকে পুত্রে, গুরু থেকে শিষ্যে, পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনিই একমাত্র এই জ্ঞান দান করতে পারেন, কোন অজ্ঞ ব্যক্তি পারেন না। এ যেন একটা দীপ থেকে আর একটা দীপ জ্বালানো।

শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুর জীবন দেখে সে শিক্ষা লাভ করবে। ব্রহ্মজ্ঞান মানুষের জীবনকে পালটে দেয়। যিনি এই জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি অন্য এক ব্যক্তিতে পরিণত হন। যীশুখ্রীষ্ট এদেরকেই পৃথিবীর সেরা মানুষ বলে চিহ্নিত করেছেন। এমন মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন বলেই এ পৃথিবী আমাদের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এই জ্ঞানলাভই মানুষের জীবনের লক্ষ্য এবং আমরা তারই চেষ্টা করছি। আমাদের শাস্ত্রে বলে বই পড়া জ্ঞানই সব নয়। বই পড়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। সৎ-গুরুই একমাত্র এই জ্ঞান দিতে পারেন। সৎ-গুরুর নির্দেশেই এই ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং
বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং
বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥৩

অন্বয়: মহাশালঃ (বিশিষ্ট গৃহস্থ); শৌনকঃ (শুনক পুত্র); হ বৈ (প্রসিদ্ধি অর্থে); বিধিবৎ (শাস্ত্র বিধি অনুসারে); অঙ্গিরসম্ উপসন্নঃ (অঙ্গিরসের কাছে উপস্থিত হয়ে); পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করলেন); ভগবঃ (হে ভগবান); কস্মিন্ নু বিজ্ঞাতে (কি জানলে); ইদম্ (এই); সর্বম্ (সব কিছু); বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি (জানা যায়)।

সরলার্থ: শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বিশিষ্ট গৃহী শৌনক ঋষি অঙ্গিরসের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রভু, কি জানলে বা কোন্ বস্তুকে জানলে, সব কিছুকে (এই জগৎ) বিশেষ রূপে জানা যায়?'

ব্যাখ্যা: শৌনক উত্তম গৃহী। যিনি সকল কর্তব্য ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করেছেন, এবং পরম জ্ঞান লাভের জন্য যাঁর মন প্রস্তুত, তিনিই উত্তম গৃহী। এই পরম জ্ঞান শুধু ঋষি এবং সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যই নয়। সংসারের সকল কর্তব্য যথাবিধি করেছেন এমন গৃহীও এই জ্ঞানলাভের অধিকারী। গৃহী ব্যক্তি যখন নিখুঁতভাবে কর্তব্য পালন করেন তখন তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়। তিনি তখন বুঝতে পারেন তিনি এই দেহ নন। মনও তখন তাঁর বশে। এই হল পরম জ্ঞান লাভের উপযুক্ত ক্ষণ।

এই জ্ঞান অর্জনের জন্য গুরুর কাছে যেতে হবে। তাই শৌনক বিধিমতে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী যজ্ঞের কাঠ নিয়ে অঙ্গিরসের কাছে গেলেন। যজ্ঞের কাঠ হাতে নিয়ে গুরুর কাছে যাওয়া বিনয় ও আত্মসমর্পণের প্রতীক। গুরু সব শিষ্যকেই এই জ্ঞান দেন না। শিষ্যকে পরীক্ষা করে উপযুক্ত বলে মনে হলেই এই জ্ঞান দান করেন।

শৌনক গুরুকে একটি চমৎকার ও কঠিন প্রশ্ন করলেন: 'কোন্ বস্তুকে জানলে এই জগৎ-চরাচরের সবকিছুকে জানা যায়? অনুগ্রহ করে আমাকে সেই শিক্ষা দিন, যার ফলে আমি এই জগৎকে জানতে পারি। কেউ কেউ বলেন যে, বিজ্ঞানকে জানতে গেলে গণিতবিদ্যাকে অবশ্যই জানতে হবে। কারণ অঙ্কই বিজ্ঞান জগতে ঢোকার চাবিকাঠি। অনুরূপভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা লাভ করলে আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে পারব? তাই কথোপকথন শুরু হচ্ছে সরাসরিভাবে—'আমার কি করা উচিত? আমি আর ঘুরে বেড়াতে পারছি না। আমি সোজাসুজি সত্যকে জানতে চাই। কি জানলে বা কাকে জানলে এই দৃশ্যমান জগতের সবকিছুকে আমি জানতে পারব? অনুগ্রহ করে আমাকে সেই শিক্ষা দিন।' এটাই হল মূল জিজ্ঞাসা।

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে
ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥৪

অন্বয়: তস্মৈ (তাঁকে অর্থাৎ শৌনককে); সঃ (তিনি অর্থাৎ অঙ্গিরস); হ উবাচ (বললেন); ইতি হ স্ম (এই যে কথাটি); ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞানীরা); বদন্তি (বলেন); দ্বে (দুটি); বিদ্যে (বিদ্যা); বেদিতব্যে (জানতে হবে [বিদ্যা দুটি]); যৎ পরা (শ্রেষ্ঠ [আধ্যাত্মিক] জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ['পরা পরম-আত্মা', পরম অর্থাৎ পরমাত্মা]); চ এব (এবং); অপরা চ (নিকৃষ্ট [পার্থিব] জ্ঞান, এই দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান)।

সরলার্থ: অঙ্গিরস শৌনককে বললেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন জ্ঞান দুই প্রকার, ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরম-জ্ঞান; আর আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কীয় জ্ঞান।'

ব্যাখ্যা: আধ্যাত্মিক ও জাগতিক এই দুই প্রকার জ্ঞানই অর্জন করতে হবে। জাগতিক জ্ঞান বলতে এই দৃশ্যমান জগৎ-সংক্রান্ত জ্ঞান বোঝায়, এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলতে ব্রহ্মজ্ঞানকে বোঝায়। জাগতিক জ্ঞান বহুর জ্ঞান; আধ্যাত্মিক জ্ঞান হল একের জ্ঞান। জাগতিক জ্ঞানের নিজস্ব কোন মূল্য নেই, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসাবে এর যা কিছু মূল্য। পার্থিব জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে যুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আর এই অর্থেই এ জগৎকে উপেক্ষা করা যায় না। জ্ঞান জ্ঞানই, তা পার্থিবই হোক বা আধ্যাত্মিকই হোক। কিন্তু জাগতিক জ্ঞান মানুষকে শান্তি বা আনন্দ দিতে পারে না। এই জ্ঞান আমাদের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয় বটে কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়। পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের সাময়িক তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু অচিরেই সেই তৃপ্তির নাশ হয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥৫

অন্বয়: তত্র (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক—এই বিদ্যা দুটির মধ্যে); ঋগ্বেদঃ (ঋগ্বেদ); যজুর্বেদঃ (যজুর্বেদ); সামবেদঃ (সামবেদ); অথর্ববেদঃ (অথর্ববেদ); শিক্ষা (উচ্চারণ বিদ্যা); কল্পঃ (আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিদ্যা); ব্যাকরণম্ (ব্যাকরণ বিদ্যা); নিরুক্তম্ (শব্দার্থ বিদ্যা); ছন্দঃ (ছন্দ বিদ্যা); জ্যোতিষম্ (জ্যোতিষ বিদ্যা); ইতি অপরা (এই সকল অপরা বিদ্যা); অথ পরা (আর পরাবিদ্যা হল); যয়া (যে বিদ্যার দ্বারা); তৎ অক্ষরম্ (যা ক্ষয়হীন বা নিত্য [ব্রহ্মকে]); অধিগম্যতে (জানা যায়)।

সরলার্থ: উপরোক্ত দুই শ্রেণীর বিদ্যা হল পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা হল : ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ বিদ্যা), কল্প (অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিদ্যা),

ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থ বিদ্যা), ছন্দ, জ্যোতিষ—এই দশটি। আর পরা বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, যে ব্রহ্ম শাশ্বত ও নিত্য।

ব্যাখ্যা: জাগতিক অর্থাৎ অপরা বিদ্যার মধ্যে কি কি পড়ে? তা হল, চারটি বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব; এ ছাড়া ছয়টি বেদাঙ্গ, যা বেদ পাঠে সাহায্য করে। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হল—শিক্ষা (উচ্চারণ), কল্প (আচার-অনুষ্ঠান), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থ বিদ্যা), ছন্দ এবং জ্যোতিষ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ সংক্রান্ত বিদ্যাই হল অপরা জ্ঞান বা অপরা বিদ্যা। বস্তুত এই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। কারণ এর দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি না। কথামৃতকার শ্রীম (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁর নিজের স্ত্রী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যে মন্তব্য করেছিলেন আমরা সেকথা সকলেই জানি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার পত্নী অজ্ঞান।' শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'তা সে অজ্ঞান, আর তুমি বুঝি খুব জ্ঞানী?' এর আগে জ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে শ্রীম-র মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। তাই তিনি ভেবেছিলেন, 'অবশ্যই আমি জ্ঞানী। কারণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত। এছাড়া অনেক বইও আমি পড়েছি। তখন পর্যন্ত তিনি জানতেন লেখাপড়া শিখলে ও বই পড়তে পারলেই জ্ঞানলাভ হয়। এই প্রথম তিনি বুঝলেন, ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান, না জানাই অজ্ঞান।

আমরা বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য বিষয় জানতে পারি। বস্তুত পার্থিব জীবনে এই সব জ্ঞান প্রয়োজনীয়। জীবন ধারণের জন্য এসব অপরিহার্য। কারণ মানুষকে স্বনির্ভর হতে হবে। কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়, জীবনের লক্ষ্যও নয়। এই জাতীয় জ্ঞান কখনই আমাদের মুক্তি দিতে পারে না।

তবে প্রকৃত জ্ঞান কি? অঙ্গিরসকে শৌনক যে প্রশ্ন করেছিলেন আমরা আবার সেই মূল প্রশ্নে ফিরে যাই। প্রশ্নটি ছিল—'কোন্ বস্তুকে জানলে সব কিছুকে জানা যায়?' অঙ্গিরস উত্তরে বললেন, 'এই পরা বিদ্যার দ্বারা আমরা অক্ষরকে জানতে পারি। অক্ষর অর্থাৎ যাঁর ক্ষয় নেই। তিনি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিনাশী। সেই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কী? ব্রহ্ম। যে বিদ্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে জানতে পারি তা হল পরাবিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥৬

অন্বয়: তৎ যৎ (সেই অক্ষর ব্রহ্ম); অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না); অগ্রাহ্যম্ (যাঁকে গ্রহণ করা যায় না); অগোত্রম্ (মূল বা উৎস নেই); অবর্ণম্ (রূপহীন); অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ (চক্ষুকর্ণহীন); তৎ (সেই); অপাণিপাদম্ (হাত পা বর্জিত); নিত্যম্ (অবিনাশী); বিভুম্ (ব্যাপক); সর্বগতম্ (সর্বব্যাপী); সুসূক্ষ্মম্ (অতি সূক্ষ্ম); তৎ (সেই); অব্যয়ম্ (ক্ষয়হীন); যৎ (যিনি); ভূতযোনিম্ (সৃষ্টির উৎস); [সেই ব্রহ্মকে] ধীরাঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিরা); পরিপশ্যন্তি (সর্বত্র দেখেন)।

সরলার্থ: যিনি অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত), অগ্রাহ্য (কর্মেন্দ্রিয়ের অতীত), স্বয়ম্ভু, অরূপ, সকল ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) অবিনাশী এবং সর্বব্যাপী (আকাশের মতো) এবং যিনি সূক্ষ্মতম ও সকল সৃষ্টির উৎস—সেই ব্রহ্মকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ববস্তুতে এবং সর্বত্র দেখেন।

ব্যাখ্যা: এই ব্রহ্মকে বর্ণনা করা যায় কি ভাবে? তিনি অবর্ণনীয়। প্রথমে উপনিষদ ব্রহ্মকে নেতিবাচক ভাবে বর্ণনা করেছেন। 'নেতি নেতি'—ব্রহ্ম এই নন, ব্রহ্ম সেই নন। ব্রহ্মকে চোখে দেখা যায় না (অদ্রেশ্যম্)। তিনি জ্ঞেয় বস্তু নন। তিনি জ্ঞাতা, কাজেই তিনি দৃষ্টিগোচর হতে পারেন না। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন—অগ্রাহ্যম্। কোন বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি কিন্তু ব্রহ্মকে পারি না। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ, যিনি কোন শর্তের অধীন নন। তিনি স্বয়ম্ভু—অগোত্রম্। অর্থাৎ তিনি বংশ পরিচয়ের অতীত। তাঁর কোন রূপ নেই—অবর্ণম্। তাঁর কোন গুণ নেই। তিনি চোখ কান (অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্), এবং হাত-পা (অপাণিপাদম্) বর্জিত। তিনি নিরাকার। তাই তাঁর কোন রূপ নেই। তাঁর যদি রূপ থাকত তবে তাঁকে আমরা দেখতে পেতাম, স্পর্শ করতে পারতাম, তাঁর কথা শুনতে পেতাম। কিন্তু যেহেতু তিনি অরূপ তাই আমরা বলতে পারি না, 'আমি ব্রহ্মকে দেখেছি'।

এই জগতে দুটি জিনিস আছে—জ্ঞাতা (বিষয়ী) এবং জ্ঞেয়বস্তু (বিষয়)। আমি জ্ঞাতা আর এই টেবিলটি জ্ঞেয়বস্তু। আমার বাইরে যদি কোন বস্তু থাকে তবে আমি তাকে দেখতে পারি, স্পর্শ করতে পারি বা অনুভব করতে পারি। এই হল জ্ঞাতা-জ্ঞেয় (বিষয়ী-বিষয়) সম্পর্ক। কিন্তু যখন একটি মাত্র সত্তা থাকে অর্থাৎ জ্ঞাতা-জ্ঞেয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখন জ্ঞাতাই বা কে আর জ্ঞেয় বস্তুই বা কি? যতক্ষণ আমাদের মধ্যে দুই বোধ থাকে ততক্ষণ জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ থাকে। তখনই দুই-এর মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে: জ্ঞেয় বস্তুটি কি রকম? তাঁকে কি দেখা যায়? অনুভব করা যায়? এই জাতীয় নানা প্রশ্ন তখন মনে আসে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জগতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনি সৎ স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। জগতে সব অস্তিত্ব, সব জ্ঞান এবং সকল আনন্দ এই ব্রহ্মের কাছ থেকেই এসেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মই সব কিছুর উৎস।

যেহেতু ব্রহ্ম সব কিছুর উৎস সেহেতু তিনি ইতিবাচক। প্রথমে উপনিষদ ব্রহ্মকে নেতি, নেতি করে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ব্রহ্ম ইতিবাচক; যেমন, ব্রহ্ম নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বগত এবং সকল বস্তুতে বিরাজিত। ব্রহ্মা কেবলমাত্র আমার মধ্যেই আছেন আর অন্যের মধ্যে নেই—এমন কথা বলা চলে না। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী অর্থাৎ তিনি সর্বত্র আছেন। আবার সকল বস্তুর মধ্যেও তিনিই রয়েছেন। ব্রহ্ম অণুর অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মতমের চেয়েও সূক্ষ্ম। তিনি ক্ষয় এবং পরিবর্তন রহিত। সকল সৃষ্টির তিনিই উৎস। সমগ্র জগতের মূল এই ব্রহ্মেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু একথা কে উপলব্ধি করতে পারেন? জ্ঞানী এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ। তিনি জানেন সবকিছুর মূলে রয়েছেন এই ব্রহ্ম।

উপনিষদ প্রথমে বলেছিলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অতীত। এখন উপনিষদ বলছেন, তিনি সর্বত্র বিরাজিত। তবে তাঁকে দেখা যায় না কেন? কারণ তিনি সর্বত্র রয়েছেন। তাঁকে স্পর্শ করা যায় না কেন? কারণ তিনি সবার মধ্যে বিরাজ করছেন। যখন কেউ বলে, ‘আমি এটি দেখতে চাই’—তখন আমি জ্ঞাতা, এবং যা আমি দেখতে চাই সেটি জ্ঞেয়। জ্ঞেয় বস্তুটি আমার বাইরে রয়েছে। আমাদের মধ্যে তখনও দুই বোধ থাকে। কিন্তু আসলে এক বৈ দুই নেই। আর সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তাই হলেন ব্রহ্ম। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: যদি একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, তবে দৃশ্যমান জগতে আমি ‘বহু’ দেখি কি করে? এই জীব জগই বা কোথা থেকে এল? এর স্রষ্টা কে? এই বৈচিত্রময় জগৎকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে কেমন করেই বা বলব এ জগতের কোন অস্তিত্ব নেই? এর ব্যাখ্যা কি?

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সংভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্॥৭

অন্বয়: যথা (যেমন); ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়সা দ্বারা); [জাল] সৃজতে (সৃষ্টি হয়), চ (এবং); গৃহ্নতে (জাল নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়); যথা (যেমন); পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীর ওপরে); ওষধয়ঃ (বৃক্ষেরা); সংভবন্তি (জন্মায়); যথা (যেমন); সতঃ (সজীব); পুরুষাৎ (জীবদেহ থেকে); কেশলোমানি (কেশ এবং লোম); [সংভবন্তি (জন্মায়)]; তথা (সেইরূপ); অক্ষরাৎ (নিত্য ব্রহ্ম থেকে); ইহ (এই সংসারে); বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ); সংভবতি (উৎপন্ন হয়েছে)।
সরলার্থ: মাকড়সা নিজ দেহের ভিতর থেকে জাল বার করে এবং প্রয়োজনে সেই জাল আবার নিজ দেহের মধ্যেই গুটিয়ে নেয়। একইভাবে এই মাটিতে ফলমূল উৎপন্ন হয়,

জীবন্ত মানুষের দেহ থেকে কেশ ও লোম রাশি বের হয়। অনুরূপ ভাবে অক্ষর এবং শাশ্বত ব্রহ্ম থেকেই এই জগতের উদ্ভব।

ব্যাখ্যা: এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে কী ভাবে? ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে উপনিষদ এখানে একাধিক উপমার উল্লেখ করেছেন। উপনিষদ প্রথমে বলেছেন, মাকড়সা যেমন তার জাল নিজের শরীরের ভেতর থেকে বার করে, জগৎ সৃষ্টিও অনেকটা সেইরকম। কীটকে ফাঁদে ফেলবার জন্য মাকড়সা ঘরের কোণে জাল বোনে। এই মাকড়সার দেহ থেকেই বিরাট জাল বের হয়, আবার ইচ্ছা করলেই মাকড়সা তার জালটিকে নিজ দেহের ভিতর গুটিয়ে নিতে পারে। সেই রকমভাবে ব্রহ্ম এই জগৎকে নিজের ভেতর থেকে বাইরে বার করে আনেন আবার সেটিকে নিজের মধ্যেই ফিরিয়ে নেন। এই জগৎ ব্রহ্ম থেকে এসেছে আবার ব্রহ্মেই লয় হয়। কিন্তু এর দ্বারা কি ব্রহ্ম নিজে প্রভাবিত হন? না, তা হন না। জাল বোনার ফলে মাকড়সার যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, ঠিক তেমনি এই জগৎ প্রকাশের দ্বারা ব্রহ্ম বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন না। ব্রহ্ম অবিচল। সকল অবস্থাতেই তিনি অচঞ্চল, পরিবর্তনরহিত। জগতের অস্তিত্ব থাক বা না থাক ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয় না, ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। উপনিষদ আর একটি উপমা দিচ্ছেন, এই পৃথিবীর মাটিতেই উদ্ভিদের জন্ম। আমাদের চারপাশে ছোট বড় নানা রকম গাছপালা আমরা দেখে থাকি। এ সবই মাটি থেকে এসেছে এবং ভবিষ্যতে সব মাটিতেই ফিরে যাবে। উপনিষদের আর একটি উপমা হল মানুষের দেহের কেশ ও লোম রাশি। দেহের চৈতন্য আছে বলেই আমাদের দেহ থেকে কেশ ও লোম রাশি জন্মাতে পারে।

একই ভাবে এই জগৎ ব্রহ্মের কাছ থেকেই এসেছে আবার ব্রহ্মেই ফিরে যাবে। এই জগৎ কারোর সৃষ্টি নয়। এ ব্রহ্মেরই প্রকাশমাত্র। বেদান্ত মতে, শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না। সৃষ্টি বলে আসলে কিছুই নেই; যা আছে তা প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্মই জগৎ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। আবার তিনি জগৎকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেন। এই প্রক্রিয়া নিরবধি ঘটে চলেছে। এ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ দুই-ই ব্রহ্ম।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্।।৮

অন্বয়: ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); তপসা ([আক্ষরিক অর্থ হল তপস্যা, কিন্তু এখানে] মননের দ্বারা); চীয়তে (বিস্তৃত হলেন [অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করলেন]); ততঃ (তা থেকে [ব্রহ্ম]); অন্নম্ (অন্ন বা সৃষ্টির বীজ অর্থাৎ মায়া); অভিজায়তে (জন্মায়); অন্নাৎ (সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে);

প্রাণঃ (প্রাণ); মনঃ (মন); সত্যম্ (পঞ্চ মহাভূত); লোকাঃ (ভূ প্রভৃতি লোকসমূহ); [অভিজায়তে (ব্যক্ত হল বা সৃষ্টি হল)]; কর্মসু চ (এবং কর্ম থেকে); অমৃতম্ (কর্মফল সৃষ্টি হল])।

সরলার্থ: নিজ মনন শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রথমে সৃষ্টির বীজ (অর্থাৎ মায়া) সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই বীজ থেকে আসে প্রাণ (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ), প্রাণ থেকে আসে মন, সমষ্টি মন। তারপর আসে পঞ্চভূত এবং শেষে এই জগৎ। কর্ম থাকলেই তার ফল থাকবে, তাই কর্মফল অনন্ত ও অবিনাশী।

ব্যাখ্যা: জাল বাইরে বার করার বা নিজের ভেতরে গুটিয়ে নেওয়ার জন্য মাকড়সাকে কিছু চেষ্টা করতে হয়। জগৎকে প্রকাশ করতে ব্রহ্মকেও কি অনুরূপ চেষ্টা করতে হয়? না, তা হয় না। এই শ্লোকে এই সূত্রটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

‘ব্রহ্ম চীয়তে’—ব্রহ্ম প্রসারিত হন এবং নিজেকে প্রকাশ করেন। কেমন করে? ‘তপসা’—মনন শক্তির দ্বারা। ‘তপসা’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ ‘কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা’। কোন কাজ করতে গেলে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হয়তো আমার কোন জরুরী কাজ পড়ে গেছে, আর সেকাজটি তখনই করতে হবে। সে জন্য সময় অভাবে আমার হয়তো খাওয়াই হল না, যদিও আমি খুবই ক্ষুধার্ত। এই হল কৃচ্ছ্র সাধন। কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম কেবলমাত্র নিজ চিন্তার দ্বারা এই জগৎকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম শুধু চিন্তা করলেন—‘আমি এক, আমি বহু হতে চাই’ এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুর সৃষ্টি হল। ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্রই এই জগতের সৃষ্টি হল। এ ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাই এই সৃষ্টির কারণ।

কথাটিকে অন্যভাবেও বলা যেতে পারে: আমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন। আমরা সকলেই স্বরূপত ব্রহ্ম, কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আমরা নিজেদের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। আত্মসংযম, নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচার, ধ্যান ধারণা, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ইত্যাদির সাহায্যে আমরা মনকে প্রস্তুত করে থাকি। আর মন প্রস্তুত হলে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন। আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছেন, তাই আমরা সে সম্পর্কে অবহিত নই। দেহ এবং কামনা-বাসনা নিয়েই আমরা মত্ত। তাই কেউ আমাদের আঘাত করলে সেই মুহূর্তেই আমরা খুব রেগে যাই এবং প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আত্মসংযম অভ্যাস করলে আমাদের ভেতরের দৈবী ভাবটি ফুটে ওঠে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই দৈবী গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু যে-কারণেই হোক সেগুলি চাপা পড়ে আছে। তপস্যার দ্বারা সেই প্রচ্ছন্ন গুণগুলিকে প্রকাশ

করতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে কোন তপস্যার দরকার হয় না। এক্ষেত্রে 'তপসা' বলতে মনন শক্তিকে বোঝায়।

এই শ্লোকে প্রকাশের ক্রমও বলা হয়েছে। প্রথমে শুধু ব্রহ্ম, জগৎ বলে কিছুই নেই। এ অবস্থা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য; তবু ধরে নেওয়া যাক, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে শুধু শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মই আছেন। এর পর ব্রহ্ম চিন্তা করলেন, 'আমি আমাকেই প্রকাশ করব।' এ সবই আমাদের অনুমানের কথা। বস্তুত ব্রহ্ম কি করেন তা আমরা সত্যিই জানি না। কিন্তু নিজেদের অবস্থা দিয়েই আমরা তাঁকে বোঝার চেষ্টা করি। যেমন, কোন কাজ করবার আগে আমরা চিন্তা করি, আবার কেমন ভাবে সেই কাজ করব তার পরিকল্পনাও করি। অর্থাৎ চিন্তা সবসময়ই কর্মের পূর্ববর্তী। কোন ইঞ্জিনিয়ার যখন বাড়ী তৈরী করেন তখন তিনি মনে মনে তার একটা ছক এঁকে নেন। তারপর সেই ছকই ক্রমশ বাস্তব রূপ নেয়। তাই প্রথমে চিন্তা ও পরে কর্ম। তাই প্রথমেই ব্রহ্ম থেকে আসে মায়া। মায়ারই আর এক নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে আসে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ হল ব্রহ্মের প্রথম সমষ্টি প্রকাশ। তারপর আসে মন, এ কোন একক মন নয়, এ হল নিখিলমন। মন থেকে আসে 'সত্যম্' অর্থাৎ উপাদান (যথা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী), এবং সত্যম্ থেকে আসে চতুর্দশ লোক বা জগৎ।

তারপর থাকে অমৃতম্। 'অমৃতম্' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল—'অমর', কিন্তু এর আর এক অর্থ হল 'কর্মফল'। কর্ম করলেই তার ফল থাকবে। আমরা ভাল কর্ম করলে ভাল ফল লাভ করে থাকি। শাস্ত্রমতে আমরা সবসময়ই যাগযজ্ঞ করে চলেছি। আমরা কে বা সমাজে আমাদের মান কি এ সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমাদের জন্য কিছু কর্ম নির্দিষ্ট থাকে। এই কাজগুলি ঠিক ঠিকভাবে করতে পারলে তা-ই যজ্ঞের সমান। এর ফলে আমরা দীর্ঘ জীবন, প্রচুর ধন সম্পদ, বহু সুসন্তান, এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে সুখ ভোগ করতে পারি। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার আমরা এই পৃথিবীতেই ফিরে আসি এবং জীবন শুরু করি। একেই বলা হচ্ছে অমৃতম্ বা অমরত্ব। কিন্তু এই অমরত্ব চিরস্থায়ী নয়। এই অমরত্বের দ্বারা আমরা হয়তো স্বর্গলাভ করতে পারি এমনকি স্বর্গের দেবদেবীও হতে পারি। তখন কিছু সময়ের জন্য আমরা বিপুল শক্তির অধিকারী হই ঠিকই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃত অমরতার তুলনায় এই অমরতা অস্থায়ী, একটি বিশেষ মুহূর্তে সত্য। কিন্তু আমরা এ কথা ভুলে গিয়ে আপেক্ষিক অমরতা বা স্বর্গসুখের পেছনে ছুটি।

এই ভাবেই সূক্ষ্ম থেকে স্থূল জগতের প্রকাশ চলতে থাকে। প্রথম ব্রহ্ম, তারপর প্রকৃতি, পরে হিরণ্যগর্ভ, তারপর সমষ্টি-মন, পরে পঞ্চ মহাভূত, তারপর চতুর্দশ লোক বা জগৎ,

এবং সর্বশেষে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম ও তার ফলভোগ।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥৯

অন্বয়: যঃ (যিনি); সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ); সর্ববিৎ (সকল বিষয় [পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে] জানেন); যস্য (যাঁর); জ্ঞানময়ম্ (জ্ঞানময়); তপঃ (তপস্যা); তস্মাৎ (তা থেকে [পরব্রহ্ম]); এতৎ ব্রহ্ম (এই ব্রহ্ম [অপরা ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ]); নাম (নাম); রূপম্ (রূপ); চ (এবং); অন্নম্ (নাম, রূপ ও অন্ন); জায়তে (জন্মায়)।

সরলার্থ: যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্ববিৎ, জ্ঞানই যাঁর তপস্যা সেই পরা ব্রহ্ম থেকেই এই অপরা ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম, রূপ ও অন্নাদি এসেছে।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ—তিনি সব কিছু জানেন। 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'—জ্ঞানই তাঁর একমাত্র তপস্যা। ব্রহ্ম যেহেতু সর্ব ব্যাপী সেহেতু তিনি সবই জানেন এবং সবই বুঝতে পারেন। ব্রহ্ম যেন জ্ঞানের সমুদ্র। আর এই সৃষ্টি বা এই প্রকাশ যেন ঐ সমুদ্রের তরঙ্গ। জগৎ এই জ্ঞানসমুদ্রের একটি তরঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই জগৎ প্রকাশে ব্রহ্মের কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তাঁর ক্ষুদ্র একটি চিন্তাই মুহূর্তের মধ্যে এই জগৎ রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। এ জগতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার একটি নাম ও রূপ আছে। আর আছে অন্ন অর্থাৎ খাদ্য। নাম, রূপ এবং খাদ্য সবই ব্রহ্ম থেকে এসেছে। এই বৈচিত্রময় জগৎও ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ দুই-ই ব্রহ্ম। কেউ একজন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে সেই ব্রহ্মাই জগৎকে সৃষ্টি করেন—এ কথাটি ঠিক নয়। ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন। নর, নারী, গাছপালা, জীবজন্তু, গ্রহনক্ষত্র, বাতাস, জল, আগুন ইত্যাদি নানারকমের বৈচিত্র আমরা দেখে থাকি। নামরূপ নিয়েই এই জগৎ। মাকড়সার জাল যেমন মাকড়সার দেহ থেকেই আসে, মাটি থেকে যেমন গাছপালা আসে, এবং জীবন্ত মানুষের দেহ থেকে যেমন কেশ ও লোম বার হয় ঠিক তেমনি সবকিছু এই ব্রহ্মের কাছ থেকেই আসে।

পরা ব্রহ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম। তিনি নির্গুণ তাই কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। পরা ব্রহ্মের পরেই হল অপরা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সগুণ। এঁকে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলা হয়ে থাকে।

মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় অধ্যায়

তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো
যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা।
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥১

অন্বয়: তদেতৎ (এই সেই); সত্যম্ (সত্য); কবয়ঃ (কবিগণ অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ); মন্ত্রেষু (মন্ত্রেতে); কর্মাণি (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম); অপশ্যন্ (দেখেছিলেন); যানি (যেগুলি); ত্রেতায়াম্ (তিনটি বেদে); বহুধা (নানাভাবে); সন্ততানি (ব্যাখ্যা করা হয়েছে); তানি (তাদের অর্থাৎ সেই কর্মসমূহকে); নিয়তম্ (সবসময়); সত্যকামাঃ (শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্মফল কামনা করে); আচরথ (আচরণ কর); সুকৃতস্য লোকে (ভাল কাজ করে যে লোকে যায়); এষঃ (এই); বঃ (তোমাদের); পন্থাঃ (পথ)।

সরলার্থ: এ-ই সত্য—বেদমন্ত্রে যে সব যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেগুলি দেখেছেন। ঋক্, সাম, ও যজুঃ—এই তিনটি বেদে এই সব অনুষ্ঠান আবার নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে গেলে ওই সব যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সবসময় করতে হবে। সৎ কর্ম করে মানুষ যে লোকে যায় সেই লোকে যাওয়ার এই হল উপায়।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম আমাদের অনেকেরই ধারণার অতীত এক তত্ত্ব। তিনি অনন্ত এবং অনন্তের ধারণা করা বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন। এই জগতের মানুষ হিসেবে আমরা এমন কিছু চাই যা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, যা আমরা উপভোগ করতে পারি। মনে বাসনা রয়েছে, অথচ চোখ বন্ধ করে বলছি আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, তা কি হয়? আমি যা নই তা হওয়ার ভান করতে পারি না। নিজের কাছে নিজেকে সৎ থাকতে হবে। অন্তরে বাসনা থাকলে তা চরিতার্থ করার চেষ্টা করাই ভাল। তবে তা করার আগে ভাল করে চিন্তা করে নিতে হবে। তাই উপনিষদ বলছেন, 'তৎ এতৎ সত্যম্', এ-ই সত্য। এখানে সত্য বলতে বৈদিক যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্রে বহুপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। শাস্ত্র তথা বেদের দুটি ভাগ: কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে নানা যাগযজ্ঞের কথা আছে। এখানে 'কর্ম' শব্দটির অর্থ যজ্ঞ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম। কর্মকাণ্ড বলে, আমাদের

প্রতিটি কর্মের একটা ফল আছে; এবং বিশেষ বিশেষ যজ্ঞকর্ম করলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যেমন, আমরা ধনসম্পদ, সুস্বাস্থ্য, সুসন্তান, স্বর্গলাভ প্রভৃতি কামনা করতে পারি। এর প্রত্যেকটিই আমাদের আকৃষ্ট করে। এই সব আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য শাস্ত্র কতগুলি নির্দিষ্ট যজ্ঞের বিধান দেন; এই সব যজ্ঞ ঠিক ঠিক করতে পারলে নির্দিষ্ট ফল লাভ হয়। এখনও এমন মানুষ আছেন যাঁরা এই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শত্রু দমন করার জন্যও আলাদা যজ্ঞ আছে। কিছু যজ্ঞ শুভ, আবার কিছু অশুভ। শুভ যজ্ঞে শুভ ফল পাওয়া যায়; যেমন, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান সন্তান, অর্থ, দীর্ঘ ও সুখী জীবন ইত্যাদি। প্রতিটি যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। শাস্ত্রের মন্ত্রগুলিতে এই সব যজ্ঞের বিশদ বর্ণনা আছে।

'সত্যকামাঃ'—যিনি ফল কামনা করেন। এখানে 'সত্য' কথাটির অর্থ ফল, 'কামাঃ'র অর্থ কামনা। যদি ফললাভ করতে চাই, তবে এই সব যজ্ঞ নিরন্তর করে যেতে হবে। বহু মানুষ নিয়মিতভাবে এই সব যজ্ঞ করে থাকেন। তাঁদের বিশেষ কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে আর সেই ফল লাভের জন্যই তাঁরা যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন হলে তাঁরা বাঞ্ছিত ফল লাভও করে থাকেন।

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাঽঽজ্যভাগাবন্তরেণাঽঽহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥২

অন্বয়: যদা হি (যখনই); সমিদ্ধে হব্যবাহনে (সম্যক্ ভাবে প্রজ্বলিত অগ্নিতে); অর্চিঃ (শিখা); লেলায়তে (লেলিহান হয়); তদা (তখন); আজ্যভাগৌ (আজ্যভাগ দুটির অর্থাৎ অগ্নির দু-পাশের); অন্তরেণ (মধ্যভাগে); আহুতীঃ (আহুতি, ঘি); প্রতিপাদয়েৎ (অর্পণ করবে)।

সরলার্থ: লকলকে শিখাসহ অগ্নি যখন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে তখন তার দুপাশের মধ্যভাগে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত।

ব্যাখ্যা: যজ্ঞ করতে গেলে প্রথমে যজ্ঞের অগ্নি জ্বালাতে হবে। যজ্ঞাগ্নি যেন দাউদাউ করে জ্বলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই অগ্নির দুটি পাশ থাকে—দক্ষিণ পাশ ও বাম পাশ। ঘৃতাহুতি দিতে হবে এই দুটি পাশের মধ্যভাগে যজ্ঞাগ্নির কেন্দ্রস্থলে। আহুতি দেওয়ার সময় অগ্নি যেন দীপ্ত এবং লেলিহান থাকে। যজ্ঞের আগুন যাতে নিভে না যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। নিভে গেলে ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের পক্ষে প্রত্যবায় হবে। সে ক্ষেত্রে যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, এবং ভালর চেয়ে যজমানের মন্দই হবে বেশী। এই জাতীয় বহু খুঁটিনাটি বিবরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥৩

অন্বয়: যস্য (যার অর্থাৎ যে যজমানের); অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্র যাগটি); অদর্শম্ (দর্শ নামক যাগ বর্জিত); অপৌর্ণমাসম্ অচাতুর্মাস্যম্ অনাগ্রয়ণম্ (পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এবং আগ্রয়ণ কর্মবর্জিত); অতিথিবর্জিতম্ (অতিথি সৎকার না করে); অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব কর্মশূন্য); অহুতম্ (অকালে আহুতি দেওয়া); অবিধিনা (অশাস্ত্রীয় ভাবে); হুতম্ (আহুতি যুক্ত), তস্য (তার [সেই যজমানের]); আসপ্তমান্ লোকান্ (সপ্তলোক পর্যন্ত); হিনস্তি (বিনষ্ট করে [অর্থাৎ যজ্ঞের আনুষঙ্গিক যা-যা করণীয় সেগুলি না করার জন্যে যজমানের সপ্তলোক তার হাতের বাইরে চলে যায়])।

সরলার্থ: (শাস্ত্রের নিয়ম না মেনে অর্থাৎ) দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এবং আগ্রয়ণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক যজ্ঞ সম্পন্ন না করে, অতিথি সৎকার না করে, অথবা বৈশ্যদেব আচার না মেনে যদি কেউ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন তাহলে সেই যজ্ঞ যথাযথ হয় না। এর ফলে যজমানের সপ্তলোক পর্যন্ত নাশ হয়।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক নিখুঁতভাবে যজ্ঞ করা সম্ভব হল না। এই শ্লোকে সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সারা জীবন ধরে ব্রাহ্মণরা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করে থাকেন। এখনও অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন যাঁরা এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন। তাঁদের ঘরে পুরুষ পরম্পরা যজ্ঞাগ্নি জ্বলতে থাকে। প্রতিদিন এই অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অতি দুরূহ। এই যজ্ঞ করতে গেলে শুধু অগ্নিহোত্র করলেই হবে না। অন্যান্য আনুষঙ্গিক যজ্ঞ যথা— দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, আগ্রয়ণ এবং বৈশ্বদেব অনুষ্ঠানও এর সঙ্গে পালন করতে হবে। আবার যজ্ঞ চলাকালীন অতিথি সৎকার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করেও শাস্ত্রের নিয়ম সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হন? সে ক্ষেত্রে তাঁর কী হবে? 'আসপ্তমান্ লোকান্ হিনস্তি' অর্থাৎ পৃথিবী থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন সাতটি লোক তিনি হারাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: কলিযুগে এই সব যজ্ঞ করা কঠিন। কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান এই যুগের উপযোগী নয়। এই যজ্ঞ একবার শুরু করলে এর সব নিয়মকানুন নিখুঁত ভাবে পালন করতে হয়। শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন হলে যজমানের সর্বনাশ। শাস্ত্র বলেন, এর ফলে জীবনে যত পুণ্য কর্মের ফল সব নষ্ট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : এ যুগে মানুষ এত ব্যস্ত যে,

শাস্ত্রের কঠোর নিয়মকানুন পালন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু কর্ম সবাইকেই করতে হয়। আমরা যে চিন্তা করি তাও একপ্রকার কর্ম। কাজেই কর্মছাড়া আমরা এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্মযজ্ঞ করা এ যুগে আর সম্ভব নয়।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুললাহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥৪

অন্বয়: কালী (কালী); করালী (করালী); চ (এবং); মনোজবা (মনোজবা); চ (এবং); সুলোহিতা (সুলোহিতা); যা চ সুধূম্রবর্ণা (এবং যা সুধূম্রবর্ণা [নামেও পরিচিত]); চ (এবং); স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গিনী); চ (এবং); দেবী বিশ্বরুচী (জ্যোতির্ময়ী বিশ্বরুচী); ইতি (এই); সপ্ত (সাতটি); লেলায়মানাঃ (লেলিহান [অগ্নির]); জিহ্বাঃ (জিহ্বা)।

সরলার্থ: কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধুম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং জ্যোতির্ময়ী বিশ্বরুচী—যজ্ঞাগ্নির এই সাতটি লেলিহান জিহ্বা (যা আহুতি গ্রহণ করে)।

ব্যাখ্যা: যজ্ঞাগ্নির সাতটি জিহ্বা এবং প্রতিটির পৃথক নাম আছে। প্রতিটি শিখাকে আলাদাভাবে স্মরণে রাখতে হবে, তাদের আহুতি দিতে হবে, এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। একটি শিখাকেও উপেক্ষা করা চলবে না। সব নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করা হলে যজমানের যজ্ঞ সাধন সার্থক হবে।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥৫

অন্বয়: এতেষু (এই); ভ্রাজমানেষু (লেলিহান অগ্নিশিখাতে); যথাকালং হি (যথা সময়েই); যঃ (যিনি); চরতে (যজ্ঞ করেন); এতাঃ (এই); আহুতয়ঃ চ (আহুতি-সমূহ); সূর্যস্য রশ্ময়ঃ (সূর্যকিরণ [অর্থাৎ সূর্যকিরণ হয়ে]); তম্ (সেই যজমানকে); আদদায়ন্ (গ্রহণ করে); নয়ন্তি (নিয়ে যায়); যত্র (যেখানে); দেবানাম্ (দেবতাগণের); একঃ পতিঃ (অধিপতি [অর্থাৎ ইন্দ্র]); অধিবাসঃ (সবার উপরে বাস করেন)।

সরলার্থ: যথাসময়ে দীপ্ত লেলিহান অগ্নিশিখাসমূহে আহুতি দিয়ে যাঁরা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন, তাঁদের আহুতি সূর্যকিরণে রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের দেবলোকে নিয়ে যায়। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র সবার উপরে বসে আছেন।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক, ঋত্বিক সব শিখাতেই উপযুক্ত আহুতি দিয়েছেন, যজ্ঞের সব শর্ত পালন করেছেন এবং শাস্ত্রের নিয়ম মেনে যজ্ঞ করেছেন। যজমান তখন কি পুরস্কার পাবেন? তাঁর দেওয়া আহুতি সূর্যকিরণে পরিণত হবে, সূর্যকিরণের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। এই সূর্যকিরণই তখন তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। যজ্ঞ সুসম্পন্ন করায় তিনি ইন্দ্রলোক অর্থাৎ যে-লোকে দেবরাজ ইন্দ্রের বাস সেই লোক প্রাপ্ত হবেন।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬

অন্বয়: এহি এহি ইতি (এস এস এইরূপে); সুবর্চসঃ আহুতয়ঃ (দীপ্যমান আহুতি-সমূহ); তম্ (সেই); যজমানম্ (যজমানকে); সূর্যস্য (সূর্যের); রশ্মিভিঃ (কিরণ পথে); বহন্তি (বহন করে নিয়ে যায়); প্রিয়াং বাচম্ (স্তুতিবাক্য); অভিবদন্ত্যঃ (উচ্চারণ করতে করতে); অর্চয়ন্ত্যঃ (অর্চনা করতে করতে); এষঃ (এই); বঃ (তোমাদের); পুণ্যঃ (পুণ্য); সুকৃতঃ (সুকর্মের ফলস্বরূপ); ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মলোক অর্থাৎ স্বর্গলোক)।

সরলার্থ: 'স্বাগত, স্বাগত। নিজ সুকৃতির দ্বারা তুমি পবিত্র স্বর্গলোক অর্জন করেছ'—এই সুবচনে অভিনন্দিত করে জ্বলন্ত আহুতিসমূহ যজমানকে সসম্মানে সূর্যের কিরণপথে (স্বর্গলোকে) নিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: যজ্ঞাগ্নির শিখাসমূহকে যদি ভালভাবে সেবা করা যায়, তাদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া যায়, তবে তারা যজমানের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। যজমানের মৃত্যুর সময় এই সব আহুতি সূর্যরশ্মিতে পরিণত হয় এবং তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যায়। ঘরে অতিথি এলে যেভাবে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়, সেইভাবে মধুর বচনে আপ্যায়ন করতে করতে সূর্যরশ্মি যজমানকে স্বর্গে নিয়ে যায়।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।

এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥৭

অন্বয়: এতে হি (এই সকল); অষ্টাদশ যজ্ঞরূপাঃ প্লবাঃ (আঠারজন ব্যক্তির দ্বারা কৃত যজ্ঞরূপ ভেলাগুলি); অদৃঢ়াঃ (অদৃঢ়, অনিত্য); যেষু (যাতে অর্থাৎ যে আঠারজন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে); অবরং কর্ম (নিকৃষ্ট কর্ম); উক্তম্ (শাস্ত্রে বলা হয়েছে); যে মূঢ়াঃ (যে অবিবেকী ব্যক্তিরা); এতৎ শ্রেয়ঃ অভিনন্দন্তি (শ্রেয়োলাভের উপায় রূপে প্রশস্তি করেন); তে পুনঃ এব (তাঁরা পুনরায়); জরামৃত্যুম্ অপিযন্তি (জরামৃত্যুকে প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ: যজ্ঞে আঠারো জন ব্যক্তির প্রয়োজন : যজমান স্বয়ং, তাঁর পত্নী ও ষোলজন ঋত্বিক বা পুরোহিত। তাঁরা সকলেই মরণশীল, অতএব তাঁরা যা করেন তাও ক্ষণস্থায়ী ও বিনাশী। সেই অর্থে তাঁরা যে যজ্ঞ করেন তা নিকৃষ্ট কর্ম। ভেলার মতোই তাঁদের যজ্ঞকর্ম অনিত্য এবং (সংসার সমুদ্র পার করতে) অক্ষম। তবু কিছু নির্বোধ মানুষ আছেন যাঁরা এই কর্মকে শ্রেয়োলাভের উপায় বলে মনে করেন। বস্তুত এই কর্মের ফলে স্বর্গলাভ হতে পারে, কিন্তু এই স্বর্গসুখ নেহাতই সাময়িক। স্বর্গের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই তাঁদের পুনর্জন্ম হয়, এবং আবার তাঁরা জন্মমৃত্যুর চক্রে প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা: অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য যজ্ঞ সম্পাদন করতে আঠারোজন ব্যক্তির প্রয়োজন—যজমান, তাঁর পত্নী ও যোলজন পুরোহিত। এই যজ্ঞ খুবই জটিল, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য। সেকালে মানুষের অর্থও ছিল, অবসরও ছিল। আর ছিল এইসব ক্রিয়াকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। সুতরাং জটিল হলেও তাঁরা এই যজ্ঞ করতে পিছপা হতেন না। কিন্তু শাস্ত্র বড় স্পষ্ট বক্তা। শাস্ত্র সরাসরি বলে দেন যে, এই জাতীয় অনুষ্ঠান সুখপ্রদ হতে পারে কিন্তু মোক্ষ দিতে পারে না। জীবনের উদ্দেশ্য হল মোক্ষলাভ। মোক্ষ বলতে কি বোঝায়? এ এমন এক অবস্থা যেখানে আমি স্বয়ং আমার প্রভু, আমার কর্তা। আর কিছু আমাকেবিচলিত করতে পারে না। ধনী বা নির্ধন—উভয় অবস্থাতেই আমি সুখী। আমার কোন অভাব নেই, অভাববোধও নেই। কেউ হয়তো বলবেন, 'এ যে দেখছি হেরেই বসে আছে। অর্থের অভাব, তাই বলছে "আঙুর ফল টক"।' আসলে কিন্তু তা নয়। এ ব্যাপারে শাস্ত্র খুব স্পষ্ট। যদি আমার মনে বাসনা থাকে, আর তা পূরণের জন্য যজ্ঞ করতে চাই, তবে শাস্ত্র বলবেন, 'তথাস্তু'। শাস্ত্র আপত্তি করবেন না, কিন্তু আমাদের সতর্ক করে দেবেন, 'মনে রেখো, এই সুখভোগ বেশি দিনের জন্য নয়। একটা সময় আসবে যখন তুমি ক্লান্ত বোধ করবে, হয়তো বা ভোগের ক্ষমতাই থাকবে না। অথবা দেখবে সব সুখই হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গেছে, সুখের আর লেশমাত্র নেই।' জীবন এভাবেই বয়ে চলে। একে হেরে

যাওয়া বলে না; এ হল বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া। আমরা যেন দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে বলছি, 'সব ঠিক চলছে'। কিন্তু চলছে কি? পরিবর্তনই জগতের স্বভাব, একথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। জগতে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়—বিবেকী ব্যক্তি একথা মনে রাখেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা ভুলে যায়। তারা বারবার বিষয়সুখের পিছনে ছোটে এবং পরিণামে দুঃখ পায়।

শাস্ত্র আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করছেন না। শাস্ত্র বলেন, এইসব ক্রিয়াকর্ম আমাদের কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, আমাদের আত্মসংযম শেখায়, কিন্তু মোক্ষ দিতে পারে না। যজ্ঞ করে বিত্ত, দীর্ঘ পরমায়ু, সৌন্দর্য, স্বর্গ এসব হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু মোক্ষ দিতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞান। উপনিষদ বলছেন, 'মূঢ়াঃ অভিনন্দন্তি এতৎ শ্রেয়ঃ'—নির্বোধ ব্যক্তিরা এই ক্রিয়াকর্মের পথকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রশস্তি করে। কেন করে? কারণ এ পথে তারা স্বর্গে যেতে পারবে এবং দেবদেবী এমন-কি ইন্দ্রপদও লাভ করতে পারবে। কিন্তু এরা মূর্খ। যজ্ঞকর্ম যেন 'অদৃঢ়া প্লবাঃ'—পলকা ভেলা মাত্র। সমুদ্র পার হতে গেলে প্রয়োজন একটি মজবুত নৌকা, তাতে ছিদ্র থাকলে চলবে না। মুমুক্ষু ব্যক্তি যদি যাগযজ্ঞ করে মোক্ষ পেতে চান তাহলে বুঝতে হবে বাহন হিসেবে তিনি এমন একটি নৌকা বেছে নিয়েছেন, যা অত্যন্ত পলকা এবং নিজেই ডুবতে বসেছে। এ পথ মোক্ষের পথ নয়। বেদান্ত বারবার বলছেন—একমাত্র আত্মজ্ঞানই মোক্ষ দিতে পারে। বেদান্ত আরও বলেন, নির্বোধ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে না, অতএব জরামৃত্যুর অধীন হয়ে একই জায়গা থেকে তাকে বারবার শুরু করতে হয়—'জরামৃত্যুং তে পুনঃ এব অপিযন্তি'।

এর অর্থ কি এই, যিনি মুক্ত যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর আর মৃত্যু হয় না? না, তা নয়। মোক্ষলাভ হলেও মানুষের মৃত্যু হবেই। কিন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুবোধ থাকবে না। কারণ তিনি জানেন তিনি দেহ থেকে আলাদা। তাঁর কাছে মৃত্যুর কোন গুরুত্ব নেই। তিনি জানেন এ শুধু তাঁর দেহের মৃত্যু। দেহ জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হলে তাকে পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের মতো ত্যাগ করাই ভাল। এই দেহ তখন ছিন্নবস্ত্রের মতো। কিন্তু সাধারণ মানুষ মৃত্যুভয়ে কাতর। বস্তুত মৃত্যুর ধারণা তার কাছে ভয়াবহ। সে মরতে চায় না। অন্যদিকে, যাঁর মোক্ষলাভ হয়েছে তিনি জানেন মৃত্যুর অর্থ শরীরের মৃত্যু, তাঁর মৃত্যু নেই।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥৮

অন্বয়: মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিরা); অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যার মধ্যে অর্থাৎ অজ্ঞানতার মধ্যে); বর্তমানাঃ (থেকে); স্বয়ম্ (নিজেকে); ধীরাঃ পণ্ডিতম্ (বুদ্ধিমান পণ্ডিত); মন্যমানাঃ (মনে করেন [তাঁরা]); জঙ্ঘন্যমানাঃ (নানা অনর্থে বার বার পীড়িত হয়ে); যথা (যেমন); অন্ধেন (অন্ধব্যক্তির দ্বারা); নীয়মানাঃ (পরিচালিত হয়ে); অন্ধাঃ (অন্ধব্যক্তিগণ); পরিযন্তি (ঘুরপাক খেতে থাকেন)।

সরলার্থ: অজ্ঞানে নিমজ্জিত কিছু নির্বোধ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিমান ও সর্বজ্ঞ বলে মনে করেন। এমন ব্যক্তিরা একটার পর একটা অনর্থে পড়েন—ঠিক যেমন এক অন্ধের দ্বারা চালিত হয়ে অন্য অন্ধ ব্যক্তিরা শুধু ঘুরপাকই খেতে থাকেন।

ব্যাখ্যা: কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করেন। কিন্তু আসলে তাঁরা অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছেন। তাঁরা অজ্ঞান, কিন্তু 'স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ', তাঁরা নিজেদের বিজ্ঞ ও পণ্ডিত বলে মনে করেন। 'জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি'—তাঁরা এই জন্মমৃত্যুর নাগরদোলায় ঘুরতেই থাকেন। তাঁদের বারবার জন্ম হয়, বারবার মৃত্যু। 'মূঢ়াঃ'—এই নির্বোধ ব্যক্তিরা পেণ্ডুলামের মতো জন্মমৃত্যুর মাঝে দুলছেন। 'অন্ধাঃ'—তাঁরা অন্ধ, আবার আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে চান। এই অঘটন সবসময় ঘটে চলেছে। এই সব মানুষ গভীর চিন্তা করেন না, নিত্য-অনিত্য ভালমন্দ বিচার করেন না। ধীরে ধীরে তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যান। এ তো আত্মহত্যার সামিল।

আবার কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন, বিবেকী এবং চিন্তাশীল। তাঁরা একবার দেখেই বস্তুর মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারেন। এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী তা তাঁরা জানেন। তাই তুচ্ছ সুখভোগে তাঁদের স্পৃহা নেই। কঠ উপনিষদের নচিকেতার চরিত্র এর দৃষ্টান্ত। অর্থ, দীর্ঘ পরমায়ু ও নানা ভোগের উপকরণ দিয়ে যম নচিকেতাকে বারবার প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু নচিকেতা জানতেন এসব ক্ষণস্থায়ী বস্তু তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। আর এই অতৃপ্তি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। এই অতৃপ্তিই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে, সত্যের কাছে পৌঁছে দেবে। এই রকম ব্যক্তি পরম সত্য ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিই অগভীর; তাঁরা বস্তুর মর্মস্থলে পৌঁছতে পারেন না। 'অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ'—তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। একটু বিত্ত, একটু সাফল্য, একটু সৌন্দর্য, এবং অল্প বিদ্যালাভ হলেই অধিকাংশ মানুষ সন্তুষ্ট। এঁদের বুদ্ধি শিশুর মতোই অপরিণত। তাঁরা কিন্তু মনে করেন তাঁরা খুব ভাল আছেন। উপনিষদকাররা এই সব মানুষদের জন্য দুঃখ বোধ করেন, এঁদের সতর্ক করে দিতে চান। তাই যাঁরা ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছুটছেন, এই শ্লোকে তাঁদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥৯

অন্বয়: বালাঃ (মূর্খব্যক্তিগণ); অবিদ্যায়াম্ (অবিদ্যাতে); বহুধা (নানাভাবে); বর্তমানাঃ (থেকে); বয়ম্ (আমরা); কৃতার্থাঃ (কৃতার্থ); ইতি (এইরূপ); অভিমন্যন্তি (অভিমান করেন অর্থাৎ অহঙ্কার করেন); যৎ (যেহেতু); রাগাৎ (কর্মফলে আসক্তিবশত); [এই মুর্খ] কর্মিণঃ (সকাম কর্মিগণ); প্রবেদয়ন্তি ন (প্রকৃত পথ [জ্ঞানের পথ] জানেন না); তেন (সেই হেতু); ক্ষীণলোকাঃ (কর্মফল-ভোগাবসানে); আতুরাঃ (পীড়িত হয়ে); চ্যবন্তে (স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হন)।

সরলার্থ: কিছু নির্বোধ ব্যক্তি আছেন যাঁদের আচরণ শিশুসুলভ। বহু বিষয়েই তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তবু নিজেদের সর্বজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান বলে জাহির করেন। তাঁরা নিজেদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত বলে দাবী করেন। আসলে কর্মফলে আসক্তিবশত তাঁরা যাগযজ্ঞ নিয়ে মত্ত থাকেন। সঠিক পথ তাঁদের অজানা। তাই তাঁরা কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করেন ঠিকই, কিন্তু অচিরেই মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁরা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হন এবং অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেন।

ব্যাখ্যা: এই অংশে উপনিষদ বলছেন, মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। প্রথমটি জ্ঞানের পথ অর্থাৎ বিচারের পথ; অন্যটি যাগযজ্ঞ তথা সকাম কর্মের পথ। উপনিষদ বলছেন, যদি মোক্ষ উদ্দেশ্য হয় তাহলে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানলে তবেই মুক্তিলাভ হয়। আত্মজ্ঞানী জানতে পারেন তাঁর ভেতরেই সব রয়েছে, তিনি বাইরে কোন কিছুর অধীন নন। তিনি নিজেই নিজের প্রভু, সদামুক্ত, সদাপ্রসন্ন।

কিন্তু কিছু নির্বোধ মানুষ আছেন যাঁরা সকাম কর্মের পথ (অর্থাৎ যাগযজ্ঞ) বেছে নেন। উপনিষদ বলছেন, তাঁরা 'অবিদ্যায়াং বর্তমানাঃ'—অজ্ঞানতায় ডুবে আছেন, 'বহুধা'—নানাভাবে। অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাও জানেন না তাঁরা অজ্ঞান। তাঁরা মনে করেন, 'বয়ং কৃতার্থাঃ'—আমরা সব পেয়েছি, আমরা কৃতার্থ। সন্তান, বিত্ত, রূপ, যৌবন, সবই তাঁদের আছে। তাই তাঁরা বলেন, 'আমরা ভাল আছি।' কিন্তু তাঁদের কিসের অভাব তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'উটের অবস্থা দেখ! তারা কাঁটাঘাস খেতে ভালবাসে। খেতে গিয়ে মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, কিন্তু ছাড়ে না।' আমাদের অনেকের অবস্থাই এই রকম, জগতের অসার বস্তুর পিছনে ছুটে চলেছি। এই জন্যই একে

বলে মায়া। এঁরা কেন এমন করেন তার ব্যাখ্যা মেলে না। তাঁরা যে একেবারেই অজ্ঞ তা নয়। তাঁরা জানেন এপথে দুঃখ অনিবার্য। তবু তাঁরা এই পথই বেছে নেন, এবং নিজেদের বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। উপনিষদ তাঁদের 'বালাঃ' অর্থাৎ শিশু বলে উল্লেখ করেছেন। শিশুদের মতোই তাঁরা অপরিণত-বুদ্ধি। অথচ অধিকাংশ মানুষই এইভাবে ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছোটে। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সারাজীবন ধরে যাগযজ্ঞ করেন—তাঁরাই হলেন 'কর্মিণঃ'। 'ন প্রবেদয়ন্তি'—তাঁরা চিন্তা করেন না, বিচার করেন না, কিছু ধারণা করতেও পারেন না। কিন্তু কেন? 'রাগাৎ'—তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত। তাঁরা অন্ধ। তাঁদের জীবনের পরিণতি কি? 'আতুরাঃ'—তাঁরা দুঃখভোগ করেন। দীর্ঘায়ু, মান-যশ এমনকি স্বর্গলোকও তাঁরা লাভ করতে পারেন, কিন্তু 'ক্ষীণলোকাঃ' অর্থাৎ তাঁদের পুণ্যকর্মের ফল ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসে। এখানে 'লোকাঃ' শব্দটির অর্থ কর্মফল। যত সুকৃতিই থাকুক না কেন তার মূল্য অতি সামান্যই, কারণ তারা স্বল্পমেয়াদী। সেই সুকৃতির ফল অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন তাঁরা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হন।

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥১০

অন্বয়: প্রমূঢ়াঃ (অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরা); ইষ্টাপূর্তম্ (যাগযজ্ঞ এবং কূপ খনন প্রভৃতি পূর্তকর্মকে); বরিষ্ঠম্ (শ্রেষ্ঠ কর্ম); মন্যমানাঃ (মনে করেন); অন্যৎ (অন্য কিছুকে); শ্রেয়ঃ (শ্রেয়); ন বেদয়ন্তে (জানেন না); তে (তাঁরা); সুকৃতে (পুণ্যকর্ম করে); নাকস্য (স্বর্গের); পৃষ্ঠে (উপরিভাগে); অনুভূত্বা (তাঁদের কর্মফল ভোগ করেন); ইমং লোকম্ (এই মনুষ্য লোকে); হীনতরং বা (অথবা তার থেকেও হীনতর লোকে); বিশন্তি (প্রবেশ করেন)।

সরলার্থ: কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চূড়ান্ত নির্বোধ। তাঁরা মনে করেন যাগযজ্ঞ এবং (কূপ, দীঘি খনন ইত্যাদি) জনহিতকর কর্মই সর্বোত্তম। এর চেয়ে মহত্তর কিছু থাকতে পারে তা তাঁরা জানেন না। এই সব সৎ কর্মের ফলে মৃত্যুর পর তাঁদের স্বর্গলাভ হয়, এবং নির্দিষ্ট কাল ব্যাপী তাঁরা স্বর্গসুখ ভোগ করেন। কিন্তু মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তাঁরা আবার এই জগতে ফিরে আসেন (এবং মনুষ্যরূপে অথবা ইতর প্রাণী রূপে তাঁদের পুনর্জন্ম হয়)।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ বারবার প্রশ্ন করছেন : আমরা কোন্ পথ বেছে নেব? বেদে দুটি পথের কথা বলা হয়েছে: কর্মকাণ্ড (কর্মের পথ) ও জ্ঞানকাণ্ড (জ্ঞানের পথ)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্যসমাজের কথা আমরা অনেকেই জানি। তিনি বলতেন, 'চলুন, আমরা কর্মকাণ্ডে ফিরে যাই, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম করি।' কিন্তু বেদান্ত বলেন, 'যাঁরা ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত, তাঁদের জন্য কর্মকাণ্ড।' এ পথে মোক্ষলাভ হয় না। মুক্তি পেতে গেলে জ্ঞানের পথ অনুসরণ করতে হবে; জ্ঞান ও বিচারের অনুশীলন করতে হবে। উপনিষদে প্রধানত জ্ঞানকাণ্ডের কথাই বলা হয়েছে।

বর্তমান উপনিষদে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত দু-ধরনের কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ইষ্টম্ ও পূর্তম্। ইষ্টম্ বলতে যাগযজ্ঞ করাকে বোঝায়, আর পূর্তম্ বলতে বোঝায় জনহিতকর কর্ম—যেমন কূপ খনন, পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি। এই সব কার্য উত্তম ও নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এর দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না। 'ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠম্'—কিছু মানুষ আছেন যাঁরা এই সব কর্মকে 'বরিষ্ঠ' অর্থাৎ অতি উত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করেন। উপনিষদ এই সব মানুষকে বলছেন 'প্রমূঢ়া' অর্থাৎ অসার, নির্বোধ এবং অজ্ঞ। 'অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তি'—এর চেয়ে ভাল কোন কিছু তাঁদের জানা নেই। দরিদ্রসেবা, কূপ খনন, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সুকৃতির বলে তাঁরা হয়তো স্বর্গলাভ করেন (নাকস্য পৃষ্ঠে)। কিছু কাল তাঁরা স্বর্গসুখ ভোগও করেন (অনুভূত্বা); পাঁচ বছর, দশ বছর বা আরও বেশি। কিন্তু তারপর তাঁদের এই পৃথিবীতে (ইমং লোকম্) ফিরে আসতে হয় অথবা পৃথিবীর চেয়েও কোন নিম্নতর লোকে তাঁদের যেতে হয় (হীনতরং বা)। কেন তাঁদের এই নিম্নতর লোকে যেতে হয়? তাঁরা স্বর্গে গিয়েছিলেন তাঁদের সৎকর্মের জন্য, কিন্তু হয়তো তাঁরা কিছু অসৎ কর্মও করেছেন; সুতরাং এই অসৎ কর্মের ফলভোগও তাঁদের করতে হবে। আর সেইজন্যই তাঁদের হীনতর লোকে গমন করতে হয় ('হীনতরং বিশন্তি'—অর্থাৎ প্রবিশন্তি বা প্রবেশ করেন)। এই সব মানুষ নির্বোধ ও অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন (আতুরাঃ)। জন্মমৃত্যুর চক্রে তাঁরা বারবার বদ্ধ হন। এই চক্রের থেকে নিষ্কৃতি লাভ কিভাবে সম্ভব? কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারা।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জনহিতকর কার্য থেকে মানুষ বিরত থাকবে, অথবা কোন কর্মই সে করবে না। এখানে কর্ম বলতে শাস্ত্র সকাম কর্মকে বুঝিয়েছেন। নাম, যশ, সন্তান, বিত্তলাভ অথবা স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি। কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম করাকে সকাম কর্ম বলা হয়। এই যুগে এসব ফললাভের জন্য মানুষ যাগযজ্ঞ করে না। মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা উপাসনা ইত্যাদি করতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। আবার মানুষ নিষ্কাম কর্মও করতে পারে। কর্মফলে আসক্তি না রেখে কর্ম করাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মই ভগবদ্গীতার মূল বাণী—ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে সব কর্ম কর। সৎ কর্ম কর; যথাসাধ্য এবং আন্তরিকভাবে কর্ম কর। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। সংবাদপত্রে নিজের নাম দেখার

জন্য যদি জনহিতকর কর্মও করে থাক তবে তাও সকাম কর্ম। লোকহিতে কাজ উত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু তা তোমাকে মোক্ষের পথ দেখাতে পারবে না।

তাই শাস্ত্র মানুষকে পথের নির্দেশ দেন, কর্মফল ব্যাখ্যা করেন কিন্তু আসল দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর। সে ভালমন্দ, নিত্য-অনিত্য বিচার করবে। নিজের পথ সে বেছে নেবে। এককথায়, সে নিজেই হবে তার ভাগ্যবিধাতা।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥১১

অন্বয়: যে হি (যাঁরা); শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়); বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ); ভৈক্ষ্যচর্যাম্ (ভিক্ষাবৃত্তি); চরন্তঃ (অবলম্বন করে); অরণ্যে (বনে); তপঃশ্রদ্ধে (তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করেন); উপবসন্তি (বাস করেন); তে (তাঁরা); বিরজাঃ (রজোগুণ শূন্য হয়ে); সূর্যদ্বারেণ (উত্তরায়ণ পথে); [তত্র] প্রয়ান্তি (প্রবেশ করেন); যত্র (যেখানে); সঃ (সেই); অমৃতঃ (অমর); অব্যয়াত্মা (অব্যয় আত্মা); পুরুষঃ (পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ [বাস করেন])।

সরলার্থ: কিছু সংযতেন্দ্রিয়, বিদ্বান ব্যক্তি আছেন যাঁরা অরণ্যে বাস করেন এবং ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করেন। পরম সত্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধন ও তপস্যা করেন। এভাবে তাঁদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। মৃত্যুর পর সূর্যদ্বার পথে (উত্তরায়ণ মার্গে) তাঁরা সেই লোকে যান যেখানে অবিনাশী অক্ষয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন। একেই বলে ব্রহ্মলোক।

ব্যাখ্যা: এখানে উপনিষদ আর এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলছেন। এই সব মানুষ গৃহীর জীবন যাপন করলেও বুঝে নিয়েছেন যে আত্মোপলব্ধিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পারিবারিক এবং সামাজিক, সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনের পর তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন। তাই তাঁরা সংসার থেকে অবসর নিয়ে বানপ্রস্থ হয়েছেন। অধিকাংশ উপনিষদ এই সব বানপ্রস্থদের রচনা। সংসারের অসারতা তাঁরা দেখেছেন, তাঁদের বিবেক-বৈরাগ্য জেগেছে; তাই তাঁরা অবসর নিয়েছেন। এ ছিল প্রাচীন ভারতের রীতি। ছেলে বড় হলে পরিবারের সকল দায়িত্ব পিতামাতা তার উপর অর্পণ করে নিজেরা বনবাসী হতেন, এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণায় সময় কাটাতেন।

এই বানপ্রস্থগণ ছিলেন ‘শান্তাঃ’—তাঁদের অন্তরে ছিল শান্তি। তাঁদের সকল বাসনা দূর হয়েছে, তাঁরা সংযতেন্দ্রিয়। তাঁরা ‘বিদ্বাংসঃ’ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান, পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ এবং

চিন্তাশীল। 'বিরজাঃ'—তাঁদের সকল মলিনতা দূর হয়ে গেছে। কি এই মলিনতা? বাসনা এবং অহং-বুদ্ধি। 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ'—যেদিন যা ভিক্ষা পাওয়া যেত তাই দিয়েই চলে যেত তাঁদের জীবন। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বাসনামুক্ত। 'যথেষ্ট ভোগ করেছি, আর নয়। এখন আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার সময়। এই জীবনের অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, আমি জানতে চাই। কিভাবে শান্তি পাব?'— এই ছিল তাঁদের মনোভাব।

আমরা অধিকাংশ মানুষই জানি না কখন সংসার ত্যাগ করতে হয় বা কখন অবসর নিতে হয়। আর সেইজন্যই এত দুঃখ পাই। জীবনে একটা সময় আসে যখন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, 'এই সংসারে যথেষ্ট হয়েছে। এখন অবসর নেব।' এর অর্থ এই নয় যে, তুমি জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছ অথবা দীর্ঘ অবকাশ কাটাতে চলেছ। এ আর একরকমের জীবন, যে-জীবন আরও কঠিন, আরও সংগ্রামের। হয়তো কোন ব্যক্তি সংসারে ধনী ছিলেন, বিলাসিতায় অভ্যস্ত ছিলেন। এখন এই বনবাসে আরামের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু অচিরেই দেখা যায় এর জন্য তাঁর মনে কোন অভাববোধও নেই। আপন অন্তরের সম্পদ তিনি আবিষ্কার করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দুজন ইংলণ্ডের শিষ্য ছিলেন—ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী সেভিয়ার। তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসে মায়াবতীতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছরের মধ্যে স্বামীজীর ও ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যু হয়। তখন সকলেই ভাবলেন শ্রীমতী সেভিয়ার আর মায়াবতীতে থাকতে পারবেন না। স্থানটি যেমন দুর্গম, তেমনি নির্জন। সেখানে আরামের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তিনি কিন্তু খুশী হয়েই সেখানে থেকে গেলেন। একবার তাঁর কাছে একজন জানতে চেয়েছিলেন ওই নির্জন জীবন তিনি সহ্য করছেন কেমন করে! উত্তরে শ্রীমতী সেভিয়ার জানান, 'স্বামী বিবেকানন্দের বহু স্মৃতি আমার মনে সঞ্চিত রয়েছে। সেই স্মৃতির আনন্দ এবং প্রেরণাই কি আমার বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়?' বহুবছর তিনি মায়াবতীতে একক জীবন অতিবাহিত করেছেন; শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তখন সকলের পরামর্শে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অধিকাংশ মানুষই এরকম জীবন যাপনকে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করবেন। কঠ উপনিষদ বলছেন, ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে স্বভাবতই তারা বহির্মুখী। চোখ, কান ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়ই বাইরের দিকে দেখছে। যদি ওই ইন্দ্রিয়গুলিকে ভিতরদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, দেখব অন্য এক জগৎ। বর্তমানে আমরা সেই জগৎ সম্পর্কে সচেতন নই, যদিও সেই অন্তর্জগৎ বাইরের জগতের মতোই সত্য। বরং কোন কোন মানুষের কাছে এই অন্তর্জগৎই বেশী সত্য। ধ্যানের দ্বারা এই জগতের

বিভিন্ন দিক তাঁরা আবিষ্কার করেন। আনন্দ, প্রেরণা এবং শক্তির নিত্য নতুন উৎস সেখানে খুঁজে পান। আরাম, আনন্দ বা শক্তির জন্য তাঁরা বাইরের জগতের অপেক্ষা করেন না। সব সম্পদ তাঁদের অন্তরেই রয়েছে। উপনিষদ বলেন : 'আত্মাই সকল বস্তুর উৎস।'

এখন কেউ বলতে পারেন যে, বাইরের বস্তুতে অবশ্যই আনন্দ আছে। কিন্তু বেদান্ত বলেন: যদি তাই হয়, তবে কেন একই বস্তু একজনের কাছে সুখপ্রদ আবার অন্যের কাছে দুঃখজনক। আনন্দ যদি সেই বস্তুরই ধর্ম হয়, তবে তা সর্বত্র সকলের কাছেই আনন্দদায়ক হবে। ধরা যাক—ক্ষেতে একজন কাজ করছে আর তুমি তাকে একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছ। সে বলে উঠতে পারে: 'কি যা তা সব পড়ে যাচ্ছ।' অন্যান্য ব্যাপারে সে হয়তো বুদ্ধিমান কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আবার কোন দর্শকের কাছে আধুনিক চিত্রকলা অর্থহীন বলে মনে হতে পারে; কিন্তু আর একজন হয়তো বলছে, 'চমৎকার হয়েছে'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আনন্দ বাইরের বস্তুতে নেই। আনন্দ রয়েছে আমাদের অন্তরে।

কিভাবে এইসব গৃহীরা জেনেছেন যে আনন্দ বা শান্তি বাইরের জগতে নেই, কেমন করেই বা তাঁরা তাঁদের মনকে অন্তর্মুখী করেছেন তার বর্ণনা উপনিষদে পাই। উপনিষদ বলেন, মৃত্যুর পর এই সব মানুষ সূর্যদ্বার পথে অর্থাৎ উত্তরায়ণ মার্গে যান। এই বানপ্রস্থগণ প্রাজ্ঞ, তাই তাঁরা আলোর পথ অর্থাৎ সূর্যের পথ অনুসরণ করেন। কোথায় যান তাঁরা? হিরণ্যগর্ভ তথা ব্রহ্মলোকে। অবশ্য তখনও তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তখনও তাঁদের মোক্ষলাভ হয়নি, তবে মোক্ষের পথে চলেছেন। এ এক মধ্যবর্তী অবস্থা, মোক্ষের কাছাকাছি তাঁরা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা না চাইলে ফিরে আসতে হয় না। কালে ব্রহ্মলোকে তাঁদের পরাগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥১২

অন্বয়: কর্মচিতান্ (কর্মের দ্বারা অর্থাৎ যাগযজ্ঞের দ্বারা লব্ধ); লোকান্ (লোকসকলকে); পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করে); ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু); নির্বেদম্ (বৈরাগ্য); আয়াৎ (অভ্যাস করবেন); [যেহেতু] কৃতেন (কর্মের দ্বারা); অকৃতঃ (অকৃত অর্থাৎ নিত্যবস্তু); ন অস্তি (হয় না; লাভ হয় না); তৎ (সেই নিত্যবস্তু); বিজ্ঞানার্থম্ (জানবার জন্য); সঃ (তিনি);

সমিৎপাণিঃ (সমিধ কাঠ হাতে নিয়ে); শ্রোত্রিয়ম্ (বেদজ্ঞ); ব্রহ্মনিষ্ঠম্ গুরুম্ (ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে); এব অভিগচ্ছেৎ (যান)।

সরলার্থ: আনুষ্ঠানিক উপাসনাদির ফল যে ক্ষণস্থায়ী একথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জানেন। তাই এই জাতীয় অনুষ্ঠান তাঁকে আকর্ষণ করে না। যা নিত্য তা অনিত্য-ক্রিয়াকর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, একথা তিনি জানেন। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ আচার্যের অনুসন্ধান করেন। নম্রতার প্রতীক হিসেবে সমিধ কাঠ হাতে নিয়ে তিনি আচার্যের নিকট উপস্থিত হন।

ব্যাখ্যা: 'পরীক্ষ্য' কথাটির অর্থ পরীক্ষা করা, বিবেচনা করা, পরিমাপ করা। নিত্য-অনিত্য বিচার করতে হবে। কি পরীক্ষা করব? 'কর্মচিতান্'—কর্মফল। 'অকৃতঃ'—কথাটির অর্থ যার সৃষ্টি নেই। আত্মার সৃষ্টি নেই। এখানে উপনিষদ বলছেন, যজ্ঞাদি অনিত্য কর্মের দ্বারা (কৃতেন) অকৃতকে অর্থাৎ নিত্যকে পাওয়া যায় না। সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে আমরা কি ফল পাব তা আগে বিবেচনা করে দেখতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে : 'এর দ্বারা কি মনের শান্তি পাওয়া যাবে? আমার কি মোক্ষলাভ হবে?' এইভাবে বিচার করলে তবেই 'নির্বেদম্ আয়াৎ' অর্থাৎ বৈরাগ্য আসবে। তখন সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। কঠ উপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন নানা উপচারে যম নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন, তখন নচিকেতা নিজেকে প্রশ্ন করলেন 'এই সব বস্তু কি আমাকে মুক্তি দিতে পারে? অথবা মনের শান্তি?' যখন উত্তর পেলেন 'না, তা পারে না' তৎক্ষণাৎ সেই সব বস্তু প্রত্যাখ্যান করলেন। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে কিছু অলৌকিক শক্তি (অষ্ট সিদ্ধি) দিতে চান; স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেন এই সব শক্তির দ্বারা মোক্ষ তথা আত্মজ্ঞান লাভ করা যাবে কি না। প্রত্যুত্তরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—'না তা যাবে না' তখন স্বামীজী বললেন : 'তবে ওসবে আমার প্রয়োজন নেই।' এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্মম, আপসহীন। একূল ওকূল দুকূল রাখতে গেলে কোন দিকই রক্ষা পায় না, দুকূলই ভেসে যায়। তাই মোক্ষলাভের জন্য চাই আপসহীন তীব্র ব্যাকুলতা—'আমি আত্মজ্ঞান চাই, আর কিছুই চাই না। এই দেহের যা হয় হোক, আমি সত্যকে জানবই।

উপনিষদ বার বার জোর দিয়ে বলছেন, নিত্য-অনিত্য বিচার করতে হবে, যুক্তিতর্ক ধ্যান-ধারণা করতে হবে। উপনিষদের ভাষায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ—এর অর্থ শোনা। আচার্য বলছেন, 'তত্ত্বমসি'—সে-ই তুমি; তুমিই সেই পরমতত্ত্ব; তুমিই পরমাত্মা। প্রথমে এই মহাবাক্য শুনতে হবে। তারপর এই তত্ত্বের মর্মার্থ মনে মনে আলোচনা করতে হবে—মনন। এর পর নিদিধ্যাসন, তত্ত্বটি নিয়ে গভীর ধ্যানে (চিন্তায়) মগ্ন হতে হবে।

সুতরাং এই পরমসত্য শোনার জন্য আচার্যের কাছে যেতে হবে। আচার্য কিরকম হবেন? ব্রহ্মনিষ্ঠম্—অর্থাৎ ব্রহ্মে যাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা। তিনি ব্রহ্ম তথা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি সত্য জ্ঞান লাভ করেছেন। তা যদি তিনি নাকরে থাকেন, স্বয়ং আচার্যই যদি অজ্ঞান হন, তবে শিষ্যকে তিনি কিভাবে সাহায্য করবেন? কি শিক্ষা দেবেন তাকে? উপযুক্ত আচার্যের কাছে 'সমিৎপাণি'—অর্থাৎ সমিধ কাঠ হাতে নিয়ে যেতে হবে। এটি শিষ্যের নম্রতার নিদর্শন।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥১৩

অন্বয়: সঃ বিদ্বান্ (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু); সম্যক্ (সম্যক্-রূপে); প্রশান্তচিত্তায় (সংযতচিত্ত); শমান্বিতায় (সংযতেন্দ্রিয়); উপসন্নায় তস্মৈ (তাঁর কাছে যে এসেছে সেই শিষ্যকে); তাং ব্রহ্মবিদ্যাম্ (সেই ব্রহ্মবিদ্যা); তত্ত্বতঃ (স্বরূপত); প্রোবাচ (প্রকৃষ্টরূপে বললেন); যেন (যার দ্বারা অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা); সত্যম্ (সত্যস্বরূপ); অক্ষরম্ (বিনাশহীন); পুরুষম্ (অন্তর্যামীকে; পুরুষকে); বেদ (জানা যায়)।

সরলার্থ: সর্বপ্রথম শিষ্যকে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। তারপর তিনি ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যের কাছে যাবেন। সেই আচার্য তখন শিষ্যকে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান দান করবেন।

ব্যাখ্যা: যখন কোন ব্যক্তি কোন আচার্যের নিকট উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করেন, তখন প্রথমেই আচার্য শিষ্যকে পরীক্ষা করেন। শিষ্য প্রশান্তচিত্ত কি না অর্থাৎ সে আত্মসংযম আয়ত্ত করেছে কি না তা আচার্য পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি জানতে চান শিষ্য সংযম অভ্যাস করেছে কি না—'শমান্বিতায়'। নিজেকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করে তুলতে বেদান্ত ছয়টি প্রয়োজনীয় সাধন-সম্পদের কথা বলেছেন: (১) শম—মনের সংযম, (২) দম—ইন্দ্রিয় সংযম, (৩) তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, (৪) উপরতি—ত্যাগ, বৈরাগ্য, (৫) শ্রদ্ধা—বিশ্বাস, (৬) সমাধান—একাগ্রতা। অভ্যাসের দ্বারা এই ষট্ সম্পদ আয়ত্ত হলে বুঝতে হবে, শিষ্য এই পথে অনেক এগিয়ে গেছেন এবং আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বেদান্ত বলছেন: 'এই প্রস্তুতি যেখানে নেই, সেখানে ব্রহ্মবিদ্যা দান নিরর্থক। বাইবেলেও আমরা দেখছি যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলছেন : 'শুয়োরের

সামনে মুক্তো ছড়িও না।' ধরা যাক একদল শুয়োরের সামনে মুক্তো ছড়ানো হল। তারা মুক্তো সম্বন্ধে কিই বা জানে? একইভাবে যার আত্মতত্ত্ব ধারণা করার প্রস্তুতি নেই সেই শিষ্যকে আচার্য ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন না। এই হল বেদান্তের 'অধিকারী ভেদ'। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ক্ষমতাও ভিন্ন ভিন্ন। সব মানুষ এক রকম হয় না। শিক্ষাদানকালে আচার্য ছাত্রদের মধ্য থেকে যোগ্য অধিকারী নির্বাচন করেন।

উপযুক্ত শিষ্য পেলে আচার্য প্রসন্ন হন। তখন তিনি শিষ্যকে পুরুষ তথা আত্মা তথা ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। আচার্য স্বয়ং সেই পুরুষকে জেনেছেন। কালে তিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যকে দান করেন, 'তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারে।

মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম অধ্যায়

তদেতৎ সত্যম্‌-যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥১

অন্বয়: তৎ এতৎ (সেই অক্ষর পুরুষই); সত্যম্‌ (সত্যস্বরূপ); যথা (যেভাবে); সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ (প্রদীপ্ত অগ্নি থেকে); সরূপাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (সমান রূপ বিশিষ্ট স্ফুলিঙ্গগুলি); সহস্রশঃ প্রভবন্তে (সহস্র সহস্র উৎপন্ন হয়); সোম্য (হে সৌম্য); তথা (সেইরূপ); অক্ষরাৎ (অক্ষর পুরুষ থেকে); বিবিধাঃ ভাবাঃ (বিভিন্ন বস্তু ও জীব সমূহ); প্রজায়ন্তে (জন্মায়); তত্র চ এব অপিযন্তি (তাতেই আবার লয় হয়)।

সরলার্থ: সেই ব্রহ্মই সত্য। জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, হে সৌম্য, সেই ভাবেই ব্রহ্ম থেকে বিবিধ বস্তুর উদ্ভব হয়, এবং সেগুলি আবার ব্রহ্মেই লোপ পায়।

ব্যাখ্যা: এখন প্রশ্ন হল—জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি? আমাদের হয়তো মনে আছে, এই উপনিষদের সূচনা হয়েছিল আচার্যের প্রতি শিষ্যের একটি প্রশ্ন দিয়ে, 'কস্মিন্‌ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বম্‌ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—'হে প্রভু, কি জানলে বা কোন্‌ বস্তুকে জানলে (কস্মিন্‌ নু বিজ্ঞাতে) এই সব কিছুকে (সর্বম্‌ ইদম্‌) জানা যায় (বিজ্ঞাতং ভবতি)?' 'এই সব' (সর্বম্‌ ইদম্‌) বলতে কি বোঝায়? এই দৃশ্যমান জগৎকে, এই বিশ্বকে বোঝায়। 'কি জানলে বা কাকে জানলে আমি সমগ্র জগৎকে জানতে পারি?' উপনিষদের মতে, একমাত্র পরমাত্মাকে জানলেই সমগ্র জগৎকে জানা যায়। পরমাত্মাই এই জগতের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, এবং এই জগৎ পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক কি এই নিয়ে যুগ যুগ ধরে তুমুল বিতর্ক চলে আসছে। হিন্দুদর্শন অনুযায়ী, এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। এই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ব্রহ্ম যেন জগতের কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছেন। এই জন্যই ঈশ্বরকে বলা হয় অন্তরাত্মন্‌ বা অন্তর্যামী

—তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি অন্তরেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র রয়েছেন।

এই শ্লোকে উপনিষদ বলছেন, 'তৎ এতৎ সত্যম্'—এ-ই সত্য। একেই সত্য বলে জান। আচার্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে চলেছেন। 'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ'—যেমন জ্বলন্ত অগ্নি থেকে; 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে'—সহস্র স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়; 'সরূপাঃ'—তাদের সব লক্ষণ অগ্নিরই মতো। 'অক্ষর' বলতে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'অক্ষয়'। আত্মা নিত্য, অবিকারী এবং অপরিবর্তনীয়। 'বিবিধাঃ ভাবাঃ প্রজায়ন্তে'—বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তি ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়। 'তত্র চ এব অপিযন্তি'—এবং তারা সেখানেই ফিরে যায়। অর্থাৎ তারা ব্রহ্ম থেকেই আসে, আবার ব্রহ্মেই ফিরে যায়। এ-ই তাদের সম্পর্ক। এর আগে উপনিষদ মাকড়সা এবং তার জালের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। মাকড়সা নিজের ভেতর থেকে জাল বের করে, আবার নিজের মধ্যেই সেই জাল গুটিয়ে নেয়। এই শ্লোকে উপনিষদ আগুন ও তার স্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আগুন ছাড়া স্ফুলিঙ্গের কোন অস্তিত্বই নেই। ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্কও সেই রকম। ব্রহ্মই এই জগতের উৎস, এই জগতের মূল। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম সকল বস্তু ব্রহ্ম থেকেই এসেছে, এবং ব্রহ্মেই ফিরে যাবে। একটি কথা সবসময় মনে রাখতে হবে তা হল, বেদান্ত মতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। 'শূন্য' থেকে কিছু সৃষ্টি হতে পারে একথা বেদান্ত স্বীকার করেন না। জগৎ সৃষ্টি হয়নি, প্রকাশিত হয়েছে—এই হল বেদান্তের কথা। ব্রহ্মই জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন।

ব্রহ্ম আছেন বলেই জগতে সব কিছু আছে। ব্রহ্ম নিত্য বিদ্যমান, সৎস্বরূপ। তাই ব্রহ্মকে সৎ বলা হয়। তাঁকে চৈতন্য বা চিৎও বলা হয়—তিনি শুদ্ধ চৈতন্য। ব্রহ্ম স্বরূপত সৎ এবং চিৎ। আমরা কোন ব্যক্তিকে দেখি, আবার একই সঙ্গে দেখি তিনি চলাফেরাও করছেন। অর্থাৎ তিনি চৈতন্যযুক্ত। এই চৈতন্য কোথা থেকে আসে? ব্রহ্ম থেকে। ব্রহ্মই তাঁর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। ব্যক্তিটি যেন তাঁর প্রকাশের একটি মাধ্যম, যেমন বৈদ্যুতিক আলো বা বাতির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়। কিছু বাতি যেমন বেশি শক্তি-সম্পন্ন, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ বেশী শক্তিমান। আবার কিছু বাতির আলো ক্ষীণ, দুর্বল; তেমনি মানুষের মধ্যেও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দুর্বল। হিন্দু দর্শন বলে, যা কিছু আছে সবই চৈতন্য। চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নেই। এই চৈতন্য কোথাও প্রকাশিত, কোথাও বা অপ্রকাশিত। একটি কাঠের টুকরোকে আমরা জড় বলি। কিন্তু হিন্দু দর্শন মতে, 'এ জড় নয়, চেতন। তবে চৈতন্য এখানে অপ্রকাশিত অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।' চৈতন্য সর্বত্র এবং সতত

বিদ্যমান। এ জগৎ চৈতন্যে পূর্ণ। এই সর্বব্যাপী চৈতন্যই জগতের প্রাণ। চৈতন্যের প্রকাশের তারতম্যেই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই দেহকে সচল রাখে। আত্মা বেরিয়ে গেলে হাত আর কাজ করে না, হৃদ্‌যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, মস্তিষ্ক অচল হয়ে যায়, শাসক্রিয়া স্তব্ধ হয়। এহেন অবস্থায় ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আত্মা দেহকে সক্রিয় রাখে। আত্মাই এই দেহের আশ্রয়। আত্মা নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলে এই দেহের মৃত্যু হয়; দেহটি তখন খসে পড়ে। কাপড় ছিঁড়ে গেলে তা যেমন আমরা পরিত্যাগ করি, আত্মার দেহত্যাগও সেই রকম। একেই বলে মৃত্যু। আসলে আত্মার কিন্তু মৃত্যু হয় না।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ এক একটি জীবাত্মা। কিন্তু পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। নামরূপ আরোপিত হয়ে এক পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন। নামরূপের জন্যই আমরা নিজেদের একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে করি। বস্তুত আমরা আলাদা নই, সেই এক পরমাত্মা। একথা কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। উদ্ভিদ, প্রাণিকুল, এককথায় সব কিছুই এই নামরূপের বৈচিত্র মাত্র। নামরূপই পরমাত্মাকে সীমাবদ্ধ করে। নামরূপের কারণেই আমরা নিজেদের খণ্ডিত বলে মনে করি। সেহেতু আমাদের পরিচয়ও স্বতন্ত্র। কিন্তু নামরূপ তুলে নিলে থাকে শুধু এক ও অভিন্ন সত্তা, পরমাত্মা। যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির প্রকাশ, ঠিক তেমনি সকল জীবাত্মা সেই অভিন্ন পরমাত্মা তথা ব্রহ্মেরই প্রকাশ।

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎপরতঃ পরঃ॥২

অন্বয়: [সঃ] দিব্যঃ (জ্যোতির্ময়); পুরুষঃ (পুরুষ); হি অমূর্তঃ (রূপহীন); সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (বাইরে এবং ভিতরে); হি অজঃ (জন্মরহিত); অপ্রাণঃ (প্রাণ-রহিত [নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন না]); হি অমনাঃ (মন বর্জিত); শুভ্রঃ (বিশুদ্ধ); হি অক্ষরাৎ (অক্ষর বা কার্য ব্রহ্ম থেকে); পরতঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর)।

সরলার্থ: এই জ্যোতির্ময় পুরুষের কোন রূপ নেই (অর্থাৎ তিনি নির্বিশেষ)। ইনি সর্বব্যাপী —বাইরেও আছেন, ভিতরেও আছেন। ইনি অজাত (অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি হয়নি)। ইনি প্রাণবায়ু বর্জিত (কারণ ইনি দেহহীন, যেহেতু দেহ থাকলেই দেহের পরিবর্তন থাকবে), এঁর মনও নেই। ইনি শুদ্ধ (নির্গুণ)। এই স্থূল মায়া জগতের (নামরূপের জগৎ) ঊর্ধ্বে তিনি। এমনকি তিনি জগতের বীজরূপ অব্যক্ত প্রকৃতিরও ঊর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মের স্বরূপ কি? 'দিব্যঃ'—জ্যোতির্ময়, দীপ্ত, উজ্জ্বল, এবং 'অমূর্তঃ'—এঁর কোন রূপ নেই, 'পুরুষঃ'—ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি সর্বত্র রয়েছেন। 'সবাহ্যাভ্যন্তরঃ'—তিনি সকল বস্তুর ভিতরেও আছেন বাইরেও আছেন। তিনি সর্বব্যাপী। 'অজঃ'—তাঁর জন্ম নেই। আবার যাঁর জন্ম নেই তাঁর মৃত্যুও নেই। জীব হিসেবে আমরা সকলেই জন্মমৃত্যুর অধীন। কিন্তু পরমাত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। 'অপ্রাণঃ'—এর আক্ষরিক অর্থ যাঁর প্রাণবায়ু নেই। এর অন্য অর্থ— নিষ্ক্রিয়, দৈহিক কর্মবিহীন এবং অচঞ্চল। নিজে নিষ্ক্রিয় হয়েও ব্রহ্মই সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। একই ভাবে, 'অমনাঃ' কথাটির একটি অর্থ যাঁর মন নেই, মন বর্জিত; এর অপর অর্থ মনের ক্রিয়া যাঁর স্তব্ধ। 'শুভ্রঃ'—অর্থাৎ নির্মল, শুদ্ধ এবং নির্বিশেষ। ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা স্বাধীন, নির্গুণ, অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়। আমরা কিন্তু বাইরের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেমন, আলোতে আমরা দেখতে পাই; কিন্তু রাতের অন্ধকারে আমরা অন্ধ। পরমাত্মা কিন্তু বাইরের কোন অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'—সেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্ম একযোগে সগুণ এবং নির্গুণ। ব্রহ্মকে যখন এই জগৎ-রূপে চিন্তা করি, তখন তাঁকে বলি সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মই এই জগৎ হয়েছেন। কিন্তু যখন জগতের কথা বাদ দিয়ে শুদ্ধ ব্রহ্মকে চিন্তা করি তখন তিনি পরঃ অর্থাৎ পরম্। তখন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। আসলে দুই-ই অভিন্ন। ব্রহ্মকে গুণের দ্বারা বিশেষিত করলে তিনি সগুণ, আর গুণবর্জিত অর্থাৎ নির্বিশেষ রূপে চিন্তা করলে ব্রহ্ম নির্গুণ। অক্ষর বলতে সগুণ ব্রহ্মকে বোঝায়, যদিও এই সব গুণ তখনও বীজাকারে রয়েছে। অক্ষরকে অব্যক্ত বা প্রকৃতিও বলা হয়। সগুণ ব্রহ্ম নিজেকে এই স্থূল নামরূপের জগৎ-রূপে পূর্ণ প্রকাশ করেন এবং অক্ষর এই জগতের ঊর্ধ্বে। ব্রহ্ম তথা পুরুষ আবার এই অক্ষরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ইনি-ই শুদ্ধ চৈতন্য তথা নির্গুণ ব্রহ্ম।

এই পরম সত্যকে কিভাবে বর্ণনা করব তা আমরা জানি না। আর সেই জন্যেই আমরা তাঁর উপর নানা গুণ আরোপ করি। আমরা বলি ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু কেমন করে বুঝব তিনি মঙ্গলময়? বস্তুত তা আমরা বুঝতে পারি না। এই গুণ আমরা ঈশ্বরের উপর আরোপ করি মাত্র। এইভাবে গুণের দ্বারা বিশেষিত না করে আমরা ঈশ্বর বা আত্মা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এই জগতের কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপর সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা আরোপ করি। আমরা বলি, তিনিই জগৎকে প্রকাশ করেছেন। তিনি তখন সগুণ। আমরা তাঁকে বিশেষিত করছি। আবার যখন উপনিষদ বলেন যে, জ্বলন্ত আগুন থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় তেমন ভাবেই এই জগৎ ও তার সব

বস্তু ব্রহ্ম থেকে আসে, তখন এই ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মকে কোনভাবেই জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না। এই জন্যই এখানে উপনিষদ বলছেন—'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'। নির্গুণ ব্রহ্মই পরম এবং সর্বোচ্চ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥৩

অন্বয়: এতস্মাৎ (এর থেকে অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্ম থেকে); প্রাণঃ (প্রাণ); মনঃ (মন); সর্বেন্দ্রিয়াণি (সকল ইন্দ্রিয়); খম্ (আকাশ); বায়ুঃ (বায়ু); জ্যোতিঃ (তেজ); আপঃ (জল); চ (এবং); বিশ্বস্য (বিশ্বের); ধারিণী (ধারক); পৃথিবী (পৃথিবী); জায়তে (উদ্ভূত হয়েছে)।
সরলার্থ: প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং সর্ববস্তুর আশ্রয় এই পৃথিবী, সব এর থেকেই (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম থেকে) এসেছে।
ব্যাখ্যা: উপনিষদ বলছেন, সব কিছু এসেছে এর থেকে (এতস্মাৎ) অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম থেকে। প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি (অগ্নি), জল এবং পৃথিবী—এককথায় পঞ্চভূত এই সগুণ ব্রহ্ম থেকে এসেছে। পৃথিবীকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বস্য ধারিণী' অর্থাৎ সর্ববস্তুর আশ্রয়। এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ও তার অন্তর্গত নরনারী, উদ্ভিদ, পশু, সব কিছুকে পৃথিবী ধারণ করে আছে। পৃথিবী এই দৃশ্যমান জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি। কিন্তু মূলত সকল বস্তুই এসেছে ব্রহ্ম থেকে। ব্রহ্মই সকল বস্তুর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এই জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত। বেদান্তে একটি সহজ উপমা পাই—রজ্জু-সর্পের উপমা। মাটিতে দড়ি পড়ে আছে, অন্ধকারে দেখে মনে হল সাপ। ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু সেটা আদৌ সাপ ছিল না, দড়ি ছিল। কিন্তু ভুলবশত মনে করেছি সাপ। এই জগৎও সেই রকম। সাপ যেমন দড়িতে আরোপিত, ঠিক তেমনি এই জগৎও ব্রহ্মে আরোপিত। আসল কথা, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।

আর একটি উপমা দেওয়া যেতে পারে। সম্ভবত এই উপমাটি বেশী উপযুক্ত—পর্দায় ফেলা চলমান ছায়াছবি। দর্শকের আসনে বসে আমরা পর্দার উপর কত বিচিত্র দৃশ্যই না দেখি। তা কখনও হাস্যকর, কখনও বা সংঘাতের। সেগুলি দেখে মনে নানাপ্রকার আবেগের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব দৃশ্য তো সত্য নয়। তবে সত্য কি? পেছনের পর্দাটিই সত্য। পর্দা আধার, আর চলমান ছবিগুলি তার উপর আরোপিত। পর্দা ছাড়া এই সব ছবির কোন অস্তিত্বই নেই। একই ভাবে বলা যায়, ব্রহ্ম ছাড়া, পরমাত্মা ছাড়া এ জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পরমাত্মাই প্রতিষ্ঠাভূমি, পরমাত্মাই আশ্রয়, আর সমগ্র

জগৎ তাঁতে আশ্রিত। আত্মাকে সরিয়ে নিলে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ '১' সংখ্যার উদাহরণ দিতেন। একের পিঠে একটি শূন্য যোগ করলে পাই ১০, আর একটি যোগ করলে পাই ১০০, তারপর ১০০০। কিন্তু ১ সংখ্যাটি সরিয়ে নিলে থাকে শুধুই শূন্য, অর্থাৎ কিছুই থাকে না। সেই '১' সংখ্যাটি হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগৎ বলতে আর কিছুই থাকে না।

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা।।৪

অন্বয়: অস্য (যাঁর); অগ্নিঃ (দ্যুলোক); মূর্ধা (মস্তক); চন্দ্রসূর্যৌ (চাঁদ এবং সূর্য); চক্ষুষী (দুটি চোখ); দিশঃ (দিক সমূহ); শ্রোত্রে (দুটি কান); চ (এবং); বিবৃতাঃ বেদাঃ (প্রকটিত বেদ সমূহ); বাক্ (বাক্য); বায়ুঃ (বায়ু); প্রাণঃ (প্রাণ); বিশ্বম্ (বিশ্ব); হৃদয়ম্ (হৃদয়); পৃথিবী (পৃথিবী); পদ্ভ্যাম্ (দুটি পায়ের জন্য [অর্থাৎ দুটি পায়ের জন্যই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে]); এষঃ হি (ইনিই); সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা)।

সরলার্থ: স্বর্গ তাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য তাঁর দুই চোখ, দিক সকল তাঁর দুই কান, প্রকটিত বেদসমূহ তাঁর বাক্য, বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, বিশ্ব তাঁর হৃদয় এবং তাঁর চরণ-যুগলের জন্যই এই পৃথিবী। তিনিই সর্বভূতের অন্তরতম আত্মা।

ব্যাখ্যা: আমাদের সম্মুখে ছড়ানো রয়েছে এই সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীর সামগ্রিক রূপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এর সামান্য অংশ মাত্র আমরা দেখতে পাই। আমরা জানি, আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অন্যান্য বহু ছায়াপথ রয়েছে। সূর্যকে দেখে আমাদের মনে হয়: 'আহা! কি অপূর্ব!' কিন্তু আবার একথাও জানি যে, এই সূর্যের চেয়ে বৃহত্তর এবং আরও শক্তিশালী অনেক সূর্য আছে। উপনিষদ আমাদের কল্পনা করতে বলছেন, দ্যুলোক (অগ্নিঃ) ব্রহ্মের মস্তক (মূর্ধা) মাত্র। চন্দ্রাতপ সদৃশ নক্ষত্র-খচিত আকাশ তাঁর শির, সূর্য এবং চন্দ্র তাঁর দুই চোখ, চারটি দিক (দিশঃ) তাঁর কান। 'বিবৃতাঃ বেদাঃ'—ব্রহ্মের বাক্-রূপে বেদসমূহের প্রকাশ। 'বায়ুঃ প্রাণঃ'—বাতাস তাঁর প্রাণবায়ু এবং এই বিশ্ব তাঁর হৃদয়। 'পদ্ভ্যাং পৃথিবী'—তাঁর পদযুগলের জন্য এই পৃথিবী। 'এষঃ সর্বভূতান্তরাত্মা'—তিনিই সর্ববস্তুর অন্তরাত্মা, আদি কারণ, সারাৎসার। জগতে সকল অস্তিত্বের মূল এই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ।
সোমাৎপর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎসংপ্রসূতাঃ।।৫

অন্বয়: তস্মাৎ (তাঁর থেকে [অর্থাৎ সেই পুরুষ থেকে]); অগ্নিঃ (দ্যুলোক [জন্ম নেয়]); যস্য (যার অর্থাৎ এই দ্যুলোকের); সমিধঃ (ইন্ধন [হল]); সূর্যঃ (সূর্য); সোমাৎ ([দ্যুলোক থেকে যার জন্ম] সেই চন্দ্র থেকে); পর্জন্যঃ (মেঘ [অর্থাৎ বৃষ্টি হয়]); পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে); ওষধয়ঃ (ওষধি বৃক্ষসমূহ); [জন্মায়] পুমান্ (মানুষ); যোষিতায়াম্ (স্ত্রীতে); রেতঃ (শুক্র); সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে); [এই রূপে] পুরুষাৎ (পরমপুরুষ অক্ষর থেকে); বহ্বীঃ (অনেক); প্রজাঃ (জীবসমূহ); সংপ্রসূতাঃ (জন্ম নেয়)।
সরলার্থ: সূর্য যেন ওই অগ্নির (অর্থাৎ দ্যুলোকের) ইন্ধন। ওই অগ্নি বা দ্যুলোক এই মহান পুরুষ থেকে এসেছে। চন্দ্র এসেছে দ্যুলোক থেকে এবং বৃষ্টি চন্দ্র থেকে। আবার এই বৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে শস্যাদির জন্ম। শস্য থেকে উৎপন্ন পুরুষবীর্য রমণীতে সিঞ্চিত হয়। এইভাবে সেই মহান পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ, সগুণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা) থেকে পরম্পরাক্রমে সর্ব বস্তুর উদ্ভব।
ব্যাখ্যা: ধরা যাক, কোন সৎ ব্যক্তি যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করেছেন। মৃত্যুর পরে তিনি স্বর্গলোকে যাবেন এবং কিছু কাল স্বর্গসুখ ভোগ করবেন। কিন্তু সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হলে তাঁকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। এই প্রত্যাবর্তন কি ভাবে হয়? উপনিষদ বলেন, মৃত্যুর পর মানুষ প্রথমে মেঘলোকে যায়। মেঘ থেকে যখন বৃষ্টি হয় তখন সেই বৃষ্টিধারার সঙ্গে সে পৃথিবীতে নেমে আসে। সেই বৃষ্টির জল উদ্ভিদ শোষণ করে। সেই সঙ্গে জীবের সূক্ষ্ম দেহও উদ্ভিদে প্রবেশ করে। সেই উদ্ভিদজাত শস্য নরনারী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সেখান থেকেই আবার মানুষের পুনর্জন্ম হয়। পুনর্জন্ম প্রক্রিয়াটি এখানে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলতেই পারেন, ব্যাখ্যাটি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, অতএব অগ্রাহ্য। কিন্তু এখানে মূল কথাটি হল, মানুষের পুনর্জন্ম হয় এবং এর থেকে তার সহজে নিস্তার নেই। কিভাবে পুনর্জন্ম ঘটে সে প্রসঙ্গ আলাদা।

'প্রজাঃ' অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে; 'বহ্বীঃ'—বহু। এই সব কিছু কোথা থেকে আসে? পুরুষ তথা ব্রহ্ম থেকে। মাকড়সা যেমন জাল বিস্তার করে এবং সেই জাল ক্রমশ বড় হতে থাকে ঠিক তেমনি ব্রহ্ম যেন নিজেকে বিস্তার করেছেন। এই ভাবে প্রাণী পরম্পরার মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ করেন।

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ॥৬

অন্বয়: তস্মাৎ (তাঁর থেকে [সেই পুরুষ থেকে]); ঋচঃ (ঋক্-বেদ); সাম (সাম বেদ); যজূংষি (যজুর্বেদ); দীক্ষা ([যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে] দীক্ষা); যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম); চ (এবং) সর্বে ক্রতবঃ (যজ্ঞসমূহ [যেখানে পশুবলি দেওয়া হয়]); চ (এবং); দক্ষিণাঃ ([দিক্ষিণাসমূহ যা যজ্ঞের অঙ্গ]); চ (এবং); সংবৎসরঃ (শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যজ্ঞের কাল); যজমানঃ (যজমান); চ (এবং); লোকাঃ (কর্মফলরূপ লোকসমূহ); যত্র (যেখানে বা যে লোকে); সোমঃ (চন্দ্র); পবতে (পবিত্র করে); যত্র সূর্যঃ (যেখানে বা যে লোকে সূর্য); [তপতে (তাপ দেয়, আলোকিত করে)।

সরলার্থ: সেই পুরুষ থেকে সবকিছুর উৎপত্তি। যথা: ঋক্, সাম এবং যজুঃ বেদ, দীক্ষা (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ শুরু করার আগে যে মঙ্গলাচরণ করা হয়) সম্বন্ধে জ্ঞান, পশুবলি, দক্ষিণা দান (যা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ; অর্থ বা পশু ইত্যাদি দক্ষিণা যা ঋত্বিককে দেওয়া হয়), শাস্ত্রমতে যজ্ঞের সময় সীমা, যজমানের যজ্ঞ করার যোগ্যতা এবং যজ্ঞকর্মের ফল রূপ লোকসমূহ। চন্দ্র যেসব লোক পবিত্র করে (যেমন দেবলোক) এবং সূর্য যেসব লোক (যথা পিতৃলোক) আলোকিত করে সবই ব্রহ্ম থেকে এসেছে।

ব্যাখ্যা: এই উপনিষদের প্রথম প্রশ্ন ছিল—'কি বা কাকে জানলে সব কিছুকে জানা যায়?' উপনিষদের উত্তর : ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম থেকেই সব কিছু আসে। 'তস্মাৎ'—তাঁর থেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে বেদসকল যথা ঋক্-বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ এসেছে। বেদসমূহের পর এসেছে 'দীক্ষা', যার অর্থ যজ্ঞ করার অধিকার অর্জনের জন্য দীক্ষা পাওয়া। দীক্ষার অপর অর্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাক্ প্রস্তুতি রূপে যজ্ঞের পূর্বে অন্যান্য অনুষ্ঠান করা—যেমন সঙ্কল্প গ্রহণ অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ; 'ক্রতবঃ'—পশুবলি সহ অনুষ্ঠান; 'দক্ষিণাঃ'— ব্রাহ্মণকে দান না করে কোন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। অর্থদান, বস্ত্রদান, গোদান এসবই দক্ষিণার অন্তর্গত। 'সম্বৎসরঃ'—যজ্ঞের যথাবিধি সময়সীমা। এমন যজ্ঞ আছে যা শেষ করতে বছর ঘুরে যায়। আবার কিছু যজ্ঞ এক ঘণ্টা বা কয়েক ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। 'যজমান'—যিনি যজ্ঞ করেন। 'লোকাঃ'—বিভিন্ন লোক (স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক ইত্যাদি)। যজ্ঞের ফল অনুযায়ী মৃত্যুর পর যজমান বিশেষ বিশেষ লোকে যান। উপনিষদে সোম

অর্থাৎ চন্দ্রলোক এবং সূর্যলোকের উল্লেখ আছে। বেদসমূহ, যজ্ঞাদি, যজমান এবং যজ্ঞফল সবই ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত — এই হল উপনিষদের বক্তব্য।

উপনিষদে একই কথার পুনরাবৃত্তি আমাদের কিছুটা বিস্মিত করে। কিন্তু উপনিষদ মনে করেন, বারবার আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে না দিলে আমরা ভুলে যেতে পারি। কেন আমরা ভুলে যাই? কঠ উপনিষদ বলছেন, চোখ কান ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়ই স্বভাবত বহির্মুখী। সেই কারণে বাইরের জগতের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই এবং একই সঙ্গে এই আকর্ষণের মূল উৎসকে আমরা ভুলে যাই। এই জন্য উপনিষদ বলছেন : 'হ্যাঁ, এই জগৎ বড় সুন্দর, বড় চমৎকার। কিন্তু মনে রেখো, ব্রহ্ম আছেন বলেই জগৎকে এত সুন্দর লাগে, কারণ সব বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মই রয়েছেন।' জগতের সকল অস্তিত্ব ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। যদি এ সত্যকে অস্বীকার করি, ব্রহ্মকে যদি দেখতে না পাই, তবে সে ভুল আমাদের। এই মূল সত্যের দিকেই উপনিষদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। সেই জন্যই উপনিষদকার বহু যত্নে এই দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। নয়তো আমরা মূল সত্যটি ভুলে যাব।

এক জায়গায় উপনিষদ পর্বতের গা বেয়ে বৃষ্টিধারা নেমে আসার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে কোন পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময়ে এ দৃশ্য দেখা যায়। পর্বতের ঢাল বেয়ে শত শত জলধারা নেমে আসে। পরে সেগুলি একত্র হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। তারপর দীর্ঘ পথ পার হয়ে শেষে সাগরে বিলীন হয়। এই জলধারাগুলির বৈচিত্র লক্ষ্য করার মতো। এক একটি জলধারা এক একজন মানুষের প্রতীক। এই জগতে বহু মানুষের বাস এবং প্রত্যেকেরই নাম ও রূপ স্বতন্ত্র। এর উপর আবার আছে নানা উপাধি অর্থাৎ গুণ। কেউ ফরসা, কেউ কালো; কেউ বিদ্বান, কেউ বা অশিক্ষিত। কিন্তু এ সবই উপাধি। উপনিষদের মতে, এই সব খুঁটিনাটি একেবারেই গৌণ। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে আছেন শুধু ব্রহ্ম। লম্বা-বেঁটে, ফরসা-কালো, নারী-পুরুষ—সবই সেই এক ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই এক ব্রহ্মই নানা রূপে, নানা নামে, নানা উপাধিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

উপনিষদ আবার বলছেন, 'এই জগতের বৈচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখ—সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি সব নিয়ে এই বিশাল জগৎ। এর স্বরূপ কি? স্বরূপত এই জগৎ ব্রহ্ম বৈ কিছু নয়।' স্ফুলিঙ্গ যেমন জ্বলন্ত আগুন থেকে বেরোয় এই জগৎও তেমনি ব্রহ্ম থেকে বেরিয়েছে। সর্বত্র সেই একই আত্মা বিরাজিত। নরনারী, উদ্ভিদ, প্রাণিকুল, আকাশ-বাতাস সর্বত্র সেই এক পুরুষ, এক অন্তরাত্মা বিদ্যমান—একই ব্রহ্ম নানারূপে। পশু, মানুষ, নারী এভাবে পৃথক করে না দেখে সবাইকে ব্রহ্মরূপে দেখতে হবে। এমন করে যিনি দেখতে পারেন তাঁরই জ্ঞান হয়েছে। যদি এক ব্রহ্মকে না দেখে বহু দেখি তবে সেটা আমার ভুল। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'—সকলের মধ্যে এক অন্তরাত্মাকে দেখ। তবেই তুমি মুক্ত।

তুমি যথার্থ জ্ঞানী। দুর্ভাগ্যবশত আমরা বহু দেখি। আর সেহেতু একজনকে বলি বন্ধু, আর একজনকে শত্রু। এইভাবে আমরা অনুরাগ-বিরাগের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হই। অধিকাংশ মানুষের জীবন এভাবেই কেটে যায়। কিন্তু উপনিষদ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, বৈচিত্রের মধ্যে বহুর মধ্যে সেই এককে দেখতে হবে। এই এক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

উপনিষদ আমাদের আরও একটি নির্দেশ দিচ্ছেন। আমাদের ফিরে তাকাতে বলছেন মূল উৎসের দিকে। ধরা যাক কোন বই পড়ে আমি অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি। লেখকের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু উপনিষদ বলছেন: 'একেবারে উৎসমুখে চলে যাও। গ্রন্থকার কোথা থেকে এ জ্ঞান লাভ করলেন? ব্রহ্ম থেকে।' গ্রন্থকার ও তাঁর লেখা বই থেকে যে জ্ঞান আমার মধ্যে এসেছে তার উৎস সেই একই ব্রহ্ম, একথা যেন ভুলে না যাই।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ॥৭

অন্বয়: তস্মাৎ চ (এবং তাঁর থেকে [অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে]); বহুধা (বহু প্রকার); দেবাঃ ([বসু প্রভৃতি] দেবতাগণ); সংপ্রসূতাঃ (সম্যক্-রূপে উৎপন্ন হয়েছে); সাধ্যাঃ (সাধ্য দেবতাগণ); মনুষ্যাঃ (মানুষেরা); পশবঃ (পশুসমূহ); বয়াংসি (পাখীরা); প্রাণাপানৌ (প্রাণ এবং অপানবায়ু; ব্রীহিযবৌ (ধান ও যব); তপঃ (তপস্যা); শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি; বিশ্বাস); সত্যম্ (সত্য); ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য); চ (এবং); বিধিঃ (শাস্ত্রের নিয়ম [সম্যক্-রূপে উৎপন্ন হয়েছে])।
সরলার্থ: সেই পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) থেকে বিবিধ দেবদেবী ও বসুগণ এসেছেন। এভাবে পরপর এসেছেন সাধ্যগণ (অন্যান্য দেবদেবীর চেয়ে উচ্চস্তরের দেবতা, সংখ্যায় বারজন), মানুষ, প্রাণী বর্গ, পক্ষিকুল, প্রাণ ও অপানরূপ শ্বাসবায়ু, ধান-গম, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, এবং শাস্ত্রবিধি সকল।
ব্যাখ্যা: এই সব কিছু, জগৎ ও তার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়সকল ব্রহ্ম থেকে এসেছে। উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মকে জানলেই সব জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিচ্ছেন—হাঁড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে। ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা জানতে গেলে এক কণা ভাত টিপে দেখলেই যথেষ্ট; নরম হলে বোঝা যায় ভাত তৈরী। হাঁড়ির সব ভাত আলাদাভাবে টিপে দেখার

প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মের বেলাতেও একই কথা খাটে। উপনিষদ বলছেন, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার প্রয়োজন নেই। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দেবদেবী, পঞ্চভূত, নরনারী, জীবজন্তু, উদ্ভিদ জগৎ—এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই ব্রহ্মের প্রকাশ। সেইজন্য ব্রহ্মকে জানলেই সব জানা হয়ে যায়।

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত।।৮

অন্বয়: তস্মাৎ (তাঁর থেকে [অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে]); সপ্ত প্রাণাঃ (সাতটি ইন্দ্রিয় [দুই চোখ; দুই নাসারন্ধ্র; দুই কান এবং মুখ]); প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়েছে); সপ্ত অর্চিষঃ ([এই ইন্দ্রিয়গুলির] সাতটি বিষয়); সমিধঃ (ইন্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু); সপ্ত (সাতটি); হোমাঃ (এইসব বিষয়ের জ্ঞান); ইমে সপ্ত লোকাঃ (প্রাণী-দেহের অভ্যন্তরে সাতটি ইন্দ্রিয়ের যে অবস্থান); যেষু (যাতে); সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ (সাতটি সাতটি করে এই ইন্দ্রিয়গুলি [ঈশ্বর] প্রাণী-দেহে স্থাপন করেছেন); গুহাশয়াঃ ([সুষুপ্তিতে] হৃদয়ে লীন হয়ে থাকে); প্রাণাঃ (সাতটি ইন্দ্রিয়); চরন্তি (বিচরণ করে)।

সরলার্থ: সেই ব্রহ্ম থেকেই সাতটি ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব। এই সাত ইন্দ্রিয়ের সাতটি বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল, সাত প্রকার বিষয় জ্ঞান, জীবদেহে এই সাত ইন্দ্রিয়ের সাতটি অধিষ্ঠান—এ সবই ব্রহ্ম থেকে এসেছে। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল আত্মায় বিলীন হয়। আত্মা তখন (যেমন সুষুপ্তিকালে) হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন।

ব্যাখ্যা: সাতটি প্রাণ কি কি? এগুলি হল ইন্দ্রিয়—দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র এবং জিভ। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'অর্চিষঃ'—কথাটির অর্থ শিখা, আলো বা কিরণ। এই ইন্দ্রিয়গুলির যেন শিখা বা কিরণ রয়েছে এবং তারা অনুভব করতে পারে। যেমন, আমরা যখন জিভ দিয়ে কোন স্বাদ গ্রহণ করি তখন আমরা কিসের স্বাদ পাচ্ছি তা বুঝতে পারি। 'সমিধঃ' বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'সমিধঃ' কথাটির অর্থ ইন্ধন। যেমন, আগুন জ্বালাতে ইন্ধন লাগে। ইন্দ্রিয়গুলি যেন যজ্ঞ করছে। কি ভাবে? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা কিছু করি তা এক ধরনের যজ্ঞ। গীতাতেও একটি শ্লোকে আছে, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ...' অর্থাৎ আমরা যা কিছু করি তা ব্রহ্মের উদ্দেশে যজ্ঞ বিশেষ। সবকিছু ব্রহ্ম থেকে আসে, আবার ব্রহ্মেই ফিরে যায়। যা কিছু দেখি

সবই ব্রহ্ম। যজ্ঞের কুশি (অর্থাৎ তামার পাত্র বিশেষ যা দিয়ে আহুতি দেওয়া হয়), যজ্ঞের আহুতি, যজ্ঞাগ্নি এবং ঋত্বিক—সব ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নেই। 'সব কিছু ব্রহ্মে সমর্পিত', এই সত্যকে যদি ধ্যান করা যায়, যদি স্বয়ং ব্রহ্মরূপে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায় তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যে কেবলমাত্র ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে তা নয়, তারা যা কিছু গ্রহণ করে তাও ব্রহ্মের উদ্দেশে নিবেদন করে। এমন নয় যে, আমি ব্রহ্মকে ঘ্রাণে গ্রহণ করছি, ব্রহ্মই ব্রহ্মকে আঘ্রাণ করছেন। একইভাবে ব্রহ্মই ব্রহ্মকে দেখছেন, ব্রহ্মই ব্রহ্মকে খাচ্ছেন। ওই ব্রহ্ম চলেছেন। কোথায় চলেছেন? ব্রহ্ম ব্রহ্মের কাছেই যাচ্ছেন। ব্রহ্মেই যাত্রার আরম্ভ, আবার ব্রহ্মেই পরিসমাপ্তি। এক ব্রহ্মই কেবল আছেন।

যেহেতু আমরা যা কিছু করি তা-ই যজ্ঞ, সেহেতু আমাদের সকল কর্মই উপাসনা। আমাদের কোন কিছুই ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়। সবই আধ্যাত্মিক। সুতরাং সব কাজ আমাদের অতি যত্ন সহকারে করতে হবে। এমন ভাবে কাজ করতে হবে যা আমাদের আত্মজ্ঞানের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেঽস্মাৎ
স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সব ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥৯

অন্বয়: অতঃ (এই পুরুষ [ব্রহ্ম] থেকে); সর্বে (সকল); সমুদ্রাঃ (সমুদ্র সমূহ); চ (এবং); গিরয়ঃ (পর্বত সমূহ [জন্মেছে]); অস্মাৎ (এই পুরুষ থেকে); সর্বরূপঃ সিন্ধবঃ (ছোট বড় নদী সমূহ); স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়); অতঃ চ (এবং এই পুরুষ থেকে); সর্বাঃ (সকল); ওষধয়ঃ (ধানযব বৃক্ষলতা ইত্যাদি); চ (এবং); রসঃ (সব রস); যেন হি (যাঁর দ্বারা); এষঃ অন্তরাত্মা (এই অন্তরাত্মা); ভূতৈঃ (পঞ্চভূতের দ্বারা বেষ্টিত); তিষ্টতে (থাকেন)।

সরলার্থ: এই ব্রহ্ম থেকেই বিশাল সমুদ্র ও পর্বতমালা এসেছে এবং নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। ধানযবাদি সমুদয় বৃক্ষলতা এবং মধু ইত্যাদি সকল প্রকার খাদ্যরস এই ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন। ব্রহ্ম আছেন বলেই সব কিছু আছে। ব্রহ্মই সকল বস্তুকে একসঙ্গে ধরে রেখেছেন। সূক্ষ্ম কোষ রূপে খাদ্যরসই অন্তরাত্মাকে বেষ্টন করে আছে।

ব্যাখ্যা: অন্তরাত্মা বলতে কী বোঝায়? আমাদের এই দেহ স্থূল। স্থূল শরীরের মধ্যে আছে সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরকে অন্তরাত্মাও বলা হয়। পঞ্চভূত ছাড়া স্থূলদেহ থাকতে পারে না। অর্থাৎ খাদ্য পানীয় ছাড়া স্থূলদেহ রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই জন্যই স্থূলদেহকে অন্নময়

কোষ বলা হয়। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে স্থূলদেহের মৃত্যু হয়। খাদ্য পানীয় রূপে পঞ্চভূত এই স্থূলদেহকে পরিপুষ্ট করে। আর এই দেহের অভ্যন্তরে আছেন অন্তরাত্মা। স্থূলদেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম শরীরই অন্তরাত্মা। সূক্ষ্মরূপে পঞ্চভূত [অর্থাৎ তন্মাত্রা] এই অন্তরাত্মাকে ধারণ করে আছে।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং
বিকিরতীহ সোম্য॥১০

অন্বয়: পুরুষঃ এব (সেই পুরুষই); ইদম্ (এই); বিশ্বম্ (বিশ্ব); কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম); তপঃ (তপস্যা); [তিনিই] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); পর অমৃতম্ (পরম অমৃত); এতৎ পরামৃতং ব্রহ্ম (এই পরম, আনন্দঘন ব্রহ্মকে); যঃ (যিনি); গুহায়াম্ (হৃদয়গুহাতে); নিহিতম্ (নিহিত রূপে); বেদ (জানেন); সঃ (তিনি); সোম্য (হে সৌম্য); ইহ (ইহলোকেই); অবিদ্যাগ্রন্থিম্ (অবিদ্যারূপ বন্ধনকে); বিকিরতি (অতিক্রম করেন)।

সরলার্থ: এই ব্রহ্মই বিশ্ব। তিনিই অগ্নিহোত্রাদি সকল প্রকার কর্ম। তিনি জ্ঞান, তিনিই পরম। তিনি অবিনাশী এবং আনন্দঘন। সকল হৃদয়ে তিনি লুকিয়ে রয়েছেন। হে সৌম্য, যিনি একথা জানেন, তিনি এই জীবনেই অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে এখানে পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষ কেন? এই দেহ হল পুর (নগর), এবং যিনি এখানে বাস করেন তিনিই পুরুষ। পুরুষ বলতে আত্মা এবং ব্রহ্মকেও বোঝায়। পুরুষ নিজেকে এই নিখিল বিশ্বরূপে (ইদং বিশ্বম্) প্রকাশ করেন। সকল প্রকার কর্মও এই পুরুষের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। 'তপঃ' বলতে বোঝায় তপস্যা, কৃচ্ছ্রতা। এও ব্রহ্মেরই প্রকাশ। বস্তুত ভাল মন্দ যা কিছু আমরা করি, সব ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আমরা ব্রহ্মেই রয়েছি, আমাদের সত্তা ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম। 'অমৃতম্', তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি আনন্দস্বরূপ।

গুহা বলতে কি বোঝায়? মানুষের হৃদয়। গুহা শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ পর্বতকন্দর। গুহার অভ্যন্তরে কোন পশু থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে এত অন্ধকার যে, আমরা পশুটিকে দেখতে পাই না। একই ভাবে, ব্রহ্ম আমাদের হৃদয়ে আছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। 'নিহিতম্'—বাস করা। ব্রহ্ম আমাদের অন্তরে বাস করছেন। উপনিষদ বলছেন যে, যদি কেউ নিজ হৃদয়ে ব্রহ্মকে দর্শন করেন তবে

'অবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি', তিনি অজ্ঞানতার বন্ধন ছিন্ন করেন। তাঁর সব গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়, শৃঙ্খল ভেঙ্গে যায়।

প্রকৃত সত্যকে আমরা দেখতে পাই না; যা দেখি তা সত্যের বাহ্যরূপ। আমরা নিজেদের নাম-রূপের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখি। ধরা যাক, একটি বালক বাঁদরের মুখোশ পরে আছে। তার দিকে চেয়ে আমরা বলি, 'ওই যে একটা বাঁদর'। আসলে মুখোশের আড়ালে রয়েছে সেই ছেলেটি। উপনিষদ তাই বলছেন যে, মানুষ যদি প্রকৃত সত্যকে জানতে পারে, তবে তার অজ্ঞানতার সব বন্ধন ছিঁড়ে যায়। সে আর কোনদিনই মোহগ্রস্ত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরতের কাহিনী আছে। তিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ, কিন্তু বোবা ও জড়ের ভান করে থাকতেন। সকলেই তাঁকে জড়বুদ্ধি বলে মনে করত। একবার পালকিতে চড়ে এক রাজা চলেছেন। জড়ভরতকে পালকি বইতে বাধ্য করা হয়েছে। জড়ভরতের দেহ সবল ছিল ঠিকই, কিন্তু পালকি কাঁধে চলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না; তাই তিনি অন্যান্য বাহকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলেন না। ফলে পালকি অস্বাভাবিক রকম দুলছিল। অবশেষে রাজা তাঁকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন : 'হে নির্বোধ, ব্যাপারটা কি? তুমি কি ক্লান্ত? যদি ক্লান্তই হয়ে থাক, তবে বিশ্রাম করতে চাইছ না কেন? তোমার উল্টো-পাল্টা পা ফেলার জন্য আমি পালকির ভেতর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছি না।' এর আগে পর্যন্ত জড়ভরত সবসময় নির্বাক থাকতেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ গভীর জ্ঞানগর্ভ সব কথা তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, 'কাকে আপনি নির্বোধ বলে সম্বোধন করছেন? এই দেহটাকে? কিন্তু আমি তো দেহ নই। আমি সেই আত্মা যিনি আপনার মধ্যেও রয়েছেন। সুতরাং আপনার "নির্বোধ" সম্বোধন কার উদ্দেশে? আপনি আর আমি যে অভিন্ন।'

এখানে উপনিষদ সেই মূল ঐক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আমরা 'বহু' দেখি কিন্তু উপনিষদ বলেন, 'না, বহু নেই, এক। এক ব্রহ্ম তথা পরমাত্মাই বহুরূপে প্রতিভাত। এই একেকে দেখার চেষ্টা কর।' জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন, বৈচিত্র শুধুমাত্র নাম এবং রূপে। এই নাম-রূপ পরমাত্মার উপর আরোপিত। প্রকৃত সত্য এই বৈচিত্রের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। সত্য এক। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, আকাশ সব কিছুর মধ্য দিয়ে এক ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সেই একত্ব দর্শন হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়।

মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥১

অন্বয়: আবিঃ (ব্রহ্ম প্রকাশমান); সন্নিহিতম্ (প্রাণিগণের অন্তরস্থ); গুহাচরং নাম (গুহাচর বলে খ্যাত); মহৎ পদম্ (মহান আশ্রয়); অত্র (ইঁহাতে); এজৎ (সচল); প্রাণৎ (প্রাণযুক্ত); চ (এবং); নিমিষৎ (যাদের চোখে পলক পড়ে); যৎ এতৎ (এই যা কিছু); সমর্পিতম্ (সমর্পিত); এতৎ (এই ব্রহ্ম); সৎ (দৃশ্য); অসৎ (অদৃশ্য); প্রজানাম্ (প্রাণিগণের); বিজ্ঞানাৎ পরম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত); বরেণ্যম্ (বরণীয়); বরিষ্ঠম্ (শ্রেষ্ঠ); [তৎ] জানথ (তাঁকে জান)।
সরলার্থ: ব্রহ্ম স্বভাবতই স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি সকলের হৃদয় গুহায় বাস করেন। তাই তিনি গুহাচর বলে খ্যাত। তিনি সর্বভূতের মহান আশ্রয়। এই ব্রহ্মে সচল-অচল, সজীব-নির্জীব, স্পন্দনযুক্ত অথবা স্পন্দনহীন, এই সমস্ত কিছুই সমর্পিত রয়েছে। (হে সৌম্য) এই ব্রহ্ম একাধারে আমাদের দৃষ্টিগোচর, আবার অদৃশ্যও বটে। তিনি সর্বজনবরেণ্য। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না। নিজ আত্মার সাথে তাঁকে অভিন্ন বলে জান।
ব্যাখ্যা: এই ব্রহ্মকে বলা হয় 'গুহাচরম্' অর্থাৎ তাঁর বিচরণ হৃদয়গুহায়। তিনি 'আবিঃ', স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি জ্যোতির্ময়, দীপ্ত এবং উজ্জ্বল। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিতেন: ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ওই প্রদীপটিকে দেখতে চাইলে কি আর একটি প্রদীপের প্রয়োজন হয়? না, তা হয় না। একথা ব্রহ্ম সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ব্রহ্মকে দেখার জন্য আর কোন আলোর প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ম্প্রভ ও স্বয়ং-জ্যোতি। তিনি চৈতন্যস্বরূপ। আবার তিনি 'সন্নিহিতম্', পূর্ণভাবে বিরাজমান।

আবার ব্রহ্মকে 'মহৎ পদম্'ও বলা হয়, যার অর্থ মহৎ অধিষ্ঠান, মহৎ আশ্রয়, মহৎ প্রতিষ্ঠাভূমি'। এই মহান অবলম্বনকে কেন্দ্র করেই সবকিছু রয়েছে। তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। 'অত্র এতৎ সমর্পিতম্'—এখানে 'অত্র' শব্দটির অর্থ 'এই ব্রহ্মে' এবং 'এতৎ' হল 'এই বিশ্ব'। 'সমর্পিতম্' বলতে আশ্রিত বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই বিশ্ব সমর্পিত।

‘এজৎ’—যা কিছু চলাফেরা করে, গতিশীল অর্থাৎ সকল প্রাণী; ‘প্রাণৎ’—যা কিছু শ্বাস গ্রহণ করে; ‘নিমিষৎ’—যাদের চোখে পলক পড়ে; ব্রহ্ম এই সবকিছুর অধিষ্ঠান।

এক কথায়, উপনিষদ আমাদের জ্ঞান লাভ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কিসের জ্ঞান? সৎ-অসৎ জ্ঞান। আক্ষরিক অর্থে ‘সৎ’ বলতে বোঝায় ‘যা আছে’ ও ‘অসৎ’ বলতে বোঝায় ‘যা নেই’। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে ‘সৎ’ বলতে যা দৃষ্টিগোচর, এবং ‘অসৎ’ বলতে যা দৃষ্টিগোচর নয় তাকেই বোঝানো হয়েছে। সৎ শব্দের আর একটি অর্থ ‘যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য’, আর অসৎ হল ‘যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়’। বীজাণু যেমন সর্বত্র রয়েছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় আমাদের কাছে তা অসৎ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বীজাণুগুলি জীবন্ত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। এই সৎ এবং অসৎ উভয়ই ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। সব কিছু এই ‘বরেণ্যম্’ অর্থাৎ পরম সত্যকে আশ্রয় করে আছে। ‘পরং বিজ্ঞানাৎ’—‘পরম্’ অর্থ ঊর্ধ্বে, ‘পরং বিজ্ঞানাৎ’ অর্থ যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত। বহু বস্তুই আছে যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি যন্ত্র হিসাবে দুর্বল, এবং এদের শক্তি সীমিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আমাদের এই পৃথিবী থেকে বহু দূরে কোন গ্রহ থাকতে পারে যা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গ্রহটির অস্তিত্ব নেই। উপনিষদ বলছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে যা কিছু রয়েছে তাও ব্রহ্ম থেকেই এসেছে, ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে আছে। ছোট-বড়, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর অস্তিত্বই ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম, ব্রহ্মই বরিষ্ঠ।

তাই উপনিষদ আমাদের ব্রহ্মকে জানার জন্য সচেষ্ট হতে বলছেন। বস্তুর বাহ্যরূপের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে তলিয়ে দেখতে বলছেন। সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্মকে, সত্যকে আবিষ্কার করতে বলছেন। ব্রহ্মই সত্য। আর যা কিছু, সব ব্রহ্মে আরোপিত। এই ব্রহ্মকেই নিজ আত্মা বলে জানতে হবে—এই উপনিষদের নির্দেশ।

যদর্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ
তদেতৎসত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥২

অন্বয়: যৎ (যিনি); অর্চিমৎ (জ্যোতির্ময়); যৎ (যিনি); অণুভ্যঃ অণু (সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর); চ (এবং); যস্মিন্ (যাঁতে); লোকাঃ (লোকসমূহ); চ (এবং); লোকিনঃ (বিভিন্ন লোকবাসিগণ); নিহিতাঃ (নিহিত রয়েছে); তৎ এতৎ অক্ষরং ব্রহ্ম (এই সেই অক্ষর ব্রহ্ম);

সঃ (তিনি); প্রাণঃ (প্রাণ [প্রাণবায়ু]); তৎ উ (তিনিই); বা মনঃ (বাক্য এবং মন); তৎ এতৎ সত্যম্ (তিনিই সত্য); তৎ অমৃতম্ (তিনি অবিনাশী); সোম্য (হে সৌম্য); তৎ (তিনি); বেদ্ধব্যম্ (তাঁকে ভেদ করতে হবে অর্থাৎ তিনি মূল লক্ষ্যস্থল); বিদ্ধি (তাঁকে ভেদ কর অর্থাৎ জান)।

সরলার্থ: তিনি জ্যোতির্ময় এবং সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর। সেই অক্ষর ব্রহ্ম বিভিন্ন লোকসমূহ এবং ঐসব লোকের অধিবাসীদেরও আশ্রয়। তিনিই প্রাণ। বাক্য এবং মনও তিনি। সেই ব্রহ্মই সত্য, তিনিই নিত্য। তাঁকে ভেদ করতে হবে অর্থাৎ তাঁকে স্বরূপত জানতে হবে।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম এই জগতের আশ্রয়। দেহ, মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্রহ্মেই আশ্রিত। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। শুধু জড় বস্তুই নয়, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, সত্যও ব্রহ্মকে আশ্রয় করে আছে। ব্রহ্ম নিত্য এবং সকল বস্তুর উৎস। সবকিছু ব্রহ্ম থেকে এসেছে, ব্রহ্মই সকল বস্তুর অধিষ্ঠান আবার অন্তে সব ব্রহ্মেই লয় পাবে।

এই ব্রহ্মকে স্বরূপত জানাই জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে জানতে হবে।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥৩

অন্বয়: সোম্য (হে সৌম্য); ঔপনিষদম্ (উপনিষদের বাণী); মহাস্ত্রম্ (মহাস্ত্ররূপ); ধনুঃ (ধনু অর্থাৎ প্রণব মন্ত্র); গৃহীত্বা (গ্রহণ করে); উপাসা-নিশিতং শরম্ (উপাসনা অর্থাৎ একাগ্র ধ্যানের দ্বারা শাণিত তীর); সন্ধয়ীত ([তীর] যোজনা [করে]); আয়ম্য (ধনুর গুণ টেনে); তদ্ভাবগতেন চেতসা (তদ্গত ভাবে মন ব্রহ্মে স্থির রেখে); লক্ষ্যম্ (লক্ষ্যে); তৎ অক্ষরম্ এব (সেই অক্ষর ব্রহ্ম); বিদ্ধি (ভেদ কর, জান)।

সরলার্থ: উপনিষদের বাণী (অর্থাৎ প্রণবের বাণী) যেন এক বিরাট ধনুক, আর জীবাত্মা এই ধনুকের শর। ধ্যানের দ্বারা এই শরকে শাণিত কর। এরপর সবলে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করে, অর্থাৎ পার্থিব বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করে, সেই মনকে তোমার লক্ষ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থির কর; তারপর সেই মনের দ্বারা ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর।

ব্যাখ্যা: উপনিষদের বাণী কি? 'তত্ত্বমসি'–তুমিই সেই অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম। 'ঔপনিষদম্', অর্থাৎ উপনিষদের বাণীকে 'মহাস্ত্র', এক মহাশক্তিশালী অস্ত্র বলা হয়েছে। সেই অস্ত্রকে উপনিষদ ধনুকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শরটি কি? জীবাত্মা। লক্ষ্যবস্তু কি? স্বয়ং ব্রহ্ম। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করতে হলে শাণিত শরের প্রয়োজন। 'উপাসা নি শিতম্'—অর্থাৎ শরটিকে ধ্যান যোগে শাণিত করতে হবে। কিসের ধ্যান? 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমিই ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এখন আমরা নিজেদের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করে দেখি। আমরা বলি আমি শ্রীযুক্ত অমুক, অমুক অফিসে কাজ করি ইত্যাদি। উপনিষদ বলছেন, 'আমিই ব্রহ্ম', একথা বারবার স্মরণ করতে হয়। এইভাবে ধ্যান করতে করতে আমার শরটি শাণিত হয়ে ওঠে এবং আমি ব্রহ্মে লীন হবার যোগ্যতা অর্জন করি। প্রথমে ধনুকটি তুলে নিতে হবে। তারপর লক্ষ্য স্থির রেখে জ্যা ধরে আকর্ষণ করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। মনকে বাইরের বস্তু থেকে নিবৃত্ত করে লক্ষ্য বস্তুতে স্থির করতে হবে। 'তদ্ভাবগতেন চেতসা'—'আমিই স্বয়ং ব্রহ্ম', এই চিন্তায় যেন মন মগ্ন হয়ে থাকে। এরপর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন হোক, তারা এক হয়ে যাক—এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। উপনিষদ আমাদের এই কঠিন সাধনায় ব্রতী হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৪

অন্বয়: প্রণবঃ (ওঁকার মন্ত্র); ধনুঃ (ধনুক); আত্মা হি (জীবাত্মাই); শরঃ (বাণ); ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); তৎ লক্ষ্যম্ (সেই শরের লক্ষ্য); উচ্যতে (কথিত হয়); অপ্রমত্তেন (অপ্রমত্ত হয়ে, নির্ভুল ভাবে); বেদ্ধব্যম্ (ভেদ করা উচিৎ [এবং]); শরবৎ (সেই বাণের মতো); তন্ময়ঃ (লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে); ভবেৎ (থাকবে [অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাবে])।
সরলার্থ: ওঁকার ধনুক, জীবাত্মা শর, এবং ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্যবস্তু বলে কথিত। নির্ভুলভাবে সেই লক্ষ্যকে শরবিদ্ধ করতে হবে। তাহলে সেই শর (জীবাত্মা) লক্ষ্যের (ব্রহ্মের) সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। অর্থাৎ জীবাত্মা নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বোধ করবে।
ব্যাখ্যা: উপনিষদের বাণী হল এই ওম্ (প্রণব)। উপনিষদ এখানে বলছেন, আমাদের 'ওম্'কে ধ্যান করতে হবে। শর হল জীবাত্মা, ওম্ হল ধনুক এবং লক্ষ্য স্বয়ং ব্রহ্ম। ধনুকটি তুলে লক্ষ্যভেদে সচেষ্ট হতে হবে। 'অপ্রমত্তেন'—নির্ভুল ভাবে। শরটিকে অভ্রান্তভাবে

লক্ষ্যে স্থির করতে হবে। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শরনিক্ষেপ করতে হবে। ব্রহ্মচিন্তায় শরটি যেন তন্ময় থাকে। জীবাত্মা তখন ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবে।

যস্মিন্দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং
মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥৫

অন্বয়: যস্মিন্ (যে অক্ষরে); দ্যৌঃ (দ্যুলোক); পৃথিবী (পৃথিবী); চ (এবং); অন্তরিক্ষম্ (পৃথিবী ও দ্যুলোকের অন্তর্বর্তী স্থান); সর্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ মনঃ চ (মন ও ইন্দ্রিয়সকল); ওতম্ (সমর্পিত); তম্ (সেই); একম্ (অদ্বিতীয়); আত্মানম্ এব (আত্মাকেই); জানথ (জান); অন্যাঃ বাচঃ (অন্য সব কথা); বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর); এষঃ (এই আত্মজ্ঞান); অমৃতস্য (অমৃতের অর্থাৎ নিত্যকে লাভ করার); সেতুঃ (উপায়, সেতু)।

সরলার্থ: স্বর্গ, মর্ত, অন্তরীক্ষ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণসহ মন, সবই এই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত। এই এক ও অভিন্ন আত্মাকে জানেনা। আত্মজ্ঞানই অমরত্বের পথে সেতুস্বরূপ। অন্য অসার আলোচনায় সময় অপচয় করো না।

ব্যাখ্যা: 'অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ'—অসার আলাপ-আলোচনা বন্ধ কর, অন্য সব কথা ভুলে যাও। তুমি এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন—এই উপনিষদের মূল সুর। এই তত্ত্বটিতে মন একাগ্র কর, আর অন্য সব বিষয় ভুলে যাও। অন্য সব কিছু অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়। 'এষঃ অমৃতস্য সেতুঃ'—এটিই অমৃতের সেতু, অমৃতের পথ। ব্রহ্মজ্ঞানই সেই সেতু যা মানুষকে মৃত্যুর পারে অমৃতলোকে নিয়ে যায়। অমরত্ব লাভের আর অন্য কোন উপায় নেই।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥৬

অন্বয়: রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ কেন্দ্রে); অরাঃ ইব (চক্র শলাকার মতো); যত্র (যেখানে); নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ); সংহতাঃ (একত্র হয়); স এষঃ (সেই তিনি); বহুধা জায়মানঃ (নানা রূপে প্রকাশিত হয়ে); অন্তঃ (হৃদয় মধ্যে); চরতে (বিচরণ করেন); আত্মানম্

(আত্মাকে); ওম্ ইত্যেবম্ (ওঁকার রূপে); ধ্যায়থ (চিন্তা কর বা ধ্যান কর); তমসঃ (অন্ধকার থেকে অর্থাৎ অজ্ঞানতা থেকে); পরস্তাৎ (পারে); পারায় (উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত); বঃ (তোমাদের); স্বস্তি (মঙ্গল হোক)।

সরলার্থ: রথচক্রের কেন্দ্রে বহু শলাকা সংযুক্ত থাকে; একই ভাবে, বহু ধমনী হৃদ্‌যন্ত্রে যুক্ত থাকে। পরমাত্মা সেই হৃদয়ের মধ্যে নানা রূপে (যথা ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি রূপে) নিজেকে প্রকাশ করে অন্তরে বিচরণ করেন। অন্ধকারের পারে যাওয়ার জন্য সেই আত্মায় ধ্যানমগ্ন হও। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।

ব্যাখ্যা: এই জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্পর্ক বর্তমান উপনিষদ আবার সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন। এবার উপনিষদ রথচক্রের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। রথচক্রে বহু শলাকা থাকে; আর এইসব শলাকা চক্রের কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। চক্রের একটি কেন্দ্র বা নাভি থাকে আর সেই কেন্দ্র থেকেই সব শলাকা নির্গত হয়। কেন্দ্রটি না থাকলে শলাকাগুলিও থাকতে পারে না। একই ভাবে, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত। ব্রহ্ম ছাড়া জগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই শ্লোকে হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ধমনীগুলিকে চক্রের শলাকাগুলির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এই ধমনীগুলি হৃদ্‌যন্ত্রে কেন্দ্রীভূত।

এরপর উপনিষদ হৃদয়ে 'ওম্'কে ধ্যান করার উপদেশ দিচ্ছেন। উজ্জ্বল, দীপ্ত, জ্যোতির্ময় 'ওম্'-এর উপর ধ্যান করতে হবে। আমাদের অন্তরস্থ আত্মাকে 'ওম্' বলে চিন্তা করতে হবে। যাঁরা যোগাভ্যাস করেন তাঁরা জানেন ধ্যেয় বস্তুকে জ্যোতির্ময় সত্তা রূপে কল্পনা করতে হয়। ব্রহ্মকে ধ্যান করা বড় কঠিন, কারণ ব্রহ্ম নিরাকার। তাই উপনিষদ সূচনাতে 'ওম্' তথা প্রণবকে ধ্যান করতে বলেছেন, কারণ 'ওম্' ব্রহ্মের প্রতীক। পরিণত সাধক পরবর্তীকালে 'ওম্'কে অতিক্রম করেন। ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব বোধ হলে আর কোন রূপের ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাধনার আরম্ভে অন্তরস্থ আত্মাকে উজ্জ্বল ওঁকার রূপে ধ্যান করার নির্দেশ দিচ্ছেন উপনিষদ। এই ভাবে ধ্যান করার অভ্যাস করলে মানুষ অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের পারে যেতে সক্ষম হন। শিষ্য যেন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন, এখানে গুরু তাঁকে সেই আশীর্বাদই করছেন।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥৭

অন্বয়: যঃ (যিনি); সর্বজ্ঞঃ (সাধারণ ভাবে সব বিষয় জানেন); সর্ববিৎ (বিশেষ রূপে সকল বিষয় জানেন); ভুবি (জগতে); যস্য (যাঁর); এষঃ মহিমা (এইরূপ মহিমা); এষঃ আত্মা হি (এই আত্মাই); দিব্যে (জ্যোতির্ময়); ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি (ব্রহ্মের আবাস হৃদয়াকাশে); প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত); [তিনি] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃদয়ে থেকে); মনোময়ঃ (মনোময়); প্রাণশরীরনেতা (প্রাণবায়ু ও সূক্ষ্ম শরীরের নিয়ামক); অন্নে (অন্নময় অর্থাৎ স্থূল শরীরে প্রকাশিত); প্রতিষ্ঠিতঃ (আশ্রয়স্থল); ধীরাঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ); তদ্বিজ্ঞানেন (তাঁর সঙ্গে অভিন্নভাবে নিজেকে জেনে) যৎ আনন্দরূপম্ অমৃতম্ (যিনি আনন্দস্বরূপ ও নিত্য); বিভাতি (প্রকাশিত হন); পরিপশ্যন্তি (তাঁরা [আত্মাকে] সম্যক্-রূপে জানেন)।

সরলার্থ: যিনি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে সব কিছু জানেন, এ জগতের সকল বস্তুই যাঁর মহিমার প্রকাশ, সেই পরমাত্মা জ্যোতির্ময় হৃদয়াকাশে অবস্থান করেন। তাই হৃদয়াকাশের আর এক নাম ব্রহ্মপুর। মন রূপে প্রকাশিত এবং প্রাণ ও সূক্ষ্মদেহের চালক হিসেবে পরমাত্মা স্থূলদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে বাস করেন। বিবেকী পুরুষরা এই অবিনাশী ও আনন্দস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আত্মাকে এইভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তাঁকে সম্যক্ ভাবে জানা যায়।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে কি ভাবে বর্ণনা করা যায়? তিনি 'সর্বজ্ঞ', সব কিছু জানেন এবং 'সর্ববিৎ', সব কিছু বোঝেন। 'যস্য এষঃ মহিমা ভুবি'—এই বিশ্ব তাঁরই মহিমা। কোন্ অর্থে? এর অর্থ, সকল বস্তুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেন। যা কিছু আমরা দেখি সবই ব্রহ্ম। তিনি বাইরে আছেন, আবার ভিতরেও আছেন। তিনি একযোগে বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত। সমগ্র জগৎ তাঁর দ্বারা আচ্ছাদিত। আবার তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মের আবাসে তথা হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

হৃৎপদ্মের মধ্যে রয়েছে শূন্য আকাশ। বাইরেও আছে সেই একই আকাশ। এই হৃদয়াকাশেই ব্রহ্মের অবস্থান। তাই এর নাম ব্রহ্মপুর। হৃদয়াকাশ জ্যোতির্ময় বলে একে দিব্য বলা হয়। আমাদের আবেগ ও অনুভূতিগুলি হৃদয়েই হয়ে থাকে। এই সব অনুভূতির দ্বারাই ব্রহ্মের উপস্থিতি বোধ করা যায়। যোগিগণ ব্রহ্মকে নিজ হৃদয়স্থ আত্মারূপে কল্পনা করেন।

ধরা যাক, কোন ব্যক্তি ব্যবহারিক জগতের উর্ধ্বে উঠে গেছেন। আসলে তিনি কোথায় গেছেন? কোথাও যাননি। এই জগৎ তাঁর নিজেরই মহিমা, এরূপ তিনি বোধে বোধ করেছেন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, সমুদ্র সব চক্রাকারে ঘুরছে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তারা চলে। একই

ভাবে দেশকালও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যাঁর স্বরূপ জ্ঞান হয়েছে, তিনি এই সমগ্র দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। এই জগতের আশ্চর্য সব ঘটনাকে তিনি তাঁর নিজের গৌরব বলে অনুভব করেন। সব কিছুই তাঁর মধ্যে রয়েছে, বাইরে আর কিছুই নেই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।৮

অন্বয়: তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে (কারণ ও কার্য উভয়রূপে ব্রহ্মকে জানলে); অস্য (সেই তত্ত্বজ্ঞানীর); হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়ের অবিদ্যারূপ বন্ধন); ভিদ্যতে (ছিন্ন হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়); সর্বসংশয়াঃ (সকল সংশয়); ছিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়); কর্মাণি চ (কর্মফলসমূহও); ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ: যিনি কারণ ব্রহ্ম ও কার্য ব্রহ্ম উভয়কেই নিজ আত্মারূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তাঁর হৃদয়ের সকল জটিলতা দূর হয়, তাঁর সকল সংশয় নাশ হয়, তাঁর কর্মফলও ক্ষয় হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: স্বরূপজ্ঞান হলে কি হয় এখানে সেকথাই বলা হয়েছে। তখন নিজেকে সব কিছুর কারণ ও কার্য বলে বোধ হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র অহং বা 'কাঁচা আমি'র বিনাশ হয়। ব্রহ্মকে জানার আগে পর্যন্ত মানুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। মানুষ তখন দেহ-মনের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করে। স্বভাবতই দেহ-মনের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সে আবদ্ধ করে ফেলে। আর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কামনা-বাসনা তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়ায়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আশা-নিরাশার দোলায় মানুষ তখন মনের স্থিরতা হারায়। এক কথায়, তখন আর তাকে স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় না। তার চরিত্রে নানা অঙ্কট-বঙ্কট অর্থাৎ গোলমাল দেখা দেয়। নিজের স্বরূপ না জানার ফলেই এসব অঘটন ঘটে। যখন মানুষ নিজেকে পরমাত্মা তথা সর্বভূতের অন্তরাত্মা বলে জানতে পারে তখন তার দুই-বোধ চিরতরে ঘুচে যায়। এই জগৎ কার্য-কারণের সমষ্টি। কার্য ও কারণ এক ও অভিন্ন, আর মানুষই সেই অভিন্ন সত্তা। মানুষই ব্রহ্ম। এই অবস্থায় তার আর কোন কর্ম থাকে না। অতএব কর্মফলও থাকে না। অন্ধকার ঘরে একটি দেশলাই কাঠি জ্বালালে যেমন বহুযুগের অন্ধকার দূর হয় তেমনি আত্মজ্ঞান হলে সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়। তখন কর্তব্য কর্ম আর কিছু থাকে না, কারণ মানুষের অহংবুদ্ধি পুরোপুরি মুছে যায়। যদিও প্রারব্ধ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে তা চলতেই থাকে, কিন্তু আসলে তিনি মুক্ত।

'পর' অর্থ হল উৎকৃষ্ট আর 'অবর' অর্থ নিকৃষ্ট। কারণ হিসাবে ব্রহ্ম (অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম) উৎকৃষ্ট, তাই তাঁকে 'পর' বলা হয়। আবার তাঁকে 'অবর' বলা হয়, যেহেতু কার্য হিসাবে (অর্থাৎ জগৎ-রূপে প্রকাশিত) ব্রহ্ম নিকৃষ্ট।

হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥৯

অন্বয়: হিরন্ময়ে (জ্যোতির্ময়); পরে (শ্রেষ্ঠ); কোশে (কোষের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয় মধ্যে); বিরজম্ (শুদ্ধ, নিরঞ্জন); নিষ্কলম্ (যাঁর কলা নেই [অর্থাৎ নিরাকার]); তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম); শুভ্রম্ (শুদ্ধ); তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (জ্যোতির জ্যোতিস্বরূপ); যৎ (যা); আত্মবিদঃ (আত্মজ্ঞানীরা); বিদুঃ (জানেন)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক এবং নিরাকার। হৃদয়ের জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কক্ষে তাঁর আবাস। সেই ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। যিনি আত্মাকে জানেন তিনি ব্রহ্মকেও জানেন।

ব্যাখ্যা: খাপের মধ্যে যেমন তলোয়ার থাকে, হৃদয়েও তেমনি ব্রহ্ম লুকিয়ে আছেন। হৃদয়েই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। সেই জন্য হৃদয়কে ব্রহ্মের 'কক্ষ' বলা হয়েছে। এই কক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশেষিত করা হয়েছে, কারণ দেহের অন্তরতম প্রদেশে এই কক্ষের অবস্থান। আত্মা জ্যোতির্ময়; তিনিই মনকে আলোকিত করেন। আবার তিনি আলোর চেয়েও উজ্জ্বল কারণ তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানের উৎস। মন আমাদের যে আলো দান করে তা ব্রহ্ম থেকেই আসে। ব্রহ্ম শুদ্ধ, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞানতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥১০

অন্বয়: তত্র (সেই ব্রহ্মে); সূর্যঃ (সূর্য); ন ভাতি (দীপ্তি পায় না); ন চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্রতারাও না); ইমাঃ বিদ্যুতঃ (এই বিদ্যুৎ); ন ভান্তি (দীপ্তি পায় না); অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (এই অগ্নি কি করে প্রকাশ পাবে); তম্ এব ভান্তম্ (তিনি দীপ্যমান হলে); সর্বম্ (সব কিছু); অনুভাতি (তাঁর আলোতেই প্রকাশিত হয়); তস্য ভাসা (তাঁর জ্যোতিতেই); সর্বমিদম্ (এই সব কিছু); বিভাতি (জ্যোতির্ময়)।

সরলার্থ: ব্রহ্মের উপস্থিতিতে সূর্য, চন্দ্র, তারা কেউই কিরণ দান করে না। এমন-কি বিদ্যুৎও তার উজ্জ্বলতা হারায়। এমন অবস্থায় অগ্নি কি করে দীপ্তি পাবে? ব্রহ্মের জ্যোতিতেই এই সব কিছু জ্যোতির্ময়। ব্রহ্মের আলোকেই সব আলোকিত।

ব্যাখ্যা: সূর্যকিরণ সব বস্তুকে প্রকাশ করে, ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না। চন্দ্র, তারা ও অন্যান্য উজ্জ্বল বস্তু সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সব বস্তুর মধ্যে কোনটিরই নিজস্ব জ্যোতি নেই। এরা ব্রহ্মের জ্যোতিতেই জ্যোতিষ্মান। একমাত্র ব্রহ্মই স্বয়ং-প্রকাশ। দীপের আলোর মতো ব্রহ্মও নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম সব কিছুর উৎস। ব্রহ্ম আছেন, তাই অন্যান্য বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আমাদের হৃদয়ে। অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম
পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥১১

অন্বয়: ইদম্ অমৃতম্ (এই আনন্দস্বরূপ); ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই); পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম (সম্মুখে ব্রহ্ম); পশ্চাৎ (পিছনে); দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে অর্থাৎ ডাইনে); চ (এবং); উত্তরেণ (উত্তরে); ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); অধঃ (নীচে); ঊর্ধ্বং চ (উপরেও); ইদং ব্রহ্ম এব প্রসৃতম্ (এই ব্রহ্মই ব্যাপ্ত আছেন); ইদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্ (এই জগৎ ব্রহ্ম [শ্রেষ্ঠ])।

সরলার্থ: আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম তোমার সম্মুখে; তিনি আবার তোমার পিছনেও বটে। দক্ষিণে, উত্তরে, উপরে, নীচে সর্বত্রই তিনি। তিনি সর্বব্যাপী। এ জগৎ স্বয়ং ব্রহ্ম।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। তিনিই একমাত্র অধিষ্ঠান যাঁর উপর সব কিছু আরোপিত উপাধি মাত্র। উপাধিগুলি সত্য নয়। যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্প অথবা মরুভূমিতে আরোপিত মরীচিকা সত্য নয়, এ-ও ঠিক তেমনি।

কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা। এ জগৎ আপেক্ষিক ভাবে সত্য; একটি বিশেষ দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য। দেশ-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জগতের লয় হয়।

অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পদর্শনে, সাপটিকে যে সত্য বলে মনে হয় তার কারণ সাপটি দড়ির উপরে অর্থাৎ একটি সত্য বস্তুর উপর আরোপিত। দড়ি সরিয়ে নিলে সাপও অদৃশ্য হয়। তেমনি ব্রহ্মকে আশ্রয় করে আছে বলেই জগৎকে সত্য বলে মনে হয়।

ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্রহ্ম সর্বত্র রয়েছেন। তিনি সর্বব্যাপী। তিনিই একমাত্র সত্য। সব কিছুকে ব্রহ্মের প্রকাশ রূপে দেখতে হবে। এ-ই যথার্থ জ্ঞান। জগৎকে জগৎ রূপে দেখার নামই অজ্ঞানতা।

মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম অধ্যায়

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥১

অন্বয়: সযুজা (সর্বদা একসাথে); সখায়া (একরকম); দ্বা সুপর্ণা (সুন্দর পালক যুক্ত দুটি পাখি); সমানং বৃক্ষম্ (একই বৃক্ষে); পরিষস্বজাতে (পরস্পর আলিঙ্গন করে আছে); তয়োঃ (তাদের মধ্যে); অন্যঃ (একটি); স্বাদু পিপ্পলম্ (মিষ্টি ফল); অত্তি (খায়); অন্যঃ (অন্যটি); অনশ্নন্ অভিচাকশীতি ([ফল] খাওয়ার বদলে কেবল দেখে)।

সরলার্থ: সুন্দর পালকযুক্ত একই রকম দেখতে দুটি পাখি সবসময় একই গাছে থাকে। তাদের মধ্যে একটি পাখি সুমিষ্ট ফল খাচ্ছে এবং অন্যটি কিছু না খেয়ে কেবল দেখছে।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চাইছেন কিভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একই গাছের দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'দ্বা সুপণা'—দুটি পাখি। 'সুপর্ণা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'সুন্দর পালক'। এই পাখি দুটি 'সযুজা'—পরস্পর অন্তরঙ্গ, এবং 'সখায়া'—পরস্পর সদৃশ। তারা দেখতে একইরকম এবং পরস্পর অন্তরঙ্গ। 'সমানং বৃক্ষম্'—একই বৃক্ষে তারা বসে আছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি (অর্থাৎ জীবাত্মা) টক মিষ্টি ইত্যাদি নানা স্বাদের ফল খাচ্ছে। অন্য পাখিটি কিছুই খাচ্ছে না, চুপচাপ বসে আছে। সে শান্ত এবং অচঞ্চল। 'অভিচাকশীতি'—সে শুধু দেখছে। যে পাখিটি ফল খেতে মত্ত সে কখনও সুখী, কখনও অসুখী। কিন্তু অন্য পাখিটি নির্লিপ্ত, সাক্ষী, দ্রষ্টা।

অনুরূপভাবে পরমাত্মা সবসময়ই শান্ত, আত্মস্থ। তিনি সাক্ষী-মাত্র। অপরদিকে জীবাত্মা চঞ্চল, অস্থির। সে বাসনা দ্বারা তাড়িত এবং নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে কখনও সুখী, কখনও দুঃখী। জীবাত্মা নানা পরিস্থিতির অধীন; আর এই জন্যই সে সবসময় সুখদুঃখের দোলায় দুলছে। এইভাবে জীবাত্মার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে পাখি দুটিকে

আলাদা বলে মনে হলেও এরা কিন্তু ভিন্ন নয়। তাদের আচরণের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু আসলে তারা এক ও অভিন্ন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।২

অন্বয়: পুরুষঃ (জীবাত্মা [জীব]); সমানে (একই); বৃক্ষে (বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে); নিমগ্নঃ (অবস্থিত হয়ে); অনীশয়া (নিজের দেবত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়); মুহ্যমানঃ (অজ্ঞানতার মোহে আচ্ছন্ন); শোচতি (শোক করে); যদা (যখন); জুষ্টম্ ([যোগিগণের দ্বারা] সেবিত হয়ে); অন্যম্ ঈশম্ (দেহ ব্যতীত পরমাত্মাকে [ঈশ্বরকে]); পশ্যতি (দেখে); অস্য (তাঁর [পরমাত্মার]); ইতি (এই); মহিমানম্ (মহিমাকে); [তদা (তখন)]; বীতশোকঃ ([এই জগতের] শোকদুঃখ থেকে মুক্ত)।

সরলার্থ: জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একই গাছে (অর্থাৎ একই দেহে) থাকলেও জীবাত্মা তার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। এই কারণে তাকে নানা দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু যখন তার স্বরূপজ্ঞান হয় তখন সে সুখদুঃখের পারে চলে যায় এবং নিজ মহিমা উপলব্ধি করে।

ব্যাখ্যা: 'পুরুষ' শব্দটির নানা অর্থ আছে। কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপরই এর অর্থ নির্ভর করছে। এখানে শব্দটির অর্থ জীবাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একই গাছে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর একটি চমৎকার উদাহরণ দিচ্ছেন: জীবাত্মা যেন একটি অলাবু অর্থাৎ লাউ। সেটি সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং তরঙ্গের আঘাতে দুলছে। সেটি পুরোপুরি তরঙ্গের অধীন। স্রোতের তাড়নায় সেটি 'নিমগ্ন' অর্থাৎ কখনও লাউটি জলের গভীরে যাচ্ছে, আবার কখনও জলের ওপরে ভাসছে, কখনও এদিকে কখনও বা অন্যদিকে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে জীবাত্মা যেন জীবন সমুদ্রে ডুবে আছে। আমাদের কখনও কখনও এ জীবনকে সুখপ্রদ বলে মনে হয়। যখন আমরা নিজেদের সুখী বলে মনে করি তখন অসুখী মানুষেরা আমাদের করুণার পাত্র। কিন্তু আবার এমনও হতে পারে মুহূর্তের মধ্যে কোন বিপর্যয়ের ফলে আমাদের জীবনটা বদলে গেল। আমাদের মুখের হাসি, সকল আশা-ভরসা তখন মিলিয়ে যায়। থাকে শুধুই চোখের জল। মানুষের জীবনটা এমনই, তাই শঙ্কর এখানে এরকম উপমা দিয়েছেন। 'অলাবু'কে যদি ফল বলে মানতেই হয় তবে এটি একটি নিকৃষ্ট ফল মাত্র।

'অনীশয়া'—জীবাত্মা নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে করে না। সে যে স্বরূপত দেবতা—একথা সে জানে না। আমাদের সকলের অবস্থাই এই রকম। আমরা ভাবি, 'হায়! আমি অক্ষম, অপদার্থ, নির্বোধ।' শঙ্কর একেই 'দীনভাব' বলেছেন। এ যেন নিজেকে অসহায় বলে মনে করা। এরূপ মনোভাব আত্মহত্যার সমান। এই সব ব্যক্তি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে (শোচতি মুহ্যমানঃ)। এই 'অনীশয়া' তার অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়। কিন্তু এই ব্যক্তিই আবার অন্য মানুষে পরিণত হতে পারে। তা কি করে সম্ভব হয়? সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা ও আত্মসংযমের মতো আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা এই পরিবর্তন লাভ করা যায়। 'যদা' শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এ যেন মোড় ফিরে যাওয়ার ক্ষণ। নিরন্তর আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসংযম লাভ হয়। তখন সে আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। তার জীবনে তখন কি ঘটে? 'পশ্যতি'—সে দেখে। কি দেখে? 'অন্যম্ ঈশম্'—সে নিজহৃদয়ে ঈশ্বরকে দেখে। সে নিজ আত্মাকেই ঈশ্বর বলে মনে করে। 'অন্যম্'—এ তার সত্তার আর একটি দিক। 'জুষ্টম্—কে 'জুষ্টম্'? শঙ্করের মতে, যিনি যোগিগণের আরাধ্য তিনিই 'জুষ্টম্'। তিনি কে? তিনিই ঈশ্বর—'ঈশম্'। 'জুষ্টম্' কথাটির অপর অর্থ হল 'কোন কিছুর খোঁজে বের হওয়া' অথবা 'বহুজন পূজিত'।

জীবাত্মা এখন তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানেন। এর আগে তিনি নিজেকে অক্ষম, অপদার্থ বলে মনে করতেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে তিনি এখন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি জানেন যে, তিনি ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। চিত্তশুদ্ধি হলে এই জ্ঞান আপনা আপনিই ফুটে ওঠে। এমন নয় যে, মানুষটির সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আগে অপদার্থ ছিলেন এখন দেবতা হয়েছেন, একথা ঠিক নয়। তিনি সবসময়ই দেবতা ছিলেন, শুধু একথা তিনি জানতেন না। উপনিষদের বাণী থেকে আমরা এই সত্যই লাভ করে থাকি।

যখন কোন ব্যক্তি 'অন্যম্ ঈশম্'—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি 'অস্য মহিমানম্'—এই বিশ্বের মহিমাকে নিজের মহিমা বলে উপলব্ধি করেন। কারণ তিনি তখন ঈশ্বর। এই জগৎ অর্থাৎ সব কিছুর সাথে তিনি একাত্ম বোধ করেন। 'বীতশোকঃ'—তিনি তখন সুখদুঃখের পারে চলে যান। তিনি কেবল দুঃখকেই জয় করেন না, সুখকেও জয় করেন। এই হল প্রকৃত মুক্তি।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্‌পুণ্যপাপে বিধূয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩

অন্বয়: যদা (যখন); পশ্যঃ (তাঁর নিজ স্বরূপকে সাধক উপলব্ধি করেন); রুক্মবর্ণম্ (উজ্জ্বল); কর্তারম্ (স্রষ্টা); ব্রহ্মযোনিম্ (ব্রহ্মার কারণ [হিরণ্যগর্ভ]); ঈশম্ (প্রভু); পুরুষ (পরমপুরুষ); পশ্যতে (দেখেন [উপলব্ধি করেন]); তদা (তখন); বিদ্বান্ (সেই সাধক যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন); পুণ্যপাপে বিধূয় (পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করে); নিরঞ্জনঃ (পবিত্র); পরমম্ (পরম); সাম্যম্ (একত্ব বোধ); উপৈতি (প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ: সাধক যখন এই জ্যোতির্ময় স্রষ্টা, ব্রহ্মার কারণ (হিরণ্যগর্ভ), সেই পরমপুরুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে চলে যান এবং নির্লিপ্ত ও পবিত্র হয়ে পরম সাম্য লাভ করেন। অর্থাৎ সাধক তখন সব কিছুর সাথে একাত্মতা অনুভব করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মজ্ঞান লাভ করলে কিরকম অবস্থা হয় উপনিষদ এখানে আমাদের সেকথা বলছেন। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে'—যখন সাধক দেখেন। 'পশ্য' কথাটির অর্থ দ্রষ্টা, 'পশ্যতে' কথাটির অর্থ 'দেখে'। এ দেখা কিন্তু সাধারণ দেখা নয়। এ ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা নয়, এক অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। সাধক তখন দেখেন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন। কি দেখেন? 'রুক্মবর্ণম্'—হৃদয়স্থিত স্বয়ং প্রকাশিত, স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্মাকে। এই কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'সোনার বরণ'। কিন্তু এখানে পরমাত্মা সোনালী রঙের এক উজ্জ্বল সত্তা এমন কথা বলা হচ্ছে না। পরমাত্মা, জ্যোতিস্বরূপ একথা বোঝাতেই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'কর্তারম্'—তিনি কর্তা, প্রকৃত প্রভু এবং পরিচালক। তিনিই একমাত্র শাসক। তিনি কারণ, আর সব কিছুই কার্য। তিনিই পুরুষ। তিনি সকলের মধ্যে আছেন। সব রূপই তাঁর রূপ। 'ব্রহ্মযোনিম্'—তাঁর মধ্যেই সব কিছু রয়েছে। ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সবকিছু ব্রহ্মের কাছ থেকে এসেছে এবং তিনিই সবকিছুকে ধারণ করে আছেন। যিনি এই ব্রহ্মকে অর্থাৎ আত্মাকে জানেন তিনি পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে চলে যান। শুধুমাত্র পাপই যে বন্ধন তা নয়, পুণ্যও এক রকমের বন্ধন। একথা আমরা সকলেই জানি যে, পাপ করলে তার যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। কিন্তু পুণ্যও বন্ধন—এ কেমন করে হয়? কারণ পুণ্য কাজ করলে আমাদের পুনর্জন্ম হবে না—এমন কথা কিন্তু শাস্ত্রে নেই। সোনার শিকলও শিকল, অর্থাৎ লোহার শিকলের মতো সোনার শিকলও আমাদের বদ্ধ করে। আমরা মুক্ত হতে চাই এবং একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারাই তা সম্ভব। যখন আমি নিজেকে জানি অর্থাৎ যখন

আমার স্বরূপজ্ঞান হয় তখন আর পাপ-পুণ্য বোধ থাকে না। সব কর্মফল তখন ক্ষয় হয়। কর্মফল পুরোপুরি ক্ষয় হলে নির্বাণ লাভ হয়।

মানুষ যখন এই অবস্থা লাভ করেন তখন আর কোন মলিনতা, কালিমা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অর্থাৎ তিনি তখন শুদ্ধ নিরঞ্জন পুরুষে পরিণত হন। 'সাম্যম্ উপৈতি'—এমন একটি সাম্য অবস্থায় তিনি পৌঁছান যখন এ জগতের সব কিছুর সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। আমরা ভালবাসার কথা বলি, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা কিরকম? এক জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। অর্থাৎ যখন আমরা সকলের মধ্যে সেই এক আত্মা বা এক ঈশ্বরকে দেখি, যখন 'আমি-তুমি' বোধ চিরতরে ঘুচে যায়। তখনই আমরা যথার্থ ভালবাসতে পারি। এই একত্বের বোধ থেকেই আসে সমদর্শিতা অর্থাৎ সকলকে সমানভাবে দেখা।

আমাদের সব দুঃখকষ্টের মূলে রয়েছে এই 'দুই'-বোধ। আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক বলে মনে করি। আমরা মনে করি, আমরা অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিমানুষ অর্থাৎ জীবাত্মা, আর পরমাত্মা হলেন অন্য কিছু। দেহ, নাম, বংশ-মর্যাদা প্রভৃতির সঙ্গে আমরা নিজেদের এক করে ফেলি। কিন্তু এ সবই আমাদের উপাধিমাত্র। অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার জন্যই এই সব উপাধিকে আমরা 'আমি' বলে মনে করি। এই অজ্ঞানতার জন্যই আমরা নিজেদের পরমাত্মার থেকে পৃথক বলে মনে করি। এর ফলে আমরা নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করে থাকি। আমাদের অবস্থা হল এই টক-মিষ্টি ফল ভোগকারী পাখিটির মতো। কিন্তু স্বরূপত আমরা সকলেই নির্গুণ। কিন্তু আমরা তা বুঝব কেমন করে? আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারা। জড়জগৎ যখন আর আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে না, যখন আমি উপলব্ধি করি সব কিছু আমার ভেতরেই রয়েছে, তখনই আমি নিজেকে আবিষ্কার করি—আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তখন আমি জানি গাছের অন্য পাখিটির মতো আমি সব সময় এক। জগতের কোন পরিবর্তন আমাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না। আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী, সকল শুভাশুভের ঊর্ধ্বে। শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য, জীবন-মৃত্যু—এ সবই আপেক্ষিক। পরব্রহ্মে কোন দুই-বোধ নেই। সব কিছুর মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম রয়েছেন। তিনিই আত্মা। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভেই আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা সকলে এক ও অভিন্ন। আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য—একথাই উপনিষদ আমাদের নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্

এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥৪

অন্বয়: যঃ (যিনি [ঈশ্বর]); সর্বভূতৈঃ (সকল ভূতে); বিভাতি (প্রকাশ পান); এষঃ হি প্রাণঃ (তিনিই প্রাণস্বরূপ); বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি); বিজানন্ ([তাঁকে] জেনে); অতিবাদী ন ভবতে ([আত্মা ছাড়া] অন্য কোন কথা বলেন না); আত্মক্রীড়ঃ (নিজের সাথে খেলা করেন); আত্মরতিঃ (আত্মাই তাঁর আনন্দের উৎস); ক্রিয়াবান্ (ক্রিয়াশীল [ধ্যান ধারণা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদিতে মগ্ন]); এষঃ (তিনি); ব্রহ্মবিদাম্ (ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে); বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ)।

সরলার্থ: ঈশ্বর সব বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং সব প্রাণীর তিনিই প্রাণ-স্বরূপ। যখন কোন ব্যক্তি একথা জানেন, তখন তিনি কেবল ব্রহ্মেরই (অর্থাৎ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ) আলোচনা করেন। তিনি নিজেই নিজের সাথে খেলা করেন। আনন্দস্বরূপ তিনি। ধ্যান ও অন্যান্য অধ্যাত্ম সাধনে তিনি মগ্ন। সকল ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা: এই পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্ববস্তুর প্রাণস্বরূপ। প্রাণের উৎসও তিনি। 'সর্বভূতৈর্বিভাতি'—তাঁর আলোতেই সব বস্তু আলোকিত। সব বস্তুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেন। 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম'—শুধুমাত্র মনন বা চিন্তার দ্বারাই ব্রহ্ম নিজেকে প্রসারিত করেন। ব্রহ্ম যেন চিন্তা করলেন, 'একঃ অহং বহুস্যাম্'—আমি এক, আমি বহু হব। এইভাবে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করলেন। তাঁর চিন্তামাত্রই এই জগতের সৃষ্টি হল। 'সর্বভূতানি'—এই জগৎ সংসারের সব কিছুর মধ্যে তিনিই রয়েছেন। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—তাঁর জ্যোতিতেই সব বস্তু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকল আলোকের উৎসও তিনি। বেদান্ত-শাস্ত্রে স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা করা যায় না। তাঁরা উভয়েই ব্রহ্ম।

'বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে'—প্রথমেই জানতে হবে, অর্থাৎ উপনিষদের চর্চা করে ও গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ শুনে, বুদ্ধি দিয়ে তা ধারণা করতে হবে। আচার্য বলবেন: 'তত্ত্বমসি—তুমিই সেই।' গুরুর এই উপদেশ প্রথমে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা প্রথমে শব্দার্থকে বুঝতে হবে। তারপর সেই শব্দার্থকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করতে হবে। যিনি এই পরমসত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম তিনিই জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা নানা রকমের পরিকল্পনা করতে পারি, কিন্তু সেগুলিকে যদি নিজের জীবনে প্রয়োগ না করি তবে তা বৃথা হয়ে যায়। তবলার 'বোল' লোকে বেশ মুখস্থ বলতে পারে কিন্তু হাতে আনা বড় শক্ত। সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। 'ন অতিবাদী'—যিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন কথা বলেন না। অজ্ঞানতা দূর হয়ে আমাদের যখন স্বরূপজ্ঞান হয় তখন আর আমাদের ভুল হয় না। যে জ্ঞান আমরা বুদ্ধির দ্বারা অর্জন করে

থাকি ভবিষ্যতে তা হয়তো ভুলেও যেতে পারি। কিন্তু এই জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধির কচ্‌কচানি নয়, এ এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। যখন কোন ব্যক্তি জানেন 'তিনিই স্বয়ং আত্মা', তখন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যে কাজই করুন না কেন, নিজ স্বরূপ সম্পর্কে তিনি সবসময়ই সজাগ। এই বিশ্বাস তাঁর কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

তখন কি হয়? 'আত্মক্রীড়ঃ'—সাধক তখন নিজেই নিজের সঙ্গে খেলা করেন। আমরা হয়তো বলব, এসব কি ব্যাপার! এও কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। আত্মা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। সাধক তখন অনুভব করেন এক আত্মা বা এক ঈশ্বরই সবার মধ্যে রয়েছেন। তাঁর কাছে এক বৈ দুই নেই। 'আত্মরতিঃ'—সাধক তখন নিজ আত্মাতে লীন হন। তিনি নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর। কারণ সমগ্র বিশ্বচরাচর যে তাঁর ভেতরেই রয়েছে, বাইরে নয়। সাধক যখন আত্মার সাথে মিলিত হন, তখন তিনিই বরিষ্ঠ, সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। 'এক' জ্ঞানই জ্ঞান, আর 'দুই' জ্ঞান অজ্ঞান—এটা উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥৫

অন্বয়: এষঃ জ্যোতির্ময়ঃ শুভ্রঃ হি আত্মা (এই জ্যোতির্ময় শুভ্র আত্মা); অন্তঃশরীরে (দেহের অভ্যন্তরে); নিত্যম্ (সর্বদা); সত্যেন (কথায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠার দ্বারা); তপসা (আত্মসংযমের দ্বারা); ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্যের দ্বারা); সমগ্‌জ্ঞানেন (যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা); লভ্যঃ (লাভ করা যায়); [ন অন্যথা (অন্য উপায়ের দ্বারা নয়)]; যম্ (আত্মাকে); ক্ষীণদোষাঃ (যাঁদের মন শুদ্ধ ও অনাসক্ত); যতয়ঃ (সাধকগণ); পশ্যন্তি (অনুভব করেন)।

সরলার্থ: দেহের মধ্যে হৃৎপদ্মে এই শুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণ, স্বরূপ চিন্তা এবং আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্য অভ্যাসের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মোপলব্ধির জন্য সাধককে যেসব ধাপ অতিক্রম করতে হয়, এই শ্লোকে সেকথাই বলা হয়েছে। প্রথমত এবং প্রধানত সাধক কায়মনোবাক্যে (অর্থাৎ কথায়, কাজে এবং আচরণে) সত্যনিষ্ঠ হবেন। সত্যকে তিনি সবার ওপরে স্থান দেন। সত্য রক্ষার জন্য তিনি কোন কিছুর সাথে আপস করেন না। কারণ, সত্যই তাঁর ঈশ্বর। সাধককে কঠোর তপস্যা করতে হবে, এবং সব সময় আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে। কৃচ্ছ্রতা বলতে কিন্তু

আচার-অনুষ্ঠানকে বোঝায় না, এর অর্থ আত্মসংযম। দেহ এবং মন তখন সাধকের বশে থাকে। খুব সহজ কাজ নয়, কিন্তু একাজ খুবই জরুরী। সাধক বহু বছরের কঠোর সংগ্রামের ফলে এই আত্মসংযম লাভ করেন। এই সংগ্রামই হচ্ছে কৃচ্ছ্রতা। আত্মসংযমের আর একটি তাৎপর্য হল মনঃসংযোগ। সাধক লক্ষ্যে অবিচল থেকে তাঁতে মনকে একাগ্র করেন।

আত্মজ্ঞান লাভ করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য; কিন্তু কোথায় আছেন এই আত্মা? এর প্রকৃতিই বা কেমন? সকলের হৃৎপদ্মে এই আত্মা বিরাজিত। আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত ও শুদ্ধ। যেসব যোগিগণের মন রাগ-দ্বেষ, লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মলিনতা থেকে মুক্ত তাঁরা নিজ হৃদয়ে আত্মাকে উপলব্ধি করেন। চিত্তশুদ্ধি হলে সাধক সত্যকে বুঝতে পারেন। 'সত্য' বলতে এখানে 'পরম সত্য'কে বোঝানো হয়েছে। এই পরম সত্য যে কি তা কেউ জানে না। এই মুহূর্তে আমরা সত্য বলতে যা বুঝি সেই আপেক্ষিক সত্যকে ধরেই পরম সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই সত্যনিষ্ঠাই ধর্মীয় জীবনের মূল কথা।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্তৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্॥৬

অন্বয়: সত্যমেব (সত্যেরই); জয়তে (জয় হয়); অনৃতং ন (মিথ্যার নয়); সত্যেন (সত্যের দ্বারা); বিততঃ (বিস্তৃত); দেবযানঃ পন্থাঃ (দেবযান নামক পথ); যেন হি (যার দ্বারাই); আপ্তকামাঃ (বিগতস্পৃহ); ঋষয়ঃ (ঋষিগণ); আক্রমন্তি (যান); যত্র (যেখানে); তৎ (সেই); সত্যস্য (সত্যের মধ্যে); পরমম্ (শ্রেষ্ঠ); নিধানম্ (ফল নিহিত)।

সরলার্থ: একমাত্র সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। কারণ স্বর্গদ্বারে পৌঁছবার প্রশস্ত পথটি সত্যের দ্বারাই লাভ করা যায়। পূর্ণকাম ঋষিরা (যাঁদের কোন কামনা বাসনা নেই) সত্যের মাধ্যমেই তাঁদের পরম লক্ষ্যে পৌঁছান।

ব্যাখ্যা: আমরা সকলেই জানি, সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের হয় না। কোন ধার্মিক ব্যক্তি অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথমে হয়তো পরাস্ত হতে পারেন, কিন্তু পরিণামে সত্যেরই জয় হবে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় ব্যক্তিটি তো বেশ সুখেই আছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার পতন অনিবার্য। তার অপকর্ম বেশিদিন গোপন থাকে না। তখন সমাজ তাকে ত্যাগ করে। তার সমস্ত চালাকি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুতেও সত্য, শেষেও সত্য। অধ্যাত্ম পথে সাধক সবসময় সত্যকে ধরে থাকেন। তিনি সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করেন না। তাঁদের কাছে উপায়ও উদ্দেশ্যর মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্যের পথই হচ্ছে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা। কোন অবস্থাতেই সাধক এই সত্য থেকে সরে আসেন না। যে কোন মূল্যে তিনি এই পথকে ধরে থাকেন। আর শেষে তিনি সেই লক্ষ্যে পৌঁছান যা পূর্ণকাম, আপ্তকাম ঋষিরা লাভ করে থাকেন। এই লক্ষ্য হল— আত্মজ্ঞান বা মুক্তি। আত্মজ্ঞান লাভে সাধক অনন্ত শান্তি ও অপার আনন্দ লাভ করেন। সত্যই আধ্যাত্মিক জীবনের মূল চাবিকাঠি।

বৃহচ্চ তদ্ দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদুরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥৭

অন্বয়: তৎ (তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম); বৃহৎ (সর্বব্যাপী); চ (এবং); দিব্যম্ (জ্যোতিস্বরূপ); অচিন্ত্যরূপম্ (চিন্তার অতীত); তৎ সূক্ষ্মাৎ চ সূক্ষ্মতরম্ (তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর); [রূপে] বিভাতি (বিবিধ রূপে প্রকাশ পান); তৎ (তিনি); দূরাৎ (দূর থেকে); সুদূরে (আরও দূরে); অন্তিকে চ ইহ (এই দেহে; অতি কাছে); পশ্যৎসু (দ্রষ্টাদের কাছে); ইহ এব গুহায়াম্ (এই গুহাতে অর্থাৎ হৃদয়ে); নিহিতম্ (নিহিত আছেন)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম অনন্ত, ইন্দ্রিয়াতীত এবং কল্পনার অতীত। ইনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (সূক্ষ্মতমের চেয়েও সূক্ষ্মতর), তিনি দূরতমের চেয়েও দূরে রয়েছেন আবার একই সাথে খুব কাছেও রয়েছেন। মানুষের হৃদয়-পদ্মেই তিনি বিরাজ করেন।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম বলতে আমরা কি বুঝি? ব্রহ্মের স্বরূপই বা কি? ব্রহ্ম কথাটির অর্থ 'বৃহৎ' বা 'বৃহত্তম'। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে কথায় ও কাজে সত্যকে ধরে থাকতে হবে। ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত। ব্রহ্মকে কল্পনা করা যায় না। ইনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং আকাশের চেয়ে সূক্ষ্ম। প্রকৃতপক্ষে তিনি আছেন বলেই এই জগতের সব কিছুর অস্তিত্ব আছে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য উজ্জ্বল বস্তুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেন। ব্রহ্মই এসব বস্তুর কারণ। সকল প্রাণীর হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজ করেন। কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকলেও অবিদ্যার জন্য আমরা তা বুঝতে পারি না। যোগিগণ নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। তাঁরা নিজ হৃদয়ে ব্রহ্মের উপস্থিতি অনুভব করে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যান।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥৮

অন্বয়: [তৎ] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে (সেই ব্রহ্মকে চোখের দ্বারা দেখা যায় না); বাচা অপি ন (বাক্যের দ্বারাও নয়); অন্যৈঃ দেবৈঃ ন (অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও নয়); তপসা কর্মণা বা [ন] (তপস্যা বা কর্মের দ্বারাও নয়); জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্মলজ্ঞানের দ্বারা যাঁর মন শুদ্ধ হয়েছে); ততঃ (তারপর); [সাধকঃ] ধ্যায়মানঃ (সেই সাধক ধ্যান করতে করতে); তং নিষ্কলম্ (সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে); পশ্যতে (দর্শন করেন)।
সরলার্থ: আত্মা নিরাকার তাই তাঁকে দেখা যায় না। ভাষা দিয়েও তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। তপস্যা বা যাগযজ্ঞের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। সাধক যখন ইন্দ্রিয়সুখে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হন তখন তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মের অর্থাৎ আত্মার দর্শন লাভ করেন।
ব্যাখ্যা: আত্মা অনন্য, তাঁকে উপলব্ধি করবার উপায়ও অনন্য। আত্মার কোন রূপ নেই, তাই তাঁকে দেখা যায় না। আত্মা অনির্বচনীয়। অর্থাৎ ভাষা দ্বারাও তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। সংক্ষেপে বলা যায় আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। আত্মা অসীম কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সসীম। এমনকি আমাদের মনও সসীম। সসীম কি কখনও অসীমকে ধরতে পারে? এমনকি তপস্যা ও যাগযজ্ঞ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হল, আত্মোপলব্ধির সেই অনন্য উপায়টি কি? চিত্তশুদ্ধি। আত্মা আমাদের ভেতরেই রয়েছেন। আমাদের হৃদয়ই আত্মার আবাস—এ কথা উপনিষদ বারবার বলছেন। যে-মন স্বভাবতই চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত সেই মন শুদ্ধ নয়। মন যেন একটি তরঙ্গায়িত হ্রদ। তরঙ্গের জন্যই হ্রদের গভীরে কি আছে তা আমরা দেখতে পাই না। একইভাবে, অশান্ত মনে পরমাত্মা নিজেকে ধরা দেন না। আমাদের মনে যখন কামনা বাসনার লেশমাত্র থাকে না তখন মন শান্ত হয়। আর সেই শান্ত মনেই পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। এখানে আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আয়নার উপরে ধুলো জমা থাকলে সেই আয়নাতে নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। নিজেকে ভালভাবে দেখতে হলে ধুলো সরিয়ে আয়নাকে পরিষ্কার করতে হয়। শান্ত, স্থির ও বাসনামুক্ত মনেই আত্মার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভের অনন্য উপায়টি হল —মনঃসংযম।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥৯

অন্বয়: এষঃ অণুঃ আত্মা (এই সূক্ষ্ম আত্মা); চেতসা (শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা); বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্য); যস্মিন্ (যে শরীরে); প্রাণঃ (প্রাণ বায়ু); পঞ্চধা (পাঁচ প্রকারে); সংবিবেশ (প্রবেশ করেছে); প্রাণৈঃ (প্রাণের দ্বারা); প্রজানাম্ (প্রাণিগণের); সর্বং চিত্তম্ ([প্রাণীদের] সমগ্র হৃদয়); ওতম্ (ব্যাপ্ত); যস্মিন্ বিশুদ্ধে (যে চিত্ত শুদ্ধ হলে); এষঃ আত্মা (উক্ত আত্মা); বিভবতি (নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ: প্রাণবায়ু পাঁচভাগে ভাগ হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একই দেহে সূক্ষ্ম আত্মাও রয়েছেন যা শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। এ কথা সত্য যে, সকল বস্তু ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও শুদ্ধ চৈতন্য (আত্মা) বিরাজ করেন। চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মা তখন নিজেকে প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মা স্বভাবতই সূক্ষ্ম। শুদ্ধ মনে তিনি নিজেকে ধরা দেন। কিন্তু আত্মার অবস্থান কোথায়? দেহ মধ্যস্থ হৃৎপদ্মে তিনি বিরাজ করেন। আবার একই দেহের ভিতর পঞ্চবায়ুও (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান) রয়েছে। সাধক কিভাবে এই আত্মাকে আবিষ্কার করেন? চিত্তশুদ্ধির দ্বারা। চিত্তশুদ্ধি হয় কি ভাবে? ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, নিত্য-অনিত্য এই বিচারের দ্বারা। এর ফলে নিত্য-অনিত্যের মধ্য থেকে সাধক নিত্য. বস্তুকেই গ্রহণ করেন। মাখন দুধের সব অংশ জুড়ে থাকলেও দুধ থেকে তাকে পৃথক করা যায়। সেই রকম ভাবে জ্বালানির সর্বত্র আগুন থাকলেও আগুনকে জ্বালানি থেকে পৃথক করা যায়। শরীরের সর্বত্র আত্মা রয়েছেন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের সঙ্গেও আত্মা যুক্ত। মুঞ্জা ঘাস থেকে যেমন মাঝের ডগাটিকে (ইষিকা) আলাদা করা যায় তেমনি বিচার বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকেও শরীর থেকে পৃথক করা যায়। নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে যেমন পরিষ্কার আয়না লাগে ঠিক তেমনি শুদ্ধ মনে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। চিত্তশুদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥১০

অন্বয়: বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (যে ব্যক্তির মন শুদ্ধ [এবং সেহেতু আত্মাকে জানেন]); মনসা (মনের দ্বারা); যং যং লোকং সংবিভাতি (যে যে লোক পেতে ইচ্ছা করেন [নিজের জন্য বা অপরের জন্য]); যান্ কামান্ চ (যে সকল কাম্য বস্তুও); কাময়তে (কামনা করেন); তং তং লোকং জয়তে (সেই সেই লোক জয় করেন) তান্ চ কামান্ (সেই সকল কাম্য বস্তুও); [লভতে—প্রাপ্ত হন]; তস্মাৎ (সেই হেতু); ভূতিকামঃ (কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তিরা); আত্মজ্ঞং হি (আত্মজ্ঞ পুরুষকেই); অর্চয়েৎ (অর্চনা করবেন)।

সরলার্থ: যিনি শুদ্ধ মনের অধিকারী তিনি যে যে লোক বা যে সকল বস্তু পেতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল লোক ও কাম্য বস্তু তিনি লাভ করে থাকেন। এই কারণে কল্যাণকামী বা ঐশ্বর্যপ্রার্থী ব্যক্তি এরকম পুরুষের পূজা করবেন।

ব্যাখ্যা: যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি সকলের মধ্যে নিজ আত্মাকে দেখেন। অর্থাৎ এ নিখিল জগতের সাথে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। তাঁর মনে কোন ইচ্ছা জাগা মাত্রই তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তাঁর এই ইচ্ছা নিজের জন্যও হতে পারে আবার অন্যের জন্যও হয়ে থাকে। কারণ সকলের মধ্যে তিনি তখন নিজেকেই দেখেন। অন্যের সুখে তিনি সুখী, অন্যের দুঃখে তিনি দুঃখী। তিনি অন্যের থেকে স্বতন্ত্র নন, অন্যেরাও তাঁর থেকে পৃথক নয়।

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় অধ্যায়

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে
শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ॥১

অন্বয়: সঃ (যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন); এতৎ পরমং ব্রহ্মধাম (এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে); বেদ (জানেন); যত্র (যাঁতে); বিশ্বম্ (জগৎ); নিহিতম্ (নিহিত আছে); শুভ্রং ভাতি (যিনি শুদ্ধ ও প্রকাশিত); যে অকামাঃ ধীরাঃ হি (যে নিষ্কাম জ্ঞানী ব্যক্তিরা); পুরুষম্ উপাসতে (সেই পুরুষের উপাসনা করেন); তে (তাঁরা); এতৎ (এই); শুক্রম্ (শুক্র সম্ভূত শরীরকে); অতিবর্তন্তি (অতিক্রম করেন)।

সরলার্থ: যে-ব্যক্তি নিজ আত্মাকে জানেন, তিনি ব্রহ্মকেও জানেন—যে-ব্রহ্ম জগৎকে ধারণ করে রেখেছেন। তিনি একথাও জানেন—এই জগৎকে যে দেখা যায় তার কারণ এ জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত। যে-সকল সাধক নিষ্কামভাবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা: 'সঃ বেদ'—যখন কোন ব্যক্তি জানেন। কি জানেন? 'এতৎ পরমং ব্রহ্মধাম'—এই পরম ব্রহ্মকে জানেন। ব্রহ্মই পরম, সর্বোচ্চ। কোন বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। 'ব্রহ্মধাম' বলতে ব্রহ্মের আবাসকে বোঝায়। এ ব্রহ্মত্বের অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় সাধক ব্রহ্মের সঙ্গে একহয়ে যান। সমগ্র বিশ্ব এই ব্রহ্মধামেই নিহিত আছে। যাঁরা একথা জানেন তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যান। এই শ্লোকে 'অতিবর্তন্তি' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিণামে আমরা সবাই এই অবস্থাই লাভ করব। 'অতি' শব্দটির অর্থ হল অতিক্রম করা আর 'বর্তন' অর্থ অস্তিত্ব। 'শুক্রম্' বলতে প্রাণবীজকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা প্রাণবীজকে অতিক্রম করেন। প্রাণবীজকে অতিক্রম করার অর্থ মৃত্যুর পারে যাওয়া। মানুষ যখন জন্ম-মৃত্যুর পরে যায় তখনই সে মুক্ত হয়। বর্তমানে আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ। বারে বারে আমরা এই পৃথিবীতে ফিরে আসি। কিন্তু ব্রহ্মধামে একবার প্রবেশ করতে পারলে, একবার

ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে পারলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করে মুক্ত হয়ে যাই।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥২

অন্বয়: যঃ (যে ব্যক্তি); কামান্ মন্যমানঃ (কাম্য বস্তুসমূহের চিন্তা করে); কাময়তে ([তা] আকাঙ্ক্ষা করে); সঃ (সেই ব্যক্তি); কামভিঃ (সেই সকল কামনার দ্বারা); তত্র তত্র (সেই সেই স্থানে [যেখানে কাম্যবিষয় সকল ভোগ করতে পারবে]); জায়তে (জন্মগ্রহণ করে); পর্যাপ্তকামস্য (যাঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে); কৃতাত্মনঃ তু (এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন); [তাঁর] ইহৈব (এই জন্মেই); সর্বে কামাঃ (সমস্ত কামনা); প্রবিলীয়ন্তি (বিলীন হয়ে যায়)।

সরলার্থ: যে-সকল ব্যক্তি বাসনা তাড়িত হয়ে ভোগ্য বস্তু লাভের আশায় তার পেছনে ছোটে সেই সব ব্যক্তি কাম্য বিষয়ের মধ্যেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অপর দিকে, যিনি আপ্তকাম (অর্থাৎ যে-ব্যক্তির সকল কামনা বাসনা পূর্ণ হয়েছে) তিনি এই জীবনেই নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করেন, এবং তাঁর সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা: যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হন না। সকল অনিত্য বস্তুকে তিনি এড়িয়ে চলেন। তিনি নিত্য অর্থাৎ যা চিরস্থায়ী, অবিনাশী সেই সব বস্তুই কামনা করেন। তিনি জানেন যে, ত্যাগই আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির চাবিকাঠি। কিন্তু ধরা যাক, কোন ব্যক্তি কামনা বাসনার দ্বারা তাড়িত—সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর এমন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে তিনি কাম্য বস্তুগুলি ভোগ করতে পারেন। 'সঃ কামভিঃ জায়তে তত্র তত্র'—কামনা বাসনা অনুযায়ী তাঁর পুনর্জন্ম হয়। এই কামনা বাসনাই আমাদের পুনর্জন্মের জন্য দায়ী। আমরা অর্থ, ক্ষমতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা এসব লাভ করতে চাই। আমরা যা কামনা করি সেই কামনা অনুযায়ী আমরা আবার জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তার আর কোন কামনা বাসনা থাকে না। 'পর্যাপ্তকামস্য'—যাঁর সকল কামনা পূর্ণ হয়েছে। 'কৃতাত্মনঃ'—ত্যাগ ও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তখন তাঁর কেমন অবস্থা হয়? উপনিষদ বলেছেন যে, 'ইহ এব'—এখানেই, এ জীবনেই; 'সর্বে কামাঃ প্রবিলীয়ন্তি'—তাঁর সকল কামনা বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। তিনি

পূর্ণকাম, আপ্তকাম। তিনি তাঁর আত্মাতেই তৃপ্ত। তিনি তখন আত্মা বহির্ভূত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ইদানীং আমরা মনোবিজ্ঞানীদের বলতে শুনি যে, এ যুগে আমরা নিজেরাই নিজেদের অপরিচিত। আমরা যেন নিজেরাই নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের ভেতরে নিরন্তর সংগ্রাম চলছে। আমার মস্তিষ্ক আমারই হৃদয়ের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত, আবার আমার কর্ম হয়তো আমার চিন্তার বিরোধী। সামঞ্জস্যের অভাবে আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু বহু প্রাচীন কালেই ভারতীয় ঋষিরা এই সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন: 'কৃতাত্মা'—আত্মাতে স্থিত হও। নিজ আত্মাকে জয় করো। ব্রহ্মধামে প্রবেশ করলে সাধক নিজেকে জানতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনিই সেই একও অদ্বিতীয় আত্মা। তিনিই পরম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানেই সব দ্বন্দ্বের অবসান।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥৩

অন্বয়: অয়মাত্মা (এই আত্মা); প্রবচনেন (শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা); ন লভ্যঃ (লাভ করা যায় না); ন মেধয়া (বুদ্ধি বা বিচারশক্তির দ্বারা নয়); বহুনা (বার-বার); শ্রুতেন ন (শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও নয়); [যিনি] এষঃ (সে (সাধক]); যম্ এব (সেই পরমাত্মাকেই); বৃণুতে (পেতে ইচ্ছা করেন); তেন (সেই [আন্তরিক] ইচ্ছার দ্বারাই); লভ্যঃ (লাভ করা যায়); তস্য (তাঁর [সেই সাধকের] কাছে); এষঃ আত্মা (এই আত্মা); স্বাম্ (নিজের); তনুম্ (স্বরূপ); বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ: পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির দ্বারাও নয়। আবার শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। সাধকের আন্তরিক ইচ্ছার দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। সেই সাধকের কাছে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা: যা আয়ত্ত করা যেতে পারে, এমন বস্তু আত্মা নন। আবার আত্মা আমার থেকে পৃথক কোন বস্তুও নন। সুতরাং আত্মাকে অর্জন করাও যায় না। বস্তুকে যেভাবে আয়ত্ত করা হয় সেভাবে আত্মাকে আয়ত্ত করা যায় না। কারণ, যাকে আয়ত্ত করা হয় তাকে একদিন না একদিন ছেড়েও দিতে হয়। আমি আমার থেকে পৃথক কোন বস্তুকে অর্জন

করতে পারি। কিন্তু আমি আমাকে অর্জন করব কেমন করে? আমাদের অন্তরতম সত্তাই হলেন এই আত্মা।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'—যুক্তিতর্কের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায়। 'মেধয়া'—বুদ্ধির দ্বারাও নয়। 'ন বহুনা শ্রুতেন'—আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক শোনার পরেও তা দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে। তবে তাঁকে কেমন করে পাওয়া যায়? 'যম্ এব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। এখানে 'যম্' বলতে আত্মাকে এবং 'এষঃ' বলতে সাধককে বোঝানো হয়েছে। সাধক যদি আন্তরিকভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে একমাত্র আত্মাকেই লাভ করতে চান তবে 'তেন লভ্যঃ'—তার দ্বারা তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ আন্তরিকভাবে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভ হয় ততক্ষণ এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আত্মাকে বাইরে নয় নিজের ভেতরে খুঁজতে হবে6। হৃদয়দুয়ার যদি বন্ধ থাকে তবে সেই দরজায় করাঘাত করতে হবে। তবে একদিন না সেই দরজা খুলে যাবেই।

'তস্য এষঃ আত্মা বিবৃণুতে তনুম্ স্বাম্'—সেই সাধকের কাছে (তস্য) আত্মা তখন নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। আত্মা তখন নিজেকেই প্রকাশ করেন। এর ফলে সহসা যেন আমি আমাকেই আবিষ্কার করি। এ যেন দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে বলছি, 'হায়! আমি দেখতে পাচ্ছি না।' তখন কেউ এসে আমার হাতটা সরিয়ে দেন। তিনি গুরু হতে পারেন, শাস্ত্র হতে পারেন কিংবা কোন উপলব্ধিও হতে পারে। কিন্তু যে-মুহূর্তে হাত দুটো সরে যায় সেই মুহূর্তেই দেখা যায়। আত্মসাক্ষাৎকার ঠিক এভাবেই হয়।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥৪

অন্বয়: অয়মাত্মা (এই [আলোচ্য] আত্মা); বলহীনেন (দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা [যাঁরা আত্মাতে নিজেকে উৎসর্গ করেন না); ন লভ্যঃ (লভ্য নয়); প্রমাদাৎ ন চ (অমনোযোগী হলেও তাঁকে লাভ করা যায় না); অলিঙ্গাৎ তপসঃ বা অপি ন (বৈরাগ্যহীন তপস্যা দ্বারাও তাঁকে লাভ করা যায় না); যঃ বিদ্বান্ (যিনি জ্ঞানী); তু (কিন্তু); এতৈঃ উপায়ৈঃ যততে (এই সকল উপায় সযত্নে চেষ্টা করেন); তস্য (তাঁর [অর্থাৎ ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির]); এষঃ আত্মা (এই আত্মা); ব্রহ্মধাম (ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে); বিশতে (প্রবেশ করেন)।

সরলার্থ: দুর্বল ব্যক্তি কখনও আত্মাকে জানতে পারেন না। আবার যাঁরা আত্মনিষ্ঠ নন তাঁরাও আত্মাকে জানতে পারেন না। একই ভাবে বলা যায় যে, ত্যাগ-বৈরাগ্য-হীন কঠোর পরিশ্রমের (দৈহিক অথবা মানসিক) দ্বারাও তাঁকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যে-সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরা কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই সব উপায়গুলিকে অভ্যাস করেন, তাঁরাই আত্মাকে জানতে সক্ষম হন। অর্থাৎ তাঁরা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন এবং এই নিখিল বিশ্বের সাথে এক হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: কঠ উপনিষদে আত্মজ্ঞান লাভের পথকে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের মতোই এ পথ দুর্গম। এ পথ দুর্বলের জন্য নয়। সাধককে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান হতে হবে। আচার্য শঙ্কর বলেন যে, যারা সংসারে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত তারাই বলহীন অর্থাৎ দুর্বল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এ কথা বলতে পারি। একই সাথে ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্যকে (অর্থাৎ জগৎকে) লাভ করা যায় না। আমাদের যে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে। যদি আত্মাকে চাই, তবে শুধুমাত্র আত্মাকেই উপাসনা করতে হবে। এখানে কোন রকম আপস করা চলবে না।

'ন চ প্রমাদাৎ'—প্রমাদ বলতে এখানে আলস্য, অবহেলা এবং অযত্নকে বোঝানো হয়েছে। এর আর এক অর্থ হল ইন্দ্রিয়সুখকে প্রশ্রয় দেওয়া। অর্থাৎ আরামপ্রিয় সুখী ব্যক্তি অলস জীবন যাপন করে। এখানে 'তপসঃ' কথাটির অর্থ জ্ঞান—জ্ঞান বলতে ত্যাগহীন (অলিঙ্গাৎ) শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে বোঝানো হয়েছে। আমি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বা সুবক্তা হতে পারি, আমার অনেক উদ্ভাবনী শক্তিও থাকতে পারে, কিন্তু তা যদি আমি বাস্তবে প্রয়োগ না করি, আমার যদি ত্যাগ না থাকে তবে সেই জ্ঞান বৃথা।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ত্যাগ, বৈরাগ্য ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই সব শর্ত পূরণে সক্ষম হন (এতৈঃ উপায়ৈঃ যততে) অর্থাৎ তিনি যদি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সব অবস্থাতেই দৃঢ় হন, তখন তিনি কি অবস্থা লাভ করেন? 'বিদ্বান্ তস্য এষঃ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম', তিনি ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন (বিশতে)। সাধক যখন নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিতে (বিদ্বান্) পরিণত হন।

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥৫

অন্বয়: ঋষয়ঃ (ঋষিরা [যাঁরা আত্মাকে জেনেছেন]); এনম্ (এঁকে [পরমাত্মাকে]); সংপ্রাপ্য (সম্যক্-ভাবে জেনে); জ্ঞানতৃপ্তাঃ (সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে); কৃতাত্মানঃ (আত্মস্বরূপ হয়ে); বীতরাগাঃ (নিরাসক্ত); প্রশান্তাঃ [ভবন্তি] (সংযতেন্দ্রিয় [হন]); যুক্তাত্মানঃ তে ধীরাঃ (এই সকল নিত্য সমাহিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা); সর্বগম্ (সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে); সর্বতঃ প্রাপ্য (সর্বত্র প্রাপ্ত হয়ে); সর্বম্ এব আবিশন্তি (পূর্ণব্রহ্মে প্রবেশ করেন)।

সরলার্থ: সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞানে তৃপ্ত হন। এর ফলে তাঁদের বিষয়াসক্তি দূর হয় এবং তাঁরা প্রশান্তি লাভ করেন। এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। ব্রহ্মে লীন হয়ে তাঁরা সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মাকে বোধে বোধ হলে ঋষিগণের আর কিছু জানবার থাকে না। তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই ডুবে যান—'আত্মতৃপ্ত'। এ অবস্থায় তাঁরা সকল দ্বিধা এবং সংশয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। উপনিষদ পূর্বেই এ কথা বলেছেন, 'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ', অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ের সমস্ত জটিলতা দূর হয় এবং সকল সংশয় নাশ হয়। ঋষিগণ 'বীতরাগাঃ' অর্থাৎ আসক্তিমুক্ত হন, এবং 'প্রশান্তাঃ'—অর্থাৎ তাঁদের মন তখন ধীর স্থির ও শান্ত। এমন অবস্থায় কোন বিরোধ বা উদ্বেগের অবকাশ থাকে না; ঋষিরা তখন পরম শান্তি লাভ করেন। এমন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল সংযত এবং তাঁর কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাস থাকে না। তিনি শিশুর মতো সদা প্রফুল্ল ও আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকেন। সাধুদের 'বালবৎ' বলা হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বুদ্ধি দিয়ে এই প্রশান্ত অবস্থার ব্যাখ্যা করা চলে না। একমাত্র যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন তিনিই পরম শান্তি অনুভব করে থাকেন।

'সর্বগম্' বলতে কি বোঝায়? এর অর্থ ব্রহ্ম, আত্মা। আকাশের মতো ব্রহ্মও সর্বত্র বিরাজ করেন। একমাত্র আকাশকেই ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ উভয়েই সর্বব্যাপী।

'ধীরাঃ'—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, 'সর্বতঃ প্রাপ্য' অর্থাৎ আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে জেনে, আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যান (যুক্তাত্মানঃ)। অর্থাৎ আত্মাই হয়ে যান। তারপর 'সর্বম্ এব আবিশন্তি'—সর্ববস্তুতে তাঁরা নিজেদেরকেই দেখেন। তখন 'আমি-তুমি'র (অস্মদ্-যুস্মদ্) ভেদ চিরতরে ঘুচে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলার ঘা (ক্যানসার) যখন তীব্র হয় তখন তাঁর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শিষ্যরা কাকুতি মিনতি করে তাঁকে বলেন : 'মা (ভবতারিণী) তো আপনার কথা খুব শোনেন, আপনি একবার মাকে বলুন না, যাতে আপনার খাওয়াটা বন্ধ না হয়।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রস্তাবে রাজী হন না। শিষ্যরা তখন বলতে থাকেন: 'অন্তত আমাদের মুখ চেয়ে আপনি মাকে একথা বলুন।' শেষপর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের কাছে এই প্রার্থনা

জানালে মা তাঁকে দেখান, তিনি শত মুখে খাচ্ছেন। অর্থাৎ এক আত্মাই সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে বিরাজ করছেন। 'সবম্' বলতে এ অবস্থাকেই বোঝানো হয়। মানুষ তখন সর্বত্র নিজেকেই দর্শন করে।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতর্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।।৬

অন্বয়: বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা যাঁদের প্রতিপাদ্য সুনিশ্চিত হয়েছে); সন্ন্যাসযোগাৎ শুদ্ধসত্ত্বাঃ (সন্ন্যাস বা ত্যাগ-বৈরাগ্যের দ্বারা যাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে); তে সর্বে যতয়ঃ (সেই সকল সাধকরা); পরামৃতাঃ ([আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে] অমৃতত্ব লাভ করেন); পরান্তকালে (দেহত্যাগের সময়ে); ব্রহ্মলোকেষু (ব্রহ্মলোকসমূহ প্রাপ্ত হয়ে); পরিমুচ্যন্তি (মুক্ত হন)।

সরলার্থ: যাঁরা বেদান্তশাস্ত্রের মর্মার্থ জেনেছেন, ত্যাগ বৈরাগ্য অভ্যাসের ফলে যাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে এবং যাঁদের স্বার্থবুদ্ধি চিরতরে ঘুচে গেছে সে সকল সাধকরা এই জীবনেই আত্মাকে উপলব্ধি করেন এবং মৃত্যুকালে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হন।

ব্যাখ্যা: যখন আমি 'আমাকে' আবিষ্কার করি তখন আমি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হই। কখনও কখনও আমরা 'হস্তামলকবৎ' শব্দটি বলে থাকি। এই কথাটির অর্থ হল আমার হাতের মুঠোর মধ্যে একটি ফল আছে। স্বাভাবিক ভাবেই, আমি ফলটিকে দেখতে পাই ও অনুভবও করে থাকি। ফলটি যে আমার হাতের মুঠোতেই আছে এ ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। ঠিক এ ভাবেই আমরা যখন জানতে পারি আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের লক্ষ্য এবং বেদান্ত আমাদের সেই শিক্ষাই দেয় তখন আর কোন সংশয় বা বিভ্রান্তি থাকে না। অর্থাৎ তখন আমি আমাকে জানতে সচেষ্ট হই। আত্মজ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর কোন কিছুই আর তখন আমাকে আকৃষ্ট করে না।

'সন্ন্যাস' কথাটির অর্থ কি? সন্ন্যাস অর্থাৎ 'সম্যক্ ন্যাস্'। 'ন্যাস্' অর্থাৎ ত্যাগ, বৈরাগ্য আর 'সম্যক্' অর্থ পুরোপুরি। অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। কি ত্যাগ করেন? এই জগৎ সংসারকে। বর্তমানে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই আমি সত্য বলে মনে করি। কিন্তু এই জগতের ঊর্ধ্বে আরও কিছু আছে যা আমার অজানা। কিন্তু যখন আমি এই জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানতে পারি, তখন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারকে আমি প্রত্যাখ্যান

করি। তখন আমি উপলব্ধি করি এ জগৎ অনিত্য অর্থাৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। যিনি নিত্য সত্যকে লাভ করেছেন, আপেক্ষিক সত্য আর তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। সাধক তখন নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচার করে অনিত্য বস্তু ত্যাগ ও নিত্য বস্তু গ্রহণ করেন। একেই বলা হয় সন্ন্যাসযোগ। দীর্ঘকাল ধরে ত্যাগ-বৈরাগ্য অনুশীলনের দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব হন।

'যতয়ঃ' বলতে আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট তপস্বীদের বোঝায়, তাঁরা শুদ্ধ ও পবিত্র। দীর্ঘকাল ধরে ত্যাগ অভ্যাসের ফলে তাঁদের সকল কামনা বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। 'পরান্তকালে'—পরা এবং অন্তকালে। 'অন্তকাল' কথাটির অর্থ মৃত্যু এবং 'পরা' কথাটির অর্থ 'চূড়ান্ত'। ব্রহ্মজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে 'পরান্তকালে' বলতে অন্তিম মৃত্যুকে অর্থাৎ শেষ জন্ম বোঝায়। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তখন সে মৃত্যু আর একটি জীবনের সূচনা করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এর ব্যতিক্রম। মৃত্যুর পর তাঁরা আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসেন। না। 'পরামৃতাঃ'—তাঁরা অমর হন। 'পরিমুচ্যন্তি' অর্থাৎ তিনি মোক্ষ লাভ করেন। একেই নির্বাণ বলা হয়। আচার্য শঙ্কর নির্বাণ অবস্থাকে নিভে যাওয়া প্রদীপ বা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাওয়া মাটির পাত্রের সাথে তুলনা করেছেন। সাধক যখন মোক্ষ লাভ করেন তিনি তখন স্বর্গ বা অন্য কোথাও যান না। তিনি তখন ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান। ব্রহ্ম বলতে কোন 'লোক' বোঝায় না। মুক্ত পুরুষ তাঁর গন্তব্য পথের কোথাও কোন পদচিহ্ন রেখে যান না। যেমন, পাখি যখন ওড়ে এবং মাছ যখন জলে সাঁতার কাটে তখন পাখির পাখার দাগ বাতাসে বা মাছের ডানার দাগ জলে পড়ে না। মুক্ত পুরুষের আর আসা যাওয়া থাকে না।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥৭

অন্বয়: [তেষাম] পঞ্চদশ কলাঃ ([তাঁদের] পনেরটি অংশ); প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ (তাঁদের কারণ অবস্থায় ফিরে যায়) সর্বে দেবাশ্চ (এবং সকল ইন্দ্রিয়সমূহ); প্রতি-দেবতাসু (নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় প্রবেশ করে); কর্মাণি (কর্মসকল); বিজ্ঞানময়ঃ চ আত্মা (এবং বিজ্ঞানময় আত্মা); সর্বে (সকল); পরে অব্যয়ে একীভবন্তি (অব্যয় পরব্রহ্মে একত্ব লাভ করে)।

সরলার্থ: তখন দেহের পনেরটি অংশ তাদের মূল কারণাবস্থায় ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়গুলিও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় লীন হয়। কেবলমাত্র সঞ্চিত কর্ম যা এখনও ফল দিতে শুরু করেনি এবং বিজ্ঞানময় আত্মা অব্যয় পরব্রহ্মে একত্ব লাভ করে।

ব্যাখ্যা: সাধক যখন জ্ঞান লাভ করেন, যখন জানেন 'তিনি কে' তখন তিনি কি অবস্থা প্রাপ্ত হন? কি ধরনের অভিজ্ঞতাই বা তাঁর হয়ে থাকে? 'একীভবন্তি' এক হয়ে যান। সব কিছু তখন একে লীন হয়। 'কলাঃ' অর্থ খণ্ড বা অংশ। যখন আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করি তখন এই অংশগুলি তাদের উৎসে ফিরে যায়। উপনিষদ বলছেন যে, এরকম পনেরটি অংশ আছে। আক্ষরিক অর্থে এগুলিকে ঠিক অংশ বলা যায় না। এই কলাসমূহ একই আত্মার প্রকাশ মাত্র। সেগুলি কি কি? ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ হল প্রাণ, দ্বিতীয় শ্রদ্ধা। অন্যগুলি যথাক্রমে 'পঞ্চভূত'—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী; 'পঞ্চ ইন্দ্রিয়', মন, খাদ্য, বীর্য, তপস্যা, বেদসমূহ, যাগ-যজ্ঞ, লোকাদি এবং তাদের নাম সমূহ। জীবাত্মাতে এই সব উপাদানই রয়েছে। কিন্তু আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই উপাদান সকল অদৃশ্য হয় অর্থাৎ এগুলি তাদের উৎসে ফিরে যায়।

'দেব' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। 'দেব' কথাটির আক্ষরিক অর্থ, 'যা প্রকাশ করে'। এর দ্বারা 'পঞ্চেন্দ্রিয়' অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বককে বোঝায়। এই সব ইন্দ্রিয় (তথা দেব) তাদের মূল উৎসে (অর্থাৎ প্রতিদেবে) ফিরে আসে। হিন্দুমতে 'পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়' সমষ্টি উপাদান থেকেই এসেছে। জীবাত্মার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার অংশ তাদের সমষ্টি উৎসে ফিরে যায়।

তারপর হল কর্ম। হিন্দু দর্শনে কর্মের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যদি প্রশ্ন করা যায়: 'আমি গরীব কেন?' হিন্দু দর্শন অনুযায়ী আমার কর্মফল এর জন্য দায়ী। আমাদের চরিত্র, জীবনের মান, এ সব কর্মফলের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কর্মই আমাদের বদ্ধ করে। আবার এমন কিছু কর্ম থাকতে পারে যা এখনও ফল দিতে শুরু করেনি। এগুলিকে বলা হয় সঞ্চিত কর্ম। আত্মাকে জানতে পারলে এ জাতীয় কর্মের নাশ হয়।

বিজ্ঞানময় আত্মা বলতে এখানে জীবাত্মাকে বোঝানো হচ্ছে। জীবাত্মারও লয় হয়। তখন এই সব বস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা কোথায় যায়? পরমাত্মায় ফিরে যায়। তখন জীবাত্মা পরমাত্মা হয়ে যান। পরমাত্মা থেকে পৃথক স্বতন্ত্র জীবরূপে তাঁর আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। আচার্য শঙ্কর পরমাত্মার মহত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে কতগুলি সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন ব্রহ্ম হচ্ছেন পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; 'অনন্তর'—অসীম; 'অদ্বয়'—এক ও অদ্বিতীয়; শিব, শান্ত ও সমাহিত। সবশেষে আচার্য বলেছেন, সবকিছুই ব্রহ্ম।

সাধক যখন ব্রহ্মে লীন হন তখন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। আমরা ব্রহ্ম হয়েই আছি কিন্তু অবিদ্যার জন্য আমরা তা বুঝি না। শরীর অসুস্থ হলেই মনে করি আমিই অসুস্থ। আবার এই মুহূর্তে আমি হয়তো সুখী, ঠিক পর মুহূর্তেই দুঃখী। কারণ দেহমনের সঙ্গে আমরা নিজেদের এক করে ফেলি। ফলে দেহমনের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমিও যেন পরিবর্তিত হতে থাকি। আমি হয়ে যাই সতত পরিবর্তনশীল। কিন্তু পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে যাওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এই যে পরিবর্তন ঘটে তার কারণ আমি আমার প্রভু নই, আমি এখনও নিজেকে জয় করতে পারিনি। নিজেকে জয় করা যায় কিভাবে? একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভেই তা সম্ভব।

আবার নিজেকে যখন পরমাত্মা বলে বোধ হয়, তখন দেখি অন্যদের মধ্যেও সেই আমিই রয়েছি। একরূপে আমি এখানে বসে আছি আবার অন্যরূপে আমিই ঘুরে বেড়াচ্ছি; আর একরূপে আমি হয়তো গান গাইছি, আবার কোথাও বা আমি লিখছি। নানা রূপে নানা পরিস্থিতিতে ও নানা কর্মের মধ্যে দিয়ে একই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। সর্বত্র সেই একই আত্মা রয়েছেন। একথা সত্য যে, জগৎ বৈচিত্রময় এবং এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই বৈচিত্রের পেছনে ঐক্য রয়েছে।

উপনিষদ বলছেন: 'একীভবন্তি', তারা এক হয়ে যায়। অর্থাৎ কার্য ও কারণ অভিন্ন হয়ে যায়। সূর্য এক কিন্তু তার প্রতিবিম্ব অনেক। প্রতিবিম্বগুলি বিভিন্ন পাত্রে প্রতিফলিত হয়। এখন পাত্রগুলি যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তবে প্রতিবিম্বগুলি সূর্যেই ফিরে যায়। তখন সূর্য ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না; তারা এক হয়ে যায়। এই জন্যই বলা হয় যে, এক দেখাই জ্ঞান আর বহু দেখাই অজ্ঞান।

যথা ন্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥৮

অন্বয়: যথা (যেরূপ); স্যন্দমানাঃ নদঃ (প্রবহমান নদী); নামরূপে (নাম এবং রূপ); বিহায় (ত্যাগ করে); সমুদ্রে (সমুদ্রে); অস্তম্ (অস্ত অর্থাৎ মিশে); গচ্ছন্তি (যায়); তথা (সেইরূপ); বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ); নামরূপাৎ (নাম ও রূপ থেকে); বিমুক্তঃ [সন] (মুক্ত হয়ে); পরাৎ পরম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ [হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, ব্রহ্মা ইত্যাদি]); দিব্যম্ (জ্যোতিস্বরূপ); পুরুষম্ (পরমাত্মাকে); উপৈতি (প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ: বহমান নদীগুলি নিজেদের নামরূপ ত্যাগ করে অবশেষে সমুদ্রে মিশে যায়। অনুরূপভাবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নামরূপ থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মায় লীন হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ'—যেমন বহমান নদীগুলি; 'সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি'—সমুদ্রে মিলিত হয়। নদীগুলি সমুদ্রে মিলে গেলে কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? তারা নামরূপের পারে চলে যায়। তখন বলা যায় না যে, সমুদ্রের এই অংশটি গঙ্গা, আর ওই অংশটি যমুনা। তখন শুধুই জল। নদীগুলি তাদের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে সাগরে মিশে যায়—'একীভবন্তি'। অর্থাৎ নদীগুলি সমুদ্রেই পরিণত হয়। আত্মজ্ঞান লাভে আমরা অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হই। এখন আমি নিজেকে পরমাত্মার থেকে পৃথক বলে মনে করি—'আমি শ্রীযুক্ত অমুক, বা শ্রীমতী অমুক'। আমরা সকলেই এরকম মনে করে থাকি। আর এই দুই-বোধ থেকে নানা সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এমনকি বন্ধুরাও একে অপরকে হিংসা ও সন্দেহ করতে থাকে। নিজের স্বরূপ না জানার ফলেই এইসব অঘটন ঘটে।

স্বভাবতই নামরূপের গণ্ডির মধ্যে আমরা নিজেদের বদ্ধ করে ফেলি। স্বামী বিবেকানন্দ একবার এক যুবককে 'ক্যাবলা' বলে ডাকেন। যুবকটি তাঁকে বলে: আপনি আমাকে 'ক্যাবলা' বলছেন কেন? ওটা তো আমার নাম নয়। এর উত্তরে স্বামীজী বললেন: নামে কী আসে যায়? আমার নাম স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমাকে অন্য যে কোন নামে ডাকতে পার। তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ 'আমি' তো নাম নই।—এটিই মূল কথা। অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তি হয়তো লম্বা কেউ আবার বেঁটে, কেউ হয়তো ফরসা, আবার কেউ বা কালো হতে পারেন, কিন্তু এসবই উপাধি মাত্র। আর উপাধির জন্যই আমরা নিজেদের একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে করি। আমাদের এই দেহও একটা উপাধিমাত্র।

'নামবদপে বিহায়'—নিজেদের নাম রূপ হারিয়ে; 'সমুদ্রে অস্তং গচ্ছত্তি'—নদীগুলি সমুদ্রে মিলিত হয়। 'তথা'—সেই ভাবে, 'বিদ্বান্'—যিনি নিজ আত্মাকে জানেন অর্থাৎ যাঁর বোধে বোধ হয়েছে তিনি। 'নামরূপাৎ বিমুক্তঃ'—নামরূপের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ সকল বন্ধন থেকেই তিনি মুক্ত। একেই নির্বাণ বলা হয়। 'উপৈতি'—তিনি পৌঁছান অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হন। 'পরাৎ পরম্'—এমনকি আত্মা পরমের থেকেও শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। 'দিব্যম্'—আত্মা শুদ্ধ এবং জ্যোতির্ময়। 'পুরুষম্'—আত্মাকে পুরুষও বলা হয় কারণ ইনি সর্বব্যাপী। এই আত্মা সর্বত্র ও সকলের মধ্যে বিরাজ করেন। ইনিই সকলের অন্তরস্থ আত্মা।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতে ভবতি॥৯

অন্বয়: যঃ হ বৈ (যে কেউ); তৎ (সেই); পরমং ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে); বেদ (জানেন); সঃ (তিনি); ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই); ভবতি (হন); অস্য (এঁর); কুলে (বংশে); অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি (কেউই অব্রহ্মবিদ্ হন না); সঃ (তিনি); শোকং তরতি (শোককে অতিক্রম করেন); পাপ্মানং তরতি (পাপকে অতিক্রম করেন); গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ গ্রন্থি থেকে); বিমুক্তঃ [সন্] (সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে); অমৃতঃ (অমর); ভবতি (হন)।

সরলার্থ: যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান, এবং তাঁর বংশে কেউ 'অব্রহ্মবিদ্' জন্মায় না। তিনি সব শোকদুঃখের পারে চলে যান। হৃদয়ের অজ্ঞানতাজনিত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: 'সঃ যঃ হ বৈ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। এই উপনিষদের শুরুতে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই শ্লোকে তারই উত্তর দেওয়া হল। প্রশ্নটি ছিল : কি জানলে বা কাকে জানলে সব কিছুকে জানা যায়। এর উত্তরে উপনিষদ বলছেন : 'যদি আমি ব্রহ্মকে জানি, তবে আমি ব্রহ্মাই হয়ে যাই। এবং তখনই আমি সবকিছুকে জানতে পারি।'

'নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি'—পিতা যদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হন তবে তাঁর বংশের সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ হবেন। এ কেমন করে সম্ভব? কারণ পিতার প্রভাব তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে ঘিরে যাঁরা থাকেন তাঁরাও তখন ব্রহ্ম হয়ে যান। এই পরিবারের সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে প্রদীপ জ্বলছে তার চারপাশে কোথাও অন্ধকার থাকতে পারে কি? অনুরূপভাবে যখন আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি তখন আমার চারপাশের মানুষও এই জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়। এখানে একথাটিই বোঝানো হয়েছে।

'শোকং তরতি'—তিনি শোকদুঃখের পারে যান। শুধুমাত্র দুঃখই নয়, তিনি সুখেরও পারে চলে যান। 'পাপ্মানং তরতি'—তিনি পাপকে অতিক্রম করেন। একই সঙ্গে তিনি পুণ্যকেও অতিক্রম করেন। 'গুহাগ্রন্থিভ্যঃ', গুহা বলতে এখানে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। আত্মার অবস্থান তো এই হৃদয়ে। আমার স্বরূপজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আমি অজ্ঞানতার জালে বদ্ধ।

‘অমৃতঃ ভবতি’—তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি অমর হন, কারণ তিনি যে ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। এ অনেকটা সাগরে জলবিন্দু পড়ার মতো। সাগরে জলবিন্দু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সাগরের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেইভাবে মানুষ যখন ব্রহ্মকে জানেন তখন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। এই জন্যই উপনিষদ সকলকে আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হতে বলছেন। আমাদের সকল সমস্যার মূলে আছে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতাকে দূর করতে পারলেই মুক্তির পথ খুলে যায়। এই অবস্থায় মানুষ পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন।

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্—
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্॥১০

অন্বয়: ঋচা (ঋক্-মন্ত্র দ্বারা); তৎ এতৎ (এই যে [সত্য]); অভ্যুক্তম্ (প্রকাশিত হল); [যে] ক্রিয়াবন্তঃ (শাস্ত্রের নিয়ম মেনে যাঁরা কাজ করেছেন); শ্রোত্রিয়াঃ (বেদজ্ঞ); ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ [পুরুষঃ] (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষরা); শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাবান হয়ে); স্বয়ম্ (নিজেই); একর্ষিম্ (একর্ষি নামক অগ্নিতে); জুহ্বতে (আহুতি দেন); যৈঃ তু (যাঁদের দ্বারা); বিধিবৎ (যথা বিধি); শিরোব্রতম্ (মস্তকে অগ্নি ধারণ পূর্বক যে ব্রত); চীর্ণম্ (অনুষ্ঠিত হয়েছে); তেষাম্ এব (তাঁদের কাছেই); এতাম্ (এই); ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যাকে); বদেত (বলবে)।

সরলার্থ: শাস্ত্র বলেন : যিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে কর্ম করেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, একর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মস্তকে অগ্নি ধারণ করেন, তিনিই একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যালাভের পক্ষে উপযুক্ত; অন্যরা নয়।

ব্যাখ্যা: ‘তৎ এতৎ ঋচা অভুক্ত’—ঋক্-বেদে একথাই বলা হয়েছে। উপনিষদ এখানে আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এই জ্ঞান সকলের জন্য নয়। তখনকার দিনে আচার্যরা এই জ্ঞানদানের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা সকলের থাকে না। কে এই জ্ঞানলাভে সক্ষম? ‘ক্রিয়াবন্তঃ’—যাঁরা শাস্ত্র নির্দেশিত কর্ম সম্পন্ন করেছেন; ‘শ্রোত্রিয়াঃ’—যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন; ‘ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ’—যাঁদের মন ব্রহ্মে সমর্পিত; ‘স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিম্’—যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে একর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। একর্ষি যজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই জানি না, শুধু জানা যায় যজ্ঞটি বড়ই দুরূহ।

'শ্রদ্ধয়ন্তঃ'—যাঁরা আন্তরিকতা সম্পন্ন। 'শিরোব্রতম্'—যে যজ্ঞে যজমানকে মস্তকে অগ্নি ধারণ করতে হয়। 'বিধিবৎ যৈঃ তু চীর্ণম্'—যাঁরা এই সব যজ্ঞ বিধি মতে পালন করেছেন। উপনিষদের মতে কেবলমাত্র এই সব মানুষই ব্রহ্মবিদ্যালাভের পক্ষে উপযুক্ত। সাধককে তাঁর কর্তব্য পালন করতে হবে এবং শ্রদ্ধা আন্তরিকতার সাথে এই বিদ্যার্জনে আগ্রহী হতে হবে। মূল কথাটি হল, যদি আমি সত্যিই ব্রহ্মকে জানতে চাই তবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং কষ্টকে মেনে নিতে হবে। এভাবেই সাধক নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত করেন। এর ফলে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। আর জ্ঞান তখন আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।

তদেতৎসত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥১১

অন্বয়: পুরা (প্রাচীন কালে); ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা নামক ঋষি); তৎ এতৎ সত্যম্ উবাচ (সেই সত্যকে বলেছিলেন [তাঁর শিষ্য শৌনককে]); অচীর্ণব্রতঃ (যিনি ব্রত আচরণ করেননি); এতৎ ন অধীতে (তিনি এই [উপনিষদ] পাঠ করেন না); পরমঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণকে); নমঃ (নমস্কার); পরমঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণকে); নমঃ (নমস্কার)।

সরলার্থ: পুরাকালে ঋষি অঙ্গিরা শৌনককে পরম সত্যের অর্থাৎ এই ব্রহ্মতত্ত্বের শিক্ষা দান করেছিলেন। যে সব মানুষ যাগযজ্ঞ করেন না, তাঁরা উপনিষদও পাঠ করেন না। যাঁরা এই জ্ঞান দান করেন সেই পরম ঋষিদের বারবার নমস্কার করি।

ব্যাখ্যা: ঋষি অঙ্গিরা শিষ্য শৌনককে এই উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। শৌনক যথাবিধি গুরুর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত তিনি পালন করেছিলেন। এই জ্ঞান গুরু থেকে শিষ্যে, এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। এই ধারাকেই বলে পরম্পরা। এই জ্ঞানলাভের শর্তগুলি সবসময়েই এক। জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যদিও এই জ্ঞান অর্জন করা কঠিন, কিন্তু এই জ্ঞানই সর্বোচ্চ। গুরু কোন অযোগ্য শিষ্যকে এই জ্ঞান দান করতে পারেন কিন্তু এই জ্ঞান তার কোন কাজে লাগে না। কিন্তু যখন সৎ গুরু যোগ্য শিষ্যকে এই শিক্ষা দান করেন তখন সেই শিক্ষাদান সার্থক হয়।

যে সব আচার্য এই ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন তাঁরা অতি উচ্চকোটির সাধক। সেই পরম ঋষিদের বারবার নমস্কার করি।

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মাণ্ডূক্য উপনিষদ

(কারিকাসহ)

মঙ্গলাচরণ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: দেবাঃ (হে দেবগণ); কর্ণেভিঃ (কান দিয়ে); ভদ্রম্ (ভালো যা কিছু); শৃণুয়াম (যেন তাই শুনতে পাই); যজত্রাঃ (হে পূজ্য দেবগণ); অক্ষভিঃ (চোখ দিয়ে); ভদ্রম্ (যা কিছু ভালো); পশ্যেম (যেন তাই দেখতে পাই); স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ (স্থির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা); তুষ্টুবাংসঃ (যেন তোমাদের স্তুতি করতে পারি); দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবগণ যে আয়ু বিহিত করে দিয়েছেন); ব্যশেম (তা যেন লাভ করতে পারি); শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ কীটপতঙ্গ, হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত বিঘ্নের শান্তি])।

সরলার্থ: দেবতাদের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা যে আমরা যেন যা কিছু ভালো শুধু তাই-ই কান দিয়ে শুনি। দেবতাদের আমরা পূজা করি, আর তাঁদের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, চোখ দিয়ে আমরা যেন শুধু ভালো জিনিসই দেখি। আরও প্রার্থনা, কায়মনোবাক্যে যেন তাঁদেরই জয়গান করি। তাঁদের যেমন ইচ্ছা ততদিনই যেন বেঁচে থাকি—বেশি নয়, কমও নয়। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: আমরা যেন ভালো কথা শুনি। 'ভালো' বলতে কি বুঝায়? যা কল্যাণপ্রদ, যা অনুকূল। দর্শন একটা শক্ত বিষয়। এ বুঝতে গেলে গভীর মনোযোগ চাই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যা আমার পক্ষে কল্যাণকর, তাই শুধু আমরা দেখব। এতে আমাদের জ্ঞানার্জনের সুবিধা হবে এবং আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

এই প্রার্থনার মধ্যে আমাদের অঙ্গাদি স্থির থাকুক, এ কথাও বলা আছে। অঙ্গ বলতে শুধু বাইরের স্থূল অঙ্গ নয়, মনও ঐ সঙ্গে আছে বুঝতে হবে। শরীর ভালো থাকবে, মনও ভালো থাকবে, তবেই কাজে মন দিতে পারব। হয়তো শরীরের কোথাও একটা ব্যথা আছে,

এতে মন বিক্ষিপ্ত থাকবে। মন যেন সর্বদা সজাগ থাকে; শরীরে বা মনে অবসাদ, জড়তা এসব কিছু যেন না থাকে। শরীর ও মন দুই-ই যেন স্থির থাকে, আর আমাদের আয়ত্তে থাকে।

আমরা এইভাবে চলব, তবে আমাদের আয়ু বিধাতার যেমন বিধান তেমনি হোক।

আমরা মাণ্ডূক্য উপনিষদ পড়তে চলেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আমাদের শরীর-মন যেন সুস্থ থাকে। তারা যেন আমাদের কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। আমরা যেন আমাদের অধ্যয়নে ডুবে থাকতে পারি। বিধাতার যেমন ইচ্ছা ততদিন যেন এইভাবে বেঁচে থাকতে পারি।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ
(গৌড়পাদ-কারিকাসহ)

মাণ্ডূক্য উপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। ছোট উপনিষদগুলির মধ্যে মাণ্ডূক্য অন্যতম। এতে মাত্র বারোটি শ্লোক আছে। রচয়িতা ঋষির নামানুসারেই হয়তো এই উপনিষদের এরূপ নামকরণ হয়েছে।

শঙ্করাচার্যের গুরু ছিলেন আচার্য গোবিন্দপাদ। আর তাঁর গুরু ছিলেন গৌড়পাদ। গৌড়পাদ এই উপনিষদ পাঠের সহায়ক হিসাবে একটি কারিকা লেখেন। কারিকাটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এতে অদ্বৈতবাদের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। কারিকামতে, আত্মা, ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, যে আত্মা এক ও অভিন্ন। এখানে দ্বিতত্ত্বের কোনও স্থান নেই। গৌড়পাদের মতে সৃষ্টি বলে কিছুই নেই। ফলে এরা কার্য-কারণ সম্পর্কও অস্বীকার করেন। কারিকা অনুসারে বলা যায়, জগৎ বলে কিছুই নেই। তবে দৃষ্টিবিভ্রমের জন্যই আমরা এই দৃশ্যমান জগৎকে দেখে থাকি। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্র অনুমোদিত—কারিকা একথাই বলে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এই কারিকার যে দর্শন আর বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ বা আত্মগত ভাববাদের মধ্যে অনেক মিল আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা করা এ কারিকার উদ্দেশ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আচার্য গৌড়পাদ বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, তিনি নিজে একজন গোঁড়া অদ্বৈতবাদী। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, কারিকাটি গৌড়পাদের রচনা হলেও এটা মাণ্ডূক্য উপনিষদের অন্তর্গত নয়। অর্থাৎ কারিকাটি স্বতন্ত্র। এই বিতর্কের মীমাংসা অবশ্য আজও হয়নি।

অধিকাংশ উপনিষদই এক বা একাধিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে মূল বক্তব্যকে তুলে ধরে। মাণ্ডূক্য উপনিষদ অবশ্য এর ব্যতিক্রম। এই উপনিষদ প্রতীকের মাধ্যমে তার মূল বক্তব্যকে তুলে ধরেছে। আর সেই প্রতীক হল 'অউম্', যা 'ওম্' নামে পরিচিত। ব্রহ্মকে আলাপ আলোচনার দ্বারা জানা যায় না। তাই এখানে প্রতীকের অবতারণা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় গোলাকৃতি কালো পাথরের নুড়িকে আমরা নারায়ণ শিলা বলে থাকি। এটি তো নেহাতই একটি ছোট পাথরের টুকরো মাত্র। কিন্তু অনেকেই এই ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডটিকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করে থাকেন। এইসব উপাসকের কাছে এটি কেবলমাত্র পাথরের নুড়ি নয়, স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁরা কোন পাথরের নুড়ির পূজা করেন না, এই নুড়ির আড়ালে তাঁদের আরাধ্য দেবতারই পূজা করে থাকেন। এই পাথরের নুড়িটি তাঁদের আরাধ্য দেবতার

প্রতীক। যেহেতু ঈশ্বর সর্বত্র রয়েছেন এবং তিনিই সবকিছু হয়েছেন সেহেতু যে কোন কিছুই ঈশ্বরের প্রতীক হতে পারে।

'অউম্'কে ব্রহ্মের উপযুক্ত প্রতীক বলে মনে করা হয়। সবকিছু যেমন ব্রহ্মের অন্তর্গত ঠিক তেমনি সমগ্র ধ্বনিজগৎ 'অউম্'-এর অন্তর্গত। মুখবিবরের যেখান থেকে কোন শব্দ নির্গত হয় সেইসব অঞ্চলকে স্পর্শ করেই 'অউম্' উচ্চারিত হয়ে থাকে। সেজন্যই 'ওম্'কে শব্দব্রহ্ম বলা হয়, যা ব্রহ্মের প্রতীক। হিন্দুমতে, এই 'ওম্' শব্দটি খুবই পবিত্র। প্রতীকের দিক থেকে এই 'ওম' বেদের সমান। উপনিষদ বলছেন 'ওম্ এবং ব্রহ্ম' এক ও অভিন্ন। সমগ্র ধ্বনিজগতের আশ্রয় হল 'ওম্' তেমনি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আশ্রয় হল ব্রহ্ম। জ্ঞানের দ্বারা যখন আমরা এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি তখন থাকে কেবলমাত্র 'অউম্' বা 'ব্রহ্ম'। এ যেন ভুল ভাঙলে আমরা যেমন আবিষ্কার করি সেখানে সাপ বলে কিছু নেই, আছে কেবলমাত্র দড়ি।

এখন প্রশ্ন হল 'অউম্'কে ধ্যান করব কেমন করে? প্রথমে আমাদের 'বিরাটের' ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নিরন্তর এই চিন্তা করতে হবে—আমি ও বিরাট এক ও অভিন্ন। ব্রহ্মের সমষ্টি-শরীর হল এই বিরাট। 'অউম্'-এর 'অ' বর্ণটি হচ্ছে বিরাটের প্রতীক। তারপর স্বপ্নাবস্থায় আমাদের ব্রহ্মের সমষ্টি-মন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে। 'অউম্'-এর 'উ' বর্ণটি হিরণ্যগর্ভের প্রতীক। সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের মায়াযুক্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে থাকতে হবে। 'ম্' বর্ণটি হল ঈশ্বরের প্রতীক। এই অবস্থাতেও আমাদের অজ্ঞানতা পুরোপুরি থাকে। আমরা যদি এই তিন অবস্থার ঊর্ধ্বে যেতে পারি তখন আমরা শুদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় অবস্থার সাথে একাকার হয়ে যাই। আমরা তখন 'অমাত্র' অর্থাৎ সব দুই বোধের পারে চলে যাই। আমরা তখন ব্রহ্মই হয়ে যাই।

'অউম্' এইভাবেই আমাদেরকে জীবনের চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা তো সবসময়ই ব্রহ্ম। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক আমরা এ সম্পর্কে সচেতন নই। কিভাবে এই অজ্ঞানতাকে দূর করা যায়? তার একটি উপায় হল—'আমি ব্রহ্ম' একথা সবসময় চিন্তা করা। জাগ্রত অবস্থায় যদি আমরা এই চিন্তায় বিভোর থাকতে পারি তবে সেই ছাপ আমাদের স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেও পড়ে। এবং ক্রমে সেটাই আমাদের তুরীয় অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

আগম প্রকরণ

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥১

অন্বয়: ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ (ওম্ এই বিশেষ অক্ষরটি); ইদং সর্বম্ (এই সমস্ত); তস্য উপব্যাখ্যানম্ (এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল); ভূতম্ (অতীতকাল); ভবৎ (বর্তমানকাল); ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যৎকাল); ইতি সর্বম্ ওঙ্কারঃ এব (এই সমস্ত ওঁকার ছাড়া আর কিছু নয়); যৎ চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ (যদি এই ত্রিকালের ঊর্ধ্বে কিছু থাকে); তৎ অপি ওঙ্কারঃ এব (সেও ওঁকার)।

সরলার্থ: 'ওম্' ব্রহ্মের প্রতীক, কার্য ও কারণ উভয়ই ব্রহ্ম। এই দৃশ্যমান জগৎও হচ্ছে ওম্। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যা কিছু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই সবই ওঁকার। এই ত্রিকালের অতীতও যদি আর কিছু থাকে তবে তাও ওঁকার।

ব্যাখ্যা: উপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই সবই ওম্'। আমরা অনেকেই 'ওম্' প্রতীকটির সঙ্গে পরিচিত। এটি ব্রহ্মের প্রতীক তাই এই প্রতীককে অতি পবিত্র বলে মনে করা হয়। কখনো কখনো ওম্‌কে বলা হয় নাদব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। কারণ সমগ্র ধ্বনিজগৎ এই শব্দটির অন্তর্গত। ওম্ শব্দটি তিনটি বর্ণের সমষ্টি, অ-উ-ম। 'অ' বর্ণটি প্রধানস্বর। এই ধ্বনিটি গলদেশের পশ্চাদ্ভাগ থেকে নির্গত হয়। 'ম' হল অন্তস্বর। এটি ওষ্ঠ্যবর্ণ এবং ঠোঁট বন্ধ অবস্থায় উচ্চারিত হয়। 'উ' হল অন্তর্বর্তী স্বর। শব্দ দিয়ে আমরা কোন বস্তুকেই বুঝি। এবং ওম্ হচ্ছে সকল ধ্বনির প্রতীক। সুতরাং এই ও-ই ব্রহ্ম। সবকিছুর অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রতীকই হচ্ছে ওম্।

'ইদম্' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইদম্ কথাটির অর্থ 'এই' অর্থাৎ যা কিনা আমাদের সামনেই রয়েছে। 'এই' বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎকে বোঝায়। এই জগৎকেই আমরা অনুভব ও স্পর্শ করতে পারি। ওঁকারই হচ্ছে 'ইদম্' তথা দৃশ্যমান জগতের প্রতীক।

ব্রহ্মই অক্ষর, কারণ এতে কোন ক্ষর বা ক্ষয় নেই। ব্রহ্ম অবিনাশী, যার সৃষ্টি আছে তার নাশও আছে, যার জন্য আছে তার মৃত্যুও আছে। কিন্তু যার সৃষ্টি হয়নি তা অবিনাশী। একমাত্র ব্রহ্মই সৃষ্ট নন। ইনি নিরপেক্ষ এবং ইনি সবসময়ই রয়েছেন। এঁর ক্ষয় নেই, মৃত্যু

নেই। ইনি অবিনাশী। ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন, রূপটা বদলায় কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন।

এই 'ওম্'-এর মধ্যেই অতীত (ভূতম্), বর্তমান (ভবৎ), এবং ভবিষ্যৎ। ওম্-ই অতীত, ওম্-ই বর্তমান আবার ওম্-ই ভবিষ্যৎ। শুধু তাই নয় ত্রিকালাতীত বলেও যদি কিছু থাকে তাও এই ওম্-এর অন্তর্গত। 'ত্রিকালাতীতং' বলতে বোঝায় যা তিন কালের ঊর্ধ্বে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এ সবই আপেক্ষিক শব্দমাত্র। 'ত্রিকালাতীতং' মানে যা নিত্যসত্য। আমরা দেশ-কালদ্বারা সীমাবদ্ধ। যখন আমরা কোন ব্যক্তির কথা বলি তখন কোন নির্দিষ্ট দেশ-কালের সাপেক্ষে তার উল্লেখ করি। ব্রহ্ম কিন্তু দেশ-কালের ঊর্ধ্বে। ব্রহ্ম দেশাতীত ও কালাতীত। আর তিনিই ওম্ (তৎ অপি ওঙ্কারঃ এব)।

ঈশ্বর সর্বত্র এবং তিনি সকলের মধ্যে বিরাজিত। যদিও তিনি সর্বব্যাপী তবুও একটি ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডও তাঁর প্রতীক হতে পারে। শিলাখণ্ডের মধ্য দিয়েও মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরকেই উপাসনা করে। একইভাবে, ওম্ ব্রহ্মের প্রতীক। ওম্-কে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে ধ্যান করলে তা ব্রহ্মকেই ধ্যান করা হল।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥২

অন্বয়: সর্বং হি এতৎ ব্রহ্ম (এই সকলই ব্রহ্ম); অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মাও ব্রহ্ম); সঃ অয়ম্ আত্মা চতুষ্পাৎ (এই আত্মার চারটি অবস্থা)।

সরলার্থ: সমগ্র জগৎই ব্রহ্ম। এই জীবাত্মাও ব্রহ্ম। আপাতদৃষ্টিতে এই আত্মার চারটি অবস্থা।

ব্যাখ্যা: 'সর্বং হি এতৎ ব্রহ্ম'—যা কিছুর অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ এই সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা এই জড় জগৎকে উপলব্ধি করতে পারি। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবুও তাদের অস্তিত্ব আছে। আবার এমনও জিনিস আছে যা সূক্ষ্মভাবে মনে বিদ্যমান। সেটাও একরকমের অস্তিত্ব। উপনিষদে বলা হয়েছে সকল অস্তিত্ব অর্থাৎ সকল বস্তুই ব্রহ্মের অন্তর্গত। এইজন্যই ব্রহ্মকে বলা হয় 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। 'সৎ' কথার অর্থ হল 'যা আছে'। ব্রহ্ম স্বয়ং এই অস্তিত্ব।

উপনিষদে বলা হয়েছে জীব ও জগৎ এক। 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'—জীবাত্মাই ব্রহ্ম। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এক এবং অভিন্ন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (2।৮।৫) বলা হয়েছে 'সঃ যঃ চ অয়ং পুরুষে যঃ চ অসৌ আদিত্যে'—যিনি এই দেহের ভেতরে রয়েছেন তিনিই সূর্যে বর্তমান। এই সেই একই আত্মা, একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রয়েছেন। এ এক চমৎকার ধারণা, কিন্তু আয়ত্ত করা কঠিন। তবুও একই কথাই উপনিষদ বারবার বলছেন। তুমিই ব্রহ্ম কিন্তু তুমি

জান না যে তুমি ব্রহ্ম। তুমি তোমার দেহটাকেই 'তুমি' মনে করেছ। ধর, যে জামাটা তুমি পড়ে আছ সেটা কি তুমি? অবশ্যই তা নয়। তুমি তোমার জামাটাকে পালটাতে পার কিন্তু তাতে তোমার কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক একইভাবে দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র, কিন্তু আত্মা সবসময়ই অপরিবর্তনীয় ও নিত্যসত্য।

এই আত্মা চতুষ্পাদ্ও বটে। আক্ষরিকভাবে 'চতুষ্পাদ্' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'চারটি পা যুক্ত', যেমন গরু। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ 'চারটি অবস্থা'। একই ব্রহ্মকে চারটি অবস্থায় দেখা যায়। প্রথম অবস্থা হচ্ছে 'বিশ্ব'—স্থূল জাগতিক অবস্থা। যখন আমরা জেগে থাকি তখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা এই জগৎকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। কিন্তু যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমাদের কাছে এই জগতের অস্তিত্ব থাকে। তখন মনের দ্বারা এই জগৎকে উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মের এই অবস্থাকে বলা হয় 'তৈজস'। এই অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি যে আমরা কোন কিছু খাচ্ছি বা কোথাও গেছি বা কোন কাজ করছি। এর পরবর্তী অবস্থা হল 'সুষুপ্তি' তথা গভীর নিদ্রার অবস্থা। এই অখণ্ড চৈতন্যের অবস্থাকে বলা হয় 'প্রাজ্ঞ'। ঘন অন্ধকারে যেন তখন মনের সব বৈচিত্র লোপ পায়। তবুও সুষুপ্তি ভাঙার পর আমরা খুব সতেজ বোধ করি। এর পরেও আছে আর এক অবস্থা—'তুরীয় অবস্থা'। এটিই ব্রহ্মের চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা চৈতন্যের সাথে এক হয়ে যাই। তখন আমরা ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা অনুভব করি।

এখন উপনিষদে ব্রহ্মের এই চারটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবেরও কি পরিবর্তন হয়? না। সেই একই জীব কখনো জেগে আছে, কখনো বা স্বপ্ন দেখছে, কখনো আছে সুষুপ্তিতে, আবার কখনো বা সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে আছে। এই জগৎ বৈচিত্রপূর্ণ। এ জগতে আমরা নানারকম পরিবর্তন দেখতে পাই, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যসত্য। ব্রহ্ম সবসময়ই এক ও অভিন্ন, অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয়। জীবের যেমন চারটি অবস্থা তেমনি ব্রহ্মেরও এই চারটি অবস্থা। কিন্তু উভয়ই ব্রহ্ম, ব্যষ্টি ও সমষ্টি এক ও অভিন্ন। এ সকল অবস্থাই ব্রহ্মের অন্তর্গত। ব্রহ্মের মধ্যেই এই সমগ্র জগৎ। এর জন্যই উপনিষদ বলছেন, 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম।

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ
স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।।৩

অন্বয়: জাগরিতস্থানঃ বহিঃ প্রজ্ঞঃ (যখন জাগ্রত ও বাহ্যজগৎ সম্পর্কে সচেতন); সপ্তাঙ্গঃ (সাতটি অঙ্গবিশিষ্ট); একোনবিংশতিমুখঃ (উনিশটি মুখযুক্ত); স্থূলভুক্ ([শব্দাদি] স্থূলবিষয়ের ভোক্তা [উপভোগকারী]); বৈশ্বানরঃ (বিশ্বরূপ-পুরুষ); প্রথমঃ পাদঃ ([এটি তাঁর] প্রথম প্রকাশ)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় আমরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতন এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা এই জগৎকে উপলব্ধি করি। যাঁর সাতটি অঙ্গ এবং উনিশটি উপলব্ধির দ্বারা জীব হিসাবে তিনিই এই স্থূলদেহ ভোগ করেন। এটিই আত্মার প্রথম প্রকাশ।

ব্যাখ্যা: আমাদের প্রথম অবস্থা হচ্ছে জাগ্রত। এই অবস্থায় আমরা বাহ্যজগৎ (বহিষ্প্রজ্ঞ) সম্পর্কে সচেতন এবং এই স্থূলজগৎকে (স্থূলভুক্) উপভোগ করি। বৈশ্বানর কথাটির অর্থ হল বিশ্ব এবং নর, অর্থাৎ সমগ্র জীবজগৎ। সকল জীবেরই জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা আছে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা এই জগৎকে অনুভব করি এবং উপভোগ করি। কিভাবে? আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। উপনিষদে বর্ণিত সপ্তাঙ্গগুলি হল—মস্তক, চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, দেহ, মূত্রাশয় ও পদযুগল। এরপর আছে উনিশটি অঙ্গ—একোনবিংশতি। 'এক' কথার অর্থ এক, 'ঊন' শব্দটির অর্থ কম, 'বিংশতি' অর্থ কুড়ি। কুড়ি থেকে এক কম অর্থাৎ উনিশ। প্রথম হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), তারপর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু), এরপর হচ্ছে পঞ্চ প্রাণ—অর্থাৎ পাঁচটি প্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান) এবং সবশেষে আসছে অন্তঃকরণের চারটি অবস্থা (মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার)। এই বিষয়গুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপনিষদ শুধু এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে এই জগৎকে আমরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই ভোগ করে থাকি। জাগ্রত অবস্থায় আমরা স্থূলভুক্ অর্থাৎ স্থূলজগৎকে ভোগ করি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষণীয়।

জীব হিসাবে আমরা 'বিশ্ব', কিন্তু সমষ্টি জীবকে বলা হয় 'বিরাট'। জীবাত্মা হল ব্যষ্টি আর পরমাত্মা হল সমষ্টি। বিরাট হল সমষ্টিগত স্থূলশরীর, অর্থাৎ স্থূলদেহের সমষ্টি। এই ব্যষ্টি আর সমষ্টি হচ্ছে এক এবং অভিন্ন—এটাই হল বেদান্তের মূল কথা। সমগ্র জগতে একটিমাত্র সত্তাই বিরাজিত। এই জগতে আমরা যে পার্থক্য দেখি তা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা সমগ্র জগতের সাথে এক, এ তত্ত্ব আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। জীবাত্মা হিসাবে আমি সচেতন। আমি জানি যে আমার একটি মাথা, দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা ইত্যাদি আছে। কিন্তু উপনিষদ বলছেন যে, তুমি জীবাত্মা নও, পরমাত্মা। এটিই উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে আচার্য শঙ্কর এক উদ্ধৃতি দিয়ে পরমাত্মার সম্বন্ধে বলছেন : দ্যুলোক তাঁর মস্তক, সূর্য তার চোখ, বায়ু তাঁর প্রাণ, সমগ্র আকাশ তাঁর

দেহ, জগতের জলরাশি তাঁর মূত্রাশয়, পৃথিবী তাঁর পদযুগল, অগ্নি তাঁর মুখ। অগ্নিকে মুখ বলা হয়েছে তার কারণ আগুন সবকিছুকে নাশ করে। মূল কথাটি হল—এই জগৎও সেই এক অখণ্ড সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়। একথা কখনই ভাববে না যে এ জগৎ থেকে তুমি আলাদা। যখন তুমি জেগে আছ তখন এই জগৎকে দেখতে পাচ্ছ এবং তুমি তোমাকেও দেখতে পাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি স্থূলরূপে ব্রহ্মকেই দেখছ। উপনিষদে বলা হয়েছে এটিই 'প্রথমঃ পাদঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, আমরা এই বাইরের জগৎকে দেখতে পাই এবং এই জগৎ থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করি। কেন? শঙ্করের মতে এটি অবিদ্যাকৃত অর্থাৎ এ অবিদ্যার ফলস্বরূপ। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমরা যে জগৎকে দেখি তার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। যদি বলা হয় এই টেবিলটির পৃথক অস্তিত্ব আছে তবে ভুল করা হবে। ব্রহ্ম আছেন বলেই টেবিলটি আছে। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের এটাই হল সারকথা। যে কোন কারণেই হোক এই একত্ববোধ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। শঙ্কর বলছেন সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক আত্মা বিরাজমান। পুরুষ, নারী, শিশু, পশু, উদ্ভিদ এ সবই সেই এক আত্মা। এই জগৎ-প্রপঞ্চ হচ্ছে বিভিন্ন পরিমাণে পঞ্চভূতের (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী) সমাবেশমাত্র। যখন এই পঞ্চভূত অর্থাৎ উপাদানগুলিকে তাদের মূল অবস্থায় (উপশম) ফিরিয়ে দেওয়া যায় তখনি একাত্মতা (অদ্বৈতসিদ্ধি) অনুভূত হয়। বর্তমান উপনিষদ আমাদেরকে ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। সমস্ত উপনিষদগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যই হচ্ছে এই একত্ব অনুভূতি।

বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, এই জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত। আমরা বিভিন্ন নাম-রূপের এই জগৎকে দেখি। কিন্তু এই নাম-রূপ সরিয়ে নিলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? একমাত্র ব্রহ্ম। অজ্ঞানতার ফলে আমাদের কাছে এই নাম-রূপ সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এগুলি সত্য নয়। বেদান্তমতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, গুণবর্জিত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নিরপেক্ষ এবং উপাধিবর্জিত (নিরুপাধিক)। উপাধিমাত্রই গুণ। যেমন অনেকেই বলেন ঈশ্বর দয়ালু কিন্তু একথা বলে তাঁকে যেন সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। কোন্ অর্থে? ঈশ্বর দয়ালু বললে বোঝানো হয় তিনি নির্দয় নন। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, অখণ্ড। দৈর্ঘ্য, বয়স ইত্যাদির সাহায্যে আমরা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা করতে পারি। কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছেন সবকিছুর আধার। ব্রহ্ম আছেন বলেই সবকিছু আছে। তাই ব্রহ্মকে কোন কিছুর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

নির্গুণ ব্রহ্মে মায়া প্রকাশিত হলে তখন তা হল ঈশ্বর। কোথা থেকে আসে মায়া? মায়া ব্রহ্মের ভেতরেই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যে ব্রহ্ম আর মায়া যেন অগ্নি আর তার

দাহিকাশক্তি। আমরা কি অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তিকে আলাদা করতে পারি? না। সেইরকম ব্রহ্ম আর মায়াকেও পৃথক করা যায় না। ব্রহ্মে মায়া প্রকাশিত হলে ব্রহ্মই হন ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সাপের উপমা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। একটি সাপ মাটিতে ঘুমিয়ে আছে, তখন সাপটি নিষ্ক্রিয়। ঘুম ভাঙার পর যখন সাপটি ফণা তুলল তখন সাপটি সক্রিয়। কিন্তু দুটি অবস্থাতেই একই সাপ বিদ্যমান। একইভাবে ঈশ্বরই মায়া। সক্রিয় ব্রহ্মই হচ্ছেন ঈশ্বর। এখানে ঈশ্বর শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐশ্বর্য শব্দটি ঈশ্বর থেকেই এসেছে। ঐশ্বর্য কথার অর্থ হল সম্পদ, শক্তি। যাঁর ঐশ্বর্য আছে তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্যটি লক্ষণীয়। ব্রহ্মকে কেউই বর্ণনা করতে পারে না। ব্রহ্ম সম্পর্কে আমরা কোন কিছুই বলতে পারি না যে 'ব্রহ্ম এই বা ব্রহ্ম সেই'। কিন্তু মায়াযুক্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ সক্রিয় ব্রহ্মই হলেন ঈশ্বর। সৃষ্টির আদিতে ছিল হিরণ্যগর্ভ। এই জগৎ হিরণ্যগর্ভে সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিল। তখন আমরাও সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিলাম। এই হিরণ্যগর্ভেরই প্রথম স্থূল প্রকাশ হচ্ছে বিরাট।

এখানে উপনিষদও একই বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ক্রমবিন্যাসটি বিপরীত, স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে। জীবাত্মা উত্তরোত্তর ব্রহ্মের নিকটবর্তী হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। ব্রহ্মের প্রথম অবস্থাই হচ্ছে 'বিরাট' অর্থাৎ এই জড়জগৎ, ব্যষ্টির কাছে যা বিশ্ব। অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা জেগে আছি। বিরাটকে আমাদের জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? জেগে না থাকলে আমরা এই জগৎকে দেখতে পাই না। আমাদের কাছে এ জগতের অস্তিত্ব যখন আমরা জেগে থাকি। পরবর্তী অবস্থা হল হিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টির নিকট যা 'তৈজস'। এই অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন এই জগৎ অতি সূক্ষ্মরূপে আমাদের মনে অবস্থান করে। এরপর হচ্ছে গভীর নিদ্রার অবস্থা (সুষুপ্তি)। তখন মানুষের দেহ-মন কোন কাজ করে না, এমনকি মানুষ তখন স্বপ্নও দেখে না। এই অবস্থায় মানুষ শান্তি লাভ করে এবং সুষুপ্তি ভাঙার পর খুব সতেজ বোধ করে। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে এটাই 'প্রাজ্ঞ' এবং সমষ্টির ক্ষেত্রে এটাই 'ঈশ্বর'। সমাধি অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যায়, তখন জীবই ব্রহ্ম। 'যঃ ব্রহ্ম বেদ সঃ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। এই অবস্থায় জীব পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। তাই উপনিষদ বলছেন যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি এক ও অভিন্ন। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—জীবাত্মা ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়। জীব যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম না হয় তবে সে কোন দিন ব্রহ্ম হতে পারবে না। আমাদের প্রকৃত স্বরূপই হচ্ছে ব্রহ্ম। এই কথাটিই উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন। উপনিষদ এখানে ব্রহ্মের এই চারটি অবস্থার সাথে জীবের এই চারটি অবস্থা যুক্তির দ্বারা তুলনা করে বোঝাতে চাচ্ছেন।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমূখঃ
প্রবিবিক্তভুক্তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪

অন্বয়: স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃ প্রজ্ঞঃ (যখন তুমি ঘুমিয়ে আছ [স্বপ্ন দেখছ] তখন যা কিছু তুমি দেখছ বা করছ, তা তোমার মনের ব্যাপার); সপ্তাঙ্গঃ (সাতটি অঙ্গ); একোনবিংশতিমুখঃ (উনিশটি মুখ [যখন তুমি জাগ্রত অবস্থায় ছিলে]); প্রবিবিক্তভুক্ ([কিন্তু] যদি তুমি কিছু ভোগ কর, তুমি তা কর মনের দ্বারা [স্থূলবস্তু নেই সেখানে]); তৈজসঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (এই মানসিক অভিজ্ঞতার অধিপতিই হচ্ছে [ব্রহ্মের] দ্বিতীয় অবস্থা)।

সরলার্থ: আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমরা যা কিছু করি সেসবের অস্তিত্ব আমাদের মনে। স্বপ্ন বাহ্যবিষয়-বিহীন। এটা পুরোপুরি মনের ব্যাপার। স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের বাসনা ও পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। জাগ্রত অবস্থার মতো স্বপ্নবস্থাতেও আমাদের সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি ইন্দ্রিয় অটুট থাকে, কিন্তু তখন আমরা যা কিছু কাজ করি মনের দ্বারা। এ অবস্থায় বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই মানস অভিজ্ঞতার অধিপতি হল (ব্রহ্মের) দ্বিতীয় অবস্থা।

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় অবস্থা হল 'স্বপ্নস্থানঃ'। সংস্কৃতে 'স্বপ্ন' কথাটির অর্থ নিদ্রা। এই অবস্থায় আমাদের জ্ঞান অন্তর্মুখী, অর্থাৎ মনোগত (অন্তঃপ্রজ্ঞ), মনের সৃষ্টি। স্বপ্নে আমরা অনেক কিছু দেখি, অনুভব করি এমনকি শুনতেও পাই, কিন্তু এ সবই মনের কল্পনা। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করি স্বপ্নে আমরা তাই দেখতে পাই। আচার্য শঙ্কর বলেন যে মনের এই সক্রিয়তা কোন বাহ্যবস্তুর দ্বারা প্রভাবিত নয়। তিনি বলছেন মন যেন একটি কাপড়ের টুকরো যাতে ছবি আঁকা হয়েছে। এই একই কথা আমরা পাই 'গীতা' এবং স্বামীজীর 'কর্মযোগে'ও। শারীরিকভাবেই হোক অথবা মানসিকভাবেই হোক আমরা যখন কোন কাজ করি তখন মনের ওপর তার একটা ছাপ পড়ে, যেন মনের ওপর একটা ছবি আঁকা হয়েছে। ধরা যাক আমি কারও ওপর রাগ করেছি এবং তাকে আমি আঘাতও করতে চাই। কিন্তু ব্যক্তিটি আমার চেয়ে শক্তিশালী তাই তাকে আমি আঘাত করতেও সাহস পাচ্ছি না, তখন আমি তাকে মনে-মনেই আঘাত করি। হিন্দুমতে এইরকম মনে-মনে আঘাত করাও সমভাবে নিন্দনীয়। উপনিষদ বলছেন যে, তুমি তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই কোন কাজ কর অথবা মনের দ্বারাই কোন কাজ কর, তার ফলে তুমি কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তোমার মনের ওপর তার একটা ছাপও পড়বে। সৎ চিন্তা বা অসৎ চিন্তা যে চিন্তাই কর না কেন মনের ওপর তার একটা ছাপ পড়ে। এই ছাপগুলিই পরে স্বপ্নে প্রকাশিত হয়।

এই উপনিষদের পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, জাগ্রত অবস্থায় আমরা 'স্থূলভুক্' অর্থাৎ এই জড়জগতের ভোক্তা। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে স্বপ্নাবস্থায় আমরা 'প্রবিবিক্তভুক্'—সূক্ষ্মবিষয় ভোগ করি অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা কিছু করি সে সমস্ত বাসনা ও স্মৃতি আমাদের মনের ওপরে একটা ছাপ ফেলে, সেগুলিই স্বপ্নে ধরা পড়ে। 'প্রবিবিক্ত' বলতে আসলে বোঝায় অনাসক্তি বা স্বতন্ত্রতা। এই অবস্থায় কোন স্থূলদেহের প্রয়োজন হয় না। কখনো কখনো স্বপ্নে আমাদের মনের অপূর্ণ কামনা-বাসনার পূর্তি হয়। 'প্রবিবিক্তভুক্' কথাটির অর্থ 'বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্য'—আমরা কামনা করি এবং এই কামনার দ্বারাই আমাদের উপভোগ হয়। এই ভোগ মনোগত, শারীরিক নয়। এই মনোগত অভিজ্ঞতার অনুরূপ কোন কিছু বাহ্য জগতে নেই। এই অবস্থায় মনের দ্বারাই ভোগ করা হয়। আমাদের কামনা-বাসনা ও অতীত অভিজ্ঞতার ছাপই হল স্বপ্ন।

'তৈজস্' কথাটির অর্থ হল আলো বা চৈতন্য। চৈতন্যকে প্রায়ই আলোর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। 'তৈজস্' বলতে মনোগত চৈতন্যকে বোঝায়। তৈজস্ হল দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি
তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো
হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞতৃতীয়ঃ পাদঃ॥৫

অন্বয়: যত্র সুপ্তঃ (যখন তুমি স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় মগ্ন); ন কঞ্চন কামং কাময়তে (তোমার মনে কোন কামনা-বাসনা থাকে না); ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি (তখন তুমি স্বপ্নও দেখ না, এই অবস্থায় মনের ক্রিয়াও থাকে না); তৎ সুষুপ্তম্ (একেই বলা হয় সুষুপ্তি); সুষুপ্তস্থানঃ (যখন তুমি সুষুপ্তিতে থাক); একীভূতঃ (একাত্ম বোধ, অর্থাৎ মন আত্মার সাথে মিলিত; প্রজ্ঞানঘনঃ এব (এক ঘনীভূত চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না); আনন্দময়ঃ (আনন্দে পূর্ণ); হি আনন্দভুক্ (আনন্দ উপভোগ কর); চেতোমুখঃ (তুমি তুরীয়ের [জ্ঞানের] নিকটবর্তী); প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ (এই প্রাজ্ঞ, আত্মার তৃতীয় অবস্থা)।

সরলার্থ: যখন তুমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাক তখন তোমার মনে কোন কামনা-বাসনা থাকে না এবং তখন তুমি স্বপ্নও দেখ না; মন নিষ্ক্রিয় থাকে। একেই বলে সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় তুমি বস্তু সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বিষয় বা কোন দ্বৈত দৃষ্টি থাকে না। তখন শুধুই এক দেখা যায়। কিন্তু এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না। এ

যেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া, যেখান থেকে আবার স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। এটাই প্রাজ্ঞ—আত্মার তৃতীয় অবস্থা।

ব্যাখ্যা: পরবর্তী অবস্থা সুষুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রার অবস্থা। মনও তখন কোন কাজ করে না, সম্পূর্ণভাবে স্থির থাকে। তখন মনে কোন কামনা-বাসনা, কোন স্বপ্ন বা কোন চিন্তা থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় কি হয়? 'একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন'—তখন থাকে শুধুমাত্র চৈতন্য, যা অখণ্ড, নির্বিশেষ। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য থাকে তাকে আলাদা করা যায়। স্বপ্নে আমরা মানুষ, জীব, ইত্যাদি বহু জিনিস দেখি। কিন্তু এসবের অস্তিত্ব আমাদের মনে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্থূলজগৎকে অনুভব করি। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে শুধুই নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য। আমাদের মধ্যে এই চৈতন্য সবসময় বিরাজিত। কখনো এই চৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করে জাগ্রত অবস্থায়, কখনো স্বপ্নে, কখনো বা সুষুপ্তিতে। এই চৈতন্য একটি দীপের মতো, যা সবসময় জ্বলছে, তা কারও কাজে লাগুক বা না লাগুক। চৈতন্য সদা বিরাজমান এবং অপরিবর্তিত।

সুষুপ্তি অবস্থাটি ঠিক কেমন তা বোঝাবার জন্য আচার্য শঙ্কর সুষুপ্তিকে অন্ধকার রাত্রির সাথে তুলনা করেছেন। সেখানে চাঁদের আলো নেই, সবকিছু অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আর এই অন্ধকারে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুকে পৃথক করাও সম্ভব নয়। শুধু বোঝা যায় সেখানে কিছু একটা রয়েছে। কিন্তু এই সুষুপ্তি ভাঙার পর আমরা খুব সতেজ বোধ করি।

এখন এই সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি না এবং আমাদের মন এবং বহিরিন্দ্রিয় তখন কোন কাজ করে না। তবে চৈতন্য যে তখনও থাকে তা আমরা জানতে পারি কিভাবে? কারণ নিদ্রাভঙ্গে আমরা বলে থাকি 'আঃ কী গভীর ঘুমিয়েছি?' অর্থাৎ এই অবস্থায় আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি সচেতন। সুষুপ্তিতে এই চৈতন্য কোথায় ছিল? এই চৈতন্য আমারই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। বাইরে তার স্পষ্ট অস্তিত্ব ছিল না। মূল কথাটি হল, এই সাম্য অবস্থা থেকে স্থূলজগতে ফিরে আসতে হলে সাম্য অবস্থায় বিক্ষেপ সৃষ্টি করতে হবে। কে এই কার্যটি করে? এই কাজের কর্তা হল মায়া বা অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা। এই সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা চৈতন্যে লীন হয়ে থাকে। তখন আমরা চৈতন্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কেন আবার আমরা এই জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসি? কে আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে? তা হল অবিদ্যা, অর্থাৎ অজ্ঞানতা।

সুষুপ্তিকে বলা হয় 'চেতোমুখঃ', যা আত্মা এবং জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী দ্বার। আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে, এই 'চেতোমুখঃ' যেন দণ্ডায়মান প্রহরী। আমাদের সকলের মধ্যে

চৈতন্য রয়েছে। যখন এই মধ্যবর্তী দ্বার খুলে যায় তখন এই চৈতন্য জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে—যেন জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্য দিয়ে এই চৈতন্য বয়ে চলেছে। সুষুপ্তিতে কোনও দ্বৈতভাব নেই, আছে কেবলমাত্র 'এক' অনুভূতি।

উপনিষদ বলছেন সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা 'আনন্দভুক্' অর্থাৎ আনন্দ ভোগ করি। এই অবস্থায় আমরা পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে থাকি। কেন? কারণ মন তখন নিষ্ক্রিয়। এই অবস্থায় মন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রাখে এবং পূর্ণ বিশ্রামে থাকে। কখনো কখনো ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাদের মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। যদিও আমরা মনে করি যে আমরা ঘুমিয়ে আছি কিন্তু জেগে উঠে আমরা বিশ্রামের স্নিগ্ধতা অনুভব করি না। নিদ্রাকালে মন ইতস্ততভাবে ঘুরে বেড়ায়—সংকল্প-বিকল্প। মনের স্বভাবই হচ্ছে এই। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকি কারণ সেখানে মনের কোনও প্রভাব থাকে না (অনায়াস-রূপ)।

এখানে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর আরও দু-একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সুষুপ্তিকালে আমরা যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করি তা আত্যন্তিক আনন্দ নয়। অর্থাৎ তা চিরস্থায়ী আনন্দ নয়। এই আপেক্ষিক আনন্দের অস্তিত্ব সাময়িক। এই অবস্থাতেও মানুষ অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত নয়। ঘুম ভাঙার পর আবার আমরা এই দৃশ্যমান জগতের নানা সংগ্রামের মুখোমুখি হই। তাই আমরা কখনো সুখী আবার কখনো দুঃখী। কিন্তু আত্যন্তিক আনন্দ চিরস্থায়ী যা সদা অপ্রতিহত। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিই কেবলমাত্র এই আত্যন্তিক আনন্দ লাভ করে থাকেন।

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এযোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ
সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥৬

অন্বয়: এষঃ (এই [প্রজ্ঞা]); সর্বেশ্বরঃ (সকলের অধিপতি); এষঃ সর্বজ্ঞঃ (তিনি সর্বজ্ঞও); এষঃ (এই [প্রজ্ঞা]); অন্তর্যামী (সকলের অন্তরস্থ আত্মা); হি (সুতরাং); [এষঃ (এই) প্রজ্ঞা]; ভূতানাম্ ([বর্ধনশীল ও বিনাশী] সকল জীবের); প্রভব-অপ্যয়ৌ (জন্ম এবং মৃত্যু); এষঃ (এই [প্রিজ্ঞা]); সর্বস্য যোনিঃ (সবকিছুর কারণ)।

সরলার্থ: এই প্রজ্ঞা সকল বস্তুর অধীশ্বর। ইনি সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্যামী। সকল বস্তু এঁর থেকে উৎপন্ন হয়ে এঁতেই লীন হয়। ইনিই সবকিছুর কারণ।

ব্যাখ্যা: এই প্রজ্ঞা অর্থাৎ আত্মাকে সর্বেশ্বর বলা হয়, যিনি সকলের অধীশ্বর এবং নিয়ন্তা। জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি সব অবস্থাতে 'আমিই' সবকিছুর অধীশ্বর। আত্মা সকল জ্ঞানের

উৎস তাই তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত আত্মা বা অন্তর্যামী, সবকিছুর সারস্বরূপ। এই আত্মা আমার তোমার সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। ইনি সর্বত্র বিরাজিত এবং সকল বস্তুতে বিদ্যমান। এই আত্মাই 'সর্বস্য যোনিঃ' অর্থাৎ সবকিছুর কারণ ও উৎস। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মকে 'মহান প্রথম কারণ' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্ম ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

'প্রভব-অপ্যয়ৌ'—এই আত্মাই সকল বস্তুর উৎপত্তি (প্রভব) এবং বিনাশের (অপ্যয়) জন্য দায়ী। জন্ম ও মৃত্যুর জন্যও ইনিই দায়ী। মৃত্যুর পর আমরা যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই ফিরে যাই অর্থাৎ আত্মাতেই প্রত্যাবর্তন করি। এ অনেকটা জলবুদ্বুদের মতো। একটি বুদ্বুদ, সেটিকে যদি আমরা আঘাত করি তাহলে বুদ্বুদটি কোথায় যায়? বুদ্বুদটি জলেই মিশে যায়। একইভাবে সকল প্রাণী (ভূতানাম্), সকল বস্তু একই উৎস থেকে আসে, আবার সেই উৎসেই ফিরে যায়।

উপনিষদ বলছেন যে, পরম সত্য এক। নাম-রূপের পার্থক্যের দরুন সেই এককেই আমরা বহু দেখি, কিন্তু এই বৈচিত্র ক্ষণস্থায়ী। প্রশ্ন হল, কেমন করে বুঝব যে আমিই সেই পরম সত্য? বেদান্ত বলেন, তুমি কি তোমার নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাসী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রত্যেকেই বলব, হ্যাঁ। বেদান্ত বলছেন, যদি তোমার নিজের অস্তিত্ব থাকে এবং পরম সত্য বলতে সেই এক ও অভিন্ন সত্তাকেই বোঝায় তাহলে সেই পরম সত্য থেকে তুমি কখনো নিজেকে তালাদা করতে পার না। তুমি তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি সেই পরম অস্তিত্বের সাথে একাকার হয়ে যাও, তোমার এই অস্তিত্বের বোধ আসে কোথা থেকে? এই মুহূর্তে অবশ্য পরম অস্তিত্ব আছে এবং 'আমি' নামক সত্তাটিও আছে। কিন্তু এই পরম সত্য থেকে আমি নিজেকে পৃথক বলে মনে করি। বেদান্তমতে এ থেকেই অজ্ঞানতার শুরু। পরম সত্তা কখনো দুটি হতে পারে না। আমাদের সকলের মধ্যেই সেই একই সত্তা বিরাজমান। আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ এই ভেদদৃষ্টি। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক, একথাই উপনিষদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন।

গৌড়পাদ-কারিকা

অত্রৈতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থ এতে শ্লোকা ভবন্তি॥

পূর্বে যা বলা হয়েছে তারই ব্যাখ্যা হিসাবে এখানে কতকগুলি শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে।

(এখানেই গৌড়পাদের কারিকার সূচনা।)

বহিষ্প্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্মৃতঃ।।১

অন্বয়: বহিঃ প্রজ্ঞঃ (জাগ্রত অবস্থায় যখন মানুষ বাহ্যজগৎ সম্পর্কে সচেতন [প্রথম অবস্থা]); বিভুঃ (সর্বব্যাপী); বিশ্বঃ (বিশ্ব বলে পরিচিত); হি (নিশ্চিতরূপে); অন্তঃ প্রজ্ঞঃ (যখন মানুষ নিদ্রিত এবং সবকিছুর অস্তিত্ব মনে [দ্বিতীয় অবস্থা]); তৈজসঃ (তৈজস বলে পরিচিত); তথা (অনুরূপভাবে); ঘনপ্রজ্ঞঃ (ঘনীভূত চৈতন্য এবং চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নয়); প্রাজ্ঞঃ (এই সেই তৃতীয় স্তর যা প্রাজ্ঞ বলে পরিচিত); একঃ এব (সেই একই [আত্মা]); ত্রিধা স্মৃতঃ (তিনটি অবস্থায়)।

সরলার্থ: যখন তুমি জাগ্রত এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন তখন তুমি 'বিশ্ব' বলে পরিচিত। তখন তুমি তোমার চারপাশের সকল বস্তু দর্শন করতে সক্ষম। তুমি সর্বব্যাপী। এটিই তোমার প্রথম অবস্থা। যখন তুমি স্বপ্ন দেখ তখন তুমি তোমার মনের সম্পর্কে সচেতন। তখন তুমি 'তৈজস', এটি তোমার দ্বিতীয় অবস্থা। যখন শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র আছে, এমনকি তুমি কোন বিশেষ বস্তু সম্পর্কেও অবহিত নও, সেটাই তোমার তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ প্রাজ্ঞ। একই আত্মা তিনটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা: মানুষ জাগ্রত অবস্থায় এই বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন। তখন তাকে বলা হয় 'বিশ্ব'। গৌড়পাদ তাকে বিভু তথা সর্বব্যাপী বলে বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থায় মানুষ নিজের চারপাশের নানা জিনিস দেখে এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা অনুভব করে থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় মানুষের চেতনা বহির্মুখী (বহিঃ প্রজ্ঞঃ)। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের চেতনা অন্তর্মুখী (অন্তঃ প্রজ্ঞঃ)। তখন তাকে বলা হয় 'তৈজস'। এই অবস্থায় জীবের শারীরিক ক্রিয়া বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র মন সক্রিয় থাকে। তখন মানুষ যা-কিছু দেখে তা দেখে মনে অর্থাৎ স্বপ্নে। আবার মানুষ যখন সুষুপ্তিতে থাকে তখন সে 'প্রাজ্ঞ'। এ অবস্থায় থাকে শুধু ঘনীভূত চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্য (ঘনপ্রজ্ঞঃ)। এই অবস্থায় দেহ-মন নিষ্ক্রিয়; শুধু চৈতন্য থাকে।

গৌড়পাদ বলছেন যে তুমি সেই একই আত্মা (একঃ এব)। সংস্কৃতে 'এব' শব্দটি কোন কিছুকে জোর দিয়ে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তিনটি বিভিন্ন অবস্থাতেও তোমার মধ্যে এক আত্মা বিরাজিত। জাগ্রত অবস্থায় অথবা নিদ্রায় কিংবা সুষুপ্তিতে তুমি সেই একই জীব। এই বিভিন্ন অবস্থাসকল তোমার ওপর আরোপিত মাত্র। জামা পরিবর্তন করলে যেমন ব্যক্তির কোনও পরিবর্তন হয় না, তেমনি বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনে মানুষটির কোনও পরিবর্তন হয় না। আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আত্মা 'স্থানত্রয় ব্যতিরিক্তম্' অর্থাৎ আত্মা কোনও অবস্থার অধীন নয়। তুমি হয়তো এখন একটি ঘরে রয়েছ, কিছু সময় পরেই আবার অন্য

ঘরে চলে যাবে। এর অর্থ হল তুমি ঐসব ঘরের ওপর নির্ভরশীল নও। অনুরূপভাবে জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই তুমি সেই অভিন্ন আত্মা। তুমি শুদ্ধ এবং অনাসক্ত। শঙ্করের মতে, এইসব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও 'অহংবোধ' বর্তমান। এই অহংবোধই যোগসূত্র। শঙ্করাচার্য এক বৃহৎ মৎস্যের উদাহরণ দিয়েছেন। নদীতে সন্তরণশীল বড় মাছটি নদীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারে। তার এই সন্তরণ হচ্ছে 'যদৃচ্ছা'—অর্থাৎ মাছটি স্বাধীনভাবে একবার এপারে, আর একবার ওপারে, একবার নদীর তলদেশে, একবার উপরিভাগে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ছোট মাছকে খুব সাবধানে চলতে হয়। সে অন্যান্য বড় মাছের ভয়ে ভীত। তার গতি অবাধ নয়। কিন্তু বড় মাছটি স্বয়ংপ্রভু এবং স্বাধীন, অকুতোভয়। একইভাবে আত্মা সবকিছুর পূর্ণ পরিণতি। আত্মা কোন কিছুর অধীন নন। এটাই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ॥২

অন্বয়: বিশ্বঃ (জাগ্রত অবস্থার আত্মা যা স্থূলবস্তু প্রত্যক্ষে সক্ষম); দক্ষিণাক্ষিমুখে (এই দেখার জন্য নিজ ডান চোখ ব্যবহার করেন); তৈজসঃ (স্বপ্নবস্থায়ও সেই অভিন্ন আত্মা); মনস্যন্তঃ (স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যখন এই স্থূলজগৎকে পুনরায় উপলব্ধি করে); প্রাজ্ঞঃ হৃদি চ আকাশে (সেই একই আত্মা হৃদয়মধ্যস্থিত শুদ্ধ চৈতন্যরূপে); ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ (তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে একই দেহে এটি বিস্তৃত)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় আত্মা হল বিশ্ব, সেই আত্মা তাঁর ডান চোখ দিয়ে স্থূল-জগৎকে প্রত্যক্ষ-সক্ষম। আত্মা যখন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তখন আত্মাকে বলে 'তৈজস', আবার হৃদয়ে যখন শুদ্ধ চৈতন্যরূপে বিরাজিত, আত্মার সেই অবস্থাকে বলে প্রাজ্ঞ। আত্মা এক এবং অভিন্ন। একই দেহের তিনটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও সেই এক আত্মা বিরাজিত।

ব্যাখ্যা: প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন, যখন আমরা এই জগৎকে দেখি তখন আমরা বাম চোখের থেকে ডান চোখ বেশি ব্যবহার করে থাকি। এ ধারণা সত্য হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আমাদের জাগ্রত অবস্থার কথা বলতে গিয়ে গৌড়পাদ এই প্রাচীন ধারণাটির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে জাগ্রত অবস্থায় আমরা যখন আমাদের ডান চোখের সাহায্যে এই জগৎকে দেখি, তখন আমাদের বলা হয় 'বিশ্ব', যখন আমরা মনের দ্বারা এই জগৎকে উপলব্ধি করি তখন আমাদের বলা হয় 'তৈজস'। সবই তখন অন্তর্মুখী।

মানুষের হৃদয়স্থিত ক্ষুদ্র আকাশে এই আত্মা রয়েছেন। 'প্রাজ্ঞ' অবস্থায় চৈতন্য বাইরের জগৎকে পরিহার করে কেবলমাত্র হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন। মূল কথাটি হল আত্মা অবিকৃত, স্ব-অবস্থায় অবস্থিত। আমরা জাগ্রত অথবা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকতে পারি কিন্তু আত্মার তাতে কিছু যায় আসে না। এই সেই একই আত্মা যিনি মুক্ত এবং কোন কিছুর অধীন নন।

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্‌নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত॥৩

অন্বয়: বিশ্বঃ (বিশ্ব [আত্মার প্রথম অবস্থা]); হি (সুনিশ্চিত); নিত্যম্ (সর্বদা); স্থূলভুক্ (স্থূলবিষয় ভোগ করে [জাগ্রত অবস্থায়]); তৈজসঃ (তৈজস আত্মার দ্বিতীয় অবস্থা); প্রবিবিক্তভুক্ (সূক্ষ্মভাবে সব বস্তুকে মনের দ্বারা উপভোগ করে [বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়]); তথা (সেইভাবে); প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ তৃতীয় অবস্থার আত্মা); আনন্দভুক্ (আনন্দ ভোগ করে [এইভাবে]); ভোগম্ (উপভোগ); ত্রিধা (তিনরূপে); নিবোধত (লক্ষ্য কর)।

সরলার্থ: 'বিশ্ব' অবস্থায় আত্মা এই স্থূলজগৎকে ভোগ করেন। 'তৈজস'রূপে নিজকামনা অনুযায়ী আত্মা সূক্ষ্মভাবে এ জগৎকে উপভোগ করেন। প্রাজ্ঞ অবস্থায় আত্মা শুধুমাত্র আনন্দ ভোগ করেন। এই তিন রকমের ভোগের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ পূর্ববর্তী এক শ্লোকে বলেছেন যে, 'স্থূলভুক্' হল স্থূলভাবে এই জগৎকে ভোগ করা। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে। ধরা যাক আমি সন্দেশ খাচ্ছি। 'প্রবিবিক্তভুক্' হল স্মৃতি এবং ধারণার মাধ্যমে মনে-মনে ভোগ করা। যেমন আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমি সন্দেশ খাচ্ছি। এরপর 'আনন্দভুক্'—যখন মন স্থির। এ অবস্থায় আমরা স্বপ্ন পর্যন্ত দেখি না। এখানে 'আনন্দ' শব্দটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ পরমানন্দ নয়। এই শ্লোকের মর্মার্থ হল তিন রকমের ভোগ (ত্রিধা ভোগম্) আছে। কিন্তু সেই এক ও অভিন্ন আত্মাই এই তিন অবস্থাতে বিদ্যমান। এই আত্মাকে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ বা অন্য যে-কোন নামে অভিহিত করা যাক না কেন, এ সবই আত্মার উপর আরোপিত গুণ বা উপাধিমাত্র।

আমরা আমাদেরকে দেহ বলে মনে করে থাকি। আমাদের শরীরে কোথাও কোন যন্ত্রণা থাকলে আমরা বলি 'আমি যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি'। কিন্তু বেদান্তমতে—তুমি দেহ নও, তুমি দেহ নিরপেক্ষ। দেহের পরিবর্তন আছে। কখনো তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আবার কখনো তুমি হয়তো অসুস্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'তুমি' এসবের ঊর্ধ্বে। আমরা যে দেহ থেকে

আলাদা এ কথাটি ধারণা করা খুবই কঠিন। বেদান্ত বলেন : ‘হ্যাঁ, এখন কঠিন ঠিকই কারণ এখন তুমি অজ্ঞ। তুমি নিজেকে দেহ বলে মনে কর। কিন্তু যখন তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারবে তখন তুমি পরমানন্দ লাভ করবে।’

এখানে একটি গল্প বলা হয়েছে। একদা বিষ্ণু বরাহরূপে জন্ম নেন। এই বরাহশরীরে তিনি বহু শাবকের জন্ম দেন। শাবকগুলিকে লালনপালন করে ও অপরিষ্কার স্থানে জীবনযাপনে বরাহের সুখের অন্ত ছিল না। একদিন নারদ তাঁর কাছে এসে বললেন : ‘প্রভু! এ আপনি কি করছেন? আপনি এই জীবন ভোগ করছেন?’ কিন্তু বরাহমাতা উত্তর দিলেন : ‘আঃ! কে তোমার প্রভু? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। আমি এখানে অত্যন্ত সুখী।’ তখন শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে বরাহমাতাকে বধ করলেন। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু তাঁর বরাহ-শরীরের মধ্য থেকে সহাস্যে বেরিয়ে এলেন। ঠিক তেমনিভাবে আমারও দেহের পরিবর্তন হতে পারে। আমি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারি। কিন্তু তার দ্বারা আমি প্রভাবিত হতে যাব কেন? মূল কথাটি এই—আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন দেহের হতে পারে।

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তং তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত॥৪

অন্বয়: স্থূলম্ (স্থূলবস্তু); বিশ্বং তর্পয়তে (বিশ্বকে তুষ্ট করে); প্রবিবিক্তম্ (সূক্ষ্মবস্তু); তৈজসম্ ([তুষ্ট করে] তৈজসকে); আনন্দঃ চ তথা প্রাজ্ঞম্ (একইভাবে আনন্দ তুষ্ট করে প্রাজ্ঞকে); ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত (লক্ষ্য কর যে উপভোগ করার এই তিন রকমের পথ আছে)।

সরলার্থ: ‘বিশ্ব’ হিসাবে স্থূলবস্তুই আমার উপভোগের বিষয়। কিন্তু যখন আমি ‘তৈজস’, তখন সূক্ষ্মবস্তু পর্যন্ত আমার কাছে তৃপ্তিদায়ক হয়ে থাকে। আর যখন আমি প্রাজ্ঞ তখন আনন্দপ্রদ বস্তু আমাকে তৃপ্তি দেয়। (যদিও এক্ষেত্রে আমি কি উপভোগ করছি সে সম্পর্কে আমি সচেতন নই।) এই তিন রকম ভোগের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী শ্লোকের কথা এই শ্লোকেও পুনরাবৃত্ত। তৃপ্তি’ কথাটির অর্থ সন্তোষ, তিনটি ভিন্ন অবস্থাতে মানুষ তিন রকমের তৃপ্তি বা আনন্দ লাভ করে থাকে। জাগতিক স্তরে মানুষ স্থূলবস্তুকেই সবথেকে বেশি উপভোগ করে। মানসস্তরে সূক্ষ্মবস্তুই উপভোগের পক্ষে উপযুক্ত। এছাড়া আরও একটি স্তর আছে যেখানে সকল ইন্দ্রিয় ও মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও মানুষ ভোগ করে কিন্তু তারজন্য কোনও ইন্দ্রিয় বা বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় না। এই আনন্দ কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়।

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে॥৫

অন্বয়: ত্রিষু ধামসু (তিনটি অবস্থায় [জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি]); যৎ ভোজ্যম্ (যা-কিছু তুমি ভোগ কর [স্থূল, সূক্ষ্ম বা আনন্দময়]); যঃ চ ভোক্তা (যে কেউ ভোক্তা হন না কেন [অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস বা প্রাজ্ঞ]); প্রকীর্তিতঃ (তাদের বলা হয়); যঃ তু (যে কেউ); এতৎ উভয়ম্ (এই দুই-ই [ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা]); বেদ (জানেন); সঃ (সেই ব্যক্তি); ভুঞ্জানঃ (তিনি যদি ভোক্তা হন); ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না [কারণ তিনি জানেন ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তু এক ও অভিন্ন])।

সরলার্থ: জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মানুষ যথাক্রমে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ ও আনন্দ উপভোগ করে। যিনি এই ভোগ্য বিষয় ও ভোক্তাকে জানেন, তিনি যদি নিজে এসব ভোগও করেন তাতেও এর দ্বারা তিনি লিপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা: বিশ্ব (জাগ্রত অবস্থায়), তৈজস (নিদ্রিত এবং স্বপ্নদর্শী) অথবা প্রাজ্ঞরূপে (সুষুপ্তি অবস্থায়) আমার মধ্যে সেই একই আত্মা রয়েছেন। আবার স্থূল, প্রবিবিক্ত তথা সূক্ষ্ম বা আনন্দময় যে-কোনও খাবারই আমি খেতে পারি। কি অবস্থায় আমি খাদ্য গ্রহণ করছি অথবা কি ধরনের খাবারই বা আমি খাচ্ছি তাতে কিছুই যায় আসে না। তিন অবস্থাতেই আত্মা আত্মাই থাকেন এবং খাদ্যবস্তু খাদ্যবস্তুই থাকে। কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে তা দ্বারা আত্মা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন না। একে আগুন আর তার প্রজ্বলনের জন্য যে জ্বালানি লাগে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জ্বালানির দ্বারা আগুনের কোন রকম ক্ষতি সাধিত হয় না। একইভাবে কোন খাদ্যই আমার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কেন পারে না? কারণ আমি সাক্ষীমাত্র। আমি এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারি কিন্তু 'আমি' এক ও অভিন্ন। তুরীয় অবস্থাতেই (শুদ্ধ চৈতন্য) আমার প্রকৃত স্বরূপ বোধ হয়। 'চেতোমুখ' তথা সুষুপ্তি ও তুরীয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তা অতিক্রম করতে পারলেই আমরা তুরীয় অবস্থা লাভ করি। যখন আমরা শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, কেবল তখনি আমরা সাক্ষীস্বরূপ। এই-ই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনও পরিবর্তন হয় না। আমরা সর্বদাই অপরিবর্তিত। বিশ্ব, তৈজস বা অন্য যে কোন অবস্থাই হচ্ছে রজ্জুতে সর্পভ্রমতুল্য। আমরা সঠিক চিনতে পারি বা না পারি দড়ি দড়িই থাকে। ঠিক তেমনি আত্মা আত্মাই থাকেন। খাদ্যের দ্বারা আত্মা প্রভাবিত হন না কারণ আত্মা সকল দোষ থেকে মুক্ত।

প্রভবঃ সর্বভাবানাং সভামিতি বিনিশ্চয়।

সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্॥৬

অন্বয়: প্রভবঃ [ইব] সতাম্ (সৎ বস্তু থেকেই সৎ বস্তুর উৎপত্তি [সৎ অর্থাৎ 'যা আছে']); সর্বভাবানাম্ (অস্তিত্ব আছে এমন সকল বস্তু [যথা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ]); ইতি বিনিশ্চয়ঃ (একথা সুনিশ্চিত); প্রাণঃ (মায়াযুক্ত ব্রহ্ম); সর্বম্ (বিশ্বের সকল অচেতন বস্তু); জনয়তি (উৎপন্ন করে); পুরুষঃ চেতোংশূন্ (সূর্য থেকেই যেমন তার কিরণের উৎপত্তি তেমনি পরমাত্মা [পুরুষ]); পৃথক্ (পৃথকভাবে চেতন বস্তুর সৃষ্টি করে)।

সরলার্থ: একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় কোন বস্তু থেকে আর এক বস্তুর সৃষ্টি হয় (যেমন, বিশ্ব [স্থূল], তৈজস [সূক্ষ্ম], প্রাজ্ঞ [কারণ])। প্রাণ থেকেই অচেতন বস্তুর সৃষ্টি। সূর্য থেকেই যেমন তার কিরণের উৎপত্তি ঠিক তেমনি পরমাত্মা (পুরুষ) থেকে চেতন বস্তুর সৃষ্টি।

ব্যাখ্যা: গৌড়পাদ এখানে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে, ব্রহ্ম সর্বত্র রয়েছেন। অন্যথায় এই পরিবর্তনশীল জগতের কোন অস্তিত্বই থাকত না। আনুমানিকভাবে ব্রহ্ম সম্পর্কে এটি হল পরোক্ষ প্রমাণ। আমরা এরকম কথা শুনে থাকি, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—পর্বত থেকে যদি ধোঁয়া নির্গত হয় তবে সেখানে কোথাও নিশ্চয়ই আগুন আছে। একেই বলা হয় অনুমান। সেইজন্য এই শ্লোকে গৌড়পাদের যুক্তি হচ্ছে, কোন বস্তুকে দেখে সহজেই অনুমান করা যায় এইসব বস্তুর উৎপত্তির নিশ্চয়ই কোন উৎস আছে। শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হয় না, এটা অসম্ভব। যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে সেই অস্তিত্বের কোথাও না কোথাও উৎসও আছে। কারণ ছাড়া কোন কার্য হতে পারে না, 'ইতি বিনিশ্চয়ঃ'—একথা সুনিশ্চিত।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উপনিষদ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে বলা হয়েছে, তুমি হয়তো এখন জেগে আছ, একটু পরেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। তারপরে হয়তো গভীর নিদ্রা তথা সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন হবে, অর্থাৎ অবস্থার এইসব পরিবর্তন ঘটে থাকে। কিন্তু এইসব পরিবর্তনের জন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন, যার উপর নির্ভর করে এইসব পরিবর্তনগুলি ঘটতে পারে। তাহলে এই আশ্রয়টি কি? আশ্রয়টি 'তুমি' অর্থাৎ জীব। জীবকে থাকতেই হবে। একইভাবে সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, কখনই স্থির নয়। কিন্তু যদি এর পেছনে কোন অপরিবর্তিত আশ্রয় না থাকে, তবে এই জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। উপনিষদ বলছেন যে—ইতিবাচক কোন সত্তা বা অবলম্বন অথবা আশ্রয় বলে এমন কিছু আছে যার উপর এই দৃশ্যমান জগৎ স্থিত। এই সত্তা নিত্য এবং অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ ইনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অস্তিত্ব না থাকলে এই দৃশ্যমান জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি দৃষ্টিবিভ্রমের জন্যও কোন অবলম্বনের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত

হিসাবে বলা যায়, আমি একটা সাপ দেখলাম বলে মনে হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ওটা সাপ নয়, আসলে দড়ি। কিন্তু দড়িটি সেখানে না থাকলে আমার এই ভুল হত না। আরও একটি দৃষ্টান্ত হল : আমি মরুভূমিতে রয়েছি। আর তার একটু দূরে একটি জলাশয় দেখতে পাচ্ছি বলে আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে সেটি জলাশয় নয়, নেহাতই মরীচিকা। মরীচিকা একমাত্র মরুভূমিতেই দেখা যায়। অর্থাৎ মরুভূমি ছাড়া মরীচিকা দেখা সম্ভব নয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন—'তুমি কখনো কি কোন বন্ধ্যা নারীর সন্তানকে দেখেছ? অথবা দেখেছ কি শশশৃঙ্গ? বা আকাশকুসুম?' এসব অসম্ভব যেহেতু এদের কোন অস্তিত্বই নেই। এমনকি ভুল করেও আমরা এসব দেখতে পাই না। আসল জিনিস না থাকলে তার কোন নকল থাকতে পারে না।

সেজন্য গৌড়পাদ বলছেন, আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই দৃশ্যমান জগতের কোন অবলম্বন বা আশ্রয় আছে। আর সেই আশ্রয় হলেন ব্রহ্ম কারণ ব্রহ্ম নিত্য এবং অপরিবর্তিত। এই দৃশ্যমান জগতের পরিবর্তনসমূহ ব্রহ্মের উপরে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য, সনাতন, নির্বিশেষ এবং নির্গুণ।

এরপর গৌড়পাদ বলছেন যে, এই জগতে দুই রকমের বস্তু আছে—জড় বস্তু ও চেতন বস্তু। এই দুই বস্তুই ব্রহ্মের কাছ থেকে এসেছে, যদিও ব্রহ্ম কোন কিছুরই স্রষ্টা নন। ব্রহ্ম ব্রহ্মই অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্ম মায়ার সাথে যুক্ত হয়ে এই জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে কোন গয়না প্রস্তুত করা যায় না। গয়না বানাতে হলে সোনার সাথে কিছু খাদ মেশাতে হয়। একইভাবে শুদ্ধ চৈতন্যই হচ্ছেন শুদ্ধ ব্রহ্ম। আর এই ব্রহ্মই মায়াযুক্ত হয়ে জড়-অজড়, চেতন-অচেতন অর্থাৎ এই জগৎরূপে প্রকাশিত হন। মায়া ব্রহ্মের মধ্যেই রয়েছেন—কখনো সক্রিয় আবার কখনো নিষ্ক্রিয়। মায়াকে একটা সাপের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যা কখনো গতিশীল আবার কখনো বা স্থির। মায়া যখন নিষ্ক্রিয় তখন তা হল নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ যা উপাধিবর্জিত বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র। আর মায়া যখন সক্রিয় তখনি এই জগতের প্রকাশ ঘটে।

কারিকা বলছেন যে, অপ্রাণ বস্তু প্রকাশিত হয় প্রাণ তথা হিরণ্যগর্ভ থেকে। এই হিরণ্যগর্ভই অপরব্রহ্ম। মাকড়সা যেমন তার নিজদেহের ভেতর থেকেই জাল বার করে এ যেন ঠিক তাই। মাকড়সা চেতন, কিন্তু তার জালটি অচেতন, পুরুষ থেকেই চেতন বস্তু বা প্রাণিকুল প্রকাশিত হয়—এই পুরুষই পরব্রহ্ম। 'অংশু' কথাটির অর্থ কিরণ। প্রাণিকুল তথা আমরা সচেতন, কারণ আমরা 'পুরুষ' থেকেই উৎসারিত। এবং এইজন্যই আমরা সূর্যকিরণের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ সূর্যের যা ধর্ম সূর্যকিরণেরও ঠিক একই ধর্ম। আবার মাকড়সা যেমন তার জালকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি প্রাণিকুলও জড়জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে।

একইভাবে, আত্মাও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু প্রাণ অপ্রাণ নির্বিশেষে সকল বস্তুই আসে ব্রহ্ম থেকে।

বিভূতিং প্রসবং ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা॥৭

অন্বয়: অন্যে সৃষ্টিচিন্তকাঃ (যাঁরা এ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী); বিভূতিং প্রসবং মন্যন্তে (এ ঈশ্বরের মহিমা—এমন কথা তাঁরা মনে করেন); অন্যৈঃ (অন্যেরা [যাঁরা আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়াসী]); সৃষ্টিঃ স্বপ্ন মায়া-স্বরূপ ইতি বিকল্পিতা ([সে যেমনই হোক] তাঁরা এই সৃষ্টিকে [এই জগৎ] স্বপ্ন তথা দৃষ্টিবিভ্রম ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন না)।
সরলার্থ: যাঁরা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা এই বিশ্বকে ঈশ্বরের মহিমা বলে মনে করেন। কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়াসী তাঁদের নিকট এ জগৎ স্বপ্ন অর্থাৎ দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।
ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে গৌড়পাদ দুই শ্রেণীর মানুষের কথা বলেছেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর নাম দিয়েছেন 'সৃষ্টিচিন্তকাঃ'—সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী। এইসব মানুষরা বলেন এই সৃষ্টি ঈশ্বরের অলৌকিক কর্মবিশেষ—'বিভূতিম্'। 'বিভূতিম্' কথাটির আর একটি অর্থ হচ্ছে মহিমা বা শক্তি। এরা দ্বিতত্ত্ববাদী, এঁদের মতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা হচ্ছে দুটি পৃথক সত্তা। এই ধারণা কিছু হিন্দুশাস্ত্রে এবং বাইবেলেও দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের মতে ঈশ্বর বলে একজন আছেন এবং তিনি তাঁর নিজ শক্তির দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাঁর অলৌকিকত্বের পরিচায়ক।

কিন্তু অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, তাঁদের নিকট—এ জগৎ স্বপ্নবৎ (স্বপ্ন-মায়া)। 'স্বপ্ন' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ জগৎ স্বপ্নের মতোই মিথ্যা। স্বপ্ন যে সত্য নয় একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যখন আমি স্বপ্ন দেখছি তখন কি আমি বুঝতে পারি যে আমি স্বপ্ন দেখছি? তখন কি আমি জানি যে স্বপ্ন সত্য নয়? হয়তো স্বপ্নে আমি দেখছি আমি কাশী যাচ্ছি। স্বপ্নে দেখলাম আমি টিকিট কাটছি, আমার জিনিসপত্র গোছাচ্ছি এবং ট্রেনেও উঠেছি। কিন্তু এ সবই মনের কল্পনামাত্র। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি আমার ঘরে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছি। তাই গৌড়পাদ বলছেন—যে অর্থে স্বপ্ন সত্য শুধুমাত্র সেই অর্থেই এ জগৎও সত্য। একটা বিশেষ মুহূর্তে এটা সত্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই তা অন্তর্হিত। যদি তুমি মনে কর যে এ জগতের অস্তিত্ব চিরকাল থাকবে তাহলে তুমি ভুল করবে। এই জগৎকে অনিত্য বলা হচ্ছে এই অর্থে যে এ জগৎ সতত পরিবর্তনশীল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা সুন্দর উপমার সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করছেন, যাঁর কাছে এ জগৎ স্বপ্নবৎ। উপমাটি হল: এক চাষীর বেশি বয়সে একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। শিশুটি যত বড় হতে থাকে তার প্রতি তার পিতামাতার স্নেহ-ভালোবাসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিন চাষীটি যখন ক্ষেতে কাজ করছে এমন সময়ে এক প্রতিবেশী এসে তাকে খবর দিল যে তার ছেলেটি ভীষণ অসুস্থ, তার মৃত্যু আসন্ন-প্রায়। চাষী বাড়ি ফিরে যাওয়ার মধ্যেই ছেলেটি মারা যায়। তার স্ত্রী অঝোরে কাঁদতে থাকে কিন্তু চাষীর চোখ একেবারেই শুষ্ক। তখন শোকাতুরা স্ত্রী তার প্রতিবেশীকে বলছে—'এমন ছেলে চলে গেল আর তার চোখ থেকে এক বিন্দু জলও পড়ল না।' কিছুক্ষণ বাদে কৃষকটি তার স্ত্রীকে বলছে—'বলতে পার কেন আমি কাঁদছি না?' গত রাতে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি রাজা হয়েছি এবং আমি সাত-সাতটি রাজপুত্রের পিতা। সেইসব রাজপুত্রেরা যেমন সুদর্শন তেমনি সৎগুণের অধিকারী। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা জ্ঞান অর্জন করে বহু বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাই আমি এখন অবাক হয়ে ভাবছি আমি কার জন্য কাঁদব ঐ সাত পুত্রের জন্য না এই একটি পুত্রের জন্য?' জ্ঞানীর কাছে জাগ্রত অবস্থাও স্বপ্নের মতো মিথ্যা।

এই জগৎ যে দৃষ্টিবিভ্রমমাত্র তার পক্ষে আচার্য শঙ্কর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এটি ভারতীয় দড়ির খেলার দৃষ্টান্ত : এক যাদুকর সপরিবারে যাদুর খেলা দেখাতে এসেছে। যাদুকর একটি দড়ি নিয়ে উঁচুতে হাওয়ায় ছুড়ে দিল, কেমন করে যেন দড়িটি গাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন যাদুকরটি বলল—এর উপরে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট প্রেত ভর করেছে। আমি তাকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছি। এই বলে কিছু অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সে দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার স্ত্রী তাকে এই বলে বাধা দিতে চেষ্টা করল: না যেও না। এ কাজ বিপজ্জনক। কিন্তু যাদুকর এই নিষেধ শুনল না। সে দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল এবং শেষে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই একটি কাটা হাত মাটিতে পড়ল, তারপর যথাক্রমে আর একটি হাত, দুটি পা, মাথা এবং সবশেষে তার দেহটি সশব্দে মাটিতে পড়ল। দর্শকদের বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এবার তার শোকাহত স্ত্রী-পুত্ররা ভূলুণ্ঠিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল : আমাদের অন্নদাতা চলে গেল। এখন কে আমাদের ভরণপোষণ করবে? তারপর স্ত্রী দর্শকদের কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগল। আর দর্শকরা প্রত্যেকেই তাদের সাধ্যমত পয়সা দিয়ে ওদের সাহায্য করলেন। এরপর স্ত্রী তার মৃত স্বামীর দেহাংশগুলিকে একত্রিত করে একটি কাপড় দিয়ে ঢাকা দিল এবং বলল 'এবার আমি একটা মন্ত্র পড়ে চেষ্টা করে দেখি।' সে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল এবং হঠাৎ সকলে দেখল যাদুকর জীবিত অবস্থায় তাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণদেব কারিকার এই শ্লোকটি শুনেছিলেন। আর হয়তো এ-কথা মনে করেই বলতেন: যাদুকর আর তার যাদুর মধ্যে কোন্‌টি সত্য? যাদু সত্য নয়। যাদুর খেলা মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। এই খেলা অনেকক্ষণ ধরে চলে এবং সেখানে অনেক ঘটনাও ঘটে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটি দৃষ্টিবিভ্রমের ফল। যাদুকরই একমাত্র সত্য। আচার্য শঙ্করও ঠিক এই কথাই বলেছেন। এ জগৎ যাদুকরের যাদুমাত্র। যখন আমরা এ জগৎকে দেখি তখন তা আমাদের কাছে সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। অনন্ত সত্তাই এই জগৎকে প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাই ভ্রান্ত, যা থেকে আমাদের সব দুঃখ-কষ্টের শুরু। এই পরিবর্তন সত্য নয়। প্রথমে আমি ছিলাম সদ্যোজাত এক শিশু, ক্রমে কিশোর, পরে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং এখন হয়তো আমি বৃদ্ধ। আবার বলছেন, এক সময়ে হয়তো আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আবার পরবর্তীকালেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারি। এইসব পরিবর্তন দেহগত। এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি সেই একই ব্যক্তি। উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চাইছেন—জাগ্রত ও ঘুমন্ত, পীড়িত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শৈশব ও বার্ধক্য এইসব পরিবর্তনশীল অবস্থার কোনটিই সত্য নয়। তাহলে সত্য কি? এইসব পরিবর্তনের পেছনে যে আত্মা রয়েছেন তাই একমাত্র সত্য।

অনুরূপভাবে এই জগৎ এবং সংগ্রাম, আসক্তি, ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ এই যে জীবন এ সবই ভ্রান্ত। এই সবের স্থায়িত্ব স্বল্প এবং এগুলি বিনাশশীল, আমরা এই জীবনকে বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমাদের প্রতিক্রিয়াসমূহ কোন বিশেষ অবস্থার, কোন বিশেষ মুহূর্তের অধীন। যেমন—কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটলে আমরা উচ্ছ্বসিত হই, আবার অর্থ নাশ হলে আমরা বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। তাই উপনিষদ বলছেন: আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সৎ কি আর অসৎই বা কি? যতক্ষণ আমি এই দৃশ্যমান জগতের অন্তর্গত ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ এবং জীবন-মৃত্যু—এই দ্বৈত দৃষ্টি থাকবে। জীবনের ধর্মই এই, কেউ বলতে পারে না, 'আমি শুধুই আনন্দে থাকব'। কিন্তু উপনিষদ বলছেন—এই সুখ-দুঃখের পারে যাওয়ার চেষ্টা কর।' উভয়ই বন্ধনের কারণ। যখন তুমি এ জগৎকে মিথ্যা বলে জানবে তখনি তুমি একথা বলতে পার: 'হে জগৎ, আমি তোমাকে এখন জেনেছি। তুমি আর আমাকে ঠকাতে পারবে না।' এ যেন দড়ি খেলার গোপন কৌশলটি আয়ত্ত করা। এবার যাদুকরের খেলা দেখে আমি আর বিস্মিত হই না। দেহের বিভিন্ন খণ্ডিত অংশগুলি মাটিতে পড়ে রয়েছে দেখেও আমি বিচলিত হই না। এখন আমি জানি এ সবই ভ্রান্তিমাত্র। ঠিক তেমনিভাবেই, এ জগৎকে সঠিকভাবে জানলে আর প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যে কোনও ঘটনার জন্যই আমি তখন প্রস্তুত। অর্থ প্রাপ্তি বা নাশ তখন আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। তখন সুখ-দুঃখ দুই-ই সমান বলে বোধ হয়।

এখানে গৌড়পাদ আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন, সৃষ্টি আর সৃষ্টির পেছনে যে সত্য রয়েছে—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েই মশগুল। অপরদিকে এমন কিছু ব্যক্তিও আছেন—যাঁরা বুদ্ধিমান। অন্তর্নিহিত মূল সত্যকে জানতেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলতেন, যারা মন্দির দর্শন করতে গিয়ে তাদের সবটুকু সময় ব্যয় করে মন্দিরের বাইরে যে ভিখারি আছে তাদের সাহায্য করার জন্য। বলতেন: তারা যে মূল উদ্দেশ্যটা নিয়ে এসেছিল তা তারা ভুলে যায়। প্রথমেই মন্দিরে ঢুকে দেবীকে দর্শন কর। তারপর তোমার সাধ্যমত তুমি গরীবদের সাহায্য কর। সুতরাং প্রথমে ঈশ্বর উপলব্ধি, তারপর তাঁর সৃষ্টির কথা ভাবা।

একটি গানে সাধক রামপ্রসাদ অভিযোগ করেছেন: মা তুমি তোমার এই সুন্দর জগতের সাহায্যে আমাদের বোকা বানাচ্ছ। এই সৃষ্টির পিছনে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ। তাই আমরা তোমাকে দেখতে না পেয়ে তোমাকে একেবারে ভুলে আছি। তুমি আমাদের সঙ্গে ছলনা করে চলেছ। তুমি কেমন মা? নিজেকে আড়ালে রেখে সন্তানদের এই অসার জগৎকে দিয়ে ভুলিয়ে রেখে, তুমি তোমার সন্তানদের ঠকাচ্ছ। একইভাবে গৌড়পাদ এই জগতের উৎসটা কোথায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। এটাই এই শ্লোকের মূল বক্তব্য।

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎপ্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ।।৮

অন্বয়: প্রভোঃ ইচ্ছামাত্রম্ (প্রভুর ইচ্ছামাত্রেই); সৃষ্টিঃ (এই জগৎ [অস্তিত্ব লাভ করল]); ইতি সৃষ্টৌ (সৃষ্টি বিষয়ে); বিনিশ্চিতাঃ (এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত); কালচিন্তকাঃ (জ্যোতির্বিদগণ); ভূতানাং কালাৎ প্রসূতিং মন্যন্তে (বস্তু সৃষ্টির জন্য কালকে দায়ী করেন)।

সরলার্থ: যাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই এই জগতের সৃষ্টি। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ মনে করেন কাল থেকেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়েছে।

ব্যাখ্যা: কিন্তু এই জগতের উৎপত্তি হল কেমন করে? গৌড়পাদ বলেন যাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁদের মতে এই জগতের সৃষ্টি হল ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, 'ইচ্ছামাত্রং'—শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার দ্বারা। বাইবেলে যেমন আছে, ঈশ্বর বললেন 'আলো হউক' এবং আলোর সৃষ্টি হল।

অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন (কালচিন্তকাঃ) যাঁরা মনে করেন কালই বিশ্বচরাচরের উৎস। তাঁরা কালকেই সবকিছুর স্রষ্টা বলে মনে করেন। এই হল বিবর্তনবাদী

অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের অভিমত। এই বিজ্ঞানীরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, কালের নিয়মেই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পরে প্রাণ এসেছে। শুরুতে প্রাণ বলে কিছু ছিল না, প্রাণের প্রকাশ পরবর্তী স্তরে। কিন্তু একথা হিন্দুদর্শন স্বীকার করেন না। হিন্দুমতে প্রাণের অস্তিত্ব শুরু থেকেই ছিল, তবে তা ছিল অব্যক্ত। পরবর্তীকালে তা ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়।

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥৯

অন্বয়: সৃষ্টিঃ ভোগার্থম্ ইতি (এ জগৎ শুধুমাত্র ভোগের জন্য); অন্যে (কিছু ব্যক্তি [মনে করেন]); ক্রীড়ার্থম্ ইতি চ অপরে (কারোর মতে এই জগৎ ক্রীড়ার জন্য); দেবস্য অয়ম্ এষঃ স্বভাবঃ (এই ঈশ্বরের প্রকৃতি); আপ্তকামস্য স্পৃহা কা (তাঁর কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ নেই, [সুতরাং জগৎ সৃষ্টিতে] তাঁর কি প্রয়োজন)?

সরলার্থ: কিছু ব্যক্তির মতে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ভোগের জন্য। অপর কিছু ব্যক্তি বলেন, তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর লীলার জন্য। অন্য কিছু ব্যক্তির মতে এই জগৎ সৃষ্টি তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঈশ্বর আপ্তকাম অর্থাৎ তাঁর সব ইচ্ছাই পরিপূর্ণ। তবে কোন্ প্রয়োজনে তিনি এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন?

ব্যাখ্যা: ঈশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন তবে কেন তিনি এ সৃষ্টি করেছেন? কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন নিজের ভোগের জন্যে। কিন্তু যদি তাই হয় তবে ঈশ্বর বড় নিষ্ঠুর এবং খেয়ালী। কারণ তিনি তাঁর ভোগের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন এই সৃষ্টি তাঁর খেলামাত্র (ক্রীড়ার্থং)। যেমন শিশুরা খেলার সময় মাটির বাড়ি তৈরি করে। কিন্তু মা যখন তাদের খেতে ডাকে তখন সব ভেঙে ফেলে তারা বাড়িতে ছুটে যায়। ঈশ্বরের খেলাও (সৃষ্টি) কতকটা এইরকম। এটা তাঁর কেবলই মজা।

রামপ্রসাদ একটা গানে বলছেন: মা কালী যেন একটা ঘুড়ি উড়াচ্ছেন। ঘুড়ির সুতোটা তিনি ধরে আছেন এবং ঘুড়ি অনেক উঁচুতে উড়ছে। ঘুড়িটা আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুড়ি নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করছে কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ ঘুড়ির সুতো যে মায়ের হাতে। একইভাবে আমরাও নিজেদের স্বাধীন মনে করি এবং ভাবি আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো যে-কোন কাজ করতে পারি। কিন্তু কোন এক সময় সুতো ছিঁড়ে ঘুড়ি কেটে যায়। তা দেখে মা খুশি হয়ে আনন্দে হাততালি দেয়া এবং হাসতে থাকেন। সুতরাং মা এ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র কৌতুকের জন্য।

আবার কেউ কেউ বলেন এই সৃষ্টি ঈশ্বরের স্বভাব (দেবস্য অয়ম্ এষঃ সূভাবঃ)। একথা সহজেই বুঝতে পারতাম যদি ঈশ্বর আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ হতেন। আমরা বাসনার দ্বারা তাড়িত। কিন্তু ঈশ্বর 'আপ্তকাম' অর্থাৎ তাঁর কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ নয়, বস্তুত তাঁর কামনা-বাসনা বলে আদৌ কিছু নেই। কোন কিছু করবার তাগিদ আমি তখনি বোধ করি যখন আমার মধ্যে কোন অভাববোধ থাকে। আর এই অভাব দূর করার জন্যই আমি কাজ করি। কুম্ভকার এই ভেবে ঘট নির্মাণ করেন যে সেটিকে বিক্রি করে তিনি অর্থ উপার্জন করবেন। এই পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় ঈশ্বরকে কুম্ভকারের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে বলে মনে হয়। আর এইসব অপব্যাখ্যার মূল কারণ হল ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকে পৃথক বলে মনে করা। কিন্তু বেদান্তেব মতে এদের পৃথক বলে মনে করা হচ্ছে বটে কিন্তু আসলে এরা পৃথক নয়। জলবুদ্বুদগুলিকে আমরা যেমন সমুদ্র থেকে পৃথক বলে মনে করি এও যেন ঠিক তাই। এরা এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম স্বয়ং এই জগৎরূপে প্রতিভাত। তাই গৌড়পাদ বলছেন ব্রহ্ম সৃষ্টি করবেনই বা কেন? যিনি আপ্তকাম (আপ্তকামস্য স্পৃহা কা) তাঁর আবার কিসের স্পৃহা? সুতরাং উল্লিখিত ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়।

কে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর কেনই বা করেছেন—ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তর্ক করে আমরা অহেতুক সময়ের অপচয় করি। আমি ভুল করে একটি দড়িকে সাপ বলে মনে করলাম। কেন আমি এই ভুল করলাম, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। ভ্রম ভ্রমই এবং তাকে শোধরাতে হবে। আমাদের সকল সমস্যার মূলে হচ্ছে এই অজ্ঞানতা। বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি হল—এই অজ্ঞানতাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করতে হবে।

বুদ্ধদেব একসময়ে বলেছিলেন, ধরা যাক, তুমি তীরবিদ্ধ হয়েছ এবং তোমাকে সাহায্য করতে মানুষ এগিয়ে এসেছে। তখন কি তুমি বলবে 'দাঁড়াও, প্রথমেই আমাকে বল, যে ব্যক্তি আমাকে তীরবিদ্ধ করেছেন তিনি জাতিতে কি এবং তিনি কোথা থেকে এসেছেন',—তা তুমি অবশ্যই বলবে না। এইসব প্রশ্ন অবান্তর। তোমার যা আশু প্রয়োজন তা হল তীরটিকে ক্ষতস্থান থেকে বার করে তোমার যন্ত্রণার উপশম ঘটানো। একইভাবে বলা যায় আমাদের সকল দুঃখের কারণ হল অজ্ঞানতা। সুতরাং এই অজ্ঞানতাকে দূর করতে হবে। কেন আমাদের এই অজ্ঞানতা কিংবা কিভাবে এই অজ্ঞানতা এল—এ জাতীয় প্রশ্ন একান্তই অবান্তর।

উপনিষদ

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন
প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যম-

ব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং
শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥৭

অন্বয়: ন অন্তঃ প্রজ্ঞম্ ([তুরীয়] অন্ত্যস্থ বস্তু [তৈজস] সম্পর্কে সচেতন নয়); ন বহিষ্প্রজ্ঞম্ (বাইরের বস্তু [বিশ্ব] সম্পর্কেও সচেতন নয়); ন উভয়তঃ প্রজ্ঞম্ (উভয়ের কোনটির সম্পর্কেই সচেতন নয়); ন প্রজ্ঞান ঘনম্ (কেবলমাত্র ঘনীভূত চৈতন্যও নয়); ন প্রজ্ঞম্ (একযোগে নকল বস্তু সম্পর্কে সচেতন নয়); অপ্রজ্ঞং [চ] ন (অসচেতনও নয়); অদৃষ্টম্ দৃষ্টির অগোচর); অব্যবহার্যম্ (কোনরূপ ব্যবহারযোগ্যও নয়); অগ্রাহ্যম্ (কোন কর্মেন্দ্রিয়ের অধীন নয়); অলক্ষণম্ (সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত); অচিন্ত্যম্ (চিন্তার অতীত); অব্যপদেশ্যম্ (কোন ধ্বনির দ্বারা নির্দেশিত নয়); একাত্মপ্রত্যয়সারম্ (কেবলমাত্র আত্মা সম্পর্কে সচেতন); প্রপঞ্চোপশম্ (এই ভৌতিক জগতের পূর্ণ অবসান হয়); শান্তম্ (শান্তির প্রতীক); শিবম্ (সর্বমঙ্গলময়); অদ্বৈতম্ (দ্বিতীয়রহিত অর্থাৎ এক); চতুর্থম্ (চতুর্থ অবস্থা —তুরীয়); মন্যন্তে সঃ আত্মা ([প্রাজ্ঞ ব্যক্তি] এই তুরীয়কে আত্মা বলে জানেন); স বিজ্ঞেয়ঃ (এই আত্মাকেই উপলব্ধি করতে হবে [এটাই জীবনের উদ্দেশ্য])।

সরলার্থ: অন্তরস্থ ঘটনা সম্পর্কে তুরীয় সচেতন নন (এর থেকে বোঝা যায় তুরীয় তৈজস নন), বাইরের ঘটনা সম্পর্কেও ইনি সচেতন নন (অর্থাৎ তুরীয় বিশ্ব নন)। ইনি জাগ্রত ও স্বপ্নবস্থার মধ্যবর্তী কোন কিছু সম্পর্কেও সচেতন নন। (সুষুপ্তি অবস্থার প্রাজ্ঞও নন। ইনি সর্বজ্ঞও নন, অচৈতন্য নন। ইনি অদৃশ্য—লৌকিক ব্যবহারের অতীত, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দুয়েরই ঊর্ধ্বে, মনের অগোচর, এবং কোন শব্দ দ্বারা ইনি নির্দেশিত নন। এই অবস্থায় থাকে শুধু আত্মার চৈতন্য এবং এখানে জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই। এখানে শান্তি ও কল্যাণের মূর্ত প্রকাশ, এই চৈতন্য এক ও অদ্বিতীয়। এই চতুর্থ অবস্থাই তুরীয়। প্রাজ্ঞগণ একেই আত্মা বলেন। এই আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে।

ব্যাখ্যা: উপনিষদে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাগ্রত অবস্থায় আমরা চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন থাকি (বহিপ্রজ্ঞং)। নিদ্রিত অবস্থায় আমরা অন্তর্জগৎ (অন্তঃপ্রজ্ঞং) সম্পর্কে সচেতন। তখন এই জগৎকে আমরা স্বপ্নে অনুভব করি। আত্মা 'বহিষ্প্রজ্ঞং' নন আবার 'অন্তঃপ্রজ্ঞং'ও নন। আত্মা বহির্জগৎ বা স্বপ্ন-জগৎ কোনটি সম্পর্কেই সচেতন নন। ইনি জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী জ্ঞান-সম্পন্নও নন (উভয়তঃ প্রজ্ঞং)।

আবার সুষুপ্তি অবস্থায় মানুষ প্রগাঢ় চৈতন্য অর্থাৎ ঘনীভূত চৈতন্যকে (প্রজ্ঞানঘনং) অনুভব করে। তখন তুমি কোন কিছুর সম্পর্কে সচেতন নও এমনকি নিজের সম্বন্ধেও না, আত্মা এরূপ অবস্থারও ঊর্ধ্বে। আত্মা চেতনও নন অচেতনও নন (ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং)।

এই দুই-এর কোনও অবস্থাই আত্মা তথা ব্রহ্মের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। আত্মা সকল অবস্থা নিরপেক্ষ অবস্থাসমূহ আত্মায় আরোপিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা ঐসকল বিশেষণ থেকে মুক্ত।

আত্মাকে বর্ণনা করা যায় কিভাবে? উপনিষদের মতে আত্মার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। আত্মাকে কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। বলা যায় না যে, আত্মা এই প্রকার বা আত্মা ঐ প্রকার। যখন আমরা আত্মার সম্বন্ধে কিছু বলি তখনি আমরা তাঁকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। আত্মায় আরোপিত গুণসমূহ আত্মার বৈশিষ্ট্য নয়। যেমন, কেউ হয়তো বলল পদ্মফুল নীল। নীল একটি গুণমাত্র, পদ্মের কোনও অংশ নয় কারণ পদ্ম সাদা কিংবা লালও হতে পারে। সেভাবেই কেউই বলতে পারে না আত্মা ছোট কিংবা বড় বা আর কিছু। আত্মাকে বর্ণনা করা যায় না, আত্মা যে সঠিক কি তা বলে বোঝানোও যায় না। সেইজন্যই বেদান্ত বলেন, 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ 'ন ইতি, ন ইতি' যার অর্থ আত্মা এটি নয়, এটি নয়।

তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'অদৃষ্টং'—আত্মা দৃষ্টির অগোচর। অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মাকে অনুভব করা যায় না। 'অব্যবহার্যং'—কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মা ব্যবহারযোগ্য নন। যেমন আমি এই 'পেপার ওয়েট'কে অনুভব করতে পারি, এটাকে হাত দিয়ে ধরতে পারি। এটাকে আমি নানা কাজে ব্যবহারও করতে পারি। কিন্তু আত্মাকে এভাবে ব্যবহার করা যায় না। কারণ আত্মার কোনও রূপ নেই। 'অগ্রাহ্যং'—আত্মাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না। 'অলক্ষণং'—আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। 'অচিন্ত্যং'—আত্মা চিন্তার অতীত। এমনকি তাঁকে চিন্তা করাও যায় না। যেমন, সূর্য যে কত বৃহৎ তা বিজ্ঞানীরা আমাদের বলে দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি তা ধারণা করতে পারি? কোন কিছুর সঙ্গেই আমরা আত্মাকে তুলনা করতে পারি না। আত্মা 'অব্যপদেশ্যং'– তাঁকে বর্ণনা করা যায় না।

তবে আত্মা কি? 'একাত্মপ্রত্যয়সারং'—এ কেবল 'অহংবোধ' অর্থাৎ আমাদের আত্মচৈতন্য। এটাই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। আমাদের সকলেরই এই 'অহংবোধ' আছে। এমনকি ক্ষুদ্রতম কীটেরও এই বোধ আছে। কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যে এক 'সাধারণ অহংবোধ' আছে। এবং সেটাই ব্রহ্ম। কেমন করে বুঝব যে এই 'অহংবোধ'ই ব্রহ্ম? আমি মনে করি যে, আমি শ্রীযুক্ত অমুক এবং অমুক বংশে আমার জন্ম। তুমি মনে কর, তুমি আর একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের এই 'অহংবোধ' আমাদের অহংকার ও দেহ-মনের সঙ্গে অভিন্ন। এই অহংকারের ফলেই আমরা নিজেদের একে অপরের থেকে আলাদা মনে করি। প্রশ্ন ওঠে, তবে 'আমি' কে? এই দেহ ও মন চলে গেলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? থাকে এক আত্মা, এটিই সাধারণ আশ্রয়, সাধারণ অধিষ্ঠান। ইনিই পরমাত্মা। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উপনিষদ দক্ষতার সাথে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত করলেন—'আমরাই ব্রহ্ম'। প্রথমে 'নেতি নেতি' করে আমরা সবকিছুকে অস্বীকার করি। শেষে থাকে কেবলমাত্র একটি সত্তা, 'আত্মপ্রত্যয়'—অহংবোধ, সমগ্র জগৎ চরাচরের এই হল আশ্রয়, আমাদের সকলেরই সত্তাস্বরূপ।

কখন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি? 'প্রপঞ্চ-উপশমং', প্রপঞ্চ কথার অর্থ হল দৃশ্যমান জগৎ এবং উপশমং এর অর্থ অস্বীকার করা। এই দৃশ্যমান পঞ্চভূতে গড়া জগৎকে অস্বীকার করতে পারলেই আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি। এই জগৎ নাম-রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নাম-রূপ বর্জিত হলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' অর্থাৎ শান্তি, আনন্দ ও একত্ববোধ। সাধারণভাবে, আমরা সবসময়েই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু যেখানে কোন দুই নেই, কেবলমাত্র এক রয়েছে সেখানেই শান্তি এবং আনন্দ। এটাই চতুর্থ অবস্থা—'চতুর্থং', একেই তুরীয় অবস্থা বলে। এই অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত অবস্থা। 'সঃ বিজ্ঞেয়ঃ'—এই আত্মাকে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন আত্মাকে বিজ্ঞেয় বলা হচ্ছে কেন? কে এই আত্মাকে জানতে পারে? তাহলে কোন জ্ঞাতা থাকা চাই। আমি আমার থেকে পৃথক কোন বস্তুকে জানতে পারি অর্থাৎ সেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বোধ আছে। ব্রহ্ম যদি জ্ঞেয় বস্তু হন তবে জ্ঞাতা কে? এর উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেছেন 'জ্ঞেয়' শব্দটি এই অর্থে উপনিষদে ব্যবহৃত হয়নি। উপনিষদ বলছেন যে এখানে আমরা নিজেদের আত্মা সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের এই অজ্ঞানতা দূর করতে হবে। এভাবেই আত্মাকে জানা যাবে।

গৌড়পাদ-কারিকা

নিবৃত্তেঃ সর্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্যো বিভুঃ স্মৃতঃ॥১০

অন্বয়: অব্যয়ঃ (অপরিবর্তনীয়); ঈশানঃ (তুরীয় [প্রভু]); সর্বদুঃখানাং নিবৃত্তেঃ প্রভুঃ (সর্বদুঃখনাশক [অর্থাৎ প্রাজ্ঞ, তৈজস এবং বিশ্ব এই তিন অবস্থার নাশ]); সর্বভাবানাম্ ([কারণ] সব বস্তু [অসত্য] হওয়ায়); অদ্বৈতঃ (অদ্বিতীয়); দেবঃ (প্রকাশিত, জ্যোতির্ময়); তুর্য্যঃ (তুরীয়); বিভুঃ (সর্বব্যাপী ঈশ্বর); স্মৃতঃ ([স্মৃতির দ্বারা] এভাবে বর্ণিত)।
সরলার্থ: প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তুরীয়কে এভাবে বর্ণনা করেছেন: এক ও অভিন্ন, সর্বব্যাপী (ঢেউয়ে যেমন জল থাকে), সম্পূর্ণভাবে এই দৃশ্যমান জগৎকে বর্জন, স্বয়ংপ্রকাশ, শুদ্ধ চৈতন্য, পরব্রহ্ম, একমাত্র তিনিই সকল দুঃখমোচনে সক্ষম। (পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারলে সকল দুঃখের অবসান হয়।)

ব্যাখ্যা: বিশ্ব, তৈজস অথবা প্রাজ্ঞ—সব অবস্থাতেই আমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। অবিদ্যা এই তিন অবস্থাতেই প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যদি প্রাজ্ঞকে অতিক্রম করে তুরীয়তে লীন হতে পারি তবে আর কোনও দুঃখ-কষ্টের অবকাশ থাকে না। তুরীয় বলতে এখানে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে—একমাত্র তিনিই আমাদের দুঃখমোচন করতে পারেন। বস্তুত তুরীয়ই আমাদের আত্মা। জীবনের লক্ষ্যই হল এই আত্মাকে জানা। যখন আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারব তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব আত্মা ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নেই। দ্বিতত্ত্বের ধারণা তখন পুরোপুরি দূরীভূত হয়। আত্মা জ্যোতির্ময়। যেন আত্মার বিচ্ছুরিত আলোকেই আমরা সকল বস্তুর মধ্যে ঐক্য দর্শনে সক্ষম হই।

কার্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্যে ন সিধ্যতঃ॥১১

অন্বয়: তৌ (ঐ দুটি); বিশ্বতৈজসৌ (বিশ্ব এবং তৈজস); কার্যকারণবদ্ধৌ (কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত); ইষ্যেতে ([প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা] একথা স্বীকৃত); প্রাজ্ঞঃ তু কারণবদ্ধঃ (প্রাজ্ঞ কিন্তু কারণজাত বলেই বদ্ধ); তৌ দ্বৌ (এ দুটি [কার্য এবং কারণ]); তুর্যে (তুরীয় অবস্থায়); ন সিধ্যতঃ (প্রযোজ্য নয়)।

সরলার্থ: বিশ্ব এবং তৈজস, উভয়ই কার্য-কারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত—জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করেন। প্রাজ্ঞ কিন্তু শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই কারণবদ্ধ। কিন্তু কার্য-কারণের কোনটিই তুরীয় অবস্থায় প্রযোজ্য নয়।

ব্যাখ্যা: তুরীয় যে এক বিশেষ অবস্থা, সেকথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ—এই অবস্থাগুলি নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু তুরীয় নিরপেক্ষ। প্রথম তিনটি অবস্থা অবিদ্যাপ্রসূত। কিন্তু তুরীয় স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ। এই অবস্থায় অজ্ঞানতা ও তার যাবতীয় আনুষঙ্গিক ঘটনা দূরীভূত হয়। অজ্ঞানতার প্রভাব প্রাজ্ঞ স্তর পর্যন্ত। সূর্যের আলোতে যেমন সকল অন্ধকারের অবসান ঘটে ঠিক তেমনি কোন মানুষ তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাঁর সমস্ত অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়।

নাত্মানং ন পরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্যং তৎ সর্বদৃক্ সদা॥১২

অন্বয়: প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ); আত্মানং ন ([যেমন পূর্বে বলা হয়েছে] নিজেকে জানে না); পরং চ ন (অন্য কিছুও জানে না); সত্যং ন অনৃতম্ (সৎ অসৎ জানে না); কিঞ্চন ন এব সংবেত্তি (কোন কিছুই উত্তমরূপে জানে না); তুরীয়ম্ (চতুর্থটি); সদা (সবসময়); তৎ সর্বদৃক্ (সর্ব বস্তু দর্শনে সক্ষম)।

সরলার্থ: প্রাজ্ঞ অবস্থায় ব্যক্তি নিজেকে জানে না, অন্য কিছুও জানে না। এ অবস্থায় সৎ-অসৎও জানা যায় না। অর্থাৎ এ অবস্থায় কোন কিছুই জানা যায় না। তুরীয় অবস্থায় ব্যক্তি কিন্তু সর্বদাই সবকিছু জানেন।

ব্যাখ্যা: প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি? প্রাজ্ঞ অবস্থায় তুমি সম্পূর্ণ অচেতন। তুমি তখন সুযুপ্তিতে থাক। তখন তুমি তোমার আত্মা বা অন্য কোন কিছুই জান না। কোন্‌টি করা ঠিক কোন্‌টি ভুল এ বোধও তখন থাকে না। অজ্ঞানতার বীজ সবসময়েই তোমার মধ্যে রয়েছে। এই অজ্ঞানতা দেখা যায় না কিন্তু এ থাকে ঠিকই। সেইজন্য ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আবার সেই স্থানে ফিরে যাও যেখানে নিদ্রার পূর্বে ছিলে। তুমি আবার সেই একই ব্যক্তি যে কর্মের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ। তুমি তখন আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ।

কিন্তু তুরীয় অবস্থায় তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। তুমি তখন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যের মতো। এই অবস্থায় তুমি কোন কিছুতেই লিপ্ত নও। তুমিই তোমার আত্মা—যা অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র। তুমি অপরিবর্তনীয়। কিছুই তখন তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই অবস্থায় তুমি সর্বদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং সতত বিদ্যমান।

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্যোয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে॥১৩

অন্বয়: প্রাজ্ঞঃ তুর্যয়োঃ উভয়োঃ (তুরীয় এবং প্রাজ্ঞ উভয়ই); দ্বৈতস্য অগ্রহণং তুল্যম্ (তাঁরা তুল্য এই অর্থে যে উভয়ের কেউই দ্বিতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নন [অর্থাৎ উভয়ের কারোর মধ্যেই দৃশ্যমান জগতের কোন বোধ নেই, কিন্তু একটি পার্থক্য আছে]); প্রাজ্ঞঃ বীজনিদ্রাযুতঃ (প্রাজ্ঞ নিদ্রাভিভূত কারণ সে অজ্ঞান); সা চ [নিদ্রা] তুর্যে ন বিদ্যতে (তুরীয় অবস্থা অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত)।

সরলার্থ: প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, উভয়ই এই দৃশ্যজগৎ সম্পর্কে অবহিত নয়। আবার উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্যও আছে। প্রাজ্ঞ নিদ্রাভিভূত কারণ সে অজ্ঞান, কিন্তু তুরীয় অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত।

ব্যাখ্যা: প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় অবস্থার মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় অবস্থাতেই আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই অবস্থায় দ্বিতত্ত্বের কোন প্রভাবও নেই, কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে এক মূল পার্থক্য আছে। আমরা দুই দেখি কেন? কারণ আমরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। সেই অভিন্ন আত্মা সর্বত্র ও সর্ববস্তুতে বিরাজমান। আমিই সেই আত্মা। তুমি আর আমি এক ও অভিন্ন। যদি আমি তোমাকে আঘাত করি তবে তো আমি নিজেকেই আঘাত করছি। কিন্তু আমি তোমাকে আঘাত করি কেন? কারণ আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক মনে করি এবং এই দ্বৈতবোধের জন্যই আমি তোমাকে আঘাত করি। যতক্ষণ এই দ্বিতত্ত্বের বোধ থাকবে ততক্ষণ আমি আমার কাছে এবং অপর সকলের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে থাকব, এই দ্বিতত্ত্ববোধ ত্যাগ করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

একথা সত্য যে প্রাজ্ঞ বা তুরীয় অবস্থায় আমরা দুই দেখি না। প্রাজ্ঞ অবস্থাকে স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার (সুষুপ্তির) অবস্থা বলে। তখন মানুষ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন এবং কোন কিছুর সম্পর্কেই অবহিত নয়। আবার নিদ্রাভঙ্গের ঠিক অব্যবহিত পরেই কোথায় আছি বা এটা কোন্ সময় তা বোঝা যায় না। অচিরেই অবশ্য এই ঘোর কেটে যায় এবং নিদ্রার পূর্বে যেখানে ছিলাম আবার সেখানেই ফিরে যাই। এর কারণ কি? কারণ আত্মা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। আমি এখনও অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত নই এবং তার ফলে দ্বৈতবোধের সাময়িক বিলুপ্তি সত্ত্বেও আমার জীবনে সেই অজ্ঞানতা। পুরোমাত্রায় বর্তমান।

কিন্তু তুরীয় অবস্থায় আমার মধ্যে অজ্ঞানতার লেশমাত্র থাকে না। তখন আমি জানি আমি কে? আমি জানি যে আমি সেই অভিন্ন আত্মা যা সকলের মধ্যে বিরাজিত।

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ।।১৪

অন্বয়: আদৌ (প্রথম দুটি [অর্থাৎ বিশ্ব—জাগ্রত অবস্থা ও তৈজস—স্বপ্নাবস্থা]); স্বপ্ন-নিদ্রা-যুতৌ (দৃষ্টিবিভ্রম এবং স্বপ্নযুক্ত নিদ্রার দ্বারা বিশেষিত); প্রাজ্ঞঃ তু অস্বপ্ন নিদ্রয়া (স্বপ্নহীন নিদ্রার দ্বারা বিশেষিত); নিশ্চিতাঃ (যাঁরা ব্রহ্মকে নিশ্চিতভাবে জানেন); তুর্যে (তুরীয় অবস্থায়); নিদ্রাং ন স্বপ্নং চ ন পশ্যন্তি (এই তিন অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে কোনটিকেই দেখেন না)।

সরলার্থ: প্রথম দুই অবস্থা—বিশ্ব এবং তৈজস, দৃষ্টিবিভ্রম ও স্বপ্নের দ্বারা বিশেষিত। প্রাজ্ঞ হল স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রার অবস্থা। যাঁরা ব্রহ্মকে যথার্থভাবে জানেন তাঁরা নিদ্রা ও স্বপ্নবস্থাকে

কখনো তুরীয়ের সঙ্গে যুক্ত করেন না।

ব্যাখ্যা: এখানে স্বপ্ন কথাটির অর্থ এক বস্তুকে অন্য আর এক বস্তুর রূপে দেখা। যেমন—রজ্জুসর্প অর্থাৎ রজ্জুর স্থানে সর্পকে দেখা। বিশ্ব তথা জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের এই ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম হয়ে থাকে। দুটি অবস্থায়ই কার্য-কারণের অধীন। প্রাজ্ঞ কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রম থেকে মুক্ত, কিন্তু এটিরও পিছনে কারণ আছে। আর সে কারণ হল অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা।

যেখানে সূর্যালোক আছে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না। আলো এবং অন্ধকার পরস্পরবিরোধী। একইভাবে তুরীয়ে অজ্ঞানতার স্থান নেই আবার তুরীয় কার্য-কারণের অধীন নয়। একথাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা দৃঢ়তার সাথে বলে থাকেন।

অন্যথা গৃহ্নতঃ স্বপ্নে নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে॥১৫

অন্বয়: অন্যথা গৃহ্নতঃ স্বপ্নঃ (স্বপ্নে [দৃষ্টিবিভ্রম] এক বস্তুর স্থানে অন্য বস্তু দেখা যায়); তত্ত্বং অজানতঃ নিদ্রা (নিদ্রিত অবস্থায় [অজ্ঞানতা] কোনও বস্তুকে যথার্থভাবে জানা যায় না); তয়োঃ বিপর্যাসে ক্ষীণে (এ দুটি ভ্রান্তির উপশম হলে); তুরীয়ং পদম্ অশ্নুতে (তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মর্যাদা অর্জন কর)।

সরলার্থ: স্বপ্ন এক দৃষ্টিবিভ্রম যেখানে এক বস্তুকে অন্য আর এক বস্তুরূপে দেখা যায়। নিদ্রা (সুষুপ্তি) হল অবিদ্যা যখন আমরা কিছুই জানতে পারি না। আমাদের নিকট এই দুই-ই বন্ধন। আমরা এ দুটিকে অতিক্রম করতে পারব তখনি যখন আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারব।

ব্যাখ্যা: আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে এই তুরীয় অবস্থা লাভ করা। কিন্তু কিভাবে এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনো যায়? আর এ পথের অন্তরায়ই বা কি?

এ পথের প্রতিবন্ধক হল মায়া। মায়ার প্রভাবে আমরা সত্যের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি না। অর্থাৎ আমরা অজ্ঞান। যেমন আকাশে সূর্য রয়েছে কিন্তু তা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তা দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে সেখানে সূর্য আদৌ নেই। এটাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা তথা অবিদ্যার জন্যই আমরা আমাদের যে প্রকৃত পরিচয় তুরীয় বা আত্মা তাঁকে জানতে পারি না।

মায়ার প্রভাবের আর এক লক্ষণ হল, আমরা এক বস্তুর স্থলে অন্য বস্তুকে দেখি। এ ক্ষেত্রে একটি অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত হল : রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই ভ্রান্তির ফলে আমরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। বিনাশশীল অস্থিমাংসের দেহকেই আমরা আত্মা

বলে মনে করি। কিন্তু আত্মা অবিনাশী। সাপ যেমন দড়ির উপর আরোপিত, ঠিক তেমনি দেহও আত্মায় ন্যস্ত।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে না পারে ততক্ষণ সে এই তিন অবস্থা—বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞের অধীন। এখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা নিদ্রারূপে বর্ণিত। এই অজ্ঞানতাই আমার ভাগ্যের নিয়ামক। বিশ্ব এবং তৈজস—এই প্রথম দুই অবস্থা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু প্রাজ্ঞ অবস্থায় এই বিভ্রান্তি আর থাকে না কিন্তু অজ্ঞানতা থাকে। এই অবস্থায় আমাদের মন নিষ্ক্রিয় এবং আমরা কোন বস্তু সম্পর্কে সচেতন নই। এই অবস্থার ঊর্ধ্বে হল তুরীয় অবস্থা, এই তুরীয়ই আমাদের প্রকৃত আত্মা। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা যা আত্মজ্ঞান লাভের অন্তরায় এবং নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তাকে অতিক্রম করতে হবে। তবেই আমরা এই তুরীয় অবস্থা লাভ করতে পারব। অজ্ঞানতা আমাদের বিভ্রান্ত করে এবং সত্যকে জানার পথে বাধার সৃষ্টি করে। সত্যকে জানতে হলে এই অজ্ঞানতাকে দূর করতে হবে।

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥১৬

অন্বয়: অনাদি মায়য়া (অনাদি মায়ার প্রভাবে); সুপ্তঃ জীবঃ যদা প্রবুধ্যতে (যখন জীবাত্মা আত্মজ্ঞান লাভ করে); অজম্ (জন্ম [মৃত্যু]-রহিত); অনিদ্রম্ (অজ্ঞানতাবর্জিত); অস্বপ্নম্ (দৃষ্টিবিভ্রমরহিত); অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা (তখন সে সব বস্তুর একত্ব বুঝতে সক্ষম)।

সরলার্থ: অনন্ত কাল ধরে মায়া সক্রিয় এবং তারই প্রভাবে জীবাত্মা নিদ্রিত, যেন সম্মোহিত। জাগ্রত হলে জীবাত্মা নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করে। সে তখন অনুভব করে যে সে অজম্ (জন্মরহিত), অনিদ্র (অর্থাৎ অজ্ঞানতারহিত), এবং স্বপ্নবর্জিত (অর্থাৎ ভ্রমমুক্ত)। জীবাত্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই একমাত্র সত্য।

ব্যাখ্যা: এখানে গৌড়পাদ বলছেন, আমরা সকলেই বিভ্রম তথা মায়ার অধীন। আমরা যেন সম্মোহিত হয়ে আছি। আমরা নিজেদেরকে পরস্পরের থেকে এবং এই জগৎ থেকে পৃথক বলে মনে করি। নিজেদের অধিকার, নিজেদের সুযোগসুবিধা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আমরা অকারণ ব্যতিব্যস্ত হই। অধিকারের দাবিতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হই। ভুলে যাই যে অন্যেরও অধিকার আছে। যদি আমরা বিষয়টিকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি তাহলে সমগ্র ব্যাপারটিকেই এক বিরাট কৌতুক বলে মনে হয়। এই দ্বিতত্ত্ব অর্থাৎ 'আমি' এবং 'তুমি'র এই যে দুইবোধ এর সবটাই একটা বিরাট কৌতুকের বিষয়। কিন্তু ঠিক

এই মুহূর্তে এই জগৎকে কৌতুক বলে মনে হয় না। বরং এই জগৎকে অতীব সত্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। গৌড়পাদ বলছেন এই মায়া অনাদি, অর্থাৎ এর কোন শুরু নেই।

আচার্য শঙ্কর মায়ার দুটি দিক তথা দুই প্রকার বিভ্রমের কথা বলছেন। এই দুটি, দিক হল 'অন্যথা গ্রহণম্' আর 'অগ্রহণম্'। 'অন্যথা গ্রহণম্' এর অর্থ ভুল দেখা। সত্য এখানে বিকৃতরূপে প্রতিভাত। যে ধরনের বিকৃতি স্বপ্নে ধরা পড়ে। যেমন, আমি হয়তো স্বপ্ন দেখছি আমি হাওয়ায় উড়ে চলেছি। 'অগ্রহণম্' হল, না দেখা। যেমন, আমি ঘুমিয়ে আছি, সে সময়ে কেউ আমার ঘরে প্রবেশ করলেও তাকে আমি দেখতে পাই না। এমনকি সে যে এসেছিল তাও আমি জানতে পারি না। সব অবস্থাতেই আমরা এই অজ্ঞানতার দ্বারা তাড়িত। কিভাবে? প্রথমত এই অজ্ঞানতার ফলেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমরা যে কে তা আমরা জানতেও পারি না। এই হল 'অগ্রহণম্' বা না দেখা। আর এই না দেখার জন্যই আমরা নিজেদেরকে পরস্পরের থেকে আলাদা বলে মনে করি। একেই বলে 'অন্যথা গ্রহণম্' বা ভুল দেখা। আমরা এই দেহকেই 'আমি' বলে মনে করি। আমার শরীর এক ধরনের, তোমার হয়তো আর এক ধরনের। এই দেহগত বিভিন্নতার জন্য আমরা নিজেদেরকে একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, শরীর নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনারও অন্ত নেই। শরীর অসুস্থ হলেই আমরা নিজেদের অসুস্থ বলে মনে করি। আমরা এই কথাটি কিছুতেই মনে রাখি না যে, এই দেহ ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু দেহের মধ্যে যে দেহী আছেন তিনিই চিরন্তন অর্থাৎ চিরস্থায়ী। আবার আমরা দেখতে পাই না যে একই আত্মা আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন। আর তিনিই হলেন পরমাত্মা। এই দুই প্রকার ভুলই আমাদের অবিদ্যার মূল কারণ।

প্রশ্ন হল, এর শেষ কোথায়? গৌড়পাদ বলছেন: 'যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে'—যখন জীবাত্মা জাগে। তিনি বলছেন, আমরা যেন এখন এই মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের কাছে এই জগৎ বা অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যখন আমরা জেগে উঠি তখন আবার আমরা সবকিছু সম্পর্কে সচেতন হই। ঠিক একইভাবে মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হলে আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করি এবং উপলব্ধি করি যে আমাদের সকলের মধ্যে এক সত্তা বিদ্যমান। তখন আমরা ভাবি : 'কি নির্বোধই না আমি ছিলাম! আমি ভাবতাম, এই জগৎ থেকে আমি আলাদা। কিন্তু আসলে আমি তা নই।' যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হল : তিনি 'অজম্'—জন্মরহিত, অনিদ্রম্—অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত, অস্বপ্নম্—ভুলত্রুটিবিহীন, এবং অদ্বৈতম্—দ্বিতত্ত্ববর্জিত।

অজম্—জন্মরহিত। তোমার জন্মও হয়নি, তোমার মৃত্যুও হবে না। তোমার কখনো জন্ম হতে পারে না কারণ তুমি সকলের আত্মা। দেহের জন্ম-মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তা তোমার প্রকৃত স্বরূপকে প্রভাবিত করতে পারে না। 'তুমি' সবসময়ই এক। হিন্দুদর্শনে 'অজম্'-এর ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুমতে এই হল সারকথা—দেই এবং আত্মা আলাদা। দেহ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা শাশ্বত ও নিত্য। এটাই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু আমরা তা জানি না। এটা এমন নয় যে আত্মোপলব্ধির পূর্বে তুমি একরকমের ছিলে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করার ফলে তোমার পরিবর্তন হয়েছে, এবং তুমি 'অজম্' অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ। না, তুমি সবসময়ই জন্মরহিত। ব্রহ্মাস্বরূপ তুমি। মায়ানিদ্রা দূর হলে একথা জানা যায়।

আচার্য শঙ্কর বলেছেন আত্মা 'অজম্'। কারণ আত্মা অবিকৃত, অপরিবর্তনীয়, স্বাধীন। হিন্দুদর্শনের সকল শাখা এইকথা স্বীকার করেন যে সৃষ্টি থাকলে তার বিনাশও থাকবে। যৌগিক বস্তু বলে যদি কিছু থাকে যা বহু বস্তুর সমষ্টি, তবে তার পরিবর্তন হবেই। সেইজন্যই উপনিষদ আত্মার সম্বন্ধে 'নিষ্কলম্' এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। 'নিষ্কলম্' কথাটির অর্থ অবিভাজ্য। যদি কোন বস্তু বিভিন্ন অংশের সমষ্টি হয় তবে কোন-না-কোন দিন এই অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হবেই। যেমন আমাদের এই দেহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আমার একটি পা, হাত বা চোখ বা যে কোনও একটি অঙ্গের হানি হতে পারে। কিন্তু তবুও আমি বেঁচে থাকি। তার কারণ 'আমি' পা বা হাত বা চোখ কোনটিই নই। কিন্তু দেহের সকল অংশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে দেহটি আর জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু আত্মা অবিভাজ্য, অখণ্ড এক সত্তা। বৌদ্ধধর্মেও একথা আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধরা বলেন: 'তোমরা রথের কথা বল। কিন্তু রথটি কোথায়? আমায় রথটিকে একবার দেখাও দেখি।' যদি তুমি রথের কোন একটি অংশ স্পর্শ করে দেখাও, তখন তাঁরা বলবেন : ও! এটি তো রথের চাকা। যদি তুমি রথের অন্য অংশ স্পর্শ করে দেখাও তখন তাঁরা বলবেন : এটি তো রথের পাটাতন। যদি বলা হয় রথ এ সব অংশেরই সমষ্টি তখন তাঁরা বলবেন, কিন্তু রথটি কোথায়? যদি এটি বিভিন্ন অংশের সমষ্টি হয় তবে এর মধ্যে রথ বলে তো আর কিছু নেই।

আচার্য শঙ্করের মতে এ জগতে সকল বস্তুই ষড়্‌বিকার বা ছয় প্রকারের পরিবর্তনের অধীন। জন্ম, কিছুকাল স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি বা সুপক্ক অবস্থা, ক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ—এই ছয় অবস্থাভেদ বা বিকার। যেহেতু বস্তুমাত্রই কার্য-কারণের অধীন, তাই সকল বস্তুই এই ষড়্‌বিকারের শিকার। বৌদ্ধদর্শনে এই কার্য-কারণ সম্পর্ককে বলা হয়েছে 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'। একটি বস্তু অন্য আর একটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল। এই জগৎ বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টিমাত্র। এইসব বস্তুসকল একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এ এক কার্য-কারণের শৃঙ্খলের মতো এবং জগৎ এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু আত্মা কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। আত্মা

স্বাধীন, স্বয়ম্ভূ। আত্মা অবিকৃত। তিনি কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। তাই আত্মা 'অজম্' অর্থৎ জন্মরহিত, নিত্য এবং শাশ্বত।

'অনিদ্রম্' অর্থ হল নিদ্রাহীন। নিদ্রাবস্থায় কি ঘটে? চতুর্দিক তখন অন্ধকার। অজ্ঞানতাকে 'তমস্' বা অন্ধকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্ধকার ঘরে আমি কাউকে দেখতে পাই না। এমনকি কেউ যদি আমার সামনে দাঁড়িয়েও থাকেন তাহলে ও তাঁকে দেখতে পাই না। ঠিক তেমনিভাবে অজ্ঞানতাজনিত অন্ধকারের প্রভাবে আমি আত্মাকে দেখতে পাই না। কিন্তু আত্মা সবসময়ই রয়েছেন। তাই গৌড়পাদ জ্ঞানকে নিদ্রাহীন অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যখন আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব তখন জানব আমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। মানুষ সমাধি বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দ্বারা তুরীয় অবস্থা বা আত্মার 'চতুর্থ' অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুষুপ্তি অবস্থাতেও আমরা আনন্দ লাভ করে থাকি। কিন্তু তখন আমাদের কোনও দেহবোধ থাকে না। এমনকি এ জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ঘুম ভাঙার পরে আমরা আবার সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসি। সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা অজ্ঞানতাকে নাশ করতে পারে না। সমাধির মাধ্যমে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলে তখনি অজ্ঞানতার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। আমরা তখন 'অনিদ্রম্' অর্থাৎ অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত। আবার 'অস্বপ্নম্'ও বটে অর্থাৎ ভ্রান্তিবিহীন। এখানে স্বপ্ন বলতে ভুল দেখা বোঝাচ্ছে, যেমন দড়িকে সাপ দেখা। তুরীয় অবস্থায় কোন দুই বোধ থাকে না। থাকেন কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তুরীয় অবস্থার পর মন স্বাভাবিক ভূমিতে ফিরে এলেও দ্বিতত্ত্বের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হয় না। তখন সব বৈচিত্রের মাঝে আমরা কেবল ঐক্যই দেখে থাকি।

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।।১৭

অন্বয়: প্রপঞ্চঃ যদি বিদ্যেত (যদি এই দৃশ্যমান জগতের সত্যিই অস্তিত্ব থাকত); নিবর্তেত ন সংশয়ঃ (নিঃসন্দেহে তার পরিসমাপ্তিও ঘটত); ইদং দ্বৈতম্ (থাকা ও না থাকা এই দ্বিতত্ত্বই এর প্রমাণ); মায়ামাত্রম্ ([এ জগৎ) ভ্রান্তিমাত্র); অদ্বৈতং পরমার্থতঃ (অদ্বয় [ব্রহ্ম] একমাত্র সত্য)।

সরলার্থ: যদি এই দৃশ্যমান জগতের সত্যিই অস্তিত্ব থাকত তবে কোন এক সময়ে সেটি লুপ্তও হত। কিন্তু এ জগতের অস্তিত্ব নেই। এর অস্তিত্ব একটি ভ্রান্তিমাত্র। আসল কথাটি হল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

ব্যাখ্যা: এখানে একটি আপত্তি ওঠে : জগৎ থাকতে ঐক্যের বোধ হয় কি করে? এর উত্তরে গৌড়পাদ বলছেন : এ জগৎ তো শুধু এক দৃষ্টিবিভ্রম। সুতরাং যা নেই তার আবার লোপ হয় কি করে? এর অস্তিত্ব কখনই ছিল না, থাকবেও না। ভুল সবসময়ই ভুল। আমার স্বরূপবোধ হলে আমি অনুভব করি, এ জগৎ বলে কখনো কিছু ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল জগতের অস্তিত্ব আছে। তাই এর (যা কখনো ছিল না) লোপ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। এ কতকটা স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার মতো। এতক্ষণ আমি যা দেখছিলাম তা যে স্বপ্নমাত্র একথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ জাগ্রত হওয়ামাত্রই আমি অনুভব করি এ সত্য ঘটনা নয়। স্বপ্নে যেসব ঘটেছে বলে মনে হয় সেসব কখনো ঘটেইনি। ঠিক একইভাবে মায়ানিদ্রা দূর হয়ে যখন আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি, তখন আমরা সর্বভূতে ব্রহ্মকেই দেখি। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই দেখি না।

যাদুকর নানারকম খেলা দেখায়। আর সেগুলিকে আমরা সত্য বলে মনে করি। অবশ্য শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারি খেলাগুলি সব ফাঁকি। যাদুকরই সত্য, তার দেখানো ভেলকিবাজি সত্য নয়। একই কথা এই জগৎ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এ জগৎ কখনই ছিল না। তবে যে আমরা এ জগৎকে দেখছি, এ দেখা আসলে দৃষ্টিবিভ্রম-মাত্র। সত্য এক এবং তা স্বয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আমরা যদি আর কিছু দেখে থাকি, তা ভুল।

বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে॥১৮

অন্বয়: বিকল্পঃ (বহু [যেমন আচার্য, শিষ্য, শিক্ষকতা ইত্যাদি]); বিনিবর্তেত (ধ্বংস হতে বাধ্য); যদি (যদি); কেনচিৎ (কোনও কারণে); কল্পিতঃ (কল্পিত [শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে]); উপদেশাৎ (উপদেশের শেষে); অয়ং বাদঃ (এই বহুর প্রশ্নটি [লোপ পায়]); জ্ঞাতে (যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে); দ্বৈতং ন বিদ্যতে ('দুই' বলতে আর কিছু থাকে না)।

সরলার্থ: কেবলমাত্র কোন কারণে যদি বহুর প্রয়োজন হয় যেমন—আচার্য, শিষ্য এবং শিক্ষকতা ইত্যাদির কল্পনা করতে হয়, তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কল্পনারও সমাপ্তি ঘটে। শিক্ষাদানের ফলে যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন বহুর অস্তিত্বের অবসান ঘটে।

ব্যাখ্যা: এখানে আরও একটি আপত্তি ওঠে : যদি দুই-এর কোনও অস্তিত্ব না থাকে তবে গুরু-শিষ্যই বা এলেন কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌড়পাদ বলছেন : 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য, সত্য কি তা মানুষকে শেখাবার জন্য

সাময়িকভাবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ককে মেনে নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে গুরুও কেউ নেই, শিষ্যও কেউ নেই। আমরা একথা যখন উপলব্ধি করতে পারব তখনি বুঝতে পারব।' যখন যীশুখ্রীষ্টের কাছে লোকজন এসে বলল তাঁর মা তাঁকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন যীশুখ্রীষ্ট বলছেন : '(আমার মা) কে?' অর্থাৎ মা ছেলের এই সম্পর্কটি কি? এও তো মায়া। মায়ার লক্ষণই হল 'অহংতা' (আমি) আর 'মমতা' (আমার)। অর্থাৎ আমার মা, আমার বাবা, আমার সন্তান ইত্যাদি। এ সবকিছুই 'অহং'কে কেন্দ্র করে।

কিন্তু এই 'আমি-আমার বোধ' থাকলে দোষেরই বা কি? দোষ হল এই যে এর দ্বারা আমরা নিজেদের বড় সীমাবদ্ধ করে ফেলি। তখন আমাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে আমরা একে অপরের থেকে আলাদা। এই দেহ, পরিবার, দেশ, ধর্ম এসবের দ্বারা আমরা নিজেদের আবদ্ধ করে রাখি। এসবই বন্ধন। এইসব ধারণার অবসান ঘটলে আমরা মুক্তিলাভ করে থাকি। যিনি নিজের মধ্যে সকলকে আর সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেন তিনিই পরম সত্যকে জেনেছেন। তাঁর কাছে দুই বলে কিছু নেই। তিনি সর্বভূতে এবং সর্বত্র এক আত্মাকেই দেখেন। এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি।

উপনিষদ

সোহমাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ
পাদা অকার উকারো মকার ইতি।।৮

অন্বয়: সঃ (সে [পূর্বোক্ত ব্যক্তি]); অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা); অধ্যক্ষরম্ (বর্ণমালার আকারে); ওঙ্কার (এটি ওম্); অধিমাত্রম্ (মাত্রা [বর্ণমালা] রূপে); পাদাঃ মাত্রাঃ (পাদ সকলই মাত্রা বা বর্ণ [সেইরূপ]); অকারঃ (অ এই বর্ণটি); উকারঃ (উ এই বর্ণটি); মকারঃ (ম এই বর্ণটি); মাত্রা চ [এইসব] মাত্রাও); পাদঃ (পাদসকল [অর্থাৎ এ সবই অভিন্ন])।

সরলার্থ: ওঁকারের বর্ণমালারূপে (অর্থাৎ অ, উ, ম) এখানেও সেই একই পরমাত্মা। আত্মার পাদসমূহই ওঁকারের মাত্রা। আবার ওঁকারের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। অকার, উকার, মকার এই তিনটি ওঁকারের মাত্রা।

ব্যাখ্যা: পূর্বেই বলা হয়েছে আত্মা চতুষ্পদ্—বিশ্ব (জাগ্রত অবস্থা), তৈজস্ (স্বপ্ন অবস্থা), প্রাজ্ঞ (সুষুপ্তি অবস্থা) এবং তুরীয় (শুদ্ধ চৈতন্য)। তুরীয়ই আত্মার প্রকৃত অবস্থা।

এই অ, উ, ম তিনটি বর্ণের দ্বারা আত্মার প্রথম তিনটি অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। এইজন্যই বর্তমান শ্লোকে পাদ এবং মাত্রাকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তুরীয়কে অমাত্র (মাত্রার ঊর্ধ্বে) বলা হয়। কারণ তুরীয় অবস্থা বর্ণনার অতীত।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিম-
ত্বাদ্বাঽঽপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি
য এবং বেদ॥৯

অন্বয়: জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ (জাগ্রত অবস্থায় বৈশ্বানর [হিসেবে চিহ্নিত]); অকারঃ প্রথমা মাত্রা (প্রথম বর্ণ অ [কেন? কারণ]); আপ্তেঃ (ব্যাপী); আদিমত্বাৎ (এটিই প্রথম); বা (ও [বৈশ্বানর যেমন সকল জগৎ জুড়ে আছেন তেমনি প্রথম বর্ণ অকারও সবকিছু প্রকাশে সক্ষম, দুই-এর মধ্যে এটিই মিল]); যঃ (সাধক [যিনি]); এবং (এই [বৈশ্বানর]); বেদ (জানেন); হ বৈ (নিশ্চিতভাবে); সর্বান্ কামান আপ্নোতি (তিনি সমস্ত কাম্য-বস্তু পেয়েছেন); আদিঃ চ ভবতি (তিনি সর্বোত্তমও বটে)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় বৈশ্বানররূপী পরমাত্মা 'অ' এই বর্ণের দ্বারা চিহ্নিত। বৈশ্বানর এবং 'অ' উভয়ই সর্বব্যাপী। যিনি একথা নিশ্চিতভাবে জানেন তাঁর সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা: 'অ' বর্ণটি বৈশ্বানর—জাগ্রত অবস্থার জীবাত্মা। এটি আবার বিরাট তথা দৃশ্যমান জগৎও বটে। কেন? কারণ 'অ' হল প্রথমা অর্থাৎ শুরু। বর্ণমালার প্রথম অক্ষর হিসাবে 'অ'কার সকল অক্ষরকে ব্যাপ্ত করে আছে। তেমনি বৈশ্বানরও সকল জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছে। সুতরাং অতি সঙ্গতভাবেই 'অ'কে বৈশ্বানরের প্রতীক বলা হয়েছে।

প্রতীক এবং যার প্রতীক, তারা এক ও অভিন্ন। অ এবং বৈশ্বানর যে এক ও অভিন্ন, এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন তাঁর সকল কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি আপ্তকাম। এরূপ ব্যক্তি সকলের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠেন।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি
হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে
ভবতি য এবং বেদ॥১০

অন্বয়: স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ (স্বপ্নাবস্থায় আত্মা); উকারঃ দ্বিতীয়া মাত্রা ('অউম'-এর দ্বিতীয় অক্ষর উ-এর তুল্য); উৎকর্ষাৎ উভয়ত্বাৎ (উভয়ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দুজনেই মধ্যবর্তীস্থান অধিকার করে আছেন [বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের মধ্যবর্তী অবস্থা হল তৈজস এবং উকার হল অ এবং ম-এর মধ্যবর্তী]); যঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তি); এবম্ (উপরোক্ত মিল); বেদ (জানেন); জ্ঞানসন্ততিম্ উৎকর্ষতি (বোঝবার ক্ষমতার উন্নতি); [সতাম্] সমানঃ ভবতি (এক

সাধু-পুরুষে পরিণত হন); অস্য কুলে (এমন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পরিবারে); অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি (এমন কেউই জন্মগ্রহণ করেন না যিনি ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে অক্ষম)।

সরলার্থ: স্বপ্নাবস্থায় আত্মার তথা তৈজসের অবস্থান 'অউম'-এর উ-এর তুল্য। কারণ উভয়ই মধ্যবর্তীস্থান অধিকার করে আছেন এবং উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যিনি এই দুই-এর অভিন্নতা জানেন তাঁর বোঝবার ক্ষমতা সকলের চেয়ে বেশি। এবং তিনি সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর পরিবারের সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: উ অক্ষরটি হল তৈজস, যা স্বপ্নবস্থার আত্মার সঙ্গে তুলনীয়। স্বপ্নাবস্থাতেও অবশ্য আমাদের মধ্যে চৈতন্য থাকে। কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই একই ব্রহ্ম বিরাজিত। যিনি এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম, তাঁর বংশে কোনও 'অব্রহ্মবিৎ'-এর জন্ম হয় না। সে বংশের সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হবেন। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসার্থেই উপনিষদ একথা বলছেন।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা
মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥১১

অন্বয়: সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ হল সেই অবস্থা যেখানে আত্মা গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা উপভোগ করেন); মকারঃ তৃতীয় মাত্রা (এটি তৃতীয় অবস্থা ['অউম'-এর ম-এর তুল্য]); মিতেঃ (পরবর্তী [বিশ্ব ও তৈজসের]); অপীতেঃ (একত্বে লীন হবার এটি তোরণদ্বার); যঃ এবং বেদ (যিনি এই একাত্মতা অনুভব করেন); ইদং সর্বং [জগৎ] মিনোতি (এই জগৎকে [জানেন]); চ অপীতিঃ ভবতি (এবং এর বিশ্রামস্থল হয়ে ওঠেন)।

সরলার্থ: সুষুপ্তি অবস্থার আত্মা তথা প্রাজ্ঞকে 'অউম'-এর তৃতীয় অক্ষর 'ম'-এর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে অ এবং উ-এর সাথে যথাক্রমে বিশ্ব এবং তৈজসের সমাপ্তি ঘটে সেখানেই প্রাজ্ঞ এবং ম উভয়েরই অবস্থান। প্রাজ্ঞ এবং ম হল একত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার সিংহদ্বার। যিনি একথা জানেন তিনি এ জগৎকে জানেন, এবং জগতের বিশ্রামস্থল হয়ে ওঠেন।

ব্যাখ্যা: প্রাজ্ঞ অবস্থা হল সুষুপ্তি অবস্থার আত্মা। 'অউম'—এর ম-কারের সাহায্যে এই অবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব এবং তৈজস প্রাজ্ঞে লীন হয়। ঠিক একইভাবে অ এবং উ উভয়েই ম-কারে লীন হয়। প্রাজ্ঞ এবং ম-কারেই দ্বৈতদৃষ্টির সমাপ্তি ঘটে। দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মাঝে এদের অবস্থান। এসবের ঊর্ধ্বে হল তুরীয় অবস্থা যা শুদ্ধ চৈতন্য, পরমাত্মা। যখন মানুষ এই অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন সমগ্র বিশ্বের সাথে তিনি একাত্মতা

অনুভব করেন। তখন সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র একটি সত্তাই বিরাজ করেন। আর তা হল আত্মা।

গৌড়পাদ-কারিকা

বিশ্বস্যাত্ববিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসংপ্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ॥১৯

অন্বয়: বিশ্বস্য (বিশ্বরূপে পরিচিত ব্রহ্ম); অত্ব বিবক্ষায়াম্ (বিশ্ব 'অ'-এর অনুরূপ তা বোঝাবার জন্য); আদিসামান্যম্ উৎকটম্ (এ কথাটি স্পষ্ট যে তারা উভয়েই প্রথম); [বিশ্বস্য] মাত্রা-সংপ্রতিপত্তৌ (এটি দেখানো যে তারা [বিশ্ব ও মাত্রা] সদৃশ); চ আপ্তি সামান্য (ব্যাপকতা এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য); স্যাৎ (সেটিও ওখানে আছে)।

সরলার্থ: বিশ্ব হল প্রথম অবস্থা, বর্ণের মধ্যে অ-কারও প্রথম। যেহেতু উভয়েই প্রথম সেহেতু তারা এক এবং অভিন্ন। বিশ্বকে যদি অ (মাত্রা)-রূপে মনে করা হয় তবে এদের মধ্যে ব্যাপকতার সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাখ্যা: আত্মার প্রথম অবস্থা হল জাগ্রত অবস্থা, যা বিশ্ব বলে পরিচিত। এই অবস্থায় আত্মা সমগ্র জগৎ জুড়ে অবস্থান করেন। আবার বর্ণমালার প্রথম বর্ণটি 'অ'। আর প্রতিটি বর্ণের মধ্যে এই 'অ'-কার রয়েছে। তাই এটি সর্বব্যাপী।

এইভাবে বিশ্ব এবং অ-কার উভয়ই প্রথম ও সর্বব্যাপী। সুতরাং এরা এক ও অভিন্ন।

তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞান উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফূটম্।
মাত্রাসংপ্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্॥২০

অন্বয়: তৈজসস্য উত্ব বিজ্ঞানে (যদি তুমি জান যে 'তৈজস' [আত্মার স্বপ্নাবস্থা] হল উকার); উৎকর্ষঃ ([এর] শ্রেষ্ঠত্ব); স্ফুটং দৃশ্যতে (তখন তোমার কাছে তা স্পষ্ট); মাত্রা সংপ্রতিপত্তৌ (যদি এর অবস্থান বিবেচনা কর); স্যাৎ উভয়ত্বম্ (মধ্যবর্তীরূপে আছে); তথাবিধম্ (এটি স্পষ্ট)।

সরলার্থ: যদি তৈজসকে 'উ' হিসেবে আমরা দেখি, তাহলে এর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টই বুঝতে পারব। (উ-কারের মতোই) তৈজসও দুই অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারা তৈজসের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: উ-কার যেমন অ এবং ম এর মধ্যবর্তী, ঠিক তেমনি তৈজসও বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্তী অবস্থা। এই কারণেই তৈজস ও উ-কার এক ও অভিন্ন।

অ, উ এবং ম যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের প্রতীক। অর্থাৎ (অ, উ, ম) এরা আত্মার বিভিন্ন অবস্থার প্রতীক।

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মানসামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসংপ্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ॥২১

অন্বয়: প্রাজ্ঞস্য (আত্মার তৃতীয় অবস্থা); মকারভাবে (ম-কারে); মান-সামান্যম্ (একই অবস্থার অধিকারী); উৎকটম্ (আপাত); মাত্রা সংপ্রতিপত্তৌ (বর্ণরূপে); লয়-সামান্যম্ (উভয়েরই শেষ); এব (হওয়া); চ (ও)।

সরলার্থ: আত্মার তৃতীয় অবস্থা হল প্রাজ্ঞ। অবস্থার দিক থেকে প্রাজ্ঞ (অউম-এর) ম-এর তুল্য। উভয়ের মধ্যে এটিই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেমন 'অউম'-এর শেষ বর্ণ ম-কার, ঠিক তেমনি প্রাজ্ঞ হল আত্মার চূড়ান্ত অবস্থা। এইখানে উভয়ই সদৃশ।

ব্যাখ্যা: 'ম'কারকে সুষুপ্তি তথা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবকে বলা হয় প্রাজ্ঞ। মানুষ তৈজস অবস্থায় অর্থাৎ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে মনের দ্বারাই নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। কিন্তু প্রাজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞতা বলতে আর কিছুই থাকে না। তখন দেহ-মন দুই-ই নিষ্ক্রিয়। মানুষ তখন কিছুই জানতে পারে না। সাময়িকভাবে এ যেন মৃত্যুর সমান। সেজন্যই এখানে 'লয়' বা 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'লয়'—প্রাজ্ঞ এবং ম উভয়েরই বৈশিষ্ট্য। যখন মানুষ প্রাজ্ঞ অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে থাকে তখন তার দেহ-মন সব নিষ্ক্রিয়। সেইরকম 'অউম' যখন ম-কারে লীন হয় তখন সেখানে আর কোনও শব্দ থাকে না।

ত্রিষু ধামসু যস্তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ॥২২

অন্বয়: যঃ (তিনি [বিবেকীপুরুষ যিনি]); নিশ্চিতঃ (স্থির মনে); ত্রিষু ধামসু (তিন অবস্থায় [বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ]); সামান্যং তুল্যং বেত্তি (জানেন যে, এক এবং অভিন্ন আত্মাই আছেন); সঃ (তিনি [এইভাবে আত্মদর্শনে যিনি সক্ষম]); মহামুনিঃ (এক মহাঋষি); সর্বভূতানাং পূজ্যঃ (সর্বজন শ্রদ্ধেয়); বন্দ্যঃ (সর্বজনপূজ্য); চ এব (অবশ্যই)।

সরলার্থ: অচঞ্চল বিবেকী ব্যক্তি এক ও অভিন্ন আত্মাকে তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় দেখেন। এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতই মহর্ষি। তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় এবং সকলের ভালোবাসার পাত্র।

ব্যাখ্যা: ত্রিষু ধামসু—তিনটি অবস্থায়। এই তিন অবস্থা হল স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে এই তিন অবস্থা হল জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আর সমষ্টির ক্ষেত্রে এই তিন অবস্থা হল—বিরাট (সমষ্টি স্থূল দেহ), হিরণ্যগর্ভ (সমষ্টি মন), এবং ঈশ্বর (সমষ্টি কারণ শরীর)। সামান্যং-এর অর্থ হল সাধারণ বা অভিন্ন। আমরা দেখি যে, এই তিন অবস্থার মধ্যে একই ব্রহ্ম অর্থাৎ একই সত্তা রয়েছেন।

বেত্তি নিশ্চিতঃ—তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন। নিশ্চিত কথাটির অর্থ কোন বস্তু নিয়ে কোনও সংশয় না থাকা। কোন বিষয়ে মনে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 'ওঃ, ইনিই ব্রহ্ম—এ বিষয়ে আমি আর এখন বিভ্রান্ত নই।' স্থূল বা সূক্ষ্ম যেরূপেই হোক না কেন, সকলই ব্রহ্ম। রূপের বা আকারের পার্থক্যে কিছু যায় আসে না। আমরা তখন শুধুমাত্র ব্রহ্মকেই দেখি। তখন ভালো-মন্দ, বড়-ছোট, সবই ব্রহ্ম। এ শুধু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয়। আমরা বুদ্ধি দিয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু ঐ জাতীয় জ্ঞান আমাদের জীবনকে পালটাতে পারে না। কিন্তু আত্মজ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা থেকে এবং এই জ্ঞানকে হৃদয়ের গভীরে অনুভব করা যায়। তখন আমরা ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা অনুভব করি। মুণ্ডক উপনিষদ বলছেন : 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। তখন তিনি মহাঋষিতে পরিণত হন। এ এক অনির্বচনীয় অবস্থা। যেহেতু জাগতিক সবকিছুকে তিনি ত্যাগ করেছেন, সেহেতু এ জগতের পেছনে যে সত্য আছে তা উপলব্ধি করতে তিনি তখন সক্ষম। তাঁর কাছে এ জগৎ ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নয়। সুতরাং তিনি এ জগতের সর্বত্র ব্রহ্মকেই দেখেন।

যিনি এই জ্ঞানের অধিকারী তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ও সর্বজনপূজ্য। কেন? কারণ, মানুষের কাম্য যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তা তিনি লাভ করেছেন। দ্বৈতবোধই আমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূল। যখন আমরা ভালো-মন্দ সবকিছুর মধ্যে সেই এক ব্রহ্মকেই দেখতে পারব তখনি আমরা সকল দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাব।

অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ॥২৩

অন্বয়: অকারঃ বিশ্বং নয়তে (যদি আমরা 'অ'কারের উপর গভীরভাবে ধ্যান করি, তখন অনুভব করি আমরাই বিশ্ব [যে আত্মা বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে আছেন—বিরাট]);

উকারঃ অপি চ তৈজসম্ ('উ' অক্ষরটিকে ধ্যান করলে আমরা দ্রুত তৈজস অবস্থা প্রাপ্ত হই [যে আত্মা সকল মনের সমষ্টি—হিরণ্যগর্ভ]); মকারঃ চ প্রাজ্ঞম্ ('ম' অক্ষরটির উপর গভীরভাবে ধ্যান করলে, আমরা হয়ে উঠি প্রাজ্ঞ [মায়াযুক্ত চৈতন্য—ঈশ্বর]); অমাত্রে (তুরীয় অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যের ধ্যান করলে); পুনঃ গতিঃ ন বিদ্যতে (তারপর আর কোনও গন্তব্যস্থান থাকে না)।

সরলার্থ: যখন আমরা 'অ'কারের (প্রথম অবস্থা) ধ্যান করি, তখন নিজেদেরকে 'বিশ্ব' বলে মনে হয়। যখন 'উ'কারের (দ্বিতীয় অবস্থা) ধ্যান করি তখন আমরা 'তৈজস' হয়ে যাই। সেইভাবে, যখন 'ম'-কারের (তৃতীয় অবস্থা) ধ্যান করি, তখন আমরা হই 'প্রাজ্ঞ'। কিন্তু যখন আমরা তুরীয়ের (চতুর্থ অবস্থা) ধ্যানে মগ্ন হই, তখন আমরা অসীম হয়ে যাই।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম অনন্ত ও বুদ্ধির অগম্য। তাই উপনিষদ আমাদের 'ওম্' এই প্রতীকের সাহায্য নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন। উপনিষদ অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন কেন 'ওম্' ব্রহ্মের সব থেকে উপযুক্ত প্রতীক। উপনিষদ বলছেন যে, 'ওম্' বহু ধ্বনির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা স্পষ্ট যে 'ওম্' তিনটি ভিন্ন ধ্বনি অর্থাৎ অ, উ, ম-এর সমষ্টি। সব শব্দ এই তিনটি ধ্বনির অন্তর্গত। তাই 'ওম্'কে বলা হয় নাদব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম।

'অ' হচ্ছে এই স্থূল জগৎ অর্থাৎ বিরাটের প্রতীক। 'অ'-কে ধ্যান করলে এই স্থূল জগৎকেই ধ্যান করা হয়। এর দ্বারা ব্যষ্টির ক্ষেত্রে বিশ্বে এবং সমষ্টির ক্ষেত্রে বিরাটে পৌঁছনো যায়। আবার 'উ'কারকে ধ্যান করলে সূক্ষ্ম জগৎকেই ধ্যান করা হয়। এই উ-কার ব্যষ্টিকে তৈজস এবং সমষ্টিকে হিরণ্যগর্ভে নিয়ে যায়। একইভাবে 'ম'কারকে ধ্যান করলে আমরা কারণ-অবস্থা প্রাপ্ত হই, ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যা প্রাজ্ঞ এবং সমষ্টির ক্ষেত্রে যা ঈশ্বর।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, একই ব্রহ্ম একদিকে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এবং অন্যদিকে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। উপনিষদ যে কথাটি আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চাচ্ছেন তা হল, ব্রহ্ম কোনও অবস্থার অধীন নন। এইসব অবস্থার অনবরত পরিবর্তন ঘটে থাকে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্রহ্ম সবসময়ই অপরিবর্তনীয়। এই অবস্থাগুলিকে আমাদের সত্য বলে মনে করা উচিত নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে মানুষটির যেমন কোনও পরিবর্তন হয় না, ঠিক তেমনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থার পেছনেও সেই একই ব্রহ্ম রয়েছেন। 'ওম্'-কে ধ্যান করলে এই তিন অবস্থায় স্থিত সেই ব্রহ্মকেই ধ্যান করা হয়। 'ওম্' থেকেই তুরীয় অবস্থায় পৌঁছনো যায়। এই তুরীয় অবস্থা উপরোক্ত তিন অবস্থার ঊর্ধ্বে।

তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলে, 'পুনঃ গতিঃ ন বিদ্যতে'—তখন আর যাওয়া-আসা কিছু থাকে না। তখন গন্তব্য বলে আর কিছু থাকে না। অনেক জায়গায় জীবনকে ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। আমরা সবসময়ই বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছি। এই গতি বলতে কি বোঝায়? স্থান পরিবর্তন, পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং অবস্থার পরিবর্তন। বস্তুর অনিত্যতা বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধদেব প্রায়ই বলতেন : 'তুমি কখনই সেই এক ব্যক্তি নও। প্রতি মুহূর্তে তোমার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন হয় শারীরিক না হয় মানসিক অথবা দুই-ই।' এ জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল। আমরা যখন আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারব তখন আমাদের আর কোনও আসা-যাওয়া থাকবে না। আমরা তখন আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারব। এই স্থূলদেহের পরিবর্তন হতে পারে। জড় বস্তুর ধর্মই এই, কারণ জড় বস্তু কখনো অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে তিনি জড় অর্থাৎ এই দেহ নন। দেহের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু তার প্রভাব দেহেই সীমাবদ্ধ। তার দ্বারা 'তিনি' প্রভাবিত হন না। 'তিনি' সবসময়ই এক, কারণ তিনি জানেন তিনি ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন কোন পরিবর্তনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

অনেক শাস্ত্রেই জ্ঞানকে আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে—জ্ঞানাগ্নি। এই জ্ঞানাগ্নিতে আমাদের কর্মবীজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতা থাকে ততক্ষণ আমাদের কামনা-বাসনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিও থাকে। এর ফলে আমরা সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সকলপ্রকার কর্মের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হই। কিন্তু 'আমরাই স্বয়ং ব্রহ্ম'—এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তখন কর্ম বলে আমাদের আর কিছু থাকে না। এই আগুনে কর্মবীজ পুড়ে যায়। বীজই যদি পুড়ে যায় তাহলে তার থেকে আর নতুন চারাগাছ জন্মাতে পারে না। কর্মের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম থাকতে পারে অর্থাৎ যে কর্ম এখনি ফল দিতে শুরু করেছে। জীবন্মুক্ত পুরুষেরও এই প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম চলতে থাকে। কিন্তু এই কর্ম জীবন্মুক্ত পুরুষকে বাঁধতে পারে না। তিনি এই কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ তিনি তখন নিজেকে দেহ থেকে পৃথক বলে মনে করেন। কুমোরের চাক ঘোরানো বন্ধ করার পরও চাকটি যেমন আপন গতিতেই খানিকক্ষণ ঘোরে, ঠিক তেমনি প্রারব্ধ কর্মের জন্য জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহও কিছুদিন থাকে। কিছুসময় পরে চাকটি যেমন আপনিই থেমে যায় তেমনি প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও আর জন্মমৃত্যু হয় না।

উপনিষদ

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত
এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাঽঽত্মানং য এবং বেদ॥১২

অন্বয়: অমাত্রঃ (অসীম); অব্যবহার্যঃ (ব্যবহারযোগ্য নয় [কারণ ইনি বাক্যমনাতীত]); প্রপঞ্চোপশমঃ (জগৎ তার অস্তিত্ব হারায় [কারণ সেখানে দুই বলে কিছু নেই]); শিবঃ (সদয়); চতুর্থঃ (তুরীয় [চতুর্থ অবস্থা]); এবম্ (যেরূপ বলা হয়েছে [জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা]); ওঙ্কারঃ অদ্বৈতঃ (ওম্ই অদ্বৈত); আত্মা এব (আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়); যঃ (সাধক); এবম্ (এইভাবে); বেদ (জানেন [তিনি]); আত্মনা (তিনি স্বয়ং); আত্মানম্ (পরমাত্মা); সংবিশতি (লীন হয়ে যান [আর কখনো ফিরে আসেন না])।
সরলার্থ: (যেমন আগে বলা হয়েছে), 'ওম্'-এর চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে পরমাত্মা। এই আত্মা অনন্ত, বাক্যমনাতীত, অদ্বয় এবং শিবস্বরূপ। দৃশ্যমান জগৎ এঁরই মধ্যে রয়েছে। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বলেন, জীবাত্মাই হলেন পরমাত্মা। যিনি এই তথ্য জানেন তিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। (তিনি নিজেকে আর কখনো জীবাত্মা বলে মনে করেন না।)
ব্যাখ্যা: অমাত্রঃ—আর কোনও অবস্থা নেই। যখন আমরা অ, উ, ম এই তিন অবস্থার ঊর্ধ্বে যেতে পারি, তখনি আমরা তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই অবস্থা হল শুদ্ধ চৈতন্য; ঈশ্বরাতীত। এই অবস্থায় স্থূল জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্নের জগৎও তখন থাকে না। সমগ্র জগৎ, এই দুই বোধ (দ্বিতত্ত্ব) তখন লোপ পায়। তুরীয় অবস্থায় আত্মাই একমাত্র থাকেন। সাধক ব্যক্তি তখন মুক্ত হয়ে যান। তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

প্রপঞ্চ—কথাটির অর্থ হল পঞ্চভূত বা পাঁচটি উপাদান। এখানে এই দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ বৈচিত্রের কথা বলা হয়েছে। তুরীয় অবস্থায় সাধক মনে করেন এ জগৎ মিথ্যা। তখন তাঁর কাছে এ জগতের কোনও অস্তিত্বই নেই। তিনি তখন সবকিছুর মধ্যে কেবল ব্রহ্মকেই দেখেন। এই অবস্থায় থাকে শুধু শিব, আনন্দ এবং মঙ্গল। তখন এক বৈ দুই বলে কিছু থাকে না। সাধক তখন সর্বত্র ও সকলের মধ্যে এক ও অভিন্ন আত্মাকেই দেখেন। তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে এই ওম্, আত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। (এবম্ ওঙ্কার আত্মৈব।)

যঃ এবং বেদ—যিনি এই প্রকার জানেন, অর্থাৎ যিনি সত্যকে জানেন। এই হল প্রকৃত জ্ঞান যা ইন্দ্রিয়াতীত। তখন সাধক জানেন : 'শুধু তিনিই আছেন।' এই অবস্থায় সকল দ্বিতত্ত্বের অবসান হয়। সমগ্র জগৎ তখন সাধকের মধ্যে লয় হয়ে যায়। এই অবস্থাই হল চূড়ান্ত অবস্থা। সাধক বাইরে আর কিছুই দেখেন না। তখন সবকিছু তাঁর নিজের মধ্যে।

সংবিশতি—তিনি পুরোপুরি লীন হয়ে যান। সাধক নিজ আত্মাতেই তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। যেহেতু তাঁর কাছে এ জগতের পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই সেহেতু তিনি নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেন। অর্থাৎ তিনি আত্মতৃপ্ত। 'আত্মনা আত্মানম্'—আত্মা আত্মাতেই স্থিত। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যান। অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা হয়ে যান।

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

এখানেই মাণ্ডূক্য উপনিষদ সমাপ্ত।

গৌড়পাদ-কারিকা

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎপাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৪

অন্বয়: ওঙ্কারং পাদশঃ বিদ্যাৎ (সাধককে ওঁকারের প্রতিটি অবস্থা জানতে হবে); পাদাঃ মাত্রাঃ সংশয়ঃ ন (পাদসমূহ [অবস্থা] যে মাত্রা [অক্ষর] এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই); ওঙ্কারং পাদশঃ জ্ঞাত্বা (বিভিন্ন পাদ [অবস্থা]-এর মধ্য দিয়ে ওঁকারকে জেনে); কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ (আর কিছু নিয়ে সাধকের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। [সাধক তখন নিজেকে ধন্য মনে করেন])।

সরলার্থ: প্রতিটি অবস্থার মধ্য দিয়ে ওম্-কে জানার চেষ্টা করতে হবে। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে পাদসমূহ (অবস্থাসকল) এবং মাত্রাসকল (অক্ষরগুলি) এক ও অভিন্ন। ওম্-কে যদি তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে জানা যায় তবে সাধকের আর কোনও চিন্তা থাকে না। সাধক তখন নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মের বিভিন্ন অবস্থার মতো অ, উ, ম বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন অবস্থা-মাত্র। ব্রহ্মই স্থূল জগৎ, ব্রহ্মই সূক্ষ্ম জগৎ, ব্রহ্মই কারণ জগৎ এবং ব্রহ্মই তুরীয়। একই ব্রহ্ম বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। একইভাবে, অ, উ, ম বিভিন্ন শব্দ হলেও এরা কিন্তু সেই একই ওম্ অর্থাৎ একই ব্রহ্ম। এই ওম্-কে তাঁর বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের জানতে হবে। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এ সবই সেই এক ব্রহ্ম, যিনি নিজেকে নানারূপে প্রকাশ করেছেন।

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥২৫

অন্বয়: প্রণবে চেতঃ যুঞ্জীত (প্রণবে [ওম্] মন একাগ্র করতে হবে); প্রণবঃ নির্ভয়ং ব্রহ্ম (প্রণবই ব্রহ্ম এবং তিনি অভয় দান করেন); প্রণবে নিত্য যুক্তস্য (যদি প্রণবের সাথে সবসময় যোগ থাকে); ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ (সাধকের তখন আর কোনও ভয় থাকে না)।
সরলার্থ: মনকে প্রণবে একাগ্র করতে হবে। প্রণবই ব্রহ্ম এবং তিনি সব ভয়ের ঊর্ধ্বে। প্রণবে মন স্থির হলে সাধকের আর কোনও ভয় থাকে না।
ব্যাখ্যা: 'যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ'—মনকে প্রণবের সাথে যুক্ত রাখতে হবে, স্থির রাখতে হবে। ব্রহ্মরূপে, আমাদের আত্মারূপে এই ওম্-কে ধ্যান করতে হবে। ব্রহ্ম অসীম, অরূপ (কোনও রূপ নেই), নির্গুণ (কোনও গুণ বা উপাধি নেই)। এমন ব্রহ্মকে কিভাবে ধ্যান করব? কাজটি প্রচণ্ড কঠিন হলেও সম্ভব। আমরা হৃদয়ে উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় ওম্-এর কল্পনা করব। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে, ওম্ ব্রহ্ম বা আত্মা ছাড়া আর কিছুই নন। এবং আমরাই সেই আত্মা। সেই আত্মাই সকলের আত্মা। 'প্রণবে নিত্য যুক্তস্য'—'আমরাই ওম্, আমরাই ব্রহ্ম', এ সম্পর্কে সবসময় আমাদের সচেতন থাকা উচিত। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

যদি আমরা এইভাবে ধ্যান করতে পারি তবে আর আমাদের কোনও ভয় থাকবে না। আমরা ভয় পাই কখন? যতক্ষণ আমাদের মধ্যে দ্বিতত্ত্বের বোধ অর্থাৎ দুই বোধ থাকে ততক্ষণ আমরা ভয় থেকে মুক্ত নই। যেমন, আমি তোমাকে দেখি এবং মনে করি তুমি আমার থেকে আলাদা। হয়তো তুমি আমার থেকে শ্রেষ্ঠ তাই তোমার কাছে আমি পরাজিতও হতে পারি। এই দুই বোধ থেকেই আসে দ্বন্দ্ব, ভয় এবং প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমার যদি দুই বোধই না থাকে, অর্থাৎ আমি যদি সর্বত্রই এই এক আত্মাকেই দেখি, তবে আর আমি কাকে ভয় করব? আমি তো আর আমাকে ভয় পাই না। 'আমি' সর্বত্র রয়েছি, তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যেই 'আমি' বিদ্যমান।

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ।
অপূর্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ॥২৬

অন্বয়: প্রণবঃ হি অপরং ব্রহ্ম (প্রণবই [ওম্] ব্রহ্ম, এমনকি তা যদি কার্যও হয় তবুও); প্রণবঃ পরঃ (প্রণবই ব্রহ্ম, যদি নির্গুণও হয় তবুও); চ স্মৃতঃ (এইরূপ বলা হয়); প্রণবঃ

অপূর্বঃ (প্রণবের আগে এমন কিছু নেই যাকে প্রণবের কারণ হিসেবে চেনা যায়); অনন্তরঃ (কিছুই এঁর থেকে আলাদা নয়); অবাহ্যঃ (এঁর [প্রণবের] বাইরে কিছু নেই); অনপরঃ (ইনি একাকী); অব্যয়ঃ (এঁর ক্ষয় নেই)।

সরলার্থ: প্রণবই (ওম্) একই সাথে পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম। প্রণবের কোন কারণও নেই, কার্যও নেই। প্রণবের বাইরে আর কিছুই নেই। সবই প্রণবের অন্তর্গত। প্রণবের কোন ক্ষয় নেই। (প্রণব সবসময়ই এক।)

ব্যাখ্যা: এই প্রণবই পরব্রহ্ম আবার ইনিই অপরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম হলেন পরমব্রহ্ম। পরব্রহ্ম নির্গুণ এবং শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। অপরব্রহ্ম হলেন জগৎরূপে প্রকাশিত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কখনো কখনো এই জগৎরূপে ব্যক্ত আবার কখনো কখনো অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত। অব্যক্ত অবস্থায় জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। কিন্তু জগৎ প্রকাশিত হোক বা না হোক, এর দ্বারা ব্রহ্ম প্রভাবিত হন না। ব্রহ্ম সবসময়ই ব্রহ্ম। তিনি নিত্য। পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম হচ্ছে সেই এক ও অভিন্ন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কখনো কারণ আবার কখনো বা কার্য, কিন্তু সবসময় সেই একই ব্রহ্ম। 'পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে'—যদি 'এই পূর্ণকে' (অর্থাৎ নাম-রূপসহ ব্রহ্মকে বা কার্যব্রহ্মকে) 'ঐ পূর্ণ' থেকে (অর্থাৎ অদৃশ্য ব্রহ্ম বা কারণব্রহ্ম থেকে আলাদা করা হয়, তবু 'সেটি' আগের মতোই পূর্ণ থাকে। ব্রহ্ম সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে রয়েছেন। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রয়েছেন অর্থাৎ তিনি সর্বগত।

ব্রহ্মকে বলা হয় 'অপূর্ব'—অর্থাৎ এঁর আগে আর কিছু নেই। ব্রহ্মের কোনও কারণ নেই। যেমন, এই টেবিলটা হচ্ছে কার্য। কারণ কেউ এই টেবিলটাকে তৈরি করেছে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। অর্থাৎ কেউ ব্রহ্মকে সৃষ্টি করেননি।

'অনন্তর'—এখানে কোনও দুই নেই। ব্রহ্মের থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র আর কিছু নেই। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। এমন কথা আমরা বলতে পারি না যে, এই স্থানে এক ব্রহ্ম রয়েছেন আর অন্য স্থানে অপর এক ব্রহ্ম রয়েছেন। সবসময়ই সেই একই ব্রহ্ম রয়েছেন। সেইভাবেই, ব্রহ্মকে 'অবাহ্য' বলা হয়। 'অবাহ্য' অর্থাৎ এঁর বাইরে আর কিছু নেই। আবার ইনি 'অনপর' অর্থাৎ ব্রহ্ম কার্য নন। আবার ব্রহ্ম নিজে যেমন কারণরহিত তেমনি ইনি অন্য কোন কিছুরও কারণ নন। একমাত্র ব্রহ্মই রয়েছেন। ইনি অব্যয়, অপরিবর্তনীয়। এঁর কোনও ক্ষয় বা বিনাশ নেই। ব্রহ্মই চিরন্তন সত্য।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, একই ব্রহ্ম অন্তরেও আছেন এবং বাইরেও আছেন। তিনি ব্রহ্মকে একটি লবণখণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। লবণখণ্ডটি বাইরে এবং ভেতরে অর্থাৎ সর্বত্রই একইরকম নোনা স্বাদ-যুক্ত। অর্থাৎ পুরো লবণখণ্ডটিই লবণাক্ত।

ঠিক একইভাবে, আমাদের বাইরে এবং ভেতরে একই ব্রহ্ম রয়েছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র রয়েছেন।

সর্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥২৭

অন্বয়: প্রণবঃ হি সর্বস্য আদিঃ (প্রণবেই এই জগতের শুরু); মধ্যম্ (এ জগতের মধ্য); তথা এব অন্তঃ চ (একইভাবে এই জগতের শেষও বটে); এবং প্রণবং জ্ঞাত্বা (যদি প্রণবকে এইভাবে জানতে পার [অর্থাৎ নিজ আত্মারূপে]); তদনন্তরম্ (তক্ষণি); ব্যশ্নুতে (ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবে)।

সরলার্থ: প্রণবই (ওম্) সবকিছুর শুরু, মধ্য ও শেষ। এইভাবে যদি প্রণবকে জানতে পারি, তবে তক্ষণি আমরা ব্রহ্মকেও সম্পূর্ণভাবে জানতে পারব।

ব্যাখ্যা: প্রণবই আরম্ভ (আদি), প্রণবই মধ্য এবং প্রণবই শেষ (অন্ত)। আবার প্রণবই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। সব অবস্থাতে এবং সকল পরিস্থিতিতে প্রণব সেই একই ব্রহ্ম। প্রণব দেশ এবং কালের ঊর্ধ্বে। প্রণবকে যদি এইভাবে জানতে পারা যায় তবে সাধক তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যান।

'ব্যশ্নুতে' শব্দটি অশ্ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ খাওয়া। এটি একটি চমৎকার তুলনা। জ্ঞান লাভ করা যেন খাবার গ্রহণের মতো। কেউ হয়তো তৃপ্তি সহকারে প্রচুর পরিমাণে খাবার খেয়েছেন, অর্থাৎ আকণ্ঠ খেয়েছেন। এ একরকমের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নয়। খাবার জিনিস সামনে রেখে কেবলমাত্র দেখলেই কি খিদে মিটে যায়? না, খিদে মেটে না। খাবার খেলেই খিদে মেটে। ব্রহ্মের বেলাতেও ঠিক একই কথা খাটে। একই ব্রহ্ম মানুষের ভেতরে এবং বাইরে আছেন—এই ভাবটিকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে আংশিক আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ এর দ্বারা কোনও উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। সেইজন্যই গৌড়পাদ 'ব্যশ্নুতে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই ভাবটিকে আমাদের খাওয়া উচিত। এ এক বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষ অনুভূতি। এই অনুভূতি হলে সাধক মুক্ত হয়ে যান, 'তদনন্তরম্'—তক্ষণি মুক্ত হয়ে যান। এই হল প্রকৃত জ্ঞান।

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্ব ধীরো ন শোচতি॥২৮

অন্বয়: প্রণবং হি সর্বস্য হৃদি সংস্থিতম্ ঈশ্বরং বিদ্যাৎ (সকলের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে প্রণব রয়েছেন—তা জান); ধীরাঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি); সর্ব-ব্যাপিনম্ ওঙ্কারং মত্বা (এই সর্বব্যাপী প্রণবকে জেনে); ন শোচতি (সকল দুঃখ-কষ্টের পারে চলে যান)।

সরলার্থ: প্রণবকে সেই ঈশ্বর বলে জানতে হবে যিনি সকলের হৃদয়ে রয়েছেন এবং সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রণবকে সর্বব্যাপী বলে জানেন। এমন মানুষ কখনো দুঃখে কাতর হন না। অর্থাৎ তিনি সুখ-দুঃখের পারে চলে যান।

ব্যাখ্যা: প্রণবকে ঈশ্বর বলে জানতে হবে। 'ব্রহ্ম' শব্দের পরিবর্তে গৌড়পাদ এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্তর্যামী ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে রয়েছেন। তিনি সকলের অন্তরাত্মা। এই প্রণব অর্থাৎ ওম্ সর্বব্যাপী। ওম্-ই সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। তিনি এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন—একথা জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো শোক করেন না। যখন আমরা এই জ্ঞান লাভ করি তখনি আমরা জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হই। তখন আমরা সুখ-দুঃখ অর্থাৎ দুই বোধের ঊর্ধ্বে চলে যাই। আমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে হচ্ছে এই অজ্ঞানতা। যখন আমরা সকলের মধ্যে—'এক' অর্থাৎ ব্রহ্মকে দেখতে পারব, তখন আমরা সব দুঃখ-কষ্টের পারে চলে যাব।

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥২৯

অন্বয়: যেন সঃ (যিনি); অমাত্রঃ (অখণ্ড); অনন্তমাত্রঃ (অসীম); চ দ্বৈতস্য উপশমঃ (এবং সকল দ্বিতত্ত্বের [দুই বোধ] লোপ); শিবঃ (মঙ্গলময়); ওঙ্কারঃ বিদিতঃ (ওঁকারকে জানেন); জনঃ (এমন ব্যক্তি); মুনিঃ (মুনি); ইতরঃ ন (অন্য কেউ নয়)।

সরলার্থ: অখণ্ড, অসীম, অদ্বৈত এবং মঙ্গলময়রূপে যিনি ওঁকারকে জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি, অন্য কেউ নয়।

ব্যাখ্যা: এই ওম্ 'অমাত্র' অর্থাৎ অখণ্ড। আবার এই ওম্ 'অনন্তমাত্র'—অপরিমেয়, অর্থাৎ এই ওম্-কে পরিমাপ করা যায় না। তিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। আবার কখনো তিনি অব্যক্ত, কখনো অসংখ্যরূপে ব্যক্ত। 'দ্বৈতস্য উপশমঃ'—এখানে কোনও দুই বোধ নেই। সকল দ্বিতত্ত্ব তখন 'ওম্'-এ লীন হয়ে যায়। তখন সেখানে থাকে কেবল শিব, শান্তি এবং আনন্দ। কেন? কারণ, যেখানে দুই বোধই নেই সেখানে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামও নেই। সকল উপনিষদই এই একটি কথা বোঝাতে চাইছেন যে, সমগ্র বিশ্বে একটিমাত্র সত্তা রয়েছেন। আর তিনিই হলেন ব্রহ্ম। যিনি এই সত্যকে জেনেছেন তিনি তো মুক্ত। যেসব বৈচিত্র

আমরা দেখি, তা আমাদের মনের ভুল। একই ব্রহ্ম বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দ্বৈতকে ভেদ করে আমাদেরকে অদ্বৈতে পৌঁছতে হবে। অজ্ঞানতা নাশ হলে আর দুই বোধ থাকে না।

মুনি কে? যাঁর মন স্বচ্ছ ও সজাগ। বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষই হলেন মুনি। আমরা বেশিরভাগ মানুষই মনের সদ্ব্যবহার করি না। কিন্তু যিনি মুনি তিনি তাঁর মনের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন। তিনি গভীরভাবে মনন বা চিন্তা করেন। যিনি সকলের মধ্যে এক আত্মাকে দেখেন তিনিই প্রকৃত মুনি। সাকার নিরাকার সবের মধ্যে তিনি সেই এক আত্মাকে দেখেন। 'ইতরঃ ন'—এ অন্য কেউ পারে না।

বৈতথ্য প্রকরণ

বৈতথ্যং সর্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্মনীষিণঃ।
অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা॥১

অন্বয়: মনীষিণঃ (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); স্বপ্নে ভাবানাম্ (স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুসকল); অন্তঃ (অভ্যন্তরে); স্থানাৎ সংবৃতত্বেন (স্থানের সংকীর্ণতা); হেতুনা (এই কারণে); সর্বভাবানাম্ ([স্বপ্নে দৃষ্ট] বস্তুসকল); বৈতথ্যম্ (মিথ্যা); আহুঃ (ঘোষণা করেন)।

সরলার্থ: প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বলেন, স্বপ্নে দেখা সকল বস্তুই মিথ্যা। তুমি স্বপ্নে নানারকম বস্তু দেখে থাক কিন্তু সেসব বস্তু তোমার মধ্যে থাকতে পারে না। কারণ তোমার দেহ সেইসব বস্তুর তুলনায় ক্ষুদ্র। (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তুমি স্বপ্নে পর্বত দেখতে পার। কিন্তু পর্বত কি সত্যিই তোমার দেহের মধ্যে থাকতে পারে? না, তাই স্বপ্নে দেখা পর্বত মিথ্যা।)

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে সত্যের বিকৃতি এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান অধ্যায় সচেষ্ট। 'তথ্য' কথাটির অর্থ সত্য। আর 'বৈতথ্যে'র অর্থ হল ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা। আমরা যা সত্য বলে মনে করি আসলে তা সত্য নয়, এখানে এই কথাই গৌড়পাদ বলতে চাচ্ছেন। আমরা বলে থাকি এ জগৎ সত্য এবং শুধু তাই নয় আমরা একথা বিশ্বাসও করি। কেন? কারণ এই জগৎকে আমরা দেখতে পাই, স্পর্শ করতে পারি এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এ জগৎকে আমরা অনুভব করি। আমাদের কাছে এই হল সত্যের মাপকাঠি। গৌড়পাদ দেখাচ্ছেন—এ আমাদের কত বড় ভুল। যেমন স্বপ্নে আমি একটি রথ বা একটি হাতী কিংবা একটি পর্বতও দেখতে পারি, কিন্তু এগুলির অস্তিত্ব কোথায়? ওগুলি আমি স্বপ্নে দেখি বটে কিন্তু এই দেখা কি সত্য? স্বপ্নে দেখা পর্বতটি কোথায়? সেটি কি তবে আমার দেহের মধ্যে? কিন্তু পর্বতের মতো বিশাল এক বস্তু আমার এই দেহের মধ্যে কিভাবে থাকতে পারে? আর ঐ পর্বতটি যদি বাইরে থাকে তবে জেগে উঠে বা সেটিকে দেখতে পাই না কেন? জেগে উঠে যখন চারিদিকে তাকাই তখন কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কোন পর্বত দেখি না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত আগেই তো আমি সেটিকে দেখেছি। এইভাবে বোঝা গেল যে স্বপ্ন সত্য নয়। চাক্ষুষ দেখাই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

গৌড়পাদের মতে স্বপ্নে নানা বস্তুকে দেখা যেমন মিথ্যা, জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা যা দেখি তাও ঠিক ততটাই মিথ্যা। স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা ও জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন

পার্থক্যই নেই। কেন? কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তো অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী। স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতারও শুরু ও শেষ আছে। আমি ঘুমের মধ্যে কত শত অদ্ভুত বস্তুই না দেখি! ঘুমোবার সময় সেগুলি বিছানাতে ছিল না আবার জেগে ওঠার পরও সেগুলিকে বিছানাতে দেখা যায় না। গৌড়পাদ বলছেন, ঠিক তেমনভাবেই জাগ্রত অবস্থায় আমি এই বিশ্বকে সত্য বলেই মনে করি, কিন্তু যখন আমার বোধে বোধ হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান তথা পরম সত্যকে উপলব্ধি করি তখন আমি ভাবি : 'আমি কি ঝামেলার মধ্যেই না পড়েছিলাম! কারণ আমি ভেবেছিলাম এ জগৎ সত্য।'

আমাদেরকে একথা মনে রাখতে হবে যে বেদান্তমতে সত্যের মাপকাঠি হল, যা নিত্য অর্থাৎ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু কি জাগ্রত অবস্থায় কি স্বপ্নে, আমাদের সকল অভিজ্ঞতাই ক্ষণস্থায়ী। একটি বিশেষ মুহূর্তে হয়তো অভিজ্ঞতাটি আছে আবার পরমুহূর্তেই সেটি নেই। এই কারণেই গৌড়পাদ বৈতথ্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। জাগ্রত অথবা স্বপ্নে আমাদের সকল অভিজ্ঞতাই এই সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মকে বিকৃত করে দেখা।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, যার সঙ্গে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তার অনিত্যতা প্রতিষ্ঠায় গৌড়পাদ উদ্যোগী। এর দ্বারা গৌড়পাদ এই জগৎ থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে নিয়ে, মনটিকে চালনা করতে চাইছেন নিত্য-সত্যের দিকে। সেই নিত্য-সত্যটি কি? তা হল আমাদের আত্মা। গৌড়পাদ বলছেন এই বাহ্য জগতের কোন কিছুই সত্য নয়। আমাদের সকলের মধ্যেই এই সত্য নিহিত রয়েছে। অন্তরস্থ আত্মাই একমাত্র সত্য, এই আত্মাই সবকিছুর অধিষ্ঠান। আত্মা আছেন বলেই আমরা দেখি, শুনি, চিন্তা করি, কল্পনা করি অর্থাৎ এ জগৎকে অনুভব করতে পারি। এই আত্মা আছেন বলেই জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থাতে আমাদের নানারকম অভিজ্ঞতা হয়। সুতরাং আত্মাই একমাত্র সত্য। এই সিদ্ধান্তের দিকেই গৌড়পাদ আমাদেরকে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছেন।

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেহান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্বস্তস্মিন্দেশে ন বিদ্যতে॥২

অন্বয়: কালস্য অদীর্ঘত্বাৎ চ (এই কারণেও যে কাল সংক্ষিপ্ত); দেহাৎ গত্বা (দেহের বাইরে গিয়ে); [স্বপ্নন্] ন পশ্যতি (স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুগুলি দেখে না); সর্বঃ প্রতিবুদ্ধঃ চ (যখন মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়); তস্মিন্ দেশে ন বৈ বিদ্যতে (স্বপ্নস্থানে নিজেকে দেখতে পায় না)।

সরলার্থ: মানুষ স্বপ্নের সময় দেহ থেকে বেরিয়ে স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে যায়—একথা ঠিক নয়। এটা অসম্ভব। যদি সে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তবে ঘুম ভাঙার আগে ঐ অল্পসময়ের মধ্যে সে ফিরে আসতে পারত না। আবার জেগে ওঠার পর সে আর নিজেকে স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে দেখে না।

ব্যাখ্যা: স্বপ্ন যে মিথ্যা একথা বোঝাবার জন্য গৌড়পাদ আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। ধরা যাক, আমি স্বপ্ন দেখছি আমি কাশীতে গেছি। কিন্তু জেগে উঠে দেখলাম আমি নিজের ঘরেই আছি। এখন এই কাশী যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য যে দীর্ঘ সময়ের দরকার সেই সময় পাওয়া গেল কিভাবে? অল্প সময়ের মধ্যে (কালস্য অদীর্ঘত্বাৎ) এ যাত্রা অসম্ভব। আগের শ্লোকে দেখেছি যে স্বপ্নে দেখা বস্তুগুলি (যেমন পর্বত ইত্যাদি) আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে থাকতে পারে না, তাই সেগুলি সত্য নয়। আর একটি যুক্তি হল, যদিও স্বপ্নে দেখছিলাম যে আমি কাশীতে রয়েছি কিন্তু জেগে উঠেই দেখি আমি কাশীতে নেই আমার ঘরেই আছি। সুতরাং সত্যি সত্যিই কাশী যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ সবই মনের ভুল।

আচার্য শঙ্কর এখানে আরও একটি যুক্তি দিয়েছেন। যেমন আমি স্বপ্নে দেখছি আমি কাশী গেছি। সেখানে বিভিন্ন স্থান ও আত্মীয়-বন্ধুদের দেখছি এবং আমি মনে করছি যে আমি সত্যিই কাশীতে আছি। কিন্তু পরে সেইসব আত্মীয়-বন্ধুরা আমাকে কখনো বলেনি : ‘ওঃ তোমার সঙ্গে কাশীতে দেখা হওয়ায় কি ভালোই না লেগেছিল। সেখানে আমাদের কতই না আনন্দ হয়েছিল!’ এরকম আমাদের কখনো ঘটে না। এই কারণেই আচার্য শঙ্কর বলছেন যে এই ধরনের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কখনো সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্॥৩

অন্বয়: স্বপ্নে রথাদীনাম্ (স্বপ্নে দেখা রথ); অভাবঃ (সব মিথ্যা); চ ন্যায়পূর্বকম্ (এটি যুক্তিগ্রাহ্য); শ্রয়তে (শাস্ত্রও এইকথা বলেন); তেন (স্থানের সংকীর্ণতার ফলে); প্রাপ্তম্ (প্রমাণিত); বৈতথ্যম্ (অসত্যতা); প্রকাশিতম্ ([শাস্ত্র শুধুই] বারবার বলেন); আহুঃ ([প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা] বলেছেন)।

সরলার্থ: স্বপ্নে দেখা রথ মিথ্যা। এটি যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্রেও সেকথা বলা হয়েছে। দেহ-মধ্যবর্তী স্থান খুবই সংকীর্ণ (রথ রাখার পক্ষে); এর দ্বারাই রথের অনিত্যতা প্রমাণিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বলেন একথা যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্রও এইকথা বারবার বলে থাকেন।

ব্যাখ্যা: এখানে গৌড়পাদ বলতে চাচ্ছেন স্বপ্নের এই অনিত্যতা শাস্ত্র-সমর্থিত। যেমন, আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমি রথে চড়ে চলেছি। শাস্ত্রমতে, আমার এ অভিজ্ঞতা সত্য নয়। এটি বৈতথ্য বা বিকৃতি। কিন্তু যদি এই সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য না হয় তবে আমরা শাস্ত্রের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি। এমনকি অগ্রাহ্যও করতে পারি। কিন্তু গৌড়পাদ বলছেন যে, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি যুক্তিগ্রাহ্য। আমার নিজের বিচারবুদ্ধিও এই যুক্তিকে মেনে নেয় যে, এই স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা মিথ্যা। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাও এই একই কথা (স্বপ্নের মিথ্যাত্ব) বলেন।

স্বপ্নের অভিজ্ঞতাই হল জ্যোতির্ময় আত্মার প্রমাণ। বস্তু থাক বা না থাক আত্মা জ্যোতিস্বরূপ।

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্।
যথা তত্র তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে॥৪

অন্বয়: [স্বপ্নে] ভেদানাম্ (পার্থক্য); অন্তঃস্থানাৎ (দেহাভ্যন্তরে [স্বল্পস্থান, অতএব মিথ্যা]); তস্মাৎ এব (তার [প্রত্যক্ষের] দ্বারা); জাগরিতে [অপি] স্মৃতম্ (একই কথা [অনিত্যতা] জাগ্রত অবস্থাতেও প্রযোজ্য); তত্র (সেখানে [জাগ্রত অবস্থায়]); যথা (যেমন); স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়); তথা (একই [অনুভূতি]); সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ([কেবলমাত্র] স্থানগত বৈষম্য)।
সরলার্থ: যখন আমরা স্বপ্নে নানা বস্তু দেখি তখন আমরা জানি যে ঐসব বস্তু মিথ্যা। কারণ দেহের অভ্যন্তরে ঐসব বস্তু থাকার মতো জায়গা নেই। কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা যা-কিছু দেখি তাও সমভাবে মিথ্যা। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য শুধু এইখানে যে জাগ্রত অবস্থাতে বস্তুগুলি থাকার জন্য জায়গার অভাব হয় না। স্বপ্ন বা জাগ্রত উভয় অবস্থাতে বস্তুগুলি কিন্তু এক। স্বপ্নে দেখা বস্তুগুলি যদি মিথ্যা হয় তবে সেগুলি জাগ্রত অবস্থাতেও মিথ্যা।
ব্যাখ্যা: এখানে কথাটা এই স্বপ্ন বা জাগ্রত উভয় অবস্থার অভিজ্ঞতাই মিথ্যা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা শুধু এইখানে যে, স্বপ্নের সময় বস্তুগুলিকে আমি আমার মধ্যে দেখি এবং এইসব বস্তু আমার অভ্যন্তরে থাকার মতো যথেষ্ট জায়গা যে আমার নেই তাও আমি জানি। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় এইসব বস্তুগুলিকে আমি বাইরে দেখি এবং সেখানে সেগুলি থাকার মতো যথেষ্ট জায়গাও আছে। গৌড়পাদ বলছেন দুটি অভিজ্ঞতাই এক। বস্তু ও বস্তুর প্রকৃতি দুই-ই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা।

জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্পর্ক জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাতেই থাকে। এখানে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়েই বর্তমান। এই অবস্থাতে দুই বোধ থাকে। গৌড়পাদের মতে এই দুই ধরনের

অভিজ্ঞতা শর্তসাপেক্ষ। বৌদ্ধদর্শনে একেই বলা হয় 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'। যেমন, তুমি হয়তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমার সামনে তুমি নেই? এখানে তোমার অস্তিত্ব আমার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যক্ষের ভূমিকা এখানে থেকেই যাচ্ছে। বস্তুটিকে থাকতে হবে আবার একই সঙ্গে দ্রষ্টাকেও থাকতে হবে। যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা ত্রুটিপূর্ণ, সেহেতু বস্তুর স্বভাবের সঠিক পরিচয় আমরা পাই না। যখন কোন বস্তুকে আমরা দেখি তখন তার কিছু বৈশিষ্ট্য হয়তো আমরা লক্ষ্য করে থাকি কিন্তু বস্তুর এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যেরূপে বস্তুটি প্রকাশিত সেইরূপেই আমরা বস্তুটিকে দেখি কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপকে আমরা দেখি না। বস্তুটি আমাদের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের এই অনুভূতি ত্রুটিহীন না হওয়ায় বস্তুর যথার্থ স্বরূপও আমরা কখনো জানতে পারি না। সুতরাং আমরা যা দেখি তা সত্য নয়। পরম সত্য সর্বদা এক ও অভিন্ন। এর কোন পরিবর্তন হয় না। এ তত্ত্ব কারও দ্বারা প্রভাবিতও নয়, এমনকি কোন কিছুর উপর নির্ভরশীলও নয়। পরম সত্য স্বতন্ত্র। সেইজন্যই গৌড়পাদ বলছেন এ বিশ্বকে সত্য বলে গ্রহণ করলে তাকে ব্যাখ্যা করব কি করে? কেউ কেউ বলেন যে এই বিশ্ব সত্য—এই কথাটির সঠিক অর্থ কি? কোন্ অর্থে এই জগৎ সত্য? গৌড়পাদ বলছেন—না, এ জগৎ সত্য নয়। এ এক দৃষ্টিবিভ্রম। দৃষ্টিবিভ্রম এই অর্থে যে আমরা বিশ্বকে যা মনে করি বিশ্ব কিন্তু আসলে তা নয়। আমরা সবসময়ই নিজেদেরকে বঞ্চিত করি।

স্বপ্নজাগরিতস্থানে হ্যেকমাহুর্মনীষিণঃ।
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা।।৫

অন্বয়: মনীষিণঃ (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি); স্বপ্ন-জাগরিত-স্থানে (স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থায়); প্রসিদ্ধেন হেতুনা (কারণ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কটি সুপরিচিত); ভেদানাম্ (আলোচ্য বস্তুসকল); হি (নিশ্চিতভাবে); সমত্বেন (একই থাকে); হি (নিঃসন্দেহে); একম্ (একই [অর্থাৎ মিথ্যা]); আহুঃ (বলেন)।

সরলার্থ: একথা সকলেই জানেন, উভয় অবস্থাতেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কটি একই থাকে। এই দুই অবস্থায় যেসব বস্তুর অভিজ্ঞতা হয় সেই বস্তুগুলি অভিন্ন। এই কারণেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থার বস্তুকেই মিথ্যা বলে মনে করেন।

ব্যাখ্যা: প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাই এক। কেন? কারণ উভয় অবস্থাতেই দ্বৈতবোধ থাকে। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যবস্তু, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়বস্তু, এই দুই বোধ

উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বলেন এ জগতে এক বৈ দুই কিছু নেই। আমরা যে দুই দেখি সেটা ভুল। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যদি মিথ্যা হয় তবে জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা-কিছু দেখি তাও মিথ্যা।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ।।৬

অন্বয়: যৎ (বস্তুটি); আদৌ (প্রথম দেখার আগে); অন্তে ন অস্তি (শেষে তা দেখা যাবে না); তৎ (সেই বস্তুটি); বর্তমানে অপি (বর্তমানেও); তথা (সেটি মিথ্যা); বিতথৈঃ সদৃশাঃ (মরীচিকার ন্যায় ভ্রান্ত); সন্তঃ অবিতথা ইব লক্ষিতাঃ (সত্য বলে দৃষ্ট হয়)।

সরলার্থ: এমন কোনও বস্তু যদি থাকে যা শুরুর আগেও ছিল না আবার শেষ হবার পরেও থাকবে না তাকে মিথ্যা বলে মনে করতে হবে। বস্তুটি মরীচিকার মতোই মিথ্যা। বস্তুটিকে সত্য বলে মনে হলেও বস্তুটি আসলে সত্য নয়। যা চিরন্তন সত্য তা নিত্য অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই তা সত্য।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক, আমি স্বপ্ন দেখছি আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছি। অগণিত দর্শকদের মধ্যে বসে আমি খেলা দেখছি। জেগে ওঠার পরই আমি বুঝতে পারলাম স্বপ্নটি সত্য নয়। পুরো সময়টা আমি বিছানাতেই ছিলাম, এক মুহূর্তের জন্যও আমি বাইরে যাইনি। কিন্তু স্বপ্ন দেখাকালীন অভিজ্ঞতাটি আমার কাছে এত সত্য বলে মনে হয়েছিল যে কেউ 'ক্যাচ্' ধরলে আমি ভারী খুশি হয়ে উঠেছি, আবার যখন কেউ 'ক্যাচ্' ফেলে দিয়েছে তখন খুবই দুঃখ পেয়েছি। যতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম ততক্ষণ এইসব নানা প্রতিক্রিয়া আমার হচ্ছিল। এখানে গৌড়পাদের বক্তব্য স্বপ্নে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতা যদি মিথ্যা হয় তবে জাগ্রত অবস্থায় ক্রিকেট ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতাও সমভাবে মিথ্যা। সত্যের যে বোধ আমার রয়েছে তা ভ্রান্তিমাত্র। এর স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি : যখন আমি স্বপ্ন দেখি তখন কি আমি বুঝতে পারি যে আমি স্বপ্ন দেখছি? না, তা পারি না। যখন স্বপ্ন দেখি তখন স্বপ্নের সকল বস্তুই আমার কাছে অতি সত্য বলে মনে হয়। তখন এর সত্যতা নিয়ে আমার কোন সংশয়ও থাকে না। ধরা যাক, স্বপ্নে একটা বাঘ দেখলাম এবং দেখামাত্রই ভয়ে দৌড়ে পালাতে শুরু করলাম। যদি আমি জানতাম যে এটি নেহাতই স্বপ্ন, এখানে প্রকৃতপক্ষে কোনও বাঘ নেই তবে আমি ভয় পেয়েছিলাম কেন? কিন্তু জেগে উঠে আমাকে মানতেই হল যে সত্যিই কোনও বাঘ ছিল না। প্রকৃত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জাগ্রত অবস্থার সব প্রতিক্রিয়া ও আবেগসমূহ স্বপ্নাবস্থার মতোই সমভাবে মিথ্যা। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে সত্য বলে মনে হলেও

আসলে সেগুলি স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতোই সাময়িক অভিজ্ঞতা মাত্র। অথবা জাগ্রত অবস্থায় রজ্জুতে সর্পভ্রমতুল্য। যখন দড়িকে সাপ মনে করি তখন নানারকম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু পরে বুঝতে পারি দড়িটি কখনই সাপ ছিল না। দড়িই ছিল।

তাই এখানে গৌড়পাদ বলছেন : 'সান্তঃ অবিতথা ইব লক্ষিতাঃ'—আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহকে সত্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। কারণ এইসব অভিজ্ঞতার শুরু ও শেষ আছে। কিন্তু যা সত্য তা নিত্য। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই তা সত্য। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী, কিছুক্ষণ পরেই তা শেষ হয়ে যায়। যা অতীতেও ছিল না ভবিষ্যতেও থাকবে না তা বর্তমানেই বা আছে কি করে? সত্যই একমাত্র নিত্য। অর্থাৎ তা সবসময়ই বিদ্যমান।

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ॥৭

অন্বয়: তেষাম্ (জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুসকল); সপ্রয়োজনতা (সেই অবস্থায় কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে); স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে (স্বপ্নাবস্থায় ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে নাও পারে); তস্মাৎ (সুতরাং); তে (জাগ্রত অবস্থার দৃষ্ট বস্তুসকল); আদ্যন্তবত্ত্বেন (যার শুরু এবং শেষ আছে); মিথ্যৈব খলু [তে] স্মৃতাঃ (এইসব বস্তু অবশ্যই মিথ্যা)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় আমাদের অনেক বস্তুই কাজে লাগে। স্বপ্নাবস্থায় সেগুলি কাজে নাও আসতে পারে। এর অর্থ হল ঐসকল বস্তুসমূহের আদি ও অন্ত আছে। এইরকম বস্তু অবশ্যই মিথ্যা।

ব্যাখ্যা: উপযোগিতার দিক থেকে একটি আপত্তি ওঠে : তুমি বলছ যে জাগ্রত অবস্থায় আমি যে খাবার খাচ্ছি তা সত্য নয় এবং খাবার গ্রহণের প্রক্রিয়াটিও সত্য নয়। আবার খাবার খাওয়ার ফলে আমি যে তৃপ্তি পাচ্ছি তাও সত্য নয়। কিন্তু এখানে খাদ্যবস্তু এবং খাবার খাওয়ার উপযোগিতা রয়েছে। কারণ জাগ্রত অবস্থায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মনে করেন যদি তিনি কিছু খাবার খান তবেই তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে। কিন্তু কেউ যদি স্বপ্নে খাবার খায় তবে নিদ্রাভঙ্গে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই দুই অবস্থাই এক। কিন্তু স্বপ্নে তিনি যে খাবার খাচ্ছিলেন তা দিয়ে জাগ্রত অবস্থার ক্ষুধার উপশম হয় না।

এর উত্তরে গৌড়পাদ বলছেন : ধরা যাক, জাগ্রত অবস্থায় তুমি ভূরিভোজন করেছ। তারপর স্বপ্ন দেখছ যে তুমি ভারী ক্ষুধার্ত। আবার তুমি স্বপ্ন দেখছ যে তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণে খেয়েছ কিন্তু ঘুম ভাঙার পর তুমি বুঝতে পার যে তুমি ক্ষুধার্ত। জাগ্রত অবস্থায় তুমি

তোমার স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার কর, আবার স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার কর। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে তুমি মিথ্যা বলে বাতিল করে দাও। একইভাবে স্বপ্নাবস্থায় তুমি জাগ্রত অবস্থার সকল অভিজ্ঞতাকেই মিথ্যা বলে বাতিল করে দাও। কিন্তু তুমি সেই একই ব্যক্তিসত্তা, এক অবস্থায় তুমি এক ধরনের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করছ আর এক অবস্থায় তুমি আর এক ধরনের অভিজ্ঞতাকে খণ্ডন করছ।

গৌড়পাদ বলছেন যে, যতক্ষণ তুমি স্বপ্ন দেখছ ততক্ষণ স্বপ্নের সবকিছু তোমার নিকট সত্য। স্বপ্ন চলাকালীন খাবার গ্রহণের অভিজ্ঞতাটি যে আদতে সত্য নয় তা কি তোমার কখনো মনে হয়েছে? না, তা হয়নি। কারণ স্বপ্নের সময় যে খাবার আমরা খাই তা আমাদের স্বপ্নের ক্ষুধাকে চরিতার্থ করে। ঠিক তেমনিই, জাগ্রত অবস্থায় যে খাবার আমরা খাই তাতে জাগ্রত অবস্থার ক্ষুধার উপশম হয়। কিন্তু সেই অবস্থার পরিবর্তন হলে প্রাসঙ্গিক সবকিছুর লোপ পায়। আমাদের অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী। জাগ্রত এবং স্বপ্ন উভয় অভিজ্ঞতারই আদি এবং অন্ত আছে। আর যার শুরু এবং শেষ আছে তাই সীমিত। আমাদের অভিজ্ঞতা দেশ-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তা সত্য হতে পারে না। আদি-অন্ত আছে কিনা তাই হল বিচারের মাপকাঠি। যা সত্য তার আরম্ভও নেই, শেষও নেই অর্থাৎ তা শাশ্বত ও সনাতন।

তবে সত্য কি? গৌড়পাদ বলেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এইসব অভিজ্ঞতা পর্দায় ফেলা চলমান ছবির মতো যায় আসে। পর্দার উপর কতশত ঘটনাই ঘটে চলে, কিন্তু পর্দাটির কোনও পরিবর্তন হয় না। পর্দার উপর চলচ্চিত্রটি আরোপিত হয়েছে মাত্র। একইভাবে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ইত্যাদি গুণাবলী আত্মার উপর আরোপিত। একমাত্র আত্মাই সত্য।

অপূর্বং স্থানিধর্মো হি যথা স্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ॥৮

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); স্বর্গনিবাসিনাম্ (যাঁরা স্বর্গবাসী [যেমন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা যাঁরা সহস্রচক্ষু এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী]); অপূর্বম্ (ঠিক তেমন, স্বপ্নাবস্থায় এইরকম নানা অদ্ভুত বস্তুর দর্শন হয়); হি (নিশ্চিতভাবে); স্থানিধর্মঃ (এইসকল বস্তু যিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ); যথা (এ ও তেমন); ইহ (জাগ্রত অবস্থার ব্যক্তি); সুশিক্ষিতঃ (পথঘাট যাঁর সুপরিচিত); গত্বা (ঐসব পথের গন্তব্যসীমায় চলাফেরা করার ফলে

এবং সেইসব স্থানের দ্রষ্টব্য বস্তু উপভোগ করার ফলে); অয়ম্ (একইভাবে, সেই ব্যক্তি তাঁর স্বপ্নে); তান্ (ঐসব স্বপ্ন জগতের মনোহর বস্তুসকল); প্রেক্ষতে (দেখে আনন্দ করেন)।
সরলার্থ: কথিত আছে, স্বর্গের ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ সহস্র চক্ষু ও বহু অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী। এবং স্বপ্নে আমরা এইসব অলৌকিক বস্তুর দর্শন পেতে পারি। স্বপ্নের প্রকৃতিই এমন। কোন স্থানের রাস্তাঘাট চেনা থাকলে আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারি এবং সেখানকার দর্শনীয় জিনিস দেখে চিনতে পারি। একইভাবে স্বপ্নেও আমরা নানা অলৌকিক বস্তু দেখি, যেন এই-সকল বস্তুকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে জানি। মরীচিকা অথবা রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো এসকল বস্তুও মিথ্যা।
ব্যাখ্যা: আমরা শুনেছি যে, স্বর্গস্থ ইন্দ্রাদি দেবতা সহস্র চক্ষু ও নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং আমরা স্বপ্নে এইসকল দেবদেবীকে দর্শন করতে পারি। কিন্তু এইসকল অভিজ্ঞতার স্থায়িত্ব শুধুমাত্র স্বপ্নে। জাগ্রত অবস্থায় এইসব অভিজ্ঞতার কোন স্থান নেই। যেমন—স্বপ্নাবস্থায় নিজেকে চতুর্ভুজা বলেও দেখা যেতে পারে। কিন্তু একি সত্য? এর উত্তরে আমরা হয়তো বলব হ্যাঁ। এগুলি সত্য না হলে মানুষ এসবের স্বপ্নই বা দেখে কি করে? এর স্বপক্ষে আরও যুক্তি হল : 'স্বপ্নের অভিজ্ঞতা যেহেতু মিথ্যা সেহেতু জাগ্রত অভিজ্ঞতাও মিথ্যা।' এই হেতুবাক্যটি ভুল। যেমন—স্বপ্নে আমি যে আমার চারটি হাত দেখি সেটি মিথ্যা নয়। কিন্তু এই স্বপ্নটি যদি সত্য হয় তবে দুটি অতিরিক্ত হাত এল কোথা থেকে? ঘুমোতে যাবার আগে তো এ দুটি হাত ছিল না। আবার ঘুম ভাঙার পরেও এ দুটি হাত থাকে না। এর অর্থ—অতিরিক্ত হাত দুটি হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল এবং নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিতও হল। এসব কি আপনিই ঘটতে পারে? হাত দুটি কি কখনো নিজ ইচ্ছায় গজিয়ে ওঠে? হাত দুটির কি তবে নিজ ইচ্ছা বলে কিছু আছে? সুতরাং সমস্ত ভাবনাটাই উদ্ভট।

তবে এ ঘটনার ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা হল—স্বপ্নের প্রকৃতিই এইরকম। স্বপ্নে অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং তা ঘটে ব্যক্তির প্রয়াস ছাড়াই। স্বপ্ন যেন ব্যক্তির সুপরিচিত পথ, আর সেই পথ ধরে ব্যক্তি কোন স্থানে চলে যায়, এবং সেখানে নানা মনোহর বস্তু দেখে। স্বপ্ন এইরকমই।

ভালোই হোক আর মন্দই হোক স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন মিথ্যা। একইভাবে জাগ্রত অবস্থাও স্বপ্নের মতোই মিথ্যা।

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥৯

অন্বয়: স্বপ্নবৃত্তৌ অপি তু (স্বপ্নাবস্থাতেও); অন্তঃ (ভেতরে); চেতসা (মনের দ্বারা); কল্পিতম্ (কল্পিত); তু (অবশ্যই); অসৎ (মিথ্যা); বহিঃ (বাইরে [স্বপ্নাবস্থায়]); চেতোগৃহীতম্ (মনে অনুভূত); সৎ (সত্য); এতয়োঃ (এই দুই-ই); বৈতথ্যম্ (মিথ্যারূপে); দৃষ্টম্ (দৃষ্ট হয়)।
সরলার্থ: স্বপ্নাবস্থায় আমরা যেসব জিনিস দেখি তা মনের সৃষ্টি। সে সবই মিথ্যা। আমরা মনে করি জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা দেখি তা সত্য। আমরা এই দুই অবস্থার অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ভেদ কল্পনা করি তাও ভুল। স্বপ্ন ব্যাপারটিই মিথ্যা হওয়ার দরুন এর মাধ্যমে আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা হয়, সেগুলিকে সত্য বা মিথ্যা যা বলেই মনে করি না কেন আসলে তা সবই মিথ্যা।
ব্যাখ্যা: জাগ্রত অবস্থায় বহির্জগতে আমরা বহু বস্তু দেখি এবং সেগুলিকে আমরা সত্য বলে মনে করি। আবার আমরা মনে মনে নানা চিন্তা নানা কল্পনা করে থাকি কিন্তু সেগুলিকে আমরা সত্য বলে মনে করি না। গৌড়পাদ এখানে বলছেন আমাদের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আমাদের জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই। যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন আমরা বাইরের জগতেরও অনেক বস্তুকে দেখে থাকি। যেমন আমরা স্বপ্নে দেখি যে আমরা কারও সাথে কথা বলছি অথবা স্বপ্নে পর্বত, নদী, হাতি ইত্যাদি নানা জিনিস দেখে থাকি। আবার আমরা এমন স্বপ্নও দেখি যে আমরা কিছু চিন্তা করছি এবং একথাও জানি এসব স্বপ্ন সত্য নয়। যখন জেগে উঠি তখন বুঝি স্বপ্নের সমস্তটাই মিথ্যা। গৌড়পাদ বলছেন যে, আমরা বস্তুকে বাইরে বা ভেতরে যেভাবেই দেখি না কেন দুই শ্রেণীর অভিজ্ঞতাই মিথ্যা। স্বপ্ন মিথ্যা হলে সেই স্বপ্নে যা কিছু দেখি, অনুভব করি বা কল্পনা করি—সে সবই মিথ্যা।

জাগ্রদ্‌বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ॥১০

অন্বয়: জাগ্রদ্‌বৃত্তৌ অপি তু (জাগ্রত অবস্থাতেও); অন্তঃ (দেহের অভ্যন্তরে); চেতসা কল্পিতম্ (মনের সৃষ্ট বস্তুসমূহ); তু অসৎ (অবশ্যই মিথ্যা); বহিঃ (দেহের বাইরে); চেতোগৃহীতম্ (চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত); সৎ (সত্যরূপে); এতয়োঃ ([যে] এই উভয়ই); বৈতথ্যং যুক্তম্ (মিথ্যা—একথা যুক্তিযুক্ত)।
সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা নানারকম কল্পনা করে থাকি। আমরা জানি এ সবই মিথ্যা। কিন্তু বাহ্যজগতে বস্তুকে দেখতে পাই বলে আমরা সেগুলিকে সত্য বলে মনে করি। কিন্তু এই দুই অভিজ্ঞতাই মিথ্যা। যুক্তি দ্বারা এ সিদ্ধান্তটি সমর্থনযোগ্য।

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী শ্লোকের মতো এখানেও গৌড়পাদ বলছেন যে, জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ নানা কল্পনা করে। যেমন, আমি হয়তো ভাবছি আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি। এটা কি সত্য? না, আমি জানি এ আমার শুধুই কল্পনা, হঠাৎ মনে ওঠা চিন্তামাত্র। আবার আমার অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতাও আছে। যেমন আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছি। গৌড়পাদ এখানে বলছেন যে, একথা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত আমার জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা স্বপ্ন অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই মিথ্যা। এখন আপত্তি উঠতে পারে : 'আমি কল্পনা করছি আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি, কিন্তু আমি জানি যে একথা সত্য নয়। আসলে আমি কোথাও যাচ্ছি না। কিন্তু আমি হয়তো কারও সাথে কথা বলছি তবে তাকে মিথ্যা বলব কেমন করে?' গৌড়পাদ বলছেন যে, আমাদের উভয় অভিজ্ঞতারই আরম্ভ ও শেষ আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় আমার কাছে এই বাহ্য জগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। আবার জাগ্রত অবস্থায় আমি হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে আছি তখন আমার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি হয়তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। অনেক সময়ে একথা বলা হয় এ জগৎ মনেরই সৃষ্টি। আমার মনই তোমাকে সৃষ্টি করেছে। তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি কিন্তু তোমাকে তোমার স্বরূপে দেখি না। তোমার উপস্থিতি আমার কল্পনাকে নাড়া দিয়ে যায় মাত্র। তখন আমার মন সেই কল্পনা অনুযায়ী তোমাকে সৃষ্টি করে। তোমার উপস্থিতি এখানে উদ্দীপকের কাজ করে। অর্থাৎ এটি আমাকে কল্পনা করতে সাহায্য করে—এইমাত্র।

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ॥১১

অন্বয়: যদি উভয়োরপি স্থানয়োঃ (যদি জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতে); ভেদানাম্ (বিভিন্ন বস্তু); বৈতথ্যম্ (মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়); কঃ (কে); এতান্ ভেদান্ (এইসব বস্তুকে); বুধ্যতে (প্রত্যক্ষ করে); কঃ বৈ (কে আবার); তেষাং বিকল্পকঃ (সেগুলি চিন্তা করে)।
সরলার্থ: যদি জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাই মিথ্যা হয় তবে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্পর্ক বলে কিছু থাকতে পারে না। আবার এই দুই অবস্থায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসমূহ যদি মিথ্যা হয় তবে সে অভিজ্ঞতার স্রষ্টাই বা কে?
ব্যাখ্যা: এখানে 'ভেদ' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে এর অর্থ হল বস্তু। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ 'পৃথকীকরণ'। এখন আমরা ভেদ অর্থাৎ দুই দেখছি বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে আমরা অভেদ অর্থাৎ একের দিকেই এগোচ্ছি। এখন প্রশ্ন হল কে এই ব্যক্তি যিনি এইসব বস্তুকে দেখে এবং সেগুলিকে অসত্য বলে মনে করে। যদি বলা যায় এই

জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাই মিথ্যা তবে স্বপ্নটি দেখছে কে? কার নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে? এইসব বস্তু কার অভিজ্ঞতার অঙ্গ? বৌদ্ধদর্শন এবং বেদান্ত এই প্রশ্নের সমাধান করেছেন ভিন্নভাবে। বৌদ্ধদর্শন বলেন যে—আত্মা বলে কিছুই নেই। এঁদের মতে কেউ স্বপ্নও দেখে না আবার কেউ ঘুম থেকে জেগেও ওঠে না। কেবলমাত্র এই অসত্য অভিজ্ঞতাগুলিই আছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না, থাকে শুধুমাত্র শূন্য। কিন্তু বেদান্ত বলেন যদি তুমি বল এ জগৎ মিথ্যা তবে কোন একজনকে থাকতে হবে যিনি এই জগৎকে অস্বীকার করবেন। এই জ্ঞাতাটি (যিনি অস্বীকার করছেন) কে? কর্তা ছাড়া কোনও কর্ম হতে পারে কি? অভিজ্ঞতাপ্রাপক ছাড়া কি অভিজ্ঞতা থাকতে পারে? বেদান্ত বলেন আত্মা রয়েছেন আর এই আত্মাই হলেন ব্রহ্ম। সেই চিরন্তন সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন সবকিছুর অধিষ্ঠান বা আশ্রয়।

কল্পয়ত্যাত্মনাঽঽত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ॥১২

অন্বয়: দেবঃ (স্বয়ং প্রকাশিত); আত্মা (আত্মা [যা শুদ্ধ চৈতন্য]); স্বমায়য়া (নিজ শক্তির দ্বারা [যাকে মায়া বলে]); আত্মনা (নিজের থেকেই); আত্মানম্ (নিজেকে); কল্পয়তি (প্রকাশিত করে [স্রষ্টা এবং সৃষ্টিরূপে]); সঃ এব (সেই অভিন্ন আত্মা); ভেদান্ (বিভিন্ন বস্তু); বুধ্যতে (প্রত্যক্ষ করে); ইতি (এই); বেদান্তনিশ্চয়ঃ (বেদান্তের সিদ্ধান্ত)।

সরলার্থ: আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত। এই আত্মা নিজেই তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য ও অদ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও মায়ার সাহায্যে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। এটাই হল বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

ব্যাখ্যা: সমগ্র জগৎই একটি কল্পনামাত্র। কিন্তু কার কল্পনা? তিনি কে যিনি এই কল্পনা করেন? ইনিই স্বয়ং প্রকাশিত আত্মা। 'দেবঃ' শব্দটির অর্থ স্বয়ং জ্যোতি। এই আত্মা জ্যোতিস্বরূপ। নিজ শক্তির সাহায্যে (স্বমায়য়া) আত্মা এই জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি সবসময়েই আছেন কিন্তু তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন এইমাত্র। এখন আমরা বহু—যেমন নারী, পুরুষ, পশুপাখি, গাছপালা, গ্রহ-নক্ষত্র অর্থাৎ ভেদ দেখি। কিন্তু আত্মা অভেদ অর্থাৎ আত্মা এক ও অভিন্ন। একথা ঠিক নয় যে এ জগতের অন্য কোন কর্তা আছেন। এ জগতের কর্তা একজনই আর তিনিই হলেন আত্মা বা ব্রহ্ম। ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ, তিনিই স্রষ্টা। আবার ব্রহ্ম হলেন উপাদান কারণ, তিনিই সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি অভেদ। ব্রহ্ম নিজ শক্তির দ্বারা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু কে এই জগৎকে প্রত্যক্ষ করে? আর এর অভিজ্ঞতা প্রাপকই বা কে? 'সঃ এব বুধ্যতে'—আত্মা স্বয়ং। এই বৈচিত্রের প্রকাশকও তিনি। তিনি নিজেই বহু হয়েছেন। এটাই হল 'বেদান্ত-নিশ্চয়ঃ' অর্থাৎ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এখানে এই সিদ্ধান্তটিতে যেন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কি যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তটিকে খণ্ডন করতে সক্ষম? গৌড়পাদ এখানে বলছেন : এই আমার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা যায় না।

মায়াবাদ বেদান্তের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই সৃষ্টিই মায়া। একথাটি কোন্ অর্থে বলা হয়? এই অর্থে বলা হয় যে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ যেন এক জাদুমাত্র। এ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন : এ-ব্যাপারে একটি কথাই বলা চলে—এ মায়া। আমি কেমন করে ভাবতে শুরু করলাম আমি এই জগৎ থেকে আলাদা, আমি যেন এই দেহ-মন, রাগ-বিদ্বেষ, সুখ-দুঃখ দ্বারা সীমাবদ্ধ এক ব্যক্তিসত্তা। এইসব ঘটনা কেমন করে যে ঘটল তা আমি নিজেও জানি না। এসবের ব্যাখ্যায় আমি ব্যর্থ। আমরা যে অনুভব করি আমরা বদ্ধ, আমরা পীড়িত, আমরা একে অপরের থেকে আলাদা—স্বামীজীর মতে এ এক অনস্বীকার্য ঘটনা। হতে পারে এটা ভুল কিন্তু যেভাবেই হোক এই উপরোক্ত বোধ আমার মধ্যেই থাকে। বেদান্তের মতে আমরা যেন সম্মোহিত হয়ে আছি। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র ধারণা, তুমি-আমির ধারণা এ সবই সম্মোহনের ফল। একেই বলা হয় মায়া।

বিকরোত্যপরান্ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ॥১৩

অন্বয়: প্রভুঃ (অন্তরস্থ ঈশ্বর); অন্তঃ (দেহের অভ্যন্তরে); চিত্তে (মনে); ব্যবস্থিতান্ (বিদ্যমান কামনাসমূহ); অপরান্ (অন্য); ভাবান্ (বস্তুসকল); বিকরোতি (নানারূপে প্রকাশিত); এবং (আবার); বহিশ্চিত্তঃ (বাইরে দৃষ্টিপাত করে [বাইরে নিজেকে প্রকাশ করে]); নিয়তান্ (আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী বস্তু [যেমন জগৎ]); চ (এবং বস্তুসমূহ যা অস্থায়ী [যেমন—প্রত্যক্ষ অনুভূতি]); কল্পয়তে (প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ: আত্মা মনোমধ্যে স্থিত এবং চিন্তা ও কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে ইনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। ক্ষণস্থায়ী (যেমন বিদ্যুৎ), এবং আপেক্ষিক স্থায়ী (যেমন এই জগৎ)—এই উভয় অবস্থার বস্তুসকলের মধ্য দিয়ে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মা নিজেই বহু হয়েছেন। নিজেকে তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেন। 'বি' অর্থ বহু বা বিচিত্র। এই জগতে দৃশ্যবস্তু দুই প্রকারের—বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত

বস্তু। 'নিয়তান্' হল প্রকাশিত বস্তু আর 'অনিয়তান্' হল অপ্রকাশিত বস্তু যা অব্যক্ত। আমাদের অন্তর্জগৎই নানা চিন্তা নানা কল্পনার উৎস। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সমগ্র জগৎ অব্যক্তরূপে আছে। সবকিছুকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। হিমবাহের যেমন শুধুমাত্র উপরিভাগ দেখা যায় ঠিক তেমনি যখন কোন মানুষকে দেখি তখন তার স্বরূপকে আমরা দেখতে পাই না কারণ তার প্রকৃত স্বরূপ তার নিজের মধ্যে লুক্কায়িত। শুধুমাত্র তার দেহ ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই দেখতে পাই।

কিন্তু ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই উভয়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। এ জগৎ দৃষ্টিবিভ্রমমাত্র। একেই বলে মায়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুই অর্থাৎ বৈচিত্রপূর্ণ জগৎকে দেখি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অজ্ঞানতার শিকার। কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তিরা এ জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখেন। এটাই হল প্রকৃত জ্ঞান।

আমাদের যা-কিছু অভিজ্ঞতা তা জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় যা সম্পর্কিতই হোক না কেন এ সবেরই উৎস ব্রহ্ম। আমাদের সমস্ত ধারণা ও কল্পনারও উৎস এই ব্রহ্ম। এইভাবেই সবকিছুর মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। আমি হয়তো কোন শব্দ শুনলাম বা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করলাম। এখানেও আমার মাধ্যমে আত্মাই অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন। আমাদের সবকিছুর পেছনে এই ব্রহ্ম রয়েছেন। আমাদের চারপাশের বস্তুর রদবদল তিনিই ঘটাচ্ছেন। এই দৃশ্যমান জগতের পরিকল্পনাও তাঁর। আর সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। কুম্ভকার প্রথমে মনে মনে ঘটটিকে তৈরি করেন তারপরে তাকে বাস্তবে রূপ দান করেন। এইভাবে আত্মা মনের ভেতরে এবং বাইরে নিজেকে প্রকাশ করেন।

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ॥১৪

অন্বয়: অন্তঃ তু (মনের মধ্যে); যে হি চিত্তকালাঃ (মনগড়া ব্যাপার, এর অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ আমি তার অস্তিত্ব আছে বলে কল্পনা করি); যে চ (আর ঐসব বস্তু); বহিঃ (বাইরে); দ্বয়কালাঃ (যতক্ষণ তাদের অস্তিত্ব থাকে এবং আমি তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকি); তে সর্বে এব কল্পিতাঃ (আন্তর এবং বাহ্য উভয় প্রকার বস্তুই কল্পনাপ্রসূত); অন্যহেতুকঃ বিশেষঃ ন ([জাগ্রত ও স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মধ্যে] পার্থক্যের কোনও যুক্তি নেই)।

সরলার্থ: মনের মধ্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ বস্তুটি আছে বলে আমরা কল্পনা করি। বহির্জগতেও কোন বস্তুর অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ আমরা বস্তুটি

সম্পর্কে সচেতন থাকি। এই সবকিছুই মিথ্যা। এ দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনরকম পার্থক্য আছে ভাবাই অযৌক্তিক।

ব্যাখ্যা: একথা সহজেই বোঝা যায় যে মনের মধ্যে আমরা যা দেখি তা ক্ষণস্থায়ী। ওগুলি মনেরই সৃষ্টি। ঐসব বস্তুর স্থায়িত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ আমরা বস্তুটি আছে বলে কল্পনা করি। সুতরাং সেগুলি মিথ্যা—একথা মেনে নিতে পারি। কিন্তু গৌড়পাদ দাবি করছেন যে—আমাদের জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাও মিথ্যা। কিন্তু আবার এমন সব অভিজ্ঞতাও আছে যা ক্ষণিকের নয়; সেই অতীতকাল থেকে এখনও পর্যন্ত যাদের অস্তিত্ব আছে সেগুলিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেব কেমন করে?

গৌড়পাদ বলছেন যে, এইসব অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল ধরে থাকতে পারে কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে এইসব অভিজ্ঞতা সত্য। এগুলি সত্য নয় কারণ এগুলি অন্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ একটি ঘটনা অন্য আর একটি ঘটনার উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের পর-নির্ভরশীল অভিজ্ঞতা কখনো সত্য হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, দেবদত্ত গরুর দুধ দুইছে। দেবদত্তের অস্তিত্ব ততক্ষণই আছে যতক্ষণ সে দুধ দুইছে। দোহনকার্য ততক্ষণই চলে যতক্ষণ দেবদত্ত সেখানে উপস্থিত। এইভাবে দেখা গেল যে, দেবদত্ত ও দোহনকার্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একটি ব্যর্থ হলে অন্যটিও ব্যর্থ। এরা একে অপরের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং এগুলি কখনো সত্য হতে পারে না। কালের একটি বিশেষ মুহূর্তে এগুলি সত্য বটে কিন্তু মুহূর্তটির আগে ও পরে এগুলি সত্য নয়। যেহেতু এগুলি সবসময়ের জন্য সত্য নয় সেহেতু এগুলি মিথ্যা।

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে।১৫

অন্বয়: অন্তঃ (মনে); যে অব্যক্তা এব (মনগড়া বস্তুর ছদ্মবেশে কামনা-বাসনা); বহিঃ (মনের বাইরে); যে চ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল); স্ফুটাঃ (স্পষ্টতই দৃষ্ট); তে সর্বে এব (ওগুলি সব); কল্পিতাঃ (মনের কল্পনাপ্রসূত); ইন্দ্রিয়ান্তরে তু বিশেষঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিসকল পরিবর্তনশীল)।

সরলার্থ: আমাদের মনে বহু বাসনা থাকে যদিও সেগুলি অস্পষ্ট কল্পনামাত্র। বহির্জগতের বস্তুগুলি খুবই স্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু এ সবই কল্পনাপ্রসূত। আমরা যে এই বস্তুগুলিকে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করি তারজন্য ইন্দ্রিয়গুলিই দায়ী।

ব্যাখ্যা: কোন একটি অবস্থায় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এই সময়ে সে দেখে, শোনে বা আহার করে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার এইসব অভিজ্ঞতা হয়। আবার মনের দ্বারাও সে বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে কিংবা জাগ্রত অবস্থাতেই মনে মনে কোন চিন্তা বা কল্পনা করছে। সাধারণত এই মানস কল্পনাগুলি খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু কোন কোন সময়ে আমাদের কল্পনা এতই স্পষ্ট ও জোরালো হয় যে সেগুলিকে প্রায় সত্য বলেই মনে হয়। যেমন আমরা কল্পনা করতে পারি আমরা কাশীতে মন্দির দর্শন করতে গেছি এবং সেখানে একাকী গঙ্গার ঘাটে বেড়াচ্ছি। আমরা মনে মনে এইসব বস্তুকে কত স্পষ্টভাবে দেখছি, তবুও সেগুলি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই অভিন্ন আত্মাই এইসব অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এইসব অভিজ্ঞতা হয় কখনো বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনো বা মনের দ্বারা। যখন স্বপ্ন দেখি তখনও আমি কিন্তু সেই একই ব্যক্তি যে একটু আগেই জেগে ছিল। গৌড়পাদ বলছেন যে বাহ্য বা অভ্যন্তরীণ উভয় অভিজ্ঞতাই কল্পনাপ্রসূত, মিথ্যা এবং অনিত্য।

জীবং কল্পয়তে পূর্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ॥১৬

অন্বয়: পূর্বম্ (প্রথম); জীবম্ (আমি কর্তা এই বোধ); কল্পয়তে (এইভাবে আত্মা অনুভব করেন); ততঃ (তারপরে); বাহ্যান্ (বাহ্যবস্তু); আধ্যাত্মিকান্ চ (অন্তরে সুখ-দুঃখের বোধ); পৃথগ্‌বিধান্ (বিভিন্ন প্রকার); ভাবান্ (বস্তুসমূহ); যথা বিদ্যাঃ (তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি অনুযায়ী); তথা স্মৃতিঃ (সে মনে করে)।
সরলার্থ: প্রথমে জীবাত্মা কল্পনা করে। সে অনুভব করে এবং বলে 'আমিই কর্তা' (আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি)। এরপর সে কল্পনা করে শব্দের মতো বাহ্যবস্তুগুলিকে ও প্রাণের মতো অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বস্তুকে। জীবাত্মা তার নিজ কল্পনা অনুযায়ী বস্তুকে উপলব্ধি করে থাকে।
ব্যাখ্যা: প্রথমে পরমাত্মা নিজেকে জীবাত্মা বলে কল্পনা করেন। এ যেন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এ ভুল থেকেই ক্রমে এইরকম চিন্তা আসে : 'আমি এটি করেছি, আমি সুখী ইত্যাদি।' বস্তুত এইসব গুণাবলী কাল্পনিকভাবে নিজের উপরে আরোপ করে। আত্মা স্বরূপত নির্গুণ।

একটি ভুল থেকেই অন্য ভুলের উৎপত্তি। পরমাত্মা নিজেকে জীবাত্মা বলে মনে করলে তখন তাঁর বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে কল্পনার অন্ত থাকে না। এইসব বস্তুসকলের মধ্যে কোনটা কারণ আর কোনটা কার্য। কার্য কারণের অনুগামী, আবার কারণ কার্যের অনুগামী।

এর কার্যপ্রণালী এইরকম : ধরা যাক, তুমি কিছু মিষ্টি খাচ্ছ এবং সেগুলি তোমার কাছে অতি উপাদেয় বলে মনে হচ্ছে। এখানে মিষ্টি হল কারণ আর সেগুলিকে যে উপাদেয় বলে মনে হচ্ছে তা হল কার্য। আবার যেহেতু মিষ্টি তোমার কাছে উপাদেয়, সেহেতু তুমি মিষ্টি খেতেও চাও এবং মিষ্টি খাও। এখানে কার্য কারণে এবং কারণ কার্যে পরিণত।

কিন্তু এটা হল বাহ্য জগতের ব্যাপার। ঠিক একই ব্যাপার আমরা মানসিকভাবেও উপলব্ধি করতে পারি। আমার মিষ্টি খাওয়ার স্মৃতি রয়েছে এবং এই স্মৃতির জন্যই আমি মিষ্টি খেতে চাই এবং মিষ্টি খাই।

এইভাবে বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ বস্তুর পরস্পরের প্রভাবের ফলে জীবাত্মা নিজ মনোসৃষ্ট বিষয়সমূহের দাস হয়ে পড়ে।

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥১৭

অন্বয়: অন্ধকারে অনিশ্চিতা (অন্ধকারে অনিশ্চিত); রজ্জুঃ (দড়ি); সর্পধারাদিভির্ভাবৈঃ (সাপ, জলধারা বা এই ধরনের অন্যান্য বস্তুর মতো); বিকল্পিতা (ভুল ধারণা করা হয় [পৃথক বস্তু হিসাবে]); তদ্বৎ (একইভাবে); আত্মা (পরমাত্মা); বিকল্পিতঃ ([জীবাত্মারূপে যিনি সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন] কল্পনা করা হয়)। **সরলার্থ:** অন্ধকার জায়গায় কোন দড়ি দেখে আমরা অনেক সময়ই সাপ বা জলধারা বা এই ধরনের কোন বস্তু বলে ভুল করে থাকি। এ সবই আমাদের মনের ভুল। ঠিক একইভাবে, আমরা পরমাত্মাকে (যিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ) কর্তা হিসাবে অথবা আমাদেরই মতো সুখী বা দুঃখী ব্যক্তি বলে মনে করে থাকি। কিন্তু এও আমাদের মনের ভুল।

ব্যাখ্যা: আমরা এরকম ভুল করি কেন? আমরা ব্রহ্মকে দেখতে পাই না কেন? আমরা পুরুষ, স্ত্রী, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি নানারকমের জিনিস দেখতে পাই। কিন্তু আমরা আত্মাকে দেখতে পাই না কেন? এখানে গৌড়পাদ বলছেন, ধরা যাক, অন্ধকার রাস্তায় একটি দড়ি পড়ে আছে। আমি ওটাকে দড়ি বলে চিনতে পারছি না। মনে করছি ওটা সাপ বা ঐ জাতীয় কোন কিছু। ঠিক একইভাবে, অজ্ঞানতার অন্ধকারের জন্য আমরা আমাদের নিজ আত্মাকে দেখতে পাই না।

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ॥১৮

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); রজ্জুঃ এব (এটি দড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়); নিশ্চিতায়াম্ (যখন স্থির হল); **রজ্জ্বাম্** (দড়ির উপরে); বিকল্পঃ (এটা সাপ বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু বলে মনে করা); বিনিবর্ততে (পুরোপুরি অস্বীকার করা); অদ্বৈতম্ ([তারপর যা বাকী থাকে] একটিমাত্র বস্তু [অর্থাৎ দড়িটি]); তদ্বৎ (একইভাবে [অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের দ্বারা যখন অজ্ঞানতা দূর হয়]); আত্মা বিনিশ্চয়ঃ (তখন তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত [অর্থাৎ তুমিই পরমাত্মা])।

সরলার্থ: সেখানে দড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু অন্ধকারের জন্য আমরা দড়িকে সাপ বলে মনে করছি। আলো এলেই আমরা বুঝতে পারি ওটা সাপ নয় আসলে দড়ি। ঠিক একইভাবে শাস্ত্রপাঠের দ্বারা নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যে অজ্ঞানতা তা দূর হয়। তখন আমরা উপলব্ধি করি আমরাই পরমাত্মা (যা নিত্যমুক্ত, এবং জন্মমৃত্যুরহিত)।

ব্যাখ্যা: আমরা কখনো কখনো অন্ধকার জায়গায় পড়ে থাকা দড়িকে সাপ বলে ভুল করে থাকি। কিন্তু আলো নিয়ে এলে আমরা দেখি সেখানে আদৌ কোন সাপ ছিল না। আসলে ওটা একটা দড়ি।

একইভাবে, আমরা সংসারজালে বদ্ধ, একথা মনে করাও ভুল। আমরা আমাদের এই দেহটাকে 'আমি' বলে মনে করি এবং ভাবি আমরা পরিবেশের দাস। আমরা তাই সবসময় মৃত্যুভয়ে তাড়িত।

এই মায়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হল শাস্ত্রপাঠ এবং অনিত্য বস্তুকে ত্যাগ করা। এই অভ্যাসের ফলে ক্রমে আমার মধ্যে এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, আমি জীবাত্মা নই, পরমাত্মা। তখন নিখিল জগতের সাথে আমি একাত্মতা অনুভব করে থাকি। তখন আমিই সকলের অন্তরাত্মা। আমার কখনো জন্ম হয়নি, আবার আমার মৃত্যুও হবে না। 'আমি' নিত্য, মুক্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

সূর্য উদয় হলে আর কোন অন্ধকার থাকে না। ঠিক সেইরকম, যখন আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করি তখন আমাদের সকল ভুলভ্রান্তির নাশ হয়। আমরা তখন উপলব্ধি করি আমরা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছু নই।

প্রাণাদিভিরনন্তৈশ্চ ভাবৈরেতৈর্বিকল্পিতঃ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্॥১৯

অন্বয়: এতৈঃ (এইসব); প্রাণাদিভিঃ (প্রাণ [প্রাণবায়ু] ইত্যাদি); অনন্তৈঃ ভাবৈঃ (অসংখ্য বস্তু); বিকল্পিতঃ (কল্পনা করা হয়েছে); তস্য দেবস্য (সেই স্বয়ং প্রকাশিত আত্মার); এষা

মায়া (মায়ার এই মোহিনীশক্তি); যযা অয়ং স্বয়ং মোহিতঃ (যার দ্বারা আত্মা নিজেকেই মুগ্ধ করে)।

সরলার্থ: এই আত্মা অদ্বিতীয়। এই আত্মাকে প্রাণ ইত্যাদি বহু রূপে কিভাবে দেখা যায়? এটি সম্ভব হয় আত্মার নিজ শক্তি অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে। বহু বস্তুকে দেখা ঠিক দেখা নয়। এ আমাদের মনের ভুল। এক আত্মাই নিজ শক্তি অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে বহু হয়েছেন। বহু এই একের উপরই অর্থাৎ 'আত্মার' উপরই আরোপিত। আত্মা যেন নিজ মায়াতে নিজেই মুগ্ধ।

ব্যাখ্যা: যদি একথা সত্য হয় যে, আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, তবে এই আত্মা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেন কিভাবে? কেমন করেই বা একমাত্র আত্মাকে আমরা আমাদের চারপাশের নানা বস্তুরূপে দেখতে পাব? উত্তরে বলা যায় এ মায়ার দ্বারাই সম্ভব হয়। মায়া স্বয়ংপ্রকাশিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মারই শক্তি। যাদুকর নানা কৌশলে যাদু দেখায়। যেমন সে হয়তো শূন্যে বাগানও তৈরি করতে পারে। এ আমাদের মনের ভুল। কিন্তু যখন আমরা খেলাটা দেখি তখন এটাকে ভুল বলে মনে হয় না। সেইভাবে আত্মা আমাদের চারপাশের নানা বস্তুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। আর এই কাজটি তিনি তাঁর নিজ মায়াশক্তির সাহায্যেই করেন। আত্মা যেন নিজ মায়াতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আছেন। ভগবদ্গীতা বলছেন (৭।১৪) : 'আমার মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা কঠিন।'

প্রাণ ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্বিদঃ।
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্বিদঃ॥২০

অন্বয়: প্রাণবিদঃ (সমষ্টি মন—হিরণ্যগর্ভের যাঁরা উপাসক [অর্থাৎ যাঁরা বৈশেষিক মতবাদী]); প্রাণ ইতি (পরমাত্মাকেই প্রাণ অথবা হিরণ্যগর্ভ [ঈশ্বরও] বলে মনে করেন); ভূতানি ইতি চ তদ্বিদঃ (জড়বাদীরা অর্থাৎ যাঁরা লোকায়ত উপাদানসমূহকে [যথা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম] একমাত্র সত্য বলে মনে করেন); গুণবিদঃ (সাংখ্যরা); গুণাঃ ইতি (বিশ্বাস করেন তিনটি গুণ [সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ] দিয়ে আত্মার সৃষ্টি); তত্ত্বানি ইতি চ তদ্বিদঃ (শৈবরা এই জগতের কারণ হিসাবে আত্মা, অবিদ্যা [অজ্ঞানতা বা মায়া] ও শিবকে উপাসনা করে থাকেন)।

সরলার্থ: যাঁরা হিরণ্যগর্ভকে উপাসনা করেন তাঁরা মনে করেন আত্মাই হিরণ্যগর্ভ। বৈশেষিক দার্শনিকরা মনে করেন, ঈশ্বরই আত্মা এবং তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা। জড়বাদী অর্থাৎ লোকায়ত দার্শনিকদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই চারটি দ্বারাই এই জগৎ

সৃষ্টি হয়েছে। আবার সাংখ্যের মতে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণই হল আত্মার উপাদান। আর শৈবরা বিশ্বাস করেন শিব, অবিদ্যা এবং আত্মাই হল জগতের মূল।

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি তদ্বিদঃ।
লোকা ইতি লোকবিদো দেবা ইতি চ তদ্বিদঃ।।২১

অন্বয়: পাদাঃ ইতি পাদবিদঃ (যাঁরা পাদে বিশ্বাসী [পাদ অর্থাৎ পরমাত্মার তিন অবস্থা—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ] তাঁরা পাদকেই সত্য বলে মনে করেন); বিষয়াঃ ইতি তদ্বিদঃ (বাৎসায়ন ও তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাস করেন জড়বস্তুই সত্য); লোকাঃ (তিন লোকই [ভূ, ভুবঃ এবং স্বঃ] সত্য); ইতি লোকবিদঃ (পুরাণ-বিশ্বাসীদের মতে); দেবাঃ ইতি চ তদ্বিদঃ (যাঁরা দেবদেবীতে বিশ্বাসী, তাঁদের মতে দেবদেবীই সত্য)।
সরলার্থ: যাঁরা পাদ অর্থাৎ অবস্থায় বিশ্বাসী, তাঁরা পাদকেই সত্য বলে মনে করেন। তাঁরা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন রূপে আত্মাকে গ্রহণ করেন। আবার আর একদল মানুষ জড়বস্তুকেই সত্য বলে মনে করেন। তাঁরা বাৎসায়ন প্রতিষ্ঠিত দর্শনে বিশ্বাসী। আর এক শ্রেণীর চিন্তাবিদরা বলেন পুরাণই সত্য। তাঁদের মতে ভূ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিন লোকই সত্য। আরও এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা দেবদেবীর পূজা করেন এবং দেবদেবীকেই সত্য বলে মনে করেন।

বেদা ইতি বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্বিদঃ।
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যমিতি চ তদ্বিদঃ।।২২

অন্বয়: বেদবিদঃ বেদাঃ ইতি যাঁরা বেদ বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন বেদই সর্বশ্রেষ্ঠ); যজ্ঞাঃ ইতি তদ্বিদঃ (যাঁরা যাগযজ্ঞ [কর্মযজ্ঞ] করেন তাঁরা যাগযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন); ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদঃ (সাংখ্যদের মতে আত্মা কোন কিছুই করেন না অর্থাৎ কোন কিছুই ভোগ করেন না); ভোজ্যম্ ইতি তদ্বিদঃ (পাচক বিশ্বাস করেন খাদ্যবস্তু খাওয়ারই জন্য)।
সরলার্থ: যাঁরা বেদপাঠে অনুরাগী ও অভ্যস্ত তাঁরা বেদকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। যাঁরা যাগযজ্ঞ (অর্থাৎ কর্মযজ্ঞ) করেন তাঁরা যাগযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। আবার সাংখ্যরা বলেন, আত্মা কোন কিছু করেন না। অর্থাৎ আত্মা কর্তা, ভোক্তা নন। (তাঁদের ভাষায় আত্মা পুরুষ এবং পুরুষ সাক্ষীমাত্র।) পাচকরা বলেন খাদ্যবস্তু তো খাওয়ারই জন্য। (পাচকের মতো, অনেক মানুষই মনে করেন জীবন শুধুমাত্র ভোগের জন্য।)

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্বিদঃ।
মূর্ত ইতি মূর্তবিদোঽমূর্ত ইতি চ তদ্বিদঃ॥২৩

অন্বয়: সূক্ষ্মবিদঃ সূক্ষ্মঃ ইতি (কিছু মানুষ মনে করেন আত্মা অণুর মতোই ছোট); স্থূলঃ ইতি তদ্বিদঃ (অন্যেরা মনে করেন আত্মা আমাদের শরীরের মতোই বড় [এঁরা জড়বাদী]); মূর্তঃ ইতি মূর্তবিদঃ (অন্য আর এক গোষ্ঠী মনে করেন সাকার উপাসনাই পরম সত্য [যেমন, শৈবদের মতে পরম সত্য যেন শিব, যিনি ত্রিশূলধারী ও ষাঁড়ের উপর বসে আছেন]); অমূর্তঃ ইতি তদ্বিদঃ (আবার আর একদল মানুষ মনে করেন পরম সত্য হল শূন্য [এঁরা শূন্যবাদী])।

সরলার্থ: কিছু মানুষ মনে করেন, আত্মা খুবই সূক্ষ্ম, যেন একটি অণু। আবার অনেকের মতে আত্মা স্থূলস্বভাবের। তাঁদের মতে আমাদের এই শরীরই আত্মা এবং শরীরই পরম সত্য। এঁরা লোকায়ত দার্শনিক বা জড়বাদী। অপর আর এক গোষ্ঠী মনে করেন পরম সত্য হল তাঁদের উপাস্য দেবদেবী, যেমন শিব—যাঁর হাতে ত্রিশূল ও যিনি ষাঁড়ের উপর বসে আছেন। আবার এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা পরম সত্যকে নিরাকার (দেহহীন), নির্গুণ (গুণ বা উপাধিবিহীন) বলে মনে করেন। তাঁদের কাছে পরম সত্য কিছুই নয়, শূন্যমাত্র।

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্বিদঃ।
বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্বিদঃ॥২৪

অন্বয়: কালঃ ইতি কালবিদঃ (জ্যোতির্বিদদের মতে কালই পরম সত্য); দিশঃ ইতি তৎ বিদঃ (মানুষের শ্বাসক্রিয়া দেখে যাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তাঁরা মনে করেন এই জ্যোতির্বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান); বাদাঃ ইতি বাদবিদঃ (যাঁরা শব্দের শক্তিতে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন শব্দই শ্রেষ্ঠ); ভুবনানি ইতি তৎ বিদঃ (যাঁরা [চতুর্দশ] লোক নিয়ে অধ্যয়ন করেন তাঁরা তাঁদের বিষয়কেই শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেন)।

সরলার্থ: জ্যোতির্বিদরা মনে করেন কালই পরম সত্য। আবার এমন সব মানুষও আছেন যাঁরা মানুষের শ্বাসক্রিয়ার ধরন দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তাঁদের মতে জ্যোতিষই হল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা শব্দের শক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁরা শব্দকেই বিজ্ঞান হিসাবে পড়াশুনো করেন। এবং তাঁদের মতে এই শব্দ বিজ্ঞানই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আবার কিছু মানুষ এই চতুর্দশ লোক নিয়ে পড়াশুনো করেন। তাঁরা বলেন, অন্য সব বিদ্যার মধ্যে তাঁদের বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ।

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্বিদঃ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্মাধর্মৌ চ তদ্বিদঃ॥২৫

অন্বয়: মনোবিদঃ মনঃ ইতি (কোন কোন ব্যক্তি বলেন মনই আত্মা); বুদ্ধিঃ ইতি তৎ বিদঃ (অন্যেরা বলেন বুদ্ধিই আত্মা); চিত্তম্ ইতি চিত্তবিদঃ (কারও [বৌদ্ধদের একাংশের] মতে সবকিছু মনেই রয়েছে, বাইরে নয়); ধর্মাধর্মৌ তৎ বিদঃ (কারও মতে, আমাদের কি করা উচিত আর কি উচিত নয় এ ব্যাপারে বৈদিক বিধিনিষেধই শেষ কথা)।
সরলার্থ: কিছু মানুষের মতে মনই আত্মা। আবার কারও মতে বুদ্ধিই আত্মা। বৌদ্ধদের মধ্যে এক গোষ্ঠী মনে করেন যে আমাদের মনেই সবকিছু আছে, বাইরে নয়। আর এক গোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা মনে করেন যে বেদের শিক্ষাই একমাত্র সত্য। আমাদের কোন্ কাজ করা উচিত আর কোন্টা করা উচিত নয়, এ ব্যাপারে বেদের নির্দেশ মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য।

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্বিংশ ইতি চাপরে।
একত্রিংশক ইত্যাহুরনন্ত ইতি চাপরে॥২৬

অন্বয়: একে (কিছু ব্যক্তি [সাংখ্য দার্শনিকরা]); পঞ্চবিংশকঃ ইতি (এই দৃশ্যমান জগতের পঁচিশটি অংশ : প্রকৃতি, মহৎ [সমষ্টি মন], অহংকার [অহংবোধ], পাঁচটি তন্মাত্র [সূক্ষ্ম উপাদান], পাঁচটি স্থূল উপাদান, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় [মন এবং পুরুষ, পুরুষ যিনি সাক্ষীমাত্র]); অপরে (অন্যেরা [যেমন, পাতঞ্জলি গোষ্ঠী]); ষড়্বিংশ [২৬] ইতি (এই জগতের ছাব্বিশটি অংশ [সাংখ্যের পঁচিশটি ও ঈশ্বর]); আহুঃ ইতি (অন্য গোষ্ঠী বলেন); একত্রিংশকঃ (সংখ্যাটি একত্রিশ); অনন্তঃ ইতি চ অপরে (আরও অন্য এক দল বলেন সংখ্যাটি গণনার অতীত)।
সরলার্থ: সাংখ্যমতে, এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য এবং এই জগতের পঁচিশটি অংশ। পাতঞ্জলি গোষ্ঠীর মতে এই সংখ্যা ছাব্বিশ। কারও কারও মতে এই সংখ্যা একত্রিশ। আবার কারও মতে এই সংখ্যা গণনার অতীত।

লোকাঁল্লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্বিদঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমথাপরে॥২৭

অন্বয়: লোকবিদঃ লোকান্ প্রাহুঃ (কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা অপরকে সন্তুষ্ট করতেই ব্যস্ত, তাঁরা মনে করেন অপরকে আনন্দ দেওয়াই একমাত্র ধর্ম); তৎ বিদঃ আশ্রমাঃ (আবার দক্ষের মতো কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বর্ণাশ্রমের নিয়মাবলীর উপরই বেশি গুরুত্ব দেন এবং এগুলিকেই তাঁদের জীবনের সব বলে মনে করেন); লৈঙ্গাঃ (যিনি ব্যাকরণ জানেন); স্ত্রীপুংনপুংসকম্ (স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক—এই প্রকার লিঙ্গভেদকে জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং একমাত্র সত্য বলে মনে করেন); অথ অপরে পর অপরম্ (আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মকেই সত্য বলে মনে করেন)।

সরলার্থ: কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অন্যকে আনন্দ দিতেই ব্যস্ত। তাঁদের কাছে এটাই ধর্ম। আবার অন্য কিছু মানুষ বর্ণাশ্রমপ্রথা কঠোরভাবে মেনে চলেন। একেই তাঁরা ধর্ম বলে মনে করেন। আবার যাঁরা ব্যাকরণবিদ তাঁরা লিঙ্গের উপরই বেশি গুরুত্ব দেন। যে সমস্ত শব্দগুলি লিঙ্গের প্রতীক সেগুলি তাঁদের কাছে পবিত্র। আবার এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন।

সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্বিদঃ।
স্থিতিরিতি স্থিতিবিদঃ সর্বে চেহ তু সর্বদা॥২৮

অন্বয়: সৃষ্টিবিদঃ সৃষ্টিঃ ইতি লয় ইতি তৎ বিদঃ, স্থিতিঃ ইতি স্থিতিবিদঃ (পুরাণ মতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এ সবই সত্য); সর্বে চ সর্বদা ইহ তু (এইসব এবং এছাড়াও অন্যান্য যা-কিছু মানুষ কল্পনা করে সবই আত্মার উপর আরোপিত)।

সরলার্থ: পুরাণ মতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এ সবই সত্য। এইসব এবং এছাড়াও অন্যান্য যা-কিছু মানুষ কল্পনা করে, তা সবই আত্মার উপর আরোপিত।

ব্যাখ্যা: আচার্য শঙ্কর ২০ থেকে ২৮ এই শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করেননি। এদের কোন গুরুত্ব নেই। লোকের বিশ্বাস, জনশ্রুতি এবং কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করেই এই শ্লোকগুলি বলা হয়েছে। স্পষ্টতই এগুলিকে উপেক্ষা করা যায় এবং শঙ্কর তাই করেছেন।

এইসব ধারণা যেন দড়ির উপর সাপ, জলধারা বা ঐ জাতীয় কোন বস্তুকে ব্রহ্মের কারণ-অবস্থার উপর আরোপ করা হয়েছে।

যং ভাবং দর্শয়েদস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তং চাবতি স ভূত্বাহসৌ তদ্গ্রহঃ সমুপৈতি তম্॥২৯

অন্বয়: যস্য যং ভাবং দর্শয়েৎ (যেভাবে সে বস্তুকে দেখতে শিখেছে); সঃ তং ভাবং তু পশ্যতি (সেভাবেই সে বস্তুটিকে গ্রহণ করে); অসৌ সঃ ভূত্বা (সে ঐ বস্তুতে পরিণত হয়); তং চ অবতি (বস্তুটি তাকে রক্ষা করে); তৎ গ্রহঃ (ঐ বস্তুতে তার মগ্নতা); তং সমুপৈতি (তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে)।

সরলার্থ: আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই সম্পর্কে আচার্য আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। উদ্দেশ্যটি কোন বস্তু বা ভাব হতে পারে। সেই বস্তুকে বা ভাবটিকে আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছি। এর ফলে আমার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং আমি ক্রমে ঐ ব্যক্তিতে (যা আমার লক্ষ্য) পরিণত হই। এই পরিবর্তনসমূহ আমাকে রক্ষা করে রাখে। আমার লক্ষ্যে আমি তখন এতই মগ্ন যে অন্য আর কিছু আমার মনকে আকর্ষণ করতে পারে না।

ব্যাখ্যা: এই মায়া থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি? আমরা এক্ষেত্রে আচার্যের সাহায্য নিতে পারি। এই আচার্য কোন ব্যক্তি হতে পারেন, আবার শাস্ত্র; যেমন উপনিষদও হতে পারেন। কিন্তু আসল কথা হল যেমন করেই হোক অজ্ঞানতাকে দূর করতে হবে। অন্ধকারে রাস্তায় একটুকরো দড়ি পড়ে আছে। তা দেখে আমি সেটাকে সাপ বলে মনে করেছি। ভয় পেয়ে আমি তখন সাপ সাপ বলে চিৎকারও করলাম। কিন্তু একজন আলো এনে আমাকে দেখালো ওটি সাপ নয়, একটুকরো দড়ি। একইভাবে অন্ধকারের আবরণ সত্যকে ঢেকে রয়েছে। মায়ার উৎপত্তি এরই থেকে। আচার্য যখন জ্ঞানের আলো নিয়ে আসেন তখনি আমরা আসল বস্তুটিকে অর্থাৎ সত্যকে দেখতে পাই।

এই জগতে আমাদেরকে কে রক্ষা করে? শুধুমাত্র জ্ঞান। এই কারণেই জ্ঞানকে অন্য সবকিছুর থেকে বেশি শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। হিন্দুদর্শনে জ্ঞানকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেই আমরা মুক্ত হয়ে যাই। যখন আমরা চরম সত্যকে জানি তখনি আমরা মুক্ত। আচার্য আমাদেরকে এই জ্ঞানই দেন এবং এই জ্ঞানই আমাদেরকে সবকিছু থেকে রক্ষা করে।

আত্মজ্ঞান লাভ করলে আমরা বদলে যাই। অর্থাৎ অন্য এক মানুষে পরিণত হই। এখন আমরা নিজেদের আত্মার থেকে আলাদা বলে মনে করি। নিজ আত্মার কাছে আমরা নিজেরাই যেন অপরিচিত। আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানি না। আত্মজ্ঞান লাভ করলে আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি। আমরা তখন নিজ আত্মাতে লীন হয়ে যাই। কোন কিছুই আমাদের মনকে তখন চঞ্চল করতে পারে না।

এতৈরেযোঽপৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।

এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ॥৩০

অন্বয়: এষঃ (এই আত্মা); এতৈঃ (পূর্বে যেমন বলা হয়েছে); অপৃথগ্‌ভাবৈঃ (প্রাণ ও অন্যান্য বস্তু থেকে যদিও আলাদা নন); পৃথগেব (পৃথকরূপে); ইতি লক্ষিতঃ (অজ্ঞান ব্যক্তি এভাবেই দেখেন); যঃ (বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ); তত্ত্বেন (প্রকৃত স্বরূপ); এবং বেদ (এইভাবে জানেন); সঃ (সেই ব্যক্তি); অবিশঙ্কিতঃ (তাঁর মন সবরকমের ভয় থেকে মুক্ত); কল্পয়েৎ (বেদের বাণী নিয়ে চিন্তা করেন)।

সরলার্থ: আত্মা হলেন সেই আশ্রয় যাঁর উপর সকল অনিত্য বস্তু অধিষ্ঠিত। আমাদের চারপাশে আমরা প্রাণেরই প্রকাশ দেখতে পাই। অজ্ঞান ব্যক্তি এই প্রাণ ও তার প্রকাশকে পৃথক বলে মনে করেন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, প্রাণ আত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু আছে তা সব আত্মারই বিকার। সবকিছুর মধ্যে এই এক আত্মাই বিরাজ করেন—একথা যিনি জানেন তিনি আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাসী এবং ভয়শূন্য। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি বেদের বাণীসমূহকে উপলব্ধি করেছেন—একথা তিনি দাবি করতে পারেন।

ব্যাখ্যা: দড়ি ছাড়া রজ্জুসর্পে যেমন সাপের কোনও অস্তিত্ব নেই, ঠিক তেমনি আত্মা ছাড়াও এ জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই। আত্মার উপরেই এই জগৎ আরোপিত, দাঁড়িয়ে আছে। আত্মাই সেই অধিষ্ঠান যাঁর উপর এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আত্মা ও জগৎ আলাদা এমন কথা ভাবাও ভুল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, এই জগৎ আত্মার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা চারিদিকে যে বৈচিত্র দেখে থাকি, সেই বৈচিত্রের মধ্যেও এক আত্মাই বিরাজ করছেন, এই আত্মারই বৈচিত্র। যিনি এই সত্যকে জেনেছেন তিনিই বেদের সারমর্ম বুঝতে সক্ষম। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু নাম-রূপের দরুন এই এক আত্মাই বহু হয়েছেন।

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥৩১

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); স্বপ্নমায়ে (স্বপ্ন এবং দৃষ্টিবিভ্রম); দৃষ্টে (আপাতদৃষ্টিতে দুটোকেই সত্য বলে দেখ); যথা (ঠিক যেমন); গন্ধর্বনগরম্ (আকাশে নির্মিত প্রাসাদ [গন্ধর্ব নামক অতিমানবিক কারও দ্বারা তৈরি অর্থাৎ আকাশকুসুম কল্পনা]); তথা (সেই প্রকার); বেদান্তেষু (বেদান্তে); বিচক্ষণৈঃ (পণ্ডিতদের দ্বারা); ইদম্ (এই); বিশ্বম্ (বিশ্ব); দৃষ্টম্ (দেখা যায়)।

সরলার্থ: যখন আমরা স্বপ্নে কোন বস্তুকে দেখি বা এক বস্তুর স্থলে অন্য কোন বস্তুকে দেখি, ভুলবশত সেগুলিকেই আমরা সত্য বলে মনে করি। (কিন্তু পরে বুঝতে পারি যে, এগুলি আদতে সত্য নয়।) গন্ধর্বনগরের মতো এ যেন আকাশকুসুম কল্পনা। বেদান্তবাদীরা এ সত্য জানেন এবং এই জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করেন।

ব্যাখ্যা: আমরা বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে বলতে পারি এ জগৎ মিথ্যা। বেদান্তও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। শাস্ত্র বলেন, আমাদের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা বা আমরা যে ভুল দেখি, এই দুই মিথ্যা। শাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ হলঃ প্রকৃতপক্ষে এ জগতের সবকিছুই আত্মা [বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।৪।৬], এবং আত্মা এক ও অদ্বিতীয় [ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।২।১]।

আত্মজ্ঞান লাভ হলে তখন আর দুই বলে কিছু থাকে না। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হয়ে যায়। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সর্বত্রই এই 'এক' অর্থাৎ আত্মাকে দেখেন। তিনি দ্বৈতবুদ্ধির দ্বারা কখনো বিভ্রান্ত হন না। তিনি জানেন যে দড়িই সত্য, সাপ নয়। তাই তাঁর কাছে আত্মাই একমাত্র সত্য, এ জগৎ নয়।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।।৩২

অন্বয়: ন নিরোধঃ (প্রকৃতপক্ষে শেষ বলে কিছু নেই); ন চ উৎপত্তিঃ (এবং শুরু বলেও কিছু নেই); ন বদ্ধঃ (কেউই বদ্ধ নয়); ন চ সাধকঃ (সাধক বলে কেউ নেই অর্থাৎ কারও মুক্ত হবার চেষ্টাও নেই); ন মুমুক্ষুঃ (কারও মুক্তির ইচ্ছা নেই); ন বৈ মুক্তঃ (কেউই মুক্ত নয়); ইতি এষা পরমার্থতা (এই পরম সত্য)।

সরলার্থ: জন্ম বা মৃত্যু বলে কিছু নেই। কেউই সংসারে বদ্ধ নয়। কারও মুক্ত হবার চেষ্টা বা ইচ্ছার অবকাশ নেই, কারণ তুমি তো মুক্ত হয়েই আছ। এই পরম সত্য।

ব্যাখ্যা: গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত হলঃ 'ন নিরোধঃ'—আমার মৃত্যু নেই; আবার 'ন চ উৎপত্তিঃ'—আমার জন্ম বলেও কিছু নেই। কারণ আমিই সেই আত্মা। 'ন বদ্ধঃ'—আমি কখনো বদ্ধ ছিলাম না। 'ন সাধকঃ'—আর আমার যদি কোন বন্ধনই না থাকে তবে সাধনা করব কিসের জন্য? আমরা নিজেদের বদ্ধ বলে মনে করি বলেই তো মুক্তি লাভ করার জন্য সাধনা করি। আমার কোন কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই। 'ন মুমুক্ষুঃ'—মোক্ষলাভের ইচ্ছাও আমার নেই। যদি আমি মুক্তই হই তবে কেনই বা আমি মুক্তির চেষ্টা করব? 'ন বৈ মুক্তঃ'—আমি মোক্ষলাভ করেছি এমনও নয়। কারণ আমি তো নিত্যমুক্ত, সবসময়ই মুক্ত।

মূল কথাটি এই, এর আগে আমি যদি আত্মা না হয়ে থাকি তবে আমি কখনই আত্মা হতে পারব না। যদি ইতিপূর্বেই আমি মুক্ত না হয়ে থাকি তবে আমি কোন দিনই মুক্ত হতে পারব না। আমি হয়তো নিজেকে বদ্ধ, দুর্বল, অসহায়, দুঃখী বলে মনে করি, কিন্তু এসবই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা। 'তৎ ত্বম্ অসি'—'তুমিই সেই'। অর্থাৎ তুমি তো ব্রহ্মই হয়ে আছ, তুমি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও। এই হল চরম সত্য (ইতি এষা পরমার্থতা)।

ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা॥৩৩

অন্বয়: অয়ম্ (এই আত্মা); এব (অবশ্যই); অসদ্‌ভিঃ ভাবৈঃ (অনিত্য বস্তুর মতো); অদ্বয়েন চ (অদ্বয়রূপে); কল্পিতঃ (অজ্ঞান ব্যক্তি মনে করেন); ভাবাঃ অপি (অনিত্য বস্তুও); অদ্বয়েন (অদ্বয়রূপে); তস্মাৎ (এইজন্য); অদ্বয়তা (অদ্বৈততত্ত্ব); শিবা (কল্যাণকর)।

সরলার্থ: আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। আত্মাই পরম সত্য। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে, এ জগতের অন্যান্য বস্তুর মতো আত্মাও একটি বস্তুমাত্র। সমগ্র জগৎ আত্মার উপর আরোপিত। এইভাবেই জগৎ আত্মার চরিত্র অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ করে। এই কারণের জন্যই আত্মাকে তিনি বস্তু বলে ভুল করেন। আত্মা সত্য, তাই জগৎকেও সত্য বলে মনে হয়। আমরা একথা ভেবে খুবই আনন্দ পাই যে আত্মা ও জগৎ এক ও অভিন্ন। আমরা যে এমনটি ভাবি তার কারণ অদ্বৈততত্ত্ব এক আনন্দদায়ক চিন্তা।

ব্যাখ্যা: এই অদ্বৈততত্ত্বকে ভালো লাগে কেন? কোন স্থানে যদি দুজন ব্যক্তি থাকেন তবে তাঁদের মধ্যে কখনো ভালো কখনো খারাপ সম্পর্ক হতে পারে। অনিশ্চয়তার বোধ তাঁদের সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। তাঁদের মানসিক শান্তি বলে কিছু থাকে না।পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যদি দুই ব্যক্তির পরিবর্তে এক ব্যক্তি ও একটি বাঘ একসাথে থাকে। এই দুই-এর মধ্যে যে-কোন একজন জীবিত থাকবে—হয় মানুষটি, নাহয় বাঘটি। এইজন্যই অদ্বৈততত্ত্ব সবসময়েই সুখপ্রদ।

এই জগৎ সত্য নয়, কারণ এটি সতত পরিবর্তনশীল। চারিত্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে এ জগৎ বৈচিত্রময়। তাই এখানে অদ্বৈতের কোন প্রশ্নই উঠে না। এ জগতের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। যদি এর কোনও অস্তিত্ব থেকে থাকে তা হল রজ্জুতে সাপের যেমন অস্তিত্ব, ঠিক সেইরকম। অর্থাৎ এ জগৎ আত্মার উপর আরোপিত মাত্র। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ হলেই জানা যায়, এ জগৎ আগেও কখনো ছিল না, পরেও কখনো থাকবে না।

এ জগতে আমরা কত রকমের বৈচিত্র দেখে থাকি। কিন্তু যেহেতু জগৎই মিথ্যা সেহেতু এর বৈচিত্রগুলিও সব মিথ্যা। এক ও অভিন্ন আত্মাই একমাত্র সত্য। সেই আত্মাই হল অদ্বৈততত্ত্ব। আত্মা আনন্দস্বরূপ তাই অদ্বৈততত্ত্ব আনন্দময়। যতদিন আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতা থাকবে ততদিন ভাবতে ভালো লাগে এই জগৎ ও আত্মা এক ও অভিন্ন।

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন।
ন পৃথঙ্ নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ।।৩৪

অন্বয়: নানা (বিভিন্ন নাম-রূপসহ); ইদম্ (এই জগৎ); আত্মভাবেন ন (আত্মার মতো নয়); স্বেন অপি (স্বাধীনভাবে); কথঞ্চন ন (কোনও বস্তু নয়); কিঞ্চিৎ পৃথক্ ন (এতটুকু আলাদা নয় [আত্মার থেকে]); ন অপৃথক্ (আত্মার মতোও নয়); তত্ত্ববিদঃ ইতি বিদুঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁকে এইভাবে জানেন)।

সরলার্থ: এই জগৎ বিভিন্ন নাম-রূপের সমষ্টি। আত্মার মতো এ জগৎ স্বয়ংপ্রকাশিত এবং স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয়। বস্তুত আত্মা ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আবার আত্মার সদৃশ কিছু নেই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এভাবেই আত্মাকে দেখে থাকেন।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈততত্ত্বকে স্বাগত জানানো হচ্ছে কেন? দুটি ভিন্ন বস্তু একসাথে থাকলে সেখানে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। যেমন ধরা যাক, মানুষ ও একটি সাপ একসাথে আছে। এরা সবসময়ই একে অপরকে সন্দেহ করে। তাই তারা কখনো শান্তি পায় না।

কিন্তু ধরা যাক, কোন বস্তু আর একটি বস্তুর উপর আরোপিত, দড়ির উপর সাপ যেমন আরোপিত। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে করে আমি ভয় পাই। কারণ অন্ধকারে, আমি সেখানে দড়িকে দড়ি বলে দেখতে পাই না সাপ হিসাবে দেখি। কিন্তু আলো এলে বুঝতে পারি আরে, এটা তো সাপ নয়, এ যে দড়ি!

একইভাবে এই জগৎও আত্মার উপর আরোপিত। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সত্য নয়, আত্মার উপর আরোপিত বলে জগৎকে সত্য বলে মনে হয়। আত্মজ্ঞান লাভ হলে বোঝা যায় যে, জগতের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। তখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারি। তখন এই জগৎ আর এর বৈচিত্র আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এমনকি মানুষ ও সাপের মধ্যে যে ভেদ তাও ঘুচে যায়। সবকিছু তখন একে লীন হয়ে যায়।

দুই বোধই হল আমাদের সব দুঃখ-কষ্টের মূল। তাই অদ্বৈততত্ত্বই কাম্য।

বীতরাগভয়ক্রোধৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।

নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ॥৩৫

অন্বয়: বীতরাগভয়ক্রোধৈঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত); বেদপারগৈঃ (বেদে পারদর্শী); মুনিভিঃ (চিন্তাশীল ঋষিদের দ্বারা); অয়ম্ (এই আত্মা); হি (নিশ্চিতভাবে); নির্বিকল্পঃ (কোনও পরিবর্তন নেই); প্রপঞ্চোপশমঃ (দ্বৈতভাবের লেশমাত্র নেই); অদ্বয়ঃ (অদ্বৈত); দৃষ্টঃ (প্রত্যক্ষ হয়)।

সরলার্থ: বেদে পারদর্শী ঋষিরা হলেন (ইন্দ্রিয়-ভোগসুখের প্রতি) নিরাসক্ত এবং ভয় ও রাগ থেকে মুক্ত। তাঁরা বলেন আত্মা অপরিবর্তনীয়। দ্বিতত্ত্বের বোধ তাঁদের নেই। এবং তাঁরা নিজেদেরকে এক ও অভিন্ন সত্তারূপে মনে করেন।

ব্যাখ্যা: এখানে বেদান্তদর্শনের প্রশংসা করা হয়েছে। কে এই দর্শনকে বুঝতে পারেন? এমন মানুষ যিনি নিজেকে পুরোপুরি বশে আনতে পেরেছেন। তাঁর কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই, অনাসক্তিও নেই। তিনি সমস্ত রিপু—যেমন ক্রোধ, ঘৃণা, ভয় এর থেকে মুক্ত। তিনি চিন্তাশীল এবং শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য। তাঁর আগ্রহ একটিমাত্র বস্তুকে কেন্দ্র করে, তা হল আত্মজ্ঞান লাভ করা। উচ্চকোটির মানুষ অর্থাৎ যাঁরা প্রকৃত সন্ন্যাসী কেবলমাত্র তাঁরাই এই আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ॥৩৬

অন্বয়: তস্মাৎ (সুতরাং); এবম্ (যেমন উল্লেখ করা হয়েছে); এনম্ (এই আত্মাকে); বিদিত্বা (উপলব্ধি করে); অদ্বৈতে (অদ্বৈতে); স্মৃতিম্ (মন); যোজয়েৎ (স্থির করতে হবে); অদ্বৈতম্ (অদ্বৈততত্ত্ব); সমনুপ্রাপ্য (প্রথমে শাস্ত্র পাঠ করে এবং পরে তা উপলব্ধি করে); জড়বৎ (জড়বুদ্ধির মতো); লোকম্ (লোকদের মাঝে); আচরেৎ (আচরণ কর)।

সরলার্থ: অদ্বৈতজ্ঞান ভালোভাবে আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন। আমাদের যা করণীয় তা আগেই বলা হয়েছে। তা হল: এই তত্ত্বের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। তারপর মনকে সেই ধারণায় সবসময় যুক্ত রাখতে হবে। শাস্ত্রে অদ্বৈততত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাধককে এই তত্ত্বের সারকথা উপলব্ধি করতে হবে। সাধক সবসময় অদ্বৈততত্ত্বের মনন ও ধ্যানে যুক্ত থেকে পরিণামে আত্মাকে উপলব্ধি করবেন। সাধক কাউকে বুঝতে দেবেন না যে, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। বরং তিনি জড়বুদ্ধির মতো আচরণ করবেন।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্র বলেন, যখন কারও একত্বের বোধ হয় অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে সেই এক আত্মাকে দেখেন তখন এ জগতের সবকিছুকেই তিনি ভালো বলে মনে করেন। তাঁর কাছে জীবনটা বড় আনন্দের হয়ে ওঠে। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হল তিনি অভয়পদ লাভ করেন। সাধক তখন মনে করেন তিনিই পরমব্রহ্ম, এ জগতের সবকিছুর উৎসও তিনি। কোন কিছুর দ্বারাই তিনি আর প্রভাবিত হন না। সর্বত্র এবং সবকিছুর মধ্যে তখন 'তিনি'ই বিরাজ করেন। এই নিখিল জগতের সাথে তিনি তখন এক হয়ে যান।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁর জ্ঞানের প্রচার করেন না। তাঁর আচরণ দেখে মনে হয় তিনি কিছুই জানেন না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যেন বিনয়ের প্রতিমূর্তি।

নিস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ॥৩৭

অন্বয়: যতিঃ (ঋষি); নিস্তুতিঃ (কাউকে তোষামোদ করেন না); নির্নমস্কারঃ (কারও কাছে নত হন না); নিঃস্বধাকারঃ (পিতৃপুরুষদের সম্মানে তর্পণ প্রভৃতি প্রচলিত অনুষ্ঠান করেন না); চলাচলনিকেতশ্চ (বিনাশী দেহ এবং অবিনাশী আত্মাকে বয়ে নিয়ে যান); যাদৃচ্ছিকঃ ভবেৎ (যা পান তাতেই তিনি খুশি)।

সরলার্থ: যখন কোন ব্যক্তি জানেন তিনি আত্মা ছাড়া আর কিছু নন, তখন তিনি কাউকে তোষামোদ করেন না। এমনকি সাধারণ শিষ্টাচার দেখাবারও প্রয়োজন মনে করেন না। পিতৃপুরুষের সম্মানে তর্পণাদি অনুষ্ঠানও তিনি করেন না। তিনি জানেন যে, এ দেহের নাশ হবেই কিন্তু আত্মা অবিনাশী। এই জ্ঞানে অবিচল থেকে সন্তোষের সাথেই তিনি জীবন কাটান।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ (যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন) কিরকম আচরণ করেন? প্রথমত এবং প্রধানত এমন মানুষ অবশ্যই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি এ জগৎকে ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবন পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের জীবন। তিনি সংসারে আছেন বটে কিন্তু তিনি সংসারী নন। তখন তাঁর বোধে বোধ হয়———তিনিই স্বয়ং পরমাত্মা। আর এই বোধ তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাঁকে দেখলে মনে হয়, তিনি হয় উন্মাদ, নাহয় শিশু। তাঁর দেহ আছে, কিন্তু দেহবোধ নেই। আকস্মিকভাবে যা পান, তাই তিনি খান। কারও প্রতি তাঁর কোনও কর্তব্য নেই। আবার নিজে কোনও নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্ভুক্ত, এমন কথাও তিনি মনে করেন না। সাধারণ নিয়ম তাঁর বেলাতে খাটে না। তিনি নিজের নিয়মে

নিজে চলেন। তিনি স্বাধীন। কারও কাছ থেকে তিনি কিছু পাবার আশা করেন না। আবার অন্যকে তোষামোদও তিনি করেন না।

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥৩৮

অন্বয়: আধ্যাত্মিকম্ (দেহ সংক্রান্ত [জীবাত্মা]); তত্ত্বম্ (আত্মা [ব্রহ্ম]); দৃষ্ট্বা (উপলব্ধি করে); তু (এবং); বাহ্যতঃ (দেহের বাইরে); তত্ত্বম্ (আত্মা [ব্রহ্ম]); দৃষ্ট্বা (দেখে); তত্ত্বীভূতঃ (ব্রহ্মে পরিণত হন); তদারামঃ (ব্রহ্মে [আত্মায়] নিষ্ঠ); তত্ত্বাৎ (নিজের স্বরূপজ্ঞান থেকে); অপ্রচ্যুতঃ ভবেৎ (কখনো বিচ্যুত হন না)।

সরলার্থ: আত্মা (ব্রহ্ম) দেহ এবং সেই সংক্রান্ত সবকিছুর আশ্রয়—একথা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপলব্ধি করেন। তাঁরা আরও উপলব্ধি করেন এই জগৎ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। একথা জেনে তাঁরা আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হন। আত্মাকে ধ্যান করতে শুরু করেন এবং কালে তাঁর সাথে এক হয়ে যান। এইভাবে আত্মায় পরিণত হয়ে তিনি আর এই অবস্থা থেকে বিচ্যুত হন না।

ব্যাখ্যা: এই জগৎ এবং মানুষের দেহ দুই-ই মিথ্যা। সাপ যেমন রজ্জুর উপর আরোপিত ঠিক তেমনি এ জগৎও আত্মার উপর ন্যস্ত। আত্মাই একমাত্র সত্য।

এই আত্মা কিরকম? আত্মা আকাশের মতো। আত্মা সর্বত্র রয়েছেন। এবং তিনিই সবকিছু হয়েছেন। আত্মার আদি নেই, অন্তও নেই। আত্মা নির্গুণ ও নিরাকার। কোনও বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। তিনি সর্বব্যাপী। এ জগতে আত্মাই একমাত্র সত্য। এবং সাধকই সেই সত্য। তাঁর আত্মাই সকলের অন্তরস্থ আত্মা।

আত্মজ্ঞান লাভ করলে সাধক সবসময় আত্মচিন্তাতেই ডুবে থাকেন। অন্য কোনও চিন্তা তাঁর ভালো লাগে না। তিনি যেন আত্মাতে নোঙর ফেলেছেন। তাই তিনি অচল, অটল।

অদ্বৈত প্রকরণ

উপাসনাশ্রিতো ধর্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ॥১

অন্বয়: উপাসনাশ্রিতঃ (প্রার্থনায় যাঁর নিষ্ঠা); ধর্মঃ (জীবাত্মা); জাতে (জীব ও জগৎ রূপে প্রতিভাত); ব্রহ্মণি বর্ততে (ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত); উৎপত্তেঃ প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্বে); সর্বং অজম্ (অনাদি এবং অনন্ত ব্রহ্ম); তেন (এরূপ চিন্তার দ্বারা); অসৌ (যে ব্যক্তি এভাবে প্রার্থনা করেন); কৃপণঃ (নির্বোধ); স্মৃতঃ (মনে করা হয়)।

সরলার্থ: ধরা যাক, কোন এক ব্যক্তি তাঁর অধিকাংশ সময় প্রার্থনা করে কাটান। তিনি মনে করেন তিনি ও এই দৃশ্যমান জগৎ পূর্বে ব্রহ্মা ছিলেন। কোন কারণে সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন; পূর্ব অবস্থা ফিরে পেতে হলে তাঁকে ব্রহ্মের (সগুণ ব্রহ্মের) উপাসনা করতে হবে। এহেন ব্যক্তি শুধুমাত্র অজ্ঞানই নন, নির্বোধও বটে। 'আমি স্বরূপত ব্রহ্ম'—এই উপলব্ধি যাঁর একবার হয়েছে তাঁর আর কখনো ভুল হয় না। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সবসময় সচেতন থাকেন। তিনি জানেন একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া এই জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই।

ব্যাখ্যা: আগম প্রকরণে 'ওম্'-এর তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে আত্মা এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে আলাদা। আত্মা এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি মঙ্গলময় (শিব)। যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তাঁর কাছে আর দুই বলে কিছু নেই, সব এক।

কিন্তু এ একটা কথামাত্র। এটাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বৈতথ্য প্রকরণে জগৎকে স্বপ্ন বা মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ জগৎ যেন আকাশকুসুম কল্পনা। এর উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। এ জগৎ কার্য-কারণের অধীন এবং বৈচিত্রপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন হল: অদ্বৈততত্ত্ব কি কেবলমাত্র শাস্ত্র -প্রমাণের উপর নির্ভরশীল? যুক্তির দ্বারা কি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না? বর্তমান প্রকরণে যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈততত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী প্রকরণে দেখানো হয়েছে একমাত্র আত্মাই সত্য। উপাস্য-উপাসকের ধারণাটাই ভুল। দুই বলে কিছু নেই, সব এক। বর্তমান প্রকরণে উপাসকের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই উপাসক মনে করেন যে একসময় তিনি ব্রহ্ম ছিলেন এবং তাঁকে আবার

ব্রহ্ম হতে হবে। আর দেবতাদের উপাসনা করে তিনি আবার ব্রহ্ম হতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম হওয়া যায় একথা যিনি বিশ্বাস করেন, জ্ঞানীরা তাকে নির্বোধ ও অজ্ঞান বলে মনে করেন। কেনোপনিষদে আছে: ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন—তাঁকে 'এই' ভাবে উপাসনা করা যায় না।

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতি সমতাং গতম্।
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ॥২

অন্বয়: অতঃ (সুতরাং); অকার্পণ্যম্ (ব্রহ্মের স্বরূপ); অজাতি (যার জন্ম নেই); সমতাং গতম্ (সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান); যথা (স্বরূপত); বক্ষ্যামি (ব্যাখ্যা করব); সমন্ততঃ (সব দিক থেকে); জায়মানম্ (জন্মগ্রহণ করছে); কিঞ্চিৎ (যে কোনও বস্তু); ন জায়তে (জন্মায় না)।
সরলার্থ: যেহেতু উপাসক নির্বোধ, তাই আমি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করব। এই ব্রহ্ম সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। এঁর জন্ম নেই। যখন দেখবে কোন কিছুর জন্ম হচ্ছে নিশ্চিত জেনো ভুল দেখছ—যেমন আমরা দড়িকে সাপ বলে ভুল করি এও তেমনি।
ব্যাখ্যা: উপাসক অজ্ঞান তাই নিজেকে তিনি হীন বলে ভাবেন। উপাসক জানেন না যে তিনি আত্মা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, নির্গুণ এবং সর্বব্যাপী। তিনি মনে করেন তাঁর জন্ম হয়েছে এবং এখন তিনি এই জগতের অন্তর্গত। এই জগৎ এক বৈ দুই নয়। কিন্তু নাম-রূপের জন্য বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এই বহু দেখাটা ভুল—কেবল, আত্মাতে নাম-রূপ আরোপ করা হয়েছে মাত্র। এই নাম-রূপ মুছে ফেললে সব 'এক' দেখা যায়। এই 'এক'-ই আত্মা, এই 'এক'-ই ব্রহ্ম। ইনিই একমাত্র সত্য—ইনি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত এবং নাম-রূপহীন। ইনি সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ। ইনি বিশুদ্ধ চৈতন্য—কোন কিছুর দ্বারা ইনি প্রভাবিত হন না। এঁর জন্ম হয়নি, কোনদিন মৃত্যুও হবে না। এই আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। এই আত্মাতেই আমরা স্বরূপত এক।

উপাসক নিজেকে আত্মা থেকে পৃথক বলে মনে করেন। তাই তিনি ক্ষুদ্র। তিনি অজ্ঞান কারণ তিনি জানেন না যে তিনি নিজেরই উপাসনা করছেন। তাঁর স্বরূপজ্ঞান যতদিন না হবে, ততদিন তিনি অসুখী থাকবেন।

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সংঘাতৈর্জাতাবেতন্নিদর্শনম্॥৩

অন্বয়: আকাশবৎ (আকাশের মতো); আত্মা (পরমাত্মা); হি ঘটাকাশৈঃ ইব (ঘটের মধ্যে সীমাবদ্ধ আকাশের মতো); জীবৈঃ (হৃদয়স্থ জীবাত্মার দ্বারা); উদিতঃ (প্রকাশিত [জীবরূপে]); ঘটাদিবৎ (ঘটের মতো); সংঘাতৈঃ (দেহের মতো); জাতৌ (জাত হয়েছে); এতৎ নিদর্শনম্ (এটি একটি উদাহরণ)।

সরলার্থ: পরমাত্মা (অনন্ত) আকাশের মতো। জীবাত্মা যেন ঘটের মধ্যে সীমাবদ্ধ আকাশ। জীবের দেহ ও জীবাত্মাকে নানাভাবে এই ঘটাকাশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবাত্মা কিভাবে এল তা বোঝাবার জন্য এই উদাহরণটি দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা: পরমাত্মা আকাশের মতো সর্বব্যাপী, সূক্ষ্ম এবং তার কোন রূপ নেই। জীবাত্মা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরমাত্মা যখন জীবের ক্ষুদ্র দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ তখন তাকে বলি জীবাত্মা। অনন্ত আকাশকে ঘটের মধ্যে যেমন দেখায়, এও ঠিক তেমনি। ঘটের ভিতরেও যে-ই আকাশ, বাইরেও সেই একই আকাশ। তেমনি জীবাত্মা আর পরমাত্মা একই। দেহ ধারণ করলেও তাতে পরমাত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না—রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে যেমন দড়ির উপর সাপকে আরোপ করা হয়, তেমনিভাবে দেহ পরমাত্মার উপর আরোপিত হয় মাত্র।

যদি মনে করি পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার উৎপত্তি তাহলে ভুল করব। দেহ পরমাত্মার উপর আরোপিত হওয়াতেই আমাদের এই ভুল হয়।

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সংপ্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীবা ইহাত্মনি।।৪

অন্বয়: ঘটাদিষু প্রলীনেষু (যখন এই আরোপিত গুণ অর্থাৎ দেহের নাশ হয়); যথা ঘটাকাশাদয়ঃ (ঠিক যেমন ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ); আকাশে (অনন্ত আকাশে [মিশে যায়]); তদ্বৎ (একইভাবে); জীবাঃ (জীবাত্মাসকল); সম্প্রলীয়ন্তে (লীন হয়ে যায়); ইহ আত্মনি (পরমাত্মার মধ্যে)।

সরলার্থ: ঘট যখন ভেঙে যায় তখন ঘটের ভিতরের আকাশ বাইরের আকাশে মিশে যায়। সেইভাবে যে দেহের সঙ্গে জীবাত্মা যুক্ত সেই দেহের যখন নাশ হয় তখন জীবাত্মা (চৈতন্য) পরমাত্মাতে (চৈতন্যে) লয় হয়।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মার দেহ পরমাত্মার উপর আরোপিত। ঘটের ভিতরের আকাশকে বাইরের আকাশ থেকে যেমন পৃথক বলে মনে হয়, তেমনি জীবের দেহ যেন জীবাত্মাকে পরমাত্মার থেকে আলাদা করে রেখেছে। ঘটটা ভেঙে গেলেই ভিতরের আকাশ ও বাইরের আকাশ

একাকার হয়ে যায়। জীবাত্মা যখন জানতে পারে এই দেহ একটা উপাধিমাত্র, সে আসলে পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্বে সংপ্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥৫

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); একস্মিন্ ঘটাকাশে (কোন একটি ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশে); রজোধূমাদিভিঃ যুতে (ধোঁয়া, ধুলো ইত্যাদি দ্বারা কলুষিত হতে পারে); সর্বে ন সংপ্রযুজ্যন্তে (কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য ঘটস্থ আকাশও ঐভাবে মলিন হয়ে গেছে); তদ্বৎ জীবাঃ সুখাদিভিঃ (সেইভাবে [যদি একটি জীবাত্মা দুঃখ ভোগ করে] অন্যান্য জীবাত্মাও কোনভাবেই প্রভাবিত হয় না [অর্থাৎ একের সুখ-দুঃখ অন্যদের স্পর্শ করে না])।
সরলার্থ: একটি ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ ধোঁয়া বা ধুলোর দ্বারা মলিন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা অন্যান্য ঘটের মধ্যে যে আকাশ তা কলুষিত হয় না। একইভাবে একটি জীবাত্মা যখন সুখ-দুঃখ ভোগ করে তখন তা অন্যান্য জীবাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।
ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটি দ্বৈতবাদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। দ্বৈতবাদীরা এই যুক্তি দেখাতে পারেন—'যেহেতু আত্মা এক এবং অভিন্ন সেহেতু একটি দেহের যন্ত্রণা অন্যান্য দেহেও অনুভূত হওয়ার কথা।' এরই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে এই শ্লোকটিতে—এর দ্বারা বৈশেষিক ও সাংখ্যের যুক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে।

বেদান্তমতে আত্মা দেহহীন, সুতরাং তিনি সুখ-দুঃখের পার। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। আত্মা আছে বলেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। কিন্তু তার দ্বারা আত্মা প্রভাবিত হন না। সূর্য ভালো বা মন্দ উভয়কেই সমানভাবে আলো দান করে কিন্তু এই ভালো বা মন্দের দ্বারা সূর্য নিজে কখনো প্রভাবিত হয় না।

রূপকার্যসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ॥৬

অন্বয়: তত্র তত্র (যখনি [আকাশে বিভিন্ন গুণ আরোপিত হয়]); রূপ-কার্য সমাখ্যাঃ চ (রূপ, কার্যকারিতা এবং নাম); ভিদ্যন্তে বৈ (নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়); আকাশস্য ভেদঃ ন অস্তি (আকাশ কিন্তু খণ্ডিত হয় না); তদ্বৎ জীবেষু নির্ণয়ঃ (জীবাত্মার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য)।

সরলার্থ: যখন আকাশ কোন পাত্র বা স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সেই স্থান বা পাত্রের আকার অনুযায়ী আকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেখে মনে হয় নাম, রূপ, কার্য বা অন্যান্য গুণের দ্বারা আকাশকে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বস্তুত আকাশকে কখনো খণ্ডিত করা যায় না। এইকথা জীবাত্মার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা: আত্মা এক এবং অভিন্ন। সুতরাং এই এক আত্মা কিভাবে 'আমি' 'তুমি' 'তারা' ইত্যাদির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে? ব্যবহারিক জীবনে আমরা সবসময়ই এই ভেদ দেখতে পাই। তার অর্থ কি এই যে আত্মাকে ভাগ করা যায়? নিঃসন্দেহে এর উত্তর হবে—না। পটাকাশ ও ঘটাকাশের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এই ভেদ কল্পিত। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই কল্পিত বিভাগকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। আকাশ সর্বব্যাপী, এক এবং অভিন্ন। কিন্তু ঘটের মধ্যে থাকলে তাকে আমরা বলি 'ঘটাকাশ', ঘরের মধ্যে থাকলে বলি 'ঘরের মধ্যস্থিত আকাশ'। এইভাবে স্থান, ব্যবহার ও অন্যান্য গুণ অনুযায়ী আমরা আকাশকে কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত করি। তার অর্থ এই নয় যে আকাশকে সত্যিই ভাগ করা যায়। না, তা কখনই নয়। উপাধিযুক্ত হলে মনে হয় যেন আকাশকে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ধর একটি পুকুরের মাঝ বরাবর তুমি একটি দড়ি ফেলে দিয়েছ। দেখে মনে হবে জলটাকে যেন দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু জলটা কি সত্যিই ভাগ হয়েছে? না। দড়িটা সরিয়ে দিলেই সেই এক জল।

এক আত্মা যে বহু রূপে প্রতিভাত হতে পারে উপরোক্ত দৃষ্টান্তে সেটি দেখানো হয়েছে। আত্মা এক, কিন্তু নাম-রূপের জন্য তাকে বহু দেখায়।

এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি উদাহরণ দিতেন : ধর একটি বালকের অনেকগুলি মুখোশ আছে। খেলার সাথীদের সঙ্গে মজা করার জন্য সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুখোশ ব্যবহার করে—কখনো বাঘের মুখোশ, কখনো বাঁদরের আবার কখনো বা কুকুরের। সেই একই বালক—কিন্তু নানারকমের মুখোশ পরে তাকে এক এক সময়ে এক এক রকম দেখায়। মুখোশগুলি সত্য নয়, আরোপিত।

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥৭

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); ঘটাকাশঃ (ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ); আকাশস্য বিকারাবয়বৌ ন (আকাশের বিকার বা অংশ নয় [ঘটাকাশও অখণ্ড আকাশ মাত্র]); তথা (একইভাবে); জীবঃ

(দেহযুক্ত আত্মা [দেহ আত্মাতে আরোপিত]); সদা (সবসময়); আত্মনঃ (স্বয়ং পরমাত্মার); বিকারাবয়বৌ ন এব (বিকার বা অংশ নয়)।

সরলার্থ: ঘটাকাশ অনন্ত আকাশের অংশ বা বিকার নয়। বস্তুত ঘটাকাশ অখণ্ড আকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে, জীবাত্মা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ নয়, আবার বিকারও নয়।

ব্যাখ্যা: জল যখন বুদ্বুদের আকার ধারণ করে তখনি জলে বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়—যেমন সোনাকে খোদাই করে অলংকার তৈরি করা হয়। কিন্তু ঘটাকাশকে কোনভাবেই বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অনন্ত আকাশ ঘটের আকার প্রাপ্ত হয়েছে একথা বলা যাবে না। আবার শাখা-প্রশাখা যেরকম গাছের অংশ, সেইভাবে ঘটাকাশকে আকাশের অংশও বলা যায় না।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কও সেইরকম। (জলবুদ্বুদ বা স্বর্ণালঙ্কারের মতো) জীবাত্মা পরমাত্মার বিকার নয়। আবার (গাছের শাখা যেমন গাছের অংশ) জীবাত্মা (সেইভাবে) পরমাত্মার অংশও নয়।

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ॥৮

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); বালানাম্ (শিশুদের কাছে); গগনম্ (আকাশ); মলৈঃ (ধোঁয়া, ধুলো ইত্যাদির দ্বারা); মলিনম্ (মলিন); ভবতি (হয়); তথা (সেইভাবে); অবুদ্ধানাম্ (অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে); আত্মা অপি (আত্মাও); মলৈঃ (লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি মলিনতার দ্বারা); মলিনঃ (কলুষিত); ভবতি (হয়)।

সরলার্থ: শিশুরা মনে করে আকাশ ধোঁয়া ধুলো ইত্যাদি দ্বারা আবৃত। সেইরকম অজ্ঞান ব্যক্তিদের কাছেও আত্মা (লোভ, ক্রোধ ইত্যাদির দ্বারা) কলুষিত বলে প্রতিভাত হন। (প্রকৃতপক্ষে আকাশ এবং আত্মা দুই-ই শুদ্ধ ও নির্মল।)

ব্যাখ্যা: আকাশের নিজস্ব কোন রং নেই। কিন্তু আমরা কখনো কখনো আকাশকে কালো, বাদামী বা ধূসর বর্ণের দেখি। আকাশে ধোঁয়া ধুলো বাষ্প বা অন্যান্য পদার্থ জমেই এরকম দেখায়। শিশুরা না বুঝে মনে করে আকাশই বুঝি কালো, বাদামী বা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে।

সেইরকম আত্মা স্বরূপত শুদ্ধ, অমলিন ও নির্গুণ। কিন্তু মানুষ মনে করে ক্রোধ, লোভ, হিংসা এগুলি আত্মাতেই রয়েছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা এগুলিকে আত্মার গুণ বলেই মনে করে।

কিন্তু তা সত্য নয়। এগুলি উপাধিমাত্র। এগুলি যেন আবরণ যা মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে রাখে।

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োরপি।
স্থিতৌ সর্বশরীরেষু আকাশেনাবিলক্ষণঃ॥৯

অন্বয়: মরণে (মৃত্যুকালে); সম্ভবে চ (যখন তোমার জন্ম হয় তখনও); গত্যাগমনয়োঃ (ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যাতায়াত); অপি সর্বশরীরেষু স্থিতৌ (যে কোন দেহেই থাক না কেন); আকাশেন (আত্মা ও আকাশের [ঘটাকাশ] মধ্যে); অবিলক্ষণঃ (কোনও পার্থক্য নেই)।

সরলার্থ: মৃত্যু, জন্ম, লোক থেকে লোকান্তরে যাতায়াত এবং বিভিন্ন দেহধারণ—এই সব বিষয়ে আত্মা ও ঘটাকাশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই (তাদের পার্থক্য শুধু উপাধিগত)।

ব্যাখ্যা: হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করে কর্মফলের দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। যতদিন পর্যন্ত তার কর্মফল নিঃশেষিত না হয় এবং সে নিজের চেষ্টায় এবং গুরুকৃপায় নিজের স্বরূপ উপলব্ধি না করে, ততদিন তাকে বারবার জন্ম নিতে হয়। ততদিন সে যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, তার অবস্থা ওই ঘটাকাশের মতো। ঘটের ভিতরে ও বাইরে একই আকাশ। ঘট দুয়ের মাঝে একটা কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করে মাত্র। একইভাবে, আমাদের এই দেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মাঝে একটা কল্পিত ভেদ সৃষ্টি করে।

সংঘাতাঃ স্বপ্নবৎসর্বে আত্মমায়াবিসর্জিতাঃ।
আধিক্যে সর্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে॥১০

অন্বয়: সর্বে সংঘাতাঃ (দেহ এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ); স্বপ্নবৎ (যেন স্বপ্নে দেখা অবাস্তব এক জিনিস); আত্ম-মায়া-বিসর্জিতাঃ (আত্মার অবিদ্যার দ্বারা উৎপন্ন); হি (অতএব); আধিক্যে (পশুদের তুলনায় উৎকৃষ্ট); সর্বসাম্যে বা (অথবা সকলের সমান অবস্থা); ন উপপত্তিঃ বিদ্যতে (ঠিক মানায় না)।

সরলার্থ: দেহমাত্রই অবিদ্যার ফসল। দেহগুলি কাল্পনিক, সত্য নয়। এইসব দেহ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যাই হোক না কেন, এগুলি সবই গৌণ।

ব্যাখ্যা: সব দেহই স্বপ্নবৎ কাল্পনিক, সত্য নয়। এর মধ্যে কিছু দেহ হতে পারে উচ্চতর লোকের—যেমন দেবদেবীর শরীর; আবার কিছু হয়তো ইতর প্রাণীর—যেমন পশুপাখীর

দেহ; আবার কিছু শরীর এ দুয়ের মাঝে—যেমন মানুষের শরীর। কিন্তু এই সব দেহই অবিদ্যার ফল। এগুলি গৌণ। এই দেহের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধন হয়, একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

রসাদয়ো হি যে কোশা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সংপ্রকাশিতঃ॥১১

অন্বয়: তৈত্তিরীয়কে (তৈত্তিরীয় উপনিষদে); রসাদয়ঃ (খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুর সার); যে হি কোশাঃ (কোষগুলি); ব্যাখ্যাতাঃ (স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে); খং যথা (আকাশের মতো); পরঃ (পরমাত্মা); তেষাম্ (ঐ কোষের); আত্মা (আত্মা); জীবঃ (জীবাত্মা); সংপ্রকাশিতঃ (বর্ণনা করা হয়েছে)।

সরলার্থ: তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেহের বিভিন্ন সার পদার্থগুলিকে কোষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মা, যিনি আকাশের মতো, এইসব কোষগুলি দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তখন তাঁকে আমরা বলি জীবাত্মা।

ব্যাখ্যা: এখানে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মা সর্বব্যাপী আকাশের মতো, আর জীবাত্মা যেন ঘটাকাশ। ঘটের ভিতরে ও বাইরে যেমন একই আকাশ আছে, আত্মাও তেমনি এক।

পরমাত্মা দেহ ধারণ করলে তাঁকে বলি জীবাত্মা বা জীব। দেহটা সত্য নয়, উপাধিমাত্র। দেহের মধ্যে পাঁচটি কোষ আছে—প্রতিটি কোষই খাদ্যরসের দ্বারা পুষ্ট। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম যথাক্রমে এই পাঁচটি কোষ হল—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই কোষগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সব কোষেই পরমাত্মা বিদ্যমান। ঘটের দ্বারা যেমন আকাশ খণ্ডিত হয় না তেমনি পরমাত্মাও এই কোষগুলির দ্বারা বিভক্ত হয়ে যান না।

দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাঽঽকাশঃ প্রকাশিতঃ॥১২

অন্বয়: যথা (যেমন); পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে, এই বাহ্যজগতে); উদরে চ ([মানুষের] উদরের ভিতরেও); আকাশঃ (আকাশ); প্রকাশিতঃ (প্রকাশিত); মধুজ্ঞানে ([বৃহদারণ্যক উপনিষদের

অন্তর্গত] মধু ব্রাহ্মণে); দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ (সব যুগল বস্তুতে [যেমন ভিতরে ও বাইরে] ব্রহ্ম প্রকাশিত)।

সরলার্থ: একই আকাশ মানুষের দেহের অভ্যন্তরেও আছে, আবার পৃথিবীর অভ্যন্তরেও আছে। সেইরকম ব্রহ্মও সর্বত্র এবং সকল যুগল বস্তুর ভিতরে ও বাইরে আছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা: আকাশের মতো পরমাত্মাও সবকিছুর ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র বিদ্যমান—মানুষের দেহের অভ্যন্তরেও যেমন আবার বাইরের জগতেও তেমনি। দুই বোধ মুছে গেলে তখন সর্বত্র এক দেখা যায়। তখন ছোট-বড়, ভিতর-বাহির, ব্যষ্টি-সমষ্টি—সব যুগল বস্তুতে সেই একই আত্মা।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণ অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ‘মধু’ শব্দটির অর্থ—‘আনন্দ’। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে ‘মধু’। কারণ এই একত্বের উপলব্ধি হলে মানুষ পরমানন্দ অনুভব করে।

জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্॥১৩

অন্বয়: [যৎ (যেহেতু)]; জীবাত্মনঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা); অনন্যত্বম্ (একত্ব); অভেদেন (অভিন্নভাবে); প্রশস্যতে (প্রশংসিত হয়); যৎ চ নানাত্বং নিন্দ্যতে (যেহেতু দ্বৈতবাদ শাস্ত্রে নিন্দিত); তৎ এবম্ (সেহেতু এই [একত্ব]); সমঞ্জসম্ (যুক্তিযুক্ত)।

সরলার্থ: যেহেতু শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতার প্রশংসা এবং দ্বৈতবাদের নিন্দা করা হয়েছে সেহেতু এই একত্ব যুক্তিযুক্ত।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হয়ে যান। এর অর্থ এই যে মানুষ চিরকালই ব্রহ্ম, কিন্তু একথা সে জানে না। চোখের উপর থেকে অজ্ঞানতার আবরণ সরে গেলেই মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে।

শাস্ত্র আরও বলে আত্মাই জগৎরূপে প্রকাশিত—দুই নেই, সব এক। দুই দেখাটা ভুল। দুই দেখলে মানুষ কখনো নিরাপদ বোধ করতে পারে না। ভয় তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। তার বারবার পুনর্জন্ম হতে পারে। অজ্ঞানতার জন্যই মানুষকে এই মূল্য দিতে হয়।

যাঁরা দ্বৈতবাদী তাঁরা অহেতুক বিষয়টাকে জটিল করে তোলেন। একত্বের ধারণা যুক্তিসিদ্ধ। এ শুধু মানুষকে শান্তি ও আনন্দই দান করে না, এই ধারণা শাস্ত্র-অনুমোদিতও বটে।

জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎপ্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্তিতম্।
ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে॥১৪

অন্বয়: উৎপত্তেঃ প্রাক্ ([উপনিষদ থেকে] আত্মজ্ঞান লাভের পূর্বে); জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বম্ (জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য); যৎ (যা); প্রকীর্তিতম্ ([বেদের কর্মকাণ্ডে] বলা হয়েছে); তৎ (সেই পার্থক্য); ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা (ভবিষ্যতে যে অবস্থা হবে সেই অনুসারে); গৌণম্ (সেহেতু মুখ্য নয়); হি (কারণ); মুখ্যত্বম্ (যা কিছু সত্য); ন যুজ্যতে ([তা] এখানে প্রযোজ্য নয়)।

সরলার্থ: উপনিষদ থেকে আত্মজ্ঞান লাভের আগে—বেদের কর্মকাণ্ডে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ দ্বৈত মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দ্বৈত ক্ষণিক অর্থাৎ যতক্ষণ অজ্ঞানতা আছে। এক ও অদ্বৈতেই এর পরিণতি। এই ভবিষ্যৎকালীন একত্বকে বোঝাবার জন্যেই ক্ষণিক পার্থক্য দেখানো হয়েছে। বস্তুত এই পার্থক্য যথার্থ নয়, কাল্পনিক।

ব্যাখ্যা: বেদে অনেক জায়গায় 'বহু'র উল্লেখ আছে। বেদের এই বিশেষ অংশটিকে বলে কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে ফল কামনা করে যাগযজ্ঞ করার কথা বলা আছে। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, 'এই ব্যক্তি এইটিই কামনা করেছে।' আবার এমনও আছে 'ঈশ্বর পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়কেই ধারণ করে আছেন।' অর্থাৎ স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি পৃথক। এই দ্বৈতবোধই কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য।

বেদের অপর অংশ জ্ঞানকাণ্ড—যার আলোচ্য বিষয় আত্মজ্ঞান। কর্মকাণ্ডের চেয়ে জ্ঞানকাণ্ড যে বেশি যুক্তিনির্ভর, একথা সর্বজনস্বীকৃত। কেন?

উত্তর হল, কর্মকাণ্ডে যে দ্বৈতবাদের কথা বলা হয় তা আদপে দ্বৈতবাদ নয়। পটাকাশ ও ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে যেমন আকাশকে দুই বলে মনে হয়, কর্মকাণ্ডে দুই জ্ঞানও ঠিক সেইরকম। আসলে একই আকাশ। ঘট আরোপ করাতেই দুই বলে মনে হয়।

একইভাবে কর্মকাণ্ডে যে বাক্যগুলিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে পৃথক বলে দেখানো হয়েছে, সেগুলি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই (ভেদবোধক) বাক্যগুলির দ্বারা সবসময় (জীবাত্মা ও পরমাত্মার) একত্বকেই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাই বোঝানো হয়েছে। যেমন আমরা বলি, 'আমি ভাত রান্না করছি।' আসলে আমি ভাত রান্না করছি না, চাল সিদ্ধ করছি। চাল সিদ্ধ হয়ে তবেই ভাত হবে। সুতরাং ভাত এখনও ভবিষ্যতের ঘটনা—একথা বলা যায়। আবার এমনও নয় যে আমি নতুন কিছু তৈরি করছি। ভাত চালেরই রূপান্তর মাত্র। সেইভাবে জীবাত্মা সবসময়ই পরমাত্মা—দেহরূপ উপাধির জন্য এই জীবাত্মাকে পরমাত্মার থেকে পৃথক বলে মনে হয়। এই উপাধি অবিদ্যাপ্রসূত। চাল আর ভাতে যেমন মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, তেমনি জীবাত্মা আর পরমাত্মাতেও কোন ভেদ নেই।

জ্ঞানকাণ্ডে এজাতীয় উল্লেখ পাওয়া যায়—'তুমিই সেই' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৮।৭) এবং 'যিনি বলেন "আমি এক আর সে আর এক" তিনি কিছুই জানেন না' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১০)। এইসব বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী উক্তির পাশে দ্বৈতবাদী মন্তব্যগুলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। যদি এগুলির কোন সার্থকতা থাকেও তা হল অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করার জন্য মনকে প্রস্তুত করা।

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥১৫

অন্বয়: মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ (মাটি, লোহা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অন্যান্য এই জাতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা); অন্যথা (নানা উপায়ে); যা সৃষ্টিঃ চোদিতা (সৃষ্টিকার্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে); সঃ (সেই [সৃষ্টি]); অবতারায় উপায়ঃ (মনকে প্রস্তুত করার জন্য [অদ্বৈতজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করার জন্য]); কথঞ্চন ভেদঃ ন অস্তি (কিছুমাত্র ভেদ নেই)।

সরলার্থ: যদিও শাস্ত্রে মাটি, লোহা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়ে নানাভাবে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা শুধু অদ্বৈততত্ত্বের জন্য মনকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। বস্তুত এর মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নেই, দুই নেই।

ব্যাখ্যা: সৃষ্টি এবং দ্বিতত্ত্বের অস্তিত্ব অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন না। দুই-ই অলীক। ঘটাকাশ ও পটাকাশ যেমন দুই নয়, এক ও অভিন্ন, সেইভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টা আলাদা নয়, এক।

তবু শাস্ত্রে সৃষ্টি ও দ্বিতত্ত্বের যে উল্লেখ আছে, তা শুধু এই দুটি তত্ত্বের অসারতা বোঝাবার জন্য—অদ্বৈতবাদীরা এরকমই বলে থাকেন। তাঁরা আরও বলেন যে দ্বৈতবাদ নানা বিতর্কের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা দেবাসুরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

দেবতাদের মন শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থপর, তাই তাঁদের জয় হয়েছিল। অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করার জন্য মনের কিরকম প্রস্তুতি দরকার তা বোঝাতেই এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য শাস্ত্রে সৃষ্টির কাহিনীও বর্ণনা করা আছে। মনকে অদ্বৈতজ্ঞানের উপযুক্ত করার জন্যেই এইসব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে সৃষ্টি এবং ভেদদর্শনকে মনের ভুল বলে নিন্দাও করা হয়েছে—ঠিক যেমনভাবে বলা হয় ঘটাকাশের কখনো উৎপত্তি হয়নি এবং এর কোন বাস্তব অস্তিত্বও নেই।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল একই শাস্ত্রে আবার বহু অদ্বৈতবোধক উক্তিও রয়েছে। যেমন 'তিনি এক এবং অদ্বিতীয়' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।২।২)। 'সে-ই সত্য, সে-ই আত্মা, এবং তুমিই সে।' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৮।৭)।

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥১৬

অন্বয়: আশ্রমাঃ হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট-দৃষ্টয়ঃ ত্রিবিধাঃ (ধারণা করার ক্ষমতা অনুযায়ী, স্ত্রী ও পুরুষদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট); অনুকম্পয়া ([শাস্ত্রাদি] করুণাবশত); তদর্থম্ (তাদের জন্য); ইয়ম্ (এই); উপাসনা (উপাসনা পদ্ধতি); উপদিষ্ট (নির্দেশ করেছেন)।

সরলার্থ: অধিকারী ভেদে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। শাস্ত্র করুণাবশত হীন ও মধ্যম অধিকারীদের জন্য নানা উপাসনা-পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু উত্তম অধিকারীর জন্য আলাদা কোন উপাসনার বিধান শাস্ত্রে নেই।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্রে প্রায়ই পরস্পরবিরোধী উক্তি দেখা যায়। কোথাও আছে 'অগ্নিহোত্র জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর', 'তাঁকে নিজ আত্মা জ্ঞানে উপাসনা কর' ইত্যাদি। এইসব উক্তি স্পষ্টতই দ্বৈতবাদী এবং এর দ্বারা আচার-অনুষ্ঠানকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আবার অন্যত্র শাস্ত্রে আছে যে আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় এবং মানুষের জীবনের লক্ষ্য সেই আত্মাকে উপলব্ধি করা। কিভাবে এই বিরোধের সমন্বয় সাধন করা যায়?

এর উত্তর খুব সহজ : আমরা সবাই এক ধাতুতে গড়া নই। বহু দিক থেকেই আমরা পরস্পর স্বতন্ত্র এবং শাস্ত্র এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করে। একই জিনিস সকলকেই গলাধঃকরণ করতে হবে—এ কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। শাস্ত্রের নীতি হল: যার পেটে যা সয়।

অনেক মানুষ আছেন যাঁরা জীবনকে উপভোগ করতে চান। শাস্ত্র বলে 'তাঁরা উপভোগ করুন। কিন্তু একথা যেন তাঁরা মনে রাখেন ভোগের ভিতর দিয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না। একমাত্র ত্যাগের মধ্য দিয়েই তাঁরা আনন্দ পেতে পারেন।' শাস্ত্রে একই গাছে দুটি পাখীর উপমা আছে। একটা পাখী একের পর এক ফল খেয়ে চলেছে—ফলটা মিষ্টি হলেই সে খুশি, আবার টক হলেই দুঃখী। সুতরাং পাখীটি কখনো সুখী, কখনো দুঃখী। অন্য পাখীটি কিন্তু অচল, অটল, স্থির। কিছু করছে না। সে সদাপ্রসন্ন।

এই পাখী দুটি পরস্পর পৃথক নয়, এক এবং অভিন্ন। প্রথম পাখীটি জীবাত্মার উপমা দ্বিতীয়টি পরমাত্মার। যখন আমরা উপলব্ধি করি আমরাই পরমাত্মা—তখন আমরা সুখী। কিন্তু সকলের জন্য তো আর ত্যাগের পথ নয়। শাস্ত্র তাদের জন্য ভোগের পথ অনুমোদন করে। কিন্তু তাঁরা যেন সব কাজ 'ঈশ্বরের পূজা' -জ্ঞানে করে—এই শাস্ত্রের নির্দেশ। তাদের জন্য 'কর্মই উপাসনা'।

শাস্ত্র সবকিছু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখে। শাস্ত্র জানে বিভিন্ন মানুষের রুচি ও ক্ষমতাও বিভিন্ন। তাই শাস্ত্র চায় না সকলে একই পথে চলুক। বিভিন্ন মানুষের জন্য শাস্ত্র বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়ে থাকে। কিছু মানুষ আছে যাঁরা অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করতে সক্ষম। শাস্ত্র তাদের কাছে অদ্বৈতবাদই প্রচার করে এবং তাদের সম্পূর্ণ ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। অন্যদের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ দ্বৈতবাদ এবং 'কর্মই উপাসনা' এই নীতি। এই দুই চরমপন্থীর মাঝে আরও নানা পথ রয়েছে। যার পক্ষে যা সর্বোত্তম—তাকে শাস্ত্র সেই পথই অবলম্বন করতে বলে। কিন্তু সে যেন না মনে করে তার পথই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ—শাস্ত্র এ-ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে॥১৭

অন্বয়: দ্বৈতিনঃ (দ্বৈতবাদীরা); স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দৃঢ়ং নিশ্চিতাঃ (নিজ প্রত্যয়ে দৃঢ়বুদ্ধি); পরস্পরং বিরুধ্যন্তে (নিজেদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ করে); তৈঃ (তাদের সঙ্গে); অয়ম্ (ইনি, অদ্বৈতবাদী); ন বিরুধ্যতে (কখনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন না)।

সরলার্থ: দ্বৈতবাদীরা আপন প্রত্যয়ে দৃঢ়বুদ্ধি, কিন্তু তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা কখনো তাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈতবাদী অভ্রান্ত, কারণ তাঁর সিদ্ধান্ত যুক্তি এবং শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কপিল কণাদ বুদ্ধ এবং জৈন প্রভৃতি দ্বৈতবাদীরা আপন আপন প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং মনে করেন

যে তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার হল তাঁরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। অদ্বৈতবাদী কিন্তু কারও সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। অদ্বৈততত্ত্ব সর্বগ্রাহী এবং সব মতবাদের সর্বোচ্চ পরিণতি। তিনি সকলকেই গ্রহণ করেন, কাউকে বর্জন করেন না। তাঁর মতে বিভিন্ন মতবাদ একই লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন ধাপ মাত্র। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা আত্মতুষ্ট এবং অহঙ্কারে অন্ধ।

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে॥১৮

অন্বয়: হি (যেহেতু); অদ্বৈতম্ (অদ্বৈত); পরমার্থঃ (পরম সত্য); দ্বৈতম্ (দ্বৈত); তদ্ভেদঃ (কার্যমাত্র [অদ্বৈতের উদ্দেশে এক পদক্ষেপ মাত্র]); উচ্যতে (একটি নাম মাত্র); তেষাম্ (দ্বৈতবাদীদের পক্ষে); উভয়থা (নিত্য এবং আপেক্ষিক উভয়ই); দ্বৈতম্ (দ্বিতত্ত্বই একমাত্র সত্য); তেন (অতএব); অয়ং ন বিরুধ্যতে (এটি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধতা করে না)।

সরলার্থ: যেহেতু অদ্বৈতই চূড়ান্ত তত্ত্ব, দ্বৈতের বহু দেখা কেবল অদ্বৈতেরই ভেদ, সুতরাং তার কার্যমাত্র। দ্বিতত্ত্বের অস্তিত্ব শুধুমাত্র নামে। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা মনে করেন যে দ্বিতত্ত্ব একযোগে নিত্যও বটে আবার আপেক্ষিকও বটে। দ্বিতত্ত্ব যেহেতু অদ্বৈততত্ত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই দ্বিতত্ত্ব কখনো অদ্বৈততত্ত্বকে খণ্ডন করতে পারে না।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে যে কোনও মৌলিক বিরোধ নেই—এই শ্লোকে তা পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। দ্বিতত্ত্বের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। এটি অদ্বৈতেরই আর এক নাম। দ্বিতত্ত্ব হল কার্য, অদ্বৈততত্ত্ব কারণ। কারণ ছাড়া কি কার্য হতে পারে? কারণই কার্যে পরিণত হয়ে থাকে। একই বহু হয়ে আছেন—এই বহুত্ব শুধু নামে আর রূপে। শাস্ত্রে একেই বলে মায়া—এক পরমাত্মার উপর বহু আরোপিত মাত্র।

'বহু' বলে যে কিছু নেই তা প্রমাণিত হয় সুষুপ্তিতে ও মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেলে। সেই অবস্থায় মানুষের কোন দুই বোধ থাকে না। দ্বৈত মনের রচনা এবং সুষুপ্তি অবস্থায় মন যেহেতু সক্রিয় থাকে না, তাই সুষুপ্তিকালে মানুষের দুই বোধও থাকে না।

দ্বৈতবাদীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়াকে অদ্বৈতবাদী আবশ্যক জ্ঞান করেন না। অদ্বৈতবাদী যেন হাতি চড়ে চলেছেন। নীচে মাটিতে দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তি যদি তাঁকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে বলেন তিনিও হাতি চড়ে চলেছেন তাহলে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের এই আহ্বানে কর্ণপাত করবেন কি? করবেন না। তিনি হেসে শান্তভাবে নিজের পথে চলে যাবেন।

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাঽজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ॥১৯

অন্বয়: এতৎ (এই); অজম্ (যার জন্ম নেই [এবং মৃত্যুও নেই অর্থাৎ ব্রহ্ম]); হি (নিশ্চিতভাবে); মায়য়া (মায়ার দ্বারা); ভিদ্যতে (বহু বলে প্রতিভাত); অন্যথা ন (অন্য কোন উপায়ে নয়); কথঞ্চন (কোন না কোন ভাবে); হি (কারণ); তত্ত্বতঃ (স্বরূপত); ভিদ্যমানে (যদি এটি পরিবর্তিত হয়); অমৃতম্ (অবিনাশী [ব্রহ্ম]); মর্ত্যতাম্ (মরণশীল); ব্রজেৎ (হয়ে যাবে)।

সরলার্থ: ব্রহ্মের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। নিজ মায়াশক্তির দ্বারা ইনি বহু রূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয় না। সত্যিই যদি ব্রহ্ম পরিবর্তিত হতেন তাহলে অবিনাশী হতেন না, মরণশীল হতেন।

ব্যাখ্যা: আগে বলা হয়েছে অদ্বৈত হল কারণ, দ্বৈত তার কার্য। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে অদ্বয় ব্রহ্ম এই দৃশ্যমান দ্বৈতজগতে পরিবর্তিত হয়েছেন? না, ব্রহ্ম সদা অবিকৃত। ব্রহ্ম নিত্য। পরিবর্তন হলে ব্রহ্ম অবিনাশী হতেন না। তাহলে এই দ্বৈতজগৎ কোথা থেকে এল? এই জগৎ প্রতিভাস মাত্র—চোখের অসুখে অনেক সময় আমরা যেমন দুটো দুটো দেখি, এও ঠিক তেমনি। আমরা দুই দেখছি, আসলে আছেন কেবল এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম। দুই দেখা রজ্জুতে সর্পভ্রমতুল্য। ব্রহ্মই অধিষ্ঠান, নাম-রূপের এই দৃশ্যজগৎ ব্রহ্মের উপর আরোপিত মাত্র।

ব্রহ্ম নিত্য, অখণ্ড, অমৃত, নিরাকার, অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয়। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। ইনি আকাশের মতো—সর্বত্র এবং সর্বভূতে বিরাজমান। যেহেতু রূপ নেই, অতএব তাঁর রূপান্তরের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আগুন কি তার উত্তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে যেতে পারে? পরমাত্মা স্বরূপত নিরাকার এবং চিরকাল নিরাকারই থাকবেন। ব্রহ্ম নরম মাটির তাল নন যে তাঁকে নানা রূপ দেওয়া যাবে।

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি॥২০

অন্বয়: বাদিনঃ (দ্বৈতবাদীরা); অজাতস্য ভাবস্য (যা জন্মরহিত তার); এব জাতিম্ ইচ্ছন্তি (জন্মের স্বপক্ষে তর্কবিচার করেন); অজাতঃ হি অমৃতঃ ভাবঃ (যার জন্ম নেই তার [অবশ্যই] মৃত্যুও নেই); কথং মর্ত্যতাম্ এষ্যতি (কিভাবে মরণশীল হতে পারে)?

সরলার্থ: যা জন্মরহিত তারও জন্ম হতে পারে—এজাতীয় তর্ক দ্বৈতবাদীরা করে থাকেন। কিন্তু যে বস্তুর জন্ম নেই, তার মৃত্যুও নেই। সুতরাং এমন বস্তুর (যার জন্ম নেই) মৃত্যু কেমন করে হতে পারে?

ব্যাখ্যা: আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরহিত। তথাপি কিছু দ্বৈতবাদী যুক্তিতর্কের দ্বারা আত্মার জন্ম হতে পারে একথা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ভুলে যান যে জন্ম থাকলে মৃত্যুও থাকতে হবে। জন্ম-মৃত্যুর একটি থাকলে অন্যটিও থাকতে বাধ্য। যেহেতু আত্মার মৃত্যু নেই, অতএব তাঁর জন্মও হতে পারে না। 'মৃত্যুহীনের জন্ম হয়'—এ প্রস্তাব উদ্ভট।

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি॥২১

অন্বয়: অমৃতম্ (যা অবিনশ্বর); মর্ত্যং ন ভবতি (মরণশীল হতে পারে না); তথা (সেইরকমভাবে); মর্ত্যম্ (যা মরণশীল); অমৃতং ন [ভবতি] (তা মৃত্যুহীন হতে পারে না); কথঞ্চিৎ (যে কোনও বস্তু); প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবঃ ন ভবিষ্যতি (যেভাবে প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে অন্যরকম হতে পারে না)।

সরলার্থ: যা স্বভাবতই মৃত্যুহীন, তার কখনো মৃত্যু হতে পারে না। একইভাবে যা স্বভাবতই মরণশীল, তা অমর হতে পারে না। প্রকৃতি যে বস্তুকে যেভাবে তৈরি করেছে, তার থেকে সে অন্যরকম হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: যা স্বভাবতই অমৃত—তা সবসময় এবং সব অবস্থাতেই অমর। আবার যা স্বভাবতই মরণশীল, তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—যেহেতু এটি মরণশীল, অতএব সব অবস্থাতেই তাকে মরণশীল হতে হবে। কখনই এ অমর হতে পারে না। প্রকৃতি যে বস্তুকে যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন তার অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়। আগুন কি কখনো উত্তাপহীন হতে পারে?

স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ॥২২

অন্বয়: যস্য (যিনি মনে করেন); স্বভাবেন অমৃতঃ ভাবঃ (যে বস্তু স্বভাবতই মৃত্যুহীন [তাও তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে (এবং)]); মর্ত্যতাং গচ্ছতি (মরণশীল হতে পারে

[তাঁর কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা]); তস্য কৃতকেন (তাঁর নিজের চেষ্টায় অর্জিত); অমৃতঃ (মোক্ষ); কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ (কিভাবে চিরস্থায়ী হবে)?

সরলার্থ: যদি কেউ বলেন কোন বস্তু স্বভাবত অবিনাশী হয়েও নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ বিনাশশীল হতে পারে (তবে আমরা তাঁকে প্রশ্ন করব)—তাহলে কঠোর সাধনায় তুমি যে মোক্ষলাভ করেছ তাও বদলাতে পারে? অর্থাৎ তোমার মোক্ষ চিরস্থায়ী নয়?

ব্যাখ্যা: কিছু মানুষ বিতর্ক শুরু করতে পারেন যে তথাকথিত 'মরণরহিত' বস্তুরও জন্ম হয় অর্থাৎ আত্মার জন্ম হয়। সেইক্ষেত্রে 'মরণরহিত' এই বিশেষণটির ব্যবহার তাঁদের পক্ষে কতটা যুক্তিযুক্ত? তাঁরা হয়তো উত্তরে বলবেন: 'জন্মাবার আগে আত্মাতে এই বিশেষণটি প্রযোজ্য। যখন আত্মার জন্ম হয়নি তখন তিনি মরণরহিত ছিলেন।' কিন্তু আদপেই যদি আত্মার জন্ম হয় তাহলে তিনি কিভাবে মৃত্যুহীন হবেন? জন্ম হলে তাঁর পরিবর্তনও হবে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হবেন। তাহলে আবার মরণরহিত হন কি করে? 'অজ' (যার জন্ম হয়নি) শব্দটি আত্মার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। যদি বলা হয় আত্মার জন্ম হয়েছে—তবে 'অজ' শব্দটি সকল তাৎপর্য হারায়। সবকিছুই তখন বিনাশশীল হয়ে ওঠে, কারণ যা জন্মায়, তার মৃত্যুও অবধারিত।

আত্মার যদি জন্ম-মৃত্যু থাকে, তবে মোক্ষ বলে আর কিছু থাকতে পারে না। মোক্ষ এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে বোধ করে। এই বোধ তখনি আসে যখন সাধক আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যান। কিন্তু আত্মা যদি নিজেই মুক্ত না হন, নিজেই যদি জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন, তবে সাধক কিভাবে নিজেকে জন্ম-মৃত্যুরহিত মনে করতে পারেন?

ভূততোঽভূততো বাঽপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তং চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ॥২৩

অন্বয়: ভূততঃ (সত্য); বা অভূততঃ (অথবা অসত্য); সৃজ্যমানে অপি সমা শ্রুতিঃ (সৃষ্টির বিষয়ে শাস্ত্রের সমর্থন সমপরিমাণে আছে); যৎ নিশ্চিতম্ (যা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত); যুক্তিযুক্তং চ (যুক্তি-বিচারের দ্বারাও সমর্থিত); তৎ ভবতি (সেটিকে স্বীকার করে নিতে হবে); ন ইতরৎ (অন্য কিছু নয়)।

সরলার্থ: সত্য বা অসত্য—দুই প্রকার সৃষ্টির প্রসঙ্গেই শাস্ত্র সমানভাবে বলে গেছেন। এই অবস্থায় শুধুমাত্র যে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে আছে এবং বিচার-বুদ্ধি দ্বারাও যা সমর্থিত তাকেই গ্রহণ

করতে হবে, অন্য কিছু নয়।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্র কেন সৃষ্টির কথা বলেছেন—অদ্বৈতবাদীরা আবার তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। দ্বৈতবাদ খণ্ডন ও অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই শাস্ত্র সৃষ্টি-প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। অদ্বৈততত্ত্ব গ্রহণে মনকে প্রস্তুত করে তোলার এটি একটি উপায়মাত্র।

আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে—'তিনি সৃষ্টি করলেন' অথবা 'তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই হলেন'—এজাতীয় শাস্ত্রীয় উক্তি অদ্বৈতবাদের বিরোধী নয়। আসলে আত্মার 'সৃষ্টি'ও নেই, 'হয়ে ওঠা'ও নেই কারণ আত্মা সতত অবিকৃত। কর্ম বা পরিবর্তনের ধারণা আত্মার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। তাহলে এজাতীয় শাস্ত্রীয় উক্তির ব্যাখ্যা কি করে হয়? উত্তর হল—বস্তুত আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না এবং আত্মায় কর্মেরও কোন স্থান নেই। আত্মার মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের ধারণা হয় যেন তিনি পরিবর্তিত হচ্ছেন, যেন কর্ম করছেন। জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় মনে হতে পারে যে সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি সত্য নয়। আত্মাই একমাত্র সত্য—আর সব মিথ্যা। শাস্ত্র বলে 'আত্মা অন্তরে ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান, এক ও অদ্বিতীয়। আত্মাই সত্য, জ্ঞান। আত্মাই ব্রহ্ম—তাঁর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই।' শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ॥২৪

অন্বয়: ইহ (ব্রহ্মে); নানা ন ইতি চ (বহু নেই এবং); ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ (ঈশ্বর তাঁর মায়ার দ্বারা); ইতি অপি (এই মর্মে); অম্লায়াৎ (শাস্ত্র বলছেন); অজায়মানঃ ([যদিও] জন্ম নেই); সঃ (ঈশ্বর); মায়য়া (মায়ার দ্বারা); তু (কিন্তু); বহুধা জায়তে (বহু হলেন)।

সরলার্থ: 'ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, এবং ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে বহু হলেন'—শাস্ত্রে এইসব কথা আছে। তাই আমরা জানি যদিও ঈশ্বর জন্মরহিত, তবু নিজ মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হলেন।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈততত্ত্বকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? বৈচিত্রে পূর্ণ এই জগৎ সত্য নয়। সত্য যে নয় তার কারণ শাস্ত্র অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করছে: 'বহু নেই, কেবল এক আছে।' দ্বৈতবাদকে খণ্ডন করে এজাতীয় ঘোষণা শাস্ত্রে আরও অনেক আছে। প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে যেখানে দেখানো হয়েছে একমাত্র মনের স্থানই সর্বোচ্চ। আবার আত্মাই একমাত্র সত্য, অন্য সবকিছু মিথ্যা—তা দেখাবার জন্য সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। নিজ মায়াশক্তির দ্বারা আত্মা আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন।

কিন্তু মায়া কি? মায়া হল জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি। এই দেখাটা ভুল, কারণ তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য। আত্মা জন্মরহিত হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত হন। এই ভুল দেখার জন্য দায়ী মায়া। যাঁর জন্ম নেই সেই আত্মা কি বহু হতে পারেন? আগুন কি একই সঙ্গে গরম ও ঠাণ্ডা দুই-ই হতে পারে? এ তো স্ববিরোধী কথা।

শাস্ত্র বলে যে ব্যক্তি জানেন একমাত্র আত্মাই আছেন তাঁর আর কোন আসক্তি থাকে না, কোন দুঃখও থাকে না। শাস্ত্র আরও বলে: 'তুমি যদি বহু দেখ তবে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে তোমাকে বারবার যাওয়া-আসা করতে হবে।' এ-জাতীয় অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিবৃতি পাওয়া যায়। এইসব উক্তির লক্ষ্য একটিই—তা হল অদ্বৈতজ্ঞান।

নংভূতেরপবাদাচ্চ সংভবঃ প্রতিষিধ্যতে।
কো ন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে॥২৫

অন্বয়: সংভূতেঃ অপবাদাৎ (সংভূতিকে [হিরণ্যগর্ভ, প্রথম সত্তা] খণ্ডন করায়) সংভবঃ প্রতিষিধ্যতে (যে কোনও বস্তুর জন্মের প্রশ্নটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে); কঃ নু এনং জনয়েৎ (জীবাত্মাকে কে সৃষ্টি করবে?); ইতি ক্যরণং প্রতিষিধ্যতে (কারও পক্ষে এর কারণ হওয়া অসম্ভব)।

সরলার্থ: সর্বভূতের আদি কারণ হিসেবে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তাহলে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণা বাতিল হয়ে গেল। সেইক্ষেত্রে একে (জীবাত্মাকে) কে আবার সৃষ্টি করবে? এর দ্বারা জীবাত্মার উৎপত্তির কারণও বাতিল করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: যখন বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন সেই বৃক্ষটি বীজের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বীজ কারণ, বৃক্ষ কার্য। কার্য স্থায়ী নয়, কারণই স্থায়ী।

সেই একইভাবে ব্রহ্ম প্রথমে নিজেকে হিরণ্যগর্ভ (সম্ভূতি)-রূপে প্রকাশ করলেন। হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, শক্তি ইত্যাদি অনন্ত। যদি কেউ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে, তবে হিরণ্যগর্ভের মহৎ গুণাবলীর কিছু লাভ করার জন্যই তা সে করে থাকে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি? এইসব গুণ কি আত্মজ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত করে?—না। এগুলি অর্জন করলে অন্যের দৃষ্টিতে নিজেকে কেউকেটা বলে বোধ হয়—এইমাত্র। কিন্তু এর দ্বারা লক্ষ্যের কাছাকাছিও আসা যায় না। বরং উদ্দেশ্য (আত্মজ্ঞান) থেকে মানুষ ক্রমশ দূরে সরে যায়। এবং আরও বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। 'সংভূতি'র উপাসনা করে উপাসক সংভূতি হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু কখনো নিজের আত্মার সঙ্গে এক হতে পারেন না। এইজন্য শাস্ত্রে সংভূতির উপাসনার নিন্দা করা হয়েছে।

কর্ম দুই প্রকার—সকাম কর্ম অর্থাৎ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে কর্ম করা হয়। সকাম কর্ম করে মানুষ আরও দুঃখ-বিপদকে ডেকে আনে। আর এই কর্মের দ্বারা কখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যাওয়া যায় না। আর একরকম কর্ম আছে যেখানে কর্মই সাধনা। যেমন, কেউ যখন পুজো করছেন তখন সেই পুজোর আনুষঙ্গিক বহু কাজ তাঁকে করতে হয়। এর প্রতিদানে তিনি কিছুই চান না। এই প্রকার কর্মের ফল হল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হলে—অর্থাৎ ঐহিক বা পারমার্থিক উভয় প্রকার কামনাশূন্য হলে, তবেই মানুষের অজ্ঞানতা দূর হয় এবং সে তার স্বরূপ জানতে পারে। সে তখন জানতে পারে সে-ই পরমাত্মা স্বয়ং।

এখন প্রশ্ন হল একবার স্বরূপজ্ঞান হলে মানুষ কি তা আবার ভুলে যেতে পারে? সে কি আবার ভাবতে পারে যে সে জীবাত্মা মাত্র এবং তার বহু অপূর্ণতা রয়েছে? না, তা আর সম্ভব নয়। একবার যখন ভুল ভেঙে যায় যে ওটা 'সাপ' নয়, 'দড়ি' তখন আর তার ভুল হয় না। তখন আর কোন উৎস নেই যার থেকে জীবাত্মার উৎপত্তি হতে পারে। আত্মজ্ঞান যে লাভ করেছে তার কাছে আর সম্ভূতির কোন অস্তিত্বই নেই।

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাঽজং প্রকাশতে॥২৬

অন্বয়: যতঃ (যেহেতু); সঃ এষঃ নেতি নেতি (ঐ [আত্মা] এই নয়, এই নয়); ইতি অগ্রাহ্যভাবেন (এইটি [শাস্ত্রবাক্যটি] বোঝা কঠিন); হেতুনা ব্যাখ্যাতং সর্বম্ (যা কিছু কারণ হিসেবে আগে বলা হয়েছে [তা হল দ্বিতত্ত্ব এবং সেইজন্য]); নিহ্নুতে (বাতিল করা হল); অজং প্রকাশতে (এইভাবে যা থাকল তা জন্মরহিত আত্মা)।

সরলার্থ: 'আত্মা এই নয় এই নয়'—এই শাস্ত্রবাক্যটি বোঝা কঠিন। সেইজন্য এতক্ষণ যা কিছু কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—তা আসলে দ্বিতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন এই দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। যা থাকল—তা জন্মরহিত আত্মা।

ব্যাখ্যা: আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পাছে আমরা আত্মা বলে মনে করি তাই শাস্ত্র আমাদের বারবার এই বলে সতর্ক করছেন—'এটি নয়, এটি নয়।' অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়।

তবুও আত্মাকে জানার জন্য আমরা নানা পথ ও উপায় অবলম্বন করে থাকি। আত্মাতে আমরা নানা উপাধিও আরোপ করি। এ সবই নিরর্থক। শাস্ত্র বারবার বলে-'এটি নয়, এটি নয়।' কারণ যখন আমরা সব উপাধি, সব মতবাদ, এককথায় আর সবকিছু প্রত্যাখ্যান

করতে সক্ষম হব—কেবল তখনি আত্মা নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। মনে রাখতে হবে আত্মা অনন্য। একমাত্র আত্মাই সত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মাতেই আর সবকিছু রয়েছে। সেইজন্য সব মত ও সব পথ শেষ পর্যন্ত আত্মাতেই লয় হয়ে যাবে। এগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—একমাত্র আত্মাই আছেন।

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে॥২৭

অন্বয়: হি (যেহেতু); সতঃ (যা ইতিপূর্বেই আছে [তার]); জন্ম মায়য়া যুজ্যতে (জন্ম মায়াজাত—সম্ভবত একথা বলা যায়); ন তু তত্ত্বতঃ (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নয়); যস্য (প্রতিপক্ষের [অর্থাৎ দ্বৈতবাদীর] মতে); তত্ত্বতঃ জায়তে (সত্য সত্যই জাত হয়); তস্য হি (তাদের মতে নিশ্চিতভাবে); জাতম্ (যার জন্ম হয়েছে); জায়তে (জন্মায়)। **সরলার্থ:** যা ইতিপূর্বেই আছে, মায়ার সাহায্যে তার আবার জন্ম হয়েছে—সম্ভবত এমন কথা বলা যায়, কিন্তু তা যথার্থ নয়। যাঁরা জন্মকে সত্য বলে মনে করেন—তাঁদের কথার তাৎপর্য—জাত আবার জাত হয়।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্র বারবার বলছেন—একমাত্র সত্য হল আত্মা, আর এই জগৎ আত্মার উপর নাম-রূপের আরোপ ছাড়া আর কিছু নয়—যেমন আমরা ভুল করে দড়ির উপর সাপ আবোপ করি।

কিন্তু এই আত্মা কোথায় আছেন? এর যে অস্তিত্ব আছে তাই বা কি করে বুঝব? কার্য থাকলে বোঝা যায় কারণও আছে। জাদুর খেলা দেখে তার পিছনে যে জাদুকর আছে তা বুঝতে পারি। শূন্য থেকে কিছুর উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। শূন্য থেকে এই জগতের সৃষ্টি হতে পারে না। জগৎ অবশ্যই কোন কিছুর থেকে হয়েছে—আর তা হল আত্মা। আত্মা এই জগতের নিমিত্ত কারণ। আত্মা নিজ মায়াশক্তির সাহায্যে এই জগৎ উৎপন্ন করেছে। কিন্তু এ জগৎ সত্য নয়—এ যেন জাদুকরের জাদুখেলা।

আত্মা এ জগতের উপাদান কারণও বটে। দড়িই সত্য। দড়ির জায়গায় যে সাপ দেখি তা সত্য নয়। তবু মায়ার প্রভাবে সত্য বলে মনে হয়। সেইভাবে ইন্দ্রিয়-মনের অতীত আত্মা নিজ মায়াশক্তির সাহায্যে এই জগৎরূপে প্রতিভাত হন। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো এও নেহাতই দেখার ভুল।

দ্বৈতবাদীরা বলেন আত্মা জগৎরূপে জন্ম নিয়েছেন। যা জন্মমৃত্যুরহিত তারও জন্ম হয় —একথাই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু এ তো নেহাতই হাস্যকর। জন্মরহিত যে,

তার জন্ম কি করে হয়? এ যে স্ববিরোধী কথা। এরকম প্রস্তাবে দ্বৈতবাদীদের স্বীকার করে নিতেই হয় যে—যে বস্তু ইতিপূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছে, তার আবারও জন্ম হতে পারে। কিন্তু যদি তাঁরা যুক্তি দেখান যে একটি বস্তু থেকে আর একটি বস্তুর জন্ম হতে পারে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে প্রথম বস্তুটির জন্য আবার আরেকটি বস্তু থেকে হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। মোক্ষলাভের আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে—আত্মাই একমাত্র সত্য, আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত।

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাঽপি জায়তে॥২৮

অন্বয়: অসতঃ (যা মিথ্যা); জন্ম (জন্ম); মায়য়া (মায়ার সাহায্যে); তত্ত্বতঃ (প্রকৃতপক্ষে); নৈব যুজ্যতে (যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না); বন্ধ্যাপুত্রঃ মায়য়া বা অপি তত্ত্বেন ন জায়তে (মায়ার দ্বারা বা বাস্তবে বন্ধ্যানারী কখনো পুত্রের জন্ম দিতে পারে না)।
সরলার্থ: যা মিথ্যা তার কখনো জন্ম হয় না—মায়ার প্রভাবেও না, বাস্তবেও না। মায়াতে বা বাস্তবে কোনভাবেই বন্ধ্যানারী সন্তানের জন্ম দিতে পারে না।
ব্যাখ্যা: যার অস্তিত্বই নেই তার থেকে কি কোন বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে? কেউ কেউ মনে করেন তা সম্ভব। শাস্ত্র এই মত খণ্ডন করে। বাস্তবে তো নয়ই, মায়ার প্রভাবেও এ সম্ভব নয়। যেমন বন্ধ্যানারী কখনো সন্তানের জন্ম দিতে পারে না— মায়ার সাহায্যেও নয়, বাস্তবেও নয়।

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥২৯

অন্বয়: যথা স্বপ্নে (যেমন স্বপ্নে); মনঃ মায়য়া দ্বয়াভাসং স্পন্দতে (অবিদ্যার প্রভাবে মন দুই দেখে ও তদনুরূপ কর্ম করে [যদিও দুই নেই, এক]); তথা জাগ্রৎ (সেইরকম জাগ্রত অবস্থাতেও); মনঃ মায়য়া (অবিদ্যার প্রভাবে মন); দ্বয়াভাসং স্পন্দতে (দুই দেখে এবং তদনুরূপ কর্ম করে)।
সরলার্থ: স্বপ্নে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তবু অজ্ঞানতাবশত মন দুই দেখে ও সেইমতো কর্ম করে। সেইরকম জাগ্রত অবস্থাতেও মন অবিদ্যার প্রভাবে ভেদদর্শন করে ও তদনুরূপ

ব্যবহার করে (বস্তুত দুই নেই, এক। অবিদ্যার কারণে এই ভুল হয়)।
ব্যাখ্যা: মায়া কিভাবে বস্তু উৎপন্ন করে? উত্তর হল দড়িকে ভুল করে যেমন সাপ বলে মনে হয় এও ঠিক তেমনি। মায়ার প্রভাবে মন এই ছলনা করে।

ধরা যাক, স্বপ্নে একটি হাতি দেখলাম। এই দেখাটা আত্মাকে আশ্রয় করে হচ্ছে। আত্মা আছে বলেই এই দেখা সত্য বলে মনে হয়। মন নিজেকে হাতির আকারে আত্মার উপর আরোপ করে। তখন মানসচক্ষুতে হাতি দেখা যায়। মনের তাই এখানে দ্বৈত ভূমিকা: মনই দ্রষ্টা, মনই দৃষ্ট। মায়া মনকে এই দ্বৈত ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করে।

জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের দেখাটা এইরকমই।

অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ॥৩০

অন্বয়: স্বপ্নে চ অদ্বয়ং মনঃ (যখন স্বপ্ন দেখি তখন শুধু মনই আছে); দ্বয়াভাসং ন সংশয়ঃ ([তথাপি] বহুদর্শন হয় এবং সে সম্পর্কে মনে কোন সংশয়ও থাকে না); তথা (একইভাবে); অদ্বয়ং চ জাগ্রৎ (যখন আমরা জাগ্রত, তখনও মন একাই আছে); দ্বয়াভাসং সংশয়ঃ ন (তবুও বহুদর্শন যে হয় সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না)।
সরলার্থ: যখন স্বপ্ন দেখি, তখন মন একাই থাকে। তথাপি আমাদের দুয়ের (জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র) অভিজ্ঞতা হয়। এবং এ-বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয়ও থাকে না। সেইরকম জাগ্রত অবস্থাতেও মন দ্বৈত ভূমিকা পালন করে ও জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র সৃষ্টি করে। এর ফলে বহুদর্শন হয়। আর এই বহুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু স্বপ্ন ও জাগ্রত—উভয় অবস্থাতেই যা অভিজ্ঞতা হয় তা ভ্রমমাত্র।
ব্যাখ্যা: রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন তা সম্ভব হয় কারণ দড়ি ও সাপ একাকার হয়ে যায়। একইভাবে যখন স্বপ্ন দেখি তখন মন আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় এবং দ্বৈত ভূমিকা অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

ধরা যাক স্বপ্নে হাতি দেখলাম। এখন কোথা থেকে এই হাতিটা এল? কেই বা এই হাতিটাকে দেখছে? উত্তর হল মন। আত্মা এখন মনের মধ্য দিয়ে কাজ করছে। মন একা। কিন্তু সে নিজেকে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—এই দুই ভাগে ভাগ করেছে।

জাগ্রত অবস্থাতেও এই একই ঘটনা ঘটে। তখন আমরা বহু দেখি, কিন্তু সেগুলি সবই মনের আরোপ মাত্র। আত্মা এর দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন না। মনই সুখ-দুঃখ অনুভব করে, আত্মা সাক্ষীমাত্র।

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎসচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥৩১

অন্বয়: ইদং সচরাচরম্ (এই গতিশীল অথবা স্থাবর); যৎ কিঞ্চিৎ (যা কিছু); দ্বৈতং মনোদৃশ্যম্ (দুই বোধ মনের সৃষ্টি); মনসঃ অমনীভাবে (যখন মন নিষ্ক্রিয় হয়); দ্বৈতং ন হি উপলভ্যতে (আর ভেদদর্শন হয় না)।

সরলার্থ: এই দ্বৈতজগতে আমরা স্থাবর এবং জঙ্গম দুরকমের বস্তুই দেখি। এ সব বস্তুই মনের সৃষ্টি। মন নিষ্ক্রিয় হলে দুই বোধ আর থাকে না।

ব্যাখ্যা: আমরা যে জগতে বহু দেখি তারজন্য মনই দায়ী। যার মন সম্পূর্ণ স্থির হয়েছে তার আর ভেদদর্শন হয় না। যেমন, সুষুপ্তি অথবা সমাধি অবস্থায় মন নিষ্ক্রিয় থাকে—তখন আর দুইবোধ থাকে না। এর তাৎপর্য যথার্থ দ্বিতত্ত্ব বলে কিছু নেই। দুই দেখা মনের সৃষ্টি।

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্॥৩২

অন্বয়: তৎ (মন); আত্মসত্যানুবোধেন (আত্মার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করে); যদা (যখন); ন সঙ্কল্পয়তে (কামনা করে না); তদা গ্রাহ্যাভাবেন (কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা না থাকায়); অগ্রহম্ অমনস্তাম্ (নিষ্কাম ও মনাতীত অবস্থা); যাতি (লাভ করেন)।

সরলার্থ: যখন মন আত্মার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করে তখন সে নিষ্ক্রিয় হয়; কারণ তখন আর মনের প্রত্যক্ষের বস্তু কিছু থাকে না; এমনকি প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষাও মনে উদিত হয় না। তখন মানুষ নিষ্কাম ও মনাতীত অবস্থা লাভ করে।

ব্যাখ্যা: এই মনের অতীত অবস্থা কিভাবে লাভ করা যায়? শাস্ত্র বলে 'মাটিই সত্য। মাটিকে যে নানা আকার দেওয়া হয় সেগুলি সত্য নয়।' একইভাবে আত্মাই সত্য। আত্মা সর্বব্যাপী। নিজের চেষ্টায়, শাস্ত্র পড়ে এবং আচার্যের নির্দেশ অনুসরণ করে এই আত্মার উপলব্ধি হয়। উপলব্ধি হলে তখন দেখি যা কিছু আছে সবই আত্মা এবং আমিই সেই আত্মা। তখন সর্বত্র নিজেকেই দেখি। অর্থাৎ তখন আমি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় কে কাকে দেখবে? এই অবস্থা ইন্ধনহীন আগুনের মতো। ইন্ধন না থাকলে আগুন আপনিই নিভে যায়। তেমনি মনকে সক্রিয় করার মতো কোন বস্তু না থাকায় মনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত মন আর মন থাকে না। আত্মায় লীন হয়ে যায়।

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্মজ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে॥৩৩

অন্বয়: নিত্যম্ (সর্বদা অভিন্ন); অজং ব্রহ্ম (যাঁর কখনো জন্ম হয়নি সেই ব্রহ্ম [যার জ্ঞান]); জ্ঞেয়ম্ (জানতে হবে [তাহলে যদি]); অকল্পকম্ (যাকে কল্পনা করা যায় না); অজম্ (চিরন্তন); জ্ঞানম্ (জ্ঞানস্বরূপ); জ্ঞেয়াভিন্নম্ (যাকে জানতে হবে সেই ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়); প্রচক্ষতে ([বিবেকী ব্যক্তিরা] বলেন); অজম্ (জন্মরহিত [ব্রহ্ম স্বয়ং]); অজেন (জ্ঞানের দ্বারা); বিবুধ্যতে (উপলব্ধি করা যায়)।

সরলার্থ: ব্রহ্মের কখনো জন্ম হয়নি। ইনি নিত্য এবং অভিন্ন। ইনি নির্গুণ, অতএব কল্পনার অতীত। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় উভয়ই ব্রহ্ম। এই অজাত এবং অমৃত ব্রহ্ম নিজেকে শাশ্বত জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক মনের সকল কর্মই মিথ্যা। তাই যদি হয় তাহলে আমরা আত্মাকে কি করে জানব? শাস্ত্র বলেন, মনের দ্বারাই আত্মাকে জানতে হবে। কিন্তু মন যদি না থাকে? তাহলে আত্মাকে জানব কেমন করে?

আত্মাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। কারও সঙ্গে আত্মার তুলনা করা যায় না। আত্মা বাক্য-মনের অতীত। এমনকি কল্পনারও অতীত। কোন গুণের দ্বারাই আত্মাকে বিশেষিত করা যায় না। তবু শাস্ত্র বলে আত্মাকে ‘জানতে’ হবে। আবার শাস্ত্রে আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়েছে। এই উক্তি দুটি পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। জ্ঞানকে কি জানা যায়? জ্ঞান জ্যোতিস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ। একটি প্রদীপ দেখতে গেলে আর একটি প্রদীপের আলোর দরকার হয় না। জ্ঞানকে ‘জানা’র অর্থ জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। এর ফলে মানুষটা আমূল পালটে যায়। সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে ওঠে।

নিগৃহীতস্য মনসো নির্বিকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ॥৩৪

অন্বয়: নিগৃহীতস্য (মন আত্মাতে স্থির); নির্বিকল্পস্য (একমুখী); ধীমতঃ (বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের); মনসঃ (মনের); প্রচারঃ (আচরণ); সঃ (সেই [আচরণ]); তু (নিশ্চিতভাবে); বিজ্ঞেয়ঃ (যত্নসহকারে পাঠ করা উচিত [যোগী ও সাধকদের দ্বারা]); সুষুপ্তে (গভীর নিদ্রামগ্ন [মানুষরা]); অন্যঃ (এক নয় [কারণ তাদের মন অবিদ্যা ও তার নানা কার্যের দ্বারা আবৃত]); ন তৎ সমঃ (ব্রহ্মে অটল যাঁদের মন, তাঁদের মতো নয়)।

সরলার্থ: যাঁর মন ব্রহ্মে স্থির, একমুখী এবং সবসময় নিত্য-অনিত্য বিচার করছে তাঁর আচরণ যোগীদের লক্ষ্য করা উচিত। গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির আচরণ এরকম নয়। তার আচরণ আলাদা কারণ তার মধ্যে এখনও অজ্ঞানতা রয়েছে। সে এই জগতের প্রতি আসক্ত। তার ব্যবহার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মতো হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: যখন মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন তার মন সম্পূর্ণভাবে স্থির হয়ে যায়। আগুন যেমন ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে নিভে যায় এও ঠিক তেমনি। এমন ব্যক্তি দুই দেখার ক্ষমতা হারিয়েছেন। তাঁর মন আত্মায় স্থির এবং তাঁর কাছে আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাঁর মনের অবস্থা যোগীদের পর্যবেক্ষণের বিষয়।

এহেন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে গভীর নিদ্রামগ্ন মানুষের পার্থক্য কোথায়? উভয় ক্ষেত্রেই মনটা স্থির হয়ে আছে। কিন্তু কোন তফাত আছে কি? হ্যাঁ আছে— আকাশ-পাতাল তফাত। প্রথমজন আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি সর্বত্র এবং সর্বভূতে নিজেকে দেখেন। তিনি নিজেকে সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন। তাঁর কাছে দুই নেই, এক। তিনি সব কামনা-বাসনা মুক্ত—ইন্ধনহীন আগুনের মতো। তিনি আত্মতৃপ্ত।

অন্যদিকে গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মনের স্থিরতা সাময়িক। সকল দুঃখের মূল যে অবিদ্যা তা এই ব্যক্তির মধ্যে তখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে অবিদ্যার খেলা শুরু হয়ে যায় এবং নিজেকে সে ইন্দ্রিয়ের অধীন বলে দেখতে পারে।

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ॥৩৫

অন্বয়: হি (যেহেতু); সুষুপ্তে তৎ লীয়তে (গভীর নিদ্রায় মন কারণ-অজ্ঞানে ফিরে যায়); নিগৃহীতম্ (সংযত); ন লীয়তে (কারণ-অজ্ঞানে ফিরে যায় না); তৎ (মন); এব নির্ভয়ম্ (ভয়মুক্ত); সমন্ততঃ (সম্পূর্ণভাবে [লয় হয়]); জ্ঞানালোকম্ (জ্ঞানের আলো [যা]); ব্রহ্ম (ব্রহ্ম)।

সরলার্থ: গভীর ঘুমের সময় মন কারণ-অজ্ঞানে লয় হয়। কিন্তু সংযত মনের ক্ষেত্রে এরকম হয় না। সংযত মন ভয়মুক্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা: গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা কিরকম? যতদিন তিনি মনকে সংযত করে আত্মায় স্থির রাখতে সক্ষম না হন, ততদিন সুষুপ্তিকালে তাঁর মন অবিদ্যার কারণ অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নিজের রূপে রয়েছে এবং নিরন্তর আত্মচিন্তায় মগ্ন তিনি আত্মাতে লীন হয়ে থাকেন।

এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রথমজনের অশান্তি থেকে মুক্তি সাময়িক। জেগে উঠলেই যা ছিল তাই। সকল দুঃখের মূল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা তার মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। অবিদ্যার বন্ধন থেকে তার তখনও মুক্তি হয়নি।

আর দ্বিতীয়জন? তিনি স্বরূপজ্ঞান লাভ করেছেন। আত্মার সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করে তিনি এখন জীবন্মুক্ত পুরুষ।

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন॥৩৬

অন্বয়: [ব্রহ্ম হলেন] অজম্ (জন্মরহিত); অনিদ্রম্ (নিদ্রাহীন); অস্বপ্নম্ (স্বপ্নহীন); অনামকম্ (তাঁকে কোনও নামের দ্বারা বিশেষিত করা যায় না); অরূপকম্ (কোনও রূপের দ্বারা তাঁকে পৃথক করা যায় না); সকৃৎ বিভাতম্ (এক সময় প্রকাশিত [অর্থাৎ উজ্জ্বল]); সর্বজ্ঞম্ (যিনি সব জানেন); কথঞ্চন উপচারঃ ন (কারও প্রতি দায়বদ্ধ নন)।

সরলার্থ: স্বভাবত ব্রহ্মের জন্ম নেই; তিনি বিনিদ্র স্বপ্নরহিত, নাম-রূপহীন এবং এককালে প্রকাশিত (অর্থাৎ সদা উজ্জ্বল)। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী চৈতন্য। অতএব তিনি সকল দায়ভারমুক্ত।

ব্যাখ্যা: অজ্ঞ ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর অধীন। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সেহেতু জন্ম-মৃত্যুহীন। তিনি বিনিদ্র এবং স্বপ্নরহিত। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে বা স্বপ্ন দেখে তখন তার স্বাভাবিক সজাগ ভাবটি থাকে না। অজ্ঞানতার ফলেও অনুরূপ বা আরও মন্দ অবস্থায় সে থাকে। এখানে নিদ্রাবস্থা এবং স্বপ্নাবস্থা বলতে বোঝাচ্ছে, যে অবস্থায় মানুষের উচিত-অনুচিত বা ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। এই পরিস্থিতির মূল কারণ অজ্ঞানতা।

পরম সত্য হল শুদ্ধ চৈতন্য। তাঁকে আমরা ব্রহ্ম বলি। ব্রহ্ম কিন্তু কোন নাম নয়। এর দ্বারা পরম সত্য যে সর্বব্যাপী সেকথা বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্ম নিত্য প্রকাশিত। দিন বা রাত্রি সবসময়ই ইনি অপরিবর্তিত। দেশ বা কালের দ্বারা এই সত্য সীমাবদ্ধ নন। কোন গুণের দ্বারা তাঁকে বিশেষিতও করা যায় না। তিনি মুক্ত, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক। তিনিই সব। তিনি নিরপেক্ষ, কারও প্রতি দায়বদ্ধ নন। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

সর্বাভিলাপবিগতঃ সর্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরলোঽভয়ঃ॥৩৭

অন্বয়: সর্বাভিলাপবিগতঃ (সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত); সর্বচিন্তাসমুত্থিতঃ (মন তাঁর নাগাল পায় না); সুপ্রশান্তঃ (শান্ত); সকৃজ্জ্যোতিঃ (সতত উজ্জ্বল); সমাধিঃ (সর্বদা আনন্দে মগ্ন); অচলঃ (সদা স্থির); অভয়ঃ (ভয়মুক্ত)।

সরলার্থ: আত্মা অনির্বচনীয় অর্থাৎ ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। বস্তুত আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত। মনও এঁর নাগাল পায় না। ইনি প্রশান্ত এবং সদা জ্যোতির্ময়। একমাত্র সমাধিতে এঁকে উপলব্ধি করা যায়। ইনি সতত স্থির, অচল এবং নির্ভয়।

ব্যাখ্যা: 'অভিলাপ' কথাটির অর্থ বাগেন্দ্রিয়। এখানে অবশ্য এর দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়কেই বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মের কোন ইন্দ্রিয় নেই এবং তিনি সব ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে।

ব্রহ্মের মনও নেই। শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-মনের অতীত এবং নিত্য শুদ্ধ। ব্রহ্ম প্রশান্ত কারণ ইনি কিছুতে লিপ্ত নন। ইনি সদা জ্যোতির্ময়। এই জ্যোতি ব্রহ্মের নিজস্ব। ব্রহ্মই সমাধি—কারণ ইনিই সমাধির কারণ। যেহেতু তাঁর কোন পরিবর্তন নেই তিনি সদা স্থির ও অচল এবং তিনি সর্বদা ভয়মুক্ত।

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্॥৩৮

অন্বয়: যত্র (ব্রহ্মে); চিন্তা ন বিদ্যতে (কোনও চিন্তা নেই); তত্র (ব্রহ্মে); গ্রহঃ ন (সেখানে গ্রহণ বলে কিছু নেই); উৎসর্গঃ ন (দান বলে কিছু নেই); তদা (তখন [যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়]); আত্মসংস্থম্ (আত্মায় প্রতিষ্ঠিত); অজাতি (জন্ম নেই); জ্ঞানং সমতাং গতং (একত্বের জ্ঞান আসে)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম চিন্তা করেন না। ইনি কিছু গ্রহণও করেন না, দানও করেন না। যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি আত্মাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থায় তিনি জন্মরহিত এবং সর্বত্র তাঁর সমদর্শন হয়।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম প্রশান্ত এবং নির্ভয়। এইজন্য গ্রহণ বা দান কোন কর্মই তিনি করেন না। ব্রহ্মের মন বলে কিছু নেই। তাই তিনি সকল চিন্তার ঊর্ধ্বে। আত্মাকে জানলে মানুষ আত্মায় লীন হয়ে যায়—যেমনভাবে উত্তাপ আগুনে রূপান্তরিত হয়। এরূপ ব্যত্তি জন্মরহিত এবং সর্বত্র সমদর্শী। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র আত্মাকেই দর্শন করেন।

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দর্শঃ সর্বযোগিভিঃ।

যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ।।৩৯

অন্বয়: অস্পর্শযোগঃ (যে যোগে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগ থাকে না); নাম (তথাকথিত [যোগ]); সর্ব যোগিভিঃ দুর্দর্শঃ (যোগীরা বহু কষ্টে উপলব্ধি করেন); বৈ (নিশ্চিতভাবে); ভয়দর্শিনঃ যোগিনঃ হি (স্বল্পবুদ্ধি যোগীরা যাঁরা [অহংবুদ্ধি নাশ করতে] ভীত); অস্মাৎ (এর থেকে [অর্থাৎ যে যোগে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগ থাকে না তার থেকে]); অভয়ে (যেখানে ভয়ের কোন স্থান নেই); বিভ্যতি (ভয়ে সরে আসেন)।

সরলার্থ: একরকমের যোগ আছে যার নাম 'অস্পর্শযোগ'। এই যোগে যোগীকে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সবরকম সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হয়। এই যোগ অভ্যাস করা কঠিন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যদিও এই যোগের দ্বারা সাধক অভয়পদ লাভ করেন তথাপি এই যোগ অনুশীলন করতে তাঁরা ভয় পান (কারণ তাঁরা তাঁদের 'আমি'কে হারাতে ভয় পান)।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্রে অস্পর্শযোগের কথা বলা হয়েছে। বাহ্যজগৎকে স্পর্শ করাও এই যোগে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সাধক এই জগৎকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। কারণ তিনি জানেন এ জগৎ মিথ্যা এবং মানুষকে বদ্ধ করে। তাই তিনি নিজেকে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নেন। এই অবস্থা আত্মহত্যার সামিল।

অনেকের কাছেই এই যোগ ভীতিপ্রদ। যোগী জানেন জগৎ থেকে এই ধরনের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার তিনি যদি অনুশীলন করেন তবে কালে তিনি অভয়পদ লাভ করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তা জানা সত্ত্বেও এই যোগ অনুশীলন করতে তিনি ভয় পান। যেহেতু এই যোগে যোগীর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে হয়, সেহেতু খুব কম সাধকই এই পথে অগ্রসর হন।

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ।।৪০

অন্বয়: সর্বযোগিনাম্ (সেই যোগিগণ [যাঁরা তাঁদের লক্ষ্য থেকে এখনও অনেক দূরে]); অভয়ম্ (ভয়ের নিবৃত্তি); দুঃখক্ষয়ঃ (দুঃখের অবসান); প্রবোধঃ (আত্মজ্ঞান); অক্ষয়া (চিরন্তন); শান্তিঃ (মোক্ষ); এব চ (ও); মনসঃ (মনের); নিগ্রহায়ত্তম্ (সংযম আনতে হয়)।

সরলার্থ: যাঁদের (অর্থাৎ যে যোগীদের) এখনও আত্মোপলব্ধি হয়নি তাঁরা শুধুমাত্র মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ভয় ও দুঃখকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে সক্ষম হন এবং মা আত্মজ্ঞান ও চিরশান্তি (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন একমাত্র আত্মাই সত্য, অন্য কিছু সত্য নয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সবই মিথ্যা। এরূপ ব্যক্তিরা অচিরেই শান্তি লাভ করেন। কালে তাঁদের মোক্ষও লাভ হয়। আর এই শান্তি বা মোক্ষ লাভ করার জন্য তাঁদের কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না। তাঁদের কোন আচার-অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নেই; সকল কর্তব্য থেকে তাঁরা মুক্ত।

কিন্তু নিম্নকোটির কিছু মানুষ আছেন যাঁদের এখনও আত্মোপলব্ধি হয়নি। তাঁরা মনে করেন মন আত্মার উপর নির্ভরশীল নয় বরং আত্মার মতোই স্বতন্ত্র এক সত্তা। তাঁদের পক্ষে ভয় ও দুঃখকে জয় করার একমাত্র উপায় মনকে সংযত করা। অসংযত মনই সকল দুঃখের মূল। বিবেক-বুদ্ধি না থাকলে মন অশান্ত হবেই। সুতরাং মনকে বশে আনতে হবে। মন সম্পূর্ণ সংযত হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, মানুষ শাশ্বত শান্তির অধিকারী হয়।

উৎসেক উদধের্যদ্বৎকুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ॥৪১

অন্বয়: কুশাগ্রেণ (কুশের অগ্রভাগের দ্বারা); একবিন্দুনা (এক এক বিন্দু করে); উদধেঃ (মহাসমুদ্রের); উৎসেকঃ (শুষ্ক করা); যৎ বৎ (ঠিক যেমন); অপরিখেদতঃ (অবিশ্রান্তভাবে); মনসঃ নিগ্রহঃ (মনের সংযম); তৎ বৎ ভবেৎ (এটি ওর অনুরূপ)।
সরলার্থ: ঘাসের ডগা দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে জল তুলে যদি মহাসাগরকে শুষ্ক করতে হয়, তাহলে অবিরাম অক্লান্তভাবে এ কাজ করে যেতে হবে। মনকে নিজের বশে আনতে গেলেও ঠিক ঐরকমই পরিশ্রম করতে হয় (অর্থাৎ সমপরিমাণ পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন)।

উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা॥৪২

অন্বয়: কামভোগয়োঃ (বাসনা এবং বাসনার তৃপ্তি); বিক্ষিপ্তম্ (অস্থির); [মনঃ (মন)]; উপায়েন (যেভাবে বলা হয়েছে); নিগৃহ্ণীয়াৎ ([সুষুপ্তিতে] নিয়ন্ত্রণ করা উচিত); [বলা হয়] লয়ে (বিনাশ [কারণ এই অবস্থায় সবকিছুর লয় হয়]); সুপ্রসন্নম্ (উদ্বেগশূন্য [মন যখন সুনিয়ন্ত্রিত তখন এই অবস্থা লাভ হয়]); এব (নিশ্চিতভাবে); [যেহেতু] কামঃ (সুখভোগের বাসনা); যথা (ক্ষতিকর); লয়ঃ তথা (গভীর নিদ্রাও একইভাবে ক্ষতিকর)।

সরলার্থ: যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে মনকে বাসনা ও ইন্দ্রিয়সুখভোগ থেকে বিরত রাখতে হবে। গভীর নিদ্রায় যখন মন সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য, তখনও এই অভ্যাস করে যেতে হবে (কারণ বাসনা ও গভীর নিদ্রা একইভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে)।
ব্যাখ্যা: যাঁরা মনকে সংযত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মনকে বশে আনার উপায় কি? দুভাবে তা করা যায়। মনকে জগৎ থেকে প্রত্যাহার করার নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। করাটা কঠিন, কিন্তু ঠিক তাই করতে হবে। এটা হল নেতিবাচক দিক। কিন্তু একইসঙ্গে আত্মচিন্তাতেও মগ্ন থাকতে হবে অর্থাৎ মনকে আত্মায় একাগ্র করতে হবে। আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা—এই স্বরূপচিন্তায় আনন্দ আছে। এটা হল মনকে বশে আনার ইতিবাচক উপায়। যখন গভীর নিদ্রায় মন সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য, তখনও এই অভ্যাস করতে হবে। জাগ্রত অথবা সুষুপ্তি সব অবস্থাতেই মন আমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূল। সুতরাং মনকে নিজের বশে আনতেই হবে। জগৎ থেকে মনকে প্রত্যাহার করে সর্বদা আত্মায় যুক্ত রাখতে হবে।

দুঃখং সর্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্তয়েৎ।
অজং সর্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥৪৩

অন্বয়: সর্বম্ (সকল প্রকার দ্বৈতবুদ্ধি); দুঃখম্ (দুঃখময়); অনুস্মৃত্য (সবসময় বিচার করতে হবে); কামভোগাৎ (ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তা থেকে); নিবর্তয়েৎ ([মনকে] নিরস্ত করতে হবে); সর্বম্ (সকল রকমের দ্বৈতবুদ্ধি); অজম্ (ব্রহ্ম); অনুস্মৃত্য (সবসময় মনে রেখে); তু (আবার); জাতম্ (জন্মেছে [অর্থাৎ দুই দেখা]); ন এব পশ্যতি (দেখে না)।
সরলার্থ: সবরকমের দুই বোধ দুঃখযুক্ত—একথা সবসময় বিচার করে মনকে ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তা থেকে বিরত রাখতে হবে। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে আমরা যে বহু দেখি তা বস্তুত বহু নয়, এক অর্থাৎ ব্রহ্ম। নিরন্তর এই চিন্তা করলে আর দুই দেখা যায় না।
ব্যাখ্যা: আমাদের এই 'বহু' দেখা কিভাবে দূর হবে? প্রথমত আমাদের মনে বাখতে হবে 'বহু' দেখা অজ্ঞানতাপ্রসূত। ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য আর এই জগৎ ব্রহ্মের উপর আরোপিত উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়—একথা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ছুটছি, কারণ এই সুখকে আমরা সত্য এবং চিরস্থায়ী বলে মনে করছি। কালে আমরা সত্য কি তা বুঝতে পারি, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এইজন্যই উপনিষদ আমাদের বারবার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অসারতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। একইসঙ্গে মনে রাখতে বলছেন ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছু দেখা ভ্রান্তি

মাত্র। যা কিছু দেখি সবই ব্রহ্ম—একথা আমাদের সবসময় চিন্তা করতে হবে। পরিণামে আমরা শুধু ব্রহ্মকেই দেখব, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাব না। তখন আর বহু নেই, এক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: দুই দেখা ভুল। এই দুই দেখাই সব দুঃখ-কষ্টের মূল। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই দুই বোধ না আসে।

লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎপুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎসমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥৪৪

অন্বয়: চিত্তং লয়ে (যখন মন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন); সম্বোধয়েৎ (জেগে ওঠ ও মনকে আত্মায় যুক্ত কর); বিক্ষিপ্তম্ (যদি মন ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ছোটে); পুনঃ শময়েৎ (বারবার চেষ্টা করে মনকে বশে আন); সকষায়ম্ (মন যদি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়); বিজানীয়াৎ (নিজের বিপদ ডেকে আনছ, একথা স্মরণ রেখে মনকে আত্মায় নিবদ্ধ কর); সমপ্রাপ্তম্ (একবার মনকে বশে আনতে পারলে); ন চালয়েৎ (ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে মনকে আর ছুটতে দিও না)।

সরলার্থ: তুমি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন (যত তাড়াতাড়ি সম্ভব) জেগে ওঠ এবং মনকে আত্মার সঙ্গে যুক্ত কর। মন যদি ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ছোটে, বারবার তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর যতক্ষণ না মন সংযত হয়। যদি মন ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হতে চায়, মনকে বোঝাও এর থেকে কি অনর্থ ঘটতে পারে। তারপর মনকে আত্মায় স্থির রাখার চেষ্টা করে যাও। আর একবার যদি সফল হও তাহলে মনকে আর ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ছুটতে দিও না।

ব্যাখ্যা: গাঢ় ঘুম সুখকর হতে পারে কিন্তু এও অবিদ্যার অবস্থা। তখনও আত্মা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নিরন্তর আত্মচিন্তা ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুশীলন করে নিজেকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতে হবে। আত্মা (অর্থাৎ যা সত্য) এবং অনাত্মা (অর্থাৎ যা মিথ্যা)—এ দুয়ের পার্থক্য সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে। মনকে সর্বদা সংযত রাখতে হবে। যদি কোন বিচ্যুতি ঘটে তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে। আর দুটো অবস্থাকে সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে: জড় অবস্থা (অর্থাৎ গভীর ঘুম) এবং ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তি।

ধরা যাক, এই দুটি অবস্থা বর্জন করতে তুমি সক্ষম হয়েছ। তা সত্ত্বেও মন যদি সংযত না হয়, ইন্দ্রিয়সুখের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও যদি থাকে তখন মনকে আত্মায় সমাহিত করার দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না আত্মাতে লীন হয়ে যাচ্ছ। মনকে সম্পূর্ণ

আয়ত্তে না আনা পর্যন্ত থামা যাবে না। একবার মন তোমার নিয়ন্ত্রণে এলে আবার যাতে সে ইন্দ্রিয়সুখে প্রলুব্ধ না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

নাস্বাদয়েৎসুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্তমেকীকুর্যাৎপ্রযত্নতঃ॥৪৫

অন্বয়: তত্র (যখন তুমি ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে আস); সুখং ন আস্বাদয়েৎ (কিছু সুখ অবশ্যই আছে কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হয়ো না); প্রজ্ঞয়া (বিবেক-বৈরাগ্যের সাহায্যে); নিঃসঙ্গঃ ভবেৎ (নির্লিপ্ত থাক); নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তম্ (সংযত মনও যদি বহির্মুখী হতে চায়); প্রযত্নতঃ ([তখন] অক্লান্ত চেষ্টায়); একীকুর্যাৎ ([সংবরণ কর এবং] আত্মায় বিলীন করে দাও।

সরলার্থ: ভোগ্যবস্তু থেকে যখন তুমি কিছু সুখও পাও তখনও এর প্রতি আসক্ত হয়ো না; বরং বিবেক-বৈরাগ্যের সাহায্যে এর থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ। এমনকি মন যখন নিজের বশে রয়েছে তখনও সে বহির্মুখী হতে চাইতে পারে। কিন্তু যত কঠিনই হোক না কেন মনের রাশ টেনে ধরে মনকে আত্মায় সমাহিত কর।

ব্যাখ্যা: যদি আত্মাকে জানতে তুমি সত্যই আগ্রহী হও তাহলে কোনভাবেই ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়ো না। এই সুখ অবিদ্যাপ্রসূত এবং আত্মজ্ঞানলাভের অন্তরায়। মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মাকে জানা। আত্মজ্ঞান ছাড়া আর যা কিছু তা সবই প্রতিবন্ধক; অতএব সেগুলি ত্যাগ করতে হবে। মন আপোষ করতে চাইতে পারে। তখন মনের লাগাম টেনে ধরে অনলস প্রচেষ্টায় মনকে আত্মায় বিলীন করে দিতে হবে।

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তত্তদা॥৪৬

অন্বয়: যদা পুনঃ চিত্তম্ (যখন মন [গভীর নিদ্রায় অভিভূত]); ন লীয়তে (লয় হয় না); ন চ বিক্ষিপ্যতে (বিক্ষিপ্তও হয় না); অনিঙ্গনম্ (স্থির অচঞ্চল থাকে); অনাভাসম্ (কোন কিছু সম্পর্কে সচেতন নয়); তদা (তখন); তৎ (সেই [মন]); ব্রহ্ম নিষ্পন্নম্ (ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়)।

সরলার্থ: যখন সুষুপ্তিতে মনের লয় হয় না, আবার বিক্ষেপও হয় না বরং স্থির, অচঞ্চল থাকে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে (যোগীর) কোন জ্ঞান থাকে না তখন সেই মন ব্রহ্মে

লীন হয়ে আছে।

ব্যাখ্যা: যখন মন সম্পূর্ণভাবে তোমার বশে থাকে তখন কি হয় সেকথাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবস্থায় সুষুপ্তিতেও মনের সম্পূর্ণ লয় হয় না, আবার কোনভাবেই মনের বিক্ষেপও হয় না। এইরকম মন সদা স্থির ও অচঞ্চল এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন অর্থাৎ উদাসীন। মনের এই অবস্থাই প্রমাণ করে যে মন ব্রহ্মে লীন হয়ে আছে।

স্বস্থং শান্তং সনির্বাণমথ্যং সুখমুত্তমম্।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্বজ্ঞং পরিচক্ষতে॥৪৭

অন্বয়: উত্তমম্ (অনন্ত); সুখম্ (আনন্দ [আত্মজ্ঞান লাভের আনন্দ]); স্বস্থম্ (যখন তুমিই স্বয়ং আত্মা [অর্থাৎ আত্মায় স্থিত]); শান্তম্ (সব দুঃখ দূর হয়েছে); সনির্বাণম্ (মোক্ষলাভ হয়েছে); অকথ্যম্ (বর্ণনার অতীত); অজম্ (যার জন্ম নেই [শাশ্বত]); অজেন (যার জন্ম নেই তার দ্বারা); জ্ঞেয়েন (ব্রহ্মরূপে); সর্বজ্ঞম্ (যিনি সব জানেন); পরিচক্ষতে ([যাঁরা ব্রহ্মকে জেনেছেন] ব্রহ্ম সম্পর্কে [এইভাবে] বলেন)।

সরলার্থ: যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা বলেন আত্মজ্ঞান লাভের যে আনন্দ তা আমাদের আত্মাতেই নিহিত রয়েছে। এই আনন্দেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি। যখন মানুষ বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় তখনি এই আনন্দের উপলব্ধি হয়। একে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই আনন্দ অনাদি এবং সর্বজ্ঞ। সনাতন ব্রহ্ম ও এই আনন্দ এক ও অভেদ—ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মতে, একমাত্র আত্মজ্ঞান থেকে যে পরমানন্দ লাভ হয় সেই আনন্দ আমাদের আত্মাতেই নিহিত আছে। সেখানেই সকল দুঃখের অবসান। এরই নাম নির্বাণ তথা মোক্ষলাভ। আমাদের সকল বন্ধনের মুক্তি এই আনন্দে। ভাষায় একে বর্ণনা করা যায় না—শুধু যে তাকে জেনেছে, সে-ই পেয়েছে। এই আনন্দ অসীম; ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখের মতো নয়। এই আনন্দ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, অতএব অনাদি। ব্রহ্ম থেকে এই আনন্দ পৃথক নয়। আনন্দই স্বয়ং ব্রহ্ম।

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥৪৮

অন্বয়: কশ্চিৎ জীবঃ ন জায়তে (কোন জীবেরই জন্ম হয় না); সম্ভবঃ অস্য ন বিদ্যতে (কোন সত্তার জন্ম হবার কোন সম্ভাবনাও নেই); যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে (কোন কিছুরই জন্ম হয় না); তৎ এতৎ উত্তমং সত্যম্ (এই হল পরম সত্য)।

সরলার্থ: কেউ জন্মায় না, কারও জন্মাবার সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। বস্তুত কোন কিছুই জন্মায় না—এই হল পরম সত্য।

ব্যাখ্যা: সৃষ্টি, যোগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—এই চূড়ান্ত তত্ত্বের জন্য মনকে প্রস্তুত করতেই এইসব প্রসঙ্গের অবতারণা। যদি কোন বস্তুকে জন্মাতে দেখি তবে তা আমাদের দৃষ্টিভ্রম মাত্র। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বই নেই।

অলাতশান্তি প্রকরণ

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্॥১

অন্বয়: যঃ (যিনি); আকাশকল্পেন (আকাশের মতো ব্যাপক); জ্ঞেয়াভিন্নেন (আত্মার সঙ্গে অভেদ); জ্ঞানেন ([আত্ম] জ্ঞানের দ্বারা); ধর্মান্ গগনোপমান (আকাশের যেমন কোন গুণ নেই তেমনি আত্মারও); সংবুদ্ধঃ (যিনি আত্মাকে জানেন); তং দ্বিপদাং বরম্ (সেই ব্যক্তি যিনি সর্বোত্তম [অর্থাৎ নারায়ণ]); বন্দে (আমি প্রণাম করি)।

সরলার্থ: যিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম, আকাশের মতো ব্যাপক এবং আত্মার সঙ্গে অভেদ তাঁকে প্রণাম করি। তিনি আত্মাকে জানেন। আবার এই আত্মজ্ঞানের দ্বারা একথাও জানেন যে আত্মার (জীবাত্মার) উপাধিসকল আকাশের উপর আরোপিত উপাধির মতোই মিথ্যা।

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের যোগসূত্রটি কি? আগের তিনটি অধ্যায়েই অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়, আগম প্রকরণে তা করা হয়েছে 'ওম্'-এর তাৎপর্য আলোচনার মাধ্যমে। দ্বিতীয় অধ্যায়, বৈতথ্য প্রকরণে বাহ্যজগতের অসারতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়েই অদ্বৈততত্ত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়, অদ্বৈত প্রকরণ। এই অধ্যায়ে শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈতবাদ প্রমাণিত হয়েছে এবং সবশেষে তাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা—'অদ্বৈতই পরম সত্য।'

বৌদ্ধরা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা শূন্যবাদী। এই শূন্যবাদী বৌদ্ধরা এবং দ্বৈতবাদীরা অদ্বৈততত্ত্বকে বারবার আক্রমণ করেছেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে দ্বৈতবাদীরা পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে অভ্যস্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তাঁদের মতবাদ কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

এই পটভূমিকায় চতুর্থ অধ্যায়, অলাতশান্তি প্রকরণের আলোচনা শুরু। এই প্রকরণে প্রথমে দ্বৈতবাদী, শূন্যবাদী ও অন্যান্য কয়েকটি মতবাদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে। পরে যুক্তি ও পূর্বোক্ত প্রমাণের সাহায্যে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে অদ্বৈতের কোন বিকল্প নেই। স্বাভাবিকভাবেই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অধ্যায়ের সূচনা। শুভ আরম্ভের সমাপ্তিও শুভই হয়।

কথিত আছে বদরিকাশ্রমে আচার্য গৌড়পাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন স্বয়ং নারায়ণ কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে অদ্বৈতের বাণী দান করেন। এই অর্থে নারায়ণকেই অদ্বৈততত্ত্বের আদিগুরু বলা যায়। গৌড়পাদ এই জ্ঞান গোবিন্দপাদকে এবং গোবিন্দপাদ আচার্য শঙ্করকে দিয়ে যান। নারায়ণ নররূপে ভগবান স্বয়ং।

অলাত শব্দটির অর্থ 'জ্বলন্ত মশাল'। 'অলাত শান্তি' মানে এই 'জ্বলন্ত মশালটি নির্বাপিত করা'। কিন্তু জ্বলন্ত মশালটির তাৎপর্য কি? রূপক অর্থে এর দ্বারা জগৎকে বোঝানো হয়েছে। জগৎ যেন অগ্নিগর্ভ, এখানে কেউ সুখী নয়। এর কারণ কি? অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যার প্রভাবেই আমরা বহু দেখি। আমরা মনে করি আমরা পরস্পরের থেকে আলাদা। সেহেতু সবসময় একে অপরের বিরোধিতা করি। এই প্রকরণ অদ্বৈতজ্ঞানের সাহায্যে এই দুঃখের আগুন নিভিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়—ব্যষ্টি স্তরেও বটে, সমষ্টি স্তরেও বটে।

অদ্বৈতকে আকাশবৎ বলা হয়। একথা সত্য যে আত্মা আকাশের মতোই ব্যাপক, কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে : বাইরের আকাশ জড় এবং তার পেছনে একটি কারণ বস্তু আছে। কিন্তু আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, শুদ্ধ চৈতন্য। আত্মা স্বতন্ত্র—কারণও নয়, কার্যও নয়।

আত্মা এক; কিন্তু নাম-রূপের জন্য বহু বলে প্রতিভাত। এইসব জীবাত্মাও আকাশের মতো। আকাশকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি আত্মাকেও কখনো খণ্ডিত করা যায় না। আগুন এবং তার উত্তাপ, সূর্য এবং তার কিরণ, আত্মা এবং জ্ঞান—এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। সেইভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক নয়, এক ও অভেদ। এখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়—এই তিনকে এক দেখানো হয়েছে; ঠিক যেমন আকাশ বস্তুত এক ও অভিন্ন।

নরোত্তম প্রভু নারায়ণ এই জ্ঞান দান করেছেন। তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্॥২

অন্বয়: অস্পর্শযোগঃ (সেই যোগ যাতে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে কোন সংযোগ থাকে না); বৈ (যথার্থত); নাম (পরিচিত); সর্বসত্ত্বসুখঃ (সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য); হিতঃ (কল্যাণকর); অবিবাদঃ (বিবাদের অবকাশ নেই); অবিরুদ্ধঃ (বিরোধিতার স্থান নেই); দেশিতঃ (শাস্ত্রে নির্দেশিত); অহং তং নমামি (তাকে [সেই যোগকে] প্রণাম করি)।

সরলার্থ: যে যোগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে কোন সংযোগ থাকে না তাকে বলে অস্পর্শযোগ। এই যোগ সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর। বিবাদ বা বৈরিতার কোন অবকাশ এই যোগে নেই। শাস্ত্র এই যোগশিক্ষা দেন। এই যোগকে আমি প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে অদ্বৈততত্ত্বের প্রশস্তি করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদকে এখানে যোগ বলা হচ্ছে, আর সেই যোগের নাম অস্পর্শযোগ। কথাটির আক্ষরিক অর্থ, যে যোগে বহির্জগতের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ থাকে না। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁরা এই যোগের তাৎপর্য বিশদভাবে জানেন।

এই যোগ সকলের জীবনে শান্তি আনে। এই জগতে বহু আপাতসুখকর বস্তু আছে, কিন্তু তা কল্যাণপ্রদ নয়। এই যোগ কিন্তু সুখকর হলেও ক্ষতিকর নয়। সর্বাবস্থায় সকলের পক্ষে এই যোগ মঙ্গলদায়ক।

অদ্বৈতমতে, একই সত্য। সুতরাং কোন সংঘাত ও বৈরিতার কোন স্থান এতে নেই। এখানে শুধু শান্তি ও সমন্বয়।

নিঃসন্দেহে এই যোগ আমাদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন আদায় করে নেয়।

ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্॥৩

অন্বয়: পরস্পরং বিবদন্তঃ (নিজেদের মধ্যে বিবাদে রত); কেচিৎ এব (কিছু মানুষ); বাদিনঃ (যাঁরা সাংখ্য দর্শনের সমর্থক); ভূতস্য (ইতিপূর্বেই যা রয়েছে); জাতিম্ ইচ্ছন্তি (মনে করেন জন্মগ্রহণ করেছে); অপরে ধীরাঃ (অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ [অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক গোষ্ঠী]); অভূতস্য ([দাবি করে] যার অস্তিত্ব নেই তা [জন্মায়])।

সরলার্থ: পরস্পর বিবাদরত পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু পণ্ডিত (সাংখ্য) মনে করেন যেসব বস্তু ইতিপূর্বেই রয়েছে তাদের জন্ম হওয়া সম্ভব। অন্য পণ্ডিতেরা (ন্যায়-বৈশেষিক) দাবি করেন যে কেবলমাত্র যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই কেবল সে বস্তুই জন্মগ্রহণ করতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা: এখানে দেখানো হচ্ছে দ্বৈতবাদীরা পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত। দ্বৈতবাদী সাংখ্যরা বলেন, যেসব বস্তু ইতিপূর্বেই রয়েছে তাদেরই জন্ম হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে দ্বৈতবাদী ন্যায়-বৈশেষিক গোষ্ঠী নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করেন। তাঁদের দাবি, কেবলমাত্র যার অস্তিত্ব নেই সেইরকম বস্তুই জন্মগ্রহণে সক্ষম।

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে॥৪

অন্বয়: ভূতম্ (যা কিছু [ইতিপূর্বেই রয়েছে]); কিঞ্চিৎ (যাই হোক না কেন); ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করে না); অভূতং ন এব জায়তে (যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই তার পক্ষে জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়); [ইতি] বিবদন্তঃ (পরস্পর বিবাদরত [সাংখ্য, ন্যায় ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ]); এবম্ অদ্বয়াঃ ([এর ফলে] যেন তাঁরা অদ্বৈতবাদী); অজাতিম্ (যুক্তির দিক থেকে জন্ম মিথ্যা); হি (স্বয়ং); তে (ওরা); খ্যাপয়ন্তি (সমর্থন করছে)।

সরলার্থ: সাংখ্য, ন্যায় ও অন্যান্য দ্বৈতবাদীরা পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে রত। তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, যা ইতিপূর্বেই আছে তার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন নেই। অপর দল বলেন, যে বস্তুর অস্তিত্বই নেই তার পক্ষে জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়। দ্বৈতবাদীরা এভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্যকেই সমর্থন করেন। অদ্বৈতমতে, কোন কিছুর জন্ম হওয়া যুক্তির দিক থেকে মিথ্যা।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীরা নিজেদের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধে পরস্পরকে খণ্ডন করতে চান। কিন্তু তা করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে অদ্বৈত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন।

সাংখ্য বলেন শুধুমাত্র অস্তিত্ববান বস্তুরই জন্ম হয়। নৈয়ায়িক বলেন—'উদ্ভট প্রস্তাব। যার ইতিপূর্বেই অস্তিত্ব আছে তা আবার জন্মাবে কেন? তবে কি তোমরা বলতে চাও যে আত্মা, যা নিত্য আছে তাঁকে আবার জন্মাতে হবে?' নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত এই যে কেবলমাত্র যার অস্তিত্ব নেই সেই বস্তুরই জন্ম হয়ে থাকে।

সাংখ্যের যুক্তি: যার অস্তিত্ব নেই তা যদি জন্মায় তাহলে তো একদিন খরগোশেরও শিং গজাবে, বন্ধ্যানারীও সন্তানের জন্ম দেবে। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, অসম্ভব।

এইভাবে দ্বৈতবাদীরা পরস্পরকে খণ্ডন করেন। অদ্বৈতবাদীরা দাবি করেন, জন্ম-মৃত্যু সমস্যার একমাত্র সমাধান হল অদ্বৈততত্ত্ব। অর্থাৎ জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, সৃষ্টি নেই, বিনাশও নেই। আছে কেবল রূপান্তর। বাইরের রূপটা বদলায়, বস্তু স্বরূপত একই থাকে। সেই অপরিবর্তিত 'বস্তু'ই আত্মা।

খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্।
বিবদামো ন তৈঃ সার্ধমবিবাদং নিবোধত॥৫

অন্বয়: তৈঃ খ্যাপ্যমানাম্ (যাঁরা স্বপক্ষে বলেন); অজাতিম্ (সৃষ্টি না হওয়া); বয়ম্ অনুমোদামহে (আমরা তাঁদের সমর্থন করি); তৈঃ সার্ধং ন বিবদামঃ (আমরা তাঁদের [সাংখ্য] সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না); [হে সাধকগণ] অবিবাদম্ (বিবাদের অবকাশ নেই [আত্মার প্রসঙ্গে]); নিবোধত (অনুধাবন কর)।

সরলার্থ: যাঁরা বলেন সৃষ্টি বলে কিছু নেই আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত। কিন্তু অন্যদের সঙ্গেও আমাদের বিবাদ নেই। হে সাধকগণ, মন দিয়ে শোন, যেখানে আত্মার প্রসঙ্গ সেখানে বিবাদের অবকাশ নেই।
ব্যাখ্যা: অদ্বৈতবাদীর মতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। কিন্তু সৃষ্টি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় তাঁরা কোন পক্ষই অবলম্বন করতে চান না; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁদের একটিমাত্র বক্তব্য : আত্মাকে জানার চেষ্টা কর।

অজাতস্যৈব ধর্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ধর্মো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি॥৬

অন্বয়: বাদিনঃ (দ্বৈতবাদীরা); অজাতস্য ধর্মস্য (যা জন্মরহিত তার); এব জাতিম্ ইচ্ছন্তি (এমন বস্তুরও জন্মের স্বপক্ষে তর্কবিচার করেন); অজাতঃ হি অমৃতঃ ধর্মঃ (যার জন্ম নেই তার [অবশ্যই] মৃত্যুও নেই); কথং মর্ত্যতাম্ এষ্যতি (কিভাবে মরণশীল হতে পারে?)।
সরলার্থ: যা জন্মরহিত তারও জন্ম হতে পারে—এ জাতীয় তর্ক দ্বৈতবাদীরা করে থাকেন। কিন্তু যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও থাকতে পারে না। সুতরাং এমন বস্তুর (যা জন্মরহিত) মৃত্যু কেমন করে হতে পারে?

[কারিকাভাষ্য ৩।২০ এবং ৪।৩ দ্রষ্টব্য]

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি॥৭

অন্বয়: অমৃতম্ (যা অবিনাশী); মর্ত্যং ন ভবতি (বিনাশশীল হতে পারে না); তথা (সেইভাবে); মর্ত্যম্ (যা মরণশীল); অমৃতং ন [ভবতি] (অবিনাশী হতে পারে না); কথঞ্চিৎ (যে-কোনও বস্তু); প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবঃ ন ভবিষ্যতি (প্রকৃতিদত্ত স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না)।
সরলার্থ: যা স্বভাবত অবিনাশী তার বিনাশ হতে পারে না। একইভাবে যা মরণশীল তা অবিনাশী হতে পারে না। প্রকৃতি যে বস্তুকে যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সে অন্যরকম হতে পারে না।

[কারিকাভাষ্য ৩।২১ দ্রষ্টব্য]

স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্মো গচ্ছতি মর্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ॥৮

অন্বয়: যস্য (যিনি মনে করেন); স্বভাবেন অমৃতঃ ধর্মঃ (যে বস্তু স্বভাবতই মৃত্যুহীন [তাও তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে এবং]); মর্ত্যতাং গচ্ছতি (মরণশীল হতে পারে [তাঁর কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা]); তস্য কৃতকেন (তাঁর নিজের চেষ্টায় অর্জিত); অমৃতঃ (মোক্ষ); কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ (কিভাবে চিরস্থায়ী হবে?)।
সরলার্থ: যদি কেউ বলেন কোন বস্তু স্বভাবত অবিনাশী হয়েও নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ বিনাশশীল হতে পারে তবে (আমরা তাঁকে প্রশ্ন করব) কঠোর সাধনায় তুমি যে মোক্ষলাভ করেছ তাও বদলাতে পারে? অর্থাৎ তোমার মোক্ষ কি চিরস্থায়ী নয়?
[কারিকাভাষ্য ৩।২২ দ্রষ্টব্য]

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা॥৯

অন্বয়: যা সাংসিদ্ধিকী (যা যোগ সাধনার দ্বারা অর্জন করা যায়); স্বাভাবিকী (যা স্বাভাবিক [যেমন আগুনের উত্তাপ]); সহজা (যা জন্মগত [যেমন পাখীর ডানা]); চ অকৃতা (যা কেউ সৃষ্টি করেনি); যা স্বভাবং ন জহাতি (যা নিজের স্বভাব পরিবর্তন করে না); সা ইতি বিজ্ঞেয়া প্রকৃতিঃ (তাই প্রকৃতি বলে পরিচিত)।
সরলার্থ: যা যোগ সাধনার বলে লাভ করা যায়, যা স্বাভাবিক, যা জন্মগত, যা কারও সৃষ্টি নয় বা যা কখনো নিজের স্বভাব পরিবর্তন করে না—তাই প্রকৃতি বলে পরিচিত।
ব্যাখ্যা: আত্মা স্বভাবত অবিনাশী। এর অন্যথা হয় না। আত্মা কখনো বিনাশশীল হতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃতি শব্দটির অর্থ কি? একটি বস্তুর প্রকৃতি বলতে তার মূল স্বভাবকে বোঝায়। এই প্রকৃতিই বস্তুটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। কখনো কখনো আমরা এমন যোগীপুরুষের সন্ধান পাই, যাঁরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। সেই শক্তি তাঁদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। যোগীপুরুষ সেইসব শক্তি সাধারণত হারান না। আরও সঠিক দৃষ্টান্ত আগুন ও তার উত্তাপ। আগুন স্বভাবতই উত্তপ্ত। উত্তাপহীন আগুন কল্পনাও করা যায় না, কারণ আগুন ও তার উত্তাপ অবিচ্ছেদ্য।

সেইভাবে পাখি এবং তার ডানা—একই সঙ্গে এদের জন্ম এবং এরা অচ্ছেদ্য। আবার পাখির উড়ার ক্ষমতাও তার সহজাত। আরেকটি দৃষ্টান্ত—জলের গতি স্বভাবত নিম্নমুখী। কোন অবস্থাতেই এইসব ক্ষণস্থায়ী বস্তু তাদের স্বভাব পরিবর্তন করে না। অতএব অবিনাশী আত্মা স্বভাব পরিবর্তন করে বিনাশশীল হবে সে প্রশ্নই ওঠে না।

জরামরণনির্মুক্তাঃ সর্বে ধর্মাঃ স্বভাবতঃ।
জরামরণমিচ্ছন্তশ্চ্যবন্তে তন্মনীষয়া॥১০

অন্বয়: স্বভাবতঃ (নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী); জরামরণনির্মুক্তাঃ (জরা, মৃত্যু ও অন্যান্য পরিবর্তন মুক্ত); সর্বে ধর্মাঃ (সকল জীবাত্মা); জরামরণম্ ইচ্ছন্তঃ (জরা এবং মৃত্যু ইচ্ছা করে); তন্মনীষয়া (তাদের কথা চিন্তা করে); চ্যবন্তে (নিজ প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়)।
সরলার্থ: জীবাত্মা স্বভাবতই জরা-মৃত্যু থেকে মুক্ত। কিন্তু সবসময় এইসব পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে করতে জীবাত্মা তার মুক্তস্বভাব হারিয়ে ফেলে (অর্থাৎ জীবাত্মা নিজের উপর এইসব পরিবর্তন আরোপ করে)।
ব্যাখ্যা: জীবাত্মা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরমাত্মার মতো জীবাত্মারও জরা-মৃত্যু ইত্যাদি পরিবর্তন নেই। কিন্তু জীবাত্মা যদি নিজেকে পরমাত্মা থেকে পৃথক এবং জরা-মৃত্যুর অধীন বলে মনে করতে থাকে, তাহলে ঐ রকম ভাবতে ভাবতে সে ঐরকমই হয়ে যায়। আসলে কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। সে ধরে নেয় যে, সে ঐরকমই হয়ে গেছে। অন্ধকার রাত্রে আমরা অনেক সময় দড়িকে সাপ বলে ভুল করি, এও ঠিক তাই। জীবাত্মা নিজের উপর অসুখ আরোপ করে নিজের অসুখ ডেকে আনে। আদতে হয়তো এসব অসুখ তার হয়নি, কিন্তু হয়েছে ভাবতে ভাবতে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।
জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথং চ তৎ॥১১

অন্বয়: যস্য (যার মতে); কারণং বৈ কার্য্যম্ (কারণ কার্যে পরিণত হয়); তস্য (তার মতে); কারণং জায়তে (কারণ জন্ম নেয়); জায়মানম্ (যদি তা জন্মায়); কথম্ অজম্ (কি করে অজাত হতে পারে); কথম্ (কেমন করে); তৎ (সেই কারণ); ভিন্নম্ (খণ্ডিত হয় [অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়]); নিত্যম্ (অপরিবর্তিত থাকতে সক্ষম?)।

সরলার্থ: কারও (সাংখ্য) মতে কারণই কার্য। তাঁরা আরও বলেন কারণের জন্ম হয়। তাই যদি হয় তাহলে কি করে কারণকে জন্মরহিত বলা যাবে? আর কারণ যদি কার্যে পরিণত হয় তবে তাঁকে কিভাবে অপরিবর্তনীয়ই বা বলা যায়?

ব্যাখ্যা: সাংখ্য মতে কারণ কার্যে পরিণত হয়। মাটির ঘটের কথাই ধরা যাক। ঘটের উপাদান-কারণ মাটি। মাটিই যেন ঘট হয়েছে।

সাংখ্য দর্শনের মতে জগতের প্রথম উপাদান-কারণ প্রধান [বা প্রকৃতি]। প্রধান মহতে এবং মহৎ অহং-কারে (অহং বোধ) পরিণত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই কারণ কার্যে পরিণত হয়। এইভাবেই সমগ্র জগতের আবির্ভাব। সাংখ্যেরা দাবি করেন প্রধান জন্মরহিত (অজ) এবং অপরিবর্তনীয় (নিত্য)।

অদ্বৈতবাদীরা সাংখ্যের এই দাবি মানেন না। তাঁরা প্রশ্ন করেন 'যদি বল প্রধান মহতে পরিণত হয় তবে তো জন্ম প্রক্রিয়াই বোঝাচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রধানের জন্ম নেই কিভাবে বলবে? নিশ্চয়ই যার জন্ম নেই সে আর একটি বস্তুতে পরিণত হতে পারে না। এ তো স্ববিরোধী কথা।'

সাংখ্য আরও বলছেন প্রধানের কোন পরিবর্তনও নেই, প্রধান নিত্য। তাই যদি হয় তাহলে প্রধান মহতে পরিণত হয় কি করে? এখানেও সাংখ্য নিজের যুক্তির কাছেই নিজে পরাজিত হচ্ছে।

কারণাদ্যদ্যনন্যত্বমতঃ কার্য্যমজং যদি।
জায়মানাদ্ধি বৈ কার্যাৎকারণং তে কথং ধ্রুবম্॥১২

অন্বয়: যদি (যদি [কার্য]); কারণাৎ অনন্যত্বম্ (কারণ থেকে পৃথক না হয়); অতঃ (অতএব); কার্য্যম্ (কার্য); অজম্ [স্যাৎ] (জন্ম হয়নি); জায়মানাৎ কার্য্যাৎ (যে কার্য উৎপন্ন হয়েছে তার থেকে [আলাদা নয়]); হি কারণং তে (তোমার মতে কারণ [কেমন করে]); কথং ধ্রুবম্ (স্যাৎ] (অপরিবর্তনীয় হতে পারে)।

সরলার্থ: কার্য যদি জন্মহীন কারণ থেকে পৃথক না হয় তাহলে কার্যেরও জন্ম নেই। উপরন্তু (কার্য-কারণ পৃথক না হলে) কারণ কিভাবে অপরিবর্তিত থাকে?

ব্যাখ্যা: সাংখ্যমতে, প্রধান (বা প্রকৃতি) মহৎ এবং অন্যান্য বস্তুর কারণ, জন্মরহিত এবং অপরিবর্তিত। আবার কারণই কার্যে পরিণত হয়, এও সাংখ্যের দাবি।

অদ্বৈতবাদীরা সাংখ্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা বলেন—'যদি কারণ কার্যে পরিণত হয় তার অর্থ হল কার্যের উৎপত্তি আছে। আবার যদি কার্য ও কারণ অভিন্ন হয় তাহলে বলতে

হবে কারণেরও উৎপত্তি আছে। উপরন্তু কারণ কার্যে পরিণত হলে কারণকে কোনমতেই অপরিবর্তিত বলা যায় না। যেমন একটি মুরগীর শরীরের এক অংশ যখন রান্না করা হচ্ছে, অপর অংশ কি ডিম দিতে পারে?

অজাদ্বৈ জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ।
জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে॥১৩

অন্বয়: যস্য (সাংখ্যমতে); অজাৎ (জন্মরহিত কারণ থেকে); জায়তে (কার্য উৎপন্ন হয়); তস্য (এইজন্য [এর সমর্থনে]); দৃষ্টান্তঃ ন অস্তি বৈ (নিশ্চয়ই কোন দৃষ্টান্ত নেই); জাতাৎ (যার জন্ম হয়েছে [সুতরাং ক্ষণস্থায়ী] তার থেকে); [এইরকম কারণ থেকে] জায়মানস্য (যার উৎপত্তি হল); চ (আরও); ব্যবস্থা ন প্রসজ্যতে (এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে)।

সরলার্থ: যে কারণের এখনও জন্মই হয়নি তার থেকেও কার্য হতে পারে—এর স্বপক্ষে সাংখ্য কোনও দৃষ্টান্ত দিতে পারেননি। আবার যদি বলা হয় কারণের উৎপত্তি আছে এবং সেই কারণ থেকে আবার কোন কার্য উৎপন্ন হয়েছে তাহলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে ন্যায়শাস্ত্রে বলে 'অনবস্থা' দোষ।

ব্যাখ্যা: সাংখ্যমতে, কারণ না থাকলেও কার্য থাকতে পারে। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে কি? না, নেই। অদ্বৈতবাদী বলেন 'শূন্য থেকে কিছুর উৎপত্তি' এ একটি উদ্ভট প্রস্তাব।

যদি তর্ক ওঠে কোন কার্যের কারণ অপর আর একটি কারণের থেকে উৎপন্ন, তাহলে এই দ্বিতীয় কারণেরও আবার একটি কারণ থাকতে হবে। আর এইভাবেই চলতে থাকবে অনন্তকাল। এই অবস্থা যুক্তির দিক দিয়ে মিথ্যা, ন্যায়শাস্ত্রে এই অবস্থার নাম অনবস্থা দোষ (Regressus ad infinitum)।

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে॥১৪

অন্বয়: যেষাম্ (যাঁরা মনে করেন); ফলম্ (কার্য [যেমন দেহ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ]); হেতোঃ আদিঃ ([পূর্বকৃত] কর্মই তার কারণ); হেতুঃ চ (এই কারণও [অর্থাৎ এই কর্মও]); ফলস্য ([কারণের] কার্য); আদিঃ (কারণ [দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ]); তৈঃ (সেই দ্বৈতবাদীরা);

হেতোঃ (কারণের); ফলস্য চ (কার্যের ও); অনাদিঃ (অনবস্থা দোষ); কথম্ উপবর্ণ্যতে (কেমন করে ব্যাখ্যা করবেন?)।

সরলার্থ: দ্বৈতবাদীরা মনে করেন দেহ কর্মের ফল। তাঁরা আরও মনে করেন কর্মও দেহের ফল (অর্থাৎ কারণ কার্যে পরিণত হয়, আবার কার্য কারণে পরিণত হয়)। এই অবস্থায় তাঁরা কি করে দাবি করবেন যে এই প্রক্রিয়া অনাদি?

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীদের মতে মানুষের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্বকৃত ভালো বা মন্দ কর্মের ফল। একইভাবে কৃতকর্ম আবার দেহের ফল। এইভাবে কার্য-কারণ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। কারণ (হেতু) কার্যে (ফলে) পরিণত হয়, আবার কার্য কারণে পরিণত হয়। স্পষ্টভাবেই এখানে আরম্ভ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলে দ্বৈতবাদীরা কি করে হেতু ও ফলের অনাদিত্ব ব্যাখ্যা করবেন? (অর্থাৎ এ তো স্ববিরোধী কথা কারণ নিত্যকূটস্থ আত্মায় হেতু-ফল ভাব সম্ভব নয়।)

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা॥১৫

অন্বয়: যেষাম্ (যাঁদের মতে); ফলং হেতোঃ আদিঃ (ফল [আবার] কারণেরও কারণ); হেতুঃ চ (কারণও); ফলস্য আদিঃ (ফলের কারণ); তেষাম্ (তাঁরা বলতে চান); পুত্রাৎ পিতুঃ জন্ম যথা তথা জন্ম ভবেৎ (পুত্রের থেকে পিতার জন্মের মতোই তাঁদের সৃষ্টির ব্যাখ্যা [যা নিতান্তই উদ্ভট])।

সরলার্থ: দ্বৈতবাদীদের মতে ফলই (অর্থাৎ কার্যই) হেতুর (অর্থাৎ কারণের) কারণ, এবং হেতুও (কারণও) আবার ফলের (অর্থাৎ কার্যের) কারণ। তাঁদের মতে উৎপত্তি অনেকটা পুত্রের থেকে পিতার জন্মের মতো—যা নেহাতই উদ্ভট।

সম্ভবে হেতুফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ॥১৬

অন্বয়: হেতু-ফলয়োঃ সম্ভবে (কার্য-কারণের উৎপত্তি বিষয়ে); ত্বয়া ক্রমঃ এষিতব্যঃ (তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে যে পরম্পরা আছে); যস্মাৎ (কারণ); যুগপৎ সম্ভবে (যদি উভয়েরই উৎপত্তি একসঙ্গে হয়); বিষাণবৎ অসম্বন্ধঃ (পরস্পরের সঙ্গে সংযোগহীন দুটো শিং যেমন একই সঙ্গে বেরোয় সেইরকম)।

সরলার্থ: তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে কার্য-কারণের মধ্যে একটা পরম্পরা আছে (কারণ আগে আসে কার্য পরে)। কারণ যদি উভয়ের উৎপত্তি একইসঙ্গে হয় তা হবে পরস্পর সংযোগহীন দুটো শিংয়ের একসঙ্গে বেরোনোর মতো। অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক সেখানে সিদ্ধ হয় না।

ব্যাখ্যা: খরগোশের শিং নেই একথা সবাই জানে। যদি বলা হয় খরগোশের শিং থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হয়েছে তবে তা হবে অবিশ্বাস্য। কারণ না থাকলে কার্যও থাকতে পারে না। প্রথমে কারণ থাকতেই হবে, কার্য তাকে অনুসরণ করবে। আবার কার্য না থাকলে সেই কার্যের কারণে পরিণত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যদি খরগোশের শিংই না থাকে, তবে সেই শিং নিশ্চয়ই কোন কার্যের কারণ হতে পারে না।

কার্য-কারণ তত্ত্ব দুরূহ যেহেতু কার্য হতে গেলে কারণ থাকতেই হবে। কারণের অস্তিত্বে সংশয় থাকলে কার্যের অস্তিত্ব স্বতই বাতিল হয়ে যায়।

ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন্ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি॥১৭

অন্বয়: তে (তোমার মতে); হেতুঃ (কারণ); ফলাৎ (কার্য থেকে); উৎপদ্যমানঃ সন্ (জন্মায়); ন প্রসিধ্যতি (প্রমাণ করে না যে এটা কারণ); অপ্রসিদ্ধঃ হেতুঃ (কারণ যদি কারণ হিসেবে প্রমাণিত না হয়); কথং ফলম্ উৎপাদয়িষ্যতি (তবে তা কেমন করে কার্য উৎপন্ন করবে?)।

সরলার্থ: দ্বৈতবাদীরা বলেন যে কারণ কার্যে পরিণত হয় এবং কার্যও পরে কারণে পরিণত হয়। একথা যদি সত্য হয়, তবে কারণ আর কারণ থাকে না, যেহেতু কারণ এখানে কার্যের উপর নির্ভরশীল। এইভাবে কারণ যদি কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা কার্য উৎপাদন কিভাবে করতে পারে?

যদি হেতোঃ ফলাৎসিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎ পূর্বনিষ্পন্নং যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া॥১৮

অন্বয়: ফলাৎ যদি হেতোঃ সিদ্ধিঃ (যদি কার্য থেকে কারণ হয়); হেতুতঃ চ অপি ফলসিদ্ধিঃ (এবং কারণ থেকে কার্য হয়); কতরৎ পূর্বনিষ্পন্নম্ (দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে এসেছে); যস্য অপেক্ষয়া (যার সাহায্যে); [উত্তরস্য ফলস্য] সিদ্ধিঃ (পরের কার্যটি ঘটে থাকে)।

সরলার্থ: কারণ যদি কার্য থেকে আসে এবং কার্যও আসে কারণ থেকে তবে কোন্‌টি আগে এসে অপরটিকে পরে ঘটতে সাহায্য করেছে?

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা॥১৯

অন্বয়: অশক্তিঃ ([যদি] এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পার [তার অর্থ হবে]); অপরিজ্ঞানম্ (তোমার অজ্ঞতা); অথবা (বা [যদি তুমি স্বীকার কর]); ক্রমকোপঃ (একটি অপরটিকে অনুসরণ করবে এমন নয় [কারণ উভয়েই যুগপৎ উপস্থিত]); পুনঃ (তবুও); এবং হি (এইভাবে); সর্বথা (প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে); বুদ্ধৈঃ (প্রজ্ঞাবানের দ্বারা); অজাতিঃ (জন্ম না হওয়া); পরিদীপিতা (স্পষ্টতই প্রমাণিত)।
সরলার্থ: যদি তোমরা (দ্বৈতবাদীরা) এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পার, তবে তা তোমাদের অজ্ঞতাই প্রমাণ করবে। যদি বল একযোগে কারণ ও কার্যের উৎপত্তি হয়, তার অর্থ হল কার্য-কারণ-পরম্পরা সম্পর্কে তোমাদের মত তোমরা নিজেরাই খণ্ডন করছ। এইভাবে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা সব দিক থেকে বিচার করে উৎপত্তির ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন।

বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে॥২০

অন্বয়: বীজাঙ্কুরাখ্যঃ দৃষ্টান্তঃ (বীজ ও চারাগাছের দৃষ্টান্ত); সঃ হি (সেই [দৃষ্টান্ত]); সাধ্যসমঃ (একটি তত্ত্ব বা মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয় [অর্থাৎ প্রমাণ-সাপেক্ষ]); সাধ্যসমঃ হেতুঃ (কারণ সেই তথাকথিত উপমাটি এখনও একটি মতবাদ মাত্র); সাধ্যস্য সিদ্ধৌ ন হি যুজ্যতে (প্রমাণ হিসেবে প্রযোজ্য হতে পারে না [অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক অনাদি—এই মতের প্রমাণ হতে পারে না])।
সরলার্থ: বীজ ও চারাগাছের দৃষ্টান্তটি এখনও মতবাদের স্তরে (অর্থাৎ প্রক্রিয়াটির অনাদিত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি)। যেহেতু দৃষ্টান্তটি এখনও প্রমাণসাপেক্ষ, সেহেতু সেটিকে অন্য মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করা যায় না।
ব্যাখ্যা: কার্য-কারণ প্রক্রিয়াটি অনাদি কিনা—এইটিই প্রশ্ন। কারও কারও মতে অনাদি। তাঁদের মতে কারণ কার্যে এবং কার্য কারণে পরিণত হয়। আর এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

এর কোনও শুরু নেই।

কার্য কারণে পরিণত হতে পারে—এই ধারণাকে বেদান্তবাদীরা বিদ্রূপ করে প্রশ্ন করেন : এর অর্থ কি এই যে পিতা নিজ পুত্রের পুত্র হতে পারেন? অথবা খরগোশের দুটি শিংয়ের মতো কার্য ও কারণ অসংলগ্নভাবে একই সময়ে উৎপন্ন হয়?

দ্বৈতবাদীরা উত্তরে বলেন: 'কারণ যে কার্যে পরিণত হয় তাতো দেখাই যায়! এই প্রক্রিয়া অনাদি।' বেদান্তবাদীরা এই প্রসঙ্গে একমত নন। তাঁরা বলেন : যখন বীজ থেকে চারাগাছ জন্মাচ্ছে, তখনি সেই নতুন চারাগাছের সূচনা হল বলতে হবে। অনুরূপভাবে যখন বীজের উৎপত্তি হয় তখন সেটিই বীজের সূচনা। অর্থাৎ প্রতিবারই যখন একটি বীজ উৎপন্ন হয় তখন সেটি একটি নতুন বীজ। চারাগাছ সম্পর্কেও একই কথা প্রয়োজন। সুতরাং কার্য ও কারণ উভয়েরই আদি আছে।

দ্বৈতবাদীরা বলতে পারেন: ভালো কথা। ধরা যাক, কার্য ও কারণ উভয়েরই আদি আছে। কিন্তু কারণের কার্য উৎপাদন প্রক্রিয়াটি যে অনাদি তা কিভাবে অস্বীকার করা যায়? এই প্রক্রিয়া অবশ্যই চিরন্তন।

বেদান্তবাদীদের উত্তর—একথা বলে তুমি আবার একটা নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করছ—কারণ থেকে কার্য। বস্তুত তুমি বিষয়টি আরও জটিল করে তুলছ। একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তুমি অন্য আর একটি মতবাদের অবতারণা করছ— যে মতবাদের নিজেরই কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই।

পূর্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্মাৎ কথং পূর্বং ন গৃহ্যতে॥২১

অন্বয়: পূর্বাপরাপরিজ্ঞানম্ (কোন্‌টা কারণ [পূর্ব] কোন্‌টা কার্য [অপর] সে-বিষয়ে অজ্ঞতা); অজাতেঃ (যার জন্ম নেই তার); পরিদীপকম্ (সাক্ষ্যপ্রমাণ); হি (যদি); জায়মানাৎ ধর্মাৎ (যা জন্মগ্রহণ করল তার থেকে); পূর্বম (এর কারণ [যা পূর্ববর্তী]); কথম্ (কেন); ন গৃহ্যতে (জানা যাবে না [সুতরাং কিছুরই জন্ম হয় না])।

সরলার্থ: যদি কারণ ও কার্য না জানা যায়, তবে তাই প্রমাণ করে যে কিছুই জন্মায় না। যদি সত্যিই কিছুর জন্ম হয়, তবে তার কারণ (উৎস) অজ্ঞাত হওয়ার পেছনে কোন যুক্তিই নেই।

ব্যাখ্যা: বেদান্তবাদীরা বলতে চান আত্মাই একমাত্র আছেন। চতুর্দিকে যে বৈচিত্র আমরা দেখি তা আত্মার উপরে নাম-রূপের আরোপমাত্র—যেমন অন্ধকার রাত্রে দড়িকে আমরা

সাপ বলে ভুল করি।

স্বতো বা পরতো বাঽপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে।
সদসৎ সদসদ্বাঽপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে॥২২

অন্বয়: স্বতঃ (স্বতন্ত্রভাবে); বা পরতঃ (অথবা কারও মাধ্যমে); কিঞ্চিৎ বস্তু ন জায়তে (কোন বস্তুই জন্মগ্রহণ করে না); সৎ (যার অস্তিত্ব আছে [যেমন—এই জগৎ]); অসৎ (যার অস্তিত্ব নেই [যেমন আকাশকুসুম]); সৎ-অসৎ (একাধারে সত্যও বটে আবার অসত্যও বটে); কিঞ্চিৎ বস্তু ন জায়তে (কোন রূপের কোন বস্তুরই জন্ম হয় না)।

সরলার্থ: স্বতন্ত্রভাবেই হোক বা কারও মাধ্যমেই হোক, কোন কিছুরই জন্ম হয় না। কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক, অথবা যার অস্তিত্ব আছেও বটে আবার নেইও বটে—যাই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই কোন বস্তুর জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা: বেদান্ত জন্মের ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। যেমন, কোন কিছুই আপনা-আপনি জন্মায় না। ঘট কখনো নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। অনুরূপভাবে ঘট একটি বস্ত্রখণ্ড বা অন্য কিছু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে না। আবার একটি বস্ত্রখণ্ড ও ঘট একযোগেও আর একটি ঘট বা আর একটি বস্ত্রখণ্ড উৎপন্ন করতে পারে না।

পরবর্তী প্রশ্নটি হল: যা আছে তার কি আবার জন্ম হতে পারে? প্রশ্নটি হাস্যকর। কারণ একটি বস্তু যদি ইতিপূর্বেই থেকে থাকে তবে তা আবার জন্মাতে যাবে কেন? আবার যার আদৌ অস্তিত্বই নেই তা কি জন্মাতে পারে? এ তো খরগোশের শিং হতে পারে কিনা সেইরকম প্রশ্ন। স্পষ্টতই উত্তর হল—না, পারে না।

আর একটি প্রশ্ন হল কোন বস্তু, যার একাধারে অস্তিত্ব আছে এবং নেই সে কি জন্মাতে পারে? প্রশ্নটিই উদ্ভট কারণ এরকম বস্তু কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আমরা বলি মাটি দিয়ে ঘট তৈরি হয় এবং পিতা পুত্রের জন্ম দেয়। কিন্তু 'ঘট' এবং 'পুত্র' শব্দে কোন আকার বা রূপকে বোঝায়, সত্যবস্তুকে নয়। সোনা দিয়ে গলার হার, বালা, কানের দুল প্রভৃতি গড়তে পারি। একই সোনা রূপ পালটাচ্ছে। আবার হার থেকে বালা, বালা থেকে কানের দুল তৈরি হতে পারে, কিন্তু সোনা সোনাই থাকে। বিবেকী ব্যক্তি আসল বস্তু ও তার বিভিন্ন আকারের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন। রূপ বদলায়, কিন্তু বস্তুটি একই থাকে।

বেদান্তমতে এই 'বস্তু'টিই হল আত্মা—যা অপরিবর্তনীয় এবং অদ্বিতীয়। আমরা যত রূপ দেখি সে সবই আত্মার উপর আরোপিত উপাধিমাত্র—যেমনভাবে সাপ রজ্জুর উপর

আরোপিত। এই আরোপ সত্ত্বেও আত্মা আত্মাই থাকেন। বিভিন্ন নাম-রূপের প্রভাবে এক আত্মাই বহু রূপে প্রতিভাত হন।

হেতুর্ন জায়তেঽনাদেঃ ফলং চাপি স্বভাবতঃ।
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য হ্যাদির্ন বিদ্যতে॥২৩

অন্বয়: অনাদেঃ (যদি অনাদি বলে কিছু থাকে); হেতুঃ ন জায়তে (তার কোন কারণ থাকে না); ফলং চ (কার্যও); স্বভাবতঃ অপি (অনুরূপভাবে কারণ না থাকলে [কার্য হয় না]); যস্য আদিঃ ন বিদ্যতে (যদি কারণ ছাড়া কিছু থাকে); তস্য হি আদিঃ ন এব বিদ্যতে ([তবে সিদ্ধান্ত এই যে] এরকম বস্তুর জন্ম নেই)।
সরলার্থ: কোন কিছুর যদি আরম্ভ না থাকে, তাহলে তার কারণও থাকে না। একইভাবে কারণ ছাড়া কার্যও উৎপন্ন হয় না। আবার যদি কারণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে তবে সেই বস্তুর জন্মই হয়নি।
ব্যাখ্যা: যদি কার্য ও কারণ উভয়ই অনাদি হয় তবে কার্যও থাকে না, কারণও থাকে না। অনাদি কার্য আর একটি বস্তুর কারণ হতে পারে না। একইভাবে অনাদি কারণ কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। সুতরাং কার্য ও কারণ উভয়ই যদি অনাদি হয় তবে কোন কিছুরই জন্ম হয় না।

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্যথা দ্বয়নাশতঃ।
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা॥২৪

অন্বয়: প্রজ্ঞপ্তেঃ (যখনি আমরা কিছু অনুভব করি [যেমন একটি শব্দ শুনলাম]); সনিমিত্তত্বম্ (সেই অনুভবের পেছনে অবশ্যই কোন কারণ থাকবে [এটি অবশ্যস্বীকার্য]); অন্যথা (অন্যথায় [যদি এটি কারণ বস্তু ছাড়াই ঘটে থাকে]); দ্বয়নাশতঃ (এর অর্থ দৃশ্যজগতে দুই বলে কিছু নেই); সংক্লেশস্য উপলব্ধেঃ চ (যন্ত্রণার অনুভূতি [কোন কিছু দ্বারা উৎপন্ন হয়—যেমন আগুন এবং এই যন্ত্রণার অনুভূতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়]); পরতন্ত্রাস্তিতা মতা (এই বাহ্যবস্তুর উপস্থিতি দ্বৈতবাদীদের শাস্ত্রীয় বক্তব্যকে সমর্থন করে)।
সরলার্থ: যখনি আমাদের কোন ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা হয় তখন অবশ্যই তার পেছনে কোন কারণ আছে। একথা স্বীকার না করার অর্থ হল, এ দৃশ্যজগতে যে দুই আছে তা অস্বীকার করছি। কিন্তু যন্ত্রণার অনুভূতি তো সবার হয়। সেক্ষেত্রে বাইরের কোন বস্তু আমাদের

আঘাত করলে তবেই সেই অনুভূতি হয়ে থাকে। এই দুয়ের উপস্থিতিই দ্বৈতবাদী শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়।

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ॥২৫

অন্বয়: যুক্তিদর্শনাৎ (যেহেতু যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা আছে [সেহেতু দ্বৈতবাদী]); প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বম্ (সকল উপলব্ধির পেছনে একটি বস্তুর উপস্থিতি); ইষ্যতে (দাবি করে [আমরা অদ্বৈতবাদীরা]); ভূতদর্শনাৎ (একই আত্মাকে সর্বত্র বিরাজিত দেখি); নিমিত্তস্য অনিমিত্তত্বম্ (বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার জন্য বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন নেই); ইষ্যতে (আমরা দেখি)।

সরলার্থ: (অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীকে বলছেন) তুমি বলতে চাইছ যেহেতু যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা আছে সেহেতু সেই যন্ত্রণার কারণও থাকবে। আমাদের বক্তব্য এই—যেহেতু আত্মা সর্বত্র আছেন, সবকিছুর ভিতরেও আছেন বাইরেও আছেন সেহেতু কোন অভিজ্ঞতার জন্য বাইরের বস্তুর প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীরা বলেন: যদি তুমি যন্ত্রণা বোধ কর তবে সেই যন্ত্রণার নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকবে। ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার জন্য বাহ্যবস্তুর একান্ত প্রয়োজন—যেমন আগুন বা অন্য কোন আঘাতে আমাদের যন্ত্রণার অনুভূতি হয়। আমরা বহু বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন: জগতে একটিই মাত্র অস্তিত্ব আছে। তা হল আত্মা। এই আত্মাকেই নানা নামে নানা রূপে দেখা যায়। এই নাম-রূপ উপাধিমাত্র। সুতরাং এগুলি সত্য নয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়—যদি দড়ি বলে বুঝতে পারি তাহলে সাপের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। যেমন নানারকমের মাটির পাত্র রয়েছে—থালা, পেয়ালা ইত্যাদি। যদি জানি সেগুলি মাটির তৈরি তাহলে আমার কাছে ওগুলি মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ আমার কাছে মানুষ আর মোষের মধ্যে যতটা তফাত, মাটির থালা আর পেয়ালার মধ্যে ততটা নয়। একইভাবে তুলোর তৈরি কিছু জিনিস নাম-রূপে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমার কাছে সেগুলি সবই তুলো।

দ্বৈতবাদীরা তর্ক করতে পারেন: পৃথক বস্তুর অনুভূতিও পৃথক হয়। যেমন কোন বস্তু আমার পক্ষে বেদনাদায়ক, কোনটা বা সুখপ্রদ। সুতরাং মানতেই হবে বাইরে নানা বস্তু রয়েছে এবং সেগুলিকে আমরা নানাভাবে অনুভব করি।

উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন: এর দ্বারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বাইরে যাই দেখ বা অনুভব কর না কেন আত্মাই একমাত্র আছেন। যেমন স্বপ্নে অনেকরকম বস্তু দেখা

যায়—তার কিছু ভালো আর কিছু মন্দ। কিন্তু সেগুলি কি সত্য? সেগুলির কি কোন অস্তিত্ব আছে? না, আত্মা ছাড়া আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই আত্মাকেই উপলব্ধি করি।

চিত্তং ন সংস্পৃশত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ।
অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্॥২৬

অন্বয়: [অতএব] চিত্তম্ (মন); অর্থম্ (বাহ্যবস্তু); ন সংস্পৃশতি (কোন সংযোগ নেই); ন অর্থাভাসং চ তথা এব (একইভাবে যে বস্তুগুলি সে দেখছে বলে কল্পনা করছে সেগুলি যে তার নিজেরই মনগড়া এ-ব্যাপারে সে সচেতন নয়); যতঃ (সেইজন্য); অর্থঃ (বাহ্যবস্তু); অভূতঃ হি (যথার্থই কোন অস্তিত্ব নেই); অর্থাভাসঃ চ (যেসব বস্তু দেখছে বলে মন কল্পনা করে); ততঃ পৃথক্ ন (সেগুলি মন থেকে পৃথক নয়)।
সরলার্থ: সুতরাং বাইরের কোন বস্তুর সঙ্গে মনের কোন যোগ ঘটে না। যদি মন ভাবে যোগ ঘটছে, তবে তা তার কল্পনা—যদিও একথা মন জানে না। তাই বাইরে যা দেখছি তার অস্তিত্ব নেই, তা কল্পনা, মনের বাইরের কোন বস্তু নয়।
ব্যাখ্যা: বাইরে কিছু নেই। আমাদের যদি মনে হয় বাইরে কি একটা আছে, আসলে কিছুই নেই। স্বপ্নে যেমন, বাইরেও তেমনি নানা জিনিস দেখা যায়। এ দেখা দেখা নয়। বাইরেই দেখি বা মনের মধ্যেই দেখি—সবই মনের সৃষ্টি মাত্র।

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বসু ত্রিষু।
অনিমিত্তো বিপর্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি॥২৭

অন্বয়: চিত্তম্ (মন); ত্রিষু অধ্বসু (তিনকালে [অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ]); সদা নিমিত্তং ন সংস্পৃশতি (বাহ্যবস্তুর সঙ্গে কখনো সংযোগ হয়নি); [যদি তাই হয়] তস্য কথম্ অনিমিত্তঃ বিপর্যাসঃ ভবিষ্যতি (যার অস্তিত্ব নেই সেই বাহ্যবস্তুর অনুভব মন কিভাবে করতে পারে?)।
সরলার্থ: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—কোন কালেই মনের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কোন সংযোগ নেই। যেহেতু মনের বাইরে কোনও বস্তু নেই সেহেতু অস্তিত্বহীন বস্তুর মিথ্যা অনুভবই বা কিভাবে হতে পারে?
ব্যাখ্যা: জ্ঞান বস্তু নিরপেক্ষ; শাশ্বত ও চিরন্তন। জ্ঞানই নিত্য।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে মন কখনো বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসে না কারণ এসব বাহ্যবস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই। তাহলে প্রশ্ন হল যদি ইতিপূর্বেই মনের সঙ্গে বস্তুর প্রত্যক্ষ যোগ না হয়ে থাকে, তবে একটা ঘট বা সাপকে দেখে মন তাদের কি করে চিনতে পারে?

এইখানেই মনের বিশেষত্ব। যদিও বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, মন নিজের ভিতরে বস্তু সৃষ্টি করে বাইরে আরোপ করে। সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। এই অবিদ্যাই একের উপর বহু আরোপ করে। জ্ঞান হলে এই দ্বৈতদৃষ্টি মুছে যায়।

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে।
তস্য পশ্যন্তি যে জাতিং খে বৈ পশ্যন্তি তে পদম্॥২৮

অন্বয়: তস্মাৎ (সুতরাং); চিত্তং ন জায়তে (মনের জন্ম নেই); চিত্তদৃশ্যম্ (বাহ্যবস্তু); ন জায়তে (জন্মায় না); যে (যাঁরা); তস্য জাতিং পশ্যন্তি (বিশ্বাস করেন যে তাঁরা জন্মান); তে (এমন লোকেরা); বৈ (নিশ্চিতভাবে); খে পদং পশ্যন্তি (আকাশে [পাখীদের] পায়ের ছাপ দেখতে পান [অর্থাৎ যা অসম্ভব])।

সরলার্থ: (পূর্বোক্ত কারণে) মনের জন্ম নেই এবং বাহ্যবস্তুরও জন্ম নেই। যাঁরা বিশ্বাস করেন মনের জন্ম আছে, তাঁরা আকাশে পাখীদের পায়ের ছাপও দেখতে পান (অর্থাৎ যা অসম্ভব)।

ব্যাখ্যা: এক শ্রেণীর বৌদ্ধ (যথা বিজ্ঞানবাদী) বলেন যে মনের বাইরে কিছুই নেই। যা কিছু দেখতে পাওয়া যায় তা হল মনের সৃষ্টি। এই পর্যন্ত একমত হতে গৌড়পাদের কোনও অসুবিধে নেই।

কিন্তু এইসব ভাববাদীরা আরও বলেন যে, সবকিছুই শূন্য, দুঃখময় এবং মন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতার কথা বলছেন কে? যিনি বলছেন তিনি কি করে বলতে পারেন যে জগৎ 'শূন্য'? দুঃখ আছে একথা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু দুঃখ তো নিত্য নয়। আবার যদি বলা হয় মন ক্ষণস্থায়ী তাহলে অবশ্যই একটা নিত্যবস্তু কিছু আছে যার তুলনায় মনকে ক্ষণিকের বলা যায়। সেই নিত্যবস্তুটি কি?

এইসব ব্যক্তিরা এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় তাঁরা আকাশে পাখির পায়ের ছাপ (অবাস্তব এবং অসম্ভব) দেখতে পান, আকাশটাকে যেন তাঁরা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছেন।

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ।

প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথংচিদ্ভবিষ্যতি॥২৯

অন্বয়: অজাতম্ (যার জন্ম নেই); যস্মাৎ জায়তে (যার থেকে উৎপত্তি); প্রকৃতিঃ অজাতিঃ (যা স্বভাবতই জন্মরহিত); ততঃ (অতএব); প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবঃ (সেই স্বভাব থেকে বিচ্যুতি); কথঞ্চিৎ ন ভবিষ্যতি (কোনও ভাবেই সম্ভব নয়)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম, যিনি স্বভাবত জন্মরহিত তাঁর থেকে মনের উৎপত্তি। এর ব্যতিক্রমের প্রশ্নই ওঠে না।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীরা বলেন—মনের জন্ম হয়। কিন্তু কিসের থেকে মনের এই জন্ম? ব্রহ্ম থেকে? কিন্তু ব্রহ্ম তো স্বরূপত জন্মহীন। যদি ব্রহ্মের জন্ম না থাকে তবে মনেরও জন্ম থাকতে পারে না। ব্রহ্মের যা স্বভাব মনেরও তাই হতে বাধ্য।

অনাদেরন্তবত্ত্বং চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥৩০

অন্বয়: অনাদেঃ সংসারস্য (যদি জগৎ অনাদি হয়); অন্তবত্ত্বং চ ন সেৎস্যতি (তবে এর অন্তও থাকতে পারে না); আদিমতঃ (যার শুরু আছে [যেমন আত্মজ্ঞান]); মোক্ষস্য অনন্ততা ন ভবিষ্যতি (মোক্ষ অন্তহীন হতে পারে না)।

সরলার্থ: যাঁরা বলেন জগৎ অনাদি তাঁদের এও স্বীকার করে নিতে হবে জগৎ অন্তহীনও বটে। অনুরূপভাবে যেহেতু মোক্ষ আত্মজ্ঞানের ফল (আর সেই কারণে তার আদি আছে), সুতরাং মোক্ষ চিরস্থায়ী হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীদের মতে, বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ই সত্য। অদ্বৈতবাদীরা এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা বলেন: 'যদি কোন বস্তুর আরম্ভ না থাকে তার শেষও থাকবে না। জগতে এর অন্যথা হতে পারে না।'

দ্বৈতবাদীদের উত্তর : কিন্তু বন্ধনের কোন শুরু নেই কিন্তু শেষ আছে। আত্মজ্ঞান হলে মোক্ষলাভ হয়; তখন বন্ধনের অবসান হয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন : মোক্ষের আদি থাকলে অন্ত অবশ্যই থাকবে। সেক্ষেত্রে একে আদৌ মোক্ষ বলা যাবে না।

উত্তরে দ্বৈতবাদীরা বলেন : মোক্ষের কোন অস্তিত্ব নেই, এ ভাঙা ঘটের মতো। অদ্বৈতবাদীরা তখন প্রশ্ন করেন : মোক্ষের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে কি তা খরগোশের শিংয়ের মতো? কিন্তু যার অস্তিত্বই নেই, অ-বস্তু, তার আবার আরম্ভ অর্থাৎ আদিই বা কি করে থাকতে পারে?

দ্বৈতবাদীরা তবু বলেন: বন্ধনের আদি না থাকলেও অন্ত আছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা বীজ-গাছ-বীজের দৃষ্টান্ত দেন। বীজ থেকেই গাছ হয়, আবার গাছ থেকে বীজ। এইভাবেই চলতে থাকে। কেউ জানে না কবে এর শুরু হয়েছিল। কোন বীজ না রেখে গাছটি মরে গেলে তবেই এই ধারায় ছেদ পড়ে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা উত্তরে বলবেন যে এই দৃষ্টান্ত এখানে যথাযথ নয়। কারণ প্রতিবারই যখন গাছ হয় তখন সেটি একটি নতুন গাছ এবং প্রতিবারই যখন বীজ উৎপন্ন হয় তখন সেটি একটি নতুন বীজ। সুতরাং এই ধারাকে কখনই অনাদি বলা চলে না।

সমস্যাটির একমাত্র সমাধান এই যে, বন্ধন কখনো ছিল না, কাজেই তার থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। একইসঙ্গে বলতে হয় মোক্ষের কোন শুরু নেই। মোক্ষ সবসময় হয়েই আছে।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥৩১

অন্বয়: যৎ (বস্তুটি); অদৌ (আবির্ভাবের আগে); অন্তে ন অস্তি (শেষ হয়ে গেলে দেখা যায় না); তৎ (বস্তুটি); বর্তমানে অপি (বর্তমানেও); তথা (এটি মিথ্যা); বিতথৈঃ সদৃশাঃ (মরীচিকার মতো দৃষ্টিভ্রম); সন্তঃ অবিতথাঃ ইব লক্ষিতাঃ (সত্য বলে মনে হয়)।
সরলার্থ: যদি এমন কোন বস্তু বর্তমানে থেকে থাকে, যা শুরুর আগেও ছিল না, আবার শেষ হয়ে গেলেও থাকবে না, তবে তাকে মিথ্যা বলেই ধরে নিতে হবে। মরীচিকার মতোই এও এক দৃষ্টিভ্রম—মনে হয় সত্য, কিন্তু আসলে সত্য নয়। যা সত্য তা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই তিনকালেই সত্য।

[কারিকাভাষ্য ২।৬ দ্রষ্টব্য]

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ॥৩২

অন্বয়: তেষাম্ (জাগ্রত অবস্থায় যেসব বস্তু দেখা যায়); সপ্রয়োজনতা (সেই অবস্থায় কিছু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে); স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে (স্বপ্নাবস্থায় সেই কাজে নাও লাগতে পারে); তস্মাৎ (সুতরাং); তে (জাগ্রত অবস্থায় দেখা বস্তুগুলি); আদ্যন্তবত্ত্বেন (শুরু ও শেষ আছে); মিথ্যৈব খলু [তে] স্মৃতাঃ (এইসব বস্তু অবশ্যই মিথ্যা)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় আমরা অনেক বস্তু দেখি যা আমাদের কাজে লাগে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় সেসব বস্তু হয়তো কোন কাজেই লাগে না। অর্থাৎ ঐসব বস্তুর শুরু ও শেষ দুই-ই আছে। এইসব বস্তু অবশ্যই মিথ্যা।

[কারিকাভাষ্য ২।৭ দ্রষ্টব্য]

সর্বে ধর্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর্নিদর্শনাৎ।
সংবৃতেঽস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ॥৩৩

অন্বয়: স্বপ্নে (স্বপ্নে); কায়স্য অন্তঃ (দেহের অভ্যন্তরে); নিদর্শনাৎ (যাকে তুমি সত্য বলে মনে কর); সর্বে ধর্মাঃ (সকল বাহ্যবস্তু); মৃষা (মিথ্যা হয়ে যায় [তাহলে]); অস্মিন্ সংবৃতে প্রদেশে (এই ব্রহ্মে, যিনি সর্বত্র অভিন্নভাবে রয়েছেন [চৈতন্য]); ভূতানাং দর্শনং বৈ (বস্তুসকলের উপলব্ধি); কুতঃ (কেন নয় [অর্থাৎ ভ্রম নয় কেন?])।

সরলার্থ: যখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি তখন দেহের অভ্যন্তরে নানা বস্তু দেখতে পাই। পরবর্তীকালে জাগ্রত অবস্থায় সেগুলি মিথ্যা হয়ে যায়, আর দেখা যায় না। এ যদি সম্ভব হয় তাহলে এক ও অভিন্ন ব্রহ্মে (যা শুদ্ধ চৈতন্য) আশ্রিত বস্তুসকলও কেন মিথ্যা হবে না?

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাদ্‌গতৌ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে॥৩৪

অন্বয়: গতৌ (নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো); কালস্য অনিয়মাৎ (কাল বলে কিছু নেই); গত্বা দর্শনং ন যুক্তম্ (এইসব স্থানে গিয়ে যে নানারকমের বস্তু দেখছ); বৈ (এই কারণে); সর্বঃ প্রতিবুদ্ধঃ (যারা ঘুম থেকে জেগে ওঠে); তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে (স্বপ্নে যেসব জায়গায় তারা ছিল, সেইসব জায়গায় আর নিজেদের দেখে না)।

সরলার্থ: আমরা স্বপ্নে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই এবং সেইসব জায়গায় নানা জিনিস দেখতে পাই। কিন্তু সেই সময়ে আমাদের সেখানে থাকা এবং নানা বস্তু দেখা শুধু সময়ের বিচারেই অসম্ভব বলে বোঝা যায়। এইজন্যই যখন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠি তখন সেইসব জায়গায় আর নিজেদের দেখা যায় না।

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য সংবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে।

গৃহীতং চাপি যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি॥৩৫

অন্বয়: [স্বপ্নে] মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য (মানুষ নিজেকে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে দেখতে পায়); সংবুদ্ধঃ (কিন্তু যখন তার ঘুম ভেঙে যায়); ন প্রপদ্যতে (সে আর তা খুঁজে পায় না); যৎ কিঞ্চিৎ গৃহীতং চ (সে স্বপ্নে যা কিছু পায়); প্রতিবুদ্ধঃ (যখন জেগে ওঠে); অপি ন পশ্যতি (আর দেখতে পায় না)।
সরলার্থ: স্বপ্নে আমরা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি দেখতে পাই। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে তা হারিয়ে যায়। আবার স্বপ্নে যা কিছু পাই জাগ্রত অবস্থায় সেগুলি আর দেখতে পাওয়া যায় না (যেমন স্বপ্নে হয়তো অনেক সোনা পেলাম, কিন্তু জেগে উঠে তা আর দেখা যায় না)।

স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্য দর্শনাৎ।
যথা কায়স্তথা সর্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তুকম্॥৩৬

অন্বয়: স্বপ্নে চ পৃথক্ অন্যস্য দর্শনাৎ (স্বপ্নে আমাদের মনে হয় যেন আর একটি দেহ আছে); কায়ঃ (সেই দেহ); অবস্তুকঃ (অবস্তু, অলীক); কায়ঃ যথা (ঠিক যেমন সেই দেহটি অলীক); তথা চিত্তদৃশ্যং সর্বম্ (যা কিছু আমরা স্বপ্নে দেখি); অবস্তুকম্ (অবস্তু, অলীক)।
সরলার্থ: স্বপ্নে আমরা অনুভব করি যেন আমাদের আর একটি শরীর আছে। সেই শরীর কিন্তু অবস্তু, অলীক। একইভাবে স্বপ্নে দেখা সব বস্তুও অবস্তু অর্থাৎ অলীক।
ব্যাখ্যা: আচার্য শঙ্কর এই বিতর্ককে আর একটু এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেন স্বপ্নে দেখা সব অভিজ্ঞতাই যেমন মিথ্যা, তেমনি জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাও মিথ্যা।

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্ধেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে।
তদ্ধেতুত্বাত্তু তস্যৈব সজ্জাগরিতমিষ্যতে॥৩৭

অন্বয়: জাগরিতবৎ (জাগ্রত অবস্থার মতো); গ্রহণাৎ (কার্য-কারণের অভিজ্ঞতা তোমার হয়); স্বপ্নঃ (স্বপ্নাবস্থা); তদ্ধেতুঃ (জাগ্রত অবস্থায় যেসব অভিজ্ঞতা হয় তার কার্য); ইষ্যতে (এই মনে করা হয়); তদ্ধেতুত্বাৎ তু (যেহেতু এটি জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার ফল); তস্য এব (যে স্বপ্ন দেখেছে কেবল তার কাছে); জাগরিতং সৎ [ইতি] ইষ্যতে (সত্য বলে গ্রহণযোগ্য)।

সরলার্থ: আমাদের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই। এইজন্যই বলা হয় আমাদের জাগ্রত অবস্থার নানা অভিজ্ঞতাই স্বপ্নে দেখা অভিজ্ঞতার কারণ। আমরা স্বপ্নে যা দেখি তা একান্তভাবে আমাদেরই। অন্যে এতে অংশ নিতে পারে না। আবার যেহেতু স্বপ্নের নানা অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থারই প্রতিফলন সেহেতু জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাও একান্তভাবে আমাদেরই। সেখানেও অপর কেউ অংশ নিতে পারে না। জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয়, তবে তা কেবলমাত্র আমার কাছেই সত্য, অন্যের কাছে নয়।

ব্যাখ্যা: জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাও যে মিথ্যা এইখানে সেকথাই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেন একথা বলা হচ্ছে? কারণ আমাদের স্বপ্ন জাগ্রতকালের অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব মাত্র। তাই আমাদের জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা স্বপ্নের নানা অভিজ্ঞতার কারণ। আমাদের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা একান্তভাবে আমাদেরই। আর কারও সেই অভিজ্ঞতা হয় না। আর যেহেতু স্বপ্ন জাগ্রতকালের অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি, সেহেতু স্বপ্নের মতোই জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাও একান্তভাবে আমাদের। তাতে অপর কারও অংশ নেই। জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা যদি সত্যও হয় তা কেবল নিজের কাছেই সত্য। যেহেতু তা সকলের কাছে সত্য নয়, অতএব তা আদপেই সত্য নয়।

উৎপাদয়াপ্রসিদ্ধত্বাদজং সর্বমুদাহৃতম্।
ন চ ভূতাদভূতস্য সংভবোঽস্তি কথঞ্চন॥৩৮

অন্বয়: উৎপাদস্য অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (বস্তুর উৎপত্তির কোন প্রমাণ না থাকায়); সর্বম্ অজম্ উদাহৃতম্ (সমগ্র জগৎকে অনাদি বলে বর্ণনা করা হয়); ভূতাৎ (শাশ্বত সত্য [ব্রহ্ম] থেকে); অভূতস্য কথঞ্চন সম্ভবঃ চ ন অস্তি (যা মিথ্যা তার উৎপত্তি হতে পারে না)।

সরলার্থ: বস্তুর উৎপত্তি না থাকায় সমগ্র জগৎকে অনাদি বলা হয়। বস্তুত নিত্য-সত্য (ব্রহ্ম) থেকে মিথ্যা অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই তার উৎপত্তি হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীরা বলেন: একথা সত্য যে জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাই স্বপ্নের কারণ, কিন্তু সেই কারণে জাগ্রতকালের অভিজ্ঞতাকেও অসত্য বলা চলে না। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা দ্রুত বদলায়। সেইজন্য তা অসত্য হতে পারে। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা স্থায়ী। অতএব জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মতোই মিথ্যা একথা ভাবা ঠিক নয়।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন: যদি তুমি বিবেকবান না হও, তবেই তুমি তোমার জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাকে সত্য বলে মনে করবে। কিন্তু যিনি যথার্থ বিবেকী (অর্থাৎ যিনি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর তফাত জানেন), তিনি জানেন এ জগতে কিছুরই উৎপত্তি হয়

না এবং সেইহেতু কিছুই সত্য নয়। একমাত্র আত্মাই সত্য। শাস্ত্র বলছেন: সমগ্র জগৎ আত্মার দ্বারা আচ্ছাদিত। আত্মা থেকে অনাত্ম বস্তুর যেমন খরখোশের শিংয়ের উৎপত্তি হয় না।

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ।
অসৎস্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি॥৩৯

অন্বয়: (মানুষ) জাগরিতে (জাগ্রত অবস্থায়); অসৎ দৃষ্ট্বা তন্ময়ঃ (অসৎ অর্থাৎ কাল্পনিক বস্তু দেখে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়); স্বপ্নে পশ্যতি (সে পরে সেইসব বস্তুকে স্বপ্নে দেখে); স্বপ্নে অপি অসৎ দৃষ্ট্বা (যদিও সে স্বপ্নে ঐ সব অসৎ বস্তু দেখে); প্রতিবুদ্ধঃ ন পশ্যতি (কিন্তু জেগে উঠে সে ঐ সব বস্তু আর দেখে না)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় মানুষ নানা অসৎ বস্তু দেখতে পারে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে সেগুলিকে আবার স্বপ্নেও দেখতে পায়। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে সেগুলি আর দেখে না।

ব্যাখ্যা: যদি জাগ্রত অবস্থায় আমাদের কোন অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিজ্ঞতা আবার স্বপ্নেও আমরা পেতে পারি। কিন্তু তার দ্বারা ঐ অভিজ্ঞতা চিরন্তন সত্য হয়ে ওঠে না। যেমন জাগ্রত অবস্থায় দড়িকে সাপ বলে ভুল করলে সেই সাপ আবার হয়তো স্বপ্নেও দেখতে পারি। কিন্তু তাতে সাপটি সত্য হয়ে উঠবে না।

নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসৎসদসদ্ধেতুকং তথা।
সচ্চ সদ্ধেতুকং নাস্তি সদ্ধেতুকমসৎকুতঃ॥৪০

অন্বয়: অসদ্ধেতুকম্ অসৎ ন অস্তি (অসৎ বস্তু [অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই] থেকে আর একটি অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না); তথা (অনুরূপভাবে); অসদ্ধেতুকং সৎ (অসৎ বস্তু থেকে কোন সৎ বস্তুর [অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে] উৎপত্তি হতে পারে না); সদ্ধেতুকং সৎ (যার অস্তিত্ব আছে [অর্থাৎ আপেক্ষিক অস্তিত্ব যেমন দড়িতে সাপের অস্তিত্ব] তার থেকে আর একটি অস্তিত্ববান [অর্থাৎ আরেকটি সাপ] বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না); সদ্ধেতুকম্ অসৎ কুতঃ (সুতরাং কোন সত্য বস্তু অর্থাৎ অস্তিত্ববান বস্তু থেকে কি করে অস্তিত্বহীন বা মিথ্যা বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে?)।

সরলার্থ: যার অস্তিত্ব নেই সেই বস্তু অপর এক অস্তিত্বহীন বা মিথ্যা বস্তু উৎপন্ন করতে পারে না। ঠিক তেমনি অস্তিত্বহীন বস্তু থেকে সৎ বস্তু অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে তার

উৎপত্তি হতে পারে না। অনুরূপভাবে, যার অস্তিত্ব আছে (অর্থাৎ আপেক্ষিক অস্তিত্ব যেমন দড়িতে সাপের অস্তিত্ব) সেইরকম বস্তু থেকে আর একটি অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু (অর্থাৎ আরেকটি সাপ) উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং কোন সত্য (অর্থাৎ অস্তিত্ববান) বস্তু থেকে কোন মিথ্যা (অর্থাৎ অস্তিত্বহীন) বস্তু কিভাবে হতে পারে?

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হচ্ছে কার্য-কারণ সম্পর্ক যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দুয়েরই বিরুদ্ধতা করে। শুরুতে বলা হয়েছে, অস্তিত্বহীন কোন বস্তু থেকে আর একটি অস্তিত্বহীন বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না। 'আকাশকুসুম' বা 'খরগোশের শিং'য়ের কোন অস্তিত্বই নেই। তাদের একটির থেকে অন্যটির কি উৎপত্তি হতে পারে? ঠিক তেমনি অস্তিত্বসম্পন্ন কোন বস্তু থেকে অপর কোন অস্তিত্ববান বস্তুরও উৎপত্তি সম্ভব নয়। এখানে অস্তিত্বসম্পন্ন বলতে বোঝাচ্ছে আপেক্ষিক অস্তিত্ব, যেমন দড়ির উপর সাপের অস্তিত্ব। এই সাপের থেকে কি আর একটি সাপের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব?

সুতরাং সত্য বস্তু অর্থাৎ অস্তিত্ববান কোন বস্তু থেকে মিথ্যা অর্থাৎ অস্তিত্বহীন কোন বস্তুর উৎপত্তি কোনভাবেই হতে পারে না।

বিপর্যাসাদ্যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ।
তথা স্বপ্নে বিপর্যাসাদ্ধর্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি॥৪১

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); বিপর্যাসাৎ (অজ্ঞানতার হেতু ভ্রান্তির কারণে); জাগ্রৎ-অচিন্ত্যান্ (জাগ্রত অবস্থায় যেসব অপরিচিত বস্তুসকল দেখে); ভূতবৎ স্পৃশেৎ (সত্য বলে মনে করে); তথা (সেইভাবে); স্বপ্নে (স্বপ্নে); বিপর্যাসাৎ (অবিদ্যাপ্রসূত ভুলের জন্য); তত্র এব (স্বপ্নেও); ধর্মান্ (বস্তুসকল); পশ্যতি (দেখে)।

সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় মানুষ নানা অপরিচিত বস্তু দেখে এবং অজ্ঞানতার হেতু সেগুলিকে সত্য বলে মনে করে। একই কারণে স্বপ্নেও সে বিভিন্ন বস্তু দেখে ও সত্য মনে করে। আসলে কিন্তু দুটির কোনটিই সত্য নয়।

ব্যাখ্যা: জাগ্রত অবস্থাতেও কখনো কখনো অদ্ভুত সব বস্তু দেখা যায়। লোকে যেমন অন্ধকারে দড়ির জায়গায় সাপ দেখে এবং তাকে সত্য বলে মনে করে। স্বপ্নেও একই রকম ঘটতে পারে। হয়তো স্বপ্নে ঘরের মধ্যে একটা হাতি দেখে তাকে সত্য বলে মনে হল। কিন্তু জেগে উঠে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় ঘরে হাতি থাকা অসম্ভব।

জাগ্রত অবস্থায় রজ্জুতে সর্পদর্শন এবং স্বপ্নে ঘরের ভিতর হাতি দেখা—এ দুটি অভিজ্ঞতাই মিথ্যা। অভিজ্ঞতা দুটির পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই স্বপ্নের এই অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নয়।

উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্।
জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্ত্রসতাং সদা॥৪২

অন্বয়: বুদ্ধৈঃ (প্রাজ্ঞ অদ্বৈতবাদীরা); তু (ও); উপলম্ভাৎ (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে); সমাচারাৎ (বর্ণাশ্রম অনুযায়ী আচরণ থেকে); অস্তি-বস্তুত্ববাদিনাম্ (যারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন); সদা অজাতেঃ এসতাম্ (জন্ম নেই একথা চিন্তা করতে ভয় পান); জাতিঃ (জন্মবাদ); দেশিতা (শেখানো হয়)।

সরলার্থ: কিছু মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ও প্রচলিত বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্ম করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে। জন্ম বলে কিছু নেই—একথা চিন্তা করতেও তাঁরা ভয় পান। এঁদের কাছে প্রাজ্ঞ অদ্বৈতবাদীরা জন্মের ব্যাপারে আপোষ করতে রাজি আছেন। কিন্তু বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তাঁরা সম্পূর্ণ আপোষহীন।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈতবাদীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। জন্ম বলে কিছু আছে এমন কথাও তাঁরা মানেন না। একথা শুনে দ্বৈতবাদীরা ভয় পেয়ে যান। তাঁদের কথা মনে রেখে অদ্বৈতবাদীরা কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম বা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা অনুমোদন করেছেন। যেমন, শাস্ত্রে এমন বাক্যও পাওয়া যায় 'ব্রহ্ম সবকিছুর উৎস'। স্থূলবুদ্ধি মানুষের জন্য এ একটি আপোষমাত্র কারণ অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করা তাদের পক্ষে দুরূহ।

কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য অদ্বৈতবাদীর আপোষহীন সিদ্ধান্ত— 'ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই।' জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই মনের সৃষ্টি।

অজাতেস্ত্রসতাং তেষামুপলম্ভাদ্বিয়ন্তি যে।
জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষোঽপ্যল্পো ভবিষ্যতি॥৪৩

অন্বয়: অজাতেঃ এসতাম্ (জন্ম নেই এই সত্যের মুখোমুখি হতে যাঁরা ভয় পান); তেষাম্ (তাঁদের [দ্বৈতবাদীদের] মধ্যে); যে (যাঁরা); উপলম্ভাৎ (বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে); বিয়ন্তি ([অদ্বৈতবাদের] বিরোধিতা করেন); জাতিদোষাঃ ন সেৎস্যন্তি (উৎপত্তি আছে এই

তত্ত্বে বিশ্বাসী [অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ও দ্বৈত উপাসনায় বিশ্বাসী] হওয়ায় তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না); দোষঃ অপি অল্পঃ ভবিষ্যতি (এটি ভুল হতে পারে, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক নয়)।

সরলার্থ: কোন কিছুই জন্মায় না—এই সত্যের মুখোমুখি হতে যাঁরা (দ্বৈতবাদীরা) ভয় পান তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করেন কারণ তাঁরা সর্বত্র দুই দেখেন। এঁরা দ্বৈত উপাসনাও করে থাকেন। এটি ভুল হতে পারে কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ভুল নয় (কারণ তাঁরা সৎ ও অকপট এবং কালে তাঁরা অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করতে সক্ষম হবেন)।

ব্যাখ্যা: দ্বৈতবাদীদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা দ্বৈতবাদকে নির্বিচারে গ্রহণ করেন। তাঁদের মনোভাবের কখনো পরিবর্তন হয় না। আবার কিছু দ্বৈতবাদী আছেন যাঁদের কাছে অদ্বৈততত্ত্ব যুক্তিগ্রাহ্য নয় কারণ তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিপরীত কথাই বলে। এঁরা সত্যকে প্রকৃতই জানতে চান। তাঁরা অকপট ও আন্তরিক এবং সাধুজীবন যাপন করেন। কালে তাঁরা অদ্বৈতবাদ মেনে নেবেন। এই মুহূর্তে যে তাঁরা অদ্বৈততত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছেন না এটি তাঁদের ত্রুটি ঠিকই, কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়।

উপলম্ভাৎসমাচারান্মায়াহস্তী যথোচ্যতে।
উপলম্ভাৎসমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে॥৪৪

অন্বয়: উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সেই অনুরূপ ঘটনাবলী থেকে [সবই দ্বৈতের কার্য]); মায়াহস্তী (যাদুকরের দেখানো মায়া হাতি); যথা উচ্যতে (নির্বোধ ব্যক্তিরা সত্য বলে মনে করেন); তথা (ঠিক তেমনি); উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যেসব ঘটনাবলী সেই অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে তার থেকে); বস্তু অস্তি উচ্যতে ([লোকে] বলেন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে)।

সরলার্থ ও ব্যাখ্যা: অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা যাদুকরের দেখানো মায়া-হাতিকে সত্য বলে মনে করেন, কারণ এর সঙ্গে তাঁদের দ্বৈতচিন্তা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন বিরোধ নেই। একইভাবে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেই অনুরূপ ঘটনাবলী থেকে তাঁদের মনে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কেও কোন সন্দেহ থাকে না।

এই প্রত্যক্ষ দেখা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই দ্বৈতবাদীরা দাবি করেন যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে। তাঁরা নানারকমের বস্তু দেখেন এবং সেইসব বস্তুর নানা ব্যবহার লক্ষ্য করে সেগুলিকে সত্য বলে স্থির করেন।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন: তোমাদের যে ভুল হচ্ছে না একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ধর, জাদুখেলা দেখছ। জাদুকর সেখানে মায়া-হাতির খেলা দেখাচ্ছে। হাতিটির আচরণ

জীবন্ত হাতিরই মতো। সেটা দেখতে দেখতে আমরা বিশ্বাস করি সেটা সত্য। কিন্তু আসলে তা সত্য নয়, জাদুকরের সৃষ্টি।

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।
অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্॥৪৫

অন্বয়: জাত্যাভাসম্ (জন্ম হয়নি কিন্তু হয়েছে বলে মনে হয়); চলাভাসম্ (আপাতদৃষ্টিতে সক্রিয়); তথা এব বস্ত্বাভাসম্ (অনুরূপভাবে সত্য বলে মনে হয়); চ (ও); বিজ্ঞানম্ (চৈতন্য); অজাচলম্ (জন্ম নেই এবং নিষ্ক্রিয়); অবস্তুত্বম্ (বস্তু নয় [সুতরাং]); শান্তম্ (অখণ্ড); অদ্বয়ম্ (অদ্বৈত, দুই নেই)।

সরলার্থ: শুদ্ধ চৈতন্য হয়েও মনে হয় যেন তাঁর জন্ম হয়েছে। তিনি সক্রিয় এবং জড়বস্তুরূপে প্রতিভাত হন। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য অনাদি, নিষ্ক্রিয় এবং আদৌ জড়বস্তুর মতো নন। তিনি অখণ্ড এবং অদ্বয়।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈতবাদীর মতে এই জগতে কিছুই সত্য নয়। সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা। তাহলে সত্য কি? সত্য হল শুদ্ধ চৈতন্য। এই চৈতন্যকে বর্ণনা করা যায় না। তিনি অনন্য, এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বলতে হয় 'তিনি যা তিনি তাই'। এই চৈতন্যই আমাদের আত্মা।

এই চৈতন্যের জন্ম হয় না, তবু মনে হয় যেন জন্ম হয়েছে। যেমন, একটি বালকের জন্ম হল, তার নাম দেওয়া হল দেবদত্ত। কিন্তু আসলে দেবদত্তের জন্ম হয়নি। শুদ্ধ চৈতন্য এখানে দেবদত্তরূপে জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ লোকে মনে করে তার জন্ম হয়েছে। আসলে এর জন্ম জাদুকরের মায়া-হাতির জন্মের মতো। কিছুদিন পরেই দেখছি দেবদত্ত চলেফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে চলছে? দেবদত্তরূপে শুদ্ধ চৈতন্যই চলেফিরে বেড়াচ্ছে। এরপর দেবদত্ত বড় হয়েছে। সে একজন দীর্ঘদেহী যুবক। কে এভাবে বড় হয়ে উঠল? এও সেই একই শুদ্ধ চৈতন্য। আসলে কিন্তু এই চৈতন্যের কোন পরিবর্তনই হয়নি, যা ছিল তাই আছে। কেবলমাত্র দেবদত্তের পরিবর্তনগুলি এই শুদ্ধ চৈতন্যের উপর আরোপিত হয়েছে। এই হল মায়ার কার্য।

এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্মা অজাঃ স্মৃতাঃ।
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্যয়ে॥৪৬

অন্বয়: এবম্ (উল্লিখিত কারণে); চিত্তম্ (মন [অর্থাৎ মনরূপে চৈতন্য]); ন জায়তে (কখনো জন্মায় না); এবম্ (একই কারণে); ধর্মাঃ (জীবাত্মাসকল [বিভিন্ন নাম এবং রূপে প্রতিভাত চৈতন্য]); অজাঃ স্মৃতাঃ ([আত্মজ্ঞ] জানেন কারোরই জন্ম হয়নি); এবম্ এব বিজানন্তঃ (যাঁরা একথা নিশ্চিতরূপে জানেন); বিপর্যয়ে ন পতন্তি (আর ভুল করেন না)।

সরলার্থ: এতক্ষণ যা বলা হল তার থেকে বোঝা যাচ্ছে মন (অর্থাৎ মনরূপে অনুভূত শুদ্ধ চৈতন্য) কখনো জন্মগ্রহণ করে না। একইভাবে জীবাত্মারও (বিভিন্ন নাম-রূপে প্রতিভাত শুদ্ধ চৈতন্যের) জন্ম হয় না (আত্মজ্ঞের দৃষ্টিতে)। যাঁরা এই সত্য জেনেছেন তাঁদের আর কখনো ভুল হয় না (অর্থাৎ তাঁরা আর অবিদ্যায় মুগ্ধ হন না)।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈতবাদীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল শুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র সত্য এবং সেই সত্য অনাদি এবং অনন্ত। কিন্তু আমরা যে চারপাশে নানারকম বস্তু দেখি তাকে কি করে ব্যাখ্যা করব? এও সেই একই সত্য, কেবল বিভিন্ন নাম-রূপে প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। এই নাম-রূপের কারণেই সেগুলিকে পৃথক বলে মনে হয়। আসলে এক সত্য।

এই এক দেখাই জীবনের লক্ষ্য। যাঁরা এই একত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁরা আর অবিদ্যায় মুগ্ধ হন না।

ঋজুবক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা॥৪৭

অন্বয়: অলাতস্পন্দিতং যথা ঋজুবক্রাদিকাভাসম্ (একটি জ্বলন্ত মশালকে যদি ঘোরানো যায়, তার আলোর রেখা কখনো সোজা, কখনো বাঁকা, কখনো বা অন্য কিছু বলে মনে হয়); তথা বিজ্ঞানং স্পন্দিতম্ (সেইভাবে [অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে] চৈতন্যও [তাঁর নাম ও রূপ] বদলায়); গ্রহণগ্রাহকাভাসম্ (এই চৈতন্য কখনো জ্ঞাতা কখনো জ্ঞেয় [এবং কখনো কারণ, কখনো কার্য])।

সরলার্থ: একটি জ্বলন্ত মশালকে ঘোরালে তার আলোর রেখা কখনো সোজা, কখনো বাঁকা আবার কখনো বা অন্য কিছু বলে মনে হয় (যদিও প্রকৃতপক্ষে আলোকরশ্মি সবসময় সোজা)। ঠিক একইভাবে চৈতন্যের পরিবর্তনও প্রতিভাত হয়—একই চৈতন্য কখনো জ্ঞাতা, কখনো জ্ঞেয়, কখনো কারণ, কখনো কার্য (যদিও চৈতন্য সতত অপরিবর্তিত)।

ব্যাখ্যা: আলোর রেখা সবসময়ই সোজা। কিন্তু আলোর উৎসকে দ্রুত ঘোরালে আলোর রেখা অন্যরকম দেখায়। তার মানে এই নয় এর আকারের পরিবর্তন হচ্ছে। একইভাবে চৈতন্যেরও কখনো পরিবর্তন হয় না, অপরিবর্তিতই থাকে। কিন্তু যেহেতু এই চৈতন্য সব

বস্তুর মধ্যে নিহিত রয়েছে সুতরাং বিভিন্ন বস্তুরূপেই চৈতন্য প্রতিভাত হয়। শুধু তাই নয় বস্তুর পরিবর্তন হলে অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে বুঝি চৈতন্যের পরিবর্তন হচ্ছে। এইভাবে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি চৈতন্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। আসলে শুদ্ধ চৈতন্য এক ও অভিন্ন।

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা॥৪৮

অন্বয়: যথা (যেমন); অস্পন্দমানম্ অলাতম্ (মশালটি যদি ঘোরানো না হয়); অনাভাসম্ (দৃষ্টি আকর্ষণ করে না); অজম্ (যেন এটি সেখানে নেই); তথা (সেইভাবে); অস্পন্দমানং বিজ্ঞানম্ (যদি চৈতন্য অপ্রকাশিত হয়); অনাভাসম্ অজম্ (তখন তা ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, যেন এর আদৌ জন্মই হয়নি)।
সরলার্থ: যদি জ্বলন্ত মশালটি স্থির থাকে এটি কারও নজরে নাও পড়তে পারে (কারণ তখন এ একটি আলোকবিন্দু মাত্র)—মনে হয় যেন এর কোন অস্তিত্বই নেই। সেইভাবে চৈতন্যও যদি কোন না কোন রূপে প্রকাশিত না হন তাহলে তিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না। তখন তাঁর অস্তিত্ব নেই বলেই মনে হয়।
ব্যাখ্যা: বাতি যদি অচঞ্চল থাকে তবে তা দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। যেন বাতিটির আদৌ অস্তিত্ব নেই। সেইভাবে চৈতন্যও কখনো কখনো অপ্রকাশিত থাকতে পারে। তখন আর দুই থাকে না অর্থাৎ কোন নাম-রূপ থাকে না। যা থাকে তা শুধুই ব্রহ্ম, চৈতন্য বা আত্মা। তখন আর জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নেই, সেই এক ব্রহ্মই আছেন। তখনি সব অবিদ্যার অবসান হয়।

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে॥৪৯

অন্বয়: অলাতে স্পন্দমানে (যখন বাতিটি ঘোরানো হচ্ছে); অভাসাঃ ন বৈ অন্যতোভুবঃ (আকৃতিগুলি [ঋজু, বক্র ইত্যাদি যেরকম দেখা যায়] অন্য কোন উৎস থেকে আসে না); ততঃ নিস্পন্দাৎ (যখন বাতিটি থেকে যায় তার থেকে); অন্যত্র ন ([আকৃতিগুলি] অন্য কোথাও যায় না); তে অলাতং ন প্রবিশন্তি (সেগুলি বাতিতে ফিরেও আসে না)।
সরলার্থ: বাতিটি যখন ঘুরছে তখন যে আকৃতিগুলি দেখা যায় (সোজা অথবা বাঁকা) সেগুলি অবশ্যই বাতি ছাড়া অন্য কোনও উৎস থেকে আসেনি। অনুরূপভাবে, যখন

বাতিটির ঘোরা থেমে যায়, আকৃতিগুলি অন্যত্র চলে যায় না বা বাতিতেও ফিরে আসে না।
ব্যাখ্যা: যখন বাতিটি ঘোরানো হয় তখন নানা আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সেগুলিতে কোন বস্তু নেই, কাল্পনিক। ঠিক তেমনি যখন আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে তখন নানা নাম ও রূপ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি সবই কাল্পনিক। যখন আত্মার কোন প্রকাশ থাকে না অর্থাৎ দুই থাকে না তখনি আত্মাকে স্বরূপে জানা যায়—অর্থাৎ তখনি আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

ন নির্গতা অলাতাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ॥৫০

অন্বয়: তে (ঐসব আকৃতি); দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (যেহেতু সেগুলি কাল্পনিক, বস্তু নয়); অলাতাৎ ন নির্গতাঃ (বাতি থেকে আসতে পারে না [অর্থাৎ যা বস্তু নয়, কাল্পনিক তা নড়াচড়া করতে পারে না]); আভাসস্য অবিশেষতঃ বিজ্ঞানে অপি (এইসব [আলোর] কল্পিত আকৃতির সঙ্গে মনের সৃষ্টির (যেমন জন্ম) কোন পার্থক্য নেই); তথা এব স্যুঃ (দুয়ের স্বরূপ একই [অর্থাৎ কারও মধ্যেই বস্তু নেই, দুই-ই কাল্পনিক])।
সরলার্থ: আলোর আকৃতিগুলি অলীক এবং তার মধ্যে কোন বস্তু নেই। সেগুলি বাতি থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। মন-কল্পিত (যেমন জন্ম) বস্তু সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা মনে করি তাদের অস্তিত্ব আছে, তাই সেগুলি আছে। তাঁরা সত্য নয়, মনের রচনা।
ব্যাখ্যা: একটি বাতি ঘোরানো হলে নানারকমের আকৃতির সৃষ্টি হয়। এইসব আকৃতি সত্য নয়, কল্পনামাত্র।

জন্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এরকম বহু জিনিস আছে যা সত্য নয়, অলীক। বস্তুত সমগ্র দৃশ্যমান জগতের প্রকৃতিই এইরকম। মনে হয় ঘটনাগুলি ঘটছে কিন্তু সেগুলি আরোপিত, কল্পিত—যেমন অন্ধকারে দড়ির জায়গায় সাপকে কল্পনা করা হয়। দড়ির জায়গায় সাপ কখনো ছিলও না, থাকবেও না।

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তি তে॥৫১

অন্বয়: বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ আভাসাঃ (যখন চৈতন্য প্রকাশিত হয়, কেবলমাত্র তখনি এই দৃশ্য-জগৎ ও তার কার্য [জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি] দেখা যায়); অন্যতোভুবঃ ন (সেগুলির অন্য কোনও উৎস নেই); নিস্পন্দাৎ (যদি চৈতন্যের প্রকাশ না ঘটে); ততঃ অন্যত্র ন (তাদের অন্য কোনও আশ্রয় নেই); তে (এই জগৎ ও তার কার্য); বিজ্ঞানং ন বিশন্তি (চৈতন্যে বিলীন হয় না [কারণ সেগুলি কাল্পনিক])।
সরলার্থ: চৈতন্য যখন প্রকাশ পায় তখন এই জগৎ ও তার কার্যও প্রকাশ পায়। এইগুলির আর কোন উৎস নেই। কিন্তু চৈতন্যের প্রকাশ না হলে এই জগতেরও প্রকাশ থাকে না। কিন্তু এগুলি চৈতন্যে বিলীনও হয় না। কারণ এগুলি অবস্তু, অর্থাৎ অলীক এবং মিথ্যা।

ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাদ্ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
কার্য্যকারণতাঽভাবাদ্যতোঽচিন্ত্যাঃ সদৈব তে॥৫২

অন্বয়: তে (জন্মাদি আপাতদৃশ্য অভিজ্ঞতাসকল); দ্রব্যাত্বাভাবযোগতঃ (যেহেতু তারা অবস্তু অর্থাৎ অলীক); বিজ্ঞানাৎ ন নির্গতাঃ (চৈতন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে না); যতঃ (কারণ); তে (তারা [আপাতদৃশ্য অভিজ্ঞতাগুলি]); কার্য্য-কারণতা-অভাবাৎ (চৈতন্যের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই); সদা এব অচিন্ত্যাঃ (সেগুলি অচিন্তনীয় [অর্থাৎ মিথ্যা])।
সরলার্থ: জন্মমৃত্যু ইত্যাদি আপাতদৃশ্য অভিজ্ঞতাগুলির কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। সুতরাং সেগুলি অবস্তু। এদের উৎপত্তি চৈতন্য থেকে হতে পারে না কারণ দুয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা কিছু দেখি তার কোন বাস্তব সত্তা নেই।
ব্যাখ্যা: জ্বলন্ত মশাল ও চৈতন্যের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে: চৈতন্য স্বভাবতই অপ্রকাশিত, কিন্তু জ্বলন্ত মশাল তা নয়।

চৈতন্য যদি স্বভাবতই অব্যক্ত হয় তবে জন্মমৃত্যুর মতো ঘটনাগুলো দেখা যায় কেন? এসবের জন্য চৈতন্য দায়ী নয়। এগুলি সবই মিথ্যা, চৈতন্যের উপর আরোপিত উপাধিমাত্র।

দ্রব্য দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদন্যদন্যস্য চৈব হি।
দ্রব্যত্বমন্যভাবো বা ধর্মাণাং নোপপদ্যতে॥৫৩

অন্বয়: দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাৎ (একটি পদার্থ আর একটি পদার্থের কারণ হতে পারে); অন্যৎ (যাতে পদার্থ নেই [অর্থাৎ অবস্তু]); চ অন্যস্য এব [হেতুঃ] হি [স্যাৎ] (অন্য কোন

অবস্তুর কারণও হতে পারে); ধর্মাণাং দ্রব্যত্বম্ অন্যভাবঃ বা (জীবাত্মারা বস্তু না অবস্তু এই বিষয়ে); ন উপপদ্যতে (প্রশ্নই ওঠে না)।

সরলার্থ: একমাত্র একটি বস্তুই অন্য আর একটি বস্তুর উৎপত্তির কারণ হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন অবস্তু (অর্থাৎ অলীক) আর একটি অবস্তুরও কারণ হতে পারে। জীবাত্মা প্রসঙ্গে বলা যায় যে জীবাত্মা বস্তু না অবস্তু তার প্রশ্নই ওঠে না।

ব্যাখ্যা: আত্মা যে এক এবং জন্মরহিত একথা পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। তবু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দ্বিতত্ত্বের উপর জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে, এক বস্তু থেকেই আর একটি বস্তুর উৎপত্তি হয়। তাহলে আত্মার সম্বন্ধে কি বলা যায়? আত্মার স্রষ্টা কে? আত্মা নিশ্চয়ই নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেননি।

যেহেতু আত্মা বস্তুও নন অবস্তুও নন, অতএব আত্মা কারণও হতে পারেন না কার্যও হতে পারেন না। আত্মা স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় এবং অনন্য।

এবং ন চিত্তজা ধর্মাশ্চিতং বাঽপি ন ধর্মজম্।
এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ॥৫৪

অন্বয়: এবম্ (এইভাবে); ধর্মাঃ (বাহ্যবস্তুসমূহ); চিত্তজাঃ ন (চৈতন্য থেকে উৎপন্ন নয়); চিত্তং বা অপি ধর্মজং ন ([একইভাবে] বাহ্যবস্তু থেকেও চৈতন্য উৎপন্ন হয়নি); মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা); এবম্ (এই কারণে); হেতুফল-অজাতিং প্রবিশন্তি (কার্য-কারণ সম্পর্কের সূচনাই বাতিল করে দেন)।

সরলার্থ: এইভাবে আমরা জানি যে বাহ্যবস্তু চৈতন্য থেকে উৎপন্ন নয় এবং বাহ্যবস্তু থেকেও চৈতন্যের উৎপত্তি হয়নি। সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য-কারণ সম্পর্কের সূচনাই বাতিল করে দেন।

ব্যাখ্যা: মন চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নয়। বাইরের বস্তুসকল মন থেকে উৎপন্ন নয়, আবার বাইরের বস্তু থেকেও মনের সৃষ্টি হয়নি। এই সমগ্র জগৎ ও তার কার্যকলাপ সেই পরম সত্য বা আত্মার বাহ্য প্রকাশমাত্র। এই পরম সত্যই ব্রহ্ম তথা চৈতন্য। এখানে কার্য-কারণ সম্পর্কের কোন স্থান নেই। আত্মা এক ও অভেদ। বিভিন্ন নাম-রূপ আত্মার উপর আরোপিত উপাধিমাত্র।

যাবদ্ধেতুফলাবেশস্তাবদ্ধেতুফলোদ্ভবঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ॥৫৫

অন্বয়: যাবৎ হেতুফলাবেশঃ (কার্য-কারণ সম্পর্কে যতক্ষণ বিশ্বাস করা যায়); তাবৎ হেতুফলোদ্ভবঃ (ততক্ষণ পর্যন্ত কার্য-কারণ সম্পর্ক সত্য বলে প্রতিভাত হয়); হেতুফলাবেশে ক্ষীণে (কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাস যদি ক্ষীণ হয়ে আসে); হেতুফলোদ্ভবঃ ন অস্তি (তখন কার্য-কারণ সম্পর্কের ক্রিয়াকলাপ আর দেখা যাবে না)।

সরলার্থ: যতক্ষণ পর্যন্ত কার্য-কারণ সম্পর্ককে আমরা গুরুত্ব দিই, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্ক সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু যখন আমরা এই সম্পর্কের প্রতি উদাসীন থাকি, তখন দেখা যায় সম্পর্কটি মিথ্যা।

ব্যাখ্যা: মানুষ কেন কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী? কারণ সে ভালো ফল লাভের আশায় কর্ম করে। সেই ফল তারা হাতে হাতে নাও পেতে পারে কিন্তু তারা আশা রাখে এ জীবনে না হলেও জন্মান্তরে ফললাভ হবেই।

এ হল ঘোর অজ্ঞতা। মানুষ যেন সম্মোহিত হয়ে আছে। কিন্তু কিভাবে তারা এই অজ্ঞতাকে অতিক্রম করবে? কার্য-কারণ সম্পর্কের অর্থ দ্বৈতবাদ। কাজেই তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে—দুই নেই, সব এক। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই ব্রহ্মই চৈতন্য তথা আত্মা। এই আত্মার উপরেই নানা উপাধি যেমন কার্য-কারণ সম্পর্ক আরোপিত হয়ে থাকে।

যাবদ্ধেতুফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে॥৫৬

অন্বয়: যাবৎ হেতুফলাবেশঃ (যতক্ষণ কার্য-কারণ সম্পর্কে অনুরাগ থাকে); তাবৎ (ততক্ষণ পর্যন্ত); সংসারঃ ([জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে] এই জগৎ); আয়তঃ (ব্যাপ্ত [অর্থাৎ বেড়ে যায়]); হেতুফলাবেশে ক্ষীণে (যখন কার্য-কারণ সম্পর্কে অনুরাগ কমে যায়); সংসারং ন প্রপদ্যতে (তখন আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে হয় না)।

সরলার্থ: যতক্ষণ মানুষ কার্য-কারণ সম্পর্কে আসক্ত থাকে ততক্ষণ তাকে এই (দুঃখের) সংসারে বদ্ধ থেকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কিন্তু এই আসক্তি জয় করতে পারলে মানুষকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না (অর্থাৎ সে তখন মুক্ত হয়ে যায়)।

ব্যাখ্যা: কার্য-কারণ সম্পর্কে মানুষ গুরুত্ব দেয় কেন? কারণ তারা অজ্ঞ। তারা আত্মসর্বস্ব, মনে করে এ জীবন ভোগের জন্য। তাই তারা ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছোটে, কিন্তু কখনো সুখী হয় না। নিজের স্বার্থ ছাড়া তারা কখনো কিছু করে না, সবসময় প্রতিদান আশা করে। তাই কারণ থাকলে কার্য থাকবেই এই ধারণা তাদের পছন্দসই।

কিন্তু একটা সময় আসে যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা উপলব্ধি করে এই সংসার ক্ষণস্থায়ী এবং জীবনের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ। তখন মনকে তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখের পথ থেকে ফিরিয়ে আত্মার দিকে চালনা করে। কালে তাদের মোক্ষলাভ হয়।

সংবৃত্যা জায়তে সর্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ॥৫৭

অন্বয়: সংবৃত্যা (সমষ্টি অজ্ঞানতার [অর্থাৎ অবিদ্যার] প্রভাবে); সর্বম্ (সকল বস্তু); জায়তে (জন্মায়); তেন (এই কারণে); শাশ্বতং ন অস্তি বৈ (চিরন্তন বলে কিছু নেই [কিন্তু একই সঙ্গে]); সর্বম্ (জগতের সবকিছু); হি (নিশ্চিতভাবে); সদ্ভাবেন (ব্রহ্মরূপে); অজম্ (জন্মরহিত); তেন (একই কারণে); উচ্ছেদঃ (বিনাশ); বৈ (ও); ন অস্তি (নেই)।
সরলার্থ: অবিদ্যার প্রভাবে সকল বস্তুর জন্ম হয়ে থাকে। সেহেতু চিরন্তন বলে কিছু নেই। কিন্তু একইসঙ্গে ব্রহ্মরূপে এই জগতে কোন কিছুরই জন্ম হয়নি। অর্থাৎ জগতে বিনাশ বলেও কিছু নেই।
ব্যাখ্যা: ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, অবিদ্যার প্রভাবে সবকিছুরই জন্ম এবং বিনাশ আছে। কিছুই চিরন্তন নয়। তবু, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নেই। অর্থাৎ যাকে আমরা ব্যবহারিক জগৎ বলি তাও ব্রহ্ম। সেই অর্থে দেখলে জগতে মৃত্যু বা বিনাশ বলে কিছু নেই।

ধর্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে॥৫৮

অন্বয়: যে ধর্মাঃ (সেইসব বস্তু [অর্থাৎ জীবাত্মা ও অন্যান্য সকল বস্তু]); জায়ন্তে (জন্মায় বলা হয়); তে তত্ত্বতঃ ন জায়ন্তে ([কিন্তু] বস্তুত তারা জন্মায় না); তেষাং জন্ম মায়োপমম্ (তাদের জন্ম যেন জাদুখেলা); সা চ মায়া ন বিদ্যতে (এবং সেই জাদুখেলা সত্য নয়)।
সরলার্থ: মানুষ মনে করে জীবাত্মা (এবং অন্যান্য বস্তু) জন্ম নেয়। কিন্তু আসলে তাদের কখনই জন্ম হয় না। তাদের জন্ম যেন ভোজবাজির খেলা এবং তা সত্য নয়।
ব্যাখ্যা: অবিদ্যার কার্যকলাপের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। অবিদ্যা এমন সব অঘটন ঘটায় যার ব্যাখ্যা চলে না। এইসব ঘটনা ব্যবহারিকভাবে সত্য হলেও আসলে তা সত্য নয়। এইসব যেন ভোজবাজির খেলা।

জীবাত্মার জন্মও এইরকম; জাদুখেলার মতো। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য। আসলে সত্য নয়। যেমন জাদুখেলা সত্য নয়, সত্যের ভান মাত্র।

যথা মায়াময়াদ্ বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ।
নাসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বদ্ধর্মেষু যোজনা॥৫৯

অন্বয়: যথা মায়াময়াৎ বীজাৎ জায়তে (জাদুখেলায় যেমন জাদুবীজ থেকে); তন্ময়ঃ অঙ্কুরঃ (জাদুগাছ জন্মায়); অসৌ (সেই গাছ); ন নিত্যঃ (চিরন্তন নয়); ন চ উচ্ছেদী (বিনাশশীল নয়); তদ্বৎ (সেইরকম); ধর্মেষু যোজনা (আত্মায় প্রযোজ্য)।
সরলার্থ: (জাদুকর) মায়াবীজ থেকে মায়াগাছ উৎপন্ন করে। সেই গাছ নিত্য নয়। আবার তাকে বিনাশও করা যায় না। একই কথা আত্মা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।
ব্যাখ্যা: জাদুর খেলায় দেখা যায় আমের আঁটি থেকে আমগাছ বেরিয়ে এল। কিন্তু সমস্তটাই ভোজবাজি। আঁটিটাও সত্য নয়, গাছটাও সত্য নয়। সুতরাং গাছটা বিনাশশীল না অবিনাশী সে প্রশ্নই ওঠে না।

জীবাত্মা সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য কারণ জীবাত্মাও সত্য নয়।

নাজেষু সর্বধর্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে॥৬০

অন্বয়: অজেষু সর্বধর্মেষু (জন্মবিহীন জীবাত্মা সম্পর্কে); শাশ্বত-অশাশ্বত-অভিধা ন (অমর বা মরণশীল শব্দগুলি প্রযোজ্য নয়); যত্র (যেখানে); বর্ণাঃ ন বর্তন্তে (বর্ণনার ভাষা নেই); তত্র (সেখানে); বিবেকঃ (নিত্য-অনিত্যের পার্থক্য); ন উচ্যতে (প্রযোজ্য নয়)।
সরলার্থ: জীবাত্মার জন্ম হয় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে অমর বা মরণশীল এই শব্দগুলি প্রযোজ্য নয়। যা বর্ণনা করা যায় না তাকে শাশ্বত বা অশাশ্বত কিভাবে বলব?
ব্যাখ্যা: আত্মার কখনো জন্ম হয় না; আত্মা চিরন্তন এবং জ্ঞানস্বরূপ। আত্মাকে বর্ণনা করা যায় না। শাস্ত্র বলছেন ‘যতো বাচঃ নিবর্তন্তে’—যেখান থেকে শব্দ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তাই ‘মরণশীল’ ‘অমর’ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে তাঁকে বর্ণনা করার প্রয়াস বৃথা।

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া॥৬১

অন্বয়: যথা স্বপ্নে (যেমন স্বপ্নে); চিত্তং মায়য়া দ্বয়াভাসং চলতি (মন অজ্ঞানতাবশত দুই দেখে ও সেই অনুরূপ কাজ করে [যদিও আসলে দুই নেই]); তথা জাগ্রৎ (সেইরকমই জাগ্রত অবস্থায়); চিত্তং মায়য়া (অবিদ্যার প্রভাবে মন); দ্বয়াভাসং চলতি (দ্বৈতচিন্তা ও সেইমতো কাজ করে)।

সরলার্থ: স্বপ্নে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। তবু মন দুই দেখে ও সেই অনুরূপ কাজ করে। ঠিক তেমনি জাগ্রত অবস্থাতেও মন অবিদ্যার প্রভাবে দুই দেখে ও সেই অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করে। (বস্তুত দুই নেই, এক। অজ্ঞানতার ফলেই এই ভুল হয়।)

[ব্যাখ্যার জন্য কারিকাভাষ্য ৩।২৯ দ্রষ্টব্য]

অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ॥৬২

অন্বয়: স্বপ্নে চ অদ্বয়ং চিত্তম্ (যখন স্বপ্ন দেখি তখন কেবল আমার মনই আছে); দ্বয়াভাসং ন সংশয়ঃ ([তবুও] দুই দেখি এবং এই বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র থাকে না); তথা (সেইভাবে); অদ্বয়ং চ জাগ্রৎ (জাগ্রত অবস্থাতেও আমার মন একাই আছে); দ্বয়াভাসং সংশয়ঃ ন (তবু আমি যে বহু দেখছি এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই)।

সরলার্থ: স্বপ্নকালে মন নিঃসঙ্গ থাকে, তবু দুয়ের (জ্ঞাতা-জ্ঞেয়) অভিজ্ঞতা হয়। সেইভাবে জাগ্রত অবস্থাতেও মনের দ্বৈতভূমিকা থাকে, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ধারণা সৃষ্টি করে। এর ফলে বহু দেখা যায়। আর এই বহুর অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্রষ্টার মনে সংশয়মাত্র থাকে না। কিন্তু স্বপ্ন ও জাগ্রত—এই দুই অবস্থার অভিজ্ঞতাই দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

[ব্যাখ্যার জন্য কারিকাভাষ্য ৩।৩০ দ্রষ্টব্য]

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাঽপি জীবান্ পশ্যতি যা সদা॥৬৩

অন্বয়: স্বপ্নদৃক্ (যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখছে); স্বপ্নে প্রচরন্ বৈ দশসু দিক্ষু (স্বপ্নে নানা দিকে বিচরণ করে); স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা অপি জীবান্ পশ্যতি সদা (এবং [ভ্রমণকালে] সে নানারকমের প্রাণী দেখে—কেউ অণ্ডজাত, কেউ স্বেদজাত ইত্যাদি)।

সরলার্থ: স্বপ্নকালে মানুষ চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায় এবং নানা ধরনের প্রাণী দেখতে পায়—কোনটি অণ্ডজাত (যেমন পাখী) কোনটি বা স্বেদজাত (যেমন মশা) প্রভৃতি।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নে নানা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবই মিথ্যা। যা দেখা যায় তাই যে শুধু মিথ্যা তা নয়, যা শোনা যায় তাও মিথ্যা।

স্বপ্নদৃক্চিত্ত দৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্চিত্তমিষ্যতে।।৬৪

অন্বয়: স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাঃ (স্বপ্নে ব্যক্তি যেসব বস্তু দর্শন করে); তে (তারা); ততঃ (সেই ব্যক্তির মন থেকে); পৃথক্ ন বিদ্যন্তে (পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই); তথা ইদং স্বপ্নদৃক্ চিত্তম্ (সেইরূপ স্বপ্ন দেখছে এমন মানুষের মন); তদ্দৃশ্যম্ এব ইষ্যতে (কেবল তার দ্বারাই অনুভূতি হয় [অর্থাৎ এই মন তার থেকে পৃথক নয়])।
সরলার্থ: মানুষ স্বপ্নে যেসব বস্তু দেখে সেগুলি তার মনের সৃষ্টি। বস্তুত তার মনও ঐসব বস্তু থেকে স্বতন্ত্র নয়।
ব্যাখ্যা: স্বপ্নে যা কিছু দেখা যায় তা মনেরই সৃষ্টি। মন এবং মন-কল্পিত বস্তু অভিন্ন। একইভাবে বলা যায় আমি ও আমার মন অভিন্ন।

চরঞ্জাগরিতে জাগ্রদিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাহপি জীবান্পশ্যতি যান্সদা।।৬৫
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে।।৬৬

অন্বয়: জাগ্রৎ জাগরিতে চরন (যেমন জাগ্রত অবস্থায় মানুষ ঘুরে বেড়ায়); দশসু দিক্ষু (সব দিকে); স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা অপি জীবান্ সদা পশ্যতি (অণ্ডজ প্রাণী, স্বেদজ কীট ও অন্যান্য জীব দেখে)।

তে জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াঃ (জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে তারা [এইসব প্রাণীরা] ধরা পড়ে); ততঃ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে (মন থেকে পৃথক কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই); তথা (একইভাবে); জাগ্রতঃ ইদং চিত্তং তদ্দৃশ্যম্ এব ইষ্যতে (যেহেতু জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মন শুধু তার নিজের কাছেই ধরা পড়ে, অতএব সে ও তার মন অভিন্ন)।
সরলার্থ: জাগ্রত অবস্থায় একজন ব্যক্তি চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায় এবং অণ্ডজ প্রাণী, স্বেদজ কীট ও অন্যান্য প্রাণী দেখে থাকে। এইসব প্রাণী কেবলমাত্র জাগ্রত ব্যক্তিরই মনের গোচর।

এইসব প্রাণী বা বস্তু তার মন থেকে পৃথক হতে পারে না। অনুরূপভাবে, মানুষের নিজের মনও নিজের কাছেই ধরা পড়ে। আর সেইহেতু মনও ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র নয়।

ব্যাখ্যা: জাগ্রত অবস্থায় যে নানা বস্তু দেখা যায় সেই অভিজ্ঞতা একান্তভাবেই মনের ব্যাপার। এর কারণ সেই অভিজ্ঞতা ওই মনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ স্বপ্নের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনীয়। মূলকথা হল ব্যক্তিমানুষ ও তার মন এক এবং অভিন্ন।

উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যে তে কিং তদস্তীতি নোচ্যতে।
লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতেনৈব গৃহ্যতে॥৬৭

অন্বয়: তে উভে (মন এবং বস্তু উভয়ই); হি (নিশ্চিতভাবে); অন্যোন্যদৃশ্যে (পরস্পরের উপর নির্ভরশীল [অতএব বিজ্ঞজনেরা কিভাবে]); তৎ অস্তি ইতি কিং ন উচ্যতে (বলতে পারেন এদের মধ্যে একটির অস্তিত্ব আছে? [তাঁরা বলেন] কোনটিরই অস্তিত্ব নেই); লক্ষণাশূন্যম্ (তাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই); উভয়ম্ (মন এবং বস্তু); তন্মতেন এব গৃহ্যতে (একসঙ্গে হলে তবেই প্রত্যক্ষ হয়)।

সরলার্থ: মন এবং বস্তু উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। (যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন) ‘কোনটির অস্তিত্ব আছে?’ (প্রাজ্ঞজনেরা বলেন) ‘কোনটিরই নেই।’ তাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। উভয়ে একত্র হলে তবেই তাদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

ব্যাখ্যা: বস্তু যদি না থাকে তবে মনও থাকে না। উভয়ে একত্র হলে তবেই তাদের অস্তিত্ব। অর্থাৎ তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অন্তত তাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। প্রাজ্ঞজনেরা তাই বলে থাকেন ওগুলি সত্য নয়।

বস্তুত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে ‘কিছু আছে’ এই উক্তি ভ্রান্ত। যার স্বতন্ত্র সত্তা নেই তার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বই নেই। ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’ পৃথকভাবে থাকে না। সেহেতু অদ্বৈতমতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা পৃথক সত্তা নয়—এক ও অভিন্ন।

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥৬৮

অন্বয়: যথা স্বপ্নময়ঃ (ঠিক যেমন স্বপ্নে); জীবঃ জায়তে চ ম্রিয়তে অপি (কাউকে জন্মাতে বা মারা যেতে দেখা যায়); তথা অমী সর্বে জীবাঃ (সেইরকম [জাগ্রত অবস্থায়] এইসব প্রাণী); ভবন্তি ন ভবন্তি চ (জন্মাচ্ছে বা মারা যাচ্ছে দেখা যায়)।

সরলার্থ: স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে জন্মাতে বা মারা যেতে দেখা যায়। একইভাবে, জাগ্রত অবস্থাতেও সকল প্রাণীর জন্ম বা মৃত্যু দেখা যায়।

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥৬৯

অন্বয়: যথা মায়াময়ঃ (ঠিক যেমন জাদুখেলায়); জীবঃ জায়তে চ ম্রিয়তে অপি (কাউকে জন্মাতে বা মারা যেতে দেখা যায়); তথা (অনুরূপভাবে); অমী সর্বে জীবাঃ ([জাগ্রত অবস্থায়] এইসব প্রাণী); ভবন্তি ন ভবন্তি চ (জন্মাচ্ছে বা মারা যাচ্ছে দেখা যায়)।
সরলার্থ: জাদুখেলায় অনেক সময় কাউকে জন্মাতে বা মারা যেতে দেখা যায়। ঠিক তেমনি জাগ্রত অবস্থাতেও এইসব প্রাণীকে জন্মগ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায়।

যথা নির্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি বা।
তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥৭০

অন্বয়: যথা (ঠিক যেমন); নির্মিতকঃ জীবঃ (কৃত্রিমভাবে তৈরি বস্তু); জায়তে ম্রিয়তে অপি বা (জাত বা মৃত হতে দেখা যায়); তথা (অনুরূপভাবে); অমী সর্বে জীবাঃ (এইসব প্রাণী [জাগ্রত অবস্থায়]); ভবন্তি ন ভবন্তি চ (জন্ম বা মৃত্যু হতে পারে)।
সরলার্থ: ঠিক যেমন, কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন বস্তুকে জন্মাতে বা বিনাশপ্রাপ্ত হতে দেখা যায় তেমনি জাগ্রত অবস্থাতেও এইসব প্রাণীর জন্ম বা মৃত্যু হতে দেখা যায়।
ব্যাখ্যা: স্বপ্নে, জাদুখেলায় অথবা কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে জন্ম বা মৃত্যু উভয়ই দেখা যেতে পারে। উভয়ই মিথ্যা। অনুরূপভাবে, জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু দুই-ই দেখা যেতে পারে, কিন্তু দুই-ই সমভাবে মিথ্যা।

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সংভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥৭১

অন্বয়: কশ্চিৎ জীবঃ ন জায়তে (কোনও কিছু জন্মায় না); সম্ভবঃ অস্য ন বিদ্যতে (কোনও কিছুর জন্মাবার সম্ভাবনাও নেই); যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে (বস্তুত কিছুরই জন্ম হয় না); তৎ এতৎ উত্তমং সত্যম্ (এই হল পরম সত্য)।

সরলার্থ: কেউ জন্মায় না, কারও জন্মাবার সম্ভাবনাও নেই; বস্তুত কোন কিছুরই জন্ম হয় না। এই হল পরম সত্য।

[ব্যাখ্যার জন্য কারিকা ৩।৪৮ দ্রষ্টব্য]

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্॥৭২

অন্বয়: ইদং গ্রাহ্যগ্রাহকবৎ (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিষয়); দ্বয়ম্ ([এই] দ্বৈতবুদ্ধি); চিত্তস্পন্দিতম্ এব (নিঃসন্দেহে মনের সৃষ্টি); চিত্তং নির্বিষয়ম্ (মন গুণের দ্বারা বিশেষিত নয়); তেন (অতএব); নিত্যম্ অসঙ্গম্ (সর্বদা অপরিবর্তনীয়, স্বনির্ভর); কীর্তিতম্ (বলা হয়ে থাকে)।
সরলার্থ: এই দ্বৈতজগৎ, যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়কেই দেখা যায় তা মনের সৃষ্টি। মন কিন্তু স্বভাবতই অপরিবর্তনীয়, স্বনির্ভর। এইজন্যই মনকে অদ্বয় বলা হয়।

যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ॥৭৩

অন্বয়: যঃ কল্পিতসংবৃত্যা অস্তি (যার অস্তিত্ব মনে কিন্তু [তা হলেও] ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী); অসৌ পরমার্থেন ন অস্তি (বাস্তব সত্তা নেই); পর-তন্ত্রাভি-সংবৃত্যা স্যাৎ (যদি অন্য কোন দার্শনিক গোষ্ঠী কোন কিছুকে সত্য বলে বর্ণনা করেন); পরমার্থতঃ ন অস্তি (পারমার্থিক দৃষ্টিতে তার অস্তিত্ব নেই)।
সরলার্থ: ব্যবহারিক জীবনে যেসব বস্তু কাজে লাগে সেগুলিকে সত্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেগুলি যদি মনের সৃষ্টি হয় তবে তাদের কোন বাস্তব সত্তা নেই। একইভাবে, অন্য মতে কোন জিনিসকে সত্য বলা হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারাই সেই জিনিসের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।
ব্যাখ্যা: মনকে (অর্থাৎ আত্মাকে) নিঃসঙ্গ বলা হয়। বাইরের জগৎ নেই বলেই কি একথা বলা হয়ে থাকে? যদি বাহ্যজগৎকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় তাহলে শাস্ত্র, আচার্য এঁরা কোথা থেকে এলেন? আত্মার কথাই বা কিভাবে তাঁরা শেখাবেন? অদ্বৈতবাদীদের উত্তর হল: এইসব ব্যবহারিকভাবে সত্য। আত্মজ্ঞান হলে জানা যায় এসবের কোন বাস্তব সত্তা নেই।

অজঃ কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ।
পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্যা জায়তে তু সঃ॥৭৪

অন্বয়: [আত্মাকেও] কল্পিত সংবৃত্যা (কল্পিত ব্যবহারিক দৃষ্টিতে [বলা হয়]); অজঃ (জন্মহীন); পরমার্থেন অজঃ অপি ন (পারমার্থিক দৃষ্টিতে জন্মহীনও নয়); সঃ (ইহা [জন্মহীন]); তু (কিন্তু); পরতন্ত্রাভিঃ নিষ্পত্ত্যা (অন্যান্য মতের শাস্ত্র অনুসারে); সংবৃত্যা (অবিদ্যায়); জায়তে (জন্ম হয়েছে বলা হয়)।
সরলার্থ: যদি বলা হয় আত্মার জন্ম নেই, তা শুধুমাত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই বলা হয়ে থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মাকে জন্মহীনও বলা যায় না। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিক গোষ্ঠী অজ্ঞানতাবশত আত্মার জন্ম হয়েছে বলে বর্ণনা করেন।
ব্যাখ্যা: সঠিকভাবে বলতে গেলে আত্মাকে 'জন্মরহিত'ও বলা যায় না। এই ধরনের উক্তি অজ্ঞানতার পরিচয় দেয়। একথা জেনেও যে অদ্বৈতবাদীরা আত্মাকে জন্মরহিত বলেন তা কেবলমাত্র প্রতিপক্ষকে (যাঁরা আত্মার জন্মে বিশ্বাসী) তাঁদের মতকে খণ্ডন করার জন্য। বস্তুত আত্মা সম্পর্কে কোন কথা বলাই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। যদি একান্তই কিছু বলতে হয় তা কেবলমাত্র মিথ্যাকে খণ্ডন করার জন্য।

অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
দ্বয়াভাবং স বুদ্‌ধ্বৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে॥৭৫

অন্বয়: অভূতাভিনিবেশঃ অস্তি (যা নেই তার প্রতি কেউ আকৃষ্ট হতে পারে); তত্র দ্বয়ং ন বিদ্যতে (শুধুমাত্র সেই কারণেই বস্তুটির অস্তিত্ব আছে বলা যায় না); দ্বয়াভাবং বুদ্‌ধ্বা এব (যেই সে বুঝতে পারে দুই বোধ মিথ্যা); নির্নিমিত্তঃ (তখন তাকে আর কিছুই আকৃষ্ট করতে পারে না); সঃ ন জায়তে (তার আর জন্ম হয় না)।
সরলার্থ: কেউ কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু তার দ্বারা দ্বিতত্ত্ব (অর্থাৎ বাইরে কিছু আছে) প্রমাণিত হয় না। যেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে দুইবোধ মিথ্যা, তখন আর কোন কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এমন ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না।
ব্যাখ্যা: একজন ব্যক্তি কোন এক বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা বস্তুটির সত্যতা প্রমাণিত হয় না। বস্তুটি সত্য হোক বা না হোক, এই আসক্তি মানুষের বন্ধনের কারণ হতে পারে। আর সেইজন্য তাকে হয়তো বারবার জন্ম নিতে হবে। কিন্তু যদি সে বুঝতে পারে যে তার অনুরাগের বস্তুটির কোন বাস্তব সত্তা নেই তখন বস্তুটির প্রতি তার

আর কোন আসক্তি থাকবে না। তখনি সে দ্বৈতচিন্তার মোহ থাকে মুক্ত হবে এবং আত্মাকে জানতে পারবে। এমন ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হবে না।

যদা ন লভতে হেতূনুত্তমাধমমধ্যমান্।
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বভাবে ফলং কুতঃ॥৭৬

অন্বয়: [চিত্তম্] যদা (যখন মন); উত্তম-অধম-মধ্যমান্ হেতূন্ ন লভতে (ভালো, মন্দ বা মাঝারি কোন কারণকে স্বীকার করে না); তদা চিত্তং ন জায়তে (তখন আর মনের জন্ম হয় না); হেত্বভাবে (যদি কারণ না থাকে); ফলং কুতঃ (ফল কোথা থেকে আসবে?)।
সরলার্থ: মন যখন ভালো, মন্দ বা মাঝারি কোন কারণকেই আর স্বীকার করে না, তখন তার আর পুনর্জন্ম হয় না। কারণ যদি না থাকে, তবে কার্য থাকে কি করে? (মন বাসনামুক্ত হলে সে আর কারণ দেখে না। সুতরাং তার আর জন্মও হয় না।)
ব্যাখ্যা: সকল প্রাণীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। যাঁরা উত্তম তাঁরা ঈশ্বরতুল্য। তাঁরা তাঁদের কাজে শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালন করেন। মধ্যম যাঁরা তাঁরা সাধুজীবন যাপনে চেষ্টা করেন। আর অধম শ্রেণীর অন্তর্গত হল পশু এবং কীটপতঙ্গ। এরা অধম এই অর্থে যে ভালো-মন্দ বিচারে তারা অক্ষম।

এই শ্রেণীবিভাগ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আত্মা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আত্মা সবরকম শ্রেণীবিভাগের ঊর্ধ্বে, শুদ্ধ এবং স্বতন্ত্র। আত্মা আত্মাই (কেবল)। আত্মা সকল কামনামুক্ত, আপনাতে আপনি তৃপ্ত।

যে ব্যক্তি সব ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

অনিমিত্তস্য চিত্তস্য যাঽনুৎপত্তিঃ সমাঽদ্বয়া।
অজাতস্যৈব সর্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তদ্যতঃ॥৭৭

অন্বয়: অনিমিত্তস্য (যার জন্মাবার কোন কারণ নেই [সেহেতু]); অজাতস্য (যার জন্ম হয়নি); সর্বস্য চিত্তস্য যা অনুৎপত্তিঃ (মনের মুক্তি); [সা] অদ্বয়া (যা সর্বদা অদ্বিতীয়); সমা (সর্বদা অভিন্ন); যতঃ (সুতরাং); তৎ চিত্তদৃশ্যম্ (মনের জন্ম এবং মন যেসব বস্তু অনুভব করে দুই-ই মিথ্যা)।
সরলার্থ: মনের জন্ম হওয়ার কোন হেতু নেই। কাজেই তার জন্ম হয় না। আর যেহেতু মনের জন্ম হয় না তাই মন মুক্ত, স্বাধীন। মন অদ্বিতীয় ও অপরিবর্তনীয়। মনের যেমন

জন্ম নেই, মন দিয়ে যেসব বস্তু অনুভব করা হয় তাদেরও জন্ম নেই।

ব্যাখ্যা: যার মনে বাসনা থাকে তার জন্ম হয়। যার বাসনা নেই তার জন্মাবার কোন হেতুই নেই। কখন মন কামনা-বাসনা শূন্য হয়? যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সে তখন উপলব্ধি করে যে সে স্বয়ং আত্মা—অনন্য ও অদ্বিতীয়। সে তখন নিজেকে সর্বত্র এবং সবকিছুতে দেখে। কিছুই আর তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। সে-ই পরম ব্রহ্ম এবং সতত অপরিবর্তনীয়। এই জ্ঞান লাভ হলে মানুষের আর কি চাওয়ার থাকতে পারে? যা কিছু কাম্য সব সে পেয়ে গেছে। তখন মানুষ সর্বকামনাশূন্য হয়।

যেহেতু কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সুতরাং মন বলেও কিছু থাকে না। এমন নয় যে কখনো আবার কিছুর আকাঙ্ক্ষা হল এবং তখন আবার মনও হল। তিনি স্বয়ং আত্ম—অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয়। মন এবং কামনা-বাসনা—দুই-ই মিথ্যা।

বুদ্‌ধ্বাঽনিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্।
বীতশোকং তথাঽকামমভয়ং পদমশ্নুতে॥৭৮

অন্বয়: অনিমিত্ততাম্ (কারণের অনুপস্থিতিতে); সত্যাম্ (যা সত্য); **বুদ্‌ধ্বা** (উপলব্ধি করে); পৃথক্ হেতুম্ অনাপ্নুবন্ (আর কোনও কারণ না দেখে); বীতশোকম্ (দুঃখের ঊর্ধ্বে); তথা অকামম্ (কামনাশূন্য); অভয়ম্ (ভয়মুক্ত); পদম্ (পদ [ব্রহ্মপদ]); অশ্নুতে (লাভ করে)।

সরলার্থ: একমাত্র সত্যকে জানলে আর জন্ম হয় না, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই—একথা উপলব্ধি করে মানুষ দুঃখের পারে চলে যায়। তখন সে কামনাশূন্য হয়, নির্ভয় হয় এবং ব্রহ্মপদ লাভ করে।

ব্যাখ্যা: যতদিন মানুষ দুই দেখে ততদিন তাকে বারবার জন্মাতে হয়। দুই দেখার অর্থ এই দৃশ্যমান জগৎকে সত্য মনে করা, যা প্রিয় তার পিছনে ছোটা এবং যা অপ্রিয় তা পরিত্যাগ করা। এও এক ধরনের দাসত্ব। মানুষের জীবনের লক্ষ্য এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। তারজন্য প্রয়োজন নিজের স্বরূপকে জানা। মানুষ তখন বুঝতে পারে সে-ই আত্মা—মহত্তম, শুদ্ধ, মুক্ত, অনন্য এবং অপরিবর্তনীয়। এই উপলব্ধি হলে তার আর চাওয়ার কিছু থাকে না, সে সব পেয়ে গেছে। নির্বাসনা হলে মানুষের জন্মাবার কোন হেতুও থাকে না, ইচ্ছেও থাকে না। তখন সে অভয় ব্রহ্মপদ লাভ করে।

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎপ্রবর্ততে।
বস্ত্বভাবং স বুদ্‌ধ্বৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ততে॥৭৯

অন্বয়: অভূতাভিনিবেশাৎ (যা মিথ্যা তার প্রতি যদি আকর্ষণ থাকে); হি সদৃশে তৎ প্রবর্ততে (সেইসব বস্তু মনকে অধিকার করে থাকে); সঃ বস্তু-অভাবং বুদ্‌ধ্বা ([কিন্তু] যদি সে বুঝতে পারে এগুলি [অর্থাৎ তার প্রিয় বস্তুগুলি] সত্য নয়); এব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ততে (সে [তৎক্ষণাৎ সেইসব বস্তু থেকে] নিজেকে সরিয়ে আনে)।

সরলার্থ: অসত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকলে মন সেসব বস্তুর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যে বুঝতে পারে এইসব বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নেই সে তৎক্ষণাৎ সেগুলি ত্যাগ করে।

ব্যাখ্যা: দ্বৈত মিথ্যা। তবু মানুষ একথা ভুলে থাকে। তাঁরা হয়তো একটা কিছু দেখে মুহূর্তে তাতে মুগ্ধ হয়। মিথ্যা হলেও এই প্রিয় বস্তুর চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু আগেই হোক বা পরে মানুষ একদিন তার ভুল বুঝতে পারে। প্রিয় বস্তুটির অসারতা আবিষ্কার করে সে তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ করে। দুইবোধ তার চিরতরে মুছে যায়।

নিবৃত্তস্যাবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্।।৮০

অন্বয়: তদা (তখন); হি (নিশ্চিতভাবে); নিবৃত্তস্য ([যদি তুমি ঐসব অসত্য বস্তু থেকে] দূরে থাক); অপ্রবৃত্তস্য (আর কখনো সেগুলিকে ভোগ না করে); নিশ্চলা (মন শান্ত হয়); স্থিতিঃ ([একমাত্র ব্রহ্মে] স্থির); হি (এইভাবে); বুদ্ধানাম্ (যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন); সঃ (পরমাত্মা); বিষয়ঃ ([তাঁদের সব কর্মের] কেন্দ্রবিন্দু); তৎ (ঐ); অজম্ (জন্মরহিত); অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়); সাম্যম্ (সতত অভিন্ন)।

সরলার্থ: ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু থেকে দূরে থেকে আর কখনো সেগুলি ভোগ না করলে মন শান্ত হয়, ব্রহ্মে একাগ্র হয়। যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদের সব চিন্তার কেন্দ্রে একমাত্র ব্রহ্ম—যিনি জন্মরহিত, অদ্বিতীয় ও সদা অভিন্ন।

ব্যাখ্যা: আমাদের আরম্ভ করতে হবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু ত্যাগের মধ্য দিয়ে। তারপর ব্রহ্মে মন একাগ্র করার চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরা আত্মাতেই মগ্ন হয়ে আছেন। অতএব তাঁদের কাছে একমাত্র আত্মাই সত্য। এই আত্মার জন্ম নেই। আত্মা অপরিবর্তনীয়, এক ও অদ্বিতীয়।

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্।
সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্মো ধাতুস্বভাবতঃ।।৮১

অন্বয়: অজম্ (যার জন্ম নেই); অনিদ্রম্ (অবিদ্যাপ্রসূত ঘুম যার নেই); অস্বপ্নম্ (অবিদ্যাপ্রসূত স্বপ্ন যিনি দেখেন না); স্বয়ং প্রভাতং ভবতি (স্বয়ংপ্রকাশ); হি (যেহেতু); এষঃ ধর্মঃ (এই আত্মা); ধাতু স্বভাবতঃ (স্বধর্ম অনুযায়ী); সকৃৎ বিভাতঃ (সবসময় প্রকাশিত)।
সরলার্থ: আত্মা জন্মরহিত, অনিদ্র এবং স্বপ্নহীন। ইনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং সদা প্রকাশিত।
ব্যাখ্যা: আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মা কিভাবে প্রতিভাত হন? তাঁর কাছে আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি স্বয়ং জ্যোতি। এই জ্যোতি সূর্য বা অন্য কোনও উৎস থেকে ধার করা নয়। আত্মা আপন জ্যোতিতেই সদা জ্যোতির্ময়।

সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা।
যস্য কস্য চ ধর্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ॥৮২

অন্বয়: যস্য কস্য চ ধর্মস্য গ্রহেণ (কোন কিছুতে তোমার অনুরাগ হলে); অসৌ ভগবান্ সদা সুখম্ আব্রিয়তে নিত্যম্ (আত্মাকে তোমার থেকে সুদীর্ঘকাল আড়াল করে রাখতে পারে); দুঃখং বিব্রিয়তে ([কিন্তু] আত্মাকে যদি তুমি দর্শন করতে চাও, তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে)।
সরলার্থ: কোন বস্তুতে আমাদের অনুরাগ হলে সেই বস্তু সহজেই আত্মাকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হলে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
ব্যাখ্যা: প্রশ্ন হল: 'আত্মা যদি সদা জ্যোতির্ময় হন তবে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না কেন?' দোষ আমাদেরই। আত্মাই একমাত্র সত্য, অন্য কোন কিছু সত্য নয়। তবু অজ্ঞানতাবশত আমরা যা মিথ্যা তার প্রতি আকৃষ্ট হই। এই মিথ্যাকে আমরা এতই ভালোবাসি যে আত্মাকে ভুলে থাকি। আমাদের প্রিয় বস্তুটি সত্য নয়, তবু তা আমাদের মুগ্ধ করে—এটাই পরিতাপের বিষয়। এর ফলে আত্মা আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যান।

আমাদের স্বভাবদোষেই আত্মাকে জানা এত কঠিন হয়ে পড়ে। এইসব দোষ দূর করতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ ব্যাপারে **সদ্গুরু**র কাছে শিক্ষাগ্রহণও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য।

আত্মা সহজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, তাঁকে লাভ করা দুরূহ।

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ॥৮৩

অন্বয়: বালিশঃ (নির্বোধ); অস্তি নাস্তি অস্তি নাস্তি নাস্তি নাস্তি ইতি বা (আত্মা আছেন, আত্মা নেই, আত্মা আছেনও আবার নেইও, আত্মা নেই, অবশ্যই নেই ইত্যাদি); পুনঃ চল-স্থির-উভয়-অভাবৈঃ আবৃণোতি (কখনো চলমান, কখনো স্থির, কখনো উভয়ই, কখনো নেই—এইভাবে আত্মাকে আবৃত করে রাখে)।

সরলার্থ: নির্বোধ ব্যক্তি কখনো মনে করে আত্মা আছেন কখনো মনে করে নেই, আবার কখনো মনে করে আত্মা আছেনও বটে নেইও বটে। এইভাবে আত্মাকে কখনো স্থির, কখনো চঞ্চল, কখনো দুই-ই ইত্যাদি ভেবে নির্বোধ ব্যক্তি আত্মাকে আবৃত করে রাখে।

ব্যাখ্যা: এমন বহু দার্শনিক গোষ্ঠী আছেন যাঁরা 'আত্ম অদ্বয়' এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তাঁরা যে যাঁর মতে এতটাই মুগ্ধ যে আসল সত্যটি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আত্মা সম্পর্কে তাঁরা আক্ষরিক অর্থে অন্ধ। আত্মাকে যেন তাঁরা অবগুণ্ঠনের আড়ালে সরিয়ে রেখেছেন।

অদ্বৈতবিরোধী চারটি প্রধান দার্শনিক মত আছে। এঁদের মধ্যে বৈশেষিকরা বলেন: আত্মার অস্তিত্ব আছে কিন্তু আত্মার পরিবর্তন হয়। আত্মা কখনো সুখী কখনো দুঃখী। অবশ্য তাঁদের মতে আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র।

আর এক বিরোধী দার্শনিক মত হল বৌদ্ধদর্শন। তাঁরা বিশ্বাস করেন বস্তুর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। এঁরা বিজ্ঞানবাদী বা আত্মগত ভাববাদী বলে পরিচিত। এই মত অনুসারে মনই আত্মা এবং বস্তুর সঙ্গে যোগ হলে এর ক্রমাগত পরিবর্তন হয়।

দিগম্বর জৈনরা বলেন : আত্মা আছেও বটে, নেইও বটে। যতক্ষণ দেহের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণই আত্মার অস্তিত্ব। দেহের মৃত্যুর সঙ্গেই আত্মারও মৃত্যু হয়। আবার দেহ বড় বা ছোট হলে আত্মাও বড় বা ছোট হয়।

বৌদ্ধদের আর এক শাখা আছে যাঁরা শুন্যবাদী বলে পরিচিত। এঁদের মতে আত্মা বলে কিছু নেই। পরম সত্য হল শূন্য। এঁদের বলা হয় নাস্তিবাদী (Nihilist)।

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাঽঽবৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্॥৮৪

অন্বয়: এতাঃ চতস্রঃ কোট্যঃ (এই চারটি গোষ্ঠী); যাসাম্ (যাঁদের); গ্রহৈঃ (মোহমুগ্ধতা [নিজ মতবাদের প্রতি]); সদা (সর্বদা); আবৃতঃ (অবগুণ্ঠিত); ভগবান্ (আত্মা); যেন (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি); আভিঃ (এমন সব মানুষ [যাঁরা আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করেন]); অস্পৃষ্টঃ (ঊর্ধ্বে [ওই চার মতবাদের]); দৃষ্টঃ ([সেইভাবে] দেখা যায়); সঃ সর্বদৃক্ (তিনি সর্বজ্ঞ)।

সরলার্থ: এই চারটি দার্শনিক মতবাদীদের কাছে আত্মা সর্বদাই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। এর কারণ নিজ নিজ মতের প্রতি এঁরা মোহমুগ্ধ। কিন্তু এই চার মতবাদের ঊর্ধ্বে গিয়ে যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জ্যোতির্ময় আত্মার দর্শন লাভ করেন তিনি প্রকৃতই সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: আত্মা সম্বন্ধে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল আত্মাকে বর্ণনা করা যায় না। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অবিরাম বিতর্ক চলে, কিন্তু এইসব তর্কবিচার নিরর্থক। এঁরা নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। কিন্তু এত বাগ্‌বিতণ্ডায় তাঁদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। এঁদের আত্মজ্ঞান লাভের আশা সুদূরপরাহত।

যিনি বুঝেছেন আত্মা বিতর্কের বিষয় নয় তিনি আত্মাকে জানেন। তিনি যথার্থই প্রাজ্ঞ।

প্রাপ্য সর্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে।।৮৫

অন্বয়: কৃৎস্নাম্ (পরিপূর্ণভাবে); সর্বজ্ঞতাম্ (সর্বজ্ঞতা); অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই যার); অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়); ব্রাহ্মণ্যং পদম্ (ব্রহ্মপদ); প্রাপ্য (লাভ করে); অতঃ (লাভ করার পর); পরম্ (সর্বোচ্চ); কিম্ (কি বস্তু); ঈহতে (পেতে ইচ্ছা করে)।

সরলার্থ: কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে সর্বজ্ঞ হন, তবে তিনি জন্ম, মৃত্যু এবং তাদের মধ্যবর্তী অবস্থাকেও জয় করে থাকেন। তারপর তাঁর আর আকাঙ্ক্ষার কি বা থাকতে পারে?

ব্যাখ্যা: প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ' তিনিই যিনি ব্রহ্মকে জানেন। এমন ব্যক্তি সর্বজ্ঞ। আবার তাঁর মনে হয় তিনি যা চেয়েছেন, সব পেয়েও গেছেন। ব্রহ্মপদ লাভ করার পর তাঁর আর কি বা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে।
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদেবং বিদ্বাঞ্ শমং ব্রজেৎ।।৮৬

অন্বয়: এষঃ বিনয়ঃ (এই বিনয়); হি প্রাকৃতঃ শমঃ উচ্যতে (আত্মসংযম বলে পরিচিত); বিপ্রাণাম্ (ব্রাহ্মণদের পক্ষে); প্রকৃতি-দান্তত্বাৎ দমঃ (কারণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আত্মসংযমে সমর্থ, তাঁরা যা করেন তাই আত্মসংযমের আদর্শ); এবং বিদ্বান্ (যখন এই আত্মসংযমকে ব্রহ্মরূপে জান); শমং ব্রজেৎ (তুমি আত্মসংযম অর্জন কর)।

সরলার্থ: এই বিনয় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক আত্মসংযম বলে পরিচিত। ব্রাহ্মণ স্বভাবতই আত্মসংযমে সক্ষম। তাঁরা যা কিছু করেন তাতেই সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সংযম তাঁরা পরিশ্রম করে অথবা শাস্ত্রবিধি অনুশীলন করে লাভ করেননি। যিনি এই আত্মসংযমকে ব্রহ্মেরই মূল স্বরূপ বলে জেনেছেন তিনি নিজে এই সংযম লাভ করেছেন।
ব্যাখ্যা: বিনয়ই ব্রাহ্মণের স্বভাব। এ কোন অর্জিত গুণ নয়, এ তাঁর সহজাত ধর্ম। সকলেই স্বরূপত ব্রহ্ম; এই বোধই তাঁদের বিনয়ের উৎস। এই বিনয় ব্রাহ্মণদের আত্মসংযমেরই অঙ্গ। আত্মসংযমই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মসংযম।

সবস্তু সোপলম্ভং চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে।
অবস্তু সোপলম্ভং চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে॥৮৭

অন্বয়: সবস্তু (বস্তু সহ); সোপলম্ভং চ দ্বয়ম্ (এবং তাদের [অর্থাৎ বস্তুর] উপলব্ধি, এই দুই একযোগে); লৌকিকম্ ইষ্যতে (জাগ্রত অবস্থা বলা হয়); অবস্তু (যদি কোন বস্তু না থাকে); সোপলম্ভম্ (কিন্তু [তথাপি বস্তু] দেখা যাচ্ছে); চ শুদ্ধং লৌকিকম্ ইষ্যতে (সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বপ্নাবস্থা যেখানে জাগ্রতের তুলনায় সীমিত বস্তুর উপলব্ধি হয় [সুতরাং বিশুদ্ধতর])।
সরলার্থ: বস্তুর উপস্থিতি ও তার উপলব্ধি—এ দুটি ব্যবহারিক সত্যকে একযোগে বলা হয় জাগ্রত অবস্থা। কিন্তু যদি বস্তু না থাকে, তবুও বস্তু দেখা যাচ্ছে তা হল স্বপ্নাবস্থা (এও সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থা। তবে জাগ্রতের তুলনায় সীমিত বস্তুর উপলব্ধি হয়)।
ব্যাখ্যা: প্রশ্ন উঠতে পারে : কেন অদ্বৈতবাদীদের নির্ভুল আর অন্যান্য মতবাদীদের ভ্রান্ত বলা হচ্ছে? অদ্বৈতবাদীরা শান্তি ও সমন্বয়ে বিশ্বাসী। শান্তি ও সমন্বয়ের একমাত্র উপায় একত্বের অনুভূতি একথাই অদ্বৈতবাদীরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের প্রতিপক্ষরা সবসময় বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত। তাঁরা কেবল তিক্ততা সৃষ্টি করেন।

অদ্বৈতবাদীদের মূল বক্তব্য: বস্তু ও তার উপলব্ধি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য। এই দুয়ের একযোগে উপস্থিতি আমাদের জাগ্রত অবস্থায়। বেদান্তবাদী এই অবস্থাকে স্বীকার করেন এবং এই অবস্থার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে থাকেন। কারণ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা জাগ্রত অবস্থাতেই সম্ভব। এই আত্মজ্ঞানলাভই জীবনের পরম লক্ষ্য।

জাগ্রত অবস্থার বিপরীত হল স্বপ্নবস্থা। এই অবস্থায় বস্তু না থাকলেও বস্তুর অনুভূতি হয়। এই অবস্থা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অদ্বৈতবাদীরা যে শুধুমাত্র স্বপ্নাবস্থাকেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেন তা নয়, তাঁদের কাছে জাগ্রত অবস্থাও একইভাবে মিথ্যা। তবে তাঁরা স্বীকার করেন যে জাগ্রত অবস্থার ব্যবহারিক সত্যতা আছে।

অবস্ত্বনুপলম্ভং চ লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্তিতম্।।৮৮

অন্বয়: অবস্তু (কোন জড়বস্তু নয়); অনুপলম্ভং চ (এবং প্রত্যক্ষ নয়); লোকোত্তরম্ (ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে [সুষুপ্তি]); ইতি স্মৃতম্ (পণ্ডিতদের দ্বারা এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে); বুদ্ধৈঃ (যাঁরা জানেন তাদের দ্বারা); সদা জ্ঞানম্ (নিরবচ্ছিন্ন [বস্তু] উপলব্ধি); জ্ঞেয়ম্ ([উপলব্ধির] বস্তু); বিজ্ঞেয়ং চ (বিশেষ জ্ঞানের বস্তুও [অর্থাৎ তুরীয়, পরম সত্য]); প্রকীর্তিতম্ (এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)।
সরলার্থ: যেখানে কোন জড়বস্তু নেই, বস্তু যে আছে এর বোধও নেই এবং যখন মানুষ সব ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে—সেই অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'গভীর নিদ্রা'(সুষুপ্তি) আখ্যা দিয়েছেন। যাঁরা আত্মাকে জানেন তাঁরা শুধু তিনটি উপাদান স্বীকার করেন— জ্ঞান, জ্ঞেয় (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা) এবং আত্মা (তুরীয়)।
ব্যাখ্যা: 'অবস্তু'র অর্থ—জড় বস্তুর অভাব, আর 'অনুপলম্ভ' কথাটির অর্থ—প্রত্যক্ষ নয়। এই দুটিই গভীর নিদ্রা তথা সুষুপ্তির লক্ষণ। জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা)—এই তিন অবস্থা হল জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। এই নামকরণের কারণ কি? কারণ, যত রকমের উপলব্ধি সম্ভব তা এই জ্ঞেয়র অন্তর্গত।

আরও এক ধরনের জ্ঞান আছে যা 'বিজ্ঞেয়' বলে খ্যাত। বিজ্ঞেয় কথাটির অর্থ বিশেষ ধরনের জ্ঞান। এই জ্ঞান বিশেষ তার কারণ এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান।

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্।
সর্বজ্ঞতা হি সর্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ।।৮৯

অন্বয়: জ্ঞানে (বস্তুর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের পর); ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে চ ([জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির] ত্রিবিধ জ্ঞান লাভের পর); ক্রমেণ বিদিতে (ক্রমশ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে); মহাধিয়ঃ (অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি); সর্বত্র (সব ব্যাপারে); হি (আপনিই); ইহ (এই জীবনেই); স্বয়ম্ এব সর্বজ্ঞতা ভবতি (পরম জ্ঞান তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ: ব্যবহারিক জ্ঞান ও (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির) ত্রিবিধ জ্ঞান অর্জন করলে মানুষ ক্রমে অসাধারণ মেধার অধিকারী হয়। এবং এই জীবনেই পরাজ্ঞান লাভ করে।

ব্যাখ্যা: সাধারণভাবে, আমরা তিনটি অবস্থার মধ্যে বাস করি—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় আমরা জড়বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি। স্বপ্নাবস্থায় যদিও কোন জড়বস্তু থাকে না, তবু জড়বস্তু নিয়ে কাজ করার অনুভূতি আমাদের হয়ে থাকে। গাঢ় নিদ্রাবস্থাতেও (সুষুপ্তি) কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের চেতনা থাকে না। এই তিন অবস্থাই আত্মার এলাকা। আমাদেরকে এই ত্রিবিধ অবস্থার পারে যেতে হবে।

এই তিন অবস্থার পারে পরম ব্রহ্ম। এই জ্ঞান লাভ হলে আমাদের ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটে। আমরা তখন সর্বজ্ঞ। এই রূপান্তর আপনিই ঘটে। আমরা তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠি।

হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রয়াণতঃ।
তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াদুপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ॥৯০

অন্বয়: অগ্রয়াণতঃ (প্রথমে); হেয় (ত্যাগ করতে হয় [তিন অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি]); জ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য বিষয় [পরম সত্য—ব্রহ্ম]); আপ্য (অর্জন করতে হয় [শাস্ত্রজ্ঞান, শিশুসুলভ স্বভাব, এবং নীরবতার অভ্যাস]); পাক্যানি (সংযত করতে হয় [রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি]; বিজ্ঞেয়ানি (যত্নসহকারে লক্ষ্য করতে হবে); বিজ্ঞেয়াৎ অন্যত্র (আত্মা ব্যতীত); ত্রিষু (তিনের মধ্যে [অর্থাৎ ত্যাগ করতে হবে, অর্জন করতে হবে এবং সংযত করতে হবে]); [সারবস্তু বলে কিছু নেই] তেষাম্ উপলম্ভঃ (যদিও ওদের অস্তিত্ব তুমি অনুভব করতে পার)।

সরলার্থ: (মুমুক্ষু ব্যক্তি হিসেবে) সাধককে তিনটি অবস্থা প্রথমেই এড়িয়ে চলতে হবে (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা যে তোমার আছে, সেই ধারণাকে মুছে ফেলতে হবে)। আর আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য একাগ্র হতে হবে), শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করতে হবে, বালকসুলভ স্বভাব এবং নীরব থাকার অভ্যাস করতে হবে, আর রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলিকে নিজের বশে আনতে হবে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আত্মজ্ঞান ছাড়া এই তিনের (অর্থাৎ বর্জন করতে হবে, অর্জন করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে) কোনও মূল্য নেই। সাধক এগুলির অস্তিত্বকে কেবল অনুভব করতে পারে।

ব্যাখ্যা: জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা আত্মায় আরোপিত হয়ে থাকে, এগুলি সত্য নয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতোই এগুলি ভ্রান্তিমাত্র। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ইন্দ্রিয়সুখকে

পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে। যেমন, সম্পদ, সন্তান বা স্বর্গ, সাধক তখন এসবের কিছুই কামনা করেন না। সাধককে শাস্ত্রপাঠ, শিশুসুলভ সারল্য ও নীরবতার অভ্যাস করতে হবে। সবসময় একথাটি মনে রাখতে হবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রকৃত্যাঽঽকাশবজ্‌জ্ঞেয়াঃ সর্বে ধর্মা অনাদয়ঃ।
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিঞ্চন।৯১

অন্বয়: সর্বে ধর্মাঃ (সকল জীবাত্মা); প্রকৃত্যা আকাশবৎ অনাদয়ঃ জ্ঞেয়াঃ (স্বভাবত আকাশের মতো [কারণ আত্মা নিষ্কলঙ্ক] এবং শাশ্বত বলে পরিচিত); তেষাং ক্বচন কিঞ্চন (এই আত্মার মধ্যে কোথাও এতটুকু); নানাত্বং ন হি বিদ্যতে (দ্বৈত বলে কিছু নেই)।

সরলার্থ: সকল জীবাত্মা স্বভাবত আকাশের মতো (কারণ জীবাত্মা নিষ্কলঙ্ক) এবং শাশ্বত বলে পরিচিত। এইসব জীবাত্মার মধ্যে দ্বৈতের কোনও স্থান নেই।

ব্যাখ্যা: মুমুক্ষু ব্যক্তি সকল জীবাত্মাকে (অনেক সময়েই ধর্ম বলে উল্লিখিত) আকাশের মতো সূক্ষ্ম, নিষ্কলঙ্ক, অনাদি এবং সর্বব্যাপী বলে গ্রহণ করবেন। 'ধর্ম' শব্দটি এখানে বহুবচনে (ধর্মাঃ) ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেইজন্য আমরা যেন ভুল না করি আত্মা অনেক। কোন অর্থেই আত্মা অনেক নয়—এক ও অভিন্ন।

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্বে ধর্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
যস্যৈবং ভবতি ক্ষান্তি সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥৯২

অন্বয়: সর্বে ধর্মাঃ (সকল আত্মা); প্রকৃত্যা এব (নিজ প্রকৃতি অনুসারে); আদি-বুদ্ধাঃ (সতত জ্যোতির্ময়); সুনিশ্চিতাঃ (সতত অভিন্ন); যস্য এবং ক্ষান্তিঃ ভবতি (সাধক যখন এই তত্ত্ব নিশ্চিতভাবে জানেন এবং তৃপ্ত হন [অর্থাৎ আত্মা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার আর প্রয়োজন মনে করেন না])। সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে (তিনি মোক্ষলাভ করেন)।

সরলার্থ: আত্মা স্বরূপত জ্যোতির্ময় এবং সতত অভিন্ন। সাধক এ তত্ত্ব আয়ত্ত করলে মোক্ষলাভ করেন।

ব্যাখ্যা: সূর্য যেমন সবসময়ই উজ্জ্বল আত্মাও তেমন সতত জ্যোতির্ময়। আমরা জানি বা না জানি আত্মা আত্মাই—স্বয়ং জ্যোতি এবং সর্বদা অভিন্ন। আমরা আত্মাকে জানার কথা বলি, কিন্তু এই জানা কোন বস্তুকে জানার মতো নয়। জ্ঞান সবসময়ই আমাদের ভেতরে রয়েছে। শুধু আমাদের যা করণীয় তা হল এই জ্ঞান এবং আমাদের মধ্যেকার আড়ালটুকু সরিয়ে

দেওয়া। এ অনেকটা আয়নার উপর থেকে ধুলোর আবরণ মুছে দেওয়ার মতো, তাহলেই আয়নায় আমরা নিজেদেরকে আরও পরিষ্কার দেখতে পাব। মন যখন সব মোহ থেকে মুক্ত হয় তখন জ্ঞান আপনা-আপনিই প্রকাশ পায়। তখন আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের আর কোনও সংশয় থাকে না। আত্মাকে জানার সব চেষ্টা এইখানেই শেষ হয়।

আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ।
সর্বে ধর্মাঃ সমাভিন্নাঃ অজং সাম্যং বিশারদম্।।৯৩

অন্বয়: সর্বে হি ধর্মাঃ (সকল, আত্মা); প্রকৃত্যা (স্বভাবত); এব আদিশান্তাঃ (সর্বদা প্রশান্ত); অনুৎপন্নাঃ (যার জন্ম নেই); সুনির্বৃর্তাঃ (মুক্ত); সমাভিন্নাঃ (সতত অভিন্ন); [অতএব] অজম্ (অনাদি); সাম্যং বিশারদম্ (নিঃসন্দেহে সদাপ্রসন্ন)।
সরলার্থ: আত্মা স্বভাবতই সদা প্রশান্ত, জন্মরহিত, নিত্যমুক্ত, এবং সতত অভিন্ন। আত্মা যে অনাদি এবং সদাপ্রসন্ন এ-বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।
ব্যাখ্যা: আত্মাকে প্রশান্ত বলা নিষ্প্রয়োজন। আত্মা স্বভাবতই শান্ত, চেষ্টা করে তাঁকে শান্ত করতে হয় না। আত্মার জন্ম নেই। আত্মা সদা বিদ্যমান, অপরিবর্তনীয় ও সর্বদা অভিন্ন। আত্মা নিত্যমুক্ত। যখন বলা হয় আত্মা অপরিবর্তনীয় তার অর্থ হল আত্মা যা আত্মা তাই। তাঁর পক্ষে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আত্মা শব্দটি এখানে বহুবচনে ব্যবহৃত, কিন্তু বস্তুত আত্মা এক ও অভিন্ন। অজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা মনে রেখেই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট হবে।

বৈশারদ্যং তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্বাদাস্তস্মাত্তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ।।৯৪

অন্বয়: সদা (সর্বদা); ভেদে বিচরতাম্ ([যারা] দ্বৈত জীবনচর্যায় মগ্ন); তু (আবার); বৈশারদ্যম্ (স্বচ্ছ [অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ চিন্তা]); ন বৈ অস্তি (তাদের আয়ত্ত নয়); তস্মাৎ (সুতরাং [যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করার অক্ষমতার হেতু]); ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্বাদাঃ (তারা [দ্বৈত] জগৎকে বেছে নেয় এবং বহু দেখে); তে [দ্বৈতিনাঃ] কৃপণাঃ স্মৃতাঃ (এই দ্বৈতবাদীরা সংকীর্ণচিত্ত ও হতভাগ্য)।

সরলার্থ: যাদের মন সবসময় দ্বৈতভূমিতে বিচরণ করে তারা কখনো শুদ্ধ আত্মাকে জানতে পারে না। যেহেতু তাঁরা সর্বত্র দুই দেখে এবং এই জগতের প্রতি আসক্ত হয়। এই দ্বৈতবাদীরা সংকীর্ণমনা এবং ভাগ্যহীন (যে হবেন) তাতে আর আশ্চর্য কি।

ব্যাখ্যা: যে আত্মাকে জানে না সে সংকীর্ণমনা এবং ভাগ্যহীন। এইরকম মানুষ জগতের প্রতি আসক্ত। সে এই জগৎকে ভোগ করতে চায়। ফলে তাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। আত্মার শুদ্ধস্বরূপ তথা সর্বভূতে একত্ব দর্শন করতে সে অক্ষম। সে সবকিছুতে ভেদ দর্শন করে। তার দৃষ্টিতে কিছু জিনিস প্রিয় আবার কিছু অপ্রিয়। সেই অনুযায়ী সে প্রিয় বস্তুর পেছনে ছোটে আর অপ্রিয়কে ত্যাগ করে।

অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে॥৯৫

অন্বয়: যে তু কেচিৎ (সেই সব লোক যাঁরা); অজে সাম্যে সুনিশ্চিতাঃ ভবিষ্যন্তি (সদা অভিন্ন ও জন্মরহিত আত্মাকে সংশয়াতীতভাবে জানেন); লোকে (এই পৃথিবীতে); তে হি মহাজ্ঞানাঃ (তাঁরা যথার্থই মহাজ্ঞানী); লোকাঃ (এই বিষয়ী লোকেরা); তৎ চ ন গাহতে (এই প্রজ্ঞাকে স্বীকার করেন না)।

সরলার্থ: এই জগতে যাঁরা জন্মরহিত এবং সতত অভিন্ন আত্মাকে নিশ্চিতরূপে জেনেছেন, তাঁরাই প্রকৃত অর্থে মহাজ্ঞানী। বিষয়ী লোকেরা কিন্তু তাঁদের এই প্রজ্ঞাকে স্বীকার করেন না।

ব্যাখ্যা: যাঁরা উদারমনা নন, শাস্ত্র পড়েননি, সুশিক্ষিত নন, বেদেও যাঁদের বিশ্বাস নেই আত্মজ্ঞান তাঁদের জন্য নয়। আত্মজ্ঞানের অধিকারী যিনি তাঁর পেশা বা সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, তিনি স্ত্রী বা পুরুষ যাই হোন না কেন তাঁকে উচ্চকোটির সাধক বলেই স্বীকার করতে হবে। এমন মানুষ দেবদেবীরও ঈর্ষার পাত্র। আকাশের অনেক উঁচুতে পাখিরা যেমন স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়ায়, এমন মানুষের মোক্ষলাভও তেমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়।

অজেষ্বজমসংক্রান্তং ধর্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্॥৯৬

অন্বয়: অজেষু ধর্মেষু জ্ঞানম্ অজম্ অসংক্রান্তম্ ইষ্যতে (আত্মায় নিহিত জ্ঞানও ঠিক আত্মার মতোই জন্মরহিত ও স্বতন্ত্র); যতঃ (যেহেতু); জ্ঞানং ন ক্রমতে (জ্ঞান [অন্য কোনও

উৎস থেকে] আসে না); তেন (সেই কারণে); [ব্রহ্ম] অসঙ্গম্ (একা [স্বতন্ত্র]); কীর্তিতম্ (উল্লিখিত)।

সরলার্থ: আত্মায় নিহিত জ্ঞানও আত্মার মতোই শাশ্বত ও স্বাধীন। যেহেতু অন্য কোনও উৎস থেকে আত্মাকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয় না সেহেতু আত্মাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মা এবং জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য যেমন সূর্য এবং তার উত্তাপ। তিনি আকাশের মতো স্বতন্ত্র। কোন অবস্থাতেই আকাশের যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, ঠিক তেমনি আত্মা অপরিবর্তনীয়। আবার আত্মার মতো জ্ঞানও স্বতন্ত্র, কারণ এই জ্ঞান কোন উৎস থেকে আসে না। জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত। আত্মার মতো জ্ঞানও জন্মরহিত এবং শাশ্বত। অর্থাৎ এই জ্ঞান ও আত্মা অভেদ।

অণুমাত্রেঽপি বৈধর্ম্যে জায়মানেঽবিপশ্চিতঃ।
অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ॥৯৭

অন্বয়: অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকী ব্যক্তি [তার মতে]); অণুমাত্রে অপি বৈধর্ম্যে জায়মানে (সামান্যতম পরিবর্তনও যদি আত্মায় সম্ভব হয়); সদা অসঙ্গতা ন অস্তি (তবে আত্মা যে সকল আসক্তি থেকে মুক্ত এ দাবি টিকবে না); কিম্ উত আবরণ চ্যুতিঃ (অজ্ঞানতার আবরণ দূর করার প্রশ্নটি তবে ওঠে কি করে?)

সরলার্থ: অবিবেকী ব্যক্তির মতে, আত্মাতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও সম্ভব হয় তবে আত্মা যে আসক্তিশূন্য এ দাবি টিকতে পারে না। (অর্থাৎ আত্মাও আসক্ত হতে পারে যার তাৎপর্য হল যে অজ্ঞানতার আবরণ আত্মাকে আড়াল করে রাখে।) তবে অজ্ঞানতার আবরণ দূর হবার প্রশ্ন ওঠে কিভাবে?

ব্যাখ্যা: যুক্তিহীন মানুষ তর্ক করে যে, জ্ঞান বলতে সবসময়ই কোন বস্তুর জ্ঞানকে বোঝায়। আত্মার স্বরূপই যদি জ্ঞান হয়, তবে তা স্বতন্ত্র হতে পারে না। বাইরের কোনও বস্তুর উপর আত্মা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, আত্মার পরিবর্তন অনিবার্য, সে পরিবর্তন সামান্যই হোক বা বিরাটই হোক।

অলব্ধাবরণাঃ সর্বে ধর্মাঃ প্রকৃতিনির্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ॥৯৮

অন্বয়: সর্বে ধর্মাঃ (সব আত্মা); অলব্ধ আবরণাঃ (অজ্ঞানতার আবরণ যার নেই); প্রকৃতি নির্মলাঃ (শুদ্ধ স্বভাব); আদৌ (পূর্বেও); বুদ্ধাঃ তথা মুক্তাঃ (প্রজ্ঞাবান বা অজ্ঞানতার বন্ধনমুক্ত); বুধ্যন্তে (তাঁরা আত্মাকে জানেন); ইতি (এইভাবে); নায়কাঃ (বেদান্তের আচার্যরা [ঘোষণা করেন])।

সরলার্থ: আত্মা কখনই অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত ছিলেন না। যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনি সতত শুদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ ও মুক্ত। বেদান্তের আচার্যরা আত্মাকে এইভাবেই প্রচার করেন।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈতবাদীরা এখানে তাঁদের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের মতে আত্মা নিত্যমুক্ত। আত্মা কোন দিনই অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা নন। কখনই তাঁর কোনও বন্ধন ছিল না।

তবে কেন বলা হয় 'আত্মা জানেন'? আত্মা যদি জ্ঞানস্বরূপ হন তবে সেই জ্ঞান কিভাবে জ্ঞাতা হতে পারে? উক্তিটির উদ্দেশ্য একটিই, জ্ঞান যে আত্মার স্বরূপ সেই কথাটির উপর জোর দেওয়া। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বলা হয় সূর্য কিরণ দিচ্ছে। উজ্জ্বলতা (কিরণ) সূর্যের স্বভাব, তবু সাধারণভাবে সূর্যের উজ্জ্বলতার উপর জোর দেওয়াই এই উক্তিটির উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্য কোনও বিশেষ তাৎপর্য নেই। আরও একটি দৃষ্টান্ত : 'ওখানে পাহাড়গুলি আছে।' সুদূর অতীত থেকেই ঐসব পাহাড় ওখানে ছিল এবং ভবিষ্যতেও বহুদিন থাকবে। উক্তিটি তথ্যপূর্ণ এর বিশেষ কোনও অর্থ নেই। 'আত্মা জানেন'—এই উক্তিটিও উপরোক্ত বিবৃতিগুলির মতো, বিশেষ কোনও তাৎপর্য নেই।

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ॥
সর্বে ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্‌বুদ্ধেন ভাষিতম্॥৯৯

অন্বয়: বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু ন হি ক্রমতে (জ্ঞানী কখনো [ব্রহ্ম ব্যতীত] অন্য বস্তুর চিন্তা করেন না); তায়িনঃ (অবিভক্ত); সর্বে ধর্মাঃ তথা জ্ঞানম্ [ন ক্রমতে] (সেই-প্রকার, বরণীয় জীবাত্মাসকল ও তাঁদের জ্ঞান [অর্থাৎ তাঁদের মন আর অন্য কোন দিকে ঘোরে না। তাঁরা সর্বদা আত্মচিন্তায় মগ্ন, অন্য কিছুর সত্তা তাঁরা স্বীকার করেন না]); এতৎ বুদ্ধেন ন ভাষিতম্ (বুদ্ধদেব এ বিবৃতি কখনো দেননি [অথবা এ বুদ্ধদেবের মত নয়])।

সরলার্থ: যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনি (ব্রহ্ম চিন্তা ছাড়া) অন্য কোনও চিন্তা করেন না। তাঁর মন সতত অভিন্ন। (কারণ তাঁর মনে আর দুই এর স্থান নেই।) এ জগতের সবকিছুকে (জীবাত্মা ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু) তিনি শ্রদ্ধা করেন। কারণ তিনি সর্বভূতে সেই এক

আত্মাকে দেখেন। সুতরাং কোন কিছুই তাঁর মনকে ব্রহ্মের চিন্তা থেকে সরিয়ে আনতে পারে না। বুদ্ধদেব এমন কথা কখনো বলেননি।

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি আত্মাকে জেনেছেন তিনি আত্মচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করতে পারেন না। তাঁর মন আত্মাতে স্থির। আত্মা আকাশের মতো সর্বব্যাপী। জ্ঞানও আকাশের তুল্য এবং সর্বত্র বিরাজমান। আকাশ যেমন কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না তেমনি কোনও কিছুই জ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

জীবাত্মাসকল আকাশের মতো রূপহীন, শাশ্বত, এক ও অদ্বিতীয়। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে পৃথক নয়। জীবাত্মাই পরমাত্মা। শাস্ত্র বলেন আত্মা কখনই জ্ঞানবর্জিত নয়।

আত্মাই একমাত্র সত্য আর বাইরের সব বস্তু মিথ্যা—এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধমতের কাছাকাছি হলেও এটি যথার্থ বৌদ্ধদর্শন নয়। বৌদ্ধদর্শন ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য আছে, তা হল : জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় অভিন্ন, অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদর্শন স্বীকার করে না।

দুর্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধ্বা পদমনানাত্বং নমস্কুর্মো যথাবলম্॥১০০

অন্বয়: দুর্দর্শম্ (বোঝা দুরূহ); অতি গম্ভীরম্ (প্রগাঢ়, সুগভীর); অজম্ (অনাদি); সাম্যম্ (সতত অপরিবর্তনীয়); বিশারদম্ (শুদ্ধ); অনানাত্বম্ (দুই নেই [অর্থাৎ আর বহু দেখে না]); পদম্ (এই মহান সত্য); বুদ্ধ্বা (বুঝে); যথাবলম্ (আমার যথাসাধ্য); নমস্কুর্মঃ (আমি নমস্কার করি)।

সরলার্থ: অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করা কঠিন। এই তত্ত্ব সুগভীর, অনাদি, সদা অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ এবং অদ্বৈত। আমি এই তত্ত্বকে বোঝার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছি। আমি তাঁকে নমস্কার করি।

ব্যাখ্যা: অদ্বৈততত্ত্ব অতি দুরূহ। কারণ এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল আত্মা, যাঁকে নিয়ে বহু বিতর্কের অবকাশ আছে। কেউ বলেন আত্মা আছেন আবার কেউ বলেন নেই। এ প্রসঙ্গে বহু পরস্পর বিরোধী মতবাদ আছে। সাধারণ মানুষের কাছে এ তত্ত্ব সমুদ্রের মতোই গভীর।

গৌড়পাদ বলছেন, তিনি উপলব্ধি করেছেন এই আত্মা অনন্য, অনাদি, শুদ্ধ এবং অপরিবর্তিত। এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা প্রায় দুঃসাধ্য, কিন্তু তিনি এই কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই পরম সত্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আচার্য এই প্রকরণের উপসংহার টেনেছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

(অন্বয়, সরলার্থ ও ব্যাখ্যার জন্য শ্লোক ১।১।১ এবং ২।১।১ দ্রষ্টব্য)

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

তৈত্তিরীয় উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত। 'তৈত্তিরীয়' শব্দটি এসেছে 'তিত্তির' থেকে। 'তিত্তির' হল এক ধরনের পাখি। তৈত্তিরীয় নামের পেছনে একটি কাহিনী আছে। এক সময়ে গুরু বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের আচরণে অসন্তুষ্ট হন। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও পণ্ডিত। কিন্তু অহঙ্কারী। তাঁর অহঙ্কারের জন্য গুরু বৈশম্পায়ন বিরক্ত। তিনি তাঁর অহঙ্কার দেখে একদিন বললেন: 'আমি তোমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছি। তুমি সেসব আমাকে এখনই ফিরিয়ে দাও। তুমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।' এই কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য গুরুপ্রদত্ত সমস্ত জ্ঞান বমি করে ফেলে দিলেন।

কিন্তু এই জ্ঞান অতি পবিত্র এবং মূল্যবান। এ জ্ঞান নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তাই বৈশম্পায়ন তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের বললেন: 'মাটিতে যে জ্ঞান পড়ে রয়েছে তা তোমরা খেয়ে নাও। তাঁরা তাই করলেন। তিত্তির পাখির রূপ ধরে ঐ বমি করা জ্ঞান খেয়ে নিলেন। এই ঘটনা দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছেন যে, জ্ঞান সবসময়ই পবিত্র। যেহেতু আত্মজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ—সেহেতু, এই জ্ঞানকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। যেভাবেই হোক এই জ্ঞান রক্ষা করা উচিত।

যজুর্বেদ দুটি অংশে বিভক্ত—কৃষ্ণ এবং শুক্ল। কৃষ্ণ কথার অর্থ হল কালো অর্থাৎ অপবিত্র। কিন্তু জ্ঞান কখনও অপবিত্র হতে পারে না। তবে জ্ঞানের আধার অর্থাৎ যিনি সকলের মধ্যে এই জ্ঞান বিতরণ করেন, তিনি অপবিত্র হলেও হতে পারেন। এরকম ব্যক্তি যে জ্ঞান দান করেন তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। এখানে তিত্তির জাতীয় পাখিরা (বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যরা) যে জ্ঞান পেয়েছেন তা অপবিত্র, কারণ তাঁরা নিজেরাই অপবিত্র। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এর ব্যতিক্রম। তিনি অন্য শিষ্যদের মতো নন। তিনি বেদের এই জ্ঞানকে পুনরায় লাভ করার জন্য সূর্যের উপাসনা করে সূর্যের মতো পবিত্র হলেন। আর এই অবস্থায় যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন তা শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ।

এই উপনিষদে তিনটি বল্লী রয়েছে। প্রথমেই আছে শীক্ষাবল্লী—উচ্চারণ ও ধ্বনিই (মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান) এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেযুগে শিষ্যদের ঠিক ঠিক ভাবে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতে শেখানো হত। এটি খুবই দরকারী। কারণ, উচ্চারণ ও আবৃত্তি ঠিক না হলে বেদমন্ত্রের অর্থটাই হয়তো বদলে গেল। কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়, কোন্ পথে ইন্দ্রিয়গুলিকে চালনা করতে হয়, যেমন, চোখ দিয়ে আমরা কি দেখব, পা-কে নিয়ে কোথায়

যাব ইত্যাদি—এই অংশে তারও বিশদ আলোচনা রয়েছে। উপনিষদের কথা মেনে প্রার্থনা করলে নানাবিধ বর যেমন—সন্তান, সম্পদ, স্বর্গ এমনকি আত্মজ্ঞানও লাভ করা যায়। এখানে দেহমনের শৃঙ্খলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত দেহমনের যিনি অধিকারী তিনি সবকিছুকে লাভ করতে পারেন।

শীক্ষাবল্লীতে 'ওম্' উপাসনার প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ 'ওম্' ব্রহ্মেরই প্রতীক। 'ওম্' শুধুমাত্র প্রতীক নয়, 'ওম্' জগতের এক বস্তুর সাথে অপর এক বস্তুর মিলন সেতুও বটে। 'ওম্'ই জগৎকে ধারণ করে রেখেছেন। এই 'ওম্'-এর উপাসনার দ্বারা মানুষ একাধারে সম্পদ ও মেধা দুই-ই লাভ করেন। তাই তখন চারদিক থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে এসে ভিড় করে। এই বল্লী বেদের অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতিকেও মেনে চলার নির্দেশ দেন। প্রতিটি উপাসনা পদ্ধতির লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা।

এই বল্লীতে সর্ব মোট এগারটি অধ্যায় আছে। কিভাবে জ্ঞানলাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, আচার্য শঙ্কর প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁর ভাষ্যে সেই আলোচনাই করেছেন। এই সব আলোচনা কালে বহু প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে এবং তা নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে। এদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় হল জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান। সব শেষে সিদ্ধান্ত হল জ্ঞান স্বতন্ত্র এবং জ্ঞান কারোর সৃষ্ট নয়। তা সত্ত্বেও শাস্ত্রে যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তা পালন করা উচিত।

এছাড়াও এখানে কিছু মূলনীতির কথা বলা হয়েছে যা থেকে আমরা কখনই সরে যাব না। এদের মধ্যে প্রধান দুটি নীতি হল সত্যে নিষ্ঠা এবং সৎ হওয়া। গৃহস্থ হিসাবে বাবা মা ও গুরুকে শ্রদ্ধা করতে হবে, অতিথিকে যথাযথ আপ্যায়ন করতে হবে, উপযুক্ত সম্মান সহ অপরকে সাহায্য করতে হবে।

এইসব আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, আত্মজ্ঞান লাভে সকলেরই সমান অধিকার। আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা আমরা কি করি—আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে এসব জানার কোন দরকার নেই। এর জন্য একমাত্র প্রয়োজন হল তীব্র আধ্যাত্মিক সাধন এবং আত্মসংযম। এর ফলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং জ্ঞান তখন আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।

শেষ উপদেশটি দেওয়া হয় সেই সব ছাত্রদের যারা গুরুগৃহে পাঠ শেষ করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন। এমনকি এখনও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রদের অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

এই উপনিষদের দ্বিতীয় অংশ হল ব্রহ্মানন্দ বল্লী। ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা বোধ হলে যে আনন্দ তাই ব্রহ্মানন্দ। আমাদের সকলের অন্তরস্থ আত্মা হলেন এই ব্রহ্ম। কিন্তু এই আত্মাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না কারণ, এক কোষের মধ্যে আর এক কোষ,

এভাবে একাধিক কোষ এই আত্মাকে ঢেকে রেখেছে। এ যেন খাপের ভেতরে রাখা তরবারির মতো। এই কোষরূপ আবরণগুলিকে সরিয়ে আমাদের আত্মাকে আবিষ্কার করতে হবে।

কিন্তু এই কোষগুলি কি কি? প্রথমে আছে অন্নময় কোষ। এটি জড় এবং স্থূলতম। দ্বিতীয় কোষ প্রাণময়। তারপরে যথাক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং সবশেষে হচ্ছে আনন্দময়। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম—এই ক্রমে কোষগুলি একটির ভেতর আর একটি রয়েছে। এই কোষগুলি হল চৈতন্যের এক একটি ধাপ। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধাপ হল ব্রহ্মানন্দ। জীবনের লক্ষ্য হল এই ব্রহ্মানন্দ লাভ করা। অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম', এটা উপলব্ধি করে ব্রহ্মে লীন হওয়া।

এই সব কোষ কিভাবে সত্য বলে প্রতিভাত হয় উপনিষদে তা আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এইসব কোষ এতই সত্য যে, আমরা নিজেদেরকে কোষের সাথে অভিন্ন বলে মনে করি। উপনিষদ আমাদের এই কোষগুলিকে অস্বীকার করতে বলেন না। দেহ উপেক্ষার বিষয় এমন কথা উপনিষদ কখনও বলেন না, বরং বলেন, সবকিছুকে এমনকি যা স্থূল, যা জড় তাকেও ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করতে হবে। এই দেহও ব্রহ্ম। কারণ, শরীর ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব। আত্মজ্ঞান লাভের এটাই প্রবেশদ্বার। সুস্থ সবল শরীর ছাড়া আধ্যাত্মিক পথে এগোনো বড়ই কঠিন। শুধু শরীরই নয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে সুস্থ মন ও তীক্ষ্ণ মেধারও প্রয়োজন। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সবই আত্মজ্ঞান লাভের যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্রগুলো আমাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে, না এর দ্বারা আমাদের কল্যাণ হবে, তা নির্ভর করে আমাদের ওপর। অর্থাৎ কোন্ পথে আমরা এই সব দেহ, ইন্দ্রিয়কে চালনা করব তার উপর। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রহ্মানন্দ বল্লীর মূল কথা হল: যখন কেউ ব্রহ্মকে জানেন তখন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। এই সকল শব্দকে কি ব্রহ্মের গুণ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে? না। ব্রহ্ম যদি এক না হয়ে বহু হতেন তখন একটি ব্রহ্ম থেকে অপর ব্রহ্মের পার্থক্য বোঝাতে এইসব বিশেষণ ব্যবহার করা হত। কিন্তু ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়—যিনি একই সাথে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই জ্ঞান আবার ব্রহ্মই অনন্ত।

শাস্ত্র বলেন, সবকিছুর অন্তরস্থ যিনি, তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকেই সব কিছুর উদ্ভব। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার। একই ব্রহ্ম কোথাও জ্ঞাতা, কোথাও জ্ঞেয় আবার কোথাও বা জ্ঞান। একমাত্র ব্রহ্মই একসাথে এই তিন সত্তা হতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্রহ্মই সবকিছু, আবার সবকিছুই হচ্ছে এই ব্রহ্ম।

এই বল্লী অবশ্য বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন, বেদান্তের তত্ত্বটি হল, স্রষ্টা কোন কিছু সৃষ্টি করেন এবং তারপর তার মধ্যে নিজে প্রবেশ করেন। এ কেমন করে সম্ভব? বেদান্ত বলেন, একই আত্মা সকলের মধ্যে এবং সবকিছুর মধ্যে রয়েছেন। সুতরাং আত্মা কিছু সৃষ্টি করছেন এবং তারপর আবার তাতে প্রবেশ করছেন, এ দুই-ই মিথ্যা। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, সবকিছুর মধ্যে একই আত্মা রয়েছেন, ভিতরে আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনিই সব। সবকিছুই তাঁর ওপর ন্যস্ত।

এই উপনিষদের তৃতীয় অংশ—ভৃগুবল্লীতে কোষসমূহের প্রশংসা করা হয়েছে। ভৃগুবল্লী শুরু হয়েছে একটি গল্প দিয়ে। ঋষি বরুণের ভৃগু নামে এক মেধাবী পুত্র ছিল। একদিন ভৃগু তাঁর বাবার কাছে এসে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে চাইলেন। উত্তম আচার্য বরুণ মনে মনে উপলব্ধি করলেন যে, সব কিছু একবারে শেখানো যায় না। তাই তিনি ভৃগুকে ধাপে ধাপে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

প্রথমে বরুণ তাঁর পুত্রকে বললেন, সবকিছুর উৎস এই ব্রহ্মকে ধ্যান কর। ভৃগু মনে করলেন এই জগৎই ব্রহ্ম। পিতা সে কথায় কোন আপত্তি না করে পুত্রকে ধ্যানে মগ্ন হতে বললেন। ভৃগু ধ্যানমগ্ন হয়ে শেষে আবিষ্কার করলেন এই জড়জগৎই শুধুমাত্র ব্রহ্ম নন, প্রাণবায়ু, মন, বুদ্ধি, আনন্দ এসবের উৎসও হচ্ছে ব্রহ্ম। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর সবকিছুই ব্রহ্মের ওপর আরোপিত মাত্র।

প্রথম খণ্ড

শীক্ষাবল্লী

প্রথম অধ্যায়

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥১

ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: মিত্রঃ (মিত্র, সূর্য); নঃ (আমাদের প্রতি); শম্ (অনুকূল [হোন]); বরুণঃ (নিঃশ্বাস ও রাত্রির নিয়ামক দেবতা); শম্ ([আমাদের প্রতি] অনুকূল হোন); অর্যমা (অর্যমন, চক্ষু ও সূর্যের নিয়ামক দেবতা); ভবতু (হোন); শম্ (অনুকূল); নঃ (আমাদের প্রতি); ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র, শক্তির প্রতীক যে দেবতা); বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি, বাক্ ও মেধার প্রতীক যে দেবতা); নঃ শম্ (আমাদের প্রতি অনুকূল [হোন]); বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ (বিষ্ণু, যিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে বিচরণ করেন এবং শক্তির প্রতীক); নঃ শম্ (আমাদের প্রতি অনুকূল [হোন]); ব্রহ্মণে নমঃ (ব্রহ্মকে নমস্কার); বায়ো নমঃ তে (বায়ু, আপনাকে প্রণাম করি); ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি (আপনি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেউ নন); ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি; (আমি ঘোষণা করব যে, আপনিই প্রকৃত ব্রহ্ম); ঋতং বদিষ্যামি (আমি আপনাকে সত্যস্বরূপ বলে ঘোষণা করব); সত্যং বদিষ্যামি (আমি আপনাকে সত্য বলেও ঘোষণা করব); তৎ মাম্ অবতু (সেই [ব্রহ্ম] যেন আমাকে রক্ষা করেন); তৎ বক্তারম্ অবতু (সেই [ব্রহ্ম] যেন বক্তাকে [আচার্যকে] রক্ষা করেন); অবতু মাম্ ([ব্রহ্ম] আমাকে রক্ষা করুন); অবতু বক্তারম্ ([ব্রহ্ম] বক্তাকে [আচার্যকে] রক্ষা করুন)।

শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত-বিঘ্নের শান্তি])।

ইতি প্রথমঃ অনুবাকঃ (এখানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: মিত্র অর্থাৎ সূর্যদেব আমাদের কল্যাণ করুন। বরুণ আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। অর্যমন (সূর্য ও চক্ষুর দেবতা) আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ইন্দ্র আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। বৃহস্পতি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। বিষ্ণু যিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে চলেন তিনি আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু আপনাকেও নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নন। আমি ঘোষণা করব আপনিই প্রকৃত ব্রহ্ম। আমি আরো বলব আপনি ঋতস্বরূপ; অর্থাৎ, আপনিই স্বয়ং সত্য। বায়ুরূপী ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আপনি আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে (আচার্য) রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ব্যাখ্যা: বহু দেবতার উদ্দেশেই এই প্রার্থনা। আমরা অত্যন্ত কঠিন কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। বেদান্ত পাঠ অতি দুরূহ আবার একই সঙ্গে লোভনীয়। এই জন্য আমাদের সকল দেবতার আশীর্বাদ, শুভ কামনা ও সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। 'শম্' কথাটির অর্থ হল 'অনুকূল হোন', 'প্রসন্ন হোন', 'সহায়ক হোন'।

মিত্র এবং বরুণ দেবতাদের মধ্যে প্রধান। সূর্যকে অনেক সময়ই মিত্র বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সূর্য হলেন দিনের বেলার দেবতা। বরুণ হলেন রাতের দেবতা। অর্যমন হলেন সমগ্র সৌরমণ্ডল ও চোখের নিয়ামক দেবতা। বিষ্ণুকে বলা হয় 'উরুক্রমঃ', যিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে চলেন। এই স্তোত্রে বলা হয়েছে দেবতারা ছোট থেকে মহৎ দেবতায় পরিণত হচ্ছেন। বিষ্ণু হচ্ছেন বৃহৎ, তিনি বরুণ ও মিত্রের তুলনায় বিরাট।

বায়ুও খুব গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। যেহেতু বায়ু সর্বত্র রয়েছেন সেহেতু বায়ুকেও এখানে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হল বৃহত্তম। উপনিষদ এখানে বলছেন যে, বায়ু ব্রহ্মের প্রতীক এবং বায়ুকে অনুভব করা যায়। তিনি অপরোক্ষ।

'ঋতং' ও 'সত্যং' শব্দ দুটির অর্থ প্রায় এক। কিন্তু এদের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। 'ঋতং' শব্দটির অর্থ হল 'নৈতিক শৃঙ্খলা', 'সততা'। নৈতিক শৃঙ্খলা বোধ না থাকলে কোন সমাজ, সভ্যতা এমনকি জগৎও টিকে থাকতে পারে না। 'সত্যম্' অর্থ হল সত্য। শিষ্য বলছেন, 'আমি আপনাকে ঋতস্বরূপ, সত্যস্বরূপ বলব।'

'তৎ মাম্ অবতু তৎ বক্তারম্ অবতু'—অনুগ্রহ করে আমাকে এবং আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। আচার্য এবং শিষ্য উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ ও দৃঢ় হতে হবে। শিষ্য যদি নির্বোধ হন তবে তিনি কোন কিছুই শিখতে পারবেন না। ঠিক তেমনি আচার্য যদি অযোগ্য হন তবে তিনিও কিছু শেখাতে পারবেন না। অতএব দুজনকেই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে যোগ্য হতে হবে।

‘শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ’। মানুষের জীবনে তিন রকমের বিঘ্ন আসতে পারে। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক বিপদ, রোগাদি; আধিদৈবিক বিঘ্ন—দৈব বিপদ, আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনা ইত্যাদি এবং আধিভৌতিক বিঘ্ন—হিংস্র প্রাণীদের হিংসা ইত্যাদি। তাই প্রার্থনায় তিনবার ‘শান্তি’ কথাটি বলা হয় যাতে কোন দিক থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥ ১॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: শীক্ষাম্ (উচ্চারণ); ব্যাখ্যাস্যামঃ (আমরা আলোচনা করব); বর্ণঃ (বর্ণের শব্দ); স্বরঃ (উচ্চারণ ভঙ্গি); মাত্রাঃ (গলার উঁচু নীচু); বলম্ (গলার শক্তি); সামঃ (সুরের উঁচু নীচু); সন্তানঃ (উচ্চারণের সমতা); ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ উক্তঃ (এ সবই শীক্ষা অধ্যায়ে বলা হয়েছে); ইতি দ্বিতীয়ঃ অনুবাকঃ (দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (এখন) আমরা উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করব (কাকে বলে)। বর্ণ উচ্চারণের প্রণালী, উদাত্তাদি স্বর, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা, কথা বলার সময়ে যে সমতা বজায় রাখা হয়, স্বরশক্তি, ছন্দ এবং স্বরস্থিতি—এগুলি শিক্ষার বিষয়। উচ্চারণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই সবই আলোচনা করা হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা: একথা সত্য যে, অর্থ না বুঝে উপনিষদ পাঠের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু এর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ যদি ঠিকমতো না হয় তবে এর আসল অর্থটা অনেক সময়ই বদলে যায়। তাই শব্দ সমূহের শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করতে হলে কোন্ কোন্ বিষয় শিখতে হবে এই শ্রুতিতে সেকথাই বলা আছে। শিক্ষার যে অংশে উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হল সংহিতা। যেহেতু উপনিষদ পাঠে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই একে উপনিষদেরই অঙ্গ বলে মনে করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যোরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ॥১

বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। অথাধিজ্যৌতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যৌতিষম্। অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্॥২

অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্। অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্॥৩

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্। ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সংধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন॥৪॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: নৌ (আমরা উভয়েই [আচার্য এবং শিষ্য]); সহ (সমভাবে); যশঃ (খ্যাতি [বৃদ্ধি পায়]); নৌ সহ ব্রহ্মবর্চসম্ (আমরা যেন সমভাবে ব্রহ্মগৌরব প্রাপ্ত হই); অতঃ (এই কারণে); অথ (এখন থেকে); অধিলোকম্ (এই পৃথিবী ও অন্যান্য লোকসংক্রান্ত সব কিছু); অধিজ্যৌতিষম্ (অগ্নি ও অন্যান্য উজ্জ্বল বস্তু সংক্রান্ত সব কিছু); অধিবিদ্যম্ (আচার্য ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত সব কিছু); অধিপ্রজম্ (পিতা মাতা ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়); অধ্যাত্মম্ (দেহ ও মন সংক্রান্ত বিষয়); পঞ্চসু অধিকরণেষু (এই পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে); সংহিতায়াঃ (এই সব আনুষঙ্গিক বিষয় [এক ধরনের নির্মাণ করে]); উপনিষদম্ (উপনিষদ [এবং তার অন্তর্নিহিত দর্শন]); ব্যাখ্যাস্যামঃ (আমরা ব্যাখ্যা করব); তাঃ মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (সে সবই মহাসংহিতা বলে পরিচিত [কারণ সেগুলির আলোচ্য বিষয় গুরুত্বপূর্ণ]); অথ (এখন); অধিলোকম্ (বিভিন্ন লোক সংক্রান্ত দর্শন [ব্যাখ্যাত হচ্ছে]); পৃথিবী পূর্বরূপম্ ([অধিলোক সংহিতার] প্রথম অংশটিকে পৃথিবী-রূপে [ধ্যান কর]); দ্যৌঃ উত্তররূপম্ (শেষ অংশটি স্বর্গ); আকাশঃ সন্ধিঃ (আকাশ যেন উভয়কে মিলিত করেছে)।

বায়ুঃ সন্ধানম্ (বায়ু তাদের যুক্ত করে); ইতি অধিলোকম্ (বিভিন্ন লোক বিষয়ক দার্শনিক মতবাদ); অথ অধিজ্যৌতিষম্ (এর পর দীপ্যমান বস্তু সংক্রান্ত দর্শন); অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ (প্রথম অংশটি অগ্নিরূপে বিবেচিত [এবং সেই অনুযায়ী ধ্যানযুক্ত হও]); আদিত্য উত্তররূপম্ (শেষ অংশটি আদিত্য তথা সূর্য রূপে বিবেচ্য); আপঃ সন্ধিঃ (জলই মিলন সেতু); বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্ (বিদ্যুতের সার তাদের যুক্ত করে); ইতি অধিজ্যৌতিষম্ (এই উজ্জ্বল বস্তু সংক্রান্ত দর্শন); অথ অধিবিদ্যম্ (এরপর বিদ্যা বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে); আচার্যঃ পূর্বরূপম্ (প্রথম অংশ আচার্য সংক্রান্ত)।

অন্তেবাসী উত্তররূপম্ (আবাসিক শিষ্য হল শেষ অংশ); বিদ্যা সন্ধিঃ (বিদ্যাশিক্ষা এদের মিলনক্ষেত্র); প্রবচনং সন্ধানম্ (আচার্য ও শিষ্যের সম্মেলক আবৃত্তি তাঁদের যুক্ত করে); ইতি

অধিবিদ্যম্ (এই হল বিদ্যাশিক্ষা সংক্রান্ত দর্শন); অথ অধিপ্রজম্ (এখন বংশধর সংক্রান্ত); মাতা পূর্বরূপম্ (মা হলেন প্রথম অংশ); পিতা উত্তররূপম্ (পিতা হলেন শেষাংশ); প্রজা সন্ধিঃ (সন্তান মিলন ক্ষেত্র); প্রজননং সন্ধানম্ (সন্তান উৎপাদন তাঁদের মিলিত করে); ইতি অধিপ্রজম্ (এই হল বংশধর সংক্রান্ত দর্শন)।

অথ অধ্যাত্মম্ (এবার দেহমন সংক্রান্ত কথা); অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্ (নিম্ন চোয়াল হল প্রথম অংশ); উত্তরা হনুঃ উত্তররূপম্ (ঊর্ধ্ব চোয়াল হল শেষ অংশ); বাক্ সন্ধিঃ (বাগিন্দ্রিয় হল মিলন ক্ষেত্র); জিহ্বা সন্ধানম্ (জিহ্বা [অগ্রভাগ থেকে মূল পর্যন্ত] তাদের যুক্ত করে); ইতি অধ্যাত্মম্ (এই হল দেহ মন সংক্রান্ত দর্শন); ইতি ইমাঃ মহাসংহিতাঃ (এই সব মিলে মহাসংহিতা গঠিত); যঃ এবম্ এতাঃ মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ (যিনি ব্যাখ্যা সহ এই মহাসংহিতা জানেন); প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন অন্নাদ্যেন সুবর্গ্যেন লোকেন সংধীয়তে (তিনি সন্তান, পশু সম্পদ, ব্রহ্মজ্যোতি, খাদ্য এবং স্বর্গ প্রভৃতির অধিকারী হন); ইতি তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ (তৃতীয় অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (১-৪) শিক্ষাদানের গৌরবে আচার্য এবং বিদ্যাগ্রহণের যোগ্যতায় শিষ্য—আমাদের উভয়েরই যশ সমভাবে বৃদ্ধি পাক। আমাদের উভয়েরই ব্রহ্মজ্যোতি সমভাবে প্রকাশিত হোক।

ব্যাখ্যা: (পাণ্ডিত্য হয়তো আমাদের কোন বিষয়ের গভীরে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের দ্বারা পরম সত্যের জ্ঞানলাভ নাও হতে পারে।) এইজন্য পঞ্চক্ষেত্রের মধ্যে যে দর্শন লুকিয়ে আছে তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই পঞ্চক্ষেত্রগুলি হল—পৃথিবী ইত্যাদি বিষয়ক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির্বিষয়ক, আচার্য ও বিদ্যাবিষয়ক, মাতা ও সন্তানবিষয়ক এবং মানব দেহসংক্রান্ত। এই সকল বিষয়গুলিকে একযোগে মহান উপনিষদ বলা হয়। বিষয় সকলের গুরুত্বের জন্যই একে 'মহান' বলা হয়।

আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব পৃথিবী ও অন্যান্য লোক সংক্রান্ত উপনিষদ দিয়ে। এই সংহিতায় প্রথম অংশটি হল পৃথিবী এবং শেষ অংশটি স্বর্গ। আর এই দুইয়ের মাঝে আছে আকাশ। বায়ু এদেরকে যুক্ত করে। আমরা যদি এই লোকসমূহের ধ্যান করতে চাই তবে এই পরম্পরাক্রমেই তা করতে হবে।

এরপরে আসছে অগ্নি ও অন্যান্য জ্যোতির্ময় বস্তুর ধ্যান। এই সংহিতার প্রথম অংশ হল অগ্নি ও শেষ অংশ হল আদিত্য অর্থাৎ সূর্য। এদের মাঝে আছে জল। বিদ্যুৎই এদেরকে মিলিত করে। এইভাবেই জ্যোতির্ময় বস্তুর ধ্যান করা উচিত।

এরপর হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত ধ্যান। এই সংহিতার প্রথমেই আছেন আচার্য, শেষে আছেন আবাসিক শিষ্য (গুরুগৃহে বাস)। এদের দুজনের মাঝে রয়েছে শিক্ষাগ্রহণ। আচার্য ও

শিষ্যকে যুক্ত করে তাঁদের মিলিত আবৃত্তি। এইভাবে শিক্ষাবিষয়ক ধ্যান করতে হয়।

এর পরবর্তী ধ্যান বংশধর সংক্রান্ত। এই সংহিতার প্রথমে আছেন মা, শেষে আছেন বাবা। আর এঁদের মাঝে আছে সন্তান। প্রজননে তাঁরা মিলিত। এই হল বংশধরসংক্রান্ত ধ্যান।

তারপর দেহ ও মনের ধ্যান। এই সংহিতার প্রথম ভাগ হল নিম্ন চোয়াল ও শেষ ভাগ হল ঊর্ধ্ব চোয়াল। এদের মধ্যে আছে বাগিন্দ্রিয়—জিভের দ্বারা এরা পরস্পর যুক্ত। এই হচ্ছে দেহমন সংক্রান্ত ধ্যান।

এই সবগুলিকে একসাথে মহাসংহিতা অর্থাৎ মহৎ সাহিত্য বলা হয়। যিনি মহাসংহিতা জানেন অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জেনে এর উপাসনা করেন কালে তিনি সন্তান, প্রাণী-সম্পদ, ব্রহ্মজ্যোতি, অন্ন এবং স্বর্গ লাভ করে থাকেন।

এখানে 'অথ' কথাটির অর্থ হল 'এরপর'। কিন্তু কিসের পর? অনেক বই পড়ার পর। বই পড়া ও পাণ্ডিত্য নিশ্চয়ই দরকার কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। তাই উপনিষদ আমাদের এই জগৎ ও অন্যান্য চারটি লোক সংক্রান্ত ধ্যানের পরামর্শ দিচ্ছেন। এইসব লোকের সাথে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কেমনভাবে এই ধ্যান করতে হয় তা মহাসংহিতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহাসংহিতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই এটি উপনিষদের অন্তর্গত।

কেমন করে আমরা ধ্যান করব? বস্তুর জড় ধর্ম কিন্তু ধ্যানের বিষয় নয়। এইসব বস্তু যে-দেবতাদের প্রতীক তাঁদের ধ্যান করতে হবে। কেউ যখন শালগ্রাম শিলাকে ভগবান বিষ্ণুরূপে উপাসনা করেন তখন তিনি কিন্তু বিষ্ণুরই ধ্যান করেন, শালগ্রাম শিলার নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা পৃথিবী, অন্যান্য লোক ও জ্যোতির্ময় বস্তু ইত্যাদি জড় বস্তুর ধ্যান করি না। এইসব বস্তু যেসব দেবতাদের প্রতীক তাঁদেরই ধ্যান করি এবং মনকে তাঁদের ওপরই একাগ্র করি। এই সাকার ধ্যানের মধ্য দিয়েই এইসব রূপ যে-অধ্যাত্মশক্তির প্রতীক সেই শক্তিকে লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। এই সব অধ্যাত্মশক্তি ব্রহ্মের কাছ থেকেই আসে। তাই ধ্যান করতে করতে আমরা ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা উপলব্ধি করে থাকি। এই ধ্যানই আমাদের ব্রহ্মের দিকে নিয়ে যায়। এখানে এটাই হল সংহিতার বাণী।

চতুর্থ অধ্যায়

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎসংবভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা।

কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। আবহন্তী বিতন্বানা॥১

কুর্বানাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমাঽঽয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমাঽঽয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥২

অন্বয়: যঃ ছন্দসাম্ (যা [অর্থাৎ ওম্] বেদমন্ত্রের মধ্যে); ঋষভঃ (সর্বোত্তম [আক্ষরিক অর্থে, বৃষ]); বিশ্বরূপঃ (সর্বত্র বিরাজমান [প্রত্যেক বাক্-রীতিতে]); ছন্দোভ্যঃ অমৃতাৎ (জ্ঞানার্জনের পন্থাসমূহ থেকে অর্থাৎ বেদ থেকে); অধিসংবভূব (উন্মেষিত [অর্থাৎ এসেছে]); সঃ (সেই [ওম্]); ইন্দ্রঃ (দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ [যিনি তোমাকে যে কোন কাম্য বস্তু দান করতে সক্ষম]); মেধয়া মা স্পৃণোতু (আমাকে মেধাবী করুন); দেব (হে প্রভু); অমৃতস্য ধারণঃ ভূয়াসম্ (আমি যেন অমৃতত্ব লাভ করতে পারি); মে শরীরং বিচর্ষণম্ (আমার দেহ আত্মজ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত হোক); মে জিহ্বা মধুমত্তমা (আমি যেন মিষ্টভাষী হই); কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্ (আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ শুনতে আমার কান দুটি আমাকে প্রভূত সহায়তা করুক); [হে ওম্] মেধয়া (লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা); পিহিতঃ (আবৃত); ব্রহ্মণঃ কোশঃ অসি (আপনি ব্রহ্মের প্রতীক); মে শ্রুতং গোপায় (যতটুকু আমি শিখেছি অনুগ্রহ করে তা রক্ষা করুন); আত্মনঃ মম (আপনার অনুগ্রহে আমি যেন পাই); চিরং বাসাংসি (প্রচুর বস্ত্র); গাবঃ (গবাদি পশু); চ অন্ন-পানে চ (খাদ্য এবং পানীয়); সর্বদা (সর্বদা); আবহন্তী (আমাকে এনে দিন); বিতন্বানা (বিস্তার করেন); কুর্বাণা (এ ধরনের প্রাচুর্য হোক); লোমশাম্ (দীর্ঘ লোমসম্পন্ন ছাগ ও মেষ); পশুভিঃ (অন্যান্য পশু); সহ (সহ); শ্রিয়ম্ (প্রাচুর্য); ততঃ (পরে [উন্নত মেধার অধিকারী হবার পর]); মে আবহ (আমার কাছে নিয়ে আসুন); স্বাহা (স্বাহা [যে শব্দটি আহুতি দান সম্পন্ন করে উচ্চারণ করতে হয়]); আ মা আয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (চর্তুদিক থেকে ছাত্রদলও যেন আমার কাছে আসে); বি মা আয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (সকল সম্ভাব্য উপায়ে ছাত্রদল যেন আমার কাছে আসে); প্র মা আয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (ন্যায্যপথে ছাত্রদল যেন আমার কাছে আসে); দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (শারীরিক সংযম তথা ব্রহ্মচর্য সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবার পর ছাত্রদল যেন আমার কাছে আসে); শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (মানসিক সংযম সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবার পর ছাত্রদল যেন আমার কাছে আসে)।

সরলার্থ: (১-২) বেদের সারাৎসারই 'ওম্' এবং সর্বপ্রকার বাক্-রীতিতে অর্থাৎ সব শব্দের মধ্যে এই 'ওম্' রয়েছেন। বেদ আমাদের আত্মজ্ঞানের পথ দেখায় এবং ওম্ সেই বেদের কাছ থেকেই এসেছেন। আমাদের সকল কামনা বাসনা যিনি পূর্ণ করেন সেই পরমেশ্বর ইন্দ্র

ও 'ওম্' এক ও অভিন্ন। প্রার্থনা করি, 'ওম্' যেন আমাকে তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি দান করেন। পরমেশ্বরের [ওম্] কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন অমর হতে পারি। আমার দেহ যেন আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। আমি যেন মিষ্টভাষী হই এবং কর্ণদ্বয় যেন আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে। আপনিই ব্রহ্মের প্রতীক। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল এই তত্ত্বকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। কৃপা করে যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তা রক্ষা করুন।

[ওম্] অনুগ্রহ করে আমাকে প্রাচুর্য দান করুন। আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র, গাভী, অন্ন এবং পানীয় দান করুন। আর এই সব জিনিস যেন নানারকমের হয় এবং এদের সংখ্যা যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। আমি যেন দীর্ঘ কেশ যুক্ত ছাগল, মহিষ ও অন্যান্য পশুও লাভ করতে পারি। তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি অর্জন করার পর আমি যেন এই সব প্রাচুর্য লাভ করি। স্বাহা।

চারদিক থেকে ছাত্ররা আমার কাছে আসুক। স্বাহা। সম্ভাব্য সব পথ দিয়ে ছাত্ররা আমার কাছে আসুক। স্বাহা। ন্যায্যপথে অর্থাৎ বিধিসম্মতভাবে ছাত্ররা আমার কাছে আসুক। স্বাহা। সম্পূর্ণ শারীরিক সংযম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অর্জনের পর ছাত্ররা যেন আমার কাছে আসে। স্বাহা। পুরোপুরি মনকে বশে আনার পর ছাত্ররা যেন আমার কাছে আসে। স্বাহা।

ব্যাখ্যা: সব বেদমন্ত্রের মধ্যে 'ওম্'ই শ্রেষ্ঠ। সকল শব্দের মধ্যে এই 'ওম্' রয়েছে। এখানে 'ওম্'কে একটি লাঠির সাথে তুলনা করা হচ্ছে। এই লাঠি যেন একটা গাছের পাতার স্তূপকে ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে 'ওম্'কে বৃষের মতো শক্তিশালী বলা হয়েছে। এই 'ওম্' ইন্দ্র এবং ব্রহ্মের প্রতীক। যাঁরা তীক্ষ্ণ মেধা লাভ করতে চান তাঁদের এই মন্ত্র বারবার আবৃত্তি করার কথা বলা হয়েছে। এরই ফলে তাঁরা প্রাচুর্যও লাভ করে থাকেন।

প্রথমে আমরা উন্নত মেধা যাতে লাভ করতে পারি সেই প্রার্থনাই করি। কারণ উন্নত মেধা না থাকলে যে সব মূল্যবান জিনিস আমরা অর্জন করেছি তা নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা এই বুদ্ধি বিচার প্রয়োগ করেই আমাদের অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করে থাকি। কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় এবং কি প্রার্থনা করতে হয় তা-ও এখানে বলা হয়েছে। উপনিষদ এই প্রার্থনাগুলি হোমের (যজ্ঞের) মাধ্যমে করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কারণের জন্যই 'স্বাহা' শব্দটি বলা হয়েছে। যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সময় এই স্বাহা শব্দটি উচ্চারিত হয়ে থাকে।

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাঽঽপঃ প্রবতা

যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব॥৩॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: জনে (সমাজে); যশঃ অসানি (আমি যেন বিখ্যাত হই); শ্রেয়ান্ বস্যসঃ অসানি (ধনীব্যক্তিদের মধ্যে আমি যেন শীর্ষস্থানের অধিকারী হই); ভগ ([অর্থাৎ ভগবান] হে প্রভু); তম্ ত্বা ([ব্রহ্মের প্রতীক] আপনাতে); প্রবিশানি (যেন প্রবেশ করতে পারি); ভগ (হে প্রভু); সঃ (সেই [অর্থাৎ আপনি, ব্রহ্মের প্রতীক]); মা (আমাতে); প্রবিশ (প্রবেশ করুন [অর্থাৎ আমার সঙ্গে একাত্ম হোন]); তস্মিন্ সহস্রশাখে (তাঁতে যাঁর বহুরূপ); ত্বয়ি (আপনার মধ্যে); অহং নি-মৃজে ([তার দ্বারা] আমি সম্পূর্ণ আমার পাপ থেকে মুক্ত); আপঃ যথা প্রবতা যন্তি (জল যেমন নিম্নগামী); যথা মাসাঃ অহর্জরম্ (মাস যেমন বৎসরে মিলিত হয়); এবম্ (সেই ভাবে); মাং ব্রহ্মচারিণঃ আয়ন্তু সর্বতঃ (চতুর্দিক থেকে ছাত্রদল যেন আমার কাছে আসে); ধাতঃ (হে প্রভু); প্রতিবেশঃ অসি (আপনি [সকলের] আশ্রয়); মা প্রভাহি (অনুগ্রহ করে আপনার স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করুন); মা প্রপদ্যস্ব (অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একাত্ম হোন [আমি আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি])। ইতি চতুর্থঃ অনুবাকঃ (এখানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: আমি যেন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হই। স্বাহা। ধনীদের মধ্যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই। স্বাহা। আপনি ব্রহ্মের প্রতীক। আমি যেন আপনার মধ্যে লীন হয়ে যাই। স্বাহা। আপনিও আমাতে প্রবেশ করুন। স্বাহা। হে প্রভু, আপনার অনেক রূপ। আপনাতে যেন আমার সকল পাপ ধুয়ে যায়। স্বাহা। জল যেমন নিম্নগামী এবং মাস যেমন বছরে পরিণত হয়, সেইভাবে, হে প্রভু, চারদিক থেকে ছাত্ররা যেন আমার কাছে আসে। স্বাহা। আপনি সকলের আশ্রয়দাতা। আমি আপনার শরণাগত। কৃপা করে আমার কাছে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করুন এবং আমাতে প্রবেশ করুন।

ব্যাখ্যা: এখানে যেমন যশ ও সম্পদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, আবার একই সাথে ব্রহ্মের সাথে যাতে একাত্ম হতে পারি সেই প্রার্থনাও করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মও যেন আমার সঙ্গে একাত্ম হন এমন প্রার্থনাও করা হচ্ছে। আমাদের নানারকমের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। ব্রহ্মের সাথে নিজ অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারলে সব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হয়ে যায়। জলরাশি যেমন ক্রমশ নিম্নদিকে বয়ে চলে, মাস যেমন বছরে মিলিত হয় ঠিক সেইভাবেই, সবদিক থেকে ছাত্ররা আমার কাছেই আসুক। 'আমি যেন ব্রহ্মের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারি'—এই আমার সর্বশেষ প্রার্থনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি অর্থ কামনা করছি কেন? কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য। কিন্তু কর্তব্যকর্মী বা করব কেন? যাতে আমার সঞ্চিত সকল পাপ ধুয়ে যায়। এর ফলে আমাদের

চিত্তশুদ্ধি হয়। আর তখন জ্ঞান আপনা আপনিই প্রকাশ পায়। আচার্য শঙ্কর একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাচ্ছেন: 'আয়নার উপরে যদি কোন ময়লা না থাকে অর্থাৎ পরিষ্কার আয়নাতে নিজেকে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।' সেইভাবে, শুদ্ধ ও পবিত্র মন ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। এটাই হল প্রার্থনার লক্ষ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোক। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ॥১

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজুংসি॥২

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি॥৩॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: ভূঃ (পৃথিবী); ভুবঃ (পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী আকাশ); সুবঃ (স্বর্গ); ইতি (এই ভাবে); এতাঃ (এই সব); তিস্রঃ ([তথাকথিত] তিন); ব্যাহৃতয়ঃ (ব্যাহৃতি [গুহ্য উচ্চারণ, যা সকল বাধা দূর করতে সক্ষম বলে মনে করা হয়]); তাসাম্ উ হ চতুর্থীম্ (এগুলি চতুর্থকে অনুসরণ করে); মহঃ ইতি (মহ নামে [পরিচিত]); মাহাচমস্যঃ (ঋষি মহাচমসের পুত্র); প্রবেদয়তে স্ম এতাম্ (একে আবিষ্কার করেছিলেন); তৎ (সেই [স্বয়ংপ্রকাশ মহ]); ব্রহ্ম (ব্রহ্ম [দেশাতীত ও কালাতীত]); সঃ আত্মা (তিনিই আত্মা); অন্যাঃ (অন্যেরা [ভূঃ, ভুবঃ এবং সুবঃ]); দেবতাঃ ([অধিষ্ঠাত্রী] দেবগণ); অঙ্গানি (তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ); ভূঃ ইতি বৈ অয়ং লোকঃ (ভূঃ হল এই পৃথিবী); ভুবঃ ইতি অন্তরিক্ষম্ (ভুবঃ হল পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী আকাশ); অসৌ লোকঃ সুবঃ ইতি (তার ওপরের আকাশ হল স্বর্গ, সুবঃ)।

আদিত্যঃ মহঃ ইতি (আদিত্য [সূর্য] হলেন মহ); আদিত্যেন বাব সর্বে লোকাঃ মহীয়ন্তে (যদি সকল লোকই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় [অথবা তাদের অভ্যস্ত কর্মসম্পাদনে সক্ষম হয়], তবে তা আদিত্যের কারণেই); ভূঃ ইতি বৈ অগ্নিঃ (অগ্নিই ভূঃ); ভুবঃ ইতি বায়ুঃ (বায়ুই ভুবঃ); সুবঃ ইতি আদিত্যঃ (আদিত্যই [সূর্য] সুবঃ); মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রই মহ); চন্দ্রমসা বাব

সর্বাণি জ্যোতীংসি মহীয়ন্তে (সকল জ্যোতির্ময় বস্তুই বর্ধিত হয় [অথবা তাদের অভ্যস্ত কর্ম সম্পাদনে সমর্থ] চন্দ্রের কারণে); ভূঃ ইতি বৈ ঋচঃ (ঋক বেদই ভূঃ); ভুবঃ ইতি সামানি (সাম বেদই ভুবঃ); সুবঃ ইতি যজুংসি (যজুর্বেদই সুবঃ)।

মহঃ ইতি ব্রহ্ম (ব্রহ্মই [ওম্] মহ); ব্রহ্মণা বাব (ব্রহ্মের কারণে); সর্বে বেদাঃ মহীয়ন্তে (বেদ সকল শক্তি লাভ করে); ভূঃ ইতি বৈ প্রাণঃ (প্রাণই [প্রশ্বাস বায়ু] ভূঃ); ভুবঃ ইতি অপানঃ (অপানই [নিঃশ্বাস বায়ু] ভুবঃ); সুবঃ ইতি ব্যানঃ (ব্যানই [যে বায়ু দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে] সুবঃ); মহঃ ইতি অন্নম্ (খাদ্যই মহ); অন্নেন বাব সর্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে (কারণ খাদ্যই সকল প্রাণে [অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর সকল প্রকারে] বল দান করে); তাঃ বৈ এতাঃ চতস্রঃ (এই চারটি); ব্যাহৃতয়ঃ (ব্যাহৃতি [উচ্চারণ সকল]); চতস্রঃ চতস্রঃ চতুর্ধা (চারটি শ্রেণীতে বর্ণিত); তাঃ যঃ বেদ (যিনি এই চারটিকে (ব্যাহৃতি) জানেন); সঃ বেদ ব্রহ্ম (তিনি ব্রহ্মকে জানেন); সর্বে অস্মৈ দেবাঃ (তাঁর নিকট সকল দেবতাই); বলিম্ আবহন্তি (অর্ঘ্য আনয়ন করেন); ইতি পঞ্চমঃ অনুবাকঃ (এখানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (১-৩) ভূঃ, ভুবঃ এবং সুবঃ—এই ধর্মীয় শব্দ তিনটিকে ব্যাহৃতি বলা হয়। ঋষি মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য চতুর্থ ব্যাহৃতি তথা ‘মহ’কে আবিষ্কার করেছিলেন। মহ-ই ব্রহ্ম, আত্মা। ভূঃ, ভুবঃ এবং সুবঃ ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সকলেই ব্রহ্মের অংশ। ভূঃ হল পৃথিবী, ভুবঃ হল পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী আকাশ এবং সুবঃ [বা স্বঃ] হচ্ছে স্বর্গ। ‘মহ’ হলেন সমষ্টি প্রাণের উৎস আদিত্য। অন্যান্য লোকেও আদিত্য শক্তি দান করেন।

ব্যাখ্যা: ভূঃ হলেন অগ্নি, ভুবঃ হচ্ছেন বায়ু এবং সুবঃ হচ্ছেন আদিত্য বা সূর্য। মহ হলেন চন্দ্র। চন্দ্রের আলোতেই সব বস্তু আলোকিত। ভূঃ—ঋগ্বেদ, ভুবঃ—সামবেদ এবং সুবঃ—যজুর্বেদ বলে খ্যাত। ‘মহ’ হলেন ব্রহ্ম [ওম্]। এই ব্রহ্মের কাছ থেকেই বেদসকল তাঁদের শক্তি লাভ করে থাকেন।

‘ভূঃ’ হলেন প্রাণবায়ু (প্রশ্বাস বায়ু), ‘ভুবঃ’ হচ্ছেন অপান বায়ু (নিঃশ্বাস বায়ু) এবং ‘সুবঃ’ হচ্ছেন ব্যান [এই বায়ু দেহের সর্বত্র রয়েছেন]। আবার ‘মহ’ই অন্ন বা খাদ্য। কারণ প্রাণবায়ুর সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে-শক্তির দরকার তা অন্নের কাছ থেকেই আসে। এই চারটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটি আবার চারভাগে বিভক্ত। যিনি এই ব্যাহৃতি সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য জানেন তিনি ব্রহ্মকেও জানেন। সকল দেবতাদের কাছ থেকে তাঁরা তখন বর লাভ করেন।

পূর্বে [তৃতীয় অধ্যায়ে] সংহিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সংহিতায় ধ্যানের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে। যাঁরা তীক্ষ্ণ মেধা ও ধন সম্পদ লাভ করতে চান তাঁরা কোন্ কোন্ মন্ত্র জপ করবেন এ কথাও সংহিতায় আছে।

আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে কেমন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং সুবঃ ইত্যাদির ধ্যান করতে হয়, এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া 'মহ'-এর গুরুত্বই বা কি সেকথাও এখানে বলা হয়েছে। উপনিষদ বলছেন যে, ঋষি মাহাচমস্য উপলব্ধি করেছিলেন, মহ এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ—এঁরা ব্রহ্মেরই (মহ) অংশ। এঁদেরকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করা উচিত। সংক্ষেপে বলা যায়, সাধক যদি এই ব্যাহৃতি সমূহকে ঠিক ঠিক ভাবে জানেন তবে তিনি ব্রহ্মকেও উপলব্ধি করতে পারবেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা হয়তো গৌণ দেবতার প্রতীক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরাও ব্রহ্ম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স য এযোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুযো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভুরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ॥১

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বরাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুস্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনয়োগ্যোপাস্স্ব॥২॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: অন্তঃ হৃদয়ে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে); যঃ এষঃ আকাশঃ ([যে] শূন্য, আকাশ যেখানে আছে); তস্মিন্ (তাতে [আকাশ]); সঃ অয়ম্ (এটি আছে); মনোময়ঃ (সমষ্টি মন [চিহ্নিত করছে]); অমৃতঃ (অমর); হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়); পুরুষঃ (আত্মা [আছেন]); অন্তরেণ তালুকে (দুই তালুর মধ্যবর্তী); যঃ এষঃ (যে [মাংস খণ্ড যা]); স্তন ইব (স্তনের ন্যায়); অবলম্বতে (ঝুলছে); যত্র (যেখানে); অসৌ কেশান্ত (কেশমূল); বিবর্ততে (বিভক্ত হয়েছে [সুষুম্নানাড়ী]); ব্যপোহ্য (বিদীর্ণ করে যায়); শীর্ষকপালে (মাথার দুটি তালু); সা (এই [সুষুম্নানাড়ী]); ইন্দ্রযোনিঃ (যেখানে ইন্দ্র [অর্থাৎ ব্রহ্ম] নিজেকে প্রকাশ করেন [সুষুম্নার মধ্য দিয়ে পুরুষ তথা আত্মা বেরিয়ে যান]); ভূঃ ইতি অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি (অগ্নি অর্থাৎ ভূঃতে বিলীন হন); ভুবঃ ইতি বায়ৌ ([এবং] বায়ুতেও যা ভুবঃ)।

সুবঃ ইতি আদিত্যে (আদিত্যে [সূর্যে] যা সুবঃ); মহ ইতি ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে যিনি হলেন মহ); স্বরাজ্যম্ আপ্নোতি (তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা উপলব্ধি করেন); মনসস্পতিম্

আপ্নোতি (তিনি সেই ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করেন যিনি মন ও তার সব কাজ কর্মের নিয়ামক) **বাক্‌পতিঃ** চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতিঃ বিজ্ঞানপতিঃ (যিনি বাক্, চক্ষু, কর্ণ, এবং মন [অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়]-কে নিয়ন্ত্রণ করেন); ততঃ এতৎ ভবতি (এরপর তিনি হয়ে ওঠেন); আকাশ-শরীরম্ (সর্বব্যাপী আকাশের মতো শরীর সহ); ব্রহ্ম ([তিনি হয়ে যান] ব্রহ্ম); সত্যাত্মা (তিনি সত্যস্বরূপ হয়ে ওঠেন); প্রাণারামম্ (তিনি আত্মতুষ্ট); মনঃ, আনন্দম্ (তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ); শান্তিসমৃদ্ধম্ (শান্তিসমৃদ্ধ); অমৃতম্ (অমরত্ব); প্রাচীনযোগ্য (হে প্রাচীনযোগ্য [হে কালাতীত সত্তা]); উপা**স্স্ব** (উপাসনা কর [সেই ব্রহ্মকে]); ইতি ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ (এখানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (১-২) সমষ্টি মনের প্রতিনিধিরূপী জ্যোতির্ময় ও অবিনাশী আত্মা হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন। দুই তালুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি মাংসখণ্ড ঝুলছে যা আকৃতিতে স্তন সদৃশ। এখানেই কেশ সমূহের মূল বিভক্ত হয়েছে। এই স্তনের মধ্য দিয়েই সুষুম্না নাড়ী চলাচল করে যেটি করোটিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। এই নাড়ী হল ইন্দ্রযোনি যেখানে ইন্দ্র নিজেকে প্রকাশ করেন। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি [তাঁর আত্মা] এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যান এবং তারপর তিনি অগ্নিতে লীন হন এবং ভূঃ-এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এরপর তিনি লীন হন বায়ুতে এবং ভুবঃ-এর সাথে এক হয়ে যান। তারপর তিনি আদিত্যে লীন হয়ে সুবঃ-এর সাথে এক হয়ে যান। শেষে তিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান যে-ব্রহ্ম হলেন মহ। তখন তিনি ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন এবং মন তাঁর বশে থাকে। মনের অধিপতিরূপে তিনি অনুভব করেন যে, সকল ইন্দ্রিয় যেমন, বাক্ চক্ষু, কর্ণ, এবং চেতনাও তাঁর অধীন। আকাশের মতো তিনি সর্বব্যাপী। তিনি সত্যস্বরূপ এবং আত্মাতেই তিনি স্থিত। তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ। তিনিই সেই ব্রহ্ম যিনি শান্তি ও আনন্দের প্রতিমূর্তি ও অমর। হে প্রাচীনযোগ্য! এই ব্রহ্মের উপাসনা কর।

ব্যাখ্যা: আমাদের হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে যে শূন্যস্থান আছে সেখানেই আত্মা রয়েছেন। আত্মাকে এখানে 'পুরুষ' বলা হয়েছে যা সবকিছুকে পূর্ণ করেন। 'পুরুষ' কথাটির অর্থ হল 'পুরে শয়ান' অর্থাৎ আত্মার অবস্থান হৃদয়ে। তাই হৃদয়ই পুরুষের 'পুর' বা আবাস। আবার আত্মাকে 'মনোময়'ও বলা হয়। কারণ আত্মাই সমষ্টি মন এবং চৈতন্য স্বরূপ। এই আত্মা অবিনাশী ও জ্যোতির্ময়।

কিন্তু এই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় কিভাবে? যোগশাস্ত্র মতে, সুষুম্না নামে এক নাড়ী আছে যা হৃদয় থেকে মস্তক অভিমুখী। সুষুম্না নাড়ী করোটির দুপাশের কেন্দ্রস্থল ভেদ করে ঢোকে। এই পথকে বলা হয় ইন্দ্রযোনি। 'ইন্দ্র' কথাটির অর্থ ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেন তাই ইন্দ্রযোনি। এখানেই সাধক উপলব্ধি করেন 'তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই

পরমাত্মা'। এই তত্ত্ব উপলব্ধি হলে সাধক শরীর ত্যাগ করে এই দৃশ্যমান জগৎ তথা অগ্নিতে লীন হন। অর্থাৎ সাধক তখন ভূঃ'-এর সাথে মিলিত হন। তারপর তিনি বায়ু বা 'ভুবঃ' এবং আদিত্য (সূর্য) তথা 'সুবঃ'-এর সাথে মিলিত হন। শেষে তিনি ব্রহ্মে লীন হন, যে ব্রহ্ম হলেন চতুর্থ ব্যাহৃতি, মহ। এখানে আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, সাধক প্রথমে অগ্নি ও অন্যান্য দেবতায় লীন হন। ব্যাহৃতি ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল ব্রহ্মে লীন হন।

ব্রহ্মই পরম বা সর্বোচ্চ। তাই আত্মজ্ঞান লাভের পর সাধক অনুভব করেন, নিজ মন, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য সবকিছুর তিনিই প্রভু। সাধক তখন অসীম, অনন্ত হয়ে যান। আকাশের মতো তিনি সর্বব্যাপী ও সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি পূর্ণ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই অবস্থাই লাভ করেন।

'আমরাই স্বয়ং ব্রহ্ম' —এই ধ্যান আমাদের সবসময় করা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দৌর্দিশোঽবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্। প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি॥১॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: পৃথিবী (পৃথিবী); অন্তরিক্ষং (মধ্যবর্তী অঞ্চল); দ্যৌঃ (স্বর্গ); দিশঃ (দিকসমূহ [পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি]); অবান্তরদিশাঃ (অন্তর্বর্তী দিক-সমূহ [পূর্বোল্লিখিত ব্যাহৃতি সদৃশ চতুর্বিধ দেবতা]); অগ্নিঃ (অগ্নি); বায়ুঃ (বায়ু); আদিত্যঃ (সূর্য); চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র); নক্ষত্রাণি (তারকাসমূহ); আপঃ (জল); ওষধয়ঃ (ওষধি); বনস্পতয়ঃ (বৃক্ষাদি [যে গাছের ফল হয় ফুল হয় না]); আকাশঃ (আকাশ); আত্মা (শরীর); ইতি অধিভূতম্ (এই সব পঞ্চভূত); অথ অধ্যাত্মম্ (এখন দেহ বিষয়ে); প্রাণঃ (গৃহীত প্রশ্বাস বায়ু); ব্যানঃ (দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে); অপানঃ (বহির্গামী নিঃশ্বাস বায়ু); উদানঃ (যে বাতাস বস্তুকে ঊর্ধ্বমুখী করে); সমানঃ (যে বাতাস জীর্ণ খাদ্যকে রক্ত ইত্যাদি রসে পরিণত করে); চক্ষুঃ (চোখ); শ্রোত্রম্ (কান); মনঃ (মন); বাক্ (বাগিন্দ্রিয়); ত্বক্ (স্পর্শেন্দ্রিয়); চর্ম (চামড়া); মাংসম্ (পেশী); স্নাবা (স্নায়ু [তথা নাড়ী]); অস্থি (হাড়); মজ্জা (মজ্জা); ঋষিঃ (বেদজ্ঞ); এতৎ (এই [পাঙ্‌ক্ত উপাসনা]); অধিবিধায় (বিধান করে); অবোচৎ (বলেছিলেন); পাঙ্‌ক্তং বৈ ইদং সর্বম্ (এই সমস্তই

পাঙ্‌ক্ত); পাঙ্‌ক্তেন এব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতি ইতি (পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্তকে পূর্ণ করে); ইতি সপ্তমঃ অনুবাকঃ (এখানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: পৃথিবী (ভূঃ), পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী আকাশ (ভুবঃ), স্বর্গ (সুবঃ), চারটি দিক (পূর্ব, পশ্চিমাদি), চারটি উপদিক (উত্তরপূর্ব, উত্তরপশ্চিম ইত্যাদি)—এই পাঁচটি লোক-পাঙ্‌ক্ত। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য (সূর্য), চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ—এই পাঁচটি দেবতা-পাঙ্‌ক্ত। জল, ওষধি (ছোট গাছ), বনস্পতি (বড়গাছ—যার ফল হয় ফুল হয় না), আকাশ, এবং দেহ—এই পাঁচটি ভূত-পাঙ্‌ক্ত। এখানে এই তিন প্রকার পাঙ্‌ক্তের কথা বলা হয়েছে। এই সব পাঙ্‌ক্তের মাধ্যমে ব্রহ্মের উপাসনাকে বলা হয় অধিভূত উপাসনা—অর্থাৎ, জড়বস্তুর উপাসনা। এখন অধ্যাত্ম উপাসনা অর্থাৎ দেহের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে। প্রাণ (গৃহীত প্রশ্বাস বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের মধ্যবর্তী বায়ু), অপান (নিঃশ্বাস বায়ু যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়), উদান (যে বায়ু বস্তুকে ঊর্ধ্বগামী করে), সমান (যে বায়ু জীর্ণ খাদ্যকে রক্ত ও অন্যান্য রসে পরিণত করে)—এই পাঁচটি হল প্রাণ-পাঙ্‌ক্ত বা প্রাণাদি বায়ু-পাঙ্‌ক্ত। চক্ষু, কর্ণ, মন, বাগিন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়-পাঙ্‌ক্ত। চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা—এরা (এই পাঁচটি) ধাতু-পাঙ্‌ক্ত। কোন এক ঋষি পাঙ্‌ক্ত রূপে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলেছেন। প্রতিটি পাঙ্‌ক্ত আবার পাঁচটি পদার্থকে নিয়ে গঠিত। এরা একে অপরের পরিপূরক। বস্তুত এরা এক ও অভিন্ন।

ব্যাখ্যা: পূর্বে ব্রহ্মকে চার রকমের ব্যাহৃতি বলে কল্পনা করা হয়েছিল। এই শ্লোকে পাঙ্‌ক্ত হিসাবে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এখানে অস্তিত্বের ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাইরে বা অভ্যন্তরে, পাঙ্‌ক্ত বা অন্য কিছু—এ সব গৌণ ব্যাপার। মুখ্য বক্তব্যটি হল বস্তুর ঐক্য। কোন ব্যক্তি যখন এই ঐক্যকে (অর্থাৎ এক আত্মাই সকলের মধ্যে রয়েছেন) উপলব্ধি করেন তখন তিনিই এই বিশ্বের প্রভু; কারণ তিনি তখন ব্রহ্মাই হয়ে যান।

অষ্টম অধ্যায়

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওংশোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতি-গরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি॥১॥ ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: ওম্ ইতি ব্রহ্ম (ওম্ শব্দটি স্বয়ং ব্রহ্ম); ওম্ ইতি ইদং সর্বম্ ([কারণ] ওম্-ই সর্ববস্তু); ওম্ ইতি এতৎ অনুকৃতিঃ হ স্ম বৈ (ওম্ শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক); অপি (ও); ওম্ শ্রাবয় ইতি আশ্রাবয়ন্তি (পুরোহিতবর্গ তখনই 'ওম্' বলেন, যখন তাঁরা অন্য পুরোহিতকে স্তোত্র আবৃত্তি [দেবদেবীর উদ্দেশে] করতে আজ্ঞা করেন); ওম্ ইতি সামানি গায়ন্তি (সামস্তোত্র আবৃত্তির সূচনায় পুরোহিতবর্গ 'ওম্' বলেন); ওম্ শোম্ ইতি (তাঁরা 'ওম্ শোম্' বলেন); শাস্ত্রাণি ([সঙ্গীত হীন] ঋগ্বেদীয় স্ত্রোত্র [যা শাস্ত্র বলে পরিচিত]); শংসন্তি (গান আরম্ভ করেন); অধ্বর্যুঃ (যজুঃ-যজ্ঞের পুরোহিত); প্রতিগৃণাতি প্রতিগরম্ ওম্ ইতি (যা কিছু তিনি করেন তিনি বলেন 'ওম্'); ব্রহ্মা (অন্য প্রকার পুরোহিত); ওম্ ইতি প্রসৌতি (কোন কিছুকে অনুমোদন করতে বলেন 'ওম্'); ওম্ ইতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি (যাঁরা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পন্ন করেন তাঁরা যজ্ঞ আরম্ভ করেন 'ওম্'ই ব্রহ্ম বলে); ওম্ ইতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ আহ ব্রহ্ম উপাপ্নবানি ইতি (একজন ব্রাহ্মণ যখন ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য বেদপাঠের ইচ্ছা করেন তখন তিনি 'ওম্' উচ্চারণ করেন); ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (তিনি ঘটনাচক্রে ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন); ইতি অষ্টমঃ অনুবাকঃ (এখানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: 'ওম্'ই ব্রহ্ম। কারণ সর্ববস্তুর প্রতীক হচ্ছেন ওম্। 'ওম্' শব্দটি সম্মতি বোঝাতেও বলা হয়ে থাকে। যখন একদল পুরোহিত অন্য পুরোহিতদের দেবদেবীর উদ্দেশে স্তোত্র আবৃত্তি করতে বলেন তখন তাঁরা 'ওম্' দিয়েই শুরু করেন। পুরোহিতরা 'ওম্' মন্ত্রটি উচ্চারণের পর সামস্তোত্র আবৃত্তি শুরু করেন। (একইভাবে) শাস্ত্র আবৃত্তি শুরু করার আগে তাঁরা 'ওম্ শোম্' শব্দটি বলে থাকেন। অধ্বর্যু পুরোহিত (যজুর্বেদের পুরোহিতরা) যে কোন কাজ করার সময়ই 'ওম্' মন্ত্র জপ করেন। আবার ব্রহ্মা নামক পুরোহিত কোন কিছুর সম্মতি বোঝাতে 'ওম্' শব্দটি বলেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞকারী 'ওম্' মন্ত্রটি উচ্চারণের পর যজ্ঞ শুরু করেন। ব্রহ্মকে জানার জন্য ব্রাহ্মণরা বেদ অধ্যয়ন করেন। এই বেদ পাঠের শুরুতে তাঁরা 'ওম্' উচ্চারণ করেন। এর ফলে তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: পূর্বে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে ব্যাহৃতিসমূহ ও পাঁচটি উপকরণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্রহ্মের প্রতীক মনে করে এগুলিকে ধ্যান করতে বলা হয়েছে। এখানে 'ওম্' শুধুমাত্র ব্রহ্মের প্রতীকই নন তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্মের মতো এ জগতের সবকিছুই হলেন এই 'ওম্'। পরব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম) ও অপরব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম) এই দুই-ই হলেন 'ওম্'।

এই অধ্যায়ে 'ইতি' শব্দটি 'ওম্'কে অনুসরণ করে। 'ইতি' শব্দটির দ্বারা 'ওম্'-এর প্রকৃত স্বরূপকে বোঝানো হয়েছে। 'ওম্'ই ব্রহ্ম—এভাবেই 'ওম্'-এর ধ্যান করা উচিত। সব শব্দ 'ওম্'-এর অন্তর্গত যেমন এই জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত।

‘ওম্’ শব্দটিকে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। শাস্ত্রপাঠ শুরুর আগে ‘ওম্’ উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। ‘ওম্’ই সাধককে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। কারণ সাধকের লক্ষ্যই তো হচ্ছে ‘ওম্’। সুতরাং ‘ওম্’ ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

নবম অধ্যায়

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। ত পশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ॥১॥ ইতি নবমোহনুবাকঃ॥

অন্বয়: ঋতম্ (অনুসারে); চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় রত হও); সত্যম্ ([কায়মনোবাক্যে] সৎ হও); চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় রত হও); তপঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (তপস্যা কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় রত হও); দমঃ চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (বহিরিন্দ্রিয় দমন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); শমঃ চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (অন্তরিন্দ্রিয় দমন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); অগ্নয়ঃ চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (ত্রি-অগ্নি [গার্হপত্য, আহবনীয়, এবং দক্ষিণাগ্নি প্রজ্বলিত কর] এবং অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); অতিথয়ঃ চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (অতিথিকে শ্রদ্ধা কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); মনুষং চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (স্বাভাবিক জীবন যাপন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); প্রজা চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (সন্তান উৎপাদন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); প্রজনঃ চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (বংশধারা অব্যাহত রাখ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); প্রজাতিঃ চ স্বাধ্যায় [ইত্যাদি] (পৌত্রাদি উৎপাদন কর [অর্থাৎ সন্তানের বিবাহ ব্যবস্থা কর] এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন [ইত্যাদি]); রাথীতরঃ সত্যবচাঃ (রথীতর পরিবারের সত্যবচা [মনে করেন]); সত্যম্ ইতি (সত্যই সব); পৌরুশিষ্টিঃ তপোনিত্যঃ (পুরুশিষ্টির পুত্র পৌরুশিষ্টি যিনি তপোনিত্য বলেও পরিচিত [মনে করেন]); তপঃ ইতি (কৃচ্ছ্র সাধনই কর্তব্য); নাকঃ মৌদ্‌গল্যঃ (মুদ্‌গল পুত্র নাক [তাঁর মতানুযায়ী]); স্বাধ্যায়প্রবচনে এব ইতি (শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা [একমাত্র

উপায়]); তৎ হি তপঃ তৎ হি তপঃ (একমাত্র সেটিই যথার্থ তপস্যা, একমাত্র সেটিই যথার্থ তপস্যা); ইতি নবমঃ অনুবাকঃ (নবম অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: শাস্ত্রের নির্দেশমতো নিজ কর্তব্য পালন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। কায়মনোবাক্যে সৎ হও এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। কৃচ্ছ্রসাধনায় জীবন অতিবাহিত কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। বহিরিন্দ্রিয়কে দমন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। অন্তরিন্দ্রিয়কে সংযত কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। যজ্ঞাগ্নি (অগ্নিহোত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত তিনটি অগ্নি—গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি) জ্বালিয়ে রাখ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্রতী হও। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রতিদিন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্রতী হও। শ্রদ্ধার সাথে অতিথি আপ্যায়ন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্রতী হও। স্বাভাবিক জীবন যাপন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। সন্তান উৎপাদন কর এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। বংশধারা অব্যাহত রাখ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। পৌত্রাদি লাভের জন্য সন্তানের বিবাহ দাও এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত হও। রথীতর বংশের সত্যবচার মতে সত্যই সব। পুরুশিষ্টির পুত্র পৌরুশিষ্টি যিনি তপোনিত্য বলেও পরিচিত তিনি বলেন, তপস্যায় মনঃসংযোগ করা উচিত। মুদ্গল পুত্র নাকের মতে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই একমাত্র উপায়। এটিই যথার্থ তপস্যা। এটিই একমাত্র তপস্যা।

ব্যাখ্যা: একথা আগেই বলা হয়েছে যে, একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়। এর ফলে লোকের মনে হতে পারে কর্মের (অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশিত কর্তব্য) কোন প্রয়োজন নেই। পাছে মানুষের এই ভুল হয় সেজন্য কর্ম বা কর্তব্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। ঠিক ঠিক ভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।

সন্ন্যাসী অথবা গৃহী প্রত্যেককেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে গৃহী এখনও প্রস্তুত নয়। তাই প্রথমেই তাকে সংসারের অর্থাৎ পার্থিব জীবনের তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়, যাতে এই অনিত্য সংসারের প্রতি তার বিরক্তি জন্মায়। এর ফলে সে নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচার করে। এভাবেই মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়। পরিণামে ইন্দ্রিয়সুখ তাকে আর কোনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না। সাধক তখন নিত্য বস্তু অর্থাৎ আত্মাকে জানার জন্য ব্যাকুল হয়। শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে জীবন কাটাতে পারলে লক্ষ্যের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, শাস্ত্র নির্দেশিত কর্তব্য কর্মের চেয়ে সত্যনিষ্ঠা বা তপশ্চর্যা অথবা কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করাই অধিকতর উপযোগী।

দশম অধ্যায়

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥১॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: অহং বৃক্ষস্য রেরিবা (আমি এই বৃক্ষের [অর্থাৎ এই পৃথিবীর] প্রেরয়িতা); গিরেঃ পৃষ্ঠম্ ইব কীর্তিঃ (পর্বত শৃঙ্গের মতোই উন্নত [আমার] গৌরব); ঊর্ধ্বপবিত্রঃ ([অর্থাৎ, ঊর্ধ্বম্—উৎস, পবিত্রম্—শুদ্ধ, কারণ তা জ্ঞানপ্রদ] আমার উৎস পরব্রহ্ম); বাজিনি (সূর্যমধ্যে [এরূপ নাম, কারণ সূর্য খাদ্য তথা 'রাজম্' দান করে]); ইব (অনুরূপ); সু (শুদ্ধ); অমৃতম্ (মোক্ষ তথা আত্মজ্ঞান); অস্মি (আমি অর্জন করেছি); দ্রবিণং সবর্চসম্ (অর্থের মতো আমি মূল্যবান [আত্মার মতো আমি স্বয়ংপ্রকাশ]); সুমেধাঃ (আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন); অমৃতঃ (আমি মৃত্যুভয়হীন); অক্ষিতঃ (আমি ক্ষয়রহিত [অর্থাৎ আমি সতত অভিন্ন]); ইতি ত্রিশঙ্কোঃ বেদানুবচনম্ (আত্মোপলব্ধির পর ঋষি ত্রিশঙ্কু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন); ইতি দশমঃ অনুবাকঃ (দশম অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: সংসার নামক বৃক্ষের আমিই উৎসাহদাতা। পর্বত শিখরের ন্যায় উন্নত আমার কীর্তি। সূর্য সকলকে খাদ্য দেন এবং তার দ্বারা সকলকে অমরত্ব দান করেন। সূর্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে (পৃথিবীরও) এবং শুদ্ধ। আমি মহান ও শুদ্ধ কারণ আমিই পরব্রহ্ম। (পরব্রহ্ম সবসময়ই আমার চেতনায় রয়েছেন)। অর্থের মতোই আমি মূল্যবান এবং আত্মার মতোই আমি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। আমি বুদ্ধিমান। মৃত্যুভয় আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি অপরিবর্তনীয়। আত্মজ্ঞানলাভের পর ঋষি ত্রিশঙ্কু এই কথাই বলেছিলেন।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে আত্মার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিকে বারবার পাঠ করতে বলা হচ্ছে। এই পুনরাবৃত্তি আত্মোপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে।

জগৎ সংসারের মূল আত্মায় নিহিত। আত্মা শুদ্ধ এবং পরম। আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র আত্মজ্ঞানলাভেই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়, অর্থ বা অন্য কিছুতে নয়। আত্মা শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত, অমর এবং যে কোন প্রকার ব্যাধি বা পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ত্রিশঙ্কু এভাবেই আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই শ্লোক বারবার আবৃত্তি কর এবং অনাসক্ত ভাবে কাজ করে যাও। এই হল আত্মজ্ঞানলাভের উপায়।

একাদশ অধ্যায়

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥১

অন্বয়: আচার্যঃ অন্তেবাসিনং বেদম্ অনূচ্য (শিষ্যকে বেদশিক্ষাদানের পর আচার্য); অনুশাস্তি (তাকে [নিম্নলিখিত] উপদেশ দান করেন); সত্যং বদ (সত্য কথা বল [যুক্তি বিচারের দ্বারা যতখানি সম্ভব]); ধর্মং চর (শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে আচরণ কর); স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ (বেদাধ্যায়নের অভ্যাস ত্যাগ করো না); আচার্যায় প্রিয়ং ধনম্ আহৃত্য (আচার্যকে তাঁর প্রিয় জিনিস দান কর [আর তারপর, তাঁর নির্দেশ মতো]); প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (বংশধারা অব্যাহত রেখো); সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (সত্য থেকে কখনও বিচ্যুত হয়ো না); ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম [শাস্ত্রানুসারী কর্তব্য সম্পাদন] থেকে কখনও বিচ্যুত হয়ো না); কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (আত্মরক্ষায় অবহেলা করো না); ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্ (নিজ স্বার্থরক্ষায় অবহেলা করো না); স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অবহেলা করো না [উপরোক্ত বিধিসমূহ সঠিক এবং সম্পূর্ণরূপে পালন করতে যত্নশীল হও])।

সরলার্থ: আচার্য প্রথমে শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেন এবং পরে নিম্নলিখিত উপদেশ দেন:

নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সর্বদা সত্য কথা বল। শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে ধর্মের আচরণ কর। বেদ অধ্যয়নে কখনও অবহেলা করো না। আচার্যকে তাঁর পছন্দ ও প্রয়োজন মতো জিনিস দক্ষিণাস্বরূপ দিও। (আচার্যের নির্দেশ মতো বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে সংসার করো)। বংশধারা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখো। সত্য থেকে কখনও বিচ্যুত হয়ো না। শাস্ত্রে যে কর্তব্য কর্মের কথা বলা হয়েছে তা সম্পাদনে অবহেলা করো না। আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো এবং নিজের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়ো। আবার বলি, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়ে অমনোযোগী হয়ো না। (এইসব নির্দেশ যথাসম্ভব মেনে চলো)।

ব্যাখ্যা: ভারতে প্রাচীনকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুকুল পদ্ধতির প্রচলন ছিল। বিভিন্ন পরিবার থেকে আগত ছাত্ররা একজন গুরু তথা আচার্যকে বেছে নিতেন এবং শিক্ষা চলাকালীন বহুবছর তাঁরা গুরুগৃহে বাস করতেন। এই গুরুগৃহে বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত। শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই তাঁরা গুরুর সান্নিধ্যলাভ করতেন না, গুরু সবসময়ই তাঁদের সাথে থাকতেন। ছাত্ররা তাই প্রতিমুহূর্তেই শিক্ষাগ্রহণ করতেন। গুরু-পরিবারের অঙ্গ হিসাবে সন্তানের মতোই তাঁরা গুরুগৃহে বাস করতেন। পরিবারের সকলের জন্য একইরকম

আহারের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্ররাও গুরুর সুখদুঃখের অংশীদার হতেন। তাঁদের সম্পর্ক কেবলমাত্র শিক্ষক-ছাত্র স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গুরুর সঙ্গে সবসময় ওঠাবসার ফলে তাঁর প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করতেন। গুরুগৃহে বাস করার ফলে শিষ্য নিপুণভাবে লক্ষ্য করতেন গুরুর দৈনন্দিন জীবনচর্যা—কেমন করে তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন, কিভাবে অবসর সময় কাটান ইত্যাদি।

আচার্য তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিষ্যদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। শিষ্যকেও এই জ্ঞানলাভের যোগ্য অধিকারী হতে হয়। গুরু—সেবার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। এখানে সেবা বলতে বিনয় এবং শ্রদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে। গুরু এবং তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি শিষ্যকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে। আচার্য প্রসন্ন হলে শিষ্যকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেন। শিষ্যকে নিজ জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে আচার্য নিজেই আনন্দিত হন।

বর্তমানে জ্ঞান বলতে আমরা পুঁথিগত বিদ্যাকে বুঝি। এছাড়া হয়তো আমাদের উপায়ও নেই। জ্ঞান অনাদি, অনন্ত। কিন্তু বই পড়ে আমরা কতটুকু জ্ঞান লাভ করতে পারি? খুবই সামান্য। অভিজ্ঞতায় প্রবীণ যে-সমস্ত ব্যক্তি আমাদের চারপাশে বাস করেন তাঁরাই জীবন্ত গ্রন্থ। আচার্য হলেন শিক্ষক। আচার্য কে? যিনি শাস্ত্রের মর্মার্থ গ্রহণ করেন এবং ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করেন। এভাবেই তিনি শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে ওঠেন। প্রকৃত আচার্য যা শেখান তা নিজ জীবনে আচরণ করেন। এই হল প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষক যদি অন্যের ধার করা বুলির পুনরাবৃত্তি করেন তবে তিনি যেন টেপরেকর্ডারেরই কাজ করছেন। ছাত্ররা সেই শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ তিনি যা শেখান তা তিনি নিজ জীবনে উপলব্ধি করেননি। সুতরাং তাঁর শেখানোর মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় শিক্ষকের গুণে। যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন তিনিই শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার যোগ্য। সত্যের উপলব্ধি ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষক হওয়া যায় না।

শিক্ষাদান সমাপ্ত হলে আচার্য শিষ্যদের কিছু মূল্যবান উপদেশ দেন। আচার্য বলেন: 'দেখ, আমি নিজে যা জানি সে সবই তোমাদের শিখিয়েছি। তা কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেই চলবে না তাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করবে। মনকেও সেভাবে চালিত করবে। এখন থেকে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করবে।'

আচার্য প্রথমেই বললেন : 'সত্যং বদ'—সত্য কথা বল। সত্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে? আচার্য শঙ্করের মতে, যাকে সত্য বলে মনে হয় এবং নিজ অভিজ্ঞতাও যাকে সমর্থন করে তাই প্রকৃত সত্য। নিজ জীবনে যাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছো কেবলমাত্র

তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করো। গুজব বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কিছু বলো না। মানুষ গালগল্প শুনতে ভালবাসে। কিন্তু সেগুলিকে সত্য বলে চালিয়ে দিও না।

গুরুর পরবর্তী নির্দেশ হল: 'ধর্মং চর'—সেই কর্ম সম্পাদন কর যা করা উচিত। শিষ্যদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কোন্ কাজ করা উচিত তা জানব কেমন করে? তার উত্তরে গুরু বলছেন : প্রথমে শাস্ত্রের সাহায্য নাও। শাস্ত্রে বলা আছে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়। এরপরও যদি সন্দেহ থাকে তবে নিজের বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ কর। কিন্তু তাতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁরা যা করেন তুমিও তাই করার চেষ্টা কর।

'স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ'—এর আক্ষরিক অর্থ হল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকে কখনও বিরত হয়ো না। শিষ্যদের বলছেন, ভুলে যেও না, আত্মজ্ঞান—লাভই জীবনের লক্ষ্য। এই সত্যলাভের ব্যাকুলতায় যেন কোন ঘাটতি না পড়ে। তুমি আচার্যের কাছে যেতে পার, শাস্ত্রচর্চাও করতে পার, কিন্তু আত্মাকে বোধে বোধ করার চেষ্টা যেন নিরন্তর চলতে থাকে। শাস্ত্রচর্চা করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্যই উপনিষদে শাস্ত্রচর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

'আচার্যায় প্রিয়ং ধনম্ আহৃত্য'—আচার্যকে তাঁর পছন্দ ও প্রয়োজন মতো জিনিস দক্ষিণাস্বরূপ দাও। আচার্য তোমাকে প্রভূত জ্ঞান দান করেছেন। এখন তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পালা। তিনি হয়তো খুবই দরিদ্র। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় বস্তু তাঁর কাম্য নয়। এমন বস্তু তাঁকে দিও না। তাঁর খাদ্যের প্রয়োজন থাকলে তাঁকে খাদ্য দাও। বস্ত্রের অভাব থাকলে, তাঁকে বস্ত্র দাও। 'আচার্যের সব ঋণ আমি পরিশোধ করে দিয়েছি, তাঁকে আর আমার দেবার কিছু নেই'—এমন কথা তুমি ভুলেও ভেবো না।

'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'—বংশধারা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখো। তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে। গৃহে ফিরে তুমি এখন গৃহস্থ জীবন যাপন কর। গুরু আরো বলেছেন, গৃহী হিসাবে বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে সংসার করা তোমার কর্তব্য। দেখ, বংশধারায় যেন ছেদ না পড়ে।

'ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্'—ন্যায়ের পথ অবলম্বন কর। 'ন্যায়' কথাটির অর্থ হল যা সকলের পক্ষে কল্যাণকর।

'কুশলাৎ' কথাটির অর্থ নিজ কল্যাণ, 'ভূতৈঃ' অর্থ ধনসম্পদ। আচার্য বলছেন: গৃহী হিসাবে ধনসম্পদ লাভের অধিকার তোমার আছে। তোমার অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং ধর্ম ও সত্যপথে অবিচল থেকে নিজ উন্নতি সাধনে যত্নবান হও।

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেব ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥২

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াঽঽসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ॥৩

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥৪॥ ইতি একাদশোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (দেবতা ও পিতৃপুরুষের প্রতি নিজ কর্তব্যে অবহেলা করো না); মাতৃদেবঃ ভব (মাতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর); পিতৃদেবঃ ভব (পিতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর); আচার্যদেবঃ ভব (আচার্যকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর); অতিথিদেবঃ ভব (অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে আপ্যায়ন কর); যানি কর্মাণি অনবদ্যানি (যে সকল কাজ অনিন্দনীয়); তানি সেবিতব্যানি (সেগুলিই করণীয়); নো ইতরাণি (অন্য কোন কাজ নয়); যানি অস্মাকং সুচরিতানি (যা কিছু উত্তম কাজ আমরা [অর্থাৎ আচার্যগণ] করি); তানি ত্বয়া উপাস্যানি (তোমাদের করা উচিত)।

ইতরাণি (অন্যান্য বস্তু [অর্থাৎ শাস্ত্রে যা অনুমোদিত নয়, কিন্তু আচার্যের দ্বারা কৃত]); ন [উপাস্যানি] (করা উচিত নয়); যে কে চ ব্রাহ্মণাঃ (সেই সব ব্রাহ্মণ যাঁরা); অস্মাৎ শ্রেয়াংসঃ (আমাদের চেয়ে উন্নততর); ত্বয়া (তোমার দ্বারা); তেষাম্ আসনেন (তাঁদের আসন দান করে); প্রশ্বসিতব্যম্ (এইভাবে তাঁদের সৎকার করা উচিত); শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ ([কাউকে কিছু দান করতে হলে] শ্রদ্ধার সঙ্গে দাও); অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ (যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে না পার, তবে আদৌ দিও না); শ্রিয়া দেয়ম্ (শ্রীসম্পন্নভাবে দান কর); হ্রিয়া দেয়ম্ (নম্রতার সঙ্গে দান কর); ভিয়া দেয়ম্ (ভয়ের সাথে দান কর [পাছে গ্রহীতা ক্ষুণ্ণ হন]); সংবিদা দেয়ম্ (সদিচ্ছার সঙ্গে দান কর); অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ (নিজ কর্মের বা কর্ম পদ্ধতির ঔচিত্য বিষয়ে যদি তোমার সংশয় থাকে)।

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ (সে সময়ে যদি সেখানে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা থাকেন, যাঁরা); যুক্তাঃ (কর্তব্যপরায়ণ); আযুক্তাঃ (উচিত কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী); অলূক্ষাঃ (দয়ালু); ধর্মকামাঃ (পুণ্যবান); স্যুঃ (উপস্থিত থাকেন); তে তত্র যথা বর্তেরন্ (তাঁরা ঐ কর্ম ও

আচারে যেরকম রত থাকেন [তুমিও]); তত্র তথা বর্তেথাঃ (সেখানে সেইভাবেই আচরণ করো); অথ অভ্যাখ্যাতেষু (তখন যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে ঐ সব ব্যক্তি কি আচরণ করছেন); যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ (সেখানে সে সময়ে যদি প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা থাকেন যাঁরা); যুক্তাঃ (কর্তব্যপরায়ণ); আযুক্তাঃ (উচিত কর্ম সম্পাদনে উৎসাহী); অলূক্ষাঃ (দয়ালু); ধর্মকামাঃ (পুণ্যবান); স্যুঃ (উপস্থিত থাকেন); তে তেষু যথা বর্তেরন্ (তাঁরা ঐ কর্ম ও আচরণে যে রকম রত থাকেন [তুমিও]); তথা তেষু বর্তেথাঃ (সেখানে সেই ভাবেই আচরণ করো); এষঃ আদেশঃ (এই হল নির্দেশ); এষঃ উপদেশঃ (এই হল উপদেশ); এষা বেদ-উপনিষৎ (এই হল বেদের শিক্ষা); এতৎ অনুশাসনম্ (এই হল অনুশাসন); এবম্ উপাসিতব্যম্ (এই হল আদর্শ); এবম্ উ চ এতৎ উপাস্যম্ (এটি অভ্যাস করা উচিত); ইতি একাদশঃ অনুবাকঃ (এখানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (২-৪) দেবতা ও পিতৃপুরুষের প্রতি নিজ কর্তব্যপালনে অবহেলা করো না। দেবতাজ্ঞানে মাতৃসেবা কর। দেবতাজ্ঞানে পিতৃসেবা কর। দেবতাজ্ঞানে অতিথি সৎকার কর। কেবলমাত্র সেই সব কাজই কর যা তুমি সঠিকভাবে করতে পারবে, আর অন্য সব কাজ পরিহার কর। যে সব ভাল কাজ আমরা (তোমার আচার্যরা) করি, তা তোমারও করা উচিত। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কাজ আমরা করি (যা শাস্ত্র অনুমোদিত নয়) তা তোমার করা উচিত নয়। আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নিজ আসন দান করবে এবং তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে। শ্রদ্ধা সহকারে দান করবে। শ্রদ্ধা ছাড়া দান করো না। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে। পাছে গ্রহীতা ক্ষুণ্ণ হন সেজন্য বিনয়, সম্ভ্রম এবং আন্তরিকতার সাথে দান করবে।

নিজ কর্ম বা কর্মপদ্ধতি (আচরণ) নিয়ে যদি কোন সংশয় জাগে তবে সেখানে যে সব ব্রাহ্মণেরা আছেন—যাঁরা জ্ঞানী, কর্তব্যপরায়ণ, কর্তব্যকর্ম করতে সদা আগ্রহী, দয়ালু এবং নিঃস্বার্থপর, তাঁদের কর্মরীতি অনুসরণ করো। আবার তাঁদের (সেই সকল ব্রাহ্মণের) কারোর আচরণ বিষয়ে কেউ যদি অভিযোগ বা সংশয় প্রকাশ করে তবে সেখানে যদি প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা থাকেন যাঁরা কর্তব্যনিষ্ঠ, যাঁরা স্বেচ্ছায় কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী, যাঁরা দয়ালু ও নিঃস্বার্থপর, তাঁরা যা করবেন তারই অনুসরণ করো। এই হল বেদের নির্দেশ, উপদেশ এবং বাণী। এ ঈশ্বরের আদেশ। এই হল আদর্শ। এই আদর্শ দ্বারাই তোমার নিজের জীবন গড়ে তোলা উচিত।

ব্যাখ্যা: তখনকার দিনে যাগযজ্ঞ করা গৃহীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করা হত। বিভিন্ন দেবদেবী ও পিতৃপুরুষের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। প্রতিদিন আমরা তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব এবং তাঁদের সম্মানার্থে আমরা উন্নত জীবন যাপন করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুরু

বলছেন: মনে কর তোমার পরিবারে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আশা করবেন তুমি সৎভাবে জীবন কাটাবে। কারণ পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করা তো তোমার কর্তব্য। অনুরূপভাবে, নির্দিষ্ট কিছু দেবদেবী আছেন যাঁরা তোমার পরিবারের অভিভাবক। তোমাদের কাজকর্মের ওপর তাঁরা নজর রাখেন এবং তোমাদের সবসময় রক্ষা করেন। তোমরা অবশ্যই তাঁদের অসম্মান করবে না।

'মাতৃদেবঃ ভব। পিতৃদেবঃ ভব।' এখানে প্রথমেই 'মা'কে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। 'মা'কে অবশ্যই দেবীজ্ঞানে সেবা করবে। আবার পিতা এবং আচার্যকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করবে। পিতামাতা তোমাকে এই দেহ দিয়েছেন। কিন্তু আচার্য তোমাকে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি তোমার মন-বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করেছেন। গৃহী হিসাবে অতিথিকে ভোজন করানো ও তার যথাসম্ভব আপ্যায়ন করাও তোমার কর্তব্য। গুরু আরো বলছেন, অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপ্যায়ন করবে।

এরপর উপনিষদ বলছেন, শুধুমাত্র সেইসব কর্মই করবে যা নিন্দনীয় নয় এবং দোষত্রুটিমুক্ত (অনবদ্যামি)। 'নো ইতরাণি'—এছাড়া অন্য কর্ম করবে না। কেউ আপত্তি করতে পারে এমন কোন আচরণ করবে না। 'অনবদ্য' শব্দটির অপর অর্থ হল সুন্দর বা নিষ্কলঙ্ক। কেবলমাত্র ভাল কাজই আমাদের করা উচিত।

'যানি অস্মাকং সুচরিতানি'। আচার্য বিনয়ের প্রতিমূর্তি। তিনি শিষ্যদের বলছেন: আমরা অনেক কিছু করে থাকি। কেবলমাত্র আমার গুণটিকে তুমি গ্রহণ করবে। কারণ আমারও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। শত হলেও আমি তো মানুষ। যদি আমি ভুল করি তবুও কি তুমি আমাকে অন্ধের মতো অনুকরণ করবে? তাই বলছি, নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে শুধু আমার ভাল কাজেরই অনুসরণ কর। 'তানি ত্বয়া উপাস্যানি'—শুধুমাত্র এই সব কাজই তুমি কর। 'নো ইতরাণি'—অন্য কিছু নয়। আচার্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করা উচিত। সাধারণত আচার্য যা করেন তোমারও তাই করা উচিত। কিন্তু আচার্য যদি ভুল করেন তবে তোমার সে কাজ করা উচিত নয়।

'যে কে চ অস্মাৎ শ্রেয়াংসঃ ব্রাহ্মণাঃ'—মনে কর, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা বিদ্যা ও নানা বিষয়ে তোমার চেয়ে পারদর্শী কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তোমার কাছে এসেছেন। তিনি হয়তো খুবই ক্লান্ত। তুমি তখন নিজের আসনটি ছেড়ে তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ করবে। অর্থাৎ তুমি তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেবে।

'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'—শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। অশ্রদ্ধা বা অভক্তি ভরে কোন কিছু দেবে না। যদি কোন ব্যক্তিকে তুমি অসতর্কভাবে বা অশ্রদ্ধার সাথে কিছু দাও তবে গ্রহীতা আহত

বা অপমানিত বোধ করবেন। যদি আন্তরিকতার সাথে দিতে না পার তবে বরং দান করো না। কারণ কিভাবে তুমি দান করছ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাই আচার্য বললেন : 'শ্রিয়া দেয়ম্'। আচার্য শঙ্করের মতে, দাতা তার সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তহস্তে দান করবে। এর আর একটি অর্থ হল দান যেন সুন্দরভাবে করা হয়। কারণ 'শ্রিয়া' শব্দটির আর একটি অর্থ হল সুন্দর। দাতা যখন কোন কিছু কাউকে দেবেন তখন তাঁর হাতের ভঙ্গি এমন সুন্দর হবে যাতে গ্রহীতা তা গ্রহণ করতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ দানের ভঙ্গিতে যেন বিনয় ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। তুমি নিশ্চয় দেখেছ উপাসক সুন্দর ও নিখুঁতভাবে দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ঠিক সেইভাবেই তুমি যেন ঈশ্বরকেই অর্ঘ্য দিচ্ছ এই মনোভাব নিয়ে দান করবে।

'হ্রিয়া দেয়ম্'—লজ্জা ও বিনয়ের সাথে দান কর। এর চেয়ে আরো বেশী অথবা এর চেয়ে আরো ভাল জিনিস দিতে না পারার জন্য তুমি যেন লজ্জিত। কোন কিছু দেওয়ার সময় অনেকেরই দম্ভ প্রকাশ পায়। তোমার টাকাপয়সা চাই? আমার অনেক অর্থ আছে। চলে এসো। এইভাবে দান করা সঙ্গত নয়। বরং দাতার মনে করা উচিত: 'আমি তাঁকে ঠিক জিনিসটি দিতে পারলাম তো? আমার এই দান যথেষ্ট হল তো?'

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়। তাঁরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে প্রতিটি বাড়ীর সামনে দাঁড়ান। তাঁরা আসার আগেই গৃহবধূরা অন্নপাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের জন্য বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। কি বিনয় আর শ্রদ্ধার সঙ্গেই না তাঁরা ভিক্ষাদান করেন। এতে তাঁরা দুজনেই আশীর্বাদ লাভ করেন। সুতরাং দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই প্রসন্ন হন।

হিন্দুসমাজে দানের অন্যতম শর্ত হল নিঃশব্দে দান। তুমি কাউকে কিছু দিচ্ছ এ কথা যেন অন্য কেউ জানতে না পারে। এখানে একজন মানুষের কথা বলা হয়েছে যিনি গরীবদের সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব। তিনি দান করতে ভালবাসেন। কিন্তু অধিক পরিমাণে আরো উৎকৃষ্ট মানের জিনিস দিতে না পারার জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করবেন। একাজ তিনি সবার অগোচরে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেন। তিনি এসব কাজ কাউকে জানিয়ে করতে চান না। কিন্তু আবার এমনও মানুষ আছেন যাঁরা দান করেন এবং পরদিনই খবরের কাগজে দাতার তালিকায় নিজের নামটি দেখতে চান।

'ভিয়া দেয়ম্'—সভয়ে দান কর। এখানে 'ভয়' কথাটি বলা হচ্ছে কেন? কারণ তুমি যেন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছ, সেকথা ভেবে তুমি অবশ্যই সতর্ক থাকবে। আচার্য বলছেন, পাছে গ্রহীতা আহত বা ক্ষুণ্ণ হন, পাছে তুমি তাঁকে অমর্যাদার সাথে দান কর সেজন্য তুমি সবসময় সচেতন থাকবে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সাথে দান করবে।

‘সংবিদা দেয়ম্’—আচার্য শঙ্করের মতে, ‘সংবিদা’ কথাটির অর্থ মৈত্রী। মৈত্রী বলতে সদিচ্ছা, বন্ধুত্ব বা প্রীতি বোঝায়। এখানে বোঝাতে চাইছেন, তুমি শুধু বস্তুটিকেই দান করছ না সেইসঙ্গে তোমার স্নেহ-ভালবাসাও তার প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে।

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সকলেই একথা বলতে পারি, যখন মা বা মায়ের মতো কোন প্রিয়জন আমাদের খেতে দেন তখন তা আমরা আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করি। আমজাদ নামে এক মুসলমান যুবক শ্রীশ্রীমা'র কাছে আসত। একদিন মায়ের নির্দেশমতো তাঁর ভাইঝি আমজাদকে খাবার পরিবেশন করছিল। একটু পরেই মা লক্ষ্য করলেন যে, ভাইঝি দূর থেকে ছুড়ে ছুড়ে আমজাদের থালায় খাবার দিচ্ছে। মা তাকে তিরস্কার করে বললেন : ‘ঐভাবে দিলে কেউ কি খেতে পারে?’ শুধু তাই নয়, তারপর তিনি নিজেই তাকে খেতে দিলেন।

‘বিচিকিৎসা’ কথাটির অর্থ সংশয়। ধরা যাক, নিজের কর্ম বা আচরণ (বৃত্তি) নিয়ে তোমার মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছ না, কোন্‌টি তোমার করা উচিত আর কোন্‌টি উচিত নয়। তুমি তখন কি করবে? আচার্য বলছেন, যাঁরা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করেন। তাঁরা কেবলমাত্র ভাল কাজ করেন। কারণ ভাল কাজ করতেই তাঁদের আনন্দ। তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করেন, কোন জোরের কাছে তাঁরা নতি স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা ‘অলূক্ষা’—নম্র ও শান্ত, কখনই রূঢ় বা উদ্ধত নন। তাঁরা হবেন ‘ধর্মকামাঃ’ অর্থাৎ ধার্মিক। আচার্য বলছেন, তোমার কি করণীয় তা যদি বুঝতে না পার তবে মহত্ত্বে ও মেধায় যিনি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁকে অনুসরণ কর।

সবশেষে আচার্য বলছেন—আমি তোমাকে যা কিছু শিখিয়েছি এই হল তার সারকথা। এই নির্দেশই শাস্ত্রের ও গুরুবাক্যের মূলভিত্তি। তুমি এখন গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে চলেছ। সুতরাং এই সব নির্দেশ তোমার পালন করা কর্তব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্ বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥১॥ ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ।

(এই প্রার্থনা প্রথম অধ্যায়ের প্রার্থনার অনুরূপ। পার্থক্য হল: এই শ্লোকের শেষের ক্রিয়াপদগুলিতে অতীতকাল ব্যবহার করা হয়েছে)

মিত্র অর্থাৎ সূর্যদেব আমাদের কল্যাণ করুন। বরুণ আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। অর্যমন (সূর্য ও চক্ষুর দেবতা) আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ইন্দ্র আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। বিষ্ণু যিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে চলেন তিনি আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নন। আমি ঘোষণা করেছি, 'আপনিই প্রকৃত ব্রহ্ম'। আমি আরো বলেছি, 'আপনি ঋতস্বরূপ, আপনিই স্বয়ং সত্য।' বায়ুরূপে ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনি আচার্যকেও রক্ষা করেছেন। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনি আচার্যকে রক্ষা করেছেন। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

॥শীক্ষাবল্লী এখানেই সমাপ্ত॥

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্রহ্মানন্দবল্লী

প্রথম অধ্যায়

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়: [ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য উভয়কে); সহ (সমানভাবে); অবতু (রক্ষা করুন); নৌ (উভয়কে); সহ (সমভাবে); ভুনক্তু (বিদ্যার সুফল প্রদান করুন [অর্থাৎ গ্রহণ করার যোগ্যতা দান করুন]); সহ (সমানভাবে); বীর্যম্ ([বিদ্যালাভের] সামর্থ্য, শক্তি); করবাবহৈ ([যেন] লাভ করতে পারি); নৌ (আমাদের দুজনের); অধীতম্ (লব্ধবিদ্যা); তেজস্বি (বীর্যশালী, ফলপ্রসূ); অস্তু (হোক); মা বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই); শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শান্তি]); শান্তিঃ (আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শান্তি]); শান্তিঃ (আধিভৌতিক বিঘ্নের শান্তি হোক [অর্থাৎ হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত বিঘ্নের শান্তি])।

সরলার্থ: ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন গুরু ও শিষ্য আমাদের উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করেন। আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আমরা উভয়েই এই বিদ্যা লাভের জন্য যেন কঠোর পরিশ্রম করি। আমাদের শিক্ষা যেন সমানভাবে আমাদের কাছে ফলপ্রসূ হয়। পরস্পরের প্রতি আমাদের যেন বিদ্বেষ না থাকে। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ব্যাখ্যা: গুরু এবং শিষ্য উভয়ে প্রার্থনা করছেন : অনুগ্রহ করে আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন।

সহ নৌ ভুনক্তু—আমরা যেন সমানভাবে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আবার যা শিখলাম তার তাৎপর্যও যেন সমানভাবে ধরতে পারি। এই বিদ্যার সর্বাধিক সুফল আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে লাভ করি। 'ভুনক্তু' শব্দটি এসেছে 'ভুজ্' ধাতু থেকে। 'ভুজ' অর্থ হল 'উপভোগ করা'। উপনিষদ পাঠ আমরা যেন একসঙ্গে উপভোগ করতে পারি।

সহ বীর্যং করবাবহৈ—আমাদের সমানভাবে বলিষ্ঠ করুন, সমান কর্মদক্ষতা দিন যাতে সম্পূর্ণভাবে আমরা নিজেদের শাস্ত্রপাঠে নিয়োগ করি।

তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু—আমরা যেন পরিপূর্ণ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়নে যত্নবান হই। আমাদের ধারণাশক্তি যেন গভীর হয়। আমাদের অধীত বিদ্যা যেন সমানভাবে আমাদের কাছে ফলপ্রসূ হয়।

মা বিদ্বিষাবহৈ—আমরা যেন পরস্পরের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ না করি। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্যে কখনও কখনও সংঘর্ষ বা তিক্ততা এসে পড়তে পারে। তাই এই প্রার্থনা—আমাদের সম্পর্ক যেন সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক যদি আন্তরিক হয়, পরস্পরের প্রতি যদি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকে তাহলে শিষ্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। শিষ্য যদি উদাসীন হন তাহলে গুরু কিভাবে শিক্ষা দেবেন? সেক্ষেত্রে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। আবার মেধাবী শিষ্যের কঠিন প্রশ্নের উত্তর গুরু যদি দিতে না পারেন? সেক্ষেত্রে শিষ্যের প্রতি গুরুর ঈর্ষা হতে পারে। তাই গুরু-শিষ্যের মিলিত প্রার্থনা : আমাদের সম্পর্ক সুন্দর হোক। পরস্পরের প্রতি যেন আমাদের অনুরাগ থাকে। পরস্পরকে যেন আমরা সাহায্য করতে পারি।

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ **পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎপুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥**

অন্বয়: ব্রহ্মবিৎ পরম্ আপ্নোতি (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করেন); তৎ এষা অভ্যুক্তা (এ বিষয়ে একটি ঋক্-মন্ত্রে এই কথাই আছে), সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সত্য [অর্থাৎ নিত্য], জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত); যঃ পরমে ব্যোমন্ গুহায়াং নিহিতং বেদ (হৃদয়স্থ পরম আকাশে বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত [ব্রহ্মকে] যিনি জানেন); সঃ অশ্নুতে (তিনি ভোগ করেন); সর্বান্ কামান্ (সকল ভোগ্য বস্তু); বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ (সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে)।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ (সেই আত্মা থেকে [তথা ব্রহ্ম থেকে]); আকাশঃ সম্ভূতঃ (আকাশের উদ্ভব); আকাশাৎ (আকাশ থেকে); বায়ুঃ ([এল] বাতাস), বায়োঃ অগ্নিঃ (বায়ু থেকে [এল] অগ্নি); অগ্নেঃ (অগ্নি থেকে); আপঃ (জল); অদ্ভ্যঃ (জল থেকে); পৃথিবী (পৃথিবী); পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী থেকে); ওষধয়ঃ (উদ্ভিদ ও গুল্ম); ওষধিভ্যঃ (উদ্ভিদ ও গুল্ম থেকে); অন্নম্ (খাদ্য); অন্নাৎ (খাদ্য থেকে); পুরুষঃ (মানুষ); সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ অন্ন-রস-

ময়ঃ (সেই পুরুষ খাদ্যজাত বস্তু); তস্য ইদম্ এব শিরঃ (এই সেই মানুষের মস্তক); অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ (এই [অর্থাৎ দক্ষিণ বাহু হল] ডান দিকের ডানা), অয়ম্ উত্তরঃ পক্ষঃ (এই [বাম বাহু] হল বাম পক্ষ); অয়ম্ (এই [দেহের মধ্য অংশ]); আত্মা (আত্মা [দেহের কেন্দ্রীয় অংশ]); ইদম্ (এই [দেহের নিম্নাংশ]); পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (পুচ্ছ বা লেজ যা ধারণ করে); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে); ইতি প্রথমঃ অনুবাকঃ (এখানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি বস্তুত পরব্রহ্মকে জানেন। এই বিষয়ে একটি মন্ত্র আছে: 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। আমাদের গুহারূপ হৃদয়াকাশে (অর্থাৎ বুদ্ধিতে) তাঁর অধিষ্ঠান। যিনি হৃদয়ে এই আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তিনি যে শুধু সর্বজ্ঞ ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করেন তা নয় তিনি যা কামনা করেন তাই লাভ করেন।

এই আত্মা থেকে আসে আকাশ। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম, উদ্ভিদাদি থেকে খাদ্য এবং খাদ্য থেকে আসে মানুষ। বস্তুত মনুষ্যদেহ খাদ্য থেকেই উৎপন্ন। মানুষের মাথা আছে। তার ডান হাত হল (পাখীর) ডান দিকের ডানা, বাঁ হাত বাঁ দিকের ডানা; দেহের উপরিভাগ হল (পাখীর) শরীর এবং নিম্নভাগ হল পুচ্ছ বা লেজ যা দেহকে ধারণ করে রাখে। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে জানতে আমরা সচেষ্ট হব কেন? ব্রহ্মকে জানলে আমাদের কি সুবিধে হবে? উত্তর হল, 'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্', যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি সর্বোচ্চকে লাভ করেন। এ-ই হল পরম প্রাপ্তি। উপনিষদ এখানে আমাদের যেন প্ররোচিত করছেন।

প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলেছেন : ব্রহ্ম হল 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'। এগুলি ব্রহ্মের গুণ নয়। বস্তু ও বস্তুর ধর্ম দুটি আলাদা জিনিস। যেমন, আমরা বলতে পারি 'এই একটি সাদা ফুল'— ধবলত্ব একটি গুণ যা ফুলের উপর আরোপ করা হল। এই ধবলত্ব অন্য যে কোন বস্তুর উপর আরোপ করা যেতে পারে। আবার এই ফুলটা সাদা হলেও আর একটি ফুল লাল হতে পারে। এই সব বিশেষণ কিন্তু ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপই হল সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত।

এর অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম একসময় সত্য, একসময় জ্ঞান এবং আর একসময় অনন্ত। না, তা নয়। ব্রহ্ম একযোগে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।

মানুষ সীমিত মনের অধিকারী। এই সসীম মন নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত, এবং অসীম কোন কিছুকে ধারণা করতে পারে না। সেইজন্য ব্রহ্মকে বোঝাতে আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার

করে থাকি। কিন্তু আমরা সবসময় জানি ব্রহ্মকে কোন শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম কোথায় আছেন? 'নিহিতং গুহায়াম্'—এখানে গুহা মানে হৃদয়। গুহার ভিতরে কিছু থাকলে তা যেমন বাইরে থেকে দেখা যায় না, ব্রহ্মও তেমনি হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ববস্তুর সারাৎসার। শঙ্করাচার্য বলেন, 'গুহা' বলতে বুদ্ধিকেও বোঝায়, কারণ বুদ্ধির দ্বারাই আমরা সব কিছু ধারণা করতে পারি।

'নিহিতম্' শব্দটির দুটি অর্থ। 'হিতম্' অর্থ 'বাস করা'; আর 'নি' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর একটি অর্থ হতে পারে নিত্য, শাশ্বত; শুধু বর্তমান বা এই মুহূর্তের জন্য নয়। তিনি হৃদয়ে সর্বদা রয়েছেন। সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে তিনি নিত্য বিরাজমান। 'নি' শব্দটির আর একটি অর্থ হল 'নিগূঢ়ত্বেন'—গূঢ়ভাবে, অতল গভীরে। তিনি সকল বস্তুর অন্তরতম সত্তা। হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে তিনি বিরাজ করেন। ব্রহ্মাকে ছাড়া আমাদের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই।

'গুহা' তথা হৃদয়কে পরম ব্যোমও বলা হয়। 'ব্যোম' কথাটির অর্থ আকাশ। ভিতরে ও বাইরে একই আকাশ। আমরা অনেক সময় হৃদয়াকাশের কথা উল্লেখ করে থাকি। ব্রহ্মকে আমরা কোথায় উপলব্ধি করি? ব্রহ্ম কি আমার থেকে আলাদা কোন বস্তু যাকে আমি দেখতে পাই বা স্পর্শ করতে পারি? না। ব্রহ্ম আমার অন্তরে, আমার হৃদয়ে রয়েছেন। হৃদয়কে 'পরম'ও বলা হয়ে থাকে। পরম অর্থ সর্বোচ্চ, পবিত্র। ব্রহ্মের পবিত্র উপলব্ধি প্রথমে এই হৃদয়েই হয়ে থাকে। এই উপলব্ধি হলে বুঝতে পারি ভিতরে যে আকাশ বাইরেও সেই একই আকাশ। অর্থাৎ তখন আমরা সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বোধ করি।

'সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে'—যখন মানুষের ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় তখন সবকিছুর মধ্যেই তিনি আনন্দ উপভোগ করেন। যেখানে যত আনন্দ আছে সব একত্র করেও এই আনন্দের সঙ্গে তুলনা হয় না। এই অভিজ্ঞতা হলে সাধক তার সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পূর্ণতা বোধ করেন। শঙ্করাচার্য বলেন, এটি ক্রমিক প্রক্রিয়া নয়। এমন নয় যে, একটা আনন্দের পর আর একটা আনন্দ আসে। এই অভিজ্ঞতা হলে সাধক সহসা আনন্দে প্লাবিত হয়ে যান।

একটা উজ্জ্বল আলো যদি পরপর কয়েকটি আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে তাহলে আলোটিকে অত্যন্ত ক্ষীণ দেখায়। আমাদের বর্তমান অবস্থাও সেইরকম। আমরা এখন শরীর ইত্যাদি বিভিন্ন কোষের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন বোধ করি। তাই আমাদের আনন্দ-অনুভব নামে মাত্র। কিন্তু কোনভাবে এই সব আবরণ ভেদ করে গেলে আমরা হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে যাব। ব্রহ্ম তথা আত্মা আমাদের অন্তরে জ্বলজ্বল করছেন। তার আলো বর্তমানে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করলে আমরা লাভ করব অসীম

ব্রহ্মানন্দ। তখন যে আনন্দ অনুভব করি তাতে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। যেখানে যত আনন্দ আছে সব তখন এই ব্রহ্মানন্দে মিলে যায়।

এরপর উপনিষদ এই জগৎ বিবর্তনের বর্ণনা দিচ্ছেন—কিভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল জগতের বিবর্তন হল। প্রথমে এক ব্রহ্ম, সর্বব্যাপী। তখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম—নামরূপহীন, অনির্বচনীয়। ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ হল আকাশ। আকাশও সর্বব্যাপী। তারপর আকাশ থেকে আসে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, এবং জল থেকে এই পৃথিবী।

পৃথিবী থেকে জন্মায় ওষধি (শস্য)। ওষধি থেকে অন্ন। তারপর জীবের (পুরুষ) প্রকাশ। খাদ্যই আগে আসে কারণ খাদ্য ছাড়া কোন প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। শরীরকে বলা হয় অন্নরসময়, খাদ্যের সারপদার্থ দিয়ে তৈরী। শরীর খাদ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই খাদ্য শুক্রবীজাকারে পিতা থেকে সন্তানে সঞ্চারিত হয়। তার থেকেই দেহ গঠিত হয়। এই দেহকে ছাঁচে ঢালা গলানো তামার সঙ্গেও তুলনা করা হয়। কারণ, আমরা আমাদের পিতা-মাতারই প্রতিচ্ছবি। পিতামাতা থেকে যে খাদ্যবীজ আসে তাই হল গলিত তামা।

শঙ্করাচার্য বলেন, এখানে 'পুরুষ' শব্দটির দ্বারা মানুষ বোঝানো হয়েছে। কারণ, জীবজগতে মানুষের স্থান সর্বোচ্চ। তাঁর মতে মানুষ দুটি ব্যাপারে পশুর থেকে আলাদা—জ্ঞান এবং কর্মে। আমাদের ধারণাশক্তি আছে, আমরা শিখতে পারি এবং পরবর্তী প্রজন্মে সেই জ্ঞান পৌঁছেও দিতে পারি। তাছাড়া আমরা ভালমন্দ বিচার করতে পারি। 'এটি করব আর ওটি করব না'—এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি।

এরপর উপনিষদ মানুষের দেহকে পাখীর সঙ্গে তুলনা করছেন। হয়তো বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে আমরা পাখী ছিলাম। আমাদের দুই হাত পাখীর দুটি ডানার সঙ্গে এবং শরীরের নিম্নভাগ পাখীর লেজ বা পুচ্ছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লেজ ছাড়া পাখী উড়তে পারে না। তাই পাখীর লেজ তথা পুচ্ছকে বলা হয় 'প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ আশ্রয়। পাখীর দেহও বিমানের মতো ভারসাম্য নির্ভর। বিমানের পাখা বা লেজ না থাকলে বিমানও উড়তে পারে না।

এই হল মানুষের দেহ অর্থাৎ অন্নময় কোষের বর্ণনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীংশ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।

অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: যাঃ কাঃ চ প্রজাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ (জগতের যত প্রাণী); অন্নাৎ বৈ প্রজায়ন্তে (তারা সকলেই খাদ্য থেকে উৎপন্ন); অথ অন্নেন এব জীবন্তি (তারা সকলেই খাদ্যের দ্বারা পুষ্ট); অথ (অধিকন্তু); অন্ততঃ (পরিশেষে, মৃত্যুকালে); এনৎ অপিয়ন্তি (তারা এতে [খাদ্যে] লীন হয়ে যায়); হি (কারণ); অন্নম্ [এই] খাদ্য), ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ (প্রাণিকুলের অগ্রদূত); তস্মাৎ (সেইজন্য) সর্বৌষধম্ উচ্চতে ([খাদ্য] সকল ব্যাধির [ক্ষুধা ইত্যাদির] ঔষধ বলা হয়ে থাকে); যে (যে সব ব্যক্তি); অন্নং ব্রহ্ম উপিসতে (খাদ্যরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করেন [অর্থাৎ সকল বস্তুর উৎস, আশ্রয় ও গতিরূপে]); তে (তাঁরা); সর্বম্ অন্নম্ বৈ আপ্নুবন্তি (যাবতীয় খাদ্য (অর্থাৎ সকল ভোগ্যবস্তু] প্রাপ্ত হন); হি (যেহেতু); অন্নং ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ (প্রাণিকুলের পূর্বে খাদ্য আসে); তস্মাৎ সর্বৌষধম্ উচ্যতে (সে জন্য তাকে বলা হয় প্রাণিকুলের সকল ব্যাধির প্রতিকার [সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আয়ত্ত করার মতো]); অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে (প্রাণী উৎপন্ন হয় খাদ্য থেকে); জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে (জন্মের পর তারা খাদ্যের দ্বারা বর্ধিত হয়); অদ্যতে (খাদ্য প্রাণিকুলের ভক্ষ্য); চ ভূতানি অত্তি (প্রাণিকুল আবার খাদ্যের [তথাকথিত খাদ্য] ভক্ষ্য); তস্মাৎ (সেইজন্য); তৎ অন্নম্ উচ্যতে ইতি (একে অন্ন [তথা খাদ্য] বলা হয় [অন্ন শব্দটির মূল ধাতু হল ‘অদ্’, যার অর্থ ‘ভোজন করা’])।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ অন্যঃ (উপরোক্ত অন্নময় কোষ থেকে স্বতন্ত্র [কিন্তু]); অন্তরঃ (সেই দেহের ভিতরে); প্রাণময়ঃ (বায়ুরূপে); আত্মা (যাকে তোমার নিজ আত্মার অংশ রূপে অনুভব কর [এটি পৃথক কোষের মতো]); তেন (এর [বায়ুর কোষ তথা প্রাণময় কোষ] দ্বারা); এষঃ (এই [স্থূল-শরীর তথা অন্নময় কোষ]); পূর্ণঃ (পূর্ণ); সঃ বৈ এষঃ (এই [প্রাণময় কোষ]); পুরুষবিধঃ এব (মানবদেহ সদৃশ [সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহ সম্পূর্ণ]); তস্য (তার [স্থূলশরীরের]); পুরুষবিধতাম্ (মানবদেহ রূপে); অনু (প্রতিরূপ); অয়ম্ (এই প্রাণময় কোষ); পুরুষবিধঃ (মানুষের শরীররূপে); তস্য (তার [প্রাণময় কোষের]); প্রাণঃ এব (শ্বাসবায়ু [যা মুখবিবর ও নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বয়]); শিরঃ (মস্তক); ব্যানঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ব্যান [সমগ্র দেহব্যাপী যে বায়ু] হল ডান পাখা); অপানঃ উত্তরঃ পক্ষঃ (অপান [নিঃশ্বাস বায়ু, যা ত্যাগ করা হয়] হল বাম পাখা); আকাশঃ আত্মা (আকাশ [অর্থাৎ সমান বায়ু বা

খাদ্য জীর্ণকারী শ্বাসবায়ু] হল দেহের মধ্যভাগ); পৃথিবী (দেহের আশ্রয় যে দেবতা [অর্থাৎ উদান বা যে বায়ু শরীরের ঊর্ধ্বগমন প্রতিরোধ করে]); পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (লেজ যা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে); ইতি দ্বিতীয়ঃ অনুবাকঃ (এখানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: এই জগতে যত প্রাণী আছে সব খাদ্য থেকে উৎপন্ন। খাদ্যের দ্বারা তারা পুষ্ট হয় এবং অন্তে তারা খাদ্যেই বিলীন হয়। এর কারণ প্রাণীর আগে খাদ্য আসে। সেইজন্য খাদ্যকে জীবের সকল রোগের ঔষধ বলা হয়। যাঁরা খাদ্যকে ব্রহ্মরূপে (অর্থাৎ সবকিছুর উৎস, প্রতিষ্ঠা এবং গন্তব্যরূপে) উপাসনা করেন তাঁরা যাবতীয় খাদ্যই প্রাপ্ত হন। প্রাণীর আগে খাদ্যের সৃষ্টি। তাই খাদ্যকে সকল প্রাণীর ঔষধ বলা হয়। অন্ন থেকে জীবের জন্ম আবার অন্নের দ্বারাই জীব পুষ্ট হয়। অন্ন প্রাণীদের খাদ্য আবার এই অন্নও প্রাণীদের খায়। এইজন্যই খাদ্যকে বলা হয় অন্ন অর্থাৎ যা আহার করে।

খাদ্য দ্বারা গঠিত যে আত্মার (অন্নময় কোষ) কথা আগে বলা হয়েছে তার থেকে স্বতন্ত্র আর এক আত্মা আছে। অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে তাকে বলা হয় প্রাণময় কোষ (এটি বায়ুর দ্বারা গঠিত এবং কোষরূপে রয়েছে)। এই কোষ অন্ননির্মিত স্থূলদেহকে পূর্ণ করে থাকে এবং তার নিজের আকারও মানুষের মতো। মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট এই প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষেরই প্রতিচ্ছবি। প্রাণবায়ু (যে শ্বাসবায়ু আমরা গ্রহণ করি) তার মাথা; ব্যান বায়ু (সমগ্র দেহে যা ছড়িয়ে আছে) হল ডান দিকের ডানা বা দক্ষিণ পক্ষ; অপান বায়ু (যে নিঃশ্বাস আমরা ছাড়ি) বাঁ দিকের ডানা বা বাম পক্ষ; আকাশ (অর্থাৎ সমান বায়ু যা খাদ্য পরিপাক করে) দেহের মধ্যভাগ এবং পৃথিবী (অর্থাৎ উদান যা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে) হল পুচ্ছ। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: সকল প্রাণীর উৎপত্তি খাদ্য থেকে এবং খাদ্যের দ্বারাই তারা পুষ্ট। খাদ্য ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। ভারতে বর্তমানে বাঘ প্রভৃতি নানা প্রজাতির প্রাণী নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে কারণ তারা খাদ্য পায় না। প্রাণীর বংশবৃদ্ধি এবং বংশ পরম্পরা খাদ্যের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে।

আবার মৃত্যুর পর আমরাও খাদ্য হয়ে যাই। পোকামাকড় ও অন্যান্য জীব আমাদের দেহটাকে খেয়ে ফেলে। খাদ্য থেকে আমরা এসেছি, খাদ্যের দ্বারা পুষ্টিলাভ করেছি আবার খাদ্যেই ফিরে যাই। এইভাবে বৃত্তাকারে চলতে থাকে।

খাদ্যকে বলা হয় 'জ্যেষ্ঠম্', সকল বস্তুর আদি কারণ। খাদ্য থাকলে তবেই প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব। 'ভূতানাম্' এর অর্থ হল জীবকুল। হিন্দুশাস্ত্রমতে চার প্রকার জীব আছে: জরায়ুজ—যারা মাতৃগর্ভজাত; অণ্ডজ—যারা ডিমজাত; স্বেদজ—যারা স্বেদ বা আর্দ্রতা

জাত (মশা জাতীয় কীটকে সেকালে সরাসরি জল থেকে উৎপন্ন বলে মনে করা হত) এবং উদ্ভিজ্জ—উদ্ভিদ যা পৃথিবী থেকে জাত। এই সব শ্রেণীর জীবেরই প্রয়োজন হল খাদ্য। অন্যথায় এদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না।

খাদ্যকে 'সর্বৌষধম্'ও বলা হয়, কারণ সকল জীবের পক্ষে খাদ্যই সর্বরোগহর। খাদ্য আমাদের ক্ষুধা-পিপাসা মেটায়, আমাদের স্বস্তি দান করে।

ধরা যাক কোন ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে। এর অর্থ হল সেই ব্যক্তি শরীরের ভজনা করে। কিছু মানুষ তাদের শরীর নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাদের কাছে দেহই পরম এবং একমাত্র সত্য। এমন মানুষের কি হয়? যার যা ভাব সে তাই পায়। দেহের ভজনা করলে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ লাভ হয়। দেহের অতিরিক্ত কিছু যদি আমি না জানি তবে স্বভাবতই আমার সকল উন্নতি হবে দেহকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু উপনিষদ আদৌ শরীরকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করার কথা কেন বলছেন? শঙ্করাচার্য বলেন, কোন একটি জায়গা থেকে আমাদের শুরু করতে হবে। প্রতিটি কোষই ব্রহ্ম, কিন্তু পরব্রহ্ম নয়। স্থূলশরীর থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে সাধকের উত্তরণ ঘটে। তখন স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দেহে সাধক এগোতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

খাদ্যকে অন্ন বলা হয় কেন? অন্ন শব্দটি এসেছে 'অদ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ হল 'আহার করা'। উপনিষদ বলেন, আমরা খাদ্য খাই, খাদ্যও আমাদের খায়। খাদ্য খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি আবার আমরাই অন্যের খাদ্যে পরিণত হই।

এই শরীরকে বলা হয় 'অন্নরস', খাদ্যের সার, কারণ এই শরীর খাদ্যেরই রূপান্তর মাত্র। আমরা যা খাই তা রক্ত মাংস হাড় ইত্যাদিতে পরিণত হয়। অন্নময় কোষকে স্থূলশরীরও বলা হয়। এই স্থূলশরীরের অভ্যন্তরে থাকে সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীরে কতগুলি কোষ থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় প্রাণময় কোষ যা প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ু দিয়ে তৈরী। পরবর্তী হল মনোময় কোষ, যা মনের স্তর এবং সবশেষে বিজ্ঞানময় কোষ, যা বুদ্ধির স্তর। এইভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যেতে থাকে। অবশেষে এই সূক্ষ্মদেহকেও অতিক্রম করে সূক্ষ্মতর অবস্থা বা আনন্দময় কোষ, যা আনন্দের স্তর।

বস্তুত এসব কোষ আমাদেরই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর। কখনও আমাদের অবস্থান স্থূলশরীরে। তখন আমরা ভাল খাদ্য গ্রহণ করে আনন্দ পাই। কখনও বা আমরা থাকি মনের স্তরে—তখন আমরা চিন্তাশীল এবং কল্পনাপ্রবণ। আবার কখনও আমরা থাকি বুদ্ধির স্তরে। তখন আমাদের বই ভাল লাগে, বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জাগে। তবে এইসব স্তরে থাকার জন্য আমাদের বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যখন আমরা আনন্দময়

কোষে থাকি তখন শুধুই আনন্দ। এই স্তরে আমরা দেহ, মন বা বুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন থাকি না। এই আনন্দ বাইরের কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে না। আমরা তখন সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন।

যখন কেউ বলে ভূত দেখেছে তখন আসলে সে কারো সূক্ষ্মশরীর দেখেছে। প্রেত মাত্রেই ক্ষতিকারক নয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তখন মধ্যরাত্রে শয্যাত্যাগ করে তিনি ধ্যান করতেন। তখন দেখতেন এক ঋষির প্রেতও তাঁর পাশে বসে ধ্যান করত। একদিন রাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি। সেই প্রেতটি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বলছে, 'ওঠ, ধ্যানের সময় হয়েছে।'

উপনিষদ এখন প্রাণময় কোষ নিয়ে আলোচনা করছেন। স্থূলশরীরের অভ্যন্তরে কিন্তু স্থূলশরীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই কোষের অবস্থান। এটি জীবাত্মার মতো, স্থূলশরীরের আত্মস্বরূপ।

এই প্রাণ যে কেবল দেহের একটি মাত্র অংশে রয়েছে তা নয়। এর অবস্থান দেহের সর্বত্র, সর্বাংশে। এ দেহ প্রাণবায়ুতে পূর্ণ। আচার্য শঙ্কর একে হাপরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কামার যখন কিছু গলাতে চায় তখন সে হাপরের সাহায্যে হাওয়া করে, যাতে আগুন ভালভাবে জ্বলতে পারে। হাওয়া হাপরের সর্বাংশে ভরে থাকে। সেইরকম প্রাণবায়ুও শরীরের সর্বাংশ পূর্ণ করে থাকে।

যদিও প্রাণের অবস্থান সারা শরীর জুড়ে, এর পাঁচটি স্বতন্ত্র কাজ আছে। এই পাঁচটি কাজকে বলা হয়—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। প্রাণের পাঁচটি কাজকে উপনিষদ পাখীর দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তা ঊর্ধ্বগামী তাই একে পাখীর মাথার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অপান হল নিঃশ্বাস বায়ু যা আমরা ত্যাগ করি। বাঁ দিকের নাসারন্ধ্র দিয়ে এই অপান বায়ু বেরিয়ে যায়। তাই একে পাখীর বাঁ দিকের ডানার (বাম পক্ষ) সঙ্গে তুলনা করা হয়। ব্যান বায়ু সারা শরীরে ব্যাপ্ত থাকে। ব্যান হল পাখীর ডানদিকের ডানা (বা দক্ষিণ পক্ষ)। সমান বায়ু খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। তাই একে পাখীর দেহের মধ্যভাগের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আর উদান বায়ু আমাদের ধারণ করে এবং আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই একে বলা হয় পাখীর লেজ (পুচ্ছ)। উদান না থাকলে আমাদের দেহ হয়। উপরে উঠে যেত, না হয় নিজের ভারে নীচে পড়ে যেত।

এই কোষতত্ত্বের আলোচনা কি কারণে করা হচ্ছে? আচার্য শঙ্কর আমাদের আত্মাকে এক দানা চালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চাল পেতে হলে যেমন ধানের খোসা ছাড়িয়ে

যেতে হবে ঠিক তেমনি আত্মাকে পেতে গেলে প্রথমেই বিভিন্ন কোষগুলি সরিয়ে ফেলা আবশ্যক।

শঙ্করাচার্য আরও বলেন, আত্মা হলেন অন্তরতম সত্তা। এ যেন প্রাসাদে রাজসন্দর্শনে যাওয়া। একটার পর একটা ঘর পার হয়ে সব থেকে ভিতরের ঘরটিতে প্রাসাদের অধিপতি রাজার দর্শন পাওয়া যায়। এই ঘরগুলি যেন কোষ এবং রাজা হলেন আত্মা। আর একটি দৃষ্টান্ত হল : কোষগুলি তলোয়ারের খাপের মতো। খাপের ভেতর তলোয়ার রয়েছে। আত্মা স্বয়ং সেই তলোয়ার।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে। সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যত ইতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সকল); প্রাণম্ (প্রাণ তথা শ্বাসবায়ুরূপ আত্মা); অনু প্রাণন্তি (প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং সেহেতু নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম); [তথা] যে মনুষ্যাঃ (একই সূত্র মানুষেও প্রযোজ্য); পশবঃ চ(পশুতেও); হি (সে কারণে); প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ (সর্বভূতের জীবনের কারণ প্রাণ); তস্মাৎ সর্বায়ুষম্ উচ্যতে (এই কারণে একে বলা হয় 'সকল জীবনের জীবন'); যে প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (যে সব মানুষ ব্রহ্মকে প্রাণরূপে উপাসনা করেন); তে সর্বম্ এব আয়ুঃ যন্তি (পূর্ণ আয়ু অর্জন করেন); হি প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ (প্রাণ সকল সত্তার জীবন); তস্মাৎ সর্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি (এবং সেইজন্যই একে বলা হয় 'সকল জীবনের জীবন')।

তস্য পূর্বস্য যঃ এষঃ এব শারীরঃ আত্মা (এই [প্রাণময় কোষ] পূর্বোক্ত কোষের [অন্নময় কোষ] অন্তরাত্মা); তস্মাৎ এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ (প্রাণময় কোষের গভীরে তার থেকে পৃথক যে আত্মা তাকে বলা হয় মনোময় কোষ [মানস স্তর]); তেন (এর [মন তথা মনোময় কোষের দ্বারা]); এষঃ (এই [প্রাণময়] কোষ); পূর্ণঃ (পূর্ণ); সঃ এষঃ বৈ পুরুষবিধঃ এব (এই [মনোময়] আত্মারও মানুষের আকার); তস্য পুরুষবিধতাম্

অনু অয়ং পুরুষবিধঃ (যেরূপ সেটির [প্রাণময় আত্মা] মানবাকৃতি, একই রূপে এটিরও [মনোময় আত্মা] মানবের আকৃতি); যজুঃ এব তস্য শিরঃ (যজুঃ মন্ত্র তার মস্তক); ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ঋক্-মন্ত্র এর ডান পক্ষ); সাম উত্তরঃ পক্ষঃ (সাম এর বাম পক্ষ); আদেশঃ (বেদের ব্রাহ্মণ অংশ); আত্মা (দেহের মধ্যভাগ); অথর্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (অথর্ব অঙ্গিরস এর লেজ তথা পুচ্ছ); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে); ইতি তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ (এখানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: ইন্দ্রিয়সকল প্রাণকে অনুসরণ করে। এর ফলেই সেগুলি নিজের নিজের কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। কি মানুষের ক্ষেত্রে কি পশুর ক্ষেত্রে, এই একই কথা প্রযোজ্য। প্রাণ সকল প্রাণীকে জীবন দান করে। সেজন্য প্রাণকে 'সর্বায়ুষম্' অর্থাৎ সকল প্রাণীর 'জীবন' বলা হয়। যাঁরা প্রাণকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করেন তাঁরা পূর্ণ আয়ু লাভ করেন। প্রাণই সকল জীবের আয়ু; যতদিন দেহে প্রাণ থাকে ততদিনই জীব বেঁচে থাকে। তাই প্রাণকে 'সর্বায়ুষম্' বলা হয়। অন্নময় কোষের অন্তরস্থ আত্মা হল এই প্রাণ।

প্রাণময় কোষেরও গভীরে রয়েছে মনোময় কোষ। মনোময় কোষ সমগ্র প্রাণময় কোষকে পূর্ণ করে আছে। যেমন প্রাণময় কোষের আকৃতি মানুষের মতো, সেই অনুযায়ী মনোময় কোষেরও আকার মানুষের মতো। যজুঃ মন্ত্র এর (পাখীর) মস্তক, ঋক্-মন্ত্র এর ডান দিকের ডানা (দক্ষিণ পক্ষ), এবং সামবেদ এর বাঁ দিকের ডানা (বাম পক্ষ)। ব্রাহ্মণ অংশ হল শরীরের মধ্যভাগ, এবং অথর্ব অঙ্গিরস এর পুচ্ছ বা লেজ। এবিষয়েও একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: 'দেব' শব্দের অর্থ যা উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। সাধারণভাবে এর দ্বারা দেবতাকে বোঝায়। কিন্তু এখানে দেব বলতে ইন্দ্রিয়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। এর কারণ কি? ইন্দ্রিয়গুলিই বাইরের বস্তুকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে। যেমন চোখ দিয়ে আমরা বাইরের সব জিনিস দেখতে পাই। চোখই যেন বস্তুকে আলোকিত করে আমাদের কাছে তাকে প্রকাশ করে।

কেউ মারা গেলে আমরা অনেক সময় দেখি তার ইন্দ্রিয়গুলি অক্ষত রয়েছে। চোখ, কান, সবই রয়েছে, কিন্তু সেগুলি কাজ করছে না। তাহলে কিসের অভাব ঘটল? অভাব হল প্রাণ অর্থাৎ জীবনীশক্তির। দেহে প্রাণ না থাকলে ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করতে পারে না। প্রাণ শুধু মানুষের নয়, সকল জীবেরই আয়ু।

উপনিষদ বলছেন, এই প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে পূর্ণ আয়ু লাভ হয় (সর্বায়ুঃ)। এখানে আয়ু বলতে জীবৎকাল অর্থাৎ পরমায়ু বোঝাচ্ছে। আচার্য শঙ্করের মতে পূর্ণ আয়ু হল একশ বছর (শত বর্ষাণি)। কিন্তু এটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণীয় নয়। মূল কথা হল—যার

যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোসংযোগ করতে পারলে সেটি সহজেই পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'যদ্গুণকং ব্রহ্মোপাস্তে স তদ্গুণভাগ্ভবতি'—যদি কেউ ব্রহ্মকে বিশেষ গুণ রূপে উপাসনা করেন তবে তিনি সেই গুণ লাভ করেন। সবকিছু ব্রহ্মেই রয়েছে। অতএব ব্রহ্মকে সৌন্দর্য রূপে ধ্যান করলে মানুষ সৌন্দর্য লাভ করে। আবার বীর্যবত্তা, পবিত্রতা বা জ্ঞানরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করলে সেই সেই গুণ লাভ হয়। উপাসক তখন ব্রহ্মসদৃশ হয়ে ওঠেন।

প্রশ্ন হল, এই জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেউ যদি মনে করেন, এ জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই তাহলে তাঁর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে 'যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার স্বরূপ জ্ঞান হয় ততক্ষণ আমি বাঁচতে চাই। আমি নিজেকে জানব—এই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি মরতে চাই না।'

প্রাণময় কোষের ভিতরে আছে মনোময় কোষ অর্থাৎ মনের স্তর। প্রাণময় কোষ যেমন অন্নময় কোষকে পূর্ণ করে রাখে তেমনি মনোময় কোষও প্রাণময় কোষকে পূর্ণ করে থাকে। এই মনোময় কোষের আকারও প্রাণময় কোষের মতো।

উপনিষদ আবার পাখীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মাথা। এখানে যজুর্বেদকে পাখীর মাথা বলা হয়েছে। কেন? যজুর্বেদের মন্ত্রগুলির ছন্দ অনিয়মিত। সামবেদ অত্যন্ত সুরেলা এবং সুর করে গাওয়া যায়। বস্তুত সামবেদকে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস বলে ধরা হয়। কিন্তু যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি গাওয়া সম্ভব নয়। তথাপি এই বেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শঙ্করাচার্য বলেন, অধিকাংশ বৈদিক ক্রিয়াকর্ম যজুর্বেদ-ভিত্তিক। যজ্ঞের আহুতি দেওয়ার সময় যেসব মন্ত্র উচ্চারিত হয় তার অধিকাংশই যজুর্বেদের অন্তর্গত। যজুর্বেদ সাধককে বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়।

একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়—আচার্য শঙ্করের এই ঘোষণা সত্ত্বেও কর্মকাণ্ডকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। মনে বাসনা থাকলে যে ভাবেই হোক তাকে জয় করতে হবে। যতক্ষণ বাসনা থাকবে ততক্ষণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্তব্য কর্ম করে যেতেই হবে। কর্মের দ্বারা দীর্ঘায়ু, ধনসম্পদ এবং স্বর্গলাভ করা যায়। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্ম করলে ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন মানুষ বোঝে তার সকল দুঃখের মূলে রয়েছে এই বাসনা, কারণ এ জগৎ অনিত্য। তখন যা নিত্য, যা অবিনাশী তাকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ইহকাল ও পরকালে সকল প্রকার ভোগ সুখ প্রত্যাখ্যান করে মানুষ তখন আত্মজ্ঞান লাভ করতে চায়।

প্রশ্ন হল মনোময় কোষের সঙ্গে বেদকে যুক্ত করা হল কেন? আচার্য শঙ্কর বলছেন, বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করা কোন যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, তা মানসিক। আমরা যখন জপ করি তা

মন দিয়েই করা উচিত। জপের সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি জাগে। তেমনি বেদের প্রতিটি শব্দের একটা অর্থ আছে; সেই অর্থ বুঝে মন্ত্র উচ্চারণ করলে মনে কতগুলি চিন্তার উদ্রেক হয়। মন্ত্রের অর্থ ধ্যান করতে করতে মনে কিছু প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি জাগে (মনোবৃত্তি)। এইভাবে বারবার অভ্যাস করতে হবে। শুরুতে যা একটা ধারণামাত্র ছিল পুনঃ পুনঃ মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তা রূপ ধরে মূর্ত হয়ে উঠবে। এর আশু ফলস্বরূপ সাধক দীর্ঘ জীবন, ধনসম্পদ ইত্যাদি লাভ করেন, কিন্তু পরিণামে সব অজ্ঞানতার বন্ধন কেটে গিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

আচার্য শঙ্কর শাস্ত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন : 'সর্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি স মানসীন আত্মা'—সকল বেদের একই লক্ষ্য (অর্থাৎ তারা একটি বিষয়ে একমত)—মনেই আত্মা রয়েছে।

কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ, জ্ঞানকাণ্ডের জ্ঞান অনুসন্ধান অথবা ঋক্ সাম ইত্যাদি বেদ অধ্যয়ন, যাই করি না কেন বেদের লক্ষ্য কিন্তু একই। তা হল আত্মজ্ঞান লাভ। কর্মকাণ্ড সাধককে একটু ঘুরপথে নিয়ে যায়। কিন্তু এইসব ক্রিয়াকর্ম করতে করতেই সাধক ধীরে ধীরে এগুলিকে অতিক্রম করেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন তাঁর আর এসব যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নেই।

বেদের ব্রাহ্মণ অংশকে বলা হয় (পাখীর) দেহের মধ্যভাগ। কারণ এই অংশেই যাগযজ্ঞের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে এই সব নির্দেশ দেওয়া আছে। তাই এগুলিকে বলা হয় 'আদেশ'। অথর্ব ও ঋষি অঙ্গিরস প্রদত্ত নির্দেশসমূহকে বলা হয়েছে পাখীর পুচ্ছ বা লেজ। আচার্য শঙ্করের মতে এইসব নির্দেশ মেনে কর্ম অনুষ্ঠান করলে সাধক শান্তি সমৃদ্ধি ইত্যাদি লাভ করেন (শান্তিকপৌষ্টিকাদি)। এগুলি জীবনকে ধারণ করে রাখে। তাই এরা পাখীর পুচ্ছের মতো, যার দ্বারা পাখীর দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধেব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: বাচঃ (বাক্যসকল); মনসা সহ (মন সহ); অপ্রাপ্য (না পেয়ে); যতঃ (তাঁর [ব্রহ্ম] থেকে); নিবর্তন্তে (ফিরে আসে); ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ আনন্দম্ (যিনি ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন); কদাচন ন বিভেতি ([কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর কারণে] কখনও ভীত হন না)।

তস্য পূর্বস্য যঃ এষঃ এব শারীরঃ আত্মা (এই [মনোময়] কোষ পূর্বোক্ত [প্রাণময়] কোষের অন্তরস্থ আত্মা); তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা (এই মনোময় কোষের গভীরে এবং এর থেকে পৃথক আর এক আত্মা); বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময় কোষ [বুদ্ধির কোষ] [কথিত হয়]); তেন এষঃ পূর্ণঃ (তার [বিজ্ঞানময় কোষ] দ্বারা এটি [মনোময় কোষ] পূর্ণ); সঃ বৈ এষঃ (সেই [বিজ্ঞানময় কোষ]); পুরুষবিধঃ এব (মনুষ্য আকার সম্পন্ন); তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু অয়ং পুরুষবিধঃ (যেভাবে সেই [মনোময়] কোষ মানবাকৃতি সম্পন্ন, সেইভাবেই এই [বিজ্ঞানময়] কোষও মানবাকৃতি সম্পন্ন); তস্য (তার [বিজ্ঞানময় কোষের]); শ্রদ্ধা (শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা); এব শিরঃ (এর মস্তক); ঋতম্ (শাস্ত্রার্থ মনন); দক্ষিণঃ পক্ষঃ (এর দক্ষিণ তথা ডান পক্ষ); সত্যম্ (শাস্ত্র বিধি অনুসারে বাক্য ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস); উত্তরঃ পক্ষঃ (এর বামপক্ষ); যোগঃ (নির্ভুলভাবে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলা); আত্মা (দেহের মধ্যভাগ); মহঃ (হিরণ্যগর্ভ [প্রথমজাত]); পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (ভারসাম্য রক্ষাকারী পুচ্ছ তথা লেজ); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে [ব্রাহ্মণ অংশে]); ইতি চতুর্থ অনুবাকঃ (এখানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: বাক্য এবং মন ব্রহ্মের কাছে পৌঁছতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। যিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেছেন তিনি কখনও (জন্ম-মৃত্যুর ভয়ে) ভীত হন না (অর্থাৎ তিনি অমরত্ব লাভ করেন)।

এই মনোময় কোষ প্রাণময় কোষের আত্মা। মনোময় কোষের অভ্যন্তরে আর একটি কোষ আছে যা বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধির স্তর) বলে পরিচিত। এই মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা পূর্ণ। বিজ্ঞানময় কোষও মানবাকৃতি। ঠিক যেমন মনোময় কোষের আকৃতি মানুষের মতো, অনুরূপভাবে বিজ্ঞানময় কোষের আকারও মানুষের মতো। এই কোষে শ্রদ্ধা (অর্থাৎ শাস্ত্র ও নিজের প্রতি শ্রদ্ধা) মস্তকের প্রতীক; ঋত (অর্থাৎ শাস্ত্রের অর্থ মনন করা) ডান দিকের ডানা (বা দক্ষিণ পক্ষ); সত্য এর বাঁ দিকের ডানা (অর্থাৎ বাম পক্ষ) এবং যোগ হল আত্মার প্রতীক যা দেহের মধ্যভাগ। 'মহঃ' অথবা হিরণ্যগর্ভ হল লেজ বা পুচ্ছ যা (পাখীর) দেহকে ধরে রাখে। ব্রাহ্মণে এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: বাক্য এবং মন উভয়ই মনোময় কোষস্থিত পরব্রহ্মকে ধারণা করতে বা প্রকাশ করতে অক্ষম। বাক্য ও মন সসীম, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। ব্রহ্ম হল বাক্য-মনের অতীত এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব। উপরন্তু বাক্ এবং মন একযোগে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ই হতে পারে না।

এখানে ‘বিদ্বান’ শব্দটির অর্থ ‘যাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে’, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের পরমানন্দ যিনি অনুভব করেছেন। তিনি আর কোন কিছুকে ভয় পান না। কেন? কারণ এক আত্মাই আছেন, আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কাকে তিনি ভয় করবেন? দুই বোধ থেকেই ভয়ের জন্ম। আসলে যা কিছু আছে সব এক আত্মার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনোময় কোষের অভ্যন্তরে, মনোময় কোষের থেকে পৃথকভাবে আছে বিজ্ঞানময় কোষ তথা বুদ্ধির কোষ। একে বলা হয় মনোময় কোষের আত্মা। একে আবার ‘শারীর’ও বলা হয়ে থাকে কারণ এটি মনোময় শরীরকে অধিকার করে থাকে। ‘শারীর’ শব্দটি শরীরের বিশেষণ। যা শরীরকে অধিকার করে থাকে তাই ‘শারীর’। বিজ্ঞানময় কোষ যেন মনোময় কোষেরই অবিকল প্রতিরূপ।

বিজ্ঞানময় বলতে বুদ্ধির স্তরকে বোঝায়। এটি সিদ্ধান্ত বা সঙ্কল্প গ্রহণ করার স্তর। মনের স্তরে সবসময় সঙ্কল্প-বিকল্প থাকে; ‘করব কি করব না’, এই সংশয় থাকে। কিন্তু বুদ্ধি স্থিরসঙ্কল্প। ‘হ্যাঁ, এটা করব’—এ সিদ্ধান্ত বুদ্ধিই নিতে পারে।

কোন কিছুর সঠিক তাৎপর্য কি তা বুদ্ধির সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি। বেদে অনেক কথা আছে, কিন্তু তার মর্মার্থ আমাদের বুঝতে হবে। অনেকে আছেন যাঁরা কোন কিছুই তলিয়ে দেখতে চান না। শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ হন।

উপনিষদে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বিরোচন সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। তাঁরা দুজনে প্রজাপতির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আত্মা কি? আমরা যে আত্মার কথা শুনি সেই আত্মা কি এবং তিনি কোথায় আছেন?’ প্রজাপতি উত্তর দিলেন, ‘ওই নদীর ধারে যাও। জলে নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য কর। ওই তোমার আত্মা।’ বিরোচন তাই করলেন। জলে নিজদেহের প্রতিবিম্ব দেখে ভাবলেন, ‘ওঃ, তাহলে এই দেহই আত্মা!’ সন্তুষ্টচিত্তে তিনি ফিরে গেলেন। প্রথমে ইন্দ্রও তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, ‘শরীর কি আত্মা হতে পারে? শরীরের পরিবর্তন আছে। এই শরীর কখনও যুবক, কখনও বৃদ্ধ; কখনও রোগগ্রস্ত, কখনও সুস্থ। কিন্তু আত্মা নিত্য, অপরিবর্তনীয়। অতএব এই শরীর কখনও আত্মা হতে পারে না।’ এইভাবে বহু বছরের আত্মজিজ্ঞাসা ও ধ্যানের পর অবশেষে তিনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করলেন।

উপনিষদ বিজ্ঞানময় কোষকেও পাখীর দেহের সঙ্গে তুলনা করছেন। যদি এই কোষকে পাখী রূপে কল্পনা করা যায় তাহলে তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ মাথা কোন্‌টি? উপনিষদ বলছেন, শ্রদ্ধা এই পাখীর মাথা। শ্রদ্ধা অর্থ হল শাস্ত্র এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস। এর আর এক অর্থ আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস না থাকলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই আত্মবিশ্বাস হারানো বড়ই ক্ষতিকর।

'ঋতম্' বা ন্যায়পরায়ণতা পাখীর দক্ষিণ পক্ষ অর্থাৎ ডান দিকের ডানা। বুদ্ধি দিয়ে আমরা ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারি এবং আমাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকি। পাখীর বাঁ দিকের ডানা বা বাম পক্ষ হল 'সত্যম্' অর্থাৎ মন-মুখ এক করে কর্ম করা। সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতা, এই দুটি বুদ্ধির স্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি পশু ভালমন্দ বিচার করবে তা কেউ আশা করে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই গুণগুলি অপরিহার্য।

পাখীর দেহকে বলা হচ্ছে 'যোগ'। শঙ্করাচার্যের মতে যোগের অর্থ 'একাগ্রতা', আত্মার সঙ্গে অভিন্নতাবোধ—'যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্'।

আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। কিভাবে এই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়? ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং একাগ্রতা—এই তিন গুণের সমন্বয় ঘটলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই তিনটি আয়ত্ত হলে বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। তখন চিত্তশুদ্ধি হয় এবং আত্মতত্ত্ব ধারণা করার শক্তি জন্মায়।

ধরা যাক একজন ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান কিন্তু সৎ নন, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কাজ করেন না। যেমন, সম্প্রতি একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাতির ঘটনাটি এত সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিত যে ডাকাতদের প্রশংসা করতেই হয়। পুলিশ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা ডাকাতদের কোন হদিস পাচ্ছে না, কারণ ডাকাতরা কোন সূত্র রেখে যায়নি। বিনা রক্তপাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ তারা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। তাই উপনিষদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, সেই বুদ্ধিকে সঠিকপথে চালিত করা চাই। সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা, এ দুটি জিনিস মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

এরপর উপনিষদ বলছেন, পাখীর পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা হল 'মহঃ'। 'মহঃ' কথাটির অর্থ হল মহত্তম বা হিরণ্যগর্ভ, যা ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। শঙ্কর বলছেন, 'কারণং হি কার্যানাং প্রতিষ্ঠা'—কার্য কারণকেই আশ্রয় করে থাকে। অর্থাৎ কারণ ছাড়া কার্য হয় না। তেমনি 'মহঃ'কে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানময় কোষ কাজ করতে পারে না, বুদ্ধির বিকাশও হয় না। শঙ্করাচার্য একে পৃথিবীর বৃক্ষ-লতাদির সঙ্গে তুলনা করেছেন (যথা বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী)। পৃথিবীই বৃক্ষ-লতার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। পৃথিবী ছাড়া বৃক্ষ লতা ইত্যাদি থাকতে পারে না। সেই রকম হিরণ্যগর্ভও সকল বস্তুর আশ্রয়।

পঞ্চম অধ্যায়

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা।

সর্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মাঽঽনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: বিজ্ঞানম্ (বুদ্ধিরূপ আত্মা); যজ্ঞম্ (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান); তনুতে (সম্পাদন করে); কর্মাণি (দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ম); অপি চ তনুতে (সম্পাদনও করে); সর্বে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সকল [অথবা তাদের অধিপতি দেবতা]); জ্যেষ্ঠম্ (প্রথমজাত); বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বুদ্ধিরূপে ব্রহ্ম); উপাসতে (ধ্যান করেন); চেৎ (যদি); বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (কোন ব্যক্তি বুদ্ধিকে ব্রহ্মরূপে জানেন); চেৎ ([এবং] যদি); তস্মাৎ (তার [অর্থাৎ বুদ্ধিরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করা] থেকে); ন প্রমাদ্যতি (তিনি কখনও বিচ্যুত না হন); শরীরে পাপ্মনঃ হিত্বা (দেহ ও দেহাভিমানজনিত পাপ ত্যাগ করে); সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ইতি (সকল কাম্য বস্তু লাভ করেন)।

তস্য পূর্বস্য যঃ এষঃ এব শারীরঃ আত্মা (এই [বিজ্ঞানময়] কোষ পূর্বোক্ত [মনোময়] কোষের অন্তরস্থিত আত্মা); তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা (এই বিজ্ঞানময় কোষের গভীরে এবং এর থেকে পৃথক এক আত্মা আছেন); আনন্দময়ঃ (আনন্দময় কোষ [হিসাবে পরিচিত]): তেন এষঃ পূর্ণঃ (ঐ [আনন্দময়] কোষ দ্বারা এই [বিজ্ঞানময়] কোষ পূর্ণ); সঃ বৈ এষঃ (ঐ [আনন্দময়] কোষ); পুরুষবিধঃ এব (মনুষ্য আকৃতিসম্পন্ন); তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু অয়ং পুরুষবিধঃ (যেভাবে ঐ [বিজ্ঞান] কোষ মনুষ্য আকৃতিসম্পন্ন, ঠিক সেইভাবে এই [আনন্দময়] কোষও মনুষ্য আকারসম্পন্ন); তস্য (তার [আনন্দময় কোষের]); প্রিয়ম্ (আনন্দ [যেমন প্রিয়বস্তু দর্শন জাত]); এব শিরঃ (মস্তক); মোদঃ (সুখ [প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিজাত]); দক্ষিণঃ পক্ষঃ (দক্ষিণ পক্ষ); প্রমোদঃ (কাম্য বস্তুর ভোগসুখ [যেমন ভাল খাবার খেয়ে হয়]); উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পক্ষ); আনন্দঃ আত্মা (আত্মাই আনন্দ [দেহের মধ্যবর্তী অংশ]); ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (ব্রহ্ম [যিনি দ্বিতীয় রহিত] আশ্রয়রূপী পুচ্ছ); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এ সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে); ইতি পঞ্চমঃ অনুবাকঃ (এখানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: বুদ্ধিমান ব্যক্তি গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যজ্ঞকর্ম করেন এবং নতুন নতুন কর্মের প্রবর্তনও করেন (তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝতে পারেন কোন্ কাজ ভাল আর কোন্ কাজ মন্দ)। বুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবদেবীগণ ব্রহ্মকে বুদ্ধিরূপে উপাসনা করেন। ব্রহ্মই সব চেয়ে বুদ্ধিমান। দেহ থাকলে মানুষের অনেক

মলিনতা থাকতে পারে। কিন্তু তিনি যদি ব্রহ্মকে জানেন এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন তবে তাঁর সব মলিনতা ধুয়ে-মুছে যাবে। আবার তিনি তাঁর যা-যা কাম্য, তাও পেয়ে যাবেন। বুদ্ধিরূপে ব্রহ্মই বিজ্ঞানময় আত্মা। এই কোষ পূর্বোক্ত মনোময় কোষের আত্মা।

বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে বুদ্ধিরূপ আত্মা আছেন। এই কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ এবং তার মধ্যে আনন্দরূপ আত্মা আছেন। বিজ্ঞানময় কোষ এই আনন্দময় কোষ দ্বারা পূর্ণ। আনন্দময় কোষের আকৃতিও মনুষ্যদেহের অনুরূপ। বিজ্ঞানময় কোষের আকৃতি যেরকম মানুষের মতো অনুরূপভাবে আনন্দময় কোষও মানুষের মতো। প্রিয় জিনিস দেখার যে আনন্দ তা যেন (পাখীর) মাথা, প্রিয়বস্তু লাভ করার আনন্দ এর ডান দিকের ডানা (দক্ষিণ পক্ষ), প্রিয়বস্তু ভোগ করার আনন্দ এর বাঁ দিকের ডানা (বাম পক্ষ), আর বিশুদ্ধ আনন্দ যেন আত্মা (দেহের মধ্যভাগ)। অদ্বয় ব্রহ্ম হলেন এর পুচ্ছ—যা এই দেহকে ধারণ করে রাখে। এই সম্পর্কে (ব্রাহ্মণে) একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে'—'বিজ্ঞান' কথাটির অর্থ বুদ্ধি, মেধা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। 'তনুতে' অর্থ ইনি সম্পাদন করেন'। বুদ্ধির সাহায্যে আমরা বহু যজ্ঞকর্ম এবং অন্যান্য কর্তব্যকর্ম স্থির করি। বুদ্ধির দ্বারাই আমরা সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পশুরা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করে। ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার তারা করতে পারে না। কিন্তু মানুষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে, কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত বুঝতে পারে।

তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রায় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। উপনিষদ বলছেন, এমনকি দেবতারাও বুদ্ধির উপাসনা করেন। কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা সবসময় আবেগ ও প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করেন। তাঁরা কি করছেন একবার ভেবেও দেখেন না। কিন্তু যিনি বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করেন তিনি কদাচিৎ ভুল করেন। বুদ্ধি আমাদের পথপ্রদর্শক, অতএব বরেণ্য। একে প্রথম জাত বা জ্যেষ্ঠম্‌ বলা হয়ে থাকে। আমরা যেমন বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দিই তেমনি বুদ্ধিকেও শ্রদ্ধা করি। এখানে বুদ্ধির মহিমা কীর্তন করা হচ্ছে। লক্ষণীয় এই যে, উপনিষদ বুদ্ধির উপরই সব থেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ব্রহ্মকে কেন আমরা বুদ্ধিরূপে উপাসনা করব? কারণ এর দ্বারা বুদ্ধি আমাদের যে পথে চালিত করে তাতে অবিচল থাকতে পারব। উপনিষদ বলেন, বুদ্ধিকে অনুসরণ করলে সব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা যায়। তখন আর শরীরের দাসত্ব করতে হয় না। সেন্ট ফ্রান্সিস নিজের দেহটাকে দেখিয়ে বলতেন, 'আমার প্রিয় গাধা ভাই' (Brother Ass)। গাধার বুদ্ধি নেই। সে নিজেকে চালাতে জানে না। অন্যে যেমন চালায়, সে তেমনি চলে।

বুদ্ধির দ্বারা এই শরীরকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে আমরা কোন ভুল না করি। স্থূলদেহের স্তরগুলিকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে যেতে উপনিষদ আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। শরীর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। সাধারণত শরীরকে অতি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে আমরা নির্বোধের মতো আচরণ করে থাকি।

তাহলে উপনিষদ কেন বলছেন, বুদ্ধির উপাসনা করলে সব কাম্যবস্তু ভোগ করা যায়? উপনিষদের বক্তব্য হল, আমরা যখন বুদ্ধি দিয়ে কিছু বোঝবার চেষ্টা করি তখন খুব আনন্দ পাই, অবশ্য বিষয়বস্তু যদি ভাল হয়। কিন্তু বাসনা ও আবেগ তাড়িত হয়ে কাজ করলে স্বভাবতই আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ঘটবে। তখন আনন্দ পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেহসুখের বাসনা ও আবেগে বিভ্রান্ত না হয়ে যাঁরা লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে যেতে পারেন তাঁদের কাছে এ জীবন অনেক বেশী উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

এরপর উপনিষদ আনন্দময় কোষ (আনন্দের স্তর) নিয়ে আলোচনা করছেন। পূর্ববর্তী শ্লোকের মতো এখানেও একই তত্ত্ব বলা হয়েছে—এই কোষ বিজ্ঞানময় কোষ থেকে স্বতন্ত্র এবং মনুষ্যদেহের আকৃতি-সম্পন্ন।

এখন আনন্দময় কোষকে যদি পাখী রূপে কল্পনা করা যায় তবে সেই পাখীর মাথা কি হবে? 'প্রিয়' অর্থাৎ আনন্দ। আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্যাখ্যায় বলছেন, প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হলে যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই এই পাখীর মাথা। সন্তানের মুখদর্শনে পিতামাতা যে আনন্দ লাভ করেন, এ আনন্দ ঠিক সেইরকম। ধরা যাক, কারোর পুত্র দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে এখন দেশে ফিরে আসছে। পিতা অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। অবশেষে পিতা-পুত্রের মিলন হল। এই মিলনের আনন্দই 'প্রিয়'।

'মোদ' হল পাখীর দক্ষিণ পক্ষ। শঙ্করাচার্য বলছেন: যা আমরা সবসময় পেতে চাইছি তা পেলে যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই 'মোদ'। বহুদিন যাবৎ, হয়তো আমার একটা গাড়ি কেনার ইচ্ছে। টাকা জমাচ্ছি। অপেক্ষা করছি কতদিনে প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় হবে। অবশেষে একদিন গাড়িটি কেন সম্ভব হল। তখন যে ধরনের আনন্দ হয় তা-ই 'মোদ'। পাখীর বাম পক্ষ হল 'প্রমোদ'। আচার্য শঙ্কর এই জাতীয় আনন্দের কোন দৃষ্টান্ত দেননি। তিনি বলেছেন 'প্রমোদ' অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট হর্ষ', অপার আনন্দ।

এই আনন্দময় কোষ কিন্তু প্রকৃত আত্মা নয়। এই স্তরে আমরা আত্মার খুব কাছাকাছি থাকি, কিন্তু তখনও দুয়ের মাঝে বাধা রয়েছে। হিমালয়ের দিকে যত এগোন যায় ততই শীত শীত করে, তেমনি আত্মার যত কাছাকাছি যাওয়া যায় ততই আনন্দ বোধ হয়। আনন্দকেই বলা হয় আত্মা তথা পাখীর মধ্যভাগ। আত্মা আছেন বলেই জীবাত্মা ও তাঁর

সঙ্গে যুক্ত সব বস্তু আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। এই আত্মাকে জানার আনন্দ নিত্য এবং শাশ্বত। কেবলমাত্র বাসনামুক্ত শুদ্ধ মনের দ্বারাই এই আত্মাকে জানা যায়।

আচার্য শঙ্করের মতে, স্থূল জাগতিক বস্তু ভোগ করার যে আনন্দ তা ক্ষণস্থায়ী। তিনি বলছেন: যখন এই আনন্দের কারণটিই অনুপস্থিত থাকে, তখন কি হয়? যে পুত্রের জন্য পিতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সে হয়তো এল না; তখন পিতার আনন্দ থাকে কোথায়? অথবা বহু কষ্টে কেনা সেই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। তখন শুধুই নিরানন্দ।

কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দ কোন বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। বাইরের বস্তু থাক বা না থাক, আধ্যাত্মিক আনন্দ যিনি লাভ করেছেন তিনি সবসময় সুখী। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অপরিসীম রোগযন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তখনও তাঁর মুখমণ্ডল ছিল দিব্য আনন্দে পূর্ণ। তাঁর সেই আনন্দ সকলকে স্পর্শ করত।

কিন্তু কোথা থেকে এত আনন্দ আসে? ব্রহ্ম থেকে। অতএব এই ব্রহ্ম তথা আত্মাকে 'পুচ্ছ', লেজ বা প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে। এই আত্মাই সকল আনন্দের উৎস। অতএব আত্মা থেকে যে আনন্দ আসে তা নিত্য। এই আত্মার নিত্য উপস্থিতিতে অন্যান্য বস্তুও আমাদের আনন্দ দান করে। গাড়ি, খাদ্য, সন্তান এরা কেন আমাদের আনন্দ দেয়? কারণ তারা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ। জগতে সকল বস্তু আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত। নিজ সন্তানকেও ব্রহ্মরূপে দেখলে আর এক রকমের আনন্দ হয়। সে আনন্দ গভীরতর।

কিন্তু মানুষ যখন ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করেন তখন তিনি পরমানন্দ লাভ করেন। আচার্য শঙ্কর বলেন, এই ব্রহ্ম 'অভ্যন্তরম্', অন্তর্নিহিত আত্মা। তিনি আছেন বলেই আমরা আছি। আমাদের সকল দুঃখ-দুর্দশার মূলে রয়েছে দুই বোধ। ব্রহ্মে এই দুই বোধের অবসান হয়। তখন আমরা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন গচ্ছতী ৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ।

সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিংচ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিংচ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: চেৎ (যদি); ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ ([কোন ব্যক্তি] জানেন যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই); সঃ অসন্ এব ভবতি (তিনি নিজেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েন); ব্রহ্ম অস্তি (ব্রহ্ম আছেন); ইতি চেৎ বেদ (যদি কেউ জানেন); ততঃ (সে ক্ষেত্রে); [ব্রহ্মবিদঃ—যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন]; এনং সন্তং বিদুঃ ইতি (তাঁকে সত্য বলে জানেন)।

যঃ (ওই [আনন্দময় কোষ); এষঃ এব তস্য পূর্বস্য শারীরঃ আত্মা (পূর্বোক্ত [বিজ্ঞানময়] আত্মার অন্তরস্থ আত্মা); অতঃ (সুতরাং); অথ (এরপর [অর্থাৎ শিষ্যের বিদ্যা লাভ সম্পূর্ণ হবার পর]); অনু ([আচার্য যা বলেছেন] তার আলোকে); প্রশ্নাঃ ([এইসব] প্রশ্ন উঠতে পারে]); কশ্চন অবিদ্বান্ (কোন অজ্ঞান ব্যক্তি [অর্থাৎ আত্মা সম্পর্কে অজ্ঞান]); প্রেত্য (মৃত্যুর পর); অমুং লোকম্ (সেই লোক [অর্থাৎ পরমাত্মাকে]); গচ্ছতি (লাভ করেন); 'উ' (অথবা করেন না); উত আহো কশ্চিৎ বিদ্বান্ (অথবা যিনি আত্মাকে জানেন তিনি কি); প্রেত্য (মৃত্যুর পর); অমুং লোকম্ (সেই পরমাত্মাকে); সমশ্নুতা (লাভ করেন); 'উ' (অথবা করেন না?)।

সঃ (তিনি [পরমাত্মা]); অকাময়ত (ইচ্ছা করলেন [চিন্তা করলেন]); বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি (আমি বহুরূপে জাত হব); [এরপর] সঃ (তিনি [পরমাত্মা]); তপঃ অতপ্যত (ধ্যান করে সিদ্ধান্তে এলেন); সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে); ইদং সবর্ম্ অসৃজত (এই সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন); ইদং (এই [জীব এবং জড় জগৎ]); যৎ কিংচ (যা কিছু আছে); তৎ (এই জগৎ [জীব ও জড়বস্তুসহ]); সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করার পর); তৎ এব অনুপ্রবিশৎ (তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করলেন); তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ অভবৎ (প্রবেশ করে তিনি রূপ পরিগ্রহ করলেন); ত্যৎ চ (এবং একযোগে নিরাকার হয়ে গেলেন); নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ ([দেশ ও কালের দ্বারা] বিশেষিত এবং [দেশকালের] ঊর্ধ্বে); নিলয়নং চ অনিলয়নং চ (যার আশ্রয় আছে অথবা নিরাশ্রয়); বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ (চেতন বা অচেতন); সত্যং চ অনৃতং চ (ব্যবহারিকভাবে সত্য ও তার বিপরীত); সত্যম্ অভবৎ ([কারণ] সেই সত্য [অর্থাৎ ব্রহ্ম] আপনাকে প্রকাশ করলেন); যৎ ইদং কিংচ (যা কিছু [আমাদের চারপাশে] আছে); তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে ([ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি] একে [অর্থাৎ ব্রহ্মকে] সত্য বলে উল্লেখ

করেন); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে); ইতি ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ (এখানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: যদি কেউ মনে করেন ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই তাহলে তাঁর নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। (আবার) কেউ যদি জানেন ব্রহ্ম আছেন তাহলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা তাঁকে ব্রহ্ম বলেই মনে করেন।

এই কোষ (আনন্দময় কোষ, আনন্দস্বরূপ আত্মা) পূর্বোক্ত কোষের (বিজ্ঞানময় কোষ, বুদ্ধির স্তর) অন্তরস্থ আত্মা। আচার্য এতক্ষণ যা শিক্ষা দিলেন, তার আলোকে শিষ্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন: 'যিনি আত্মাকে জানেন না, তিনি কি মৃত্যুর পর আত্মজ্ঞান লাভ করেন, না করেন না? আবার যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি মৃত্যুর পর আত্মজ্ঞান লাভ করেন, না করেন না?'

পরমাত্মা চিন্তা করলেন, 'আমি এক, বহু হতে চাই।' তারপর তিনি তপস্যা করলেন। অর্থাৎ তিনি শুধু চিন্তা করলেন। তাঁর চিন্তামাত্রই চেতন-অচেতন বস্তু সহ সমগ্র জগতের সৃষ্টি হল। জগৎ সৃষ্টি করার পর তার মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে কোথাও রূপ ধারণ করলেন, কোথাও নিরাকার হয়ে রইলেন। কোথাও দেশ-কালের দ্বারা বিশেষিত হলেন, কোথাও তার ঊর্ধ্বে রইলেন। কখনও কিছুকে আশ্রয় করে থাকলেন (অর্থাৎ আশ্রয়ের প্রয়োজন হলে) আবার কখনও বা তিনি নিরাশ্রয় (নিরাকার, তাই আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই)। কখনও তিনি চেতন, আবার কখনও বা অচেতন। ব্রহ্ম, যিনি নিত্য সত্য, তিনি কোথাও আপেক্ষিক সত্যরূপে, কোথাও বা অসত্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। যেহেতু ব্রহ্ম সকল বস্তুতে নিজেকে প্রকাশ করেন সেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁকে 'সত্য' বলে বর্ণনা করে থাকেন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: 'চেৎ' কথাটির অর্থ 'যদি'। উপনিষদ বলেন যদি কেউ ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন তিনি বস্তুত নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন। তাঁর নিজের অস্তিত্বই যেন হারিয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, 'ব্রহ্ম বলে কিছু নেই। এসব অর্থহীন কথা। ব্রহ্মকে তো দেখতে পাই না। কি করে বুঝব তিনি আছেন?' তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু উপনিষদ এইসব মানুষদের অস্তিত্বহীন বলছেন কেন? কারণ ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত সত্তা। নিজের সত্তাকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? এ যেন বলা হচ্ছে, 'আমার অস্তিত্ব নেই।' আমরা প্রতিবাদ করে বলতে পারি, 'আমি তো বলিনি আমার অস্তিত্ব নেই। আমি বলছি ব্রহ্ম বলে কিছু নেই। আমি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা।' কিন্তু উপনিষদ বলছেন, 'তুমিই ব্রহ্ম।' অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন—এ কথাই উপনিষদ বোঝাতে চাইছেন।

ধরা যাক, কেউ দৃঢ়তার সাথে বলছেন, ব্রহ্ম আছেন। এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তখন সবাই বুঝতে পারে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। এখানে 'ততঃ' শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ 'তার থেকে' অর্থাৎ 'ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি থেকে' বা 'সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা'। 'ব্রহ্ম আছেন' বা 'ঈশ্বর আছেন' একথা অনেকেই বলে থাকেন। বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের এই ধারণা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মকে আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হবে। সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' এ প্রশ্ন তিনি আগেও অনেককে করেছেন। সবাই এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ দেখেছি বৈকি। তোমাকে যেভাবে দেখছি তার চেয়েও স্পষ্টভাবে দেখেছি। আর তুমি চাইলে তোমাকেও দেখাতে পারি।' শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মানুষ যখন একথা বলেন তখন তা না মেনে কি উপায় আছে? তাঁর কথাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ।

এরপর কতগুলি প্রশ্ন (অনুপ্রশ্নাঃ) উঠেছে। 'প্রশ্ন' কথাটির অর্থ 'জিজ্ঞাসা' এবং 'অনু'র অর্থ হল 'অনুসরণ করে' অথবা 'এর পরবর্তী'। এতক্ষণ আচার্য ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এখন ছাত্ররা বিস্তারিতভাবে বুঝতে চাইছেন। প্রথম প্রশ্ন অজ্ঞান ব্যক্তি প্রসঙ্গে। 'অবিদ্বান্' বলতে এখানে 'যাঁর আত্মজ্ঞান হয়নি' তাঁকে বোঝানো হয়েছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আছে যখন মাষ্টারমশাই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন তখন তিনি নিজের স্ত্রীকে অজ্ঞান বলে উল্লেখ করেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তীব্র ভৎর্সনার সুরে বলে ওঠেন, 'আর তুমি বুঝি খুব জ্ঞানী?' মাষ্টারমশাই ভেবেছিলেন, তাঁর কলেজের ডিগ্রী আছে, তাই তিনি বিদ্বান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে প্রথম জানতে পারলেন, ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান, যার না জানাই অজ্ঞান। অন্যান্য আর যা কিছু জ্ঞান তা অজ্ঞানতারই নামান্তর মাত্র।

এখানে ছাত্ররা জানতে চাইছে, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি মৃত্যুর পর তাঁর কি অবস্থা হয়? তিনি কি ব্রহ্মে অর্থাৎ আনন্দলোকে প্রবেশ করেন? অনেকে মনে করেন: জ্ঞানলাভের পথে দেহ একটা বড় বাধা; দেহই সব বন্ধনের কারণ, আর দেহের বিনাশ হলেই মুক্তিলাভ হবে। এরূপ মনে করে অনেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় আত্মহত্যা করেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন: শুধু দেহের নাশ হলেই মোক্ষলাভ হতে পারে না। দেহত্যাগের পরও বন্ধন থাকে। এর কারণ হল অবিদ্যা; নিজের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার জন্যে মানুষ বারবার জন্মায়, বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়। কেবল মাত্র আত্মজ্ঞান হলেই মানুষ মুক্তিলাভ করে।

মূল শ্লোকে আমরা '৩' (3) সংখ্যাটি লক্ষ্য করেছি। এই চিহ্নকে বলে 'প্লুতি' যার অর্থ বিপরীত। মূল প্রশ্নটি ছিল, তাঁর কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়? এবং '৩'-এর অর্থ হল 'না কি হয় না'?

আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি হল, 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য কি আত্মজ্ঞান প্রয়োজন?' প্রশ্নটির তাৎপর্য হল : সূর্য কিংবা আকাশের মতো ব্রহ্ম যদি নিরপেক্ষ হন, তাহলে একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় বলা হচ্ছে কেন? আমরা জ্ঞানী না অজ্ঞান তাতে কি আসে যায়? মৃত্যুর পর তো আমরা সবাই সমান। একটি ইংরাজী কবিতা আছে যেখানে মৃত্যুকে 'সাম্যবাদী' (Leveller) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা-উজির, শাসক-শাসিত মৃত্যুর পরে সব একাকার হয়ে যায়। সকলে এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে, জ্ঞানী অথবা অজ্ঞান, ব্রহ্মের দৃষ্টিতে সব সমান। তাহলে আমরা সবাই কেন ব্রহ্মপদ লাভ করব না? তাৎপর্য হল, হয় ব্রহ্ম পক্ষপাতিত্ব করেন, না হয় ব্রহ্ম বলে কিছু নেই, সুতরাং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু বেদান্তের মূল কথা হল, আমরা জানি বা না জানি, আমরা সবসময়ই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিতেন, 'একটা পুকুরের মাঝ বরাবর একটা লাঠি ফেলে দাও। মনে হবে জলটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু একই জল। অনুরূপভাবে, নামরূপের জন্য আমরা নিজেদের পরস্পর পৃথক এবং ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করি। কিন্তু যখন স্বরূপজ্ঞান হয়, দেহমনের থেকে নিজেকে ভিন্ন বলে বোধ হয়, তখন বুঝতে পারি কোনদিনই আমরা ব্রহ্ম থেকে পৃথক ছিলাম না।

আচার্য শঙ্কর এখানে ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রশ্নটি তুলেছেন। কেউ বিতর্ক তুলতে পারেন: যার অস্তিত্ব আছে, যেমন একটি পাত্র, তাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায় অর্থাৎ বস্তুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আবার যার অস্তিত্ব নেই, যেমন খরগোশের শিং তাকে দেখাও যায় না, অনুভবও করা যায় না। একইভাবে ব্রহ্মকেও দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না। তাহলে কেমন করে বুঝব ব্রহ্ম আছেন?

শঙ্করাচার্য উত্তর দিচ্ছেন, আকাশের মতো সূক্ষ্ম উপাদান থেকে শুরু করে এই বিশ্বে যা কিছু দেখা যায়, সব কিছুর পেছনেই একটা কারণ আছে। সব বস্তুকে কার্য-কারণ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একই বস্তু কখনও কারণ, কখনও কার্য। যেমন মাটি দিয়ে ঘট তৈরী হয়, আবার মাটির উৎপত্তি হয় অন্য কোন কারণ থেকে। অন্যান্য উপাদান থেকে যখন মাটি তৈরী হচ্ছে, তখন মাটি হল কার্য। অথচ এই মাটিই আবার ঘটের কারণ।

এইভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় কার্য-কারণ একটি শৃঙ্খল। কারণ-কার্য-কারণ, একটির পর আর একটি আসে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই শৃঙ্খল সূক্ষ্মতম উপাদান আকাশে এসে মিলিত হয়। অবশ্য উপাদান হিসেবে আকাশও কোন কিছু থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই সকল বস্তু কি কোন অ-বস্তু থেকে আসতে পারে? 'শূন্য' থেকে কি কিছুর উৎপত্তি সম্ভব? অতএব, একটি আদি কারণ আছে মেনে নিতেই হয়। এই আদি কারণই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সকল বস্তুর উৎস। ব্রহ্মই পরম সত্য যার থেকে আর সব কিছু এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ '১' সংখ্যাটির দৃষ্টান্ত দিতেন। একের পিঠে একটি শূন্য বসালে হয় দশ, আরেকটি দিলে একশ, এইভাবে বাড়তে থাকে। কিন্তু '১' সরিয়ে নিলে থাকে শুধুই শূন্য। ব্রহ্ম এই '১' সংখ্যাটির মতো। ব্রহ্ম আছেন বলেই সব কিছু আছে। ব্রহ্ম থেকেই সব কিছু আসে।

এবার উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মের ইচ্ছে হল (সঃ অকাময়ত) : 'বহু স্যাম্'—'আমি বহু হব।' এর অর্থ কি এই যে, ব্রহ্ম আমাদের মতোই মরণশীল জীব? জীবের বাসনা থাকে। আমরা বিত্ত, ক্ষমতা, সুস্বাস্থ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কত কি কামনা করি। সেই বাসনা কখনও ভাল হতে পারে, কখনও মন্দ। কিন্তু আমাদের মধ্যে সবসময় একটা অভাব বা অতৃপ্তির বোধ রয়েছে। ব্রহ্ম যদি আমাদের মতোই হন তবে আমরা কেন ব্রহ্ম হতে চাইব?

শঙ্করাচার্য বলেন: না, ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। তিনি নিজেই নিজের প্রভু। আমাদের বাসনা আছে বলেই আমরা স্বাধীন নই; বহু কিছুর উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। আমরা নিজেদের বাসনার দাস, আবার অন্য মানুষেরও দাস। সুতরাং আমরা যা কিছু করি বাধ্য হয়ে করি। কিন্তু ব্রহ্ম কোন কিছু করতে বাধ্য নন; তিনি নিজেই নিজের কর্তা।

পরবর্তী প্রশ্ন হল: এক ব্রহ্ম কিভাবে বহু হলেন? শঙ্কর বলছেন: ব্রহ্ম বাইরে কিছু সৃষ্টি করেননি। নিজের মধ্যে যা আছে তা-ই তিনি প্রকাশ করেছেন। নামরূপ তাঁর ভেতরেই রয়েছে। সেগুলির প্রকাশ হয় মাত্র। আর সেইজন্য আমরা মনে করি আমরা পরস্পর পৃথক এবং ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র সত্তা। বস্তুত একই সত্তা নাম-রূপের কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়। নর, নারী, পশু, উদ্ভিদ—সবই সেই এক ব্রহ্ম। কিন্তু আমরা শুধু নামরূপই দেখি, ব্রহ্মকে দেখতে পাই না।

তাই উপনিষদ বলছেন: ব্রহ্ম শুধুমাত্র চিন্তা করলেন। এখানে 'তপঃ' কথাটির অর্থ 'জ্ঞান'। এই জগৎ তাঁর চিন্তা বা ইচ্ছা মাত্র। সাধারণভাবে 'তপঃ' কথাটির অর্থ তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন। আমরা যখন কিছু তৈরী করতে চাই, আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্রহ্ম শুধু চিন্তা করেন। সেই চিন্তামাত্রই জগৎ সৃষ্টি হয়। ব্রহ্ম যেন বীজ। বীজ থেকে গাছ হয়। গাছ তৈরী করতে বীজকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়? না, বীজ থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই গাছ বেরিয়ে আসে। একইভাবে এই সমগ্র জগৎ আর জগতের সকল বস্তু ব্রহ্ম থেকে নির্গত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশমাত্র

আমাদের দৃষ্টির গোচর। অধিকাংশই আমাদের দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু দৃশ্য-অদৃশ্য, সাকার-নিরাকার সব কিছু এক ব্রহ্ম থেকেই আসে।

এরপর উপনিষদ বলছেন, এই জগৎ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম তার মধ্যে প্রবেশ করেন। 'অনুপ্রাবিশৎ' কথাটির অর্থ 'প্রবেশ করলেন'। মূল শ্লোকের এই অংশটি খুবই বিতর্কিত অংশ। শঙ্করাচার্য বিভিন্নভাবে এই শব্দটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ব্রহ্ম কেমন করে প্রবেশ করলেন? একটি আপত্তি হল: ধরা যাক একজন কুম্ভকার একটি মাটির ঘট তৈরী করেছেন। ঘটটি তৈরী করার পর তিনি কি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন?

দ্বিতীয় যুক্তি হল: 'ব্রহ্ম প্রবেশ করেছেন' বললে তাঁর একটা রূপ ধারণা করা হয়। কে প্রবেশ করেন? যাঁর আকার আছে তিনিই প্রবেশ করতে সক্ষম। একটি বাড়ীতে একজন প্রবেশ করছেন। বাড়ীটি একটি বস্তু আবার যিনি প্রবেশ করছেন তিনিও আর একটি বস্তু। অথবা আমার এই হাত আমার মুখে প্রবেশ করছে। আমার একটি দেহ আছে। তার একটি অংশ হাত আর একটি অংশে অর্থাৎ মুখে প্রবেশ করছে।

শঙ্করাচার্য বলছেন: না, ব্যাপারটা এই রকম। ধরা যাক, অন্ধকার ঘরে একটি ঘট রয়েছে। ঘর অন্ধকার হওয়াতে ঘটটি দেখা যাচ্ছে না। আলো আনলে ঘটটি দেখা যাবে। ঘটটি সব সময় সেখানে ছিল। কিন্তু অন্ধকার তাকে আড়াল করে রেখেছিল। সেইরকম ব্রহ্ম সর্বত্র রয়েছেন। তোমার, আমার সবার মধ্যে রয়েছেন। অজ্ঞানতার কারণে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। জ্ঞান হলে মনে হয় যেন ব্রহ্ম আমাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, যদিও তিনি প্রথম থেকেই সেখানে ছিলেন। জ্ঞানই সেই দীপের আলো, আর আমাদের অজ্ঞানতাই হল অন্ধকার।

সপ্তম অধ্যায়

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎসুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽঽনন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ। এষ হ্যেবাঽঽনন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: ইদম্ (এই [আপেক্ষিক জগৎ]); অগ্রে (আদিতে); অসৎ বৈ আসীৎ (অস্তিত্ব ছিল না [অর্থাৎ বস্তুত তা ছিল অব্যক্ত ব্রহ্ম]); ততঃ বৈ (তার [অব্যক্ত অবস্থার] থেকে); সৎ (বিচিত্র নামরূপসহ এই জগৎ); অজায়ত (নির্গত হয়েছে); তৎ (ওই [ব্রহ্ম]); স্বয়ম্ আত্মানম্ অকুরুত (আপনাকে প্রকাশ করলেন); তস্মাৎ (সেইজন্য); তৎ (ওই [ব্রহ্ম]); সুকৃতম্ (সুন্দর স্রষ্টা অথবা স্বয়ং স্রষ্টা); উচ্যতে ইতি ([ঋষিদের দ্বারা] অভিহিত হন)।

যৎ তৎ বৈ সুকৃতম্ (সেই যা সুকৃত); সঃ (তা-ই); রসঃ বৈ (সর্ব বস্তুতে রস তথা মাধুর্য রূপে); অয়ং হি রসম্ এব লব্ধ্বা (যে ব্যক্তির মধ্যে এই রস আছে [রসের উৎসরূপে আত্মাকে তিনি জানেন]); আনন্দী ভবতি (সুখী হন); আকাশে (হৃদয়াকাশে); এষঃ (এই [আত্মা]; যৎ আনন্দঃ ন স্যাৎ (যদি ইনি আনন্দের উৎস না হতেন); কঃ হি এব অন্যাৎ (শ্বাসগ্রহণের কষ্টটুকুই বা কে স্বীকার করত); কঃ প্রাণ্যাৎ (জীবনধারণ করবার ক্লেশটুকুই বা কে স্বীকার করত); হি (অতএব); এষঃ (এই [হৃদয় মধ্যস্থ আত্মা]); এব আনন্দয়াতি (আনন্দ দান করেন [সকলকে]); এষঃ (এই আত্মা); এব হি যদা (যখন); অদৃশ্যে (অদৃশ্য হন); অনাত্ম্যে (দেহত্যাগ করেন [এবং সেই কারণে]); অনিরুক্তে (একে বর্ণনা করা যায় না); অনিলয়নে (কোন আশ্রয় নেই [অর্থাৎ সকল বিকার মুক্ত]); এতস্মিন্ (এতে [এই আত্মায়]); অভয়ম্ (ভয়হীন [যেমন পুনর্জন্মের ভয়মুক্ত]); প্রতিষ্ঠাম্ (নিজ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত); বিন্দতে (প্রাপ্ত হন); অথ (এরপর); সঃ (সেই ব্যক্তি [যিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন]); অভয়ং গতঃ ভবতি ([পুনর্জন্মের] ভয় থাকে না); [অন্যদিকে] এষঃ (এই [ব্যক্তি]); এব যদা (যদি [সেই একই ব্যক্তি]); এতস্মিন্ (আত্মায়) উৎ অরম্ (একটুও); অন্তরম্ (পার্থক্য); কুরুতে (করে [অর্থাৎ পার্থক্য চিহ্নিত করে]); অথ (এর কারণে [পার্থক্যের কারণে]); তস্য (ব্যক্তিটির [যিনি পৃথক করেন]); ভয়ং ভবতি (তিনি ভীত হয়ে পড়েন); তু (কিন্তু); অমন্বানস্য (সেই নির্বোধ ব্যক্তিটির); বিদুষঃ (যে ব্যক্তি নিজেকে আত্মার থেকে পৃথক মনে করেন); তৎ এব (সেই [ব্রহ্ম] আবার); ভয়ম্ (ভয় [অর্থাৎ, ভয়ের কারণ]); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে); ইতি সপ্তমঃ অনুবাকঃ (এখানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: আদিতে জগৎ বলে কিছু ছিল না। কেবল ব্রহ্ম ছিলেন। এই জগৎ তখন অব্যক্ত ব্রহ্মরূপে ছিল। তারপর নামরূপের এই দৃশ্যমান জগৎ আত্মপ্রকাশ করল। ব্রহ্ম যেন নিজেই নিজেকে এভাবে সৃষ্টি করলেন। তাই তিনি 'সুকৃত' (অর্থাৎ 'সুন্দর সৃষ্টি' বা 'স্বয়ংকর্তা') বলে খ্যাত।

'সুকৃত' রূপে তিনিই আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপকে যিনি লাভ করেন তিনি সুখী। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরস্থ আত্মাই সকল আনন্দের উৎস। এই আনন্দ না থাকলে কেউ

কি বাঁচতে চাইত? একটা নিঃশ্বাসও কি কেউ গ্রহণ করত? আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তিনি স্বাধীন, ত্রিগুণাতীত। যে ব্যক্তি নির্ভয়ে এই আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি আর কোন কিছুকে ভয় করেন না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সামান্যতম পার্থক্যও অনুভব করেন ততক্ষণ তনি ভয়মুক্ত নন। একজন ব্যক্তি পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি ব্রহ্ম থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করেন তাহলে স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁর ভীতির কারণ হয়ে ওঠেন (যদিও ব্রহ্মজ্ঞান মানুষকে ভয়ের পারে নিয়ে যায়)। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকে 'সৎ' ও 'অসৎ' এই শব্দ দুটি বিশেষ অর্থবহ। আক্ষরিকভাবে 'সৎ' কথাটির অর্থ 'যা আছে'। সেই অর্থে কেবলমাত্র ব্রহ্মই 'সৎ'; কারণ সব অবস্থাতেই ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্ম ছাড়া আর সব কিছুই 'অসৎ' অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বা ক্ষণস্থায়ী। কারণ তারা স্থান-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এখানে কিন্তু সৎ কথাটির অর্থ যা প্রকাশিত বা দৃষ্টিগোচর। অর্থাৎ এর দ্বারা দৃশ্যমান জগৎকে বোঝানো হয়েছে। আর 'অসৎ' কথাটির অর্থ যা অপ্রকাশিত, অদৃশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম যা সব কিছুর আদি কারণ।

ধরা যাক, আমাদের সামনে একটা বিশাল বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছে অগণিত পাতা ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, গাছটি কোথা থেকে এল? বীজ থেকে। গাছটি বীজের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। গাছটি ছিল না—একথা আমরা বলতে পারি না। অনুরূপভাবে, আদিতে এই জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় (অসৎ) ছিল। বীজাকারে ব্রহ্মের মধ্যে ছিল। এখন ব্যক্তরূপ ধারণ করল (সৎ)।

'ইদম্'–এই; 'ততঃ'—তার থেকে। লক্ষণীয় এই যে, উপনিষদ এখানে ব্রহ্ম শব্দটি ব্যবহার করছেন না। বেদান্তে আমরা প্রায়শই 'ইদম্' এবং 'তৎ' এই শব্দ দুটির ব্যবহার দেখতে পাই। 'ইদম্' বলতে দৃশ্যমান জগৎকে বোঝায়—যে জগৎকে আমরা দেখতে পাই। 'ইদম্' অর্থাৎ 'এই' জগৎ সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। কিন্তু 'তৎ' বা 'সেই' বলতে বোঝায় যা আমাদের সামনে নেই, যাকে আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং উপনিষদ বলছেন, 'এই' জগৎ 'সেই' ব্রহ্ম থেকে এসেছে—যে ব্রহ্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর নন।

কিন্তু ব্রহ্ম যদি এই জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে ব্রহ্মকে সৃষ্টি করল কে? উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মের কোন স্রষ্টা নেই। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন (স্বয়ম্ অকুরুত)। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। লক্ষণীয় যে, এখানে কোন দ্বৈত ধারণা নেই। যিনি স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্টি। ব্রহ্মের প্রকাশই তাঁর সৃষ্টি। ব্রহ্ম কি করে তাঁর সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন এই নিয়ে পূর্ববর্তী শ্লোকে যে আপত্তি উঠেছিল এখানে তার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। উপনিষদের মতে,

স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি অভিন্ন। এখানে ‘সুকৃতম্’ কথাটির দুটি অর্থ। ‘সু-কৃতম্’, অর্থাৎ যা উত্তম বা উত্তমরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে; অথবা ‘স্ব-কৃতম্’, স্বয়ং নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

‘রসঃ বৈ সঃ’—ব্রহ্ম রস তথা আনন্দস্বরূপ। তিনিই সকল আনন্দের উৎস। বলতে চাইছেন, এমনকি দৈহিক সুখের কারণও ব্রহ্ম। দেহের সুখ আসে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে। ভাল খাবার খেলে যে আনন্দ হয় তা আসে রসনার মাধ্যমে। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে আনন্দ পেয়ে থাকি। এ জগৎ শুধুই দুঃখময়—উপনিষদ একথা বলেন না। একজন ব্যক্তি কখনও আনন্দ পাননি এ হতে পারে না। প্রত্যেকের আনন্দের ধারণা পৃথক হতে পারে। কেউ ভাল কবিতা পড়ে আনন্দ পান। আবার কেউ বা ভাল খাবার খেয়ে বা ভাল জামাকাপড় পরে আনন্দ পান। কিন্তু আনন্দের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, সব সেই এক ব্রহ্ম থেকেই আসে।

কারোর যদি একটা পোষা কুকুর থাকে তাহলে দেখা যায় প্রভুর সান্নিধ্যে কুকুরটির খুব আনন্দ হয়। আর এই আনন্দ থেকেই প্রমাণিত হয় কুকুরটির ভেতরও ব্রহ্ম আছেন। কুকুরটির আনন্দের উৎসও সেই এক ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, সব আনন্দের উৎস তাঁর নিজের ভেতরে, বাইরে নয়।

আমরা অর্থ উপার্জনের জন্য এত পরিশ্রম করি কেন? কেন আমরা ভাল খাবার, ভাল বই দেখলে ছুটে যাই? কারণ আমরা মনে করি, এগুলি আমাদের আনন্দ দেবে। আমরা সবসময় আনন্দ পেতে চাইছি। তার জন্য আমাদের কত সংগ্রাম! জীবনে কোন আনন্দ না পেলে কার বাঁচার ইচ্ছে থাকত? ধরা যাক, জীবন শুধুই দুঃখময়, সেখানে আনন্দের লেশমাত্রও নেই। সেক্ষেত্রে জীবনধারণ অসম্ভব হত। উপনিষদ বলছেন, তখন আমরা শ্বাস-গ্রহণের কষ্টটুকুও স্বীকার করতাম না। কিন্তু দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক যে আনন্দই হোক না কেন, আমরা সবসময়ই তার কিছু না কিছু পেয়ে থাকি। কারণ আনন্দের উৎস যিনি, সেই ব্রহ্ম আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আমরা কখনও দুঃখ পাব না। দুঃখ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কখনও কখনও আনন্দ এসে আমাদের দুঃখকে ভুলিয়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আনন্দের জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়। কখনও এমনও মনে হয় যে সুখের চেয়ে আমাদের দুঃখের পাল্লাই ভারী। দুঃখের দিনে আমাদের মনে হয়, ‘জীবনে সুখ কাকে বলে জানলাম না। শুধু কষ্টই ভোগ করে গেলাম। আমার এ জীবন অভিশপ্ত।’ আবার যেই আমরা একটু সুখের মুখ দেখি অমনি দুঃখের দিনের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি ভুলে যাই। ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ হন তবে আমাদের এত দুঃখ-বেদনা কোথা

থেকে আসে? আমাদের সব দুঃখের মূলে রয়েছে আমাদের অজ্ঞানতা। ব্রহ্মকে জানলে সব দুঃখের অবসান হয়। তখন থাকে শুধু শুদ্ধ অমল আনন্দ—যা অনন্ত ও অপার।

ব্রহ্মকে এখানে 'অদৃশ্য' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি দৃষ্টিগোচর নন। আবার তিনি 'অনাত্ম্য' অর্থাৎ নিরাকার। এখানে 'আত্ম্য' বলতে অন্তরাত্মাকে বোঝানো হচ্ছে না। এখানে এর অর্থ 'রূপ' বা 'আকার'। ব্রহ্ম নিরাকার, অতএব অদৃশ্য। আবার ব্রহ্ম 'অনিরুক্ত', বাক্যের অতীত। তাঁকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না বা তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। সব জিনিসকে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? আমরা কি আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি? না, আমরা নির্বাক হয়ে থাকি। হৃদয় যখন পরিপূর্ণ, তখন আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। তারপর উপনিষদ বলছেন, 'অনিলয়ম্' অর্থাৎ নিরাশ্রয়। ব্রহ্ম এখানে আছেন বা ওখানে আছেন, এমন কথা বলা যায় না। তিনি সর্বত্র রয়েছেন। তিনিই সকলের আশ্রয়, তাঁর আশ্রয় আবার কে হবে?

ব্রহ্মকে জানলে সাধকের কি অবস্থা হয়? তিনি অভয়পদ লাভ করেন। 'অভয়ম্'—এই অভয় অবস্থাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। আর এই স্বরূপই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই 'প্রতিষ্ঠাম্' অর্থাৎ আশ্রয়, অধিষ্ঠান। ব্রহ্মই আমাদের আত্মা। অতএব আমি কি আমাকে ভয় পেতে পারি?

'প্রতিষ্ঠা' শব্দটির অন্য অর্থও আছে—যথা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। অর্থাৎ পরনির্ভর নয়। আমরা যখন কোন মানুষ বা পরিস্থিতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি, তখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। যেমন, কৃষককে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করতে হয়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, উভয় অবস্থাতেই ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং উদ্বেগ আশঙ্কা সবসময় থেকেই যায়। আমরা এমন একটা অবস্থা লাভ করতে চাই যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রভু, বাইরের অবস্থার দাস নই। তাই আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাই। আমরা যে চাঁদে মহাকাশযান পাঠাই তা এই অনন্তের আহ্বানে। এ যে মানবাত্মার ডাক—যে আত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই আমাদের অন্তরাত্মা।

উপনিষদ বলছেন, সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে সামান্যতম পার্থক্যও বোধ করেন, ততক্ষণ তিনি অজ্ঞান। ততদিন তিনি ভয়মুক্ত নন। তিনি হয়তো বলতে পারেন: 'আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও সফল হইনি। ব্রহ্মের সঙ্গে এখনও এক হয়ে যাইনি বটে, তবে খুব কাছাকাছি রয়েছি।' কিন্তু তাঁর এই উক্তি উদ্ভট। হয় তিনি ব্রহ্ম, না হয় তিনি ব্রহ্ম নন—এ হল আত্মজ্ঞান তথা আত্মপ্রত্যয়ের প্রশ্ন। একবার যদি সাধক জানেন তিনি ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নন, তবে কোন কিছু তাঁকে আর সেই অবস্থা থেকে টলাতে পারে না। তিনি তখন সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত।

শঙ্করাচার্য বলেন, 'বহু' দেখা অজ্ঞানতা এবং এই অজ্ঞানতাই আমাদের সর্বপ্রকার ভয়ের মূল কারণ। দুজন মানুষই হোক বা দুটি পদার্থই হোক, যতক্ষণ এই দুই-বোধ আছে ততক্ষণ সংঘাত বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবেই। আবার পরস্পর ভয়ও থাকবে। কিন্তু যখন সাধক বুঝতে পারেন তিনি এক ও অভিন্ন আত্মা, তখন তিনি আর দ্বিতীয় কোন বস্তু দেখেন না, শোনেন না বা জানেন না। তখন কেবল 'আমি'। যতক্ষণ 'তুমি-আমি' বোধ থাকে ততক্ষণ তুমি আমার থেকে আলাদা এই পৃথক বোধও থাকে। তার অর্থ হল অজ্ঞানতা। কিন্তু যখন বোধ হয় এক আত্মা সর্বত্র বিরাজিত, নানা রূপে, নানা নামে এক 'আমি'ই রয়েছি, তখন আর ভয়ের কোন কারণই থাকে না।

এই অজ্ঞানতাকে আচার্য শঙ্কর ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি হয়তো আকাশে দুটো চাঁদ দেখছেন। কিন্তু বস্তুত আকাশে কি দুটো চাঁদ থাকতে পারে? অবশ্যই না। কেউ দুটো চাঁদ দেখেছেন বলেই তা সত্য হতে পারে না। তেমনি অজ্ঞানতার কারণে মানুষ বহু দেখলেও 'বহু'ই সত্য হয়ে যায় না।

শঙ্করাচার্য বলছেন, এহেন ব্যক্তি আক্ষেপ করেন, 'ঈশ্বরঃ অন্যঃ মত্তঃ অহম্ অন্যঃ সংসারী'—ঈশ্বর আর আমি আলাদা। আমি পার্থিব জীব, পাপী এবং তাঁর থেকে ভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নিজেকে পাপী মনে করাই সবচেয়ে বড় পাপ। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে, আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন। তিনি যদি আমাদের মধ্যে থাকেন তবে তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেন না। তিনি আমাদের ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন। তিনি একযোগে বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত। তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

অষ্টম অধ্যায়

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ। ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। সৈষাঽঽনন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎসাধুযুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ॥১

স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য

চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ॥২

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যাহ্হনন্দঃ॥৩

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যাহ্হনন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥৪

অন্বয়: বাতঃ (বাতাস); ভীষা (ভয় থেকে); অস্মাৎ (এর [অর্থাৎ ব্রহ্ম] থেকে); পবতে (বয়); সূর্যঃ (সূর্য); ভীষা উদেতি ([এর] ভয়ে উদিত হয়); অগ্নিঃ চ (অগ্নিও); ইন্দ্রঃ চ (ইন্দ্রও); মৃত্যুঃ পঞ্চমঃ ([এবং] মৃত্যু যা পঞ্চম স্থানীয়); অস্মাৎ ভীষা (এর ভয়ে); ধাবতি (প্রত্যেকে [নিজ কর্ম সম্পাদন করতে] ধাবমান); সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি (ব্রহ্মানন্দ এমনই [ঠিক যেমন]); যুবা স্যাৎ (একটি যুবক আছে); সাধু যুবা (সৎ যুবক); অধ্যায়কঃ (যিনি শাস্ত্রজ্ঞ); আশিষ্ঠঃ (নেতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব); দ্রঢ়িষ্ঠঃ (সুগঠিত দেহ); বলিষ্ঠঃ (বলশালী); তস্য ইয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ (সমগ্র জগতের সকল সম্পদ যদি তিনি অধিকার করতেন [অর্থাৎ, তিনি যদি সমগ্র জগতের অধীশ্বর হতেন]); সঃ মানুষঃ একঃ আনন্দঃ (সেই আনন্দ [যা মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ আনন্দ] মানব আনন্দের একটি একক); তে যে শতং মানুষাঃ আনন্দাঃ (সেই মানব আনন্দের শতগুণ)।

সঃ (সেই [আনন্দ]); মনুষ্য-গন্ধর্বাণাম্ একঃ আনন্দঃ (মানব গন্ধর্বের [অর্ধ স্বর্গীয় অবস্থায় উন্নীত নরনারী] আনন্দের একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের); তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্ আনন্দাঃ (মানব গন্ধর্বের আনন্দের শতগুণ আনন্দ); সঃ দেব-গন্ধর্বাণাম্ একঃ আনন্দঃ (দেব-গন্ধর্বের [দেবদেবীর আনুকূল্যে যে সব মানুষ অর্ধ স্বর্গীয় অবস্থায় উন্নীত] আনন্দের একটি একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতং দেব-গন্ধর্বাণাম্ আনন্দাঃ (সেই দেব-গন্ধর্বের আনন্দের শতগুণ) সঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানাম্ একঃ আনন্দঃ (নিত্যধামে [চিরলোক যা বর্তমান কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী] বাসকারী পিতৃপুরুষের আনন্দের একটি একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানাম্ আনন্দাঃ (চিরস্বর্গবাসী পিতৃপুরুষের সেই আনন্দের শতগুণ); সঃ

আজানজানাং দেবানাম্ একঃ আনন্দঃ (আজান স্বর্গলোকজাত দেবদেবীগণের আনন্দের একক)।

শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতম্ আজানজানাং দেবানাম্ আনন্দাঃ (স্বর্গলোকজাত দেবদেবীগণের আনন্দের শতগুণ); সঃ কর্মদেবানাং দেবানাম্ একঃ আনন্দাঃ যে কর্মণা দেবান্ অপিযন্তি (কর্মদেব তথা দেবদেবীগণ, যাঁরা বৈদিক কর্মাদি [যথা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রভৃতি] সম্পাদনের মধ্য দিয়ে স্বর্গে পদমর্যাদা প্রাপ্ত); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানাম্ আনন্দাঃ (কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ); সঃ দেবানাম্ একঃ আনন্দঃ (সেই হল দেবগণের [অর্থাৎ যাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন] আনন্দের একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতং দেবানাম্ আনন্দাঃ (দেবগণের সেই আনন্দের শতগুণ অধিক); সঃ ইন্দ্রস্য একঃ আনন্দঃ (দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দের সেই হল একক)।

শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতম্ ইন্দ্রস্য আনন্দাঃ (ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ); সঃ বৃহস্পতেঃ একঃ আনন্দঃ (বৃহস্পতির [দেব পুরোহিত] আনন্দের সেই হল একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতং বৃহস্পতেঃ আনন্দাঃ (বৃহস্পতির আনন্দের শত গুণ অধিক); সঃ প্রজাপতেঃ একঃ আনন্দঃ (সেই হল প্রজাপতির [অর্থাৎ বিরাট তথা সকল স্থূলবস্তুর সমষ্টি] আনন্দের একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের); তে যে শতং প্রজাপতেঃ আনন্দাঃ (প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ অধিক); সঃ ব্রহ্মণ একঃ আনন্দঃ (সেই হল ব্রহ্মের [হিরণ্যগর্ভ, নিখিল মনের সমষ্টি] আনন্দের একক); শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য (এবং বাসনামুক্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের)।

সরলার্থ: তাঁর (অর্থাৎ ব্রহ্মের) ভয়ে ভীত হয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। সূর্যও তাঁর ভয়ে উদিত হয়। অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু তাঁরই ভয়ে ত্রস্ত হয়ে ধাবিত হয় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

ব্রহ্মানন্দ কি তার একটা ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে। এক যুবাপুরুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তিনি শুধু বয়সেই যুবা নন, উপরন্তু তিনি সৎ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ, সুগঠিত দেহযুক্ত এবং বলিষ্ঠ। ধনসমৃদ্ধ সসাগরা পৃথিবীর তিনি অধিকারী। তখন তাঁর যে আনন্দ হয় তা মানুষের পক্ষে সর্বোত্তম আনন্দ। সেই চূড়ান্ত আনন্দকে একক ধরে নিয়ে তাকে একশ গুণ বর্ধিত করা হল। সেই আনন্দ মনুষ্য-গন্ধর্বদের আনন্দের একটি একক এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সম পরিমাণ। মনুষ্য-গন্ধর্বদের আনন্দের শতগুণ দেব-

গন্ধর্বদের আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সম পরিমাণ। দেব-গন্ধর্বদের আনন্দের শতগুণ চিরলোকবাসী (কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী) পিতৃপুরুষদের আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। চিরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণের আনন্দের শতগুণ আজান-স্বর্গবাসী দেবতাদের আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। আজান-স্বর্গবাসী দেবতাদের আনন্দের শতগুণ কর্মদেবগণের (যাঁরা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন) আনন্দ এবং কামনাশুন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ হল যজ্ঞের আহুতি গ্রহণকারী দেবতাদের (সংখ্যায় তেত্রিশ) এক (পূর্ণমাত্রা) আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। এই দেবগণের আনন্দের শতগুণ আবার দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ যে আনন্দ তা-ই দেবগুরু বৃহস্পতির এক (পূর্ণমাত্রা) আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ যে আনন্দ, তা-ই প্রজাপতির (অর্থাৎ বিরাটের) এক (পূর্ণমাত্রা) আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। প্রজাপতির আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হলে হয় ব্রহ্মার (বা হিরণ্যগর্ভের) এক আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ।

ব্যাখ্যা: বায়ু কার আদেশে বয়? ব্রহ্মের আদেশে। ব্রহ্মই কর্তা, রাজাধিরাজ। ঝড়ের তাণ্ডবের সময় বায়ুর প্রচণ্ডতা আমাদের হকচকিয়ে দেয়। কিন্তু এই বায়ুও স্বাধীন নয়। ব্রহ্মের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়।

বেদান্ত জোর দিয়ে বলেন, মুক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু কোন না কোন অভাববোধ মানুষকে সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। তাই মুক্তির ইচ্ছা মানুষের সহজাত। আকাশে ওড়ার জন্য কেন আমরা বিমান তৈরী করি? কারণ মাটির পৃথিবীতে আমরা বদ্ধ হয়ে থাকতে চাই না। আমরা স্বাধীন হতে চাই। প্রকৃতির বন্ধনকেও আমরা মেনে নিতে চাই না; প্রতি মুহূর্তে তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করি।

উপনিষদ বলেন, এমনকি মৃত্যুও পরাধীন। আমরা অনেক সময় 'সর্বগ্রাসী মৃত্যু'র কথা বলি। মৃত্যুর কবল থেকে কেউ মুক্ত নয়। মৃত্যুকে তাই সর্বশক্তিমান বলে মনে হয়। এই মৃত্যুকেও নিয়ন্ত্রণ করেন ব্রহ্ম। এ জগতে যা কিছু আছে, এমনকি যা মহাপরাক্রমশালী তাও ব্রহ্মের বলেই বলীয়ান—একথাই উপনিষদ বলতে চাইছেন।

কেন উপনিষদে একটি উপাখ্যান আছে। একবার দেবতারা অসুরদের জয় করে নিজেদের বীর্যবত্তার অহঙ্কার করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের সামনে এক বিচিত্র মূর্তির আবির্ভাব হল। মূর্তিটি কে তা তাঁরা জানতেন না। তাই একে একে দেবতারা মূর্তিটির পরিচয় জানতে

আগ্রহী হলেন। প্রথমে গেলেন অগ্নি। অগ্নি কিছু বলার আগেই ছায়ামূর্তি বলে উঠলেন, 'তুমি কে?' উত্তরে অগ্নি জানালেন, 'আমি অগ্নি।' প্রশ্ন হল, 'তুমি কোন্ কাজে দক্ষ?' অগ্নি উত্তর দিলেন, 'আমি এই জগতে সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারি।' 'তাহলে এই খড়কুটোটি পোড়াও দেখি'—এই বলে সেই ছায়ামূর্তি অগ্নির সম্মুখে একটি খড়কুটো রাখলেন। অগ্নি বারবার খড়কুটোটি পোড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তখন বায়ু গেলেন সেই অদ্ভুত মূর্তির কাছে। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। বায়ু শত চেষ্টা সত্ত্বেও খড়কুটোটি ওড়াতে পারলেন না। এইভাবে দেবতারা পরাস্ত হয়ে ফিরে এলেন। সহসা সেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে সেখানে এক দেবীমূর্তির আবির্ভাব হল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই দেবীকে ছায়ামূর্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। দেবী জানালেন যে, তিনি সকল শক্তির উৎস ব্রহ্ম।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'সর্বং চ জগদ্ভয়বদ্ দৃশ্যতে।' এই জগৎ ভয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। মানুষ একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত, পরস্পরকে ভয় পায়। আজ যার স্থান সবার উপরে কাল সে ভূলুণ্ঠিত। অতএব সবসময় আমরা ত্রস্ত হয়ে আছি। এইভাবে ভয়তাড়িত হয়ে জীবন এগিয়ে চলে। ব্রহ্ম তাঁর ইচ্ছানুসারে আমাদের কর্ম করতে বাধ্য করেন। মূল কথাটি হল—সবকিছুর পেছনে সেই এক চৈতন্য বিরাজমান।

মানবদেহের কথাই ধরা যাক। দেহে কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্গের জন্য একটি বিশেষ কাজ নির্দিষ্ট আছে। প্রতিটি অঙ্গ সুশৃঙ্খল এবং তারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করে। কিন্তু কে তাদের সমন্বয় সাধন করে? কি করে তাদের কাজে সঙ্গতি রক্ষা হয়? উত্তর হল—চৈতন্য। আর মানবদেহ যেরকম চৈতন্যময় তেমনি এ জগৎও চৈতন্যে পূর্ণ। সবকিছুর পেছনে রয়েছে এক চৈতন্য। এই চৈতন্য না থাকলে সব ধ্বংস হয়ে যেত। এই চৈতন্যই ব্রহ্ম।

আজকাল বৈজ্ঞানিকরাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন এই জগৎ এক যন্ত্রবিশেষ। যন্ত্রের একটি অংশ বিকল হলে সেই যন্ত্র আর কাজ করে না। মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গকে আমরা উপদ্রব বলে মনে করি এবং নির্বিচারে তাদের ধ্বংস করি। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এইভাবে মশককুল ধ্বংস হওয়ার ফলে প্রকৃতিতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আমরা যে পরস্পর নির্ভরশীল সেকথা আমরা ভুলে যাই। আমরা স্বরূপত এক। সকলের বিনিময়ে শুধু জগতের একটি অংশ বেঁচে থাকবে তা হতে পারে না। এই জগৎ এক অভিন্ন সত্তা। এর প্রতিটি অংশেরই একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এমনকি মৃত্যুরও নিজস্ব ভূমিকা আছে। এ সবের নিয়ন্তা কে? ব্রহ্ম।

এরপর উপনিষদ আমাদের আনন্দের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে বলছেন। আমরা শুনি ব্রহ্মই সবকিছুর নিয়ন্তা ও উৎস। কিন্তু ব্রহ্ম কি আনন্দেরও উৎস? যদি হন, তবে সেই আনন্দ কিরকম? এখানে উপনিষদ ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বর্ণনা করে আমাদের আত্মজ্ঞান লাভে উৎসাহিত করছেন। বলছেন, 'ও, তুমি ভাল খাবার খাওয়ার আনন্দকেই চূড়ান্ত আনন্দ বলে মনে করছ! কিন্তু সব আনন্দের সেরা আনন্দ যে আত্মজ্ঞান তা কি তুমি জান না—আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

মানুষ সবচেয়ে বেশী কি চায়? এর উত্তরে অধিকাংশ মানুষই বলে থাকে, 'আমি ধনী হতে চাই।' কিন্তু ধনলাভই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, বৃদ্ধ হলে মানুষ ধনসম্পদ ভোগ করতে পারে না। তাই যৌবন চাই। আবার কেউ হয়তো বয়সে যুবা হলেও রুগ্ন, বেশী কাজকর্ম করতে পারে না। সুতরাং শুধু যৌবন থাকলেই চলবে না, স্বাস্থ্যও চাই। আবার একইসঙ্গে পরিণত জ্ঞানবুদ্ধিও থাকা চাই। বুদ্ধি থাকলেই অর্থের সদ্ব্যবহার সম্ভব; নতুবা অপচয়ে বিত্তনাশ অনিবার্য।

উপনিষদ এখানে 'আশিষ্ঠঃ', 'দ্রঢ়িষ্ঠঃ' এবং 'বলিষ্ঠঃ' এই শব্দ তিনটি ব্যবহার করেছেন। 'আশিষ্ঠঃ' কথাটির অর্থ যাঁর নেতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব আছে। এর অন্য অর্থ হল কাজেকর্মে দক্ষ এবং চটপটে। এমন ব্যক্তি সপ্রতিভ ও নিয়মনিষ্ঠ হন। 'দ্রঢ়িষ্ঠঃ'-এর অর্থ হল যাঁর দেহ সুগঠিত। 'বলিষ্ঠঃ' কথাটির অর্থ 'শক্তিশালী'। এর আর একটি অর্থ হতে পারে 'দৃঢ়চেতা'—যাঁর চিন্তা স্বচ্ছ এবং দৃঢ়—তিনি জানেন তিনি কি চান। যারা সবসময় সঙ্কল্প-বিকল্পের দোলায় দুলছে, তিনি তাদের মতো নন।

ধরা যাক, কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সব গুণই আছে। তদুপরি তিনি ধনসমৃদ্ধ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। অধিকাংশ লোকই মনে করবেন, এর চেয়ে অধিক কাম্য আর কি হতে পারে? কিন্তু উপনিষদ বলছেন, এ শুধু এক রকমের আনন্দ। এই আনন্দের শতগুণ হল গন্ধর্বের আনন্দ। গন্ধর্বরা পূর্বজন্মে মানুষ ছিলেন। এখন উন্নত হয়ে স্বর্গে সঙ্গীত শিল্পীর পদ লাভ করেছেন। দেবদেবীদের গান শোনানোই তাঁদের কাজ। এ পদ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেবতারা একত্র হলেই সেখানে সঙ্গীতের আসর বসে।

'পিতৃ' অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাঁরা নানা সদ্‌গুণের অধিকারী। তাঁরা 'চিরলোক' তথা নিত্যধামের অধিবাসী। কিন্তু তাঁদের অমরত্বও আপেক্ষিক। চিরলোকে তাঁরা কল্পান্ত পর্যন্ত বাস করতে পারেন। তারপর আছেন বিভিন্ন স্তরের দেবতারা। তাঁদের মধ্যে কেউ গৌণ, কেউ বা মুখ্য। প্রতিটি স্তরের আনন্দ তাঁর পূর্ববর্তী স্তরের আনন্দের শতগুণ। তারপর আছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতির আনন্দ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এইসব দেবতার নাম কার্যত এক একটি পদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যে কোন সজ্জন ব্যক্তি ইচ্ছে করলে এই পদে উন্নীত হতে পারেন। দেবদেবী বলতে কি বোঝায়? যাঁরা মহৎ প্রাণ তাঁরাই দেবদেবী। তা তিনি এই পৃথিবী বা অন্য যে কোন লোকের অধিবাসী হোন না কেন, সেসব প্রশ্ন অবান্তর।

দেখা যাচ্ছে মূল শ্লোকে একটি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য'। 'শ্রোত্রিয়' অর্থ হল যিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং সত্যদ্রষ্টা। যেহেতু তিনি সত্যকে জেনেছেন সেহেতু তিনি 'অকামহত' অর্থাৎ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। 'অকামহত' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'যিনি বাসনার দ্বারা হত নন'। 'হত' অর্থ 'নিহত' অর্থাৎ 'কামহত' শব্দটির অর্থ 'যিনি বাসনার দ্বারা নিহত'। বাসনা আমাদের সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। ফলে আমরা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসনার দাস হয়ে উঠি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক বক্তৃতায় বলছেন, 'তোমরা স্বাধীন ইচ্ছার কথা বল, কিন্তু তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? তোমাদের মন কি তোমাদের বশে আছে?' মন যতক্ষণ বশে না আসে ততক্ষণ কেমন করে বলব আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে?

কিন্তু উপনিষদ বলছেন, শুধু নির্বাসনা হলেই হবে না। একটা টেবিলেরও কোন বাসনা নেই। আমরা কি সেইরকম হতে চাই? আমরা কি জড় হয়ে থাকতে চাই? না, আমরা 'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ বেদজ্ঞও হব। 'শ্রোত্রিয়' শব্দটি 'শ্রুতি' থেকে এসেছে। 'শ্রুতি' কথাটির অর্থ বেদ। আমাদের বেদজ্ঞ হতে বলেছেন কেন? কারণ বেদপাঠ করলে আমরা উচিত-অনুচিত, ভালমন্দ বিচার করতে পারব।

কখন মানুষ যথার্থ 'অকামহত' হয় অর্থাৎ নির্বাসনা লাভ করে? যখন সে তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে; সব বস্তুর উৎস ব্রহ্মের সঙ্গে সে যখন একত্ব অনুভব করে। তখন আনন্দের জন্য তাকে আর বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর করতে হয় না। সে তখন আপ্তকাম, আত্মরতি।

সাধারণ মানুষের আনন্দ নির্ভর করে কোন বাসনা পূরণ বা উচ্চতর লোক প্রাপ্তির ওপর। কিন্তু বাসনামুক্ত মানুষ বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক ছাড়াই এই পৃথিবীতে শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, সুখাদ্য, ভাল পোশাক, রাজনৈতিক ক্ষমতা এসব থেকে যে পার্থিব আনন্দ লাভ হয় তা-ও ব্রহ্ম থেকেই আসে। এই লৌকিক আনন্দ ব্রহ্মানন্দের একটি ক্ষীণধারা মাত্র। শঙ্করাচার্য বিষয়ানন্দকে বিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর সঙ্গে এবং ব্রহ্মানন্দকে অতল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উভয় আনন্দই আনন্দ। কিন্তু বিষয়ানন্দ শুদ্ধ নয়। কারণ অশুদ্ধ মাধ্যমের ভেতর দিয়েই এই সুখ আসে। মাধ্যমটি সরিয়ে নিলে দেখা যায় আনন্দের

উৎস আমাদের ভেতরেই রয়েছে। সেই আনন্দ থেকে আমি পৃথক নই। আমি আর আনন্দ এক ও অভিন্ন। জলবিন্দুগুলি সমুদ্রে গিয়ে পড়লে যেমন সমুদ্রই হয়ে যায় ঠিক তেমনি আমিও আনন্দের সাথে একাকার হয়ে যাই।

শঙ্করাচার্য বলছেন, পার্থিব আনন্দ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ সেই আনন্দের অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়। যেমন, যতক্ষণ মিষ্টি খাচ্ছি ততক্ষণই সুখ। মিষ্টি খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই সুখেরও অবসান হয়। এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। আর এইজন্যই আমরা ধর্মের দিকে ঝুঁকি। নতুবা কে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতো? আমরা সকলে পরমানন্দকেই চাই। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য লোক থেকে লোকান্তরে যাওয়ার চেষ্টা করি; কিন্তু অসন্তোষ থেকেই যায়। যতক্ষণ না ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছি, ততক্ষণ আমাদের অতৃপ্তি বোধ থাকবেই। ব্রহ্মই সকল আনন্দের উৎস। ব্রহ্মেই সকল অতৃপ্তির অবসান।

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎপ্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মান মুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥৫॥ ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: সঃ যঃ চ অয়ং পুরুষে (যিনি এই দেহের মধ্যে); যঃ চ অসৌ আদিত্যে (এবং যিনি ওই সূর্যের মধ্যে); সঃ একঃ (তিনি অভিন্ন); যঃ এবংবিৎ (যিনি এ কথা জানেন); সঃ (তিনি); অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (এই জগৎ ত্যাগ করে); এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (স্থূলদেহের আত্মার সঙ্গে একত্বলাভ করেন); এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (প্রাণরূপ আত্মার সঙ্গে একত্বলাভ করেন); এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (মনরূপ আত্মার সাথে অভিন্ন বোধ করেন); এতং বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (বুদ্ধিরূপ আত্মার সাথে অভিন্ন বোধ করেন); এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (আনন্দময় আত্মার সাথে অভিন্ন বোধ করেন); তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে); ইতি অষ্টমঃ অনুবাকঃ (এখানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: এই দেহের মধ্যে হৃদয়াকাশে যিনি, তিনিই আবার ওই সূর্যের মধ্যেও রয়েছেন। যে ব্যক্তি একথা জানেন এবং একই সঙ্গে যিনি জগৎ সম্পর্কে উদাসীন (কারণ তিনি বাসনামুক্ত), তিনি প্রথমে নিজেকে অন্নময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন। এরপর যথাক্রমে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মার সঙ্গে তিনি একত্ব বোধ করেন (তারপর তিনি পরমাত্মা তথা ব্রহ্মে লীন হয়ে যান)। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম কখনও প্রকাশিত অর্থাৎ ব্যক্ত; কখনও বা তিনি অব্যক্ত। ব্রহ্ম যখন নিজেকে জগৎ রূপে ব্যক্ত করেন তখন এই জগতের প্রতিটি অংশে তিনি বিরাজমান। কিন্তু ব্যক্ত বা অব্যক্ত উভয় অবস্থাতেই তিনি আনন্দরূপে সর্বত্র রয়েছেন। উপনিষদ এখানে সূর্য এবং মানুষের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দূর আকাশে রয়েছে সুবিশাল ও মহা শক্তিশালী সূর্য, আর অন্যদিকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষ। কিন্তু মানুষের এই ক্ষুদ্র দেহেও পরমাত্মা তথা ব্রহ্ম বিরাজ করেন। আবার আমাদের ভিতরে যিনি, সূর্যের ভিতরেও তিনি। একই আত্মা সর্বত্র বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বালিশের উপমা দিতেন। কোন বালিশ গোলাকৃতি, কোনটা লম্বা, কোনটা মাথার বালিশ আবার কোনটা বা পায়ের। কিন্তু আকৃতি যেমনই হোক না কেন প্রত্যেকটি বালিশের ভিতর একই উপাদান অর্থাৎ তুলো। অনুরূপভাবে, এক ব্রহ্ম তথা এক আত্মা নানা রূপে নানা নামে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

আচার্য শঙ্কর ঘটের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। ঘটের ভিতরে যে আকাশ (ঘটাকাশ), বাইরেও সেই একই আকাশ (পটাকাশ)। ঘটটি যেন আকাশকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। আমরাও প্রত্যেকে এক একটি ঘটের মতো। আপনি একটি ঘট, আমি আর একটি ঘট। নামরূপের দ্বারা আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু স্বরূপত এক। ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত চেতন-অচেতন যত বস্তু আছে সবই ব্রহ্ম। জীব (ব্যষ্টি) ও জগৎ (সমষ্টি) স্বরূপত এক ও অভিন্ন—এই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

'সঃ য এবংবিৎ'—যিনি একথা জানেন। অর্থাৎ যিনি একথা জানেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন। বেদান্তমতে, অজ্ঞানতার লক্ষণই হল ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ 'বহু দেখা'। 'এক' দেখাই জ্ঞান। এ তত্ত্ব শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানলে হবে না, এ 'জানা'র অর্থ 'হয়ে ওঠা'—এই বেদান্তের অভিমত। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বত্র এক দর্শন করতেন, সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বোধ করতেন। প্রথমে অবশ্য এই তত্ত্বকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করেও আমরা অগ্রসর হতে পারি। অন্যের প্রতি আমাদের মনোভাব তখন ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। তখন আর কাউকে আমরা আঘাত করতে পারি না। 'অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য'—এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। 'প্রেত্য' কথাটির অর্থ 'প্রত্যাহার করা'। এই শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কথাটি এসেছে 'প্র + ই' থেকে—'ই' অর্থ হল 'যাওয়া' এবং 'প্র' মানে 'আগে' বা 'ঊর্ধ্বে'। অর্থাৎ তিনি এই জগতের ঊর্ধ্বে উঠে যান, জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

কিন্তু এই দেহ থাকতে কিভাবে জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়? শঙ্করাচার্য এখানে উপনিষদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলছেন: আমাদের অনাসক্ত হতে হবে। বৈরাগ্যের অর্থ হল 'অনাসক্তি', অর্থাৎ কোন কিছুতে আসক্ত না হওয়া। তুমি হয়তো প্রভূত

সম্পদের অধিকারী। কিন্তু তোমার যদি কিছুতে আসক্তি না থাকে, তবে তুমি প্রকৃত বৈরাগ্যবান। মিথিলার রাজা জনক একবার বলেছিলেন, 'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে'—'সারা মিথিলা পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও তাতে আমার কিছু আসে যাবে না।' তিনি উদাসীন, নির্লিপ্ত সাক্ষী-মাত্র! তিনি জীবন্মুক্ত।

আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, 'এ জগৎই একমাত্র সত্য।' এ জগৎ যে অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল একথা আমরা বুঝতে পারি না। বেদান্ত বলেন, এ জগৎ 'স্বপ্নবৎ', স্বপ্নের মতো। স্বপ্ন দেখার সময় আমরা বুঝি না আমরা স্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভেঙ্গে গেলে বুঝি, এতক্ষণ যা দেখছিলাম তা সত্য নয়। সেইরকম ভাবে যখন বুঝতে পারি স্বপ্নের মতো এ জগৎও মিথ্যা, তখনই আমরা নিজেদের জগৎ থেকে গুটিয়ে নিই। তখন আমরা বলি, 'বাস্তবিক, এ জগতের স্বভাবই অনিত্য।'

বর্তমানে আমরা এই জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি; জগতের সঙ্গেই একাত্ম বোধ করি। কিন্তু এর যথার্থ প্রকৃতি যখন আমাদের কাছে ধরা পড়ে তখন এই জগৎ 'মজার কুটি'। শেক্সপিয়ার তাঁর 'As You Like It' নাটকে বলছেন : 'সমগ্র পৃথিবী এক রঙ্গমঞ্চ। আর সকল নারী পুরুষ এখানে অভিনেতার ভূমিকায়। রঙ্গমঞ্চে ঢুকবার এবং বেরোবার দুটি দরজা থাকে। তার ভেতর দিয়ে অভিনেতারা ঢোকে, আবার বেরিয়ে যায়। এই জগৎও ঠিক সেইরকম।'

এখন কিছু লোক আপত্তি তুলতে পারেন, 'তোমরা পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছ।' কিন্তু বস্তুত তা নয়। একে বলা চলে 'বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী'। এ জগৎকে অনিত্য বলে বুঝতে পারলে আর একে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। হতে পারে আজ আপনি স্বাস্থ্যবান যুবক বা খুব ধনী অথবা আপনার অনেক রাজনৈতিক ক্ষমতা। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন চিরকাল এরকমই চলবে তাহলে ভুল করবেন। একদিন এ স্বাস্থ্য আপনার থাকবে না, আপনি বৃদ্ধ হবেন। আর যে কোন দিন আপনার ধনসম্পদ বা ক্ষমতা আপনার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

এই পরিবর্তনকে যদি মেনে না নিই, তবে দুঃখভোগ অনিবার্য। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—একথা মেনে নিলে অনাসক্তি আপনিই আসে। যখন উপলব্ধি হয় এক আত্মা সর্বত্র রয়েছেন তখন মন সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য হয়।

এই অবস্থায় কি হয়? নিখিল বিশ্বের সাথে মানুষ একাত্ম বোধ করে। এমন-কি স্থূলদেহের স্তরেও এই একত্বের অনুভূতি হয়। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ একজনকে কোমল ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল লোকটি যেন তাঁর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আর একবার দুজন মাঝি ঝগড়া করতে

করতে একজন আর একজনকে প্রহার করতে থাকে। তাই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ দেহে যন্ত্রণা অনুভব করেন। পরে দেখা গেল তাঁর দেহেও প্রহারের দাগ ফুটে উঠেছে। তিনি সমগ্র জগৎকে নিজের দেহ বলে মনে করতেন।

আবার মনের স্তরেও মানুষ তখন একত্ব অনুভব করে। আমাদের দেহ যেমন এক, তেমনি মনও এক। এই সমষ্টি মনকে কখনও কখনও হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হ্রদের এক অংশে ছোট ঢেউ উঠলে ক্রমশ সেই ঢেউ সমগ্র হ্রদে ছড়িয়ে পড়ে। যোগীরা এই কারণেই অন্যের মনের কথা সহজে জানতে পারেন বলে দাবী করে থাকেন। একজন যা চিন্তা করে তা কোন না কোন ভাবে অন্যের মনেও অনুরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

যোগীরা বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে অপরের মনের কথা জানা যায়। স্বামীজীর এই ক্ষমতা ছিল। গুডউইন যখন প্রথম স্বামীজীর ভাষণ লিখতে এলেন তখন দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। একদিন তিনি স্বামীজীর সামনেই হিন্দুদর্শনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিলেন। হঠাৎ স্বামীজীর সামনে গুডউইনের সমগ্র মনোজগৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। গুডউইনকে তিনি প্রথমে বালক ও পরে যুবকরূপে দেখতে পেলেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁকে স্বামীজী দেখলেন। গুডউইনের সমগ্র জীবন ছায়াছবির মতো স্বামীজীর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। তিনি গুডউইনকে বললেন, 'ওহে, আমি তোমার কথায় একটুও অবাক হচ্ছি না। তুমি অতীতে কেমন ছিলে আমি জানি। তুমি এই এই করেছ। বল, তুমি এইরকম ছিলে না?' এইভাবে বলে যেতে লাগলেন। গুডউইন তখন স্বামীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

শঙ্করাচার্য 'উপসংক্রামতি' কথাটি নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করেছেন। কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'তিনি কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করেন' অথবা 'তিনি ভিতরে যান'। আচার্য শঙ্কর জানেন, এই শব্দার্থ শুনেই দ্বৈতবাদীরা বলবেন, 'এর অর্থ হল একজন আছেন যিনি প্রবেশ করেন এবং তাঁর একটা গন্তব্যস্থলও আছে। অর্থাৎ দ্বিতত্ত্বই সত্য। এ যেন অনেকটা জোঁকের মতো। জোঁক এক পাতা থেকে অন্য পাতায় ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম যদি সর্বত্র থাকেন তবে তাঁর পক্ষে কি স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব? কিভাবে তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবেন?'

কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেন, ব্রহ্মে চলাফেরা বা স্থান পরিবর্তন বলে কিছু নেই। অজ্ঞানতার কারণে ব্রহ্মকে সচল বলে মনে হয়। অজ্ঞানতা দূর হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন সেই এক আত্মাকে সর্বত্র দেখা যায়। আর এক জায়গায় আচার্য শঙ্কর বলছেন : এটি উপলব্ধির বিষয়। চোখের অসুখ হলে কেউ আকাশে দুটো চাঁদ দেখতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয়

যে, দ্বিতীয় চাঁদটিও সত্য। তেমনি সত্যকে জানলে মানুষ আর 'বহু' দেখে না, সর্বত্র তখন এক দর্শন হয়। সর্বভূতে এক আত্মা আছেন, এই তত্ত্ব তখন বোধে বোধ হয়।

নবম অধ্যায়

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥১॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: বাচঃ (বাক্য); মনসা সহ (মন সহ); অপ্রাপ্য (না পেয়ে); যতঃ (তার [ব্রহ্ম] থেকে); নিবর্তন্তে (ফিরে আসে); ব্রহ্মণঃ ([যিনি] ব্রহ্মের); আনন্দং বিদ্বান্ (আনন্দকে [নিজের স্বরূপ বলে] জানেন); কুতশ্চন ন বিভেতি (কারো দ্বারা ভীত হন না [কারণ তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই])।

এতং হ বাব (এই জাতীয় চিন্তা); কিম্ (কেন); অহং সাধু ন অকরবম্ (আমি কোন সৎকাজ করিনি); কিম্ (কেন); অহং পাপম্ অকরবম্ (নিষিদ্ধ কর্ম করেছি); ইতি (এই [স্মৃতি]); ন তপতি (বিবেককে দংশন করে না); সঃ (সে); যঃ (যে); এতে (এই সব [অর্থাৎ সৎ কর্ম না করা আর নিষিদ্ধ কর্ম করা]); এবম্ (পূর্বে উল্লিখিত); বিদ্বান্ (জেনে [যে সেগুলি তার নিজ আত্মার প্রকাশ]); আত্মানং স্পৃণুতে (নিজেকে আশ্বস্ত করে); হি (কারণ); এষঃ (এই [ব্যক্তি যিনি বস্তুর একত্বকে জানেন]; এতে (এই দুই [অর্থাৎ সৎ কর্ম না করা ও নিষিদ্ধ কর্ম করা]); উভে এব (উভয়েই); আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মার সাথে অভিন্ন [এই ব্যক্তিটি কে?]); যঃ এবং বেদ (যিনি নিজেকে [আত্মার সঙ্গে অভিন্ন] জানেন); ইতি উপনিষদ্ (এই হল উপনিষদ, তথা ব্রহ্মবিদ্যা বা গুহ্যতত্ত্ব); ইতি নবমঃ অনুবাকঃ (এখানে নবম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: বাক্য ও মন ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে না পেরে তাঁর (ব্রহ্ম) থেকে ফিরে আসে। যিনি ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করেছেন তিনি কোন কিছুকেই আর ভয় পান না (কারণ সর্বত্র ব্রহ্ম ব্যতীত তিনি অন্য কিছু দর্শন করেন না)।

'আমি কেন সৎকাজ করিনি?' অথবা, 'কেন পাপকাজ করেছি?'—এই ধরনের প্রশ্ন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে কখনও বিচলিত করে না। ভালমন্দ তাঁর কাছে একাকার। কারণ তিনি জানেন ভাল বা মন্দ উভয়ের উৎসই ব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম তাঁরই আত্মা। এই হল উপনিষদ অর্থাৎ গুহ্যতত্ত্ব।

ব্যাখ্যা: 'যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে'—যাঁর থেকে বাক্য নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসে। আত্মাকে কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? সসীম কি অসীমকে বর্ণনা করতে পারে? না, পারে না। আত্মা বাক্যমনাতীত। 'মনসা সহ'—মনও ব্রহ্মকে চিন্তা করতে সক্ষম হয় না। আমরা কেবল আমাদের পরিচিত বস্তুকেই চিন্তা করতে পারি। যার সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই তার কথা কেমন করে ভাবব? আমাদের চিন্তা আমাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

'আনন্দং ব্রহ্মণঃ'—ব্রহ্মকে জানলে আনন্দ লাভ হয়। কারণ ব্রহ্মই আনন্দ আবার আনন্দই ব্রহ্ম। উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেইজন্য আমাদের সকল সুখ, এমনকি দেহসুখও ব্রহ্ম থেকে আসে। ব্রহ্মই সকল আনন্দের উৎস।

'ন বিভেতি কুতশ্চন'—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কোন কিছুকে ভয় করেন না। ব্রহ্মকে জানলে দুই-বোধ চিরতরে ঘুচে যায়। সুতরাং ভয়ের কারণও থাকে না। তখন সর্বত্র সেই এক ব্রহ্ম। আমাদের সকল ভয়ের উৎপত্তি দুই-বোধ থেকে অর্থাৎ 'তুমি আর আমি আলাদা' এই পৃথক বোধ থেকে। তখন মন সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে—'তুমি আমার থেকে শক্তিমান; অতএব আমাকে আঘাত করতে পারো'। কিন্তু যখন সর্বত্র এক দর্শন হয় তখন কে কাকে আঘাত করবে?

কিন্তু মৃত্যুকালে কি হয়? উপনিষদ বলেন, মৃত্যুকালে সাধারণ মানুষ তার সারাজীবনের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে। তখন তার মনে দু'ধরনের অনুশোচনা হয়। তার মনে হয়, 'কেন আমি সৎ কর্ম করিনি?' হয়তো সে বহু সৎকাজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার আরও মনে হয়, 'ওই মন্দ কাজগুলো কেন করতে গেলাম? এগুলো না করলেই তো হত।' এই জাতীয় নানা চিন্তা তখন তাকে পীড়িত করে।

কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন পাপ-পুণ্যের চিন্তা তাঁকে আর বিচলিত করে না। কারণ তিনি তখন পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে। আচার্য শঙ্কর বলেন, আত্মজ্ঞ পুরুষের কাছে ভালমন্দ ভেদ থাকে না। ভালমন্দের ধারণা আপেক্ষিক। যতক্ষণ আমরা ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখি ততক্ষণ ভালমন্দের বোধও থাকে। কিন্তু আর এক অবস্থায় সকল দ্বৈত বুদ্ধি ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। তখন থাকে শুধু এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, এই অবস্থায় 'আমি আছি' এই বোধটুকু মাত্র থাকে। আমি কে, আমি কোথায়, আমি কি করছি—এইসব ভাব আপেক্ষিক জগতের। এইসব চিন্তা থেমে

গেলে কেবল ‘আমি আছি’ এই বোধ ছাড়া আর কিছু থাকে না। কিন্তু সগুণ ঈশ্বরে যাঁর অনুরাগ তাঁর কি হয়? তাঁরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। তফাৎ শুধু এই যে, তিনি সবার মধ্যে নিজেকে না দেখে তাঁর প্রিয়তমকে, তাঁর প্রভুকে দেখতে পান। তাঁর আর কোন শত্রু নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এক সাধুর গল্প বলতেন। সেই সাধু একবার কারোর প্রহারে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। একথা জানতে পেরে তাঁর গুরুভাইরা গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে মঠে নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে গুরুভাইরা তাঁকে একটু দুধ খাওয়ান। তাঁর জ্ঞান কতটা ফিরেছে পরীক্ষা করার জন্য একজন গুরুভাই তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘কে আপনাকে দুধ খাওয়াচ্ছে চিনতে পারছেন কি?’ অসুস্থ সাধুটি উত্তর দিলেন, ‘যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই এখন আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।’ অর্থাৎ তাঁর কাছে এখন সবাই ভগবান। একই ঈশ্বর আগের মুহূর্তে তাঁকে আঘাত করেছেন, আবার পরমুহূর্তেই তাঁর সেবা করছেন।

ধরা যাক, কেউ সর্বত্র ব্রহ্ম দেখছেন। অর্থাৎ সর্বত্র নিজেকেই দেখছেন। যদি এক সত্তাই সর্বত্র বিরাজ করেন তবে ভালমন্দের কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ব্যবহারিক জগৎকে সত্য বলে মনে করলে ভালমন্দের পার্থক্যও মেনে নিতে হয়।

ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি দ্বৈত জগতের ব্যাপার। একজন মানুষ আর একজনকে ঠকায়, কারণ সে নিজেকে অন্যজনের থেকে পৃথক বলে মনে করে; অভিন্ন বোধ করলে আর ঠকাতে পারে না। আমি কি আমাকে ঠকাতে পারি? সুতরাং সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে তিনি আর কোন মন্দ কাজ করতে পারেন না। তিনি যদি মন্দ কাজ করতেও চান, তবুও ব্যর্থ হন।

আচার্য শঙ্কর এই জ্ঞানকে ‘পরমরহস্যম্’ অর্থাৎ গুহ্যবিদ্যা বলেছেন। এই জ্ঞান সকলের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ এসব কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবে, ‘ভালমন্দের তফাতই যদি না থাকে তাহলে সমাজব্যবস্থা চলবে কি করে?’ এখন প্রশ্ন হল : ভালমন্দের বিচার আমরা কি করে করব? শাস্ত্রের সাহায্যে। শাস্ত্র আমাদের বলে দেবে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের জীবন ও বাণীই হল শাস্ত্র। তাঁদের জীবনই আমাদের আদর্শ। যেহেতু তাঁরা সর্ব বস্তুতে নিজের আত্মাকেই দেখেন, সেহেতু তাঁরা যা করেন তা-ই আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী এখানেই সমাপ্ত ॥

তৃতীয় খণ্ড

ভৃগুবল্লী

প্রথম অধ্যায়

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সরলার্থ: ব্রহ্ম যেন আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করেন। এই বিদ্যার দ্বারা আমরা উভয়ে যেন সমভাবে উপকৃত হই। আমরা উভয়েই যেন সমভাবে এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য কঠোর শ্রম স্বীকার করি। আমাদের অধীত বিদ্যা যেন সমভাবে উভয়কেই ফল দান করে। পরস্পরের প্রতি আমাদের যেন বিদ্বেষ না থাকে।

ওঁ শান্তি। শান্তি। শান্তি।

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥১॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ (বরুণপুত্র যিনি ভৃগু বলে পরিচিত); পিতরং বরুণম্ উপসসার ([ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে] পিতা বরুণের সমীপবর্তী হলেন [যথাবিধি]); ইতি ([এবং] এ কথা বললেন); ভগবঃ (হে ভগবান); ব্রহ্ম অধীহি (অনুগ্রহ করে আমাকে ব্রহ্ম সম্পর্কে শিক্ষা দান করুন); তস্মৈ (তাঁকে [ভৃগুকে]); এতৎ প্রোবাচ ([তাঁর পিতা] একথা বললেন); অন্নম্ (খাদ্য [অর্থাৎ অন্নময় স্থূলদেহ]); প্রাণম্ (জীবনী-শক্তি তথা প্রাণ); চক্ষুঃ (চোখ); শ্রোত্রম্ (কান); মনঃ (মন); বাচম্ (বাক্ [বাগিন্দ্রিয়]); [এইসব ইন্দ্রিয়ের কার্য ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন যে এরা কিভাবে ব্রহ্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে]; তং হ উবাচ (তাঁকে [ব্রহ্ম

কেমন] তাও বললেন); যতঃ (যাঁর থেকে [অর্থাৎ উৎসরূপ ব্রহ্ম থেকে]); বৈ (উদাহরণ হিসাবে); ইমানি (এই সব); ভূতানি ([ব্রহ্ম থেকে শুরু করে] সব বস্তু); জায়ন্তে (জন্মায়); জাতানি (জন্মগ্রহণ করে); যেন (যাঁর দ্বারা); জীবন্তি (জীবন ধারণ করে); প্রয়ন্তি (অভিমুখে অগ্রসর হয়); যৎ (যাঁর মধ্যে); অভিসংবিশন্তি (লীন হয়ে যায়); তৎ (তাঁর সম্বন্ধে [অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাঁর মধ্যে হয়]); বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর); তৎ ব্রহ্ম ইতি (সে-ই ব্রহ্ম); [এই কথা শুনে] সঃ (সে [ভৃগু]); [ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য] তপঃ অতপ্যত (তপস্যা করতে শুরু করলেন); সঃ (তিনি [ভৃগু]); তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা করে); ইতি প্রথমঃ অনুবাকঃ (প্রথম অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: বরুণ-পুত্র ভৃগু একবার তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান, আমাকে অনুগ্রহ করে ব্রহ্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিন।' (বরুণের মনে হল, তাঁর পুত্র যথাবিধি তাঁর কাছে এই বিদ্যালাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন, সুতরাং) তিনি পুত্রকে অন্ন (স্থূলদেহ রূপে), প্রাণ, চোখ, কান, মন এবং বাগিন্দ্রিয়ের কথা বললেন (যেহেতু ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে গেলে এইসব বিষয় জানা দরকার)। তারপর ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি পুত্রকে বললেন, 'এই তত্ত্ব ধারণা করার চেষ্টা কর যে, এই সকল বস্তু ব্রহ্ম থেকে আসে, ব্রহ্মকে আশ্রয় করে থাকে এবং ব্রহ্মেই ফিরে যায়। তিনিই ব্রহ্ম।' (এই কথা শুনে) ভৃগু তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যা করে তিনি—

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় সেকথা আলোচনা করা হচ্ছে বর্তমান অধ্যায়ে। প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে একটি কাহিনীর মাধ্যমে। ভৃগু তরুণ বালক, তিনি তাঁর পিতা বরুণের কাছে এসে বললেন, 'অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম'—'ভগবান, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন'। এখানে লক্ষণীয় যে, ভৃগু তাঁর পিতাকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করেননি। বরুণ খ্যাতনামা পণ্ডিত। ভৃগু তাঁর কাছে শিষ্য হয়ে এসেছেন। তাই ভৃগুর আচরণে নম্রতার প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পিতা সম্বোধন না করে শ্রদ্ধেয় আচার্যকে যেভাবে সম্বোধন করা উচিত, ভৃগুও তাই করলেন। 'ভগবান' বলে সম্বোধন করলেন। এই সম্বোধন গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। এই উপনিষদে ব্যবহৃত শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'উপসসার' শব্দটিও সম্মানসূচক। এর অর্থ 'বিনম্রভাবে কাছে যাওয়া'। উপনিষদ কেন পিতাপুত্রের কাহিনী দিয়ে শুরু করেছেন? আচার্য শঙ্কর বলছেন যে, এই জ্ঞান কত মূল্যবান তা বোঝাতেই এই কাহিনীর অবতারণা। পিতা এই জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রকে দিয়ে যেতে চান। পিতা এই সর্বোচ্চ জ্ঞান পুত্রের জন্য সংরক্ষিত করেন। পুত্র নিজে পিতার কাছে এই জ্ঞান প্রার্থনা করলে পিতা খুশী হন।

কিন্তু বরুণ সরাসরি নির্গুণ ব্রহ্মের আলোচনায় প্রবেশ করেননি। উত্তম আচার্য সরলভাবে, শিষ্যের পরিচিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেন। খাদ্য, প্রাণবায়ু, চোখ, কান, বাক্ ও মনের গুরুত্ব কতটা তা আমাদের সকলেরই জানা। সেই কারণে বরুণ ভৃগুকে এই সব বিষয়ে চিন্তা করতে নির্দেশ দিলেন। শঙ্করাচার্য এগুলিকে ব্রহ্ম উপলব্ধির দ্বার বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ সবল দেহ, সুস্থ মন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে ব্রহ্মকে জানা যায় না।

এই দেহ স্থূল। অতএব দেহ পরম সত্য হতে পারে না। কিন্তু এই দেহ না থাকলে আবার জ্ঞান লাভও হয় না। সুতরাং এই দেহের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণ দেহকেই আশ্রয় করে থাকে। আবার প্রাণ না থাকলে মন এবং মন না থাকলে বুদ্ধি থাকতে পারে না। এই সবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যন্ত্র বা হাতিয়ার। এই যন্ত্রগুলিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

কিন্তু ব্রহ্ম কি? বরুণ বলছেন, 'ব্রহ্ম এই সমস্ত অস্তিত্বের উৎস', শঙ্করাচার্য যোগ করেছেন, 'আব্রহ্মস্তম্ব (তৃণ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত) সকলই ব্রহ্ম।' আবার ব্রহ্ম সবকিছুকে ধারণ করে আছেন এবং অন্তে সব বস্তু ব্রহ্মেই লয় হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক বিশাল ব্রহ্মচক্র। এখানে জন্ম-মৃত্যু আছে। আর আছে কত বিচিত্র রূপের আসা-যাওয়া। কিন্তু সবকিছু ব্রহ্মের মধ্যেই রয়েছে। এই সব কিছু যেখান থেকে আসে আবার সেখানেই ফিরে যায়।

শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন (৪।৪।১৮)। এই শ্লোকে ব্রহ্মকে 'প্রাণের প্রাণ' বলা হয়েছে। প্রাণের পিছনেও ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে প্রাণ কাজ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম 'চক্ষুষশ্চক্ষু', চক্ষুর চক্ষু এবং 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্', কর্ণের কর্ণ। এই চোখ আর কানের পিছনে যে প্রকৃত চোখ আর কান আছে, তা-ই হল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আছেন বলেই সব ইন্দ্রিয় কাজ করতে পারে। শঙ্করাচার্য বলেন, ব্রহ্ম 'পুরাণম্ অগ্র্যম্', তিনি প্রাচীন, তিনিই সব কিছুর আদি কারণ। তিনিই সব কিছুর উৎস।

এরপর পিতা ভৃগুকে বলছেন, 'বিজিজ্ঞাসস্ব'—বিশ্লেষণ কর, অনুসন্ধান কর। উ পনিষদ শুধু 'জিজ্ঞাসস্ব' অর্থাৎ 'সন্ধান কর' বলছেন না। বলছেন, 'বিজিজ্ঞাসস্ব'—বিশ্লেষণ কর। 'বি' উপসর্গটির অর্থ 'বিশদভাবে'। পিতা বলছেন, 'ভাল করে বুঝে এই বিদ্যা অভ্যাস কর।' তোমাকে স্বয়ং এই সত্য আবিষ্কার করতে হবে। অন্যে তোমার হয়ে করে দিতে পারবে না। পিতা পুত্রকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জানেন ভৃগু যদি নিজে যত্নবান না হন, পূর্ণ মনোনিবেশ না করেন তবে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা পড়বে না। সুতরাং বরুণ বললেন, 'আমি তোমাকে একটা ভাব (ধারণা) দিলাম। তুমি এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর।'

অতএব ভৃগু ফিরে গিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। কি ধরনের তপস্যা? তিনি ধ্যান করলেন। আচার্য শঙ্কর এখানে মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ'—মন এবং ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এই একাগ্রতার দ্বারাই সাধক মন, ইন্দ্রিয় এবং তাঁর সমগ্র সত্তাকে এক লক্ষ্যের দিকে চালিত করেন।

মন এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে। চোখ, কান, বাক্ প্রত্যেকেরই এক একরকম ক্ষমতা। বর্তমানে শক্তিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। এগুলিকে সংহত করে একটি কেন্দ্রে 'একাগ্র' না করলে মন ও ইন্দ্রিয়সকল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

ধরা যাক, আপনি বিজ্ঞানের কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। প্রথমে সমস্যাটি আপনাকে ধাঁধায় ফেলে দেবে। কিন্তু আপনি জানেন আপনাকে ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে। আপনার মনোভাব হল, 'যতক্ষণ সফল না হব ততক্ষণ আমি হাল ছাড়ব না।' যদি আপনার সামনে কোন লক্ষ্য থাকে, জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে উঠে পড়ে লাগতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

শঙ্করাচার্য আরও বলছেন, 'তৎ জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ'—একাগ্রতা সকল আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'সঃ ধর্মঃ পরঃ উচ্যতে'—এ-ই হল সব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো তৈরীর দৃষ্টান্ত দিতেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ঝিনুক স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এক ফোঁটা জল পেলেই ঝিনুকের মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং মহাসাগরের অতলে ডুবে সে ধীরে ধীরে মুক্তো তৈরী করে। অনুরূপভাবে, প্রথমে কোন একটি ভাব আমাদের পেয়ে বসে। আমাদের সব চিন্তা ও কর্ম সেই ভাবটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। একেই বলে 'তপস্যা'। আর যা কিছু সব অতিরিক্ত বলে মনে হয়। সেগুলি আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই ঘটনাই ঘটেছিল। লোকে বলে মা-কালী যেন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছিলেন। মা-কালী যেন বাঘিনী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিকার। তাঁর হাত থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্কৃতি নেই। আত্মোপলব্ধির জন্য এই জাতীয় ব্যাকুলতারই প্রয়োজন।

অতএব বৃষ্টির ফোঁটাসহ অতলে তলিয়ে যাওয়া শুক্তির মতো ভৃগুও তাঁর পিতার উপদেশ গ্রহণ করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥১॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: [তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করে ভৃগু] অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (জানতে পারেন যে অন্ন তথা খাদ্যই ব্রহ্ম); হি (কারণ); ইমানি ভূতানি (এই সব বস্তু [বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম]); অন্নাৎ এব খলু জায়ন্তে (নিঃসংশয়ে খাদ্য থেকে উৎপন্ন); জাতানি (যারা জন্ম গ্রহণ করেছে); অন্নেন জীবন্তি (তারা খাদ্যের দ্বারা পুষ্ট হয়); প্রয়ন্তি (তারা সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়); অন্নং অভিসংবিশন্তি ইতি (পরিণামে তারা খাদ্যেই লয় প্রাপ্ত হয়); তৎ (সেই [অর্থাৎ সেই খাদ্যই ব্রহ্ম]); বিজ্ঞায় (জেনে [এখনও তাঁর সংশয় বর্তমান]); পুনঃ এব বরুণং পিতরম্ উপসসার (আবার তিনি পিতা বরুণের কাছে গেলেন); ভগবঃ ব্রহ্ম অধীহি ইতি (এবং বললেন, 'হে দেব! অনুগ্রহ করে আমাকে [আরও] ব্রহ্ম সংক্রান্ত শিক্ষা দান করুন); তং হ উবাচ ([বরুণ] তাঁকে বললেন); তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপশ্চর্যার [ব্রহ্মে একাগ্রতা] দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে প্রয়াসী হও); তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন); [এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে] সঃ (তিনি [ভৃগু]); তপঃ অতপ্যত (তপশ্চর্যা পুনরায় আরম্ভ করলেন); সঃ (তিনি); তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা করে); ইতি দ্বিতীয়ঃ অনুবাকঃ (এখানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (ভৃগু তপস্যা করে) জানতে পারলেন খাদ্যই (অন্ন) ব্রহ্ম। (কেন?) কারণ অন্ন থেকেই সকল জীবের জন্ম, অন্নের দ্বারাই তারা পালিত হয়, আবার মৃত্যুর পরে তারা অন্নেই ফিরে যায়। ব্রহ্মকে এভাবে জেনে ভৃগু সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আবার (যথাবিহিত নিয়ম পালন করে) পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন।' তাঁর পিতা বললেন, 'পুনরায় তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু পুনরায় তপস্যা করলেন। এবং তপস্যা করে তিনি—

ব্যাখ্যা: কিছুকাল গভীর ধ্যানে মগ্ন থেকে ভৃগু এই সিদ্ধান্তে এলেন—'অন্নং ব্রহ্ম ইতি', খাদ্যই (অন্ন) ব্রহ্ম। এই স্থূল জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ন থেকে যেমন এই দেহের উৎপত্তি, তেমনি এই জগৎও অন্ন থেকেই এসেছে। অন্নই এই জগৎকে ধারণ করে আছে আবার অন্নেই এই জগতের লয় হয়। মৃত্যুর পর এই দেহের কি গতি হয়? মাটিতে মিশে এই দেহ অন্য প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়।

সুতরাং ভৃগু পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি বুঝেছি খাদ্যই (অন্ন) ব্রহ্ম। এর অধিক যদি কিছু থাকে আমায় উপদেশ করুন।' শঙ্করাচার্য বলছেন: কেন ভৃগুর মনে সংশয় ছিল? কারণ খাদ্যের উৎপত্তি আছে (অন্নস্য উৎপত্তি-দর্শনাৎ)। ব্রহ্মের কি উৎপত্তি

হতে পারে? না পারে না। কারণ যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে। অর্থাৎ সেই বস্তু বিনাশশীল। অতএব তা ব্রহ্ম হতে পারে না।

কিন্তু ভৃগুর পিতা তাঁকে সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি আবার বললেন, 'যাও, তপস্যা কর।' অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিত দিলেন মাত্র। যোগ্য আচার্য শিষ্যের অন্তরে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেন। তিনি শিষ্যকে বিষয়ের একটা ধারণা মাত্র দেন। কারণ তিনি জানেন, প্রকৃত জ্ঞান শিষ্যের অন্তরেই নিহিত রয়েছে। চিত্তের একাগ্রতায় এই জ্ঞান আপনা আপনি ফুটে ওঠে।

উপনিষদ এখানে বলতে চাইছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরীক্ষায় পাস, মোকদ্দমা জেতা, চাকরি পাওয়া অথবা অর্থ উপার্জন করা ইত্যাদি কাজে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের সবার আছে। যে কোন কাজে সফল হতে গেলে তার যথার্থ মূল্য দিতে হয়। অতএব আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে আমাদের যে সমধিক মূল্য দিতে হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই আচার্য শঙ্কর বলছেন যে, আমাদের বারবার চেষ্টা করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু যতদিন না আমাদের সব সংশয়ের নিরসন হয় ততদিন আমাদের অসন্তোষ থেকেই যাবে। আর একমাত্র ব্রহ্মকে জানলেই সব সংশয়ের অবসান হয়।

মানুষকে কিরকম নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে সেকথাই উপনিষদ বলছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমে যেও না।' যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজের আত্মাকে না জানি, আমার আত্মাই যে সর্বভূতের অন্তরাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আমিই সর্বত্র রয়েছি একথা না বুঝি ততক্ষণ পর্যন্ত এ চলার বিরাম নেই।

আমরা জানি বা না জানি সব কাজের মধ্য দিয়ে আমরা সেই পরম সত্যকে খুঁজে চলেছি। ছোট ছেলে বাজারে গিয়ে সেরা মার্বেলটি খোঁজে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক খোঁজ করেন সেরা গাড়ীটির। মননশীল মানুষ খোঁজেন ভাল বই বা ভাল গানের রেকর্ড। এইভাবে আমরা ক্রমাগত কিছু না কিছু খুঁজছি। কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই এ খোঁজার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পুত্র পিতার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থী হয়ে যাচ্ছেন, এই আখ্যায়িকার মাধ্যমে উপনিষদ আমাদের দৃষ্টি আমাদের স্বরূপের দিকে আকর্ষণ করছেন। আমরা ভুলবশত দেহ, মন বা বুদ্ধির সঙ্গে নিজেদের এক করে দেখি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মাই নিখিল জগতের অন্তরাত্মা।

এই এক আত্মাই আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন—কখনও স্থূল কখনও বা সূক্ষ্মরূপে। বাইরের রূপে আমাদের কত না বৈচিত্র, কিন্তু স্বরূপত আমরা এক ও অভিন্ন।

এই একত্বকে উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥১॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: [তপস্যার ফলে ভৃগু] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (জানতে পারলেন যে প্রাণই [জীবনী শক্তি] ব্রহ্ম); হি (কারণ); ইমানি ভূতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে (প্রাণ থেকেই এই সব বস্তুর উৎপত্তি); প্রাণেন জাতানি জীবন্তি (জন্মের পর তারা প্রাণের দ্বারাই প্রতিপালিত); প্রাণং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (আবার তারা প্রাণেই ফিরে যায় এবং সেখানেই লীন হয়ে যায়); তৎ বিজ্ঞায় (একথা জেনে); পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার (তিনি আবার পিতা বরুণের কাছে ফিরে গেলেন); ভগবঃ অধীহি ব্রহ্ম ইতি (হে দেব, অনুগ্রহ করে আমাকে ব্রহ্ম সংক্রান্ত শিক্ষা দান করুন); তং হ উবাচ [তাঁর পিতা] তাঁকে বললেন); তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও); তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন); সঃ তপঃ অতপ্যত (তিনি [ভৃগু] আবার তপস্যা শুরু করলেন); সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তপশ্চর্যার পর তিনি); ইতি তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ (এখানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: ভৃগু উপলব্ধি করলেন প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ থেকেই এই সব ভূতবর্গ জন্মায়, প্রাণই তাদের ধারণ করে রাখে আবার মৃত্যুর পর প্রাণেই তাদের লয় হয়। এই তত্ত্ব জেনে ভৃগু আবার তাঁর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান, ব্রহ্ম বিষয়ে আমাকে (আরও) উপদেশ দিন।' পিতা বললেন, 'কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন এবং তপস্যা শেষ হলে তিনি—

চতুর্থ অধ্যায়

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি

ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥১॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: মনঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ ([তিনি] উপলব্ধি করলেন যে মনই ব্রহ্ম); মনসঃ হি এব খলু (মন থেকেই); ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই সব বস্তু জন্মেছে) মনসা জাতানি জীবন্তি (জন্মের পর তারা মনের দ্বারা পালিত হয়); মনঃ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (তারা মনেই ফিরে যায়, এবং মনেই লীন হয়ে যায়); তৎ বিজ্ঞায় (এই তত্ত্ব জেনে); পুনঃ এব (আরও একবার); পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের কাছে ফিরে গেলেন); ভগবঃ অধীহি ব্রহ্ম ইতি ([এবং বললেন]) হে দেব, অনুগ্রহ করে আমাকে ব্রহ্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান করুন); তং হ উবাচ ([তাঁর পিতা] তাঁকে বললেন); তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও); তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপশ্চর্যাই ব্রহ্ম); সঃ তপঃ অতপ্যত (তিনি [আবার] তপস্যায় নিরত হলেন); সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা অন্তে, তিনি); ইতি চতুর্থঃ অনুবাকঃ (এখানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: ভৃগু উপলব্ধি করলেন মনই ব্রহ্ম। কারণ মন থেকেই সব বস্তুর উদ্ভব, মনই তাদের আশ্রয় আর মৃত্যুর পর মনেই তাদের লয় হয়। এই তত্ত্ব জেনে ভৃগু আবার তাঁর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিন।' তাঁর পিতা বললেন, 'তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানার চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু আরও তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি—

ব্যাখ্যা: ধীরে ধীরে ভৃগুর উচ্চতর উপলব্ধি হচ্ছে। তিনি স্থূল [অন্ন] স্তর থেকে শুরু করে প্রথমে প্রাণ এবং পরে মন রূপে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। এই ভাবেই জ্ঞান ধাপে ধাপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু ভৃগু এখনও সন্তুষ্ট নন। মন অবশ্যই খুব শক্তিশালী, কিন্তু মনেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মনে সঙ্কল্প-বিকল্প আছে। মন কখনও সুখী, কখনও দুঃখী। অতএব মন কখনই পরম সত্য হতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥১॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ ([ভৃগু] উপলব্ধি করলেন যে বুদ্ধিই ব্রহ্ম); বিজ্ঞানাৎ হি এব খলু (স্বয়ং বুদ্ধি থেকেই); ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই সব বস্তু জন্মেছে); বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি (জন্মের পর তারা বুদ্ধির দ্বারা পালিত হয়); বিজ্ঞানং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (তারা বুদ্ধিতেই ফিরে যায়, এবং তাতেই লীন হয়ে যায়); তৎ বিজ্ঞায় (এই তত্ত্ব জেনে); পুনঃ এব (আবার); পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের কাছে ফিরে গেলেন); ভগবঃ অধীহি ব্রহ্ম ইতি ([এবং বললেন] হে দেব, অনুগ্রহ করে আমাকে ব্রহ্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান করুন); তং হ উবাচ ([তাঁর পিতা] তাঁকে বললেন); তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও); তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপশ্চর্যাই ব্রহ্ম); সঃ তপঃ অতপ্যত (তিনি [আবার] তপস্যায় নিরত হলেন); সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা অন্তে, তিনি); ইতি পঞ্চমঃ অনুবাকঃ (এখানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: ভৃগু তখন জানতে পারলেন বুদ্ধিই ব্রহ্ম। জগতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সব বুদ্ধি থেকেই জন্মায়। জন্মাবার পর বুদ্ধিই তাদের ধারণ করে রাখে। আবার মৃত্যুর পর তারা বুদ্ধিতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই তত্ত্ব জেনে ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে শিক্ষা দিন। বরুণ উত্তর দিলেন, 'তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানার চেষ্টা কর। তপস্যা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।' ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি—

ব্যাখ্যা: এক অর্থে বুদ্ধিও সত্য। ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ এসবের বিচার বুদ্ধিই করে থাকে। কিন্তু বুদ্ধিও পরিবর্তনশীল। আজ যা উচিত বলে মনে হচ্ছে, কাল তা উচিত বলে মনে নাও হতে পারে। অভিজ্ঞতার সাথে সাথে আমাদের উচিত-অনুচিতের ধারণাও বদলাতে থাকে। আমাদের বুদ্ধি আরও পরিণত হয়ে ওঠে। কিন্তু বয়স বাড়লেই বুদ্ধি বাড়বে এমন কোন কথা নেই। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিও অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় দেন। আবার বয়সে নবীন হয়েও অনেকে চিন্তাশীল এবং পরিণত বুদ্ধির অধিকারী। সুতরাং পরিবর্তনশীল স্বভাবের কারণে বুদ্ধিও চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥১॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ ([ভৃগু] উপলব্ধি করলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম); আনন্দাৎ হি এব খলু (আনন্দ থেকেই); ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই সব বস্তুর জন্ম হয়); আনন্দেন জাতানি জীবন্তি (জন্মের পর তারা আনন্দের দ্বারা পালিত হয়); আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (তারা আনন্দেই ফিরে যায়, এবং তাতেই লীন হয়ে যায়); সা এষা (এই সেই); ভার্গবী বারুণী বিদ্যা (যে জ্ঞান ভৃগু লাভ করেছিলেন এবং বরুণের থেকে যা অর্জন করেছিলেন); পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা (হৃদয়াকাশে অধিষ্ঠিত); যঃ এবং বেদ (যিনি [ব্রহ্মকে] এইভাবে জানেন); সঃ প্রতিতিষ্ঠতি ([ব্রহ্মে] দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত); অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী এবং বহু অন্ন ভোক্তা হন [অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় স্থূলবস্তু থেকে সূক্ষ্ম আনন্দ পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর আয়ত্তে]); মহান্ ভবতি (তিনি মহান হন); প্রজয়া (বহু সন্তান দ্বারা); পশুভিঃ (অনেক পশুর দ্বারা); ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মের জ্যোতি দ্বারা); কীর্ত্যা মহান্ (তিনি প্রভূত যশের অধিকারী); ইতি ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ (এখানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: ভৃগু উপলব্ধি করলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কেননা আনন্দ থেকেই এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়। জন্মের পর তারা আনন্দের দ্বারাই বর্ধিত হয় এবং যখন তারা ধ্বংস হয়ে যায় তখন আনন্দেই ফিরে যায় এবং তাতেই লীন হয়। এই জ্ঞান ভৃগু লাভ করেছিলেন বরুণের কাছ থেকে এবং বরুণ তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সত্য রয়েছে হৃদয়াকাশের নিভৃতে (স্থূল খাদ্যবস্তু থেকে সূক্ষ্ম আনন্দে এই সত্য পরিব্যাপ্ত)। যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী এবং প্রচুর অন্ন ভোগের ক্ষমতা-সম্পন্ন (অর্থাৎ, অগ্নির মতো তিনি সবকিছুই আত্মসাৎ করতে পারেন)। তাঁর বহু সন্তান এবং অনেক পশুধন রয়েছে। তিনি ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণ করেন। তিনি প্রকৃতই মহান। তাঁর যশ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যা: এইভাবে ধাপে ধাপে ভৃগু সত্যে উপনীত হলেন। উপনিষদের মূল কথা হল, যুক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণযোগ্য মনে না হলে আমরা যেন কোন বিষয় মেনে না নিই। আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে প্রথমে প্রশ্ন করতে হবে। তারপর সেই বিষয়ের উপর গভীর ভাবে মনন ও ধ্যান করতে হবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'শনৈঃ শনৈঃ অন্তঃ অনুপ্রবিশ্য'—ধাপে ধাপে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। নিজের চেতনার গভীরে অনুসন্ধান করতে হবে, প্রবেশ (অনুপ্রবিশ্য) করতে হবে।

উপনিষদ কেন 'তপস্যা' কথাটি ব্যবহার করছেন? কেন শুধু 'চিন্তা' বা 'ধ্যান' করতে বলছেন না? কারণ উপনিষদ এখানে 'সুনিয়ন্ত্রিত' চিন্তার উপর জোর দিচ্ছেন। আমরা সকলেই চিন্তা করি। চিন্তা না করে আমরা পারি না। কিন্তু সে চিন্তা নিতান্তই ভাসা-ভাসা।

আমরা ধাপে ধাপে এগোই না। আমাদের অধিকাংশ চিন্তা যুক্তিপূর্ণ নয়। মনকে আমরা সংযত করতে পারি না। তাই মন একাগ্র হয় না। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'শনৈঃ শনৈঃ', ধাপে ধাপে চিন্তাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

ধরা যাক একজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে রত। প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে প্রতিটি তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। সেই তথ্যগুলি বিবেচনা করতে হবে। কোনটিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। এও এক ধরনের 'তপস্যা'।

তপস্যাবলে ভৃগু উপলব্ধি করলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। এবং সেই আনন্দ 'পরমে ব্যোমন্', হৃদয়স্থ পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করাচার্য একেই বলেছেন অন্তরাত্মা, যা অন্তরতম, সত্তার গভীরে যা লুকিয়ে আছে।

যিনি এই আনন্দ উপলব্ধি করেছেন তাঁর কি হয়? উপনিষদ বলছেন, তিনি অন্নভোক্তা হন। অর্থাৎ তিনি যে শুধু ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন তা নয়, এই স্থূল জগৎও তাঁর উপভোগ্য হয়ে ওঠে। জগতের সব কিছুতেই তিনি আনন্দ পান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানুষকে দেয় আত্মপ্রত্যয়, মানসিক দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তি। আর এর দ্বারা তিনি সবকিছু লাভ করতে পারেন।

'মহান্ ভবতি'—তিনি মহৎ হয়ে ওঠেন। কোন্ অর্থে মহৎ? উপনিষদ এখানে বলছেন, 'সব অর্থে, এমনকি সন্তানসন্ততি এবং প্রাণী-সম্পদেও।' সে যুগে পশুবলকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হত। তাই উপনিষদ বলছেন, এহেন ব্যক্তি ধনসম্পদেও মহান। আর উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার জ্ঞানের কিছু অংশ লাভ করে তাঁর সন্তানরাও মহৎ হয়।

কিন্তু এসবই 'ব্রহ্মবর্চস', ব্রহ্মজ্যোতি বা ব্রহ্মতেজের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। 'ব্রহ্মবর্চস' হল আধ্যাত্মিক জ্যোতি যা অন্তরস্থ আনন্দ থেকে উৎসারিত, বাইরের কোন বস্তু থেকে নয়। একবার স্বামী বিবেকানন্দের একটি ছবি দেখে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, 'এঁকে এত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে কেন? জগতে এত দুঃখ থাকতে এঁকে এত আত্মতৃপ্ত মনে হচ্ছে কেন?' অনেকেরই ধারণা সাধু-সন্ন্যাসীর চেহারা হবে বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট। জগতে দুঃখ আছে এ কথা সত্য। আর এ দুঃখ স্থায়ী হোক, তা কোন সন্ন্যাসীরই কাম্য নয়। কিন্তু জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি আনন্দও আছে। এই আনন্দই পরম সত্য। এই আনন্দ আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে। আত্মজ্ঞান লাভ হলে এই আনন্দের প্রকাশ হয়। জীবনের শেষ দিনগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল সবসময় দিব্য আনন্দে পূর্ণ থাকত। শারীরিক কোন কষ্টই তাঁর সে আনন্দকে ম্লান করতে পারেনি।

যে-ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন আধ্যাত্মিক গুণাবলীতেও তিনি মহান হয়ে ওঠেন। এই গুণগুলি কি কি? শঙ্করাচার্য বলছেন: 'শম-দম-জ্ঞানাদি', অর্থাৎ সংযত মন, সংযত ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি কি? কি করে বোঝা যাবে তিনি এই পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন? আমরা কখনও কখনও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মানুষের কথা শুনে থাকি। এরই নাম কি আধ্যাত্মিকতা? আচার্য শঙ্কর বলছেন, না, মানুষের জীবনই আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ পরিমাপ। মানুষ তার নৈতিক চরিত্রেই মহৎ হয় ('শুভপ্রচার-নিমিত্তয়া')। এহেন ব্যক্তি সবসময় অপরের কল্যাণ সাধন করেন। শেষ বিচারে এই হল আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি। অন্য কোন পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥১॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: অন্নং ন নিন্দ্যাৎ (অন্নের [খাদ্যের] নিন্দা করবে না); তৎ ব্রতম্ ([ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে] এ এক পবিত্র নিয়ম); প্রাণঃ বৈ অন্নম্ (জীবনই অন্ন তথা খাদ্য [কারণ প্রাণ খাদ্যে আশ্রিত]); শরীরম্ অন্নাদম্ (শরীরই অন্নের ভোক্তা); প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ ([জীবনী শক্তি] শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত); শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত); তৎ এতৎ (এটি সেটির মতো [দেহ এবং প্রাণ উভয়ই]); অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (শরীর প্রাণের ওপর নির্ভরশীল); সঃ যঃ (যে কেউ); এতৎ বেদ (এ তত্ত্ব জানেন); অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (শরীর প্রাণের ওপর নির্ভরশীল); প্রতিতিষ্ঠতি (জগদ্বিখ্যাত হয়ে যান); অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (তিনি প্রচুর খাদ্যের বা অন্নের অধিকারী এবং অন্নভোক্তা হন); প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ ভবতি ([তিনি] সন্তান দ্বারা, পশুসমূহ দ্বারা, ব্রহ্মতেজ দ্বারা মহান হন); কীর্ত্যা মহান্ (তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেন); ইতি সপ্তমঃ অনুবাকঃ (সপ্তম অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন এবং অন্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন) তিনি কখনও অন্ন বা খাদ্যের নিন্দা করবেন না। এটি তাঁর কাছে ধর্মীয় শপথের তুল্য। প্রাণই খাদ্য। আবার প্রাণই সেই খাদ্যের ভোক্তা (তাই প্রাণকে অন্নদি বলা হয়)। প্রাণ আছে বলেই দেহ জীবিত আছে। সুতরাং দেহ প্রাণের ওপর নির্ভরশীল। আবার প্রাণও দেহের ওপর নির্ভরশীল। এরা

একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল (যেন এক ধরনের খাদ্য বা অন্ন আর এক ধরনের খাদ্য বা অন্নের ওপর নির্ভরশীল)। যিনি এই দুই প্রকার অন্নকে (দেহ এবং প্রাণ) পরস্পর নির্ভরশীল বলে জানেন তিনি জগতে বিখ্যাত হন। তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী এবং তিনি নানারকম খাদ্য ভোগ করেন। তিনি বহু সন্তান ও প্রভূত প্রাণী-সম্পদ লাভ করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্যোতিতে তিনি ভাস্বর হয়ে ওঠেন। এই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: এখানে অন্নের প্রশংসা করা হয়েছে। 'অন্ন' শব্দটি এখানে দুই অর্থে ব্যবহৃত। এর আক্ষরিক অর্থ হল খাদ্য। আবার 'অন্ন' বলতে এই স্থূল জড় জগৎকেও বোঝানো হয়েছে। কারণ এই জগৎ তো অন্নেরই পরিণতি। সুতরাং উপনিষদ বলছেন, অন্নকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অনেকেরই ধারণা বেদান্ত এই জগৎকে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয় ইহলোক ছেড়ে কেবলমাত্র পরলোকের চিন্তা করতেই বেদান্ত মানুষকে উপদেশ দেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, উপনিষদ বলছেন, এই জগৎও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনে এই জড়জগতেরও প্রয়োজন আছে। আমাদের যেমন শরীরের প্রয়োজন আছে, তেমনি আবার খাদ্যেরও প্রয়োজন আছে। শরীরকে অবহেলা না করে বরং তার যত্ন নেওয়াই আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য বা ব্রত।

'প্রাণঃ বৈ অন্নম্'—এই প্রাণই অন্ন। দেহ এবং প্রাণশক্তি একে অপরের সাথে যুক্ত, অর্থাৎ পরস্পর নির্ভরশীল। দেহ ছাড়া যেমন প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না তেমনি প্রাণ ছাড়াও দেহ বাঁচতে পারে না। প্রাণহীন দেহ একতাল পচনশীল মাংসপিণ্ড মাত্র।

'শরীরম্ অন্নাদম্'—দেহ খাদ্য গ্রহণের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। তাই দেহকে 'অন্নাদম্' বা ভোক্তা বলা হয়। প্রাণ এবং দেহ উভয়েই খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই খাদ্যকে তুচ্ছ বা উপেক্ষা করা উচিত নয়। যিনি খাদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন একমাত্র তিনিই জীবিত থাকেন।

এখানে খাদ্যের প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন? আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এটিই প্রবেশদ্বার। খাদ্য ছাড়া দেহকে সুস্থ রাখা যায় না। আর জীবনে উন্নতির জন্য সুস্থ সবল দেহের প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এটিই প্রথম সোপান।

অষ্টম অধ্যায়

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে

প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥১॥ ইতি অষ্টোমোহনুবাকঃ॥

অন্বয়: অন্নং ন পরিচক্ষীত (খাদ্য তথা অন্নকে অবহেলা করা উচিত নয়); তৎ ব্রতম্ (এটি ধর্মীয় ব্রত [কিন্তু অন্ন কী?]); আপঃ বৈ অন্নম্ (জলই অন্ন); জ্যোতিঃ অন্নাদম্ (শক্তি [তথা—অগ্নি ইত্যাদি] খাদ্য পরিপাক করে); অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ([একযোগে] জলে শক্তি অন্তর্নিহিত), আপঃ জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ (জলও শক্তি তথা অগ্নিতে অন্তর্নিহিত); তৎ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (এই দুই প্রকার অন্নই পরস্পরনির্ভর); সঃ যঃ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (এক প্রকার অন্ন বা খাদ্য অন্য প্রকার অন্নের উপর নির্ভরশীল—এই গুহ্য তত্ত্ব যিনি জানেন); প্রতিতিষ্ঠতি (সাফল্য লাভ করেন); অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (তিনি খাদ্য বা অন্নের অধিকারী হন এবং অন্নভোক্তা হন); প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ ভবতি ([তিনি] সন্তান দ্বারা, পশুসমূহ দ্বারা, ব্রহ্মতেজ দ্বারা মহান হন); কীর্ত্যা মহান্ (অধ্যাত্মবিদ্যার আচার্যরূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন); ইতি অষ্টমঃ অনুবাকঃ (এখানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত)।

সরলার্থ: খাদ্যকে অবহেলা করা উচিত নয়। একে ধর্মীয় ব্রত বলে মনে করবে। (কিন্তু খাদ্য বলতে কি বোঝায়?) জল খাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অগ্নি খাদ্যকে পরিপাক করে (তাই অগ্নিকে অন্নাদম্ বলা হয়)। জলে অগ্নি (বা শক্তি) আছে। আবার অগ্নিতেও জল আছে। সুতরাং খাদ্য খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। 'এক রকমের খাদ্য আর একরকমের খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল'—যিনি এই তত্ত্বকে জানেন তিনি খুব খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী এবং নানারকম খাদ্য ভোগ করেন। তিনি বহু সন্তানের ও প্রভূত প্রাণী-সম্পদেরও অধিকারী হন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্যোতিতে তিনি ভাস্বর হয়ে ওঠেন। এই কারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন ও তত্ত্ব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে খ্যাত হন।

ব্যাখ্যা: হিন্দুদর্শন অনুযায়ী, এই জড়জগৎ, পাঁচটি উপাদানের সমষ্টি। পঞ্চ উপাদানগুলি হল: আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এই উপাদান-সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এরা একে অপরকে আশ্রয় করে রয়েছে। আমাদের কাছে প্রতিটি উপাদানই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার। সাধকের বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ খাদ্য ও আগুনের প্রয়োজন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কোলাহলপূর্ণ, কিংবা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশ ধ্যানের পক্ষে অনুকূল নয়। সুন্দর, শান্ত পার্বত্য এলাকা বা ঐরূপ নদীতীরবর্তী অঞ্চল ধ্যানের প্রশস্ত জায়গা। এরকমস্থানে মন আপনিই শান্ত ও অন্তর্মুখ হয়।

‘অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্’—অগ্নি এবং জল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আর জলেই অগ্নি বিদ্যমান। একথা আমাদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। জলভরা মেঘে বিদ্যুতের খেলা দেখেই হয়তো একথা মানুষের মনে এসেছে। কিন্তু এখানে শক্তি বোঝাতে ‘জ্যোতি’ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। জলে শক্তি আছে। বহমান জলধারা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এখানে উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, জড়জগৎ অবহেলার বিষয় নয়। আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভের চেষ্টা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। কারণ এই আনন্দ লাভই তো আমাদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু এই আনন্দ পেতে গেলে সুস্থ সবল দেহ ও উপযুক্ত পরিবেশ একান্তই জরুরী। তাই এই দৃশ্যমান জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। আবার উপনিষদ বলেন, এ জগৎ মিথ্যা। এর দ্বারা একথা বোঝানো হয় না যে, এ জগৎকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য বা বাতিল করতে হবে। এ জগতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু এ জগৎকে ব্রহ্মের প্রকাশরূপে দেখতে হবে।

এখানে উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, খাদ্য, মন, পঞ্চভূতের এই জড়জগৎকে ব্রহ্মরূপে মনে করতে হবে। এগুলিকে ব্রহ্ম হিসাবে জেনে, তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও পরিচর্যা করতে হবে। এ জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সাধককে সকল বস্তুর প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কারণ সাধকের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের এই হল প্রতিষ্ঠাভূমি। আর এই সংগ্রামের দ্বারা তিনি কালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলতেন, উদ্দেশ্যের মতো উপায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উপায়ের প্রতি যত্নশীল হও। রাসায়নিক উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করলে, তার ফল আপনিই পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে পরিবেশ, দেহ, মন, বুদ্ধি এ সবেরই অসামান্য গুরুত্ব আছে। এগুলির সঠিক পরিচর্যা করতে পারলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে (ব্রহ্মজ্ঞান) পৌঁছুতে পারি।

নবম অধ্যায়

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্‌ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥১॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ॥

অন্বয়: অন্নং বহু কুর্বীত (অন্ন [খাদ্য] উৎপাদন বর্ধিত করতে চেষ্টা কর); তৎ (এইরূপ করা); ব্রতম্ ([সকলের জন্য] ধর্মীয় কর্তব্য); [কিন্তু অন্ন কি?] পৃথিবী বৈ অন্নম্ (এই পৃথিবীই অন্ন

তথা খাদ্য); আকাশঃ অন্নাদঃ (আকাশ অন্নভোক্তা [অর্থাৎ আচ্ছাদন করে]); আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ([সর্বব্যাপী হওয়ার জন্য] আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত); পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিতা (পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত); তৎ এতৎ (এই ভাবে); অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (এক ধরনের অন্ন আর এক ধরনের অন্নের উপর নির্ভরশীল); সঃ যঃ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (এক জাতীয় অন্ন অন্য জাতীয় অন্নের ওপর নির্ভরশীল যিনি [এই গুহ্যতত্ত্ব] জানেন); প্রতিতিষ্ঠতি ([তিনি] জীবনে সাফল্য লাভ করেন); অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী হন এবং অন্নভোক্তা হন); প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ ভবতি ([তিনি] সন্তান দ্বারা, পশুসমূহ দ্বারা, ব্রহ্মতেজ দ্বারা মহান হন); কীর্ত্যা মহান্ (অধ্যাত্ম বিদ্যার আচার্য হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন); ইতি নবমঃ অনুবাকঃ (নবম অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত)।

সরলার্থ: সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটি ধর্মীয় কর্তব্য। (কিন্তু খাদ্য কি?) পৃথিবীই খাদ্য, আকাশ এই খাদ্য গ্রহণ করে (তাই আকাশের আর এক নাম অন্নাদ বা ভোক্তা)। আকাশ পৃথিবীর ওপর নির্ভরশীল। আবার পৃথিবীও আকাশের ওপর নির্ভরশীল। এরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। 'এক জাতীয় খাদ্য আর এক রকমের খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল'— যিনি এই তত্ত্বকে জানেন তিনি জীবনে খুব সাফল্য অর্জন করেন। তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী হন এবং নানা রকমের খাদ্য ভোগ করে থাকেন। তিনি বহু সন্তান ও প্রভূত প্রাণী-সম্পদও লাভ করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্যোতিতে তিনি ভাস্বর হয়ে ওঠেন। এই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

দশম অধ্যায়

ন কংচন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে॥১

অন্বয়: বসতৌ কংচন (যদি কেউ আশ্রয়প্রার্থী হন [বাসের নিমিত্ত তোমার গৃহে]); ন প্রত্যাচক্ষীত (তাঁকে ফিরিয়ে দিও না); তৎ ব্রতম্ (এটি ধর্মীয় কর্তব্য); তস্মাৎ যয়া কয়া চ বিধয়া (সুতরাং যে কোন উপায়ে); বহু অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রচুর খাদ্যের সংস্থান করা উচিত [যাতে আগত অতিথির সৎকার ব্যাহত না হয়]); [দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি অতিথি

সৎকারের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করেছেন] অস্মৈ অন্নম্ অরাধি ইতি আচক্ষতে (তাঁদের বলবেন, আমি অন্ন রান্না [সঞ্চয়] করেছি [তাঁদের আসার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে]); এতৎ বৈ অন্নম্ (এই খাদ্য [যা আমি আপনাদের দিচ্ছি]); মুখতঃ রাদ্ধম্ (নিজ অসামান্য যোগ্যতার বলে এ সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল [অথবা জীবনের প্রারম্ভে]); [যার ফলে] অস্মৈ (তাঁর প্রতি [অর্থাৎ গৃহস্বামীর প্রতি]); অন্নং মুখতঃ রাধ্যতে (একই যোগ্যতাবলে খাদ্য তাঁর কাছে ফিরে আসবে [অথবা জীবনের প্রারম্ভে]); এতৎ বৈ অন্নং মধ্যতঃ রাদ্ধম্ ([কিন্তু ধরা যাক] এই খাদ্য সৎ উপায়ে সংগৃহীত হয়নি); অস্মৈ অন্নং মধ্যতঃ রাধ্যতে (সেই খাদ্য তাঁর কাছে ঠিক সেইভাবেই ফিরে আসবে); এতৎ বৈ অন্নম্ অন্ততঃ রাদ্ধম্ ([কিন্তু ধরা যাক] এই খাদ্য সংগ্রহের পন্থা ছিল মন্দ); অস্মৈ অন্নম্ অন্ততঃ রাধ্যতে (খাদ্য তাঁর কাছে একই ভাবে ফিরে আসবে)।

সরলার্থ: আশ্রয়প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এটি ধর্মীয় ব্রত। (এবং যদি অতিথি আসেন তবে তাঁকে যথাযথ আপ্যায়ন করতে হবে।) তাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যে কোন উপায়ে খাদ্য সঞ্চয় করা উচিত। কারণ যে কোন দিন অতিথি এসে পড়তে পারেন। অতিথি এলে যেন ফিরিয়ে না দিতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এমন কথাই বলে থাকেন। অতিথিকে খাদ্যদানের সময়ে এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, উক্ত খাদ্য সৎ উপায়ে অর্জিত। অর্থাৎ নিজের যোগ্যতার দ্বারা অর্জিত। এই খাদ্যদানের জন্য তিনি উপযুক্ত পুরস্কার আশা করতে পারেন। তাঁর সততার গুণে সেই খাদ্যই আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে। কিন্তু এই সঞ্চিত খাদ্য যদি উত্তম উপায়ে সংগৃহীত না হয়ে থাকে অর্থাৎ খানিকটা নিজের যোগ্যতায় ও খানিকটা অসৎ উপায়ের দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে তবে সেই খাদ্য তাঁর কাছে ঠিক সেভাবেই ফিরে আসবে। যদি অতিথিদের জন্য তিনি অসৎ উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন, তবে সেই খাদ্য সেইভাবেই তাঁর কাছে ফিরে আসে। অর্থাৎ, সততা যেন বজায় থাকে।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ এইমাত্র বলেছেন যে, আকাশ এবং পৃথিবী একই উপাদানে গঠিত এবং তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সবকিছুই পরস্পর নির্ভরশীল—যিনি একথা সঠিকভাবে জেনেছেন তিনি আর কখনও আশ্রয়প্রার্থী অতিথিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। আর অতিথিকে যথাসম্ভব আপ্যায়ন করা উচিত। উপনিষদ আমাদের বলছেন: আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। কখন আসবে তুমি, তাই আমি তোমার জন্য খাদ্যসামগ্রীও প্রস্তুত করে রেখেছি। এভাবেই অতিথিকে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে যাতে অতিথি সৎকারে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

অন্নদানের (বা খাদ্যদানের) নিজস্ব পুরস্কার আছে। কারণ যেসময়ে ও যেভাবে অন্নদান করা হয় প্রায় একই সময়ে ও একইভাবে সেই অন্নই দাতার কাছে ফিরে আসে। বস্তুত কোন দানই অপুরস্কৃত থাকে না। কিভাবে দান করা হয়েছে তা পুরস্কার দেখলেই বোঝা যায়।

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি॥২

অন্বয়: যঃ এবং বেদ (যিনি এই ভাবে [অর্থাৎ খাদ্যের গুরুত্ব ও অপরকে অন্নদানের পুণ্য] জানেন [তিনি পূর্বোক্তভাবে পুরস্কৃত হন]); [এখন ব্রহ্ম ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ সম্পর্কীয় আলোচনা]; ক্ষেমঃ (আত্মসংযম [আক্ষরিক অর্থে অর্জিত বস্তুর সঞ্চয়]); বাচি ইতি (বাক্যে যেমন প্রকাশিত [অর্থাৎ, তোমার সঞ্চিত দ্রব্যে ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টা কর]); প্রাণাপানয়োঃ যোগক্ষেমঃ ইতি (প্রাণ ও অপান যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে); হস্তয়োঃ কর্ম ইতি (হাত দিয়ে যা কিছু কর সেইরূপে); পাদয়োঃ গতিঃ ইতি (পদদ্বয়ে গতিরূপে); পায়ৌ বিমুক্তিঃ ইতি (মলত্যাগে); ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ (এই সকল মানুষী কর্মে); অথ দৈবীঃ (পরে সকল অমর্ত্য [অর্থাৎ নৈসর্গিক] ঘটনাবলী); বৃষ্টৌ তৃপ্তিঃ ইতি (বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে [উত্তম ফসল ও অন্যান্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় বলে]); বিদ্যুতি বলম্ ইতি (বিদ্যুতে শক্তি রূপে)।

সরলার্থ: যিনি এভাবে (খাদ্যের গুরুত্ব এবং অপরকে খাদ্যদানের পুণ্য) জানেন তিনি পূর্বোক্তভাবে ফল লাভ করেন। আমাদের সব কর্মে ব্রহ্মকে দর্শনের চেষ্টা করা উচিত; যথা, বাক্ সংযম রূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগক্ষেম রূপে, হাতের দ্বারা যা কিছু করা হয় সেইরূপে, পায়ের গতি সঞ্চালনে এবং মলত্যাগে। (এই সব কিছুতে ব্রহ্ম রয়েছেন এবং) এই সব কর্ম মানুষের উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী। এরপর দৈবী (প্রাকৃতিক শক্তিকে) উপাসনার কথা বলা হয়েছে। বৃষ্টির ফলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় (যার জন্য ভাল ফসল ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায়) সেই তৃপ্তিতে এবং বিদ্যুতের শক্তিতে ব্রহ্মকে কল্পনা কর।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ এখানে ব্যবহারিক ধর্মের কথা বলেছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে সেই তত্ত্বকে আমরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করব? তার উত্তরে উপনিষদ বলছেন, সব কিছুকে ব্রহ্ম বলে মনে করতে হবে।

এরপর উপনিষদ বলছেন যে, বাক্, শ্বাসকর্ম ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্যসহ যাবতীয় শারীরিক কাজকর্মকেই পবিত্র বলে মনে করতে হবে। আমরা যেমন আমাদের সম্পত্তিকে

মূল্যবান মনে করে তা রক্ষা করার চেষ্টা করি ঠিক সেভাবেই বাক্ ও অন্যান্য শারীরিক কর্মকেও মূল্যবান বলে বিবেচনা করতে হবে। এগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজন; অপচয় যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা যখন কোন সম্পদকে সংরক্ষণ করি তখন তা যাতে বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাও করে থাকি। যেমন শ্বাসক্রিয়ার প্রসারণে আমাদের আয়ু বাড়ে এবং দৈহিক বলও বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে শ্বাসক্রিয়াকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হত। যথাযথভাবে শ্বাসগ্রহণ করলে শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। এসবই আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—দুর্বল ব্যক্তি আত্মাকে জানতে পারে না। শারীরিকভাবে দুর্বল যে-ব্যক্তি তার উন্নতিলাভ করা সম্ভব নয়। এমনকি সে নিজের জীবিকা অর্জনেও অসমর্থ। আর আধ্যাত্মিক জীবনের সংগ্রাম জীবিকা অর্জনের চেয়ে অনেক বেশী দুরূহ। সুতরাং সুস্থ সবল দেহ ছাড়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

উপনিষদ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শরীরের সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ। হাত-পা যেন কাজ করার উপযোগী হয়। এমনকি মলমূত্র ত্যাগের ইন্দ্রিয়গুলিও জরুরী। কারণ এগুলি যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

'মানুষীঃ' কথাটির অর্থ হচ্ছে মানুষ বা মানুষের দেহ সংক্রান্ত। 'সমাজ্ঞাঃ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ ধ্যান বা উপাসনা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাক্, হাত, পা অর্থাৎ সব ইন্দ্রিয়কে আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী করে তুলতে হবে। আর তা করতে পারলে যে কাজই আমরা করি না কেন তা পূজায় পরিণত হয়।

এখানে 'দৈবীঃ' কথাটির অর্থ প্রকৃতি সম্বন্ধীয়। বৃষ্টি ও বজ্রপাত হল প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রশ্ন হল, ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে কি? না, প্রকৃতিও ব্রহ্ম। উপনিষদ বলছেন, এ জগতে যা কিছু ঘটে তা মানুষ সম্পর্কিতই হোক বা প্রকৃতি সম্বন্ধীয়ই হোক, সবই ব্রহ্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বলে কিছুই নেই, সবই পারমার্থিক।

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইতি উপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি॥৩

অন্বয়: পশুষু যশঃ ইতি (পশুগণে যশরূপে); নক্ষত্রেষু, জ্যোতিঃ ইতি (নক্ষত্রসমূহে জ্যোতিরূপে); উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে); প্রজাতিঃ অমৃতম্ আনন্দঃ ইতি (সন্তানোৎপাদন রূপ অমৃতত্ব ও আনন্দরূপে [অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বত্র ও সব কিছুতে বিরাজিত একথা চিন্তা করে সুখী হও]); আকাশে সর্বম্ ইতি (আকাশকে সবকিছুর আশ্রয়রূপে [অর্থাৎ যা কিছু আকাশে বিদ্যমান তাই ব্রহ্ম]); তৎ (সেই [ব্রহ্ম]); প্রতিষ্ঠা (সর্ববস্তুর আশ্রয়); ইতি উপাসীত (এইভাবে তাঁর উপাসনা কর); [এইভাবে উপাসনা করার ফলে] প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি ([যে ব্যক্তি এভাবে উপাসনা করেন] তিনি সকল বস্তুর ধারক হয়ে ওঠেন); তৎ (সেই [ব্রহ্ম]); মহঃ ইতি (মহত্তমরূপে); উপাসীত (উপাসনা কর); [তা করতে করতে] মহান্ ভবতি ([উপাসক] মহান হয়ে ওঠেন); তৎ (সেই [ব্রহ্ম]); মনঃ ইতি উপাসীত (মনরূপে উপাসনা কর); [আর তা করলে] মানবান্ ভবতি ([উপাসক] চিন্তাশীল ও বিবেকী হয়ে ওঠেন)।

সরলার্থ: (সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্ম রয়েছেন যথা) প্রভূত প্রাণী-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির যশে, নক্ষত্রসমূহের আলোকে, জননেন্দ্রিয়ে অর্থাৎ সন্তান সন্ততির মাধ্যমে অমরত্ব লাভের আনন্দে। আকাশে সর্ববস্তুর আশ্রয়রূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন—এভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি এভাবে ব্রহ্মকে উপাসনা করেন তবে তিনি স্বয়ং সকল বস্তুর আশ্রয় হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মকে মহত্তম রূপে উপাসনা করা উচিত। যিনি সেভাবে উপাসনা করেন তিনি নিজেই মহত্তম হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মকে মনরূপে উপাসনা করা উচিত। যিনি তা করেন তিনি চিন্তাশীল মনের অধিকারী হন।

ব্যাখ্যা: তখনকার দিনে প্রাণী-সম্পদ বিশেষ করে গবাদি পশু ছিল ধন-সম্পদের প্রতীক। এই সেদিন পর্যন্তও তাঁকেই ধনী বলা হত যিনি অনেক গরু, ঘোড়া ও হয়তো কয়েকটি হাতির মালিক। সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির খ্যাতি তাঁর প্রাণী সংখ্যার ওপর নির্ভর করত।

সন্তানাদি লাভকেও সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করা হত। কারণ এক অর্থে সন্তানই মানুষকে অমরত্ব দান করে। সন্তানের মাধ্যমেই বংশধারা অব্যাহত থাকে। এই কারণেই সন্তান লাভে মানুষ এত আনন্দ লাভ করে থাকেন।

সমগ্র জগৎ এই ব্রহ্মের ওপর আশ্রিত। তাই উপনিষদ আমাদের বলছেন, ব্রহ্মকে সর্ববস্তুর আশ্রয়রূপে, অধিষ্ঠানরূপে চিন্তা কর। যিনি এভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি নিজেই সর্ববস্তুর আশ্রয় স্বরূপ হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ সাধক তখন ব্রহ্মই হয়ে যান।

একইভাবে, ব্রহ্মকে যদি 'মহ' তথা মহান বলে উপাসনা করা যায় তবে উপাসক নিজেই মহান হয়ে ওঠেন। আমরা একথা স্বীকার করি বা না করি কিন্তু এই ভাবনাটি সত্যিই অপূর্ব। আচার্য শঙ্কর মুদ্গল উপনিষদ (৩।৩) থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি'। অর্থাৎ, যিনি যেভাবে তাঁকে উপাসনা করেন তিনি

সেইভাবেই প্রাপ্ত হন—'যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ'। যিনি ঈশ্বরকে করুণার মূর্ত প্রতীকরূপে কল্পনা করেন তিনি নিজেই দয়ার সাগর হয়ে যান।

আমরা ঈশ্বরকে কোন বিশেষ রূপে ভজনা করি কেন? কারণ আমরা ঈশ্বরের সেই রূপটির মতো হতে চাই। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মতে : যদি আমরা কোন নির্দিষ্ট দেবতার চিন্তায় মগ্ন হই তবে আমরা ধীরে ধীরে তাঁর মতোই হয়ে উঠি। এ হয়ে ওঠা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকই নয়, শারীরিকও বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসাবে মহাদেব শিবের কথা মনে করা যাক। তিনি উদার, করুণাঘন, সতত ক্ষমাশীল, সরল এবং আত্মভোলা। আমরা শত দোষ করলেও তিনি তা ক্ষমা করে দেন। মনে করা যাক, আমি শিবের উপাসক এবং সারাক্ষণ তাঁরই স্মরণ-মনন করে থাকি। এর ফলে কালে আমি শিবের মতোই হয়ে উঠি। অর্থাৎ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তখন আমার মধ্যে ফুটে ওঠে।

মনে করা যাক, সাধক ব্রহ্মকে মনরূপে বা বুদ্ধিরূপে উপাসনা করেন। এর ফলে তাঁর মনের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বুদ্ধিমান হয়ে ওঠেন।

জীবাত্মা দেহ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা সীমাবদ্ধ। এসবের জন্যই আমরা নিজেদেরকে পরমাত্মার থেকে পৃথক বলে মনে করি। কিন্তু যখন আমরা দেহ, মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করি তখন আমরা পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যাই। আমাদের যেমন শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধির স্তর রয়েছে ব্রহ্মও তেমনি দেহ, মন ও বুদ্ধিরূপে রয়েছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মানুষের দেহ কোটি কোটি কোষের সমবায়ে গঠিত। যদিও এইসব কোষগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে তবুও তারা একটি দেহের অংশ। সেই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে কোষগুলিরও মৃত্যু ঘটে। দেহ ছাড়া কোষগুলি জীবিত থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে, মানুষ, উদ্ভিদ ও পশু সবই হল ব্রহ্মের সমষ্টি-শরীরের অন্তর্গত অগণিত কোষরাশি। কিন্তু এ হল ব্রহ্মের শারীরিক স্তর। এরপর হল মনের স্তর অর্থাৎ সমষ্টি-মন। আমাদের প্রত্যেকেরই মন আছে। কিন্তু এছাড়াও একটি সমষ্টি-মন আছে। আমাদের সকলের মন সেই সমষ্টি-মনেরই অন্তর্গত।

আমাদের এই অনন্ত সত্তাকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা নিজেদের এই ক্ষুদ্র দেহ মন নিয়েই মত্ত। কিন্তু হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করি আমার নিজের ভেতরেই চৈতন্যের বিভিন্ন স্তর রয়েছে যা ছিল এতদিন পর্যন্ত আমার অজানা। এই অবস্থায় আমরা অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করতে পারি যা এতদিন পর্যন্ত আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। বর্তমানে আমাদের মন হয়তো অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু যখন আমরা আমাদের 'কাঁচা আমি'-কে নিশ্চিহ্ন করে অহঙ্কারের পারে চলে যাই তখন আমরা এক উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই অবস্থায় আমরা নিখিল বিশ্বের সাথে এক হয়ে যাই।

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপোসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণেং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ।।৪

অন্বয়: তৎ নমঃ ইতি উপাসীত (তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধাসহ তাঁকে উপাসনা করা উচিত); অস্মৈ কামাঃ নম্যন্তে (এমন উপাসকের কাছে কাম্যবস্তু আপনিই আসে); তৎ ব্রহ্ম ইতি উপাসীতা (তাঁকে ব্রহ্মরূপেই উপাসনা করা উচিত); [যদি কেউ তা করেন] ব্রহ্মবান্ ভবতি (তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যান); তৎ (তাঁকে); ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ ইতি উপাসীত (ব্রহ্মের পরিমর [তথা আকাশ] হিসাবে উপাসনা করা উচিত); এনং দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (তাঁর প্রতি দ্বেষকারী শত্রু); পরি ম্রিয়ন্তে (বিনষ্ট হয়); যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ পরি [ম্রিয়ন্তে] ([এবং যারা তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তারাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়); সঃ যঃ চ অয়ং পুরুষে (এই দেহের মধ্যে যিনি আছেন); যঃ চ অসৌ আদিত্যে (যিনি সূর্যে আছেন); সঃ একঃ (তিনি সেই একই)।

সরলার্থ: পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে উপাসনা করা উচিত। যদি কেউ তা করেন তবে তাঁর যা কিছু কাম্য সবই তিনি লাভ করেন। তাঁকে পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে উপাসনা করতে হবে। এরূপ উপাসনার ফলে সাধক নিজেই পরম হয়ে ওঠেন (অর্থাৎ তিনি মহত্তম তথা ব্রহ্মই হয়ে যান)। তাঁকে আকাশরূপে উপাসনা করা উচিত যেখানে সকল নৈসর্গিক শক্তি (বৃষ্টি, বজ্রপাত) ব্রহ্মে লীন হয়। এই প্রকার উপাসনার ফলে উপাসকের বিদ্বেষকারী শত্রুদের মৃত্যু ঘটে অথবা তাঁর অপ্রিয় শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। যিনি এই দেহের অভ্যন্তরে রয়েছেন আর যিনি সূর্যের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা এক ও অভিন্ন।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ বলছেন যে, ব্রহ্মকে যদি 'নম' অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করা যায় তবে সমস্ত কাম্য বস্তুই উপাসকের আয়ত্তে আসে। কাম্য বস্তুগুলি যেন উপাসকের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে। সম্মান প্রদর্শন করে তারা যেন বলে ওঠে, 'আমরা তোমার আজ্ঞাধীন।' এ যেন ভাগ্যের পরিহাস। যখন অর্থ চাইছি তখন তা পাচ্ছি না, আবার যখন চাইছি না তখন তা পাচ্ছি। কিন্তু যখন আমরা একমাত্র ব্রহ্মকেই পেতে চাই অর্থাৎ তাঁকে বোধে বোধ করার জন্য মন যখন ছটফট করতে থাকে, তখন দেখা যায় সব কিছুই আমার দ্বারস্থ। এমন কেন হয়? কারণ ব্রহ্মই যে সব কিছুর উৎস।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন, আমরা সবাই ভিখারী। সবসময়ই আরো চাই আরো চাই করছি এবং সদা অপ্রসন্ন। আমরা আমাদের কামনা বাসনার দাস। কোন কিছু পেলেও আমরা তৃপ্ত হই না। আমরা আরো পেতে চাই। আমরা কখনই সন্তুষ্ট নই। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি সদাপ্রসন্ন। তিনি বলেন, 'আমি সব পেয়ে গেছি।' মূল কথাটি

হল, যিনি ব্রহ্মানন্দকে পেয়েছেন বিষয়ানন্দ তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হয়। এই তুচ্ছ বিষয়সকল তাঁর কাছে ভিড় করলেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে তা টলাতে পারে না।

একসময় মহাবীর আলেকজান্ডার এক ভারতীয় যোগীকে গ্রীস দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। কিন্তু কোন লোভই যোগীকে স্পর্শ করতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নিঃস্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন পূর্ণ। অর্থাৎ সবই তাঁর ছিল। কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। একটি ইংরেজি কবিতায় আছে: 'কিছুই নেই অথচ সবই আছে।' এমন মানুষ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা: 'কি নির্বোধই না মানুষটি। আদপে তাঁর কিছুই নেই অথচ মনে করছেন তাঁর সব আছে।' এখন প্রশ্ন হল, এঁদেরকে বোকা ভেবে যারা নিজেদের বুদ্ধিমান ও চালাক বলে মনে করে তারা সকলেই সুখী তো? তারা তৃপ্ত তো?

'তৎ ব্রহ্ম ইতি উপাসীতা ব্রহ্মবান্ ভবতি'—যিনি ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দটি শারীরিক অর্থে ব্যবহৃত। এ অবস্থায় সাধক মনে করেন তিনিই সর্বত্র রয়েছেন।

'ব্রহ্মণঃ পরিমর' কথার অর্থ হল ব্রহ্ম যেখানে 'সংহার' করেন। আচার্য শঙ্করের মতে, এটি হল আকাশ। যেহেতু বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি সব প্রাকৃতিক ঘটনা আকাশেই লীন হয় সেহেতু মনে হয় ব্রহ্ম যেন আকাশেই এগুলিকে সংহার করেন।

আচার্য শঙ্কর এখানে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলছেন: যখন ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ দুই-বোধ চিরতরে মুছে যায় তখন খাদ্যই বা কি আর খাদ্যের ভোক্তাই বা কে? দু-ই অভিন্ন। সাধকের তখন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি তীব্র অনীহা জাগে। একসময় স্বামী বিবেকানন্দ 'সবই ব্রহ্ম' এ কথাটি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে একটিবার স্পর্শ করেছিলেন মাত্র এবং তখনই স্বামীজী সর্বভূতে ব্রহ্মকেই দেখতে লাগলেন। কয়েকদিন ধরে এই আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্য স্বামীজীর পক্ষে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি খেতে বসেও দেখেন, তিনিও ব্রহ্ম আবার খাদ্যবস্তুও ব্রহ্ম। তাহলে তিনি নিজেই নিজেকে খান কি করে? আবার রাস্তায় চলাকালীন তিনি দেখতে লাগলেন যে, যানবাহন ও অন্যান্য সব বস্তুই ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্ম কেন ব্রহ্মের পথ থেকে সরে আসবেন?

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্কামান্নী কামরূপ্যনুসংচরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা৩বু হা৩বু হা৩বু।।৫

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতাঽস্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাঽভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাঽঽবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমাঽদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাঽম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ।।৬।। ইতি দশমোঽনুবাকঃ।।

অন্বয়: সঃ যঃ এবংবিৎ (যিনি একথা জানেন [অর্থাৎ পূর্ব-আলোচিত জ্ঞান যিনি অর্জন করেছেন]); অস্মাৎ লোকাৎ (এই জগৎ থেকে); প্রেত্য (ত্যাগ করে); এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য ([প্রথমে] নিজেকে অন্নময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন জেনে); এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য ([পরে] নিজেকে শ্বাস কর্মে তথা প্রাণময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন জেনে); এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য ([তারপর] নিজেকে মনোময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন জেনে); এতং বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্, উপসংক্রম্য (নিজেকে বিজ্ঞানময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন জেনে); [এবং পরিশেষে] এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য (নিজেকে আনন্দময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন জেনে); অনুসংচরন্ ইমান্ লোকান্ কামান্নী [অর্থাৎ, কাম + অন্নী] কামরূপী (তিনি ত্রিলোক বিচরণ করে নিজের রুচিমতো 'অন্ন' গ্রহণ করেন এবং নিজের খেয়াল খুশিতে কাজ করেন); এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে (সব কিছু নিয়ে আনন্দে এবং বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে তিনি গান করতে থাকেন); হা-আ-আ-বু হা-আ-আ-বু হা-আ-আ-বু (ওঃ। ওঃ। ওঃ)।

অহম্ অন্নম্ (আমিই খাদ্য! [বিস্ময় প্রকাশের জন্য তিন বার উচ্চারিত]); অহম্ অন্নাদঃ (আমি অন্নভোক্তা! [একই কারণে তিনবার উচ্চারিত]); অহং শ্লোককৃৎ (আমিই সেই, যে খাদ্য ও খাদককে একত্রিত করে [এর দ্বারা সজীব দেহ নির্মাণ করে] [একই কারণে তিনবার উচ্চারিত]); অহং প্রথমজাঃ ঋতস্য অস্মি (আমিই সেই, যে এ জগতে অন্য সব কিছুর [দৃশ্য এবং অদৃশ্য] পূর্বে জন্মেছিল); দেবেভ্যঃ পূর্বম্ (দেবদেবীগণের পূর্বে আমার জন্ম); অমৃতস্য নাভায়ী ([আমি-ই] অমৃতের আশ্রয়); যঃ মা দদাতি ([খাদ্য হিসাবে] যিনি আমাকে দেন [যাঁর খাদ্যের প্রয়োজন]); সঃ (তিনি); ইৎ এব (এইভাবে); মা আবাঃ (আমাকে রক্ষা করেন); অন্নম্ অদন্তম্ ([অন্যদিকে] যিনি অন্নদান করেন না [তাঁকে]); অহম্ অন্নম্ অদ্মি (আমি অন্নরূপে ভক্ষণ করি); অহং বিশ্বং ভুবনম্ অভ্যভবাম্ (আমি সমগ্র বিশ্বকে ভক্ষণ করি); সুবঃ ন জ্যোতীঃ (আমি সর্বদাই সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল); যঃ এবং বেদ (যিনি এ তত্ত্ব জানেন [তিনি পূর্বোল্লিখিত সুফল অর্জন করেন]); ইতি উপনিষৎ (এই তো উপনিষদ); ইতি দশমঃ অনুবাকঃ (দশম অধ্যায় এখানে সমাপ্ত)।

সরলার্থ: (৫-৬) যিনি এই জ্ঞান লাভ করেছেন (অর্থাৎ অন্ন এবং অন্নাদ, খাদ্য এবং খাদ্যের ভোক্তার একত্ব জ্ঞান) তিনি আর এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি

নিজেকে যথাক্রমে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই সময় তাঁর যেখানে যেতে ইচ্ছা করে সেখানেই যান এবং নিজের খেয়াল-খুশিমতো কাজ করেন। তখন তিনি ব্রহ্মানন্দে ভরপুর হয়ে যান। তাঁর এই আনন্দ ও বিস্ময়কে তিনি কতগুলি প্রায় অর্থহীন শব্দে প্রকাশ করেন: 'ওঃ! ওঃ! ওঃ! আমিই খাদ্য, আমিই খাদ্য, আমিই খাদ্য। আমিই ভক্ষক, আমিই ভক্ষক, আমিই ভক্ষক। আমিই খাদ্য এবং খাদ্যের ভোক্তাকে একত্রিত করি এবং এর দ্বারা সজীব দেহ সৃষ্টি করি। আমিই প্রথমজাত। দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় জগতের আমিই পূর্বসূরী। সুতরাং আমি দেবতাদেরও পূর্ববর্তী। আমিই মোক্ষ (অমরত্ব) দাতা। যিনি ক্ষুধার্তকে খাদ্যরূপে আমাকে দান করেন তিনি পরোক্ষভাবে আমাকেই রক্ষা করেন। কিন্তু আমাকে খাদ্যরূপে জেনেও যিনি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান না করেন তাঁকে আমিই খাদ্যরূপে আত্মসাৎ করি। আমি সমগ্র বিশ্বকে ভক্ষণ করি। সূর্যের মতোই আমি উজ্জ্বল এবং আমি জ্যোতিস্বরূপ।' উপনিষদ এই কথাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। যিনি উপনিষদের তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম তিনি পূর্বোক্ত ফল লাভ করে থাকেন।

ব্যাখ্যা: সাধককে স্থূল জড়জগৎ (খাদ্যের তথা অন্নময়) থেকে সূক্ষ্মতম জগতে (আনন্দের তথা আনন্দময়) পৌঁছতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। এ যাত্রা শুধু দীর্ঘই নয়, এ পথ দুর্গম ও কষ্টকর। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দ পেতে হলে এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

এই উপনিষদের শুরুতেই ভৃগু নামে এক যুবকের কথা বলা হয়েছে। ইনি তাঁর পিতা বরুণের কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন। ভৃগুকে বারবারই তাঁর পিতার কাছে আসতে হত। এবং প্রতিবারই পিতা ভৃগুকে কঠোর থেকে কঠোরতর তপস্যা করার নির্দেশ দিতে থাকেন। বরুণ এ পর্যন্তও বলেছিলেন যে, তপস্যাই ব্রহ্ম। উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যে কোন তফাৎ নেই তা বোঝাবার জন্যই পিতা পুত্রকে একথা বলেছিলেন। উপায় ঠিক থাকলে উদ্দেশ্য আপনিই উপায়কে অনুসরণ করে। দীপের আবরণকে সরিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গেই তার আলো দেখা যায়। অনুরূপভাবে অহঙ্কার ইত্যাদি অবিদ্যাজনিত নানা বাধা দূর হলে আমাদের সকলের অন্তরস্থ আত্মা তখন স্বমহিমায় নিজেকে প্রকাশ করেন। এর জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। তপস্যার দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। এই জন্যই বরুণ তাঁর পুত্র ভৃগুকে 'যাও এবং তপস্যা কর'—এই কথা বলে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

ভৃগু তপস্যা শুরু করলেন। প্রতিবারই পিতার কাছ থেকে ফিরে এসে ভৃগু নতুন প্রেরণায় তপস্যা শুরু করতেন এবং লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রথমে তিনি নিজেকে এই স্থূলদেহ (অন্নময়) বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তপস্যা

করার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে, দেহ ছাড়াও তাঁর একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব রয়েছে। তা হল প্রাণ (প্রাণময়) বা জীবনীশক্তি। এইভাবে তপস্যার দ্বারা তিনি স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। পরিশেষে তিনি আনন্দের সাথে এক হয়ে যান যা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ। সাধক যখন ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন তখন তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছেন বলতে হবে। তখন তিনি উপলব্ধি করেন, কেবলমাত্র তিনিই ব্রহ্ম নন। এ জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া এ জগতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এক বৈ দুই বলে কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন হল, যদি দুই বলে কিছু না থাকে তবে খাদ্য এবং খাদ্যের ভোক্তার ধারণাই বা এল কোথা থেকে? এ ধারণা তো দুই-বোধ থেকেই সৃষ্টি। অদ্বৈত তত্ত্ব বিরোধী এই দ্বৈতবাদের কথা এখানে এলই বা কেন? 'এক' কি কখনও 'বহু'র স্থান গ্রহণ করতে পারে?

এর উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলছেন, তপস্যার ফলে দ্বৈতদৃষ্টি দূর হয় এবং ধীরে ধীরে একত্বের বোধ জাগ্রত হয়। প্রথমে অন্ন (খাদ্য) ও অন্নাদকে (খাদ্যের ভোক্তা) দুটি পৃথক সত্তা বলে মনে হয়। কিন্তু নিপুণভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এই মুহূর্তে যা অন্ন পরমুহূর্তে তাই অন্নাদ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র শব্দ প্রয়োগে। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এক ও অদ্বিতীয় সত্তাই নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেন। মূলত আমরা সবাই এক এবং সেই 'এক' থেকেই সব কিছু এসেছে।

সাধক যখন এই একত্বকে বোধে বোধ করেন তখন তিনি জাতি, ধর্ম, দেশ, কাল ইত্যাদি সমস্ত বন্ধনের ঊর্ধ্বে চলে যান। এই নিখিল জগতের সবকিছুর সঙ্গে তিনি তখন একাত্ম বোধ করেন। তাঁর কাছে তখন সকলেই সমান। আনন্দের ঘনীভূত রূপই হচ্ছেন তিনি। এ-অবস্থায় সাধক তাঁর আনন্দ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পান না। এ আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। তাঁর মুখমণ্ডল সবসময় দিব্য স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত। সদা প্রসন্ন তিনি।

॥ ভৃগুবল্লী এখানেই সমাপ্ত ॥

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অন্বয়: অদঃ (সেই [অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম,কারণ-ব্রহ্ম]); পূর্ণম্ (পূর্ণ [সর্বব্যাপী]); ইদম্ (এই [নামরূপাত্মক দৃশ্যমান ব্রহ্ম, কার্য-ব্রহ্ম]); পূর্ণম্ (পূর্ণ [সর্বব্যাপী]); পূর্ণাৎ (পূর্ণ থেকে [কারণ-ব্রহ্ম]); পূর্ণম্ (পূর্ণ [কার্য-ব্রহ্ম]); উদচ্যতে (উদ্‌গত হন [যখন]); পূর্ণস্য (পূর্ণের [কার্য-ব্রহ্মের]); পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব); আদায় (গ্রহণ করলে [জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্ম হিসাবে]); পূর্ণম্ এব (কেবল পূর্ণই [কেবল ব্রহ্মই]); অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন); শান্তিঃ ([হোক] শান্তি [আধ্যাত্মিক]); শান্তিঃ ([হোক] শান্তি [আধিদৈবিক]); শান্তিঃ ([হোক] শান্তি [আধিভৌতিক])।

সরলার্থ: দৃষ্টির অগোচর যে ব্রহ্ম তা সর্বদাই পূর্ণ। আর নাম এবং রূপ নিয়ে যে ব্রহ্ম দৃষ্টিগ্রাহ্য, তাও পূর্ণ। দৃষ্টির অগোচর যে ব্রহ্ম সেটি 'কারণ'; আর নামরূপাত্মক যে ব্রহ্ম সেটি 'কার্য'। পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উদ্ভব (অর্থাৎ, কারণ থেকেই কার্যের উদ্ভব)। কারণ-ব্রহ্ম যদি পূর্ণ হয় তো কার্য-ব্রহ্মও পূর্ণ। অন্যদিকে যদি দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্রহ্ম পূর্ণ— একথা স্বীকার করে নিই, তাহলে তাকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, স্বীকার করতে হবে তাও পূর্ণ। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন এই, ওম্ কি অনন্ত এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতীক হতে পারে? বস্তুত ব্রহ্মের ক্ষেত্রে কোন প্রতীকই যথেষ্ট নয়। আদৌ কোন প্রতীক না থাকাই সবচাইতে ভালো। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ জীব, প্রতীক ছাড়া আমাদের পক্ষে কিছু চিন্তা করাই অসম্ভব। তাই ওম্ ব্রহ্মের প্রতীক হলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নয়। সব ধ্বনির প্রতীক এই ওম্, কারণ এর মধ্যে সব শব্দই ধরা আছে। এইজন্যই ওম্-কে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়। যদি ওম্-এ মন সংহত করা যায়, যদি ওম্-এর সঙ্গে নিজের একাত্মতা চিন্তা করা যায় তাহলে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব হয়।

'পূর্ণম্' শব্দটির অর্থ পূর্ণ বা অনন্ত। আর 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ বৃহত্তম। যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মই পূর্ণ, তাই 'পূর্ণম্' বলতে ব্রহ্মকেই বোঝানো হয়েছে। এই শ্লোকে 'পূর্ণম্' শব্দটির

পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে শ্লোকটি হবে ‘ওঁ ব্রহ্ম অদঃ ব্রহ্ম ইদম্’ ইত্যাদি।

‘অদঃ’ এই শব্দটি এসেছে সর্বনাম ‘অদস্’ শব্দ থেকে, যার অর্থ ‘সেই’। ‘সেই’-টি কি? ‘সেই’ শব্দের দ্বারা দৃষ্টির অগোচর যে অতীন্দ্রিয় জগৎ তাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে। ‘সেই’ বলতে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে বোঝায়। ব্রহ্মকে ‘সেই’ বলা হচ্ছে কারণ তাঁকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখতে বা বুঝতে পারি না। তিনি সর্বত্র আছেন, অথচ অপ্রকাশিত।

অনুরূপভাবে ‘ইদম্’ শব্দটির অর্থ ‘এই’ অর্থাৎ, যা ব্যক্ত, যা আমাদের সামনে উপস্থিত, যাকে আমরা দেখতে বা বুঝতে পারি। সুতরাং ‘ইদম্’ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বোঝাচ্ছে, যে জগৎ আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে।

‘অদঃ’ আর ‘ইদম্’ যেন দুটি জগৎ; অথবা বলা ভালো ঐ দুটি শব্দ দিয়ে একই জগতের দৃশ্য এবং অদৃশ্য এই দুটি দিককে বোঝানো হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় ব্রহ্মই কারণ, ব্রহ্মই কার্য অথবা ব্রহ্মই পরমাত্মা এবং ব্রহ্মই জীবাত্মা। একথা মনে করা ঠিক নয় ব্রহ্ম একটা পৃথক বস্তু, আর তিনিই জীবাত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। না, তা নয়। বস্তুত এক ব্রহ্মই ভিন্ন রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছেন। ব্রহ্ম কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত; কখনো তিনি দৃষ্টিগোচর, কখনো বা তিনি দৃষ্টির অগোচর। কিন্তু দেখি আর নাই দেখি, সব অবস্থাতেই ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান জগতেই আমরা ব্রহ্ম অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ দেখি। কিন্তু কখনো কখনো ব্রহ্ম যেন নিজেকে গুটিয়ে নেন, যেন আমাদের কাছে আত্মগোপন করেন। তখন আর আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তিনি তখন অব্যক্ত, অদৃশ্য। কিন্তু দেখতে পাই আর নাই পাই, ব্রহ্ম নিত্য, সর্বদাই রয়েছেন। যে কথাটি শাস্ত্র আমাদের বোঝাতে চাইছেন তা হল এই—যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম।

‘পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে’, এই স্থূল, প্রকাশমান জড়জগৎ, ওই অদৃশ্য ও অব্যক্ত জগৎ থেকেই এসেছে। এ যেন অনেকটা বীজ থেকে চারাগাছ অঙ্কুরিত হওয়ার মতো। আমরা হয়তো বীজটিকে দেখতে পাই না। কিন্তু সেটি ঠিকই আছে। নাহলে গাছটি এল কোথা থেকে?

‘পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে’, ধরা যাক ওই অদৃশ্য বা এই দৃশ্যমান জগৎ সরিয়ে নেওয়া হল। তাহলে কি অবশিষ্ট থাকল? ‘পূর্ণম্’, শুধু পূর্ণ, কেবলমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকল। সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে, রূপান্তর হচ্ছে; প্রতিনিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু ব্রহ্মের কোন বিকার নেই। তিনি স্থির হয়ে রয়েছেন, আর সেই প্রেক্ষাপটে কত কী-ই না ঘটে চলেছে। সবরকমের ক্রিয়া, সংযোগ ও বিয়োগ সবই ব্রহ্মের উপর আরোপিত। কিন্তু তিনি সব পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে। যেমন বহু নদীই সাগরে এসে মেশে, কিন্তু

তাতে সাগরের স্বভাব এতটুকু পালটায় না। যদি নদীগুলির প্রবাহ স্তব্ধও হয়ে যায় তবুও সাগর সাগরই থাকবে। ব্রহ্মের স্বভাবও সেইরকম।

আমাদের চারপাশে নিত্যই আমরা পরিবর্তন দেখতে পাই, কিন্তু সেসব পরিবর্তন এই স্থূল জগতের অন্তর্গত। ব্রহ্ম এইসব পরিবর্তনের দ্বারা তিলমাত্র প্রভাবিত হন না। তিনি জগতের অধিষ্ঠান, অপরিবর্তনীয় এক পরম তত্ত্ব। সেইজন্য যদি 'এই'কে, দৃশ্যমান জগৎ-রূপী কার্য-ব্রহ্মকে 'সেই' অদৃশ্য কারণ-ব্রহ্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবুও 'সেই' কারণ-ব্রহ্ম আগের মতো অনন্তই থাকবে। 'এই' বলতে বোঝায় নাম-রূপ-সম্পন্ন এই দৃশ্যমান জগৎ। এই জগৎকে সরিয়ে নেওয়া মানে এর ব্রহ্মনিরপেক্ষ পৃথক সত্তাকে স্বীকার না করা। অন্যভাবে বলা যায়, এই জগৎও ব্রহ্ম। কারণ সত্যি সত্যি জ্ঞান হলে তখন সর্বত্র এবং সর্বভূতেই ব্রহ্মদর্শন হয়। এমনকি 'এই' অর্থাৎ নামরূপাত্মক জগতেও ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে সাধক একাত্মতা উপলব্ধি করেন, নাম-রূপের আড়ালে সেই এক, অদ্বিতীয় পরম সত্তাকে তিনি অনুভব করেন। এরই নাম 'বৈচিত্রের গভীরে ঐক্য।' দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, একই সোনা দিয়ে হার, বালা বা অন্যান্য অলঙ্কার গড়ানো যেতে পারে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা রূপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সোনা সোনাই থাকে। ঠিক তেমনি ব্রহ্ম এই দৃশ্যমান জগৎরূপে ব্যক্তই হোন বা কারণরূপে অব্যক্তই থাকুন, ব্রহ্ম ব্রহ্মই। পরম বস্তু বা সত্তা একটাই এবং আমরা তাঁকেই ব্রহ্ম বলি। যদিও এটা ঠিক, তিনি সব নাম এবং রূপের ঊর্ধ্বে।

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু।
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

অন্বয়: [ব্রহ্ম যেন] নৌ (আমাদের [আচার্য এবং শিষ্য উভয়কে]); সহ (সমভাবে); অবতু (রক্ষা করেন); নৌ (উভয়কে); সহ (সমভাবে); ভুনক্তু (দান করেন [বিদ্যার সুফল]); সহ (সমভাবে); বীর্যং করবাবহৈ ([যেন আমরা] ব্রতী হই [বিদ্যার সুফল লাভের জন্য]); নৌ (আমাদের উভয়ের); অধীতম্ (অর্জিত বিদ্যা); তেজস্বি (ফলপ্রদ); অস্তু (হোক) মা বিদ্বিষাবহৈ (আমরা যেন কখনো পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি); শান্তিঃ ([হোক] শান্তি [আধ্যাত্মিক]); শান্তিঃ ([হোক] শান্তি [আধিদৈবিক]); শান্তিঃ ([হোক] শান্তি [আধিভৌতিক])।

সরলার্থ: ব্রহ্ম যেন আচার্য এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করেন। জ্ঞানের সুফল তিনি যেন সমানভাবেই আমাদের দান করেন। আমরা উভয়েই যেন জ্ঞানলাভের জন্য সমভাবে কঠোর শ্রমে ব্রতী হই। অর্জিত জ্ঞান যেন আমাদের উভয়ের পক্ষে সমভাবে ফলপ্রদ হয়। আমরা যেন পরস্পরকে হিংসা না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্যাখ্যা: 'সহ নৌ অবতু', আচার্য এবং শিষ্য উভয়েই প্রার্থনা করছেন : হে ব্রহ্ম, আপনি আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন।

'সহ নৌ ভুনক্তু', আমরা দুজনেই যেন এই অধ্যয়নের সুফল লাভ করতে পারি। কৃপা করুন যাতে এই বিদ্যা থেকে আমরা উভয়ে শ্রেষ্ঠ ফললাভ করতে পারি। 'ভুনক্তু' শব্দটির মূল হল 'ভুজ্', যার অর্থ উপভোগ করা। অর্থাৎ, আচার্য এবং শিষ্য, আমরা উভয়েই যেন উপনিষদ পাঠের যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

'সহ বীর্যং করবাবহৈ', আমাদের উভয়কেই বলবান ও বীর্যবান করুন যাতে নিষ্ঠার সঙ্গে উপনিষদ অধ্যয়নে আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি।

'তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু', অসীম আগ্রহ ও তেজের সঙ্গে আমরা যেন এই বিদ্যাচর্চা করতে পারি। আমরা যেন অমনোযোগী না হই, আন্তরিকতার অভাব যেন কখনো আমাদের না হয়। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পাঠ শুরু করা যাক। এই প্রার্থনা, যেন আমরা মূল বিষয়ের গভীরে ঢুকতে পারি।

'মা বিদ্বিষাবহৈ', কখনো কখনো ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহজ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়ে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। সেইজন্যই এই প্রার্থনা : আমাদের উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠুক। উভয়ের মধ্যে যদি ভালো সম্পর্ক থাকে, আচার্য এবং ছাত্র যদি পরস্পরকে ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন তবেই তাঁরা দ্রুত উন্নতি করতে পারবেন। ছাত্ররা যদি উদাসীন হয় তাহলে কেমন করে শিক্ষক তাঁদের শেখাবেন? সেক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হবেন। অথবা মেধাবী ছাত্রকে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক যদি তার কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তিনি ছাত্রটির উপর রুষ্ট হতে পারেন; তাকে ঈর্ষা করতে পারেন। তাই তাঁদের মিলিত প্রার্থনা : আমাদের সম্পর্ক যেন সুন্দর হয়, আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসতে পারি, সাহায্য করতে পারি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত। এই উপনিষদের সংকলক ঋষির নাম শ্বেতাশ্বতর। ‘শ্বেতাশ্বতর’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ শ্বেত অশ্বতর, অর্থাৎ ঘোড়া এবং গাধার মিলনে জাত সাদা রঙের একটি পশু। এর অর্থ এও হতে পারে, এমন একজন মানুষ যার একটি সাদা অশ্বতর আছে। আরেকটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য অর্থ হল, ‘শ্বেত’ অর্থাৎ শুদ্ধ, এবং ‘অশ্বতর’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ। আমরা জানি কঠ উপনিষদে (১।৩।৩-৯) শরীরকে রথ এবং আত্মাকে রথারূঢ় সারথির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ‘ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ’। তাঁরা বলেন এইসব ইন্দ্রিয় হল ‘হয় বা অশ্ব’। আমরা জানি ঘোড়াকে বশে রাখা কত দুরূহ কাজ। যদি ঘোড়াগুলিকে সংযত রাখা যায় তবে তারা বন্ধুর কাজ করবে, কিন্তু তাদের সংযত করতে না পারলে তারা তাদের খেয়ালখুশি মতো চলবে, যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাবে। তারাই হবে প্রভু, সারথি নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ঋষি শ্বেতাশ্বতর তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলেন। তাই তিনি শ্বেত অর্থাৎ শুদ্ধ। তিনি শুদ্ধ,পবিত্র এই অর্থে যে তিনি নিজেকে জয় করেছেন। নিজেই নিজের প্রভু।

এখন দেখা যাক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাণীটি কি? কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে এই উপনিষদের সূচনা। প্রশ্নগুলি এই : এই মহাবিশ্বের কারণ কি? কে আমাদের স্রষ্টা? আমরা কোথা থেকে আসি এবং পরিণামে যাবই বা কোথায়? কে আমাদের চালাচ্ছে? আমরা কখনো সুখী, কখনো বা অসুখী। এমন কেন হয়? এইসব প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মই এই মহাবিশ্বের কারণ। ব্রহ্মই চরম সত্য বা পরম তত্ত্ব। ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়, কারণ জগতে যত বস্তু আছে তিনিই সবকিছুর অন্তরাত্মা। নাম-রূপের বৈচিত্রের দরুন জীবাত্মাদের পরমাত্মা থেকে পৃথক বলে মনে হয়। এই নাম-রূপগুলি আর কিছুই নয়, উপাধি মাত্র। পরমাত্মার উপর আরোপিত বা চাপানো। বস্তুত জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, এক সত্তা। আমরা যখন উপলব্ধি করি যে আমরা স্বরূপত পরমাত্মা তখন জন্মমৃত্যু আর আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা জন্মমৃত্যুর পারে চলে যাই। উপনিষদ বলছেন, যেহেতু আমরা ব্রহ্ম তথা পরমাত্মাকে জানি না, সেই কারণেই জন্মমৃত্যুর চক্রে বারবার বাঁধা পড়ে অশেষ দুর্গতি ভোগ করি। বহু দেখাই বন্ধনের কারণ। এক দেখা, বহুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে এক, তাঁকে দেখলেই মুক্তি। সব বস্তুর মধ্যে এই যে একত্ব, তাকে জানা, এবং এই অদ্বয় জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি —

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু।
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥১

অন্বয়: ব্রহ্মবাদিনঃ (যাঁরা [ঋষিরা] ব্রহ্মজিজ্ঞাসু [একদা মিলিত হন এবং]); বদন্তি (পরস্পরকে প্রশ্ন করেন); ব্রহ্ম কিং কারণম্ (ব্রহ্ম কি এই জগতের কারণ); কুতঃ (কোথা থেকে); [বয়ম্ (আমরা)]; জাতাঃ স্ম (এসেছি); কেন (কার দ্বারা); জীবাম ([আমরা] পালিত); [অন্তকালে (শেষে)]; ক্ব (কোথায়); চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ (আমরা লীন হব); ব্রহ্মবিদঃ (হে ব্রহ্মবিদগণ); অধিষ্ঠিতাঃ (নিয়ন্ত্রিত); কেন (কার দ্বারা); সুখেতরেষু [সুখ ইতরেষু] (সুখ এবং দুঃখ বিষয়ে); [বয়ম্ (আমরা)]; ব্যবস্থাং বর্তামহে (নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন)।

সরলার্থ: ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিরা কোন এক সময়ে মিলিত হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন : ব্রহ্মই কি এই জগতের কারণ? আমরা কোথা থেকে এসেছি? সৃষ্ট হবার পর কে আমাদের পালন করেন? মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব? হে ব্রহ্মবিদগণ, কার বিধানে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করি?

ব্যাখ্যা: বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মিলিত হয়ে পরস্পরকে নানাবিধ প্রশ্ন করার একটা রীতি ভারতবর্ষে চালু ছিল। যেমন, এটি কেন? ওটি কেন? তাঁদের মধ্যে কে সবচাইতে বুদ্ধিমান অথবা কার পাণ্ডিত্য বেশি, সেটি জানার জন্যও অনেক সময় এসব প্রশ্ন করা হত। আবার অনেকে এভাবে নিজের বিদ্যেবুদ্ধিও জাহির করতেন। তাঁদের এইসব বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্ক শোনাও ছিল এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। একজন হয়তো গীতা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিলেন। তক্ষুণি আরেকজন বলে বসলেন, আমি গীতাকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে মনে করি না, আমি উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই। এমনি এক বিদ্বজ্জন সভার পটভূমিতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সূচনা। একজন পণ্ডিত অন্যান্য পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিং কারণং ব্রহ্ম?’ অর্থাৎ, ব্রহ্ম কি এই জগতের কারণ? যদি

তাই হয় তবে সে কারণের স্বরূপ বা প্রকৃতি কি? ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান কারণ অথবা নিমিত্ত কারণ? যেমন একটি টেবিলের উপাদান কারণ কাঠ আর নিমিত্ত কারণ সূত্রধর। ঠিক সেইরকম, এই বিশ্বের কারণ কোন্‌টি?

'কুতঃ স্ম জাতাঃ?' আমরা কোথা থেকে এসেছি? কেউ কেউ বলতে পারেন, এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে সময়ের অপব্যয় করা কেন? এসব প্রশ্ন অবান্তর। ওঁদের কাজকর্ম কিছু ছিল না, তাই এইসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতেন। কিন্তু না, তা নয়। এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এইসব বিষয়ের বিশ্লেষণ ছাড়া কোন সমস্যার গভীরে পৌঁছানো যায় না। মূল সমস্যা হল, আমরা কোথা থেকে এলাম?

'জীবাম কেন?' কে আমাদের প্রতিপালক? 'ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ?' মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব? তখন আমাদের কি অবস্থা হয়? কঠোপনিষদে নচিকেতাও যমের কাছে এই প্রশ্ন করেছিলেন : মৃত্যুর পর মানুষের কি গতি হয়? সে কোথায় যায়? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি সব শেষ হয়ে যায়? নাকি কিছু বাকি থাকে?

'অধিষ্ঠিতাঃ কেন?' কার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি? কে আমাদের ভাগ্যবিধাতা? কখনো আমরা সুখী, কখনো বা দুঃখী। কখনো সুখের মাঝে, কখনো দুঃখের গভীরে রেখে কে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে? কেউ বলতে পারে না, আমি সদাই সুখী। 'বর্তামহে ব্যবস্থাম্‌', আমরা যেন একটা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। যেন সবকিছুই পূর্বপরিকল্পিত, কেউ বা কোন কিছু যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আমি তো আমার প্রভু বা নিয়ন্তা নই। তা যদি হত, তবে আমি বলতাম, আমি সবসময় সুখে থাকব। সবসময় হাসব, আনন্দ করব। কিন্তু এমনটি তো ঘটে না। বাস্তবিক, আমি তো আমার প্রভু নই। তবে কে আমাদের চালাচ্ছে?

বিদগ্ধ জনেরা পরস্পরকে সম্মান করেন। তাই 'ব্রহ্মবিদ্‌' বলে সম্বোধন করছেন। ব্রহ্মবিদ্‌ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন। তাঁরা বিনীতভাবে বলেন, 'সত্য কি তা আপনি জেনেছেন। অনুগ্রহ করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার বিভ্রান্তি দূর করুন। কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা।
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥২

অন্বয়: কালঃ (কাল); স্বভাবঃ (বস্তুর স্বভাব [আগুনের যেমন তাপ]); নিয়তিঃ (কার্য-কারণের সম্বন্ধ); যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা); ভূতানি (পঞ্চভূত); পুরুষঃ (জীবাত্মা); যোনিঃ (কারণ); ইতি চিন্ত্যা (বিবেচনার বিষয়); এষাং সংযোগঃ (সবগুলি মিলিতভাবে); ন তু [যোনিঃ] (সংযোগের কারণ নয়); আত্মভাবাৎ (এভাবে সংহত করার জন্য আত্মার প্রয়োজন); সুখ-দুঃখহেতোঃ (সুখ-দুঃখের অধীন); আত্মা অপি (জীবাত্মাও); অনীশঃ (নিজের প্রভু নয়)।

সরলার্থ: কাল, বস্তুর স্বভাব, কারণ এবং তার কার্য, আকস্মিক ঘটনা, ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি মহাভূত অথবা জীবাত্মা, এই সবের কোনও একটি কি জগতের কারণ? এইটিই প্রশ্ন। (বস্তুত এর কোনটিই কারণ নয়।) উপরিউক্ত সবগুলি সমষ্টিগতভাবেও জগৎকারণ নয়, কারণ কেবলমাত্র জীবাত্মাই এগুলিকে একত্রিত করতে পারে। কিন্তু আবার (কর্মফলের জন্য) সুখ-দুঃখের অধীন কোন জীবাত্মাই নিজের প্রভু অর্থাৎ স্বাধীন নয়।

ব্যাখ্যা: 'ইতি চিন্ত্যা', বিষয়টি তাই ভালোভাবে, বারবার বিচার করে দেখা উচিত। কারণটি কি? 'কালঃ', কাল কি কারণ? অথবা 'স্বভাবঃ', বস্তুর নিজস্ব স্বভাব? অথবা কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার সমষ্টি, যার নাম 'নিয়তি', সেই কি তবে জগৎকারণ? অথবা 'যদৃচ্ছা', অর্থাৎ আকস্মিক ঘটনাই জগৎকারণ? বহু মানুষ বিশ্বাস করেন প্রাণের উদ্ভব একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। কতগুলি উপাদান আকস্মিকভাবে একত্রিত হওয়ার ফলেই অ্যামিবার উৎপত্তি। কিন্তু কি উপায়ে এটি সম্ভব হল তা কেউ জানে না। অথবা আকাশ, বাতাস, আগুন, জল এবং মাটি (ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি)— এই পঞ্চভূত মিলেমিশে কি এই জগতের উদ্ভব হয়েছিল? এগুলির কোন একটি কি জগৎকারণ (যোনিঃ)? পুরুষ বা জীবাত্মার ভূমিকাই বা কি? জীবাত্মাই কি স্রষ্টা? 'ইতি চিন্ত্যা', এইসব প্রশ্ন আমাদের মনে উঠেছে এবং তা তলিয়ে দেখা উচিত।

'এষাং সংযোগঃ', অথবা এতক্ষণ যেসব সম্ভাব্য কারণগুলির কথা বলা হল তাদের সকলের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলেই কি এই জগতের উদ্ভব? কিন্তু সেটাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ ঐ উপাদানগুলোকে একত্র করার জন্য একজন কর্তা থাকা দরকার। কেউ বলতে পারে জীবাত্মাই এই জগতের স্রষ্টা। কিন্তু মানুষ বড় দুর্বল, সে দাস। সে 'অনীশ' অর্থাৎ ঈশ বা প্রভু নয়। সুতরাং মানুষ কখনই পঞ্চভূতকে একত্রিত করে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। তাছাড়া মানুষ নিজেই সুখ-দুঃখের শিকার (সুখ-দুঃখ-হেতোঃ)। স্রষ্টা হলে সে আরও সুন্দর একটা জগৎ সৃষ্টি করত। অনেকে বলেন, 'ভগবান যদি এই জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে বলতে হবে তিনি খুব একটা উঁচুদরের শিল্পী নন, কারণ তাঁর সৃষ্টিতে অনেক খুঁত। আমি হলে তাঁর চাইতে অনেক সুন্দর একটা জগৎ সৃষ্টি করতাম।'

আমরা দেখছি এই জগৎটা ভালো আর মন্দ এই দুয়ে মেশানো। কখনো এখানে সুখ, কখনো দুঃখ। যখন আমরা সৌভাগ্যের তুঙ্গে উঠি তখন জগতে আমাদের চাইতে সুখী কে? কিন্তু হয়তো পরমুহূর্তেই আমরা দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হই, তখন আবার বলি, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমি শেষ হয়ে গেছি।' মানুষ স্রষ্টা হলে এমন হত না। সেক্ষেত্রে সে এমন একটা চমৎকার জগৎ রচনা করত যেখানে সে নিরবচ্ছিন্ন সুখ উপভোগ করতে পারে। সুতরাং উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে জীবাত্মা কখনো জগতের কারণ হতে পারে না। ঠিক সেইরকমভাবে এইখানে যেসব সম্ভাব্য কারণগুলির কথা বলা হল, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত কোনভাবেই তারা এই জগৎ সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

ব্রহ্মবাদীরা ভাবলেন বিষয়টি যেহেতু গভীর, এ ব্যাপারে তাঁদের আরও চিন্তাভাবনা করা উচিত।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥৩

অন্বয়: তে (তাঁরা [সেই ঋষিরা]); ধ্যানযোগানুগতাঃ (গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন [এবং তার ফলে]); অপশ্যন্ (দেখলেন); দেবাত্মশক্তিম্ (জ্যোতির্ময় পরমাত্মার শক্তি); স্বগুণৈঃ (নিজের [তিনটি] গুণের দ্বারা, নিজের মায়ার সাহায্যে); নিগূঢ়াম্ (ঢাকা [যে জগৎ তাঁর প্রকাশ তারই আড়ালে]); যঃ একঃ (এই পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয়); কালাত্মযুক্তানি (কাল এবং জীবাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত); নিখিলানি তানি কারণানি ([পূর্বে উল্লিখিত] সব কারণসমূহ); অধিতিষ্ঠতি (নিয়ন্ত্রণ করেন)।

সরলার্থ: ঋষিরা গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে দেখলেন জ্যোতির্ময় পরমাত্মার শক্তিই এই জগতের কারণ। মায়া তাঁর তিন গুণের সাহায্যে সেই পরমাত্মাকে যেন এই বিশ্বের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মাই 'পুরুষ' বা জীবাত্মা এবং পূর্বোল্লিখিত সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ব্যাখ্যা: মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কতগুলি যুগান্তকারী ঘটনা চোখে পড়ে। হঠাৎ একটা কিছু আবিষ্কার হল এবং তার ফলে সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। চাকা আবিষ্কারের কথাই ধরা যাক। ঐ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটা মোড় ফিরে

গেল। গোড়ার দিকে ঠিক কিভাবে এইসব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত। কিন্তু ঐসব প্রাথমিক আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বড় বড় জিনিস সব আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আবিষ্কারক হিসেবে বহু মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন। আমরা অনেকেই গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেছি। আপেল পাকলে মাটিতে পড়ে যায়, এটি অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাই কেন নিউটনের চোখে অসামান্য বলে প্রতিভাত হল? তিনি মনে মনে নিজেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন—'আপেল মাটিতে পড়ে কেন? কিছু কি তাদের নীচের দিকে টানে বা আকর্ষণ করে?' তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং হঠাৎ মনের মধ্যে উত্তরটি বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। মনের মধ্যে এইরকম হঠাৎ আলোর ঝলকানিকেই বলে Intuition বা স্বজ্ঞা। অধিকাংশ আবিষ্কারই সম্ভব হয়েছে এই জাতীয় স্বজ্ঞার মাধ্যমে। স্বজ্ঞা কি? না, স্বজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য এক জিনিস নয়। পাণ্ডিত্য দরকার ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে দরকার আরও কিছুর। মনের গভীর থেকে সত্য যখন আপনা-আপনিই ভেসে ওঠে তখন তাকে স্বজ্ঞা বলে। প্রশ্নের উত্তর প্রথম থেকেই ব্যক্তির মনের গভীরে প্রোথিত থাকে। কিন্তু তা আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু যেই মনকে ধ্যানের দ্বারা একমুখী করা হল, অমনি উত্তরটি চেতনার স্তরে ভেসে উঠল।

এখানেও আমরা দেখছি প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরের পর ঋষিরা ধ্যানমগ্ন হলেন। 'তে ধ্যানযোগানুগতাঃ', তাঁরা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তখন 'অপশ্যন্', তাঁরা দেখতে পেলেন। এই দেখা কিন্তু চাক্ষুষ দেখা নয়। তাঁরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করলেন এবং তাঁদের প্রশ্নের সদুত্তর পেলেন। এই হল আবিষ্কার। কি আবিষ্কার করলেন তাঁরা? 'দেবাত্মশক্তিম্'। এখানে 'দেব' শব্দটির অর্থ ঈশ্বর নয়। এর অর্থ স্বয়ং প্রকাশ। স্বয়ংজ্যোতি। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ। 'আত্মশক্তিম্', ব্রহ্মের 'নিজস্ব' শক্তি হল 'মায়া', সেই শক্তিবলে। কেমন করে এই জগতের সৃষ্টি হল? কোথা থেকে এর আবির্ভাব? ঋষিরা এই প্রশ্নটির যে উত্তর পেলেন তা এই ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা নিজের মায়াশক্তিবলে এই জগৎকে প্রকাশ করেছেন। জগৎরূপে ব্রহ্ম নিজেকেই প্রকাশ করছেন। ব্রহ্ম এবং মায়া দুটো পৃথক সত্তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি অভেদ। ব্রহ্ম যখন ব্যক্ত বা প্রকাশ, তখনি তাঁকে মায়া বলি। যখন অব্যক্ত, তখন তিনিই শুদ্ধ বা পরব্রহ্ম।

'স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্', এই মায়া নিগূঢ়। অর্থাৎ নিজের গুণ দিয়ে (স্বগুণৈঃ) নিজেকেই ঢেকে রেখেছেন (নিগূঢ়াম্)। অতএব এই আত্মশক্তি, এই মায়া নিজগুণের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। এই গুণ কি? সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। 'সত্ত্ব' হল শান্ত এবং সাম্য অবস্থা (balance) বা প্রজ্ঞা (wisdom); 'রজঃ' হল কর্মতৎপরতা বা অস্থিরতা এবং 'তমঃ' হল জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা।

এই পৃথিবীতে, এমনকি মানুষের মধ্যেও এত বৈচিত্র কেন? এর উত্তর, ঐ তিনটি গুণের জন্য। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ঐ তিন গুণের খেলা বই আর কিছুই নয়। গুণগুলি একটা আরেকটার উপর কাজ করে যাচ্ছে এবং এই কারণেই ব্রহ্মকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ব্রহ্ম যেন এই তিন গুণের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন।

‘যঃ কারণানি নিখিলানি তানি’, সকল কারণের কারণ। ব্রহ্মই সবকিছুর উৎস, সকল বস্তুর পরম কারণ।

‘কাল-আত্ম-যুক্তানি অধিতিষ্ঠতি একঃ।’ ‘একঃ’ এই শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ‘একঃ’ মানে এক। অর্থাৎ কেবলমাত্র এক-ই আছেন। যখন সেই এক আত্মপ্রকাশ করেন তখনি আমরা ‘বহু’ দেখি। যেমন, সূর্য একটাই, কিন্তু এই এক সূর্যের বহু প্রতিবিম্ব থাকতে পারে। খোলা আকাশের তলায় যদি বারোটি জলের পাত্র থাকে, তবে বারোটি পাত্রে সূর্যের বারোটি প্রতিবিম্ব পড়বে। প্রতিটি প্রতিবিম্বে আলাদা আলাদা সূর্যকে দেখা যাবে। কিন্তু বস্তুত একটি সূর্যই রয়েছে। ব্রহ্ম সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এক ব্রহ্মই সর্ববস্তুরূপে প্রতিভাত। তিনিই কাল, তিনিই জীবাত্মা আবার তিনিই পরমাত্মা। আগের শ্লোকে পণ্ডিতেরা পরস্পরকে প্রশ্ন করেছিলেন : কাল (সময়) অথবা জীবাত্মা, কোন্‌টি জগৎকারণ? উত্তরে উপনিষদ এখানে বলছেন : কাল, আত্মা এককথায় সকল বস্তুর উৎসই এই পরম ‘এক’। এই একই বহুরূপে প্রকাশিত। ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয় বস্তু সবকিছুই এই এক অর্থাৎ ব্রহ্মের উপর নির্ভর করে। ‘অধিতিষ্ঠতি’, ব্রহ্মই মহাবিশ্বের অধিষ্ঠান। উনিই সবকিছুর নিয়ামক।

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্‌॥৪

অন্বয়: একনেমিম্‌ (যেটি সাধারণ আবেষ্টনী বা প্রান্তভাগ [অথবা অবলম্বন, অর্থাৎ, মায়া এই মহাজাগতিক চক্রের আবেষ্টনী, এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল দৃশ্যমান জগতের সামগ্রিক পরিধি]), ত্রিবৃতম্‌ (তিন [গুণের] দ্বারা আবৃত); ষোড়শান্তম্‌ (ষোলটি অংশযুক্ত [পাঁচটি মহাভূত, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন]); শতার্ধারম্‌ (পঞ্চাশটি দণ্ড বা শলাকা সমন্বিত [যা এই মহাজাগতিক চক্রটিকে ধরে রেখেছে। এগুলি হল মায়াজনিত নানারকম ভুলভ্রান্তি ও বৈকল্য]); বিংশতি-প্রত্যরাভিঃ (কুড়িটি খুঁটি [যার উপর ভর করে শলাকাগুলি দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ, দশটি ইন্দ্রিয় এবং তাদের কার্যকলাপ]); ষড়্‌ভিঃ অষ্টকৈঃ

(বৈচিত্রময় ছয় রকমের অষ্টক); বিশ্ব-রূপ-এক-পাশম্ (নানারূপে একই বন্ধনের); ত্রিমার্গ-ভেদম্ (তিনটি পথ [যা প্রতীক জ্ঞান (জ্ঞান), পুণ্য (ধর্ম), এবং পাপ (অধর্ম)]); দ্বি-নিমিত্ত-এক-মোহম্ (আসক্তি [ইন্দ্রিয়ের প্রতি], দুই-এর একমাত্র কারণ [সুখ এবং দুঃখ]); তম্ (তাঁকে [ব্রহ্মচক্রে, মহাজাগতিক চক্র]); [অধীমঃ (আমরা ধ্যান করি)]।

সরলার্থ: ব্রহ্মচক্রের সাধারণ পরিধি বা প্রান্তভাগ হল মায়া যা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা আবৃত। এর ষোলটি অঙ্গ বা কলা (যথা—মন, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়)। এই ব্রহ্মচক্রের পঞ্চাশটি দণ্ড বা শলাকা (অর্থাৎ, মায়াজনিত প্রমাদ ও বৈকল্য), কুড়িটি খিল বা খোঁটা, ছয় শ্রেণীর বৈচিত্র যার প্রতিটি আবার আট প্রকারের। এইসব দণ্ড, খিল ও বিভিন্ন অংশ যেগুলি বহুবিধ বন্ধনের প্রতীক, তারই উপর ব্রহ্মচক্র দাঁড়িয়ে আছে। এই চক্রের বিচরণভূমি তিনটি (পুণ্য, পাপ এবং জ্ঞান)। ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তিই (সুখ-দুঃখের) মূল কারণ। আমরা সেই ব্রহ্মচক্রের ধ্যান করি।

ব্যাখ্যা: এখানে উপনিষদ ব্রহ্মকে এক বিশাল চক্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাচীন ঋষিরা স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁরা উপমা, প্রতীক বা রূপকের মাধ্যমে তাঁদের ভাব ব্যক্ত করতে ভালবাসতেন। তাঁরা তাই ব্রহ্মকে চক্ররূপে কল্পনা করেছেন, ব্রহ্মচক্র। এই চক্র মহাবিশ্বকে ধারণ করে রয়েছে। কি দেবতা, কি মানুষ, সকলেই এই চক্রে বিধৃত। সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, গ্রহ, তারকা সবকিছুই এই চক্রের অন্তর্গত। অর্থাৎ, ব্রহ্মই এই মহাবিশ্বের রূপ নিয়েছেন। কেমন করে? আগের শ্লোকে বলা হয়েছে, তাঁর নিজের যে মায়াশক্তি, তারই প্রভাবে। সেই মায়াই এই চক্রের পরিধি, নেমি বা প্রান্তভাগ। বাস্তবিক, বেড় বা বেষ্টনী না থাকলে চাকা অচল। সে চাকা চাকাই নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রহ্ম কি এই ব্রহ্মচক্র, এই বিশ্বের দ্বারা সীমিত? অথবা ব্রহ্ম বিশ্বাতীত? তার উত্তর এই, ব্রহ্ম যথার্থই বিশ্বাতীত। বিশ্ব ব্রহ্মের একটি ফুট্ মাত্র। ব্রহ্ম বিশ্বগতও বটে, বিশ্বাতীতও বটে, অর্থাৎ, বিশ্বের ভিতরেও আছেন, আবার বিশ্বের বাইরেও আছেন।

'ত্রিবৃতম্' বলতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকেই বোঝায়। 'বৃতম্' কথাটির অর্থ অবগুণ্ঠিত, আবৃত। ব্রহ্মকে দেখা যায় না কারণ তিন গুণের দ্বারা তিনি আবৃত। এই বিশ্ব তিন গুণের খেলা বই আর কিছুই নয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের যোগাযোগের উপরই এই বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে। তারপর 'ষোড়শ-অন্তম্', ষোলটি অংশ বা কলা অর্থাৎ ব্রহ্মচক্রের ষোলটি অংশ। পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন। প্রতিটি অংশই দরকারী, নাহলে বিশ্বের অস্তিত্বই থাকে না। প্রথমে মনের কথাই ধরা যাক। পঞ্চভূত ছাড়া মন কিছুতেই কাজ করতে পারে না। এই পাঁচটি ভূত কি কি? আকাশ (আকাশ),

বাতাস (বায়ুঃ), আগুন (অগ্নিঃ), জল (অপঃ) এবং মাটি (পৃথিবী)। আবার এই জগৎকে দেখতে এবং বুঝতে গেলে দরকার পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন্‌গুলি? চোখ (চক্ষুঃ), কান (শ্রোত্র), নাক (ঘ্রাণ), জিব (জিহ্বা) এবং চামড়া (ত্বক)। এগুলিও যথেষ্ট নয়। কাজ করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের, যেমন—কথা বলার জন্য চাই মুখ (বাক্), কোন কিছু ধরার জন্য হাত (পাণি), চলবার জন্য পা (পাদ), আবার মলত্যাগের জন্য মলদ্বার (পায়ু) এবং জননেন্দ্রিয় (উপস্থ)। সব মিলিয়ে এই হল বিশ্বের ষোলটি অংশ বা অঙ্গ।

এখন চাকা থাকতে গেলে দণ্ড, শলাকা বা শিক যাই বলা হোক না কেন, এগুলি থাকতেই হবে। চাকা হিসেবে এই ব্রহ্মচক্র অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মজবুত। এতে পঞ্চাশটি শলাকা আছে ('শতার্ধারম্', অর্থাৎ অর্ধশত বা পঞ্চাশ; 'অরম্' অর্থাৎ শলাকা)। এটি অবশ্যই কাল্পনিক। কিন্তু প্রতিটি শলাকারই একটি বিশেষ কাজ আছে। বস্তুত এগুলি আর কিছুই নয় —মনের অবস্থাবিশেষ। প্রথমত, মন থাকলেই ভুলত্রুটি থাকবে। ভ্রম (বিপর্যয়) আবার পাঁচ রকমের: আত্মপ্রীতি অর্থাৎ শুধু নিজেকে ভালোবাসা, আসক্তি, ঘৃণা এবং জীবনতৃষ্ণা অর্থাৎ বেঁচে থাকবার প্রবল ইচ্ছা ইত্যাদি। এই জগতে এত যে উত্তেজনা, সংঘাত, স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা এসব কেন? বিপর্যয় বা ভ্রমই এর কারণ। আর মায়া থেকেই যতকিছু বিপর্যয়।

এরপর আটাশটি ত্রুটি বা দুর্বলতার (আসক্তি) কথা বলা হচ্ছে। বলা হয়েছে নয় রকমের মিথ্যা তুষ্টির কথা। যেমন অনেকেই বলেন, 'আমাদের ভোগের জন্যই এই জগৎ; অতএব আমি চুটিয়ে ভোগ করতে চাই।' এইসব মানুষ একবারও তলিয়ে দেখেন না, কেনই বা তাঁরা এ জগতে এসেছেন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যই বা কি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন তাঁদের ভোগের জন্যই ভগবান যতকিছু সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জীবনের কোন অর্থ আছে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করা? যে পাঁচ রকমের বিপর্যয় বা ভ্রমের কথা বলা হয়েছে তারাই এই ধরনের মনোভাবের জন্য দায়ী, এবং যত কিছু বিপর্যয় তার প্রসূতিই হল মায়া।

এরপর রয়েছে আটটি অলৌকিক শক্তি বা 'অষ্টসিদ্ধি'। প্রথম, 'অণিমা'। এর প্রভাবে অণুর মতো ছোট হওয়া যায়। দ্বিতীয়, 'লঘিমা'। এর প্রভাবে মানুষ খুব হালকা হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়, 'প্রাপ্তি'। আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। এমনকি চাইলে হাত বাড়িয়ে চাঁদকেও ছুঁতে পারেন। চতুর্থ, 'প্রাকাম্যম্'। এর ফলে আপনি যা চাইবেন তাই পেতে পারেন। পঞ্চম, 'মহিমা'। পর্বতের মতো বিশাল হয়ে যেতে পারেন। ষষ্ঠ, 'ঈশিত্বম্'। এটা হল অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সপ্তম, 'বশিত্বম্'। অর্থাৎ, ইচ্ছামতো সবকিছু এবং

সকলকে বশ করার ক্ষমতা। অষ্টম, 'কামাবসায়িত'। অর্থাৎ, সব কামনা শেষ হল (অবসায়িত)। আপনি বললেন, 'আমি কিছুই চাই না।' বস্। মুহূর্তের মধ্যে আপনার যত কামনা সব উবে যাবে।

এইসব শক্তি মানুষের কাছে খুবই লোভনীয়। মায়া অত্যন্ত চতুর, চতুর্দিকে সে লোভের জাল বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ধর্ম বলতে এইসব যাদু বা অলৌকিকতা বোঝায় না। ধর্ম হল হওয়া। ধর্ম এমন একটা বিজ্ঞান যা অনুশীলন করলে মানুষ পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি নিজেকে বশ করতে পেরেছেন? যদি তা পেরে থাকেন তবে সেটাই হবে সবথেকে বড় অলৌকিকতা। সুতরাং এই পঞ্চ বিপর্যয় বা ভ্রম, আটাশটি আসক্তি, নয় রকমের তুষ্টি এবং অষ্টসিদ্ধি এইসব মিলে ব্রহ্মচক্রের পঞ্চাশটি দণ্ড।

অনেক সময় দেখা যায় চাকার একটা দণ্ড বা শলাকা আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু মায়া খুবই চালাক। ব্রহ্মচক্রের কোনকিছুই যাতে ঢিল হতে না পারে, তার জন্য কুড়িটি 'প্রত্যরস্' বা উপদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এগুলি হল দশটি ইন্দ্রিয় এবং তাদের কার্যকলাপ। এছাড়া চক্রে অন্যান্য এমন কলকবজা আছে যা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যেমন, 'অষ্টকৈঃ ষড়্ভিঃ', অর্থাৎ ছটি অষ্টক। যেমন মানবদেহের উপাদান 'ধাতু অষ্টক' (ত্বক, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র)।

'বিশ্বরূপ এক-পাশম্', মায়া নানারূপ ধারণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত বন্ধন একটিই। 'পাশম্' মানে বন্ধন। এই বন্ধনটা কি? বাসনা, বুদ্ধের ভাষায় 'তৃষ্ণা'। স্থূল বা জড় বস্তুর পেছনে আমরা ছুটে বেড়াই এবং ওটাই আমাদের সব কষ্টের মূল। তাই বহির্মুখী না হয়ে আমাদের অন্তর্মুখী হওয়া উচিত। এটিই শাস্ত্রের মূল বক্তব্য। আমাদের ভিতরের দিকে তাকাতে হবে। আমরা এখন জড়বস্তুর প্রতি আসক্ত; ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত। এই আসক্তি, এই বাসনার টানেই জগৎ চলছে। বাসনাই এখন আমাদের চালাচ্ছে; আমরা সম্পূর্ণভাবে বাসনার দাস আর সেইজন্যই আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। যদি কারও আসক্তি এবং বাসনা না থাকে তাহলে সে একেবারে অন্য মানুষ। সে মুক্তপুরুষ। জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও তার সম্পূর্ণ পালটে যায়। বস্তুত তখন তার কাছে আর জগৎই নেই। এই বিশ্বের মূল কারণ হচ্ছে এই 'এক পাশম্', বাসনা।

'ত্রিমার্গভেদম্', পথ তিনটি। জ্ঞানের পথ, ধর্মের পথ এবং অধর্মের পথ। এই তিনটি পথেই আমরা ঘোরাফেরা করি।

'এক-মোহম্' কি? আচার্য শঙ্কর বলছেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই এই মোহ। আমরা দেহের সঙ্গে হাত, চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির (জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়) সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন

ভাবি। আমরা ভাবি, এগুলি আমাদের বেঁধে রেখেছে। কিন্তু আমরা কখনই বদ্ধ নই। আমরা নিত্যমুক্ত। শরীর বা ইন্দ্রিয়—ওগুলি আমাদের সত্যিকারের পরিচয় নয়, ওগুলি আমাদের সীমিত করতে পারে না। ওগুলি সব আরোপিত, চাপানো জিনিস। 'এক-মোহম্' বলতে মিথ্যা জ্ঞানকেই বোঝাচ্ছে। আমরা যা নই, নিজেকে তাই ভেবে বসি। স্বরূপত আমরা দেবতা, কিন্তু আমরা নিজেদের অপদার্থ, অকর্মণ্য মনে করি। অজ্ঞানতাবশত যেহেতু আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি, সেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি আমাদের তীব্র আসক্তি। আর এই আসক্তিই 'দ্বি-নিমিত্ত' অর্থাৎ, সুখ এবং দুঃখ, আনন্দ এবং বিষাদের কারণ। সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই সুখ-দুঃখের পারে যাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। কেউ যদি বলেন, 'না, আমি শুধু সুখই ভোগ করব', তবে বলতে হয় এটা একটা অসম্ভব কথা। সুখ-দুঃখ দিন আর রাতের মতোই নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। একটার পর আরেকটা আসে। সুতরাং এই দুই-এর পারেই আমাদের যেতে হবে।

এই অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়? উদ্ধার পেতে গেলে ঐ ঋষিদের মতো আমাদেরও ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। কি বিষয়ে ধ্যান করব আমরা? স্বরূপের ধ্যান। বারবার নিজেকে শোনাতে হবে যে আমরা শুদ্ধ, শক্তিমান পরমেশ্বর। নিজেদের স্বরূপ জানতে পারলে, অর্থাৎ আমরা যে স্বরূপত ব্রহ্ম, একথা হৃদয়ঙ্গম করলেই আমাদের মুক্তি। এই শক্তির বাণীই উপনিষদের সারকথা।

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ॥৫

অন্বয়: পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্ (একটি নদীর পাঁচটি ধারা [যাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে]); পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাম্ (কারণরূপ পঞ্চভূতের সাহায্যে যা খরস্রোতা অথবা আঁকাবাঁকা হয়েছে); পঞ্চপ্রাণোর্মিম্ (যার তরঙ্গ হল পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়); পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ (যার উৎস মন, যা আবার ইন্দ্রিয়লব্ধ পাঁচ রকমের জ্ঞানেরও উৎস); পঞ্চাবর্তাম্ (মনের পাঁচটি ঘূর্ণি বা আবর্ত [শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ থেকে যাদের উৎপত্তি]); পঞ্চদুঃখৌঘবেগাম্ (পাঁচ রকমের দুঃখ মনোনদীর পাঁচটি তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ ঢাল [মাতৃগর্ভে থাকা, জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু]); পঞ্চাশদ্ভেদাম্ ([প্রায়] পঞ্চাশ রকমের পরিবর্তন); পঞ্চপর্বাম্ (পাঁচ রকমের ভাব [নদীতে, যার সঙ্গে মনের পাঁচটি ভাব অর্থাৎ অজ্ঞানতা,

আমিত্ব, আসক্তি, বিতৃষ্ণা এবং কোনকিছুর সাথে খুব বেশি জড়িয়ে পড়া]); অধীমঃ ([এই নদীরূপা মহাবিশ্বকে] আমরা ধ্যান করি)।

সরলার্থ: পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেন নদীর পাঁচটি ধারা। পঞ্চভূত জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপ নদীকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আঁকাবাঁকা ও খরস্রোতা করে তোলে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই নদীর তরঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উৎস যে মন, সেই মনই আবার এই নদীর উৎসমুখ। শব্দ প্রভৃতি অন্যান্য গুণ যেন এই নদীর আবর্ত এবং পাঁচ রকমের দুঃখ এই নদীর তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ ঢাল। এই নদীর পাঁচটি ভাব এবং পঞ্চাশ রকম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এর গতি। আমাদের একথা ভুললে চলবে না মনই বিচিত্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, যাকে আমরা জগৎ বলি, তার কারণ।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ এই বিশ্বকে নদীর সঙ্গে তুলনা করছেন। নদী সর্বদাই বইছে, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই জগৎ ও জীবনকে বোঝাতে সংসার শব্দটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। কারণ সংসার কথাটার অর্থই হল, যা সরে সরে যায়, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাই নদীর সঙ্গে বিশ্বের এই তুলনা খুবই যুক্তিসঙ্গত। নদীর পাঁচটি স্রোতোধারা, 'পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্'। এই ধারাগুলি কি? এগুলি হল— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই সদা চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের স্রোতোধারায় আমরা নিরন্তর ভেসে চলেছি।

'পঞ্চযোনি', নদীর পাঁচটি উৎস হল পঞ্চভূত (আকাশ, বাতাস, আগুন, জল ও মাটি)। এগুলিকে পঞ্চযোনি বলা হয়, কারণ এই পঞ্চভূতকে আশ্রয় করেই আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা। পঞ্চভূত ছাড়া আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই সম্ভব নয়। এদের 'উগ্র' অর্থাৎ শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর এবং বক্র অর্থাৎ বঙ্কিম বা জটিল বলা হয়। মহাভূতগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে একমাত্র যেখানে আমাদের নানাধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। কিছু অভিজ্ঞতা নিশ্চয় ভালো, কিন্তু অধিকাংশই জটিল এবং ভয়ানক।

'পঞ্চপ্রাণ-ঊর্মিম্'—'ঊর্মিম্' অর্থাৎ ঢেউ। এই নদীর ঢেউ হল পঞ্চবায়ু, যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। এই পঞ্চ প্রাণ বা বায়ু আমাদের ভেতরে নানান তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ক্রমাগত নানারকম চিন্তা ও অনুভূতির ঢেউ উঠিয়ে মনকে চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত করে। বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ এবং পায়ু—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই চঞ্চলতা ও বিক্ষেপ প্রকাশ পায়।

'পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলাম্'—'মূল' হল মন। পঞ্চবুদ্ধি অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি) মূল কারণ হল মন। এই ইন্দ্রিয়গুলির পেছনে আছে মন। মন ছাড়া এগুলি কোন কাজ করতে পারে না। মনই এদের চালায়।

'পঞ্চাবর্তাম্', পাঁচটি ঘূর্ণি বা আবর্ত। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ—এই পাঁচটি ঘূর্ণিই হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। একটা ভালো গান শুনে হয়তো আমি খুব আনন্দ পেলাম অথবা মন্দ কিছু শুনে বিচলিত হলাম। এইভাবে নানা বিষয়ে, নানাভাবে আমাদের মনে প্রতিক্রিয়া ঘটছে। এইজন্যই এগুলিকে 'আবর্তাম্' বলা হচ্ছে কারণ এগুলি আমাদের মনকে উত্তেজিত করে।

'পঞ্চদুঃখ', পাঁচ রকমের দুঃখ। প্রথম—মাতৃগর্ভে অবস্থান, দ্বিতীয়—ভূমিষ্ঠ হওয়া, তৃতীয়—জরা বা বার্ধক্য, চতুর্থ—ব্যাধি, পঞ্চম—মৃত্যু। এই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে, এটা মোটেই সুখকর নয়।

'পঞ্চ পর্বাম্', পাঁচটি ভাব যা বন্ধনের কারণ। এগুলি হল—অবিদ্যা, অহঙ্কার, আসক্তি, দ্বেষ এবং কোন কিছু নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি।

বাসনা নিয়েই আমাদের যত কিছু সমস্যা। ধরুন আমি বললাম, 'আমার এই একটিমাত্র ইচ্ছা আছে।' কিন্তু যে মুহূর্তে আমার এই বাসনাটি পূর্ণ হবে তার পরমুহূর্তেই আরেকটি বাসনার উদয় হবে এবং একটার পর একটা বাসনার ঢেউ চলতেই থাকবে। এইভাবেই আমরা মায়ার জালে ধরা পড়ি। কিন্তু কেন আমাদের এই বাসনা? তার উত্তর এই, আমরা আমাদের চিনি না। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না। একবার যদি আমরা জানতে পারি যে স্বরূপত আমরা ব্রহ্ম, আমরা পূর্ণ, তাহলে আমরা বুঝব যে সবই আমার ভেতরে আছে। বাইরের থেকে চাইবার আমার কিছুই নেই। এই জানাতেই আমাদের মুক্তি।

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥৬

অন্বয়: হংসঃ (জীবাত্মা); আত্মানম্ (নিজেকে); প্রেরিতারং চ (এবং নিয়ন্তা [অর্থাৎ পরমাত্মাকে]); পৃথক্ (আলাদা); মত্বা (মনে করে); অস্মিন্ (এই); সর্বাজীবে (সকল জীবের পালনকর্তা); সর্বসংস্থে (সকল জীবের গতি); বৃহন্তে (সেই বিশাল ব্রহ্মচক্রের চারপাশে); ভ্রাম্যতে (ভ্রমণ করে); তেন (তাঁর দ্বারা [পরমাত্মার]); জুষ্টঃ ([কৃপায়] পুষ্ট হয়ে); ততঃ (পরে); [সঃ (সে (জীবাত্মা])]; অমৃতত্বম্ (অমৃতত্ব); এতি (লাভ করে)।

সরলার্থ: যতক্ষণ জীবাত্মা নিজেকে পরমাত্মা (পরমেশ্বর) থেকে পৃথক মনে করে, ততক্ষণ ব্রহ্মচক্রের চারপাশে তাকে পরিভ্রমণ করতে হয়। (ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তার ভাগ্যের উত্থান-

পতন হতেই থাকে।) ঈশ্বরের করুণায় শেষ পর্যন্ত জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করে, তখনি তার মুক্তি। তাই যো সো করে জীবাত্মাকে এই একত্ব উপলব্ধি করতেই হবে। ঈশ্বর কৃপা করে তাঁর দিকে টানলেই এটি সম্ভব হবে।

ব্যাখ্যা: জীবাত্মা কিভাবে বদ্ধ হয় আর কিভাবেই বা মুক্ত হয় এখানে সে তত্ত্বটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'হংসঃ' শব্দটি তন্ত্রে জীবাত্মাকে বোঝাবার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো হংস বলতে 'রাজহংস'-কেও বোঝানো হয়। আবার একটা অন্য অর্থও আছে—ভ্রমণ করা। এর তাৎপর্য হল আমরা সকলেই যাত্রী বা পথিক। অনেক শাস্ত্রেই আছে আমরা জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিরন্তর ভ্রমণ করছি। কখনো মানুষরূপে, কখনো পশু হয়ে, কখনো কীটপতঙ্গ বা গাছপালা হয়ে। আমরা যেরকম জীবনযাপন করি, সেই অনুসারেই আমাদের রূপ তথা দেহের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যদি আমরা ভালো জীবনযাপন করি, সৎ কাজ করি, তবেই আমাদের ভালো বা উন্নততর জন্ম হতে পারে। বলাবাহুল্য, মানুষজন্মই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য স্বর্গের দেবদেবী হয়েও আমরা জন্মাতে পারি। কিন্তু অন্যান্য জন্মের মতো ঐ দেবদেবীর পদও সাময়িক। যে সৎকাজের ফলে স্বর্গে গেলাম সেই কাজের ফল ফুরোলেই আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। আবার প্রতিটি কাজকর্মের ব্যাপারে সতর্ক না হলে আমরা পশু হয়েও জন্মাতে পারি। আর এইভাবেই ব্রহ্মচক্রকে ঘিরে আমাদের পরিক্রমা নিরন্তর চলতেই থাকে।

কিন্তু কেন এই পরিক্রমা? উপনিষদ বলছেন, 'পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা'—আমরা মনে করি জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরের থেকে আলাদা। 'প্রেরিতারম্'-এর অর্থ যিনি চালান, অথবা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা ভাবি কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আমরা সেই শক্তি থেকে আলাদা। এই হচ্ছে আমাদের দুর্গতি। সেই নিয়ন্তাই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। যখন আমরা বুঝব যে আমরা মরণশীল জীব নই, আমরা স্বরূপত ব্রহ্ম, তখন আর আমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। তখন আমরা মুক্ত। 'মত্বা' মানে 'বিবেচনা করে' বা 'মনে করে।' আমাদের চিন্তা-ভাবনাই আমাদের ভাগ্য রচনা করে। অষ্টাবক্র সংহিতা (১।২) বলছেন, 'কিং বদন্তি ইহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ'—এই প্রবাদটি সর্বৈব সত্য। 'যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।' যদি আপনি নিজেকে সজ্জন মনে করেন, তাহলে সত্যিই আপনি ভালো হয়ে যাবেন; কিন্তু যদি আপনি নিজেকে খারাপ, নির্বোধ মনে করেন, তাহলে আপনি সত্যি সত্যিই খারাপ, নির্বোধ হয়ে যাবেন। এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে 'মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি'— যিনি নিজেকে মুক্ত মনে করেন, তিনি মুক্ত আর নিজেকে যিনি বদ্ধ মনে করেন, তিনি বদ্ধ। জীবাত্মা যদি

নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে করে, তাহলে ব্রহ্মচক্রের চারপাশে তাকে অবিরাম ঘুরপাক খেতেই হবে।

'জুষ্টঃ' মানে 'শেবিতা', অর্থাৎ, তুমি পুষ্ট কর, সবল কর। তুমি যে ব্রহ্ম, এই ধারণাটিকে তুমি পুষ্ট কর। যদি এই ধারণাটি দৃঢ়ভাবে তোমার মনে গেঁথে যায়, যদি তুমি এই ভাবটিকে ধরে থাকতে পার, তাকে শক্তিশালী করে তুলতে পার, তবেই তুমি এগিয়ে যেতে পারবে। তুমি উপলব্ধির পথে এগিয়ে চলেছ—এ যেন ঈশ্বর স্বয়ং তোমায় তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। এইভাবেই তুমি অমৃত হবে। 'অমৃতত্বম্ এতি', তুমি অমৃতত্ব লাভ করবে। তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। কখনো কখনো দুঃখ-কষ্ট এবং হতাশায় আমরা ভেঙে পড়ি। আমাদের ভুলটা হয় এইখানে—আমরা মানতে চাই না যে জীবনে ওঠা-পড়া আছেই। এই মুহূর্তে হয়তো আমি সাফল্যের তুঙ্গে, বিশ্ববিজেতা; কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি পরাজিত, বিপর্যস্ত। মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছি। এই জোয়ারভাটা চলতেই থাকে। কিন্তু আমাদের নিজেকে সামলাতে হবে, নিজেকে বলতে হবে, 'আমি ঠুনকো বায়ু-নির্দেশক যন্ত্র নই যে হাওয়ার তালে তালে আমাকে নাচতে হবে। আমার অসীম শক্তি। আমি সবকিছু অতিক্রম করতে পারি। আমিই আমার প্রভু। আমি মুক্ত। আমি ব্রহ্ম। আমি আনন্দস্বরূপ।' স্বামী বিবেকানন্দ বারবার এই আত্মশ্রদ্ধা, অটল আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

উপনিষদ তাই বলছেন, আমরা যে ব্রহ্ম এই ভাবটিকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করতে হবে। নিজেকে বারবার শোনাতে হবে আমরা দেহ নই। দেহের যাই হোক না কেন, সে নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আমরা সব ক্ষুদ্রতার, সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে। চিরকাল আমরা এই সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকব—একথা ভাবার কোন কারণ নেই। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা স্বরূপত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকে আলাদা কিছু নই। এই সত্য ভুলে গেলে দুঃখ আমাদের অনিবার্য। কখনো দেবতা-রূপে, কখনো মানুষ হয়ে, কখনো পশু বা কীটপতঙ্গ হয়ে বারবার জন্মমৃত্যু-চক্রে আমাদের আবর্তিত হতেই হবে।

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরাঃ যোনিমুক্তাঃ।।৭

অন্বয়: এতৎ (এই); পরমং তু ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম [বেদান্তে]) উদ্গীতম্ (বর্ণিত [কার্য-কারণ থেকে মুক্ত বলে]); তস্মিন্ (তাঁতে [ব্রহ্মে]); এয়ম্ (তিনটি [ভোক্তা, ভোগ্যবস্তু এবং নিয়ামক]

অন্তর্ভুক্ত); [তৎ (তিনি)] সুপ্রতিষ্ঠা (জগতের আশ্রয়); অক্ষরং চ (এবং অবিনাশী); ব্রহ্মবিদঃ (যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন); অত্র (এই জগতে); অন্তরম্ ([ব্রহ্ম] যিনি আমাদের সকলের অন্তরতম); বিদিত্বা (জেনে); তৎ-পরাঃ ([অর্থাৎ, ব্রহ্মে] অনুরক্ত হয়ে); ব্রহ্মণি লীনাঃ (ব্রহ্মে লীন হন); যোনিমুক্তাঃ (জন্মের এবং [মৃত্যুরও] পারে [যান])।

সরলার্থ: বেদান্তে পরব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। তিনটি উপাদান—ভোক্তা, ভোগ্যবস্তু এবং নিয়ামক এই ব্রহ্মের অন্তর্গত। এই অক্ষর ব্রহ্ম জগতের আশ্রয় এবং অবিনাশী। যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা জানেন যে এই ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র। ব্রহ্মই সকল বস্তুর অন্তরাত্মা একথা জেনে তাঁরা কালক্রমে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান; তাঁদের আর জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা: 'উদ্গীতম্' শব্দটির অর্থ বিবৃত বা বর্ণিত। সব শাস্ত্রেই বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম এই বিশ্ব, এই জড়জগৎ থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ ব্রহ্ম এই বিশ্বের মতো নয়। এই বিশ্ব পরিবর্তনশীল, এর লয়, ক্ষয় আছে। ব্রহ্ম কিন্তু অবিনাশী, অক্ষর। অর্থাৎ তাঁর কোন ক্ষয় নেই। তিনি অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি অধিষ্ঠান। তাঁরই উপর নিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগৎ অধ্যস্ত বা আভাষিত। ব্রহ্ম যেন এক স্থির সাদা পর্দা, যার উপর সিনেমার নানারকম ছবি আসছে, যাচ্ছে। কোন একসময় এই জগতের উৎপত্তি হয়েছিল; এবং যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এই জগৎও একদিন ধ্বংস হবে। কিন্তু ব্রহ্ম অনাদি এবং অনন্ত। একমাত্র ব্রহ্মই অক্ষয় এবং সেইজন্যই তিনি 'পরমম্' অর্থাৎ পরম।

এই ব্রহ্মই 'সুপ্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ ভিত্তি বা আশ্রয়। কিসের আশ্রয়? 'ত্রয়ম্' অর্থাৎ তিনের। তাৎপর্য এই যে তিনটি উপাদানের জন্যই আমাদের পক্ষে এ জগতে কোনকিছু ভোগ করা সম্ভব হয়। সেই তিনটি উপাদান হল 'ভোক্তা', 'ভোগ্য' এবং 'ঈশ্বর'। জীবাত্মাই ভোগ করে, তাই সে 'ভোক্তা' এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হল 'ভোগ্য', অর্থাৎ ভোগের জিনিস। যদি কোন দেখার বস্তু না থাকে তাহলে চোখ কাজ করতে পারে না। সুতরাং উপভোগের জিনিস বা ভোগ্যবস্তু থাকতেই হবে। তারপর ঈশ্বর। ঈশ্বর নিয়ামক। তাঁর এক নাম 'বিধাতা' কারণ তিনিই আমাদের কর্মফল বিধান করেন। ঈশ্বর সাক্ষীরূপে নেপথ্যে আছেন। তিনি জগতে লিপ্ত নন, অথচ তাঁর উপস্থিতিতেই জগৎ চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'শূন্যের আগে এক থাকলে, তবেই শূন্যের অর্থ হয়, এক না থাকলে শূন্য শূন্যই থাকে।' ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক কি তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। এক কথায়, ঈশ্বর ছাড়া এই জগতের কোন অস্তিত্বই নেই।।

'অত্র', অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। যার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত—দুই রকমের প্রকাশই আছে।

ব্রহ্মই অন্তর্নিহিত সত্তা। 'অন্তরম্', অর্থাৎ কিনা অন্তরাত্মা। তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই আছেন। যখন একথা জানা যায়, যখন জগৎকে শুধুমাত্র প্রতিভাস বলে বোঝা যায় অর্থাৎ প্রকাশ্য জগতের অন্তরালের যে পরম সত্তা, তাঁকে যখন জানা যায় তখন কি হয়? 'ব্রহ্মণি লীনাঃ'—তখন আপনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। মুণ্ডক উপনিষদ (৩।২।৯) বলছেন, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।৮

অন্বয়: ঈশঃ (ঈশ্বর); এতৎ সংযুক্তম্ (নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত); ক্ষরম্ (বিনাশী); অক্ষরং চ (এবং অবিনাশী); ব্যক্তাব্যক্তম্ (ব্যক্ত এবং অব্যক্ত); বিশ্বম্ (সমগ্র বিশ্বকে); ভরতে (ধারণ করেন); অনীশঃ আত্মা (জীবাত্মা); ভোক্তৃভাবাৎ (যেহেতু নিজেকে ভোক্তা মনে করে); বধ্যতে (বদ্ধ হয়); [কিন্তু] দেবং জ্ঞাত্বা (নিজেকে পরব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করে); সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়)।

সরলার্থ: 'ক্ষরম্' (বিনাশী) এবং 'অক্ষরম্' (অবিনাশী), ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়েই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যুক্ত এই কারণে যে ঈশ্বর দুয়েরই আশ্রয়। বস্তুত ঈশ্বরই এই জগৎকে ধরে আছেন। নিজের দৈবসত্তাকে না জানাতেই জীবাত্মা নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। ফলে সে বদ্ধ হয়। কিন্তু সেই জীবাত্মাই যখন নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন মুক্ত হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানি না, তাই আমরা এত দুঃখ ভোগ করি। আমাদের প্রকৃত পরিচয়, আমরা ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম হিসাবে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ কোন পরিবর্তনই আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা মুক্ত। আমরা দেহ নই। আমরা পরমাত্মা। আর পরমাত্মারূপে আমরা নির্বিশেষ, আমাদের কোন নাম নেই, কোন রূপ নেই। আকাশের মতো আমরা সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে ছড়িয়ে আছি। আমরা অদ্বিতীয়। এই একত্ব উপলব্ধিই জীবনের লক্ষ্য, এই উপলব্ধিই মুক্তি।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা
হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
এয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥৯

অন্বয়: দ্বৌ (উভয়ই); জ্ঞ অজ্ঞৌ (সর্বজ্ঞ এবং অজ্ঞ); অজৌ (জন্মরহিত); ঈশ-অনীশৌ (ঈশ্বর এবং দুর্বল জীব); ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তা (ভোক্তা এবং ভোগের বস্তু); অজা হি (জন্মরহিত); একা (প্রকৃতি, যিনি বিশ্ব প্রসবিনী); অনন্তঃ চ আত্মা (পরমাত্মা, যিনি অনন্ত); বিশ্বরূপঃ (বিশ্বের সব রূপই তাঁর রূপ); অকর্তা ([যদিও] নিষ্ক্রিয়); এয়ং যদা (যখন তিনটি [ভোক্তা, ভোগের বস্তু এবং ভোগ]); বিন্দতে ব্রহ্মম্ এতৎ ([সাধক] ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন [তখন তিনি মুক্ত হয়ে যান])।

সরলার্থ: সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অজ্ঞ জীব উভয়ই অজাত। জীবের ভোগের জন্য প্রকৃতি নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করেন। কিন্তু পরমাত্মা অসীম, তাই তিনি সাক্ষীস্বরূপ। ভোক্তা, ভোগ্যবস্তু এবং ভোগ স্বয়ং—অর্থাৎ 'জীব', 'প্রকৃতি' (মায়া) এবং ঈশ্বর (পরমাত্মা)—এই তিনই ব্রহ্মে একাত্ম। এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে জীব মুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা: 'জ্ঞ-অজ্ঞৌ'। পরমাত্মাই 'জ্ঞ' কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং জীবাত্মা 'অজ্ঞ', কারণ সে নিজের স্বরূপ জানে না। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুয়েরই জন্ম নেই। জীবাত্মার জন্ম নেই কেন? আমরা কি জন্মাইনি? উপনিষদ বলছেন, না, তোমার দেহের জন্ম হয়েছে এবং সেই দেহেরই মৃত্যু হবে। জন্ম-মৃত্যু বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা দেহের জন্ম, দেহের মরণ। তুমি জন্মরহিত এবং জন্মরহিত বলেই তুমি মৃত্যুরও অতীত। কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে এই দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এই দেহ ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকবে যতক্ষণ এর মধ্যে কাজ করার শক্তি থাকে; তারপরই শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ে। তখন স্থূল শরীরটিকে হয় পুড়িয়ে ফেলা হয় নয়তো সমাহিত করা হয় অথবা অন্য কোন ভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীর থেকেই যায়। তার আবার নতুন জন্ম হয়। সতেরটি উপাদান নিয়ে এই সূক্ষ্ম-শরীর। সেগুলি কি? মন, বুদ্ধি, পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম রূপ। ইন্দ্রিয়ের স্থূল রূপ শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয় কিন্তু সূক্ষ্ম রূপ থেকেই যায়। এই সূক্ষ্মদেহই আবার নতুন স্থূলদেহ গ্রহণ করে। কিরকম জন্ম হবে বা কি পরিবেশে জন্ম হবে তা নির্ভর করে জীবের পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে।

মায়াই 'অজা', কারণ প্রকৃতপক্ষে মায়াই ব্রহ্ম এবং সেই কারণে তাঁর জন্ম নেই। এই সংসারে মায়ার ভূমিকাটি খুবই মজার। মায়া ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুকে একত্র করে। ধরা যাক, আমি 'ভোক্তা' আর এই ফুলগুলি 'ভোগ্য'। মায়াই আমাদের একত্রিত করেছে এবং আমাকে

দিয়ে ভোগ করাচ্ছে। ফুলগুলির প্রতি আমি আকৃষ্ট হচ্ছি এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করছি। এরকমটি ঘটানোই মায়ার কাজ।

'অনন্তশ্চ আত্মা'। আত্মা বলতে এখানে জীবাত্মাকেই বোঝানো হচ্ছে। এই জীবাত্মা বস্তুত অনন্ত, অসীম। অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। তিনি 'বিশ্বরূপঃ' অর্থাৎ যা কিছু আমরা দেখি, সবই তিনি। সবই ব্রহ্ম। তিনি আবার অকর্তা, অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয়, কিছুই করেন না। তিনি সবসময় সাক্ষী হয়ে আছেন।

'ত্রয়ম্', তিনটি। এই তিনটি কি? ভোক্তা (যে ভোগ করছে), ভোগ্য (যে বস্তু ভোগ করা হচ্ছে, অর্থাৎ মায়া যা ভোগ সম্ভব করে), এবং ঈশ্বর। মায়ার শক্তিতেই ঈশ্বর (পরমাত্মা) এই জগৎ হয়েছেন। উপনিষদের মতে এই তিনটিই ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতার(৪। ২৪) একটি শ্লোকে এই একই কথা বলা হয়েছে। খাওয়ার আগে মঠের সাধুরা ঐ মন্ত্রটি আবৃত্তি করেন। মন্ত্রটি এই :

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

'ব্রহ্ম হবিঃ', এই ঘি (হবি) যা আমি আহুতি দিচ্ছি তা ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মাগ্নৌ', যে আগুনে আমি ঘি আহুতি দিচ্ছি তাও ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মার্পণম্', যে হাতার সাহায্যে আমি ঘি আহুতি দিচ্ছি তাও ব্রহ্ম। যা আহুতি দিচ্ছি তা কোথায় যাচ্ছে? ব্রহ্মে। সবই ব্রহ্ম। আমি যখন এই সত্য উপলব্ধি করি যে 'ভোক্তা' আমি, 'ভোগ্য' ফুল এবং যে শক্তি আমাকে এই ভোগ করাচ্ছে —এই তিনটিই ব্রহ্ম, তখনি আমার মুক্তি হয়ে যায়। আর এই মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥১০

অন্বয়: ক্ষরং প্রধানম্ ([প্রকৃতি] বা প্রধান-এর বিনাশ আছে); হরঃ (পরমেশ্বর [যিনি অজ্ঞানতা দূর করেন]); অমৃত-অক্ষরম্ (অমর এবং অক্ষয়); একঃ দেবঃ (সেই এক পরমাত্মা); ক্ষর-আত্মানৌ-ঈশতে (প্রকৃতি [ব্যক্ত জগৎ] এবং জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন); তস্য ভূয়ঃ চ অভিধ্যানাৎ (যদি বারবার তাঁর ধ্যান করা যায়); যোজনাৎ (এই সংযোগের ফলে); তত্ত্ব-ভাবাৎ (ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে); অন্তে (শেষে); বিশ্ব-মায়া-নিবৃত্তিঃ (মহামায়ার কর্তৃত্ব শেষ হয়)।

সরলার্থ: প্রকৃতি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বিনাশ আছে; কিন্তু পরমেশ্বর (পরমাত্মা যিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূর করেন) অমর এবং অক্ষয়। সেই পরমাত্মাই এই জগৎ ও জীবাত্মার নিয়ন্তা। তাঁর ধ্যান করে, ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের অভিন্নতা উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধি হলে তবেই মহামায়া জীবের বাঁধন খুলে দেন এবং তখনি সে মুক্তিলাভ করে।

'ক্ষরম্', অর্থাৎ যার ক্ষয় আছে। এখানে 'ক্ষরম্' বলতে জড়জগৎ বা প্রকৃতিকেই (প্রধানম্) বোঝাচ্ছে। কিন্তু এমন বস্তুও আছে যা অক্ষর বা অক্ষয়। তাঁকে 'অমৃত-অক্ষরম্' বলা হচ্ছে। তিনি অমর ও নিত্য, তিনিই পরমাত্মা। এই শ্লোকে উপনিষদ পরমাত্মাকে 'হরঃ' বলে সম্বোধন করছেন। কারণ তিনি ধ্বংস করেন। কি ধ্বংস করেন? অবিদ্যা, অজ্ঞানতা যা দুঃখের মূল। বারবার জন্মানো এবং বারবার মরা, এই জন্মমৃত্যু-চক্রের কারণই অবিদ্যা; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আমাদের সব সমস্যা এই অবিদ্যার অবসান হয়।

'ক্ষর-আত্মানৌ-ঈশতে'। জড়জগৎ এবং জীবাত্মা উভয়ই সেই এক ঈশ্বর (একঃ দেবঃ) বা পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (ঈশতে), এক পরমাত্মাই আমাকে এবং এই পরিবর্তনশীল জগৎকে চালান। এখানে 'দেবঃ' শব্দের অর্থ 'যা দীপ্তিমান, যা জ্যোতির্ময়', অর্থাৎ ব্রহ্ম।

'তস্য অভিধ্যানাৎ', উপনিষদ এরপর বলছেন, দেখ এই 'একঃ দেবঃ', এই পরমাত্মার সঙ্গেই ধ্যানে যুক্ত হও; জগৎকে ধ্যানের বিষয় করো না। জগতের নেপথ্যে যে ঈশ্বর তাঁরই ধ্যান কর। 'যোজনাৎ', ধ্যানের মাধ্যমে এই সংযোগের ফলে তুমি পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাবে। 'তত্ত্বভাবাৎ', তুমি আর ব্রহ্ম যে অভিন্ন সেটা জান। 'তত্ত্ব' মানে সত্য। কোন্ সত্য? আমি এই দেহ নই। 'ভূয়ঃ', বারবার, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই চিন্তা করতে হবে যে তুমিই ব্রহ্ম। এই ভাব একদিনে আসে না। নিরন্তর অভ্যাস করে করে এই ভাবটিকে আয়ত্ত করতে হয়। শ্রুতি বলেন, সাধনের তিনটি ধাপ—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। প্রথমে উপনিষদীয় তত্ত্ব শুনতে হবে (শ্রবণ)। কিন্তু তত্ত্বটি অতি গভীর। তাই কি তার অর্থ, কি তার তাৎপর্য, এ নিয়ে বারবার চিন্তা করতে হবে (মনন)। এরপর এই তত্ত্বটির উপর নিবিড়ভাবে ধ্যান করতে হবে (নিদিধ্যাসন)। তাই এখানে উপনিষদ বলছেন 'অভিধ্যান'—অর্থাৎ তুমিই যে ব্রহ্ম, জগৎ এবং তোমার আত্মা যে অভিন্ন, পরমাত্মাই যে জীবাত্মারূপে প্রকাশিত—এই তত্ত্বটিকে ধ্যান কর। এরপর 'যোজনা' অর্থাৎ, ধীরে ধীরে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম অনুভূতি। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান অভ্যাসের ফলে ক্রমশ এই উপলব্ধি হবে—না, আমি এই দেহ নই; দেহের যাই ঘটুক না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি আত্মা, নিত্যমুক্ত, আমি জন্মরহিত।

তখন কি হয়? 'বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ', বহুরূপী মায়ার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। সাধকের নিজের সব শৃঙ্খল, সব বন্ধন ঘুচে যায়। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করে তিনি মুক্ত

হয়ে যান।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ॥১১

অন্বয়: দেবং জ্ঞাত্বা (নিজেকে পরমাত্মা হিসাবে জানতে পারলে); সর্ব-পাশ-অপহানিঃ [ভবতি] (সব শৃঙ্খল খসে পড়ে); ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ (অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞতা-জনিত সব দুঃখ-কষ্টের ক্ষয় হয়); জন্ম-মৃত্যু-প্রহাণিঃ (তখন আর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই); তস্য অভিধ্যানাৎ (একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার ধ্যান করলে); দেহভেদে (মৃত্যুর পর); তৃতীয়ং বিশ্বৈশ্বর্যম্ (বিশ্বকর্তৃত্বের তৃতীয় অবস্থা লাভ, ['বিরাট' বা ব্যক্তি-শরীরের সমষ্টি এবং 'হিরণ্যগর্ভ' বা চেতন-মনের সমষ্টি—এই দুই অবস্থা পার হবার পর]); আপ্তকামঃ (আপনার মনে হয় সব পাওয়া হয়ে গেছে); কেবলঃ (একমাত্র আপনিই সর্বত্র বিরাজ করছেন)।

সরলার্থ: যখন কেউ পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর একাত্মতা উপলব্ধি করেন তখনি অবিদ্যাজনিত সকল বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান; তখন আর তিনি জন্মমৃত্যুর নিয়মে বাঁধা নন। কিন্তু কেউ যদি শুধু পরমাত্মার ধ্যানই করে যান, তাহলে মৃত্যুর পর তিনি তৃতীয় স্তরে উঠে যান —সেখানে তিনি এবং ঈশ্বর অভিন্ন। তখন তিনি পরম পরিতৃপ্ত, আপ্তকাম। তখন তিনি অনুভব করেন তাঁর যা কিছু পাওয়ার, সব পাওয়া হয়ে গেছে। তখন তিনি মুক্ত। (এইভাবে ধাপে ধাপে সাধক পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।)

ব্যাখ্যা: 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশ-অপহানিঃ'। যখন আপনি এই দেবকে (দেবম্), এই পরমাত্মাকে জানতে পারেন, তখন আপনার সব পাশ, দুঃখ এবং সব যন্ত্রণার অবসান হয়। জীবনে আমরা নানান দুঃখ-কষ্ট পাই, আবার কখনো একই সমস্যা অজস্র ডালপালায় পল্লবিত হয়ে এক জটিল রূপ ধারণ করে। 'যোগসূত্র' প্রণেতা পতঞ্জলির মতে, মূল দুঃখ পাঁচটি (পঞ্চক্লেশ), যথা — 'অবিদ্যা' (অজ্ঞানতা), 'অস্মিতা' (অহঙ্কার, আমিত্ব), 'রাগ' (আসক্তি), 'দ্বেষ' (ঘৃণা) এবং 'অভিনিবেশ' (জীবনতৃষ্ণা)। এই পঞ্চক্লেশের মূলোচ্ছেদ হলে, 'জন্ম-মৃত্যু-প্রহাণিঃ'— জন্মমৃত্যুচক্রে আমাদের যে আবর্তন তার পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন এই চক্র থেমে যায়।

'তস্য অভিধ্যানাৎ'। ঈশ্বরের ধ্যান করলে কি হয়? তখন আপনি 'তৃতীয়ম্'-এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। 'তৃতীয়ম্' (যার আক্ষরিক অর্থ তৃতীয়) বলতে ঈশ্বরকে বোঝায়। ঈশ্বরকে

এখানে ‘তৃতীয়ম্’ বলা হল কেন? ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার। কিন্তু যখন মায়াযুক্ত, তখন সগুণ বা গুণসম্পন্ন। এই সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ তিনটি— বিরাট বা স্থূলজগৎ, হিরণ্যগর্ভ— প্রথম সূক্ষ্ম প্রকাশ এবং ঈশ্বর। উপনিষদের বক্তব্য, আপনি যদি সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে করুণাময়, মঙ্গলময় মনে করে তাঁর ধ্যান করেন, তাহলে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর পর আপনি সবরকম দৈবীসম্পদ, দৈবী ঐশ্বর্য এবং দৈবীশক্তির অধিকারী হবেন। তখন মনে হবে মানুষ যা চায়, আপনি তার সবকিছুই পেয়ে গেছেন। কিন্তু এও ঠিক ঠিক মুক্তির অবস্থা নয়। একে বলে ‘ক্রমমুক্তি’ বা ধাপে ধাপে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকার পর আপনার মনে হবে যে, দেবতার পদমর্যাদা ও শক্তিও যথেষ্ট নয়। কারণ মুক্তি এখনও দূরে। আপনাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে; কারণ আপনাকে ‘কেবল’ হতে হবে; কৈবল্য লাভ করতে হবে, অদ্বিতীয় হতে হবে। আর একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই ‘কেবল’। এরকম একটা অবস্থা চিন্তা করাও খুব শক্ত কারণ সেখানে জগৎ বলেই কিছু নেই অর্থাৎ কোনরকম কোন প্রকাশ নেই।

এই শ্লোকে ‘জ্ঞান’ এবং ‘ধ্যান’-এর তফাত দেখানো হয়েছে। জ্ঞান হলে এখনি মুক্তি। কিন্তু ধ্যানে ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তিতে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি হয়; তখন সবকিছুই আপনার নাগালের মধ্যে, আপনি সবকিছুর অধীশ্বর। তখন আপনি পরিতৃপ্ত (আপ্তকামঃ)। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অবস্থা ‘কৈবল্য’, যেখানে কেবলমাত্র আপনিই আছেন, আর কিছু নেই। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হলে বা ব্রহ্মে লীন হলে তবে এই অবস্থা লাভ করা যায়।

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।।১২

অন্বয়: এতৎ (এই [ব্রহ্ম]); নিত্যম্ (সর্বদা); আত্মসংস্থম্ (নিজের আত্মারূপে); জ্ঞেয়ম্ (জানতে হবে); অতঃ পরম্ (এর থেকে উচ্চতর অবস্থা); ন হি কিঞ্চিৎ (আর কিছুই নেই); বেদিতব্যম্ (জানবার); ভোক্তা (যে ভোগ করে [জীব]); ভোগ্যম্ (যা ভোগ করা হবে [প্রকৃতি]); প্রেরিতারং চ (যিনি চালান [ঈশ্বর]); মত্বা (বিবেচনা করে); সর্বম্ (সবকিছু); প্রোক্তম্ (পূর্বে উল্লিখিত); ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ (এই তিনই ব্রহ্ম)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম যে অন্তরতম সত্তা, সর্বদা তিনি যে ভিতরে রয়েছেন, এ সত্য আমাদের জানতে হবে। এর চেয়ে উচ্চতর আর কোন জ্ঞান নেই। জীব (ভোক্তা), জগৎ (ভোগ্য),

এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর (প্রেরিতারম্)—এই তিনই যে ব্রহ্ম একথাটা জানতে হবে।

ব্যাখ্যা: 'আত্মসংস্থম্'। আমার ভেতরেই পরমাত্মা বিরাজ করছেন, কিন্তু আমি সেকথা জানি না। এ যেন কাঁধে গামছা রেখে গামছা খোঁজা! গামছা সর্বক্ষণ আমার কাঁধে আছে, কিন্তু সেকথা ভুলে গেছি। ঠিক সেইরকম ব্রহ্ম সর্বদাই আমার অন্তরেই আছেন। তিনি আমার বাইরে বা দূরে কোথাও নেই। অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম—শুধু আমি জানি না এই যা। 'শিব ধর্মোত্তর' থেকে আচার্য শঙ্কর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি সেখানে বলছেন—তাঁরা (যোগীরা) নিজেদের মধ্যে শিবকে দেখেন (শিব আত্মনি পশ্যন্তি), প্রতিমায় নয় (প্রতিমাসু ন)। অন্তরের শিবকে অগ্রাহ্য করে যিনি বাইরে তাঁকে খুঁজে বেড়ান, তিনি অনেকটা সেই মানুষটির মতো যিনি হাতের খাবার না খেয়ে কনুই চাটেন।

আমরা কেন ভিতরে তাকাই না? কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে (২।১।১) এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সহজাত ত্রুটি এই যে তারা সর্বদা বহির্মুখী। তারাই প্রতিবন্ধক। কিন্তু যদি কেউ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারেন, সেগুলিকে প্রত্যাহার করে অর্থাৎ বাইরের দিক থেকে গুটিয়ে এনে অন্তর্মুখী করতে পারেন, তবে নিজের ভিতরেই তিনি আত্মাকে দেখতে পাবেন।

'ন অতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ'। উপনিষদ বলছেন, এই পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানলে আর কিছু জানার বাকী থাকে না। এই জ্ঞানই চূড়ান্ত, পরম। এই জ্ঞান লাভ করলে আপনার সব পাওয়া হয়ে গেল। মুণ্ডক উপনিষদে দেখি (১।১।৩) ছাত্র আচার্যের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করছেন : 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—হে ভগবান, কি জানলে সব জানা হয়ে যায়। উত্তরে আচার্য বলছেন, ব্রহ্ম।

আপ্তকাম হলে ঠিক ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হয়েছেন। ব্রহ্মই ভোক্তা, ব্রহ্মই ভোগ্য এবং ব্রহ্মই সেই শক্তি যিনি আমাদের ভোগ করান। 'প্রেরিতারম্'। তিনিই খাদক, তিনিই খাদ্য এবং তিনিই ভোজনশক্তি। তিনভাবে তিনিই প্রকাশিত। হিন্দুদের ধারণা, এক ব্রহ্মই বহুরূপে প্রকাশিত।

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্ন
দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে।।১৩

অন্বয়: যথা (যেমন); যোনিগতস্য বহ্নেঃ মূর্তিঃ (আগুন যখন তার উৎস [কাঠে থাকে]); ন দৃশ্যতে (তাঁকে দেখা যায় না); লিঙ্গ-নাশঃ ন এব চ (তবুও তার চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে); সঃ (এই [অর্থাৎ, কাঠে আগুন]); ভূয়ঃ এব (আবার); ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ (দেখা যায় যখন দুটি কাঠের টুকরোকে পরস্পরের সাথে ঘষা হয়); তৎ বা উভয়ং বৈ ([আগুন আর তার বৈশিষ্ট্য] ওই দুইয়ের মতোই); [আত্মা] দেহে (এই শরীরে); প্রণবেন (বারবার প্রণব-মন্ত্র, অর্থাৎ ওম্ উচ্চারণের দ্বারা); [গ্রাহ্য (অনুভবযোগ্য হন)]।

সরলার্থ: আগুনের উৎস কাঠ। অর্থাৎ কাঠের ভিতরেই আগুন আছে। কিন্তু সেই আগুন তখনি দেখা যায় যখন একটি কাঠকে আরেকটি কাঠের সঙ্গে ঘষা হয়। সেইরকম পরমাত্মা আমাদের অন্তরে সর্বদাই আছেন। কিন্তু প্রণব বা ওম্-এর সাহায্যে যখন আমরা ধ্যান করি কেবল তখনি আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি।

ব্যাখ্যা: আগুন কাঠেই প্রচ্ছন্ন থাকে। 'যোনিগত' বলতে সেই সুপ্ত আগুনকেই বোঝাচ্ছে। আদিম মানুষ দুটি কাঠ ঘষেই আগুন জ্বালত। তারা জানতে পেরেছিল কাঠের মধ্যেই আগুন লুকিয়ে আছে। যদিও এমনিতে তা দেখা যায় না। বাস্তবিক, ঘর্ষণের দ্বারা যতক্ষণ না কাঠের ভিতর থেকে আগুন টেনে বার করা হচ্ছে ততক্ষণ আগুনের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাহিকাশক্তি এবং আলো দেবার ক্ষমতা, তাদের কোন প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাক আর নাই যাক, কাঠে আগুনের সম্ভাবনা আছেই। দুটি কাঠের একটিকে বলা হচ্ছে 'ইন্ধন', অন্যটিকে 'যোনি'। দুটিকে ঘষলে তবেই আগুন প্রকাশ পায় (গৃহ্যঃ)।

'তৎ বা উভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে।' অনুরূপভাবে, ব্রহ্ম এই দেহেই আছেন। এই মুহূর্তে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা সম্ভব। কখন? উপনিষদ উপমা দিয়ে বলছেন, আমাদের এই দেহ যেন একটা কাঠের টুকরো; দ্বিতীয় টুকরোটি হল প্রণব বা ওম্। প্রণবের ধ্যান করে দুটি কাঠকে যুক্ত করা যায়। 'ওম্' ব্রহ্মের প্রতীক। ব্রহ্মকে ধ্যান করা খুব শক্ত। কিন্তু যখন ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে ওম্-কে ধ্যান করা হয়, তখন ক্রমশ অনুভব করা যায় যে ব্রহ্ম আমারই অন্তরে আছেন, ঠিক যেমন কাঠে প্রচ্ছন্ন আগুন।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥১৪

অন্বয়: স্বদেহং কৃত্বা (নিজের দেহকে মনে কর); অরণিম্ (নীচের কাঠটির মতো); প্রণবং চ উত্তর অরণিম্ (এবং প্রণব [অর্থাৎ ওম্]-কে উপরের কাঠ); ধ্যান-নির্মথন-অভ্যাসাৎ ([জ্যোতির্ময় পরমাত্মার] ধ্যান কর, যেন দুটি কাঠ ঘষা হচ্ছে); দেবম্ (জ্যোতির্ময় পরমাত্মা);

পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ (এইভাবে দেখ তিনি যেন অন্তরের গভীরে লুকিয়ে আছেন [কাঠে লুকানো আগুনের মতো])।

সরলার্থ: দেহকে নিম্ন অরণি, অগ্নিমন্থ্ বা কাঠ এবং প্রণব তথা ওম্-কে ঊর্ধ্ব অরণি বলে ভাবতে হবে। ধ্যানের সময় ভাবতে হবে যেন দুটিকে ঘর্ষণ করা হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ধ্যান করলে অন্তরেই সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করা যাবে; যিনি অরণিতে অগ্নির মতো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

ব্যাখ্যা: আগুন জ্বালানোর সময়, বিশেষ করে যজ্ঞের আগুন জ্বালানোর জন্যে যে দুটি কাঠ ব্যবহার করা হয় তাদের অরণি বলা হয়। ঊর্ধ্ব অরণি হল প্রণব তথা ওম্ এবং নিম্ন অরণি—দেহ। 'নির্মথন', এই শব্দটি এসেছে 'মন্থ্' ধাতু থেকে যার অর্থ মন্থন করা। এখানে এর অর্থ জোরে ঘষা। সকলেই জানেন, কাঠে কাঠে ঘষামাত্রই আগুন বেরোয় না। বারবার এবং সজোরে ঘষলে তবেই আগুন পাওয়া যাবে। সেইরকম নিবিড় ধ্যানের অভ্যাস গড়ে তুলতে (অভ্যাসাৎ) হবে। গীতাতেও (৮।৮) বলা হয়েছে, অভ্যাসযোগের দ্বারাই লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় (অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন)। অভ্যাস, একটা মস্ত জিনিস।

এইভাবে সাধক যখন ধ্যান করতে থাকেন, তখন 'দেবং পশ্যেৎ'—সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায়। তিনি 'নিগূঢ়বৎ'—অন্তরের অন্তস্তলে লুকিয়ে আছেন। তিনি বাইরে নেই; আছেন আপনার ভিতরেই, কিন্তু লুকিয়ে আছেন। এইজন্যই মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।১) 'গুহাচরম্' বলা হয়েছে। তিনি যেন একটা গুহার মধ্যে থাকেন। আমাদের হৃদয় হচ্ছে সেই গুহা। বলা হয় 'হৃদয়গুহা'।

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাহত্মনি গৃহ্যতেহসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি॥১৫

অন্বয়: তিলেষু তৈলম্ ইব (ঠিক যেমন তিলের মধ্যে তেল থাকে); দধিনি সর্পিঃ (দই-এর মধ্যে ঘি); স্রোতঃসু আপঃ (নদীতে জল); অরণীষু চ অগ্নিঃ (এবং জ্বালানী কাঠে আগুন); এবম্ (ঠিক একইভাবে); যঃ সত্যেন তপসা এনম্ অনুপশ্যতি (যিনি সত্য এবং আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারা সেই পরমাত্মার অন্বেষণ করেন); অসৌ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে (তিনি নিজের আত্মার ভিতর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন)।

সরলার্থ: তিল পিষলে তেল পাওয়া যায়। দই মন্থন করলে মাখন ওঠে। শুকনো নদী খুঁড়লে জল পাওয়া যায়। আবার কাঠে কাঠে ঘষলে আগুন পাওয়া যায়। ঠিক সেইরকম, কেউ যদি সত্য এবং সংযম অভ্যাস করে পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হতে পারেন তবে তিনি নিশ্চয়ই পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করবেন।

ব্যাখ্যা: পরমাত্মা যে আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, এই তত্ত্বটি নিশ্চিতভাবে বোঝাবার জন্য উপনিষদ এখানে একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন তিলে তেল আছে। কিন্তু তিলের মধ্যে কি আমরা তেল দেখতে পাই? পাই না। তেল পেতে বা দেখতে গেলে তিলকে পিষতে হবে। তেমনি দইয়ে মাখন আছে ঠিকই, কিন্তু মন্থন না করলে সে মাখন পাওয়া যায় না। আবার শুকনো নদী দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সেখানে জল নেই; কিন্তু একটু খুঁড়লেই জল দেখা যাবে। অরণির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, ক্রমাগত ঘষে গেলে তার ভিতর থেকে আগুন বেরুবেই বেরুবে।

সেইভাবেই পরমাত্মা আমার, আপনার অন্তরে রয়েছেন (আত্মা আত্মনি)। সেখানেই তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর বলছেন, আমাদের 'নেতি নেতি' বিচার করতে হবে। অর্থাৎ এটা নয়, এটা নয়, এটা নয়। আমার প্রকৃত সত্তা যেন বহু উপাধিতে ঢাকা পড়ে গেছে। আমি ভাবি : 'আমি অমুক; এই আমার বংশপরিচয়; আমি লম্বা; আমি ধনী; আমি শিক্ষিত'— এইরকম অজস্র উপাধি। শঙ্কর বলছেন, এই উপাধিগুলো খাপ বা কোষের মতো যা পরমাত্মাকে ঢেকে রাখে। বিচার করে করে এই উপাধিগুলোকে সরাতে হবে। আমি কে? আমি কি এই দেহ না মন? না, আমি দেহ নই, আমি মনও নই। এইভাবে 'নেতি নেতি' করে শেষে উপলব্ধি হবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম।

কিন্তু এই উপলব্ধি কিভাবে হবে? 'সত্যেন তপসা', কৃচ্ছ্রসাধন ও সত্য পালনের মধ্য দিয়ে। সত্যের মধ্য দিয়েই পরমাত্মার সন্ধান করতে হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে : 'সত্য কি'? শ্রুতিতে (বেদে) সত্যের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া নেই। শ্রুতি শুধু বলেছেন, ব্রহ্মই সত্য এবং সত্যই ব্রহ্ম। বাস্তবিক, সত্যের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। আমরা আপেক্ষিক সত্য হয়তো বুঝতে পারি, কিন্তু যা আত্যন্তিক সত্য তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। স্মৃতি (পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র) অবশ্য সত্যের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং বলেছেন 'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তম্'—যা সকলের কল্যাণ করে তাই সত্য।

উপনিষদ বারবার যে ভাবটি আমাদের মনে গেঁথে দিতে চাইছেন তা এই, ব্রহ্ম আমাদের থেকে ভিন্ন নন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন, আত্মায় আমাদের জন্মগত অধিকার, এ আমাদের উত্তরাধিকার। এটি এমন জিনিস নয় যা আমাদের বাইরে থেকে

পেতে হবে। না, তা নয়। এই আত্মা নিত্য, আমাদের ভেতরেই আছেন। শুধু সেকথা আমরা জানি না। যে কোন প্রকারে এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে যে আমরা ব্রহ্ম, আমরা মুক্ত, আমরা শুদ্ধ। দেহটাকে 'আমি' মনে করেই আমাদের যত বিপত্তি। আমরা প্রায়ই অভিযোগ করি—'আমার মাথা ধরেছে' অথবা 'আমার জ্বর হয়েছে'। দেহ থাকলেই এসব অসুবিধা থাকবে, কিন্তু এগুলিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে। এখন আমরা নিজেদের যা ভাবি তা না ভেবে যদি আমরা ভাবতাম 'আমি ব্রহ্ম; আমি মুক্ত; আমি এই শরীর নই; এই শরীরের যাই ঘটুক, তা আমাকে স্পর্শ করে না', তাহলে আমাদের অবস্থা কত পালটে যেত, ভাবুন দেখি! আমরা যদি জানি একবার একথা যে আমরা অনন্ত, আমাদের অসাধ্য কিছু নেই, আমরা সবকিছু ও সবার ওপরে, তাহলে আমাদের মধ্যে সাহস, আত্মবিশ্বাসের বান ডাকবে। ঠিক সেই চেষ্টাই করেছেন উপনিষদ স্বরূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥
তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥১৬

অন্বয়: ক্ষীরে (দুধে); অর্পিতং সর্পিঃ ইব (যেমন ঘি নিহিত থাকে); সর্ব-ব্যাপিনম্-আত্মানম্ (সর্বব্যাপী আত্মা); আত্ম-বিদ্যা-তপো-মূলম্ (আত্মজ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা লাভ করা যায়); তৎ ব্রহ্ম-উপনিষৎ পরম্ (উপনিষদের দৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মই পরব্রহ্ম [বক্তব্যটিকে জোরালো করার জন্য অথবা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য পুনরুক্তি করা হচ্ছে])।

সরলার্থ: দুধের সবখানেই যেমন মাঠা বা মাখন ছড়িয়ে থাকে, তেমনি পরমাত্মা সর্বব্যাপী এবং সবকিছুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন। কেবল কৃচ্ছ্রসাধন ও তৈলধারাবৎ মননের দ্বারাই এই পরমাত্মাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। উপনিষদের মতে পরমাত্মাই পরম সত্য।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ আবার দই-এর মধ্যে মিশে থাকা মাখনের (অর্থাৎ ঘিয়ের) দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দইয়ের কোন্ অংশে মাখন থাকে? উপরে? না। দইয়ের সঙ্গে মাখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে (সর্বব্যাপিনম্)। আত্মাও সেইরকম সর্বব্যাপী যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। কিন্তু দেখি আর নাই দেখি, তিনি ছোটর থেকেও ছোট এবং বড়র থেকেও বড়, সবকিছুর মধ্যেই বর্তমান। তিনি আছেন তাই সব আছে। আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি সবই তিনি, সেই পরমাত্মা।

অজ্ঞানতার জন্যই আমরা এই পরমাত্মাকে চিনতে পারি না। এই অবিদ্যা দূর করতে গেলে আমাদের সত্যে সমর্পিত কঠোর জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এইভাবেই আমাদের চিত্তশুদ্ধি হবে। মনে পবিত্রতা আসবে। এখন আমাদের মন ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্ত। পরমাত্মাই যে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ আমরাই যে পরমাত্মা—এই সত্যের নিরন্তর ধ্যান ও আত্মসংযমের ফলে পরমাত্মা আপনিই আমাদের কাছে প্রকাশিত হবেন। এ যেন অনেকটা দই মন্থন করে লুকিয়ে থাকা মাখন তোলা। জীবনের উদ্দেশ্যই হল এই পরমাত্মাকে ভিতরে বাইরে দর্শন করা। কারণ একমাত্র পরমাত্মাই আছেন।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥১

অন্বয়: তত্ত্বায় (সত্যজ্ঞান লাভের জন্য); সবিতা (সূর্য); প্রথমম্ (সর্বপ্রথম); মনঃ ধিয়ঃ (মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে); যুঞ্জানঃ (কৃপা করে [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে তুলে দিন এবং] চালিত করুন [পরমাত্মার দিকে]); অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য (আগুনের আলোকপ্রদ শক্তি সংগ্রহ করে); পৃথিব্যা (জাগতিক সব বস্তু থেকে); অধ্যাভরৎ (সংহত করুন [আমার এই শরীরে])।

সরলার্থ: (সূর্যের কাছে এটি একটি প্রার্থনা—সূর্য যেন কৃপা করে সাধকের মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমাত্মার দিকে চালিত করেন। সাধারণত ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী, বাইরের বিষয় নিয়েই তারা মেতে থাকে। প্রার্থনা করা হচ্ছে তারা যেন অন্তর্মুখী হয়।) যখন কেউ সত্য লাভ করতে চান তখন তাঁকে প্রথমে এই প্রার্থনা করতে হয়—সূর্য যেন তাঁর মন ও বুদ্ধিকে পরমাত্মা অভিমুখী করেন। সাথে সাথে এই প্রার্থনাও করতে হবে, সূর্য যেন অগ্নির প্রকাশশক্তিসমূহ ঢেলে দিয়ে সাধকের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রোজ্জ্বল করে তোলেন, যাতে সাধকের দেহ পরমাত্মা উপলব্ধির যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

ব্যাখ্যা: এখন প্রশ্ন : পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে, কোন্ পথই বা আমরা বেছে নেব? উপনিষদ বলছেন, প্রথমে প্রার্থনা কর। কিন্তু কেন প্রার্থনা করব? ধরা যাক আমি অদ্বৈতবাদী, আমার বাইরে একজন ভগবান আছেন একথা আমি স্বীকার করি না। তাহলে কার কাছে আমি প্রার্থনা করব? শাস্ত্রের উত্তর—যতক্ষণ আপনি নিজেকে এই বিশ্বসংসার থেকে আলাদা মনে করবেন, যতক্ষণ আপনার একটা পৃথক দেহবোধ আছে, যতক্ষণ নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ বলে আপনি অনুভব করবেন ততক্ষণ আপনাকে প্রার্থনা করতেই হবে। এইজন্যই আমরা দেখি আচার্য শঙ্কর পর্যন্ত প্রার্থনা ও স্তব রচনা করেছেন এবং তীর্থদর্শনও করেছেন।

সবিতা বা সূর্যের প্রতি প্রার্থনা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। সবিতার কাছে কেন আমাদের প্রার্থনা? তার উত্তর এই, সূর্য এতই বিরাট, বিশাল, এতই শক্তিমান এবং আলোর উৎস যে সূর্যকে পরম দেবতা ও বিশ্বস্রষ্টার প্রতীকরূপে কল্পনা করা

আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। সূর্য ছাড়া কোন কিছুর বেড়ে ওঠা বা জীবনধারণ অসম্ভব। তাছাড়া এই জগৎই আমাদের আকর্ষণের প্রধান বিষয়, এই জগৎই আমাদের মনটাকে টেনে রেখেছে। যাতে এই জগৎ থেকে মনটা তুলে নিতে পারি তারজন্যই সূর্যের কাছে প্রার্থনা : 'হে সবিতা, এই আপাতমধুর জগৎ ত্যাগ করে আমি জগতের উৎস যে ব্রহ্ম তাঁর কাছে যেতে চাই। দেখো, ইন্দ্রিয়গুলি যেন জড়জগতে আমাকে টেনে না নামায়। দয়া করে তুমি আমার মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্রহ্মের সাথে যুক্ত কর।' বাস্তবিক, একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতে গেলে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্যজগৎ থেকে তুলে নিয়ে অন্তর্মুখ করতে হবে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ উলটো পথে, অর্থাৎ বাইরের দিকে ছুটছে। আমাদের সত্তার একটা অংশ হয়তো আমাদের একদিকে টানে, আরেকটা অংশ আরেকদিকে। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যদি খুব বেশি চঞ্চল হয়, সবসময় এদিক-সেদিক ছুটে বেড়ায় তাহলে ধ্যান করা অসম্ভব। তাই প্রার্থনা, আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যেন একসাথে চেষ্টা করতে পারে।

'অগ্নের্জ্যোতিঃ'—জ্যোতি, অর্থাৎ কোনকিছুকে প্রকাশ করার শক্তি আগুনেরই আছে। চোখ, কান, নাক ইত্যাদি আমাদের যত জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, সেগুলোর কাজই হল, প্রকাশ করা। আমার সামনে যদি কোন একটা জিনিস থাকে, তবে চোখের সাহায্যেই আমি তা দেখতে পাই। উপনিষদের বর্ণনা অনুযায়ী এক এক দেবতা, এক এক ইন্দ্রিয়ের কর্তা। একজন হয়তো চোখের দেবতা, আর একজন হয়তো কানের। সেইরকম অগ্নি চোখের দেবতা। অবশ্য এখানে অগ্নি, ইন্দ্রিয়গুলির যত বিশেষ বিশেষ দেবতা আছেন, তাঁদের সকলেরই প্রতীক। 'পৃথিব্যা' বলতে শরীরকে বোঝানো হয়েছে। যে পঞ্চভূত দিয়ে এই পৃথিবী তৈরি, সেই একই পঞ্চভূতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমাদের এই মানবদেহ। তাই প্রার্থনা, হে সবিতা, আমাদের শরীর এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে পরিচালিত কর যাতে তারা পরমজ্ঞানলাভে সচেষ্ট ও সমর্থ হয়। এই প্রার্থনা সার্থক হবে তখনি যখন ইন্দ্রিয়গুলি যথার্থভাবে সত্যকে প্রকাশ করবে।

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা।।২

অন্বয়: বয়ম্ (আমরা); যুক্তেন মনসা ([পরমাত্মায়] নিবদ্ধ মন দিয়ে); দেবস্য সবিতুঃ সবে (জ্যোতির্ময় সূর্যদেবের কৃপায়); সুবর্গেয়ায় (ধ্যানাদি কর্ম যার ফলে স্বর্গলাভ হয় [অর্থাৎ, পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়]); শক্ত্যা (একাগ্র হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব)।

সরলার্থ: জ্যোতির্ময় সূর্যদেবের কৃপায় আমরা পরমাত্মায় মন স্থির করব। ধ্যান ও অনুরূপ সাধনের দ্বারা আমরা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

ব্যাখ্যা: 'সবিতুঃ সবে'—সবিতার কৃপা অথবা অনুগ্রহে। 'সবে' অর্থাৎ আদেশ, অনুজ্ঞা, কৃপা অথবা অনুমতি। সূর্যদেব বা সবিতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন। তিনি আমাদের ধ্যানের অনুমতি দিয়েছেন। উপনিষদ কেন বলছেন, 'সবিতার অনুমতিক্রমে'? তার কারণ হচ্ছে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের এক একজন দেবতা আছেন যিনি ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেকথা আগের শ্লোকের ভাষ্যে বলা হয়েছে। এই ইন্দ্রিয়াধীশ দেবতারা আবার সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, 'হে সবিতা, আপনি দয়া করে দেখবেন যেন আমার ইন্দ্রিয়গুলি ও তাদের নিয়ামক দেবতারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন; ধ্যানের সময় তাঁরা যেন কোন বিঘ্ন না ঘটান। দেখবেন আমি যেন গভীরভাবে ধ্যান করতে পারি।'

সূর্যদেব এবার কৃপা করে আমাদের ধ্যানের অনুমতি দিয়েছেন। 'মনসা যুক্তেন', আমাদের মন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত। 'শক্ত্যা', অর্থাৎ যথাশক্তি, আমাদের সাধ্যমতো। যেহেতু সবকিছুই এখন অনুকূল, সেইহেতু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিসের জন্য চেষ্টা? 'সুবর্গেয়ায়', চরম আনন্দের জন্য। 'সুবর্গ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ স্বর্গ। কিন্তু আমরা জানি স্বর্গও ক্ষণস্থায়ী। স্বর্গ হয়তো আমাদের কিছু সুখ দিতে পারে, তবে সে সুখ ক্ষণিকের। এখানে উপনিষদ 'সুবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন পরমানন্দ অর্থে। স্বর্গ সেই আনন্দের একটা প্রতীক। যখন আমরা পরমাত্মাকে, নিজের স্বরূপকে জানতে পারি তখনি পরমানন্দ বা নিত্যানন্দের অধিকারী হই।

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥৩

অন্বয়: সবিতা (সূর্যদেব); মনসা যুক্ত্বায় (মনকে [পরমাত্মার] সঙ্গে যুক্ত করে); সুবঃ যতঃ (পরমাত্মা অভিমুখী); তান্ দেবান্ (মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে); ধিয়া (বিচারশক্তির সাহায্যে); দিবং বৃহৎ-জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ প্রসুবাতি (কৃপা করে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করান)।

সরলার্থ: সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে আমার মনকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করুন। তাহলে আমার ইন্দ্রিয়গুলি পরমাত্মার দিকে ধাবিত হবে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য যে বিচারশক্তির প্রয়োজন, তাও যেন সবিতা আমাদের দান করেন।

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফিরিয়ে যাতে তাদের অন্তর্মুখ করা যায় সেইজন্য সবিতার কাছে আরও একটি প্রার্থনা শেখানো হচ্ছে। 'সুবর্যতঃ', শঙ্করের মতে শব্দটির অর্থ হল ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরের বস্তু থেকে তুলে নিয়ে পরমাত্মার দিকে চালনা করা। 'সুবঃ' বলতে পরমাত্মাকে বোঝাচ্ছে, এবং 'যতঃ'-র অর্থ প্রবেশ করা বা অভিমুখী হওয়া। উপনিষদের মতে আত্মজ্ঞান লাভ, অর্থাৎ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানাই সবচেয়ে জরুরী। যতক্ষণ তা না জানছি, আমরা নিতান্ত অসহায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে বাইরের জগৎ থেকে মনকে গুটিয়ে না আনা পর্যন্ত আত্মজ্ঞান দুরস্থ! ইন্দ্রিয়সুখের আশায় মত্ত থাকলে অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বাদ পাওয়া অসম্ভব। তাই আমরা ঠিক কি চাই তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। উপনিষদ অবশ্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন (ঈশ উপনিষদ, ১) : 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', ত্যাগের দ্বারা আত্মচেতনায় দৃঢ় হও। ত্যাগ বলতে মূলত মনের ত্যাগকেই বোঝায়। একজন গরীব মানুষের কথাই ধরা যাক। সে হয়তো সোনাদানা না পরেও বাঁচতে পারে, ভালো-মন্দ খাবার না খেয়েও থাকতে পারে। এবং ঐরকম আরও অনেক কিছু ছাড়াই হয়তো তার চলে। কিন্তু তার ত্যাগ দৈহিক, মানসিক নয়। ওটা প্রকৃত ত্যাগ নয়। সত্যিকারের বৈরাগ্য হল অন্তরে ত্যাগ, যার ফলে ভোগের প্রতি মনে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। তাই উপনিষদ বারবার প্রার্থনা করতে বলছেন যাতে আমরা অনিত্য বস্তুর দিকে না ঝুঁকি।

তাই সবিতার কাছে আমরা আবার প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ব্রহ্ম উপলব্ধির উপযুক্ত করে তোলেন। এই উপনিষদেই পরে আমরা দেখতে পাব যোগাভ্যাস করলে কি হয়। যোগের ফলে আমাদের শরীর এবং ইন্দ্রিয়গুলি আমূল পালটে যায়। নিয়মিত সংযম অভ্যাস করে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্রহ্ম উপলব্ধির উপযুক্ত করে তোলা হয়। ব্রহ্মানুভূতির ফলে কারও কারও এমনও হয়েছে যে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। এরকম হওয়ার কারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলে যে অমিত শক্তি আসে, সেই শক্তির বেগ ধারণের উপযুক্ত শারীরিক প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে? 'আমি ঈশ্বরদর্শন করতে চাই বা আমি আত্মোপলব্ধি করতে চাই'—শুধু মুখে বললে কি হবে? তারজন্য চাই উপযুক্ত শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়; নাহলে অনুভূতির বেগ ধারণ করা সম্ভব হবে না। এইখানেই যোগাভ্যাসের প্রাসঙ্গিকতা। যোগাভ্যাসের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্রগুলি তীক্ষ্ণ ও মজবুত হয় এবং তাদের সাহায্যে আমরা আত্ম-অনুভূতি লাভ করতে পারি।

'ধিয়া' অর্থাৎ বিচারশক্তির সাহায্যে। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে মনকে গুটিয়ে নিতে হলে বিচার করা খুবই প্রয়োজন। দায়িত্ব আমাদেরই। নিজের বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। সবিতার কাছে প্রার্থনা জানাব ঠিকই কিন্তু নিজেদের ভূমিকাও সঠিকভাবে

পালন করতে হবে। কারণ বিচারের দ্বারাই মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে আমরা ব্রহ্মে প্রবেশ করি।

'করিষ্যতঃ', আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির পরমাত্মাকে প্রকাশ করার, আবিষ্কার করার ক্ষমতা আছে। আমরা আত্মায় প্রবেশ করতে চাই, আত্মাকে আবিষ্কার করতে চাই, তাইতো সবিতার কাছে আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে প্রস্তুত করে দেন, যাতে আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারি। 'প্রসুবাতি তান্', অনুগ্রহ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে পুষ্ট করুন, তাদের সাহায্য করুন। এইটিই সারার্থ।

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥৪

অন্বয়: [যে] বিপ্রাঃ (যেসব ব্রাহ্মণ); যুঞ্জতে (তাঁদের মনকে একাগ্র করতে পারেন); উত ধিয়ঃ যুঞ্জতে (এবং তাঁদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও [পরমাত্মায়]); [সেই ব্রাহ্মণেরা]; বিপ্রস্য (সর্বব্যাপী); বৃহৎ (মহান); বিপশ্চিতঃ (সর্বজ্ঞ); দেবস্য সবিতুঃ (সূর্যদেবের); মহী পরিষ্টুতিঃ [কর্তব্যা] (ভূয়সী প্রশংসা করা উচিত); বয়ুনাবিৎ (প্রাজ্ঞ); একঃ (অদ্বিতীয় [সবিতা]); হোত্রাঃ বিদধে (সব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন)।

সরলার্থ: যেসব ব্রাহ্মণ তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমাত্মায় কেন্দ্রিত করতে পারেন, তাঁদের সর্বব্যাপী, মহান এবং সর্বজ্ঞ সূর্যদেবের প্রতি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই সূর্যদেব প্রাজ্ঞ, অনন্য এবং তিনিই সবকিছু ঘটাচ্ছেন।

ব্যাখ্যা: 'যুঞ্জতে', একত্রিত বা সংযুক্ত করা। এই শব্দটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপনিষদ বারবার এটি ব্যবহার করেছেন। এখন আমরা যেন নিজভূমে পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। আমরা সম্রাট হয়েও ভিখারীর মতো আচরণ করছি। আমাদের মন এমনি যে সবসময়, এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও আবোল-তাবোল চিন্তায় ব্যস্ত। একমাত্র সুষুপ্তি অবস্থা ছাড়া আমাদের মন এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম পায় না। আমাদের মনে সর্বক্ষণই কোন না কিছুর স্মৃতি, আবেগ অথবা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢেউ উঠছে। উপনিষদ তাই বলছেন, দিনরাত টাকা-পয়সা, খাওয়া-দাওয়া আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা না করে মনকে ঈশ্বর অভিমুখী কর। চিন্তা করতে হয় তো পরমাত্মার কথা ভাব, নিজের দৈবীসত্তার কথা

চিন্তা কর। এই কারণেই উপনিষদ প্রার্থনা করতে বলছেন। কি সেই প্রার্থনা? যেন বাইরের জগৎ থেকে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তুলে নিয়ে তাদের পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি।

এই শ্লোকে এমন কয়েকজন ঋষির কথা বলা হয়েছে যে যাঁরা নিজেদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জগৎ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। প্রার্থনা এবং নিরন্তর অভ্যাসের মধ্য দিয়েই তাঁরা সফল হয়েছিলেন এবং তারজন্য সবিতার কাছে তাঁরা খুবই কৃতজ্ঞ। তাঁরা সবিতাকে 'মহী পরিষ্টুতিঃ' বা প্রভূত প্রশংসা করেছেন। যেহেতু সবিতা তাঁদের প্রার্থনা পূরণ করেছেন, তাঁদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম সার্থক করেছেন, সেইহেতু তাঁরা সবিতাকে এই বলে বন্দনা করেছেন যে তিনি বিশাল, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং অদ্বিতীয়।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥৫

অন্বয়: বাম্ (তোমরা উভয়ে [অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাদের অধীশ দেবতারা]); পূর্ব্যং ব্রহ্ম (সনাতন ব্রহ্মের [প্রতি]); যুজে ([আমি] নিবেদন করি); নমোভিঃ (নমস্কার করে); সূরেঃ পথি এব (জ্ঞানীব্যক্তিদের মাধ্যমে); বিশ্লোকঃ এতু (আমার প্রার্থনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক); যে দিব্যানি (সেইসব দিব্য); ধামানি (ধাম); আ-তস্থুঃ (নিবাসী); বিশ্বে (সকল); অমৃতস্য পুত্রাঃ (অমৃতের সন্তানেরা); শৃণ্বন্তু (শুনুন)।

সরলার্থ: হে আমার ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের অধীশ দেবতারা, আমি আপনাদের নমস্কার করি (অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে আমি আপনাদের সকলকে সনাতন ব্রহ্মে সমাহিত করি)। আমার এই স্তুতি জ্ঞানীদের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। অমৃতের পুত্রেরা এবং যাঁরা দিব্যধামে আছেন, তাঁরা সকলেই আমার কথা শুনুন।

ব্যাখ্যা: 'বাম্' শব্দটির অর্থ তোমরা উভয়ে। উভয় বলতে এখানে কাদের বোঝাচ্ছে? ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাদের নিয়ামক দেবতাদের। তাঁরা উভয়েই সেই ব্রহ্মে যুক্ত হয়েছেন যিনি নিত্য, সনাতন। আমরা সেই ব্রহ্মের উপাসনা করি।

এই শ্লোকেও সবিতার বন্দনা করা হচ্ছে। এই স্তুতি সর্বত্র প্রচারিত হোক। সকলেই এই স্তুতি শুনুক। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', নিত্য আনন্দের সন্তানেরা। এখানে 'অমৃত' বলতে

হিরণ্যগর্ভকে বোঝানো হয়েছে। আমরা সকলেই সেই হিরণ্যগর্ভের সন্তান। আমরা সকলেই স্বরূপত দেবতা।

বাস্তবিক, এটি এক অমূল্য মহাবাণী। এই পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে, যে যেখানেই থাকুন না কেন, সকলেই এই বাণী শুনুন। যেভাবেই হোক, দিকে দিকে এই বাণী ছড়িয়ে পড়ুক। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা প্রজ্ঞাবান তাঁরা বহুজনহিতায় এই মহাসত্যের প্রচারে সাহায্য করেন।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥৬

অন্বয়: যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে (কাঠ ঘষে যেখানে আগুন জ্বালানো হয়); যত্র বায়ুঃ অধিরুধ্যতে (যেখানে বাতাস বইছে না [অথবা, যেখানে তোমার শ্বাস নিয়ন্ত্রিত এবং সেইহেতু ইন্দ্রিয়াদিও]); যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে (যেখানে সোমরসের প্রাচুর্য); তত্র মনঃ সঞ্জায়তে (সেখানে মন অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখীই হয়)।

সরলার্থ: কাঠ ঘষে যেখানে আগুন জ্বালানো হয়, যেখানে বাতাস বয় না, যেখানে পাত্রগুলি সোমরসে পরিপূর্ণ, সেখানে মানুষের মন অন্তর্মুখী হয়ে পরমাত্মায় সংযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে জাগতিক কাজেই লিপ্ত হতে চায়।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক, আপনি একটা যজ্ঞ করছেন। সবকিছুই অনুকূল। হাওয়া নেই, যজ্ঞের আগুন সুন্দর জ্বলছে, এবং ভাণ্ডারে অফুরন্ত সোমরস মজুত আছে। কিন্তু এই যজ্ঞের তাৎপর্য আপনি জানেন না। দেবতাকে যে আবাহন করছেন তাতেও আপনার প্রাণের স্পর্শ নেই। আপনি সোমরস পানেই মত্ত। এককথায় যন্ত্রের মতো, ভাসাভাসাভাবে আপনি ক্রিয়াকর্ম করে যাচ্ছেন। ফলে আপনার যজ্ঞে সবিতা প্রসন্ন হচ্ছেন না এবং আপনার চিত্তশুদ্ধিও হচ্ছে না। বরং আপনার চিত্ত আরও বহির্মুখী হয়ে উঠছে, জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

আচার্য শঙ্কর এই শ্লোকের আরেকটি ভাষ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে 'অগ্নি' বলতে আমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন পরমাত্মাকেই বোঝানো হয়েছে কারণ তিনি দহন করেন। কি দহন করেন? অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং তার ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যু। 'বায়ুঃ অধিরুধ্যতে' বলতে এখানে প্রাণায়াম, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ বোঝাচ্ছে। এর অর্থ, আত্মসংযম বা চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ—তাও হয়। সংযমে চিত্ত শুদ্ধ হয় আর চিত্তশুদ্ধি হলেই জ্ঞান আপনা-

আপনি ফুটে ওঠে। এক, অদ্বয় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে তখন আপনি পরমানন্দে পূর্ণ হয়ে যান।

শাঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী এই শ্লোকে সাধনের একটি ক্রম দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ‘কর্ম’, কামনা পূরণের জন্য যাগযজ্ঞ ইত্যাদি। এর পরের ধাপ হল ‘প্রাণায়াম’ বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম। পরবর্তী ধাপ ‘সমাধি’, অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করা। এরপর ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই সেই—এই মহাবাক্যের উপলব্ধি ঘটে। এবং সবশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করে সাধক পূর্ণ হয়ে যান, ধন্য হন।

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ॥৭

অন্বয়: প্রসবেন সবিত্রা (যিনি জগতের উৎস, সেই সবিতার প্রসাদে); পূর্ব্যম্ (সনাতন); ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে); জুষেত (উপাসনা কর); তত্র (তাঁতে [ব্রহ্মে]); যোনিম্ (মন নিবিষ্ট); কৃণবসে (কর); তে (যাঁরা [তাই করেন]); পূর্তম্ (কুয়ো খোঁড়া, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ [যা দীর্ঘ জীবন, ধনসম্পদ অথবা সন্তানসন্ততি লাভের জন্য সকামভাবে করে থাকে, অথবা স্বর্গে অন্য কিছু লাভের প্রত্যাশায় করে]); ন হি (একেবারেই হবে না); অক্ষিপৎ (বন্ধনের কারণ)।

সরলার্থ: সাধক জগতের উৎস সবিতার কৃপাপ্রার্থী হয়ে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হবেন। তাহলে আর তাঁকে ইষ্টপূর্তাদি অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক কাজের বন্ধন এবং জগতের বন্ধনে বাঁধা পড়তে হবে না।

ব্যাখ্যা: সবিতার আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের সাধনা শুরু করতে হবে। নাহলে এমন সব কাজে জড়িয়ে পড়বার প্রলোভন আসতে পারে যার দ্বারা বড়জোর ইহলোকে বা সুরলোকে ইন্দ্রিয়সুখ পাওয়া যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। এই কারণেই আমরা সবিতার বন্দনা করি। তিনি ‘প্রসবেন’ অর্থাৎ সব সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে স্রষ্টা বলা হয় কারণ তাঁরই শক্তিতে, তাঁরই আলোয় এই পৃথিবীর সবকিছু বেঁচে থাকে ও বেড়ে ওঠে। সবিতার কাছে আমাদের প্রার্থনা পরম লক্ষ্য ছাড়া আর অন্য কিছুর দ্বারা যেন আমরা প্রলুব্ধ না হই। সবিতার প্রসাদে আমরা অনাদি এবং সনাতন ব্রহ্মের উপাসনায় মনোনিবেশ করতে পারি।

হিন্দুদর্শনের অনেক শাখাপ্রশাখা। খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধও আছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সবাই একমত। প্রত্যেকেই স্বীকার করেন জীবনের লক্ষ্য মোক্ষ বা নির্বাণলাভ। তাঁরা কুমোরের চাকের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। ঘট তৈরির সময় সে ক্রমাগত তার

চাকটি ঘোরাতে থাকে। কিন্তু যেই তার কাজ শেষ হল অমনি সে চাকটি ছেড়ে দেয়। কুমোরের দেওয়া শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত চাকটি বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতেই থাকে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে সেটা থেমে যায়। আমরাও সেই চাকের মতো জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে মরছি। আমরাই চাকটি ঘুরিয়েছি, তাই কিছুকাল সেটি ঘুরবে। কিন্তু আর যদি নতুন করে ঠেলা না দিই, তবে একদিনেই হোক, এক সপ্তাহেই হোক অথবা আরও পরে, ঘোরা তার থামবেই। জন্ম আর পুনর্জন্মের আবর্তন থামাতেই হবে।

এর মানে কি এই, আমরা কিছু না করে চুপ করে বসে থাকব? না, তা নয়। এর অর্থ আমরা কর্মের বোঝা আর বাড়াবো না। কিভাবে? সকাম কর্ম না করে। আমরা বাসনার দাস। আমরা যা কিছু করি, বাসনাতাড়িত হয়েই করি। আর তারই ফলে আমাদের কর্মফল জমতে থাকে। যেমন, বহু মানুষ আছেন যাঁরা নাম-যশের লোভে অথবা স্বর্গের সুখ লাভের আশায় সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেন। একজন জীবন্মুক্ত পুরুষও কাজ করেন, কিন্তু নিষ্কাম হওয়ায় তাঁর কোন কর্মফল হবে না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, 'লোকসংগ্রহ' বা মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই নিষ্কাম কর্মের অজোড় দৃষ্টান্ত। গলায় ক্যান্সার; ডাক্তাররা কথা বলতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু তাঁদের নির্দেশ অমান্য করেও তিনি নিরন্তর ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করছেন, মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন, ভগবান লাভের প্রেরণা দিচ্ছেন।

আপনি যদি একবার জানতে পারেন আপনি কে, যদি একবার বুঝতে পারেন আপনি ব্রহ্ম; তাহলে আপনি সম্পূর্ণ আপ্তকাম হয়ে যাবেন; আপনার মধ্যে তখন আর বাসনার লেশমাত্র থাকবে না।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি।।৮

কিভাবে সমাধিলাভ করা যায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে]

অন্বয়: শরীরং ত্রিরুন্নতম্ ([একজন যোগীর] শরীরের তিনটি অংশ [অর্থাৎ, তাঁর বুক, ঘাড় এবং মাথা] সোজা); [তৎ (সেই, অর্থাৎ শরীরের তিনটি অংশ)]; সমম্ (একটি সরলরেখায়); স্থাপ্য (স্থাপন করে); মনসা (মনের দ্বারা); ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি); হৃদি (হৃদয়ে); সন্নিবেশ্য (একত্র বা সংহত করে); বিদ্বান্ (একজন জ্ঞানী ব্যক্তি); ব্রহ্মোডুপেন (ব্রহ্মকে ভেলারূপে ব্যবহার করে); সর্বাণি (সকল); ভয়াবহানি (ভয়াবহ [মানুষ, পশু অথবা

কীটপতঙ্গ হয়ে বারবার জন্মানোর কথা বলা হচ্ছে]); স্রোতাংসি (জলস্রোত [অর্থাৎ, অজ্ঞতাপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী বিপজ্জনক পরিস্থিতি]); প্রতরেত (পার হয়ে যান [এই সংসার])।
সরলার্থ: সমাধিলাভের জন্য যোগীকে এমন আসন করে বসতে হবে যাতে মাথা, ঘাড় এবং বুক—শরীরের এই তিনটি অংশ সোজা এবং সমান্তরাল থাকে। এরপর মনের সাহায্যে তিনি তাঁর ছড়ানো ইন্দ্রিয়গুলিকে কুড়িয়ে এনে রাখবেন এবং ব্রহ্মকে (অর্থাৎ প্রণব বা ওম্-কে) ভেলা করে ভয়াবহ তরঙ্গসঙ্কুল জীবন-নদী পার হবেন।
ব্যাখ্যা: এখন আমরা যোগসাধনার জন্য প্রস্তুত। প্রথমেই মাথা, ঘাড় এবং বুক— শরীরের এই তিন অংশকে সোজা (উন্নতম্) এবং সরল (সমম্) রাখতে হবে। একথা ঠিক ধ্যান মনের ব্যাপার; এটা শুকনো দৈহিক প্রক্রিয়া নয়। তবুও যোগ অভ্যাস করতে গেলে দেহের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যোগীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছেন, সোজা হয়ে বসলে মন একাগ্র হয়। গীতাও (৬।১৩) একই নির্দেশ দিচ্ছেন—'সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ', মাথা, ঘাড় এবং বুক ঋজু ও সমুন্নত, শরীর অচঞ্চল (অচলম্)। 'সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বম্', নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। অর্থাৎ, বাইরের কোন কিছুই আর আপনি দেখছেন না। বুদ্ধদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখুন। তাহলেই বুঝবেন ধ্যানের সময় যোগীকে কেমন দেখায়। তাঁদের দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টিই নয়। উপনিষদ বলছেন, 'হৃদীন্দ্রিয়াণি সন্নিবেশ্য', সব ইন্দ্রিয়গুলি পর্যন্ত হৃদয়ে (হৃদি) আহৃত বা প্রবিষ্ট।

ব্রহ্মকে এখানে ভেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধ্যানের সময় আমরা যেন ব্রহ্মরূপ ভেলায় উঠে বসি, যে ভেলা আমাদের সংসার-সমুদ্রের অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পারে নিয়ে যাবে। সংসারকে 'ভয়াবহানি' অর্থাৎ ভীষণ ভীতিপ্রদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভীতিপ্রদ কেন? কারণ একটাই—এই সংসার একটা ভয়ানক বন্ধন। পরার্থে জীবন ধারণ করলে ঠিক আছে, তাতে কোন ভয় নেই। কিন্তু বাসনাতাড়িত হয়ে জন্মগ্রহণ করা—সেটা মারাত্মক বন্ধন। কারণ কামনা-বাসনাই আমাদের যত দুঃখ-কষ্টের মূল। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। পরজন্মে যে আমরা মানুষ হয়ে জন্মাবো তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পশু অথবা কীটপতঙ্গ হয়েও জন্মাতে পারি। হিন্দুমতে জন্ম নির্ভর করে কর্মের উপর; আমরা কি ধরনের মানুষ তার ওপর। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মভেলায় একবার উঠে বসতে পারি অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে আমার অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারি, তাহলেই আমি মুক্ত। আর আমার জন্ম হবে না। ব্রহ্মের সঙ্গে এই একাত্মবোধই জীবনের উদ্দেশ্য। একবার যদি নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে আমরা ব্রহ্ম, তবে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। কারণ তখন আমরা ব্রহ্ম হয়ে গেছি।

মুণ্ডক উপনিষদ (৩।২।৯) বলছেন : 'সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যান।

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥৯

অন্বয়: ইহ (যিনি যোগাভ্যাস করেন); সংযুক্তচেষ্টঃ (যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন); অপ্রমত্তঃ (নির্ভুলভাবে); [পঞ্চ] প্রাণান্ (প্রাণবায়ুকে [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান]); প্রপীড্য (সংযত করে); প্রাণে ক্ষীণে (দুর্বল বোধ করলে [কিছুক্ষণ প্রাণবায়ুকে ধরে রাখার পর]); নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত (শ্বাস ত্যাগ করবেন); [যথা (যেমন)]; দুষ্টাশ্বযুক্তং বাহম্ (সারথি যেমনভাবে তাঁর অবাধ্য ঘোড়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন); ইব (সেইভাবে); বিদ্বান্ (জ্ঞানীব্যক্তি); এনং মনঃ (এই মনকে); ধারয়েত ([কোন ধ্যেয় বস্তুতে, দেবতায়] একাগ্র করেন)।

সরলার্থ: (কেমন করে প্রাণায়াম করতে হয়, এখানে তার কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। যিনি যোগাভ্যাস করেন, তাঁকে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে খুব সতর্ক হতে হয়। (অর্থাৎ, যোগশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে খাদ্যাখাদ্য সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ তাঁকে নিখুঁতভাবে মেনে চলতে হয়।) খুব সাবধানে, অতি যত্নের সঙ্গে তাঁকে প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একমাত্র ক্লান্তি বোধ করলে তবেই তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। মন যেন রথের দুরন্ত, অশান্ত ঘোড়া। যিনি বিজ্ঞ, তিনি দক্ষ সারথির মতোই চঞ্চল মনকে সংযত করে (কোন দেবতায়) নিবদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা: অনেকে মনে করেন যোগ একটা রহস্য, একটা প্রহেলিকা। কিন্তু আদপেই তা নয়। যোগ একটা বিজ্ঞান, আত্মসংযমের বিজ্ঞান। আপনি হয়তো মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনতে চান। তা সে কাজ আপনাকেই করতে হবে। আপনার হয়ে অন্য কেউ তা করে দিতে পারবে না। আপনার প্রত্যেকটি কর্মই (চেষ্টঃ) নিয়ন্ত্রিত (সংযুক্ত) হবে। গীতায় (৬। ১৬) বলা হয়েছে, 'যদি তুমি খুব বেশি খাও, তাহলে তুমি যোগী হতে পারবে না; আবার যদি একেবারেই না খাও তাহলেও না। অনুরূপভাবে তুমি যদি খুব বেশি ঘুমাও, তাহলে যোগী হতে পারবে না; আবার যদি একেবারেই না ঘুমাও তাহলেও না।' সবকিছুই সুপরিমিত, সুসংযত হবে এবং আপনাকেই তা করতে হবে। আপনি যদি যোগী হতে চান,

তবে আপনাকে এইরকমই হতে হবে। সংযমই ধর্মের চাবিকাঠি। ধর্মজীবনে প্রথমেও সংযম এবং শেষেও। সংযমই ধর্মের প্রাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মনকে বলি—'মন তুই মায়ের পাদপদ্মে বসে থাক। তা মন তাই থাকে।' শ্রীরামকৃষ্ণের মনটি কাগজ-চাপা বা পেপারওয়েটের মতো স্থির। যদি টেবিলে একটা চাপা রেখে আপনি তাকে বলেন 'তুমি এইখানেই থাক, একচুল নড়বে না', তাহলে সে নড়বে কেমন করে? নড়তে পারবে না। এখন হয়তো অসম্ভব মনে হবে, কিন্তু অভ্যাস করলে আমাদের মনকেও ঠিক ঐরকম নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, স্থির করা যায়। গীতায় (৬।৩৪) অর্জুন বলছেন, 'তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্', মনকে বশে আনা বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করার মতোই দুরূহ। অবশ্য অভ্যাসের দ্বারা (অভ্যাসেন) ধীরে ধীরে মনকে আয়ত্তে আনা যায়। একদিনেই এটা সম্ভব হবে না; কিন্তু নিরলস চেষ্টা করলে আপনি একদিন না একদিন অবশ্যই সফল হবেন।

এখানে উপনিষদ রথের অবাধ্য ঘোড়ার সঙ্গে মনের তুলনা দিয়েছেন। যদি আপনি ভালো রথী হন, যদি আপনার ঘোড়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল জানা থাকে, তবে ঝড়ের বেগে রথ এগোবে। তা নাহলে ঘোড়াগুলো আপনাকে খাদে নিয়ে ফেলবে। সেইরকম আপনি যদি আপনার মনকে সংযত করতে না পারেন, তাহলে দুঃখের একশেষ।

মন নিয়ন্ত্রণের জন্য উপনিষদ যে কটি উপায়ের কথা বলেছেন তাদের একটি হল 'প্রাণায়াম'। প্রাণায়াম মানে হল 'প্রাণ' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটিও পুরোপুরি বিজ্ঞান। 'রেচক', 'পূরক' ও 'কুম্ভক'—শ্বাসত্যাগ, শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসধারণ, মূলত এই তিনটি নিয়েই প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্রে রেচক (শ্বাসত্যাগ) সৃষ্টির প্রতীক, কুম্ভক (শ্বাসধারণ) স্থিতির প্রতীক এবং পূরক (শ্বাসগ্রহণ) প্রলয়ের প্রতীক।

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥১০

অন্বয়: সমে (সমান); শুচৌ (পবিত্র বা অন্ততপক্ষে পরিচ্ছন্ন); শর্করা-বহ্নিবালুকা বিবর্জিতে (যেখানে পাথর, আগুন এবং বালি নেই); শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (জনকোলাহলমুক্ত এবং নদী বা হ্রদের কাছাকাছি নয় [যেখানে মশারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে]); মনোনুকূলে (মনোরম

হবে); ন তু চক্ষুপীড়নে (এবং দৃষ্টিকটু হবে না); গুহানিবাতাশ্রয়ণে (গুহা বা ঐ ধরনের কোন স্থানে যেখানে বাতাস শান্ত); প্রযোজয়েৎ (এইপ্রকার স্থানেই যোগ অভ্যাস করবে)।

সরলার্থ: (কিরকম জায়গা যোগসাধনের পক্ষে অনুকূল? এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া হচ্ছে।) প্রথমত, স্থানটি সমান হবে। দ্বিতীয়ত, শুদ্ধ হবে। তৃতীয়ত, সেখানে নুড়ি-পাথর, আগুন ও বালি থাকবে না। চতুর্থত, স্থানটি মানুষের কোলাহলমুক্ত হবে। পঞ্চমত, কাছাকাছি নদী, হ্রদ ইত্যাদি থাকবে না। ষষ্ঠত, স্থানটি মনোরম এবং নয়নসুখকর হবে। সপ্তমত, স্থানটি গুহা বা ঐজাতীয় কোন জায়গা হলে ভালো যেখানে বাতাস শান্ত। এইরকম স্থানেই যোগ অভ্যাস করতে হয়।

ব্যাখ্যা: এখন প্রশ্ন : আপনি কোথায় ধ্যান করবেন? আপনার স্বাস্থ্য হয়তো ভালো, ধ্যানের উপযুক্ত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের জন্য আপনার একটা অনুকূল জায়গাও প্রয়োজন। প্রথমেই দেখতে হবে যাতে আপনার বসার জায়গাটি সমান, নরম, সুখকর এবং পরিচ্ছন্ন হয়। মনে করুন, এমন একটা জায়গায় আপনি ধ্যান করতে বসেছেন যেটি খুব শক্ত, অথবা জায়গাটা হয়তো পাথর ও বালিতে ভরা। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো আপনার মনে হতে পারে, 'জায়গাটা মন্দ কি? আমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না।' কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারবেন জায়গা নির্ধারণ মোটেই ঠিক হয়নি। স্থানটি খুবই অস্বস্তিকর।

আবার বলা হচ্ছে, ধ্যানের স্থানটি কোলাহলমুক্ত হবে। হাট-বাজারের কাছাকাছি হলে চলবে না। মন একেবারে নিজের বশে এসে গেলে তখন আর কোলাহলকে কোলাহল মনে হবে না। ঐসব আপনি সহজেই উপেক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু শুরুতে এসব জায়গা থেকে দূরে থাকাই উচিত।

আগুন এবং জল থেকেও দূরে থাকতে হবে। আগুনের থেকে দূরে থাকতে হবে একথা নাহয় বোঝা গেল। কিন্তু জল কি দোষ করল? তার উত্তর হচ্ছে, জলে মশা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ, এমনকি সাপও থাকতে পারে।

দৃষ্টিকটু, হতশ্রী, অগোছালো এবং অপ্রীতিকর স্থানও ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত নয়। অতএব স্থানটিকে মনোরম হতে হবে, এমন স্থান যেখানে বাতাসটিও শান্ত।

উপনিষদ গুহায় ধ্যানের পরামর্শ দিয়েছেন।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥১১

অন্বয়: যোগে (যোগ অভ্যাসের সময়); ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরণি (ব্রহ্মোপলব্ধির লক্ষণ হিসাবে); নীহার (তুষার); ধূম (ধোঁয়া); অর্ক-অনিল-অনলানাম্ (সূর্য, বাতাস এবং আগুন); খদ্যোত (জোনাকি); বিদ্যুৎ (স্ফুলিঙ্গ); স্ফটিক (স্বচ্ছ পাথরবিশেষ); শশী (চাঁদ); এতানি রূপাণি (এইসব লক্ষণ); পুরঃসরাণি [ভবন্তি] (আগেই দেখা দেয় [অর্থাৎ, এইসব লক্ষণ দেখে যোগী বুঝতে পারেন তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির আর দেরি নেই])।

সরলার্থ: (যোগ অভ্যাসের দ্বারা সাধক লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে কিনা তার লক্ষণ আছে। কয়েকটি লক্ষণের কথা এখানে বলা হচ্ছে।) ব্রহ্মোপলব্ধির আগে যোগী তুষার, ধোঁয়া, সূর্য, বাতাস, আগুন, জোনাকি, স্ফুলিঙ্গ, স্ফটিক, চাঁদ প্রভৃতি দেখতে পান। এগুলি সবই ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস।

ব্যাখ্যা: শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, জমিদার তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আগে থেকেই বাড়িঘর ঝাড়পোঁছ, ধোওয়া-মোছা শুরু হয়ে যায়। আসবাবপত্র সব আসে। এসব হয়ে গেলে শেষে দেখা যায় একজন হুঁকো নিয়ে আসছে। দেখলেই বোঝা যায় জমিদারের আসার আর দেরি নেই। সেইরকম অধ্যাত্ম জীবনেও অগ্রগতির কিছু লক্ষণ আছে। ধ্যানের সময় যোগীর হৃদয়ে সেইসব লক্ষণ ফুটে ওঠে। লক্ষণগুলি দৈহিক নয়, মানসিক। সাধক মনের গভীরে তাদের প্রত্যক্ষ করেন। এইসব দর্শন হলে বোঝা যায় সাধকের অগ্রগতি হচ্ছে, ব্রহ্ম ক্রমশ প্রকাশিত হতে চলেছেন। ব্রহ্ম সাধকের অন্তরে সর্বদাই আছেন, কেবল অবিদ্যার আবরণটি সরাতে হবে।

ধ্যান করতে করতে প্রথমদিকে আপনার জ্যোতিদর্শন হবে, অর্থাৎ নিজের ভিতরে আপনি নানারকম আলো দেখতে পাবেন। আপনার মনে হবে গোটা সূর্যটাই যেন আপনার ভিতরে জ্বলজ্বল করছে। আলোর দ্যুতি যদি অত উজ্জ্বল নাও হয়, চাঁদের মতো অথবা স্ফুলিঙ্গ কি জোনাকি বা আগুনের মতো হতে পারে। কখনো কখনো তুষার এবং স্ফটিকের মতো সাদা জিনিসও আপনি দেখতে পারেন। যুগে যুগে, সব দেশের মরমীয়া সাধকেরাই অন্তরে জ্যোতি দর্শন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, মা ভবতারিণীর দেহ থেকে জ্যোতির বিপুল তরঙ্গ বেরিয়ে এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তুলাভ করেছিলেন।

পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥১২

অন্বয়: পৃথিবী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খে (মাটি, জল, আগুন, বাতাস এবং আকাশ); সমুত্থিতে (প্রকাশিত হলে [যা যোগীর সাফল্যের প্রমাণ]); পঞ্চাত্মকে (পঞ্চভূত যখন কেবল তাদের অতি সূক্ষ্মগুণের অবস্থায় থাকে); যোগগুণে (যোগীর যোগশক্তির দ্বারা); প্রবৃত্তে ([ওই গুণগুলি সেইভাবে] প্রকাশিত হয়); যোগ-অগ্নিময়ম্ (যোগাগ্নিদ্বারা শুদ্ধ হয়ে); শরীরং প্রাপ্তস্য ([এমন পবিত্র] দেহ লাভ করে); তস্য [যোগীনঃ] (সেই বিশেষ [যোগীর]); রোগঃ ন (ব্যাধি হয় না); জরা ন (বার্ধক্যের লক্ষণ থাকে না); মৃত্যুঃ ন (মৃত্যুও থাকে না [তিনি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হন])।

সরলার্থ: পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি স্থূল পঞ্চভূত যোগীর কাছে আর স্থূল থাকে না। তাঁর কাছে সেগুলি রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি সূক্ষ্মগুণে পরিণত। যোগীর দেহও আর স্থূল থাকে না। সে দেহের রূপান্তর ঘটে। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু আর সে দেহকে স্পর্শ করতে পারে না। যোগীর তখন ইচ্ছামৃত্যু।

ব্যাখ্যা: যখন কেউ যোগসাধনা শুরু করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন তাঁর শরীরের রূপান্তর ঘটছে। যোগের আগুনে যোগীর দেহ শুদ্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য কারোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় মানুষটি যোগী না ভোগী। বাস্তবিক, যোগীর দেহ সাধারণের চেয়ে আলাদা।

(পৃথিবী) মাটি, (অপ্) জল, (তেজস্) আগুন, (অনিল) বাতাস এবং (খ) আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত দিয়ে আমাদের দেহ তৈরি। কিন্তু এই মহাভূতের মধ্যে অনেক খাদ বা অশুদ্ধি আছে। যোগ অভ্যাসের ফলে এইসব মলিনতা পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং মহাভূতগুলি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়। তখন আর সেগুলিতে স্থূলতা থাকে না। তখন মহাভূতগুলি রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি সূক্ষ্মগুণে পরিণত হয়। এইসব গুণের মাধ্যমেই তখন জগতের সঙ্গে যোগীর যোগাযোগ ঘটে। তখন কি হয়? 'রোগঃ ন'—তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হন না। 'জরা ন'—বার্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করে না। যোগীকে দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা যায় না। আশী বছরের যোগীকে পঞ্চাশ বছরের মতো দেখাতে পারে। 'মৃত্যুঃ ন'—যোগীর মৃত্যু নেই, অর্থাৎ যোগীর মৃত্যুভয় নেই। তিনি জানেন, রোগ, জরা, মৃত্যু তাঁকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারে না। তখন তাঁর ইচ্ছামৃত্যু। যোগ অভ্যাসের ফলে মানুষের এইরকম একটা অপূর্ব অবস্থা হয়।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং

যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥১৩

অন্বয়: লঘুত্বম্ (শরীরের লঘুতা অর্থাৎ ছিপছিপে শরীর); আরোগ্যম্ (সুস্বাস্থ্য); অলোলুপত্বম্ (ভোগবাসনার অভাব); বর্ণপ্রসাদম্ (উজ্জ্বল গায়ের রঙ); স্বরসৌষ্ঠবম্ (মধুর কণ্ঠস্বর); শুভঃ গন্ধঃ (দেহের সুগন্ধ); অল্পং মূত্রপুরীষম্ (মল-মূত্রের স্বল্পতা); যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি (সার্থক যোগীর এইগুলিই প্রাথমিক লক্ষণ)।

সরলার্থ: শরীরের লঘুতা অর্থাৎ হালকা ভাব, রোগ এবং ভোগলিপ্সার অভাব, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, মধুর কণ্ঠস্বর, দেহের সুগন্ধ, স্বল্প মলমূত্র—এইগুলিই সার্থক যোগীর প্রাথমিক লক্ষণ।

ব্যাখ্যা: ছিপছিপে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর, অনাসক্তি ইত্যাদি যোগের লক্ষণ, কিন্তু এগুলি লক্ষ্য নয়। তাই যদি কেউ মনে করেন 'সুস্থ দেহ লাভ করবার জন্য যোগ অভ্যাস করব' অথবা 'আমি বুড়ো হতে চাই না তাই যোগ করব'—তাহলে হবে না। যোগ অভ্যাস করতে করতে এগুলি এমনিই এসে যেতে পারে; কিন্তু এগুলি এল কি এল না—তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। সাধকের একটাই লক্ষ্য—ব্রহ্ম। যেসব লক্ষণের কথা বলা হল, সেগুলি যদি আসে তো যোগী বুঝবেন যে তিনি ঠিক পথে এগোচ্ছেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, লক্ষণগুলি যে সর্বদা দেখা যাবেই, এমন কথা বলা যায় না।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥১৪

অন্বয়: যথা এব (যেমন); মৃদয়া-উপলিপ্তম্ (মাটি দিয়ে ঢাকা); বিম্বম্ (একতাল সোনা); সুধান্তম্ [সৎ] (পরিষ্কৃত হলে [আগুন, জল বা কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে]); তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে (তার চকচকে ভাব ফিরে আসে); তদ্বা (ঠিক সেইভাবে); আত্ম-তত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য (আত্মজ্ঞান লাভ করে); একঃ দেহী (সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে); কৃতার্থঃ বীতশোকঃ ভবতে (অনুভব করেন যে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এবং সব দুঃখের পারে চলে যান)।

সরলার্থ: (আগুন, জল বা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে) ধুলে যেমন ধূলিধূসরিত একতাল সোনার (স্বাভাবিক) ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে, তেমনি কেউ যদি নিজের আত্মাকে সকলের

আত্মা বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তিনি অনুভব করেন যে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন; তখন তিনি সব দুঃখের পারে চলে যান।

ব্যাখ্যা: মনে করুন, আপনার একটুকরো সোনা আছে। কিন্তু সেটি কাদা মাখা। বোধহয় বহুদিন মাটির তলায় পোঁতা ছিল। মাটি লেগে থাকায় সেটি যে সোনা, তা আপনি বুঝতে পারছেন না। এইরকম পরিস্থিতিতে আপনি কি করবেন? আপনি নিশ্চয় সোনাটিকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করবেন। আর যেই পরিষ্কার করলেন, অমনি সোনাটি চকচক করে উঠল। ওটি আগাগোড়া সোনাই ছিল, কিন্তু পরিষ্কার করায় এখন তার আসল চেহারা প্রকাশ পেল। ধরুন, আপনার বাড়ির কাছেই হয়তো একটা পুকুর আছে। তাতে পরিষ্কার টলটলে জল। কিন্তু কচুরিপানায় ঢাকা পড়ায় আপনি জল দেখতে পাচ্ছেন না, খাওয়া তো দূরের কথা! কিন্তু পানা সরিয়ে দিন— অমনি পরিষ্কার জল দেখা যাবে। তখন সে জল খেতেও পারবেন।

সেইভাবে, পরমাত্মা আমাদের অন্তরেই লুকিয়ে রয়েছেন। যোগ অভ্যাসের দ্বারা মনের মলিনতা দূর হলেই অন্তরে ব্রহ্মজ্যোতি আপনিই ঝলমল করে উঠবে। যোগী তখন সেই অন্তরাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করবেন। পরমাত্মা একটিই (একঃ), বহু নন। শ্রীরামকৃষ্ণ বালিশের উপমা দিতেন। আপনার নানা মাপের, নানা আকারের, নানা রঙের বালিশ আছে। কিন্তু সব বালিশের ভেতরেই এক তুলো। অনুরূপভাবে, নাম-রূপের বিভিন্নতার জন্যই আমাদের সব পৃথক মনে হয়। কিন্তু স্বরূপত আমরা সব এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

এই একাত্ম উপলব্ধি করলেই আপনি মুক্ত পুরুষ। তখন আপনার মনে হয়, আপনি সবকিছুই পেয়ে গেছেন, আপনার আর কোন দুঃখ নেই। বস্তুত তখন সুখ-দুঃখ দুটোই আপনার কাছে সমান।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥১৫

অন্বয়: যুক্তঃ (যোগ অভ্যাস করছেন এমন যোগী); যদা (যখন); তু দীপোপমেন (দীপের মতো উজ্জ্বল); আত্মতত্ত্বেন (নিজেকে); ব্রহ্মতত্ত্বম্ (ব্রহ্মরূপে); প্রপশ্যেৎ (মৃত্যুর অতীত তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করেন); অজম্ ([তখন] আর জন্ম নেই); ধ্রুবম্ (নির্লিপ্ত, অপ্রভাবিত); সর্ব-

তত্ত্বৈঃ (অবিদ্যার ছলনায়); বিশুদ্ধম্ (একই থাকেন); দেবম্ (স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মাকে); জ্ঞাত্বা (জেনে); সর্বপাশৈঃ ([অবিদ্যাজনিত] সকল প্রকার বন্ধন থেকে); মুচ্যতে (মুক্ত হন)।
সরলার্থ: (যোগী কেমন করে সুখ-দুঃখের পারে যান, এখানে উপনিষদ তারই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।) যোগী নিজেকে দীপের মতো উজ্জ্বল দেখেন এবং তিনি যে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, তাও তিনি স্পষ্ট অনুভব করেন। এই উপলব্ধির ফলে তিনি জন্ম-মৃত্যু এবং সকল পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে চলে যান। অবিদ্যার কোন প্রলোভনেই তিনি আর ভোলেন না। জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাকে পেলে তিনি অবিদ্যাজনিত সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হন।
ব্যাখ্যা: যোগ অভ্যাস করার ফলে যোগীর শরীরে পরিবর্তন আসতেও পারে, নাও পারে। সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অন্তরের পরিবর্তনই আসল কথা। এই পরিবর্তন এলে যোগী যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান। আমরা এখন নিজেদের তত্ত্ব বা পঞ্চভূত, অর্থাৎ দেহ এবং জগতের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি। কিন্তু স্বরূপ উপলব্ধি করলে যোগী বুঝতে পারেন যে তিনি দেহ নন। তিনি দেহের অতীত, বুদ্ধির অতীত, সব ক্ষুদ্রতা বা সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তিনি জানেন, কোনকিছুই তাঁকে বাঁধতে পারে না। তিনি মুক্ত। কেউ হয়তো বলবেন, ‘এ সবই তোমার কল্পনা, তোমার মতিভ্রম।’ কিন্তু যোগী নিশ্চিত জানেন তিনি আর সেই দুর্বল, বদ্ধ মানুষটি নন। তিনি জানেন তিনি কে। আর সেইজন্যই তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, তাঁর চালচলন সবকিছু আমূল পালটে যায়। স্বরূপ উপলব্ধির পর যোগী নিজেকে সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে দেখতে পান। তখন তিনি আর কাউকে আঘাত করতে পারেন না, কারণ ‘আমি-তুমি’-র ভেদ তাঁর কাছে মুছে গেছে। ‘অস্মদ্’, ‘যুষ্মদ্’ বলে আর কিছু নেই। তাঁর দৃষ্টিতে যা আছে সে কেবল ‘আমি’, যাঁর অন্য নাম পরমাত্মা। এই বোধোদয়ই মুক্তি। এই অনুভূতি লাভ করাই জীবনের পরম লক্ষ্য।

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥১৬

অন্বয়: এষঃ হ দেবঃ (এই পরমাত্মা [এই পরমেশ্বর]); সর্বাঃ প্রদিশঃ অনু (মুখ্য এবং গৌণ সবদিকেই যিনি বিরাজিত); পূর্বঃ (প্রথমে [হিরণ্যগর্ভরূপে]); জাতঃ (প্রকাশিত [অতি সূক্ষ্মরূপে বিশ্বমনে]); সঃ উ গর্ভে অন্তঃ (তিনিই আবার মাতৃগর্ভে); সঃ এব জাতঃ (তিনিই [শিশু হয়ে] জন্মান); জনিষ্যমাণঃ (ভবিষ্যতেও তিনিই শিশু হয়ে জন্মাবেন); সর্বতোমুখঃ

(সব মুখই তাঁর মুখ [তিনি বিরাট, সকল দেহের সমষ্টি]); সঃ জনান্ প্রত্যক্ তিষ্ঠতি (এইভাবে সকলের ভিতর তিনিই আছেন)।

সরলার্থ: এই পরমাত্মা, এই পরমেশ্বর চতুর্দিকে, সর্বত্র আছেন। তিনিই (হিরণ্যগর্ভ বা বিশ্বমন রূপে ব্রহ্মের) প্রথম প্রকাশ। তিনিই মাতৃগর্ভে আছেন, তিনিই শিশু হয়ে জন্মান এবং ভবিষ্যতে তিনিই শিশু হয়ে জন্মাবেন। সব মুখ তাঁরই মুখ। তিনিই বিরাট, সব দেহের সমষ্টি। এইভাবে তিনি সকল সত্তায় বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা: 'পূর্বঃ জাতঃ'। তিনিই প্রথম জন্মেছেন। তিনিই প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। হিরণ্যগর্ভ-রূপে প্রকাশিত ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম। তিনিই নিখিল চিত্ত। তিনিই আবার 'স্থূল'। তখন তিনি 'বিরাট', সকল জড়দেহের সমষ্টি। কখনো তাঁকে দেখা যায়, কখনো বা দেখা যায় না।

বহু মানুষকে আমরা জন্মাতে দেখি। ভবিষ্যতেও আরও অনেকে জন্ম নেবে। এখন যা আছে, কিছুকাল পরে তা থাকবে না। তা ধ্বংস হবে। তখন আবার নতুন কিছুর জন্ম হবে। কিন্তু যা কিছু আসছে, আছে—সবই পরমাত্মা, সবই ব্রহ্ম। শুধু নাম-রূপ বদলে যাচ্ছে, এই যা। সর্বত্র তাঁরই মুখ জ্বলজ্বল করছে। জন্ম, সে এখনি হোক আর ভবিষ্যতেই হোক, সূক্ষ্মই হোক আর স্থূলই হোক—সেই এক ব্রহ্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

যো দেবো অগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥১৭

অন্বয়: যঃ দেবঃ অগ্নৌ (যে জ্যোতির্ময় পরমাত্মা [সকলের প্রভু] যিনি [প্রকাশিত] অগ্নিতে); যঃ অপ্সু ([সেই পরমাত্মা] যিনি [প্রকাশিত] জলে); যঃ ওষধীষু ([সেই পরমাত্মা] যিনি [প্রকাশিত] গাছগাছড়ায়); যঃ বনস্পতিষু (যিনি প্রকাশিত বটবৃক্ষে); যঃ বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ ([সংক্ষেপে] যিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত); তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ (সেই পরমাত্মাকে বারবার নমস্কার করি)।

সরলার্থ: সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মা অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে এবং বিশাল বটবৃক্ষে রয়েছেন। সংক্ষেপে, একই পরমাত্মা বিশ্ব জুড়ে। সেই পরমাত্মাকে বারবার নমস্কার করি।

ব্যাখ্যা: বেদান্তমতে 'একঃ' বা ঐক্যের ধারণাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এককে জানাই জীবনের লক্ষ্য। আপনি এবং আমি অভিন্ন। আমরা আলাদা নই। কেউ বলতে পারেন, হ্যাঁ, কল্পনা

হিসেবে এটা সুন্দর, কিন্তু এটা কি সত্য? বাস্তব জীবনে কি এই ধারণা নিয়ে চলা যায়? ঘরে যদি চোর ঢোকে, তবে কি বলব, 'চোরটিও তো ব্রহ্ম, কাজেই ওকে ছেড়ে দাও?' এভাবে কি সমাজজীবন চলে? কিন্তু বেদান্ত অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। বেদান্ত বাস্তবকে কখনো অস্বীকার করে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—অন্যায়, অশুভকে দমন করতেই হবে। অত্যাচার এবং দুরাচারের মূল উপড়ে ফেলা অর্জুনের অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণের গল্প প্রায়ই বলতেন। এক গুরু তাঁর শিষ্যকে বললেন যে সবই নারায়ণ। একদিন সেই শিষ্যটি পথে বেরিয়েছেন। এমন সময় দেখেন একটি পাগলা হাতি তাঁরই দিকে দৌড়ে আসছে। মাহুত চিৎকার করে সরে যেতে বলল; কিন্তু শিষ্যটি ভাবলেন, হাতিটিও তো নারায়ণ। সুতরাং তিনি হাতিটির স্তবস্তুতি শুরু করে দিলেন। একে পাগলা হাতি, তায় স্তবস্তুতি! হাতিটি এসে শিষ্যটিকে শুঁড় দিয়ে তুলে এক আছাড়। পরে সব শুনে গুরু শিষ্যকে বললেন, 'বুঝলাম, সবই নারায়ণ। তবে তুমি মাহুত-নারায়ণের কথা শুনে সরে গেলে না কেন?' সেইরকম আপনি হয়তো জানেন সবই ঈশ্বর, ভালো কথা। কিন্তু সবকিছু এবং সবাই কি আপনার সঙ্গে ভগবানের মতো আচরণ করছেন? করছেন না। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের বিচারবুদ্ধি ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

এই শ্লোকের নিহিতার্থ—মানুষ, পশু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ যা কিছু আছে, সকলের মধ্যে সেই এক পরমাত্মা। যেহেতু আপনি সেই পরমাত্মা সেহেতু অন্যকে আঘাত করলে নিজেকেই আঘাত করা হয়। আমি যদি আমার পরিবেশ নষ্ট করি, সেটা আমার নিজেরই সর্বনাশ ডাকা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের এই অদ্বয় তত্ত্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যদি তিনি দেখতেন কেউ কোন পশুকে মারছে, তাহলে তিনি নিজের শরীরে সেই যন্ত্রণা অনুভব করতেন। কাউকে ফুল ছিঁড়তে দেখলে তাঁর মনে হত কেউ যেন তাঁর বুকটাই উপড়ে ফেলছে।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত॥

তৃতীয় অধ্যায়

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাংল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ॥
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥১

অন্বয়: যঃ একঃ (এক ও অভিন্ন [পরমাত্মা] যিনি); জালবান্ (মায়াবী); ঈশনীভিঃ ঈশতে (নিজের শক্তিতে শাসন করেন); সর্বান্ লোকান্ (সকল জগৎ); যঃ (যিনি); ঈশনীভিঃ ঈশতে (নিজের শক্তিতে শাসন করেন); উদ্ভবে সম্ভবে চ ([সমস্ত লোক বা জগতের] উৎপত্তি ও লালন-পালনের ব্যাপারে [এখানে তাৎপর্য, কারণ অবস্থায় ফিরে যাওয়া অর্থাৎ, বিনাশ]); একঃ এব (সেই এক); যে এতৎ বিদুঃ (যাঁরা এই [সত্য] জানেন); তে (তাঁরা); অমৃতাঃ ভবন্তি (অমর হন)।

সরলার্থ: সেই পরমাত্মা যিনি মায়াবী, যিনি নিজের শক্তিতে সকল জগৎ শাসন করেন, সেই একই শক্তিতে যিনি এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি অথবা বিনাশের কারণ, তিনি অদ্বিতীয়। যাঁরা এই সত্য জানেন, তাঁরা অমর হন।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে এখানে 'জালবান্' বা মায়াবী বলা হয়েছে। তিনি মায়ার জাল বিস্তার করেছেন। আপনাকে যদি সম্মোহিত করা হয়, তাহলে আপনি নিতান্ত অসহায়। ম্যাজিসিয়ান, অর্থাৎ যিনি ঐন্দ্রজালিক, তিনি আপনাকে যেমনভাবে চালাবেন আপনি তেমনিভাবে চলতে বাধ্য। আপনি হয়তো বলবেন—'কেন, আমার কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই? আমার তো মনে হয় আমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।' এর উত্তরে বেদান্ত বলছেন, হ্যাঁ, স্বাধীন ইচ্ছে আছে তা ঠিক, তবে তা কিছুদূর পর্যন্ত। তার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডী আছে। শেষে দেখা যায় আমাদের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছুই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন—ভাত ফুটছে; তার মধ্যে আলু, পটল সব লাফাচ্ছে। আগুন সরিয়ে নিলেই লাফ-ঝাঁপ বন্ধ। তেমনি, আমাদের পেছনেও এক অদৃশ্য শক্তি আছে। তার প্রভাবে আমরা সবকিছু করি। এই শক্তি হল ব্রহ্মের 'মায়াশক্তি'। ব্রহ্ম তাঁর মায়াশক্তি দিয়েই এই বিশ্বচরাচর চালাচ্ছেন।

ব্রহ্ম কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মই—এক ব্রহ্ম। 'উদ্ভব' শব্দটির অর্থ উৎপত্তি বা প্রকাশ। 'সম্ভব' শব্দটিরও ঐ একই অর্থ। কিন্তু এখানে শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দটির অর্থ 'কারণ অবস্থায় ফিরে যাওয়া' অথবা বিনাশ। ব্রহ্ম, প্রকাশ এবং বিনাশ, দুয়েরই কারণ। আপনি যদি বোঝেন সবকিছুর পেছনে এক ব্রহ্মই আছেন, তাহলে আপনি মৃত্যুকে জয় করে অমর হয়ে যাবেন।

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাংল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোচান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥২

অন্বয়: হি রুদ্রঃ (যেহেতু রুদ্র); একঃ (এক ও অদ্বিতীয় [যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন]); দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ (রুদ্র ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করেন না); যঃ (যিনি); ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহ); ঈশনীভিঃ ঈশতে (নিজের শক্তিতে চালান); প্রত্যক্ জনান্ তিষ্ঠতি (তিনি সকল জীবের অন্তরে আছেন); [সঃ] বিশ্বা ভুবনানি সংসৃজ্য গোপাঃ (তিনিই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন); অন্তকালে সঞ্চুকোচ (শেষে সংহার করেন)।

সরলার্থ: যেহেতু 'রুদ্র' আছেন তাই ব্রহ্মবিদরা রুদ্র ছাড়া দ্বিতীয় কোন দেবতাকে স্বীকার করেন না। তিনিই রুদ্র, যিনি নিজের শক্তিতে নিখিল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনিই সকলের অন্তরতম সত্তা। তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ঘটান।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে বোঝাতে গিয়ে আমরা নানান নাম ব্যবহার করি—রুদ্র, অগ্নি, বরুণ, আরও কত কি। এখানে উপনিষদ ব্রহ্মকে 'রুদ্র' বলছেন। রুদ্র কথাটির অর্থ, যিনি আমাদের কাঁদান। তিনি আমাদের কাঁদান কেন? কারণ তিনি প্রলয়ঙ্কর। কিন্তু তিনি শুধু ধ্বংসই করেন না, তিনি সৃষ্টি (সংসৃজ্য) এবং পালনও (গোপাঃ) করেন। তিনি দুই বা বহু নন, তিনি এক (একঃ)। বহু দেবদেবী আছেন একথা ঠিক নয়। পরমেশ্বর একজনই। তিনি নিজেকে নানারূপে এবং নানা নামে প্রকাশ করেন। যে শক্তি সৃষ্টি করেন, সেই একই শক্তি পালনও করেন আবার সংহারও করেন।

যখন আমরা সৃষ্টির কথা বলি তখন একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। 'সৃষ্টি' বলতে সাধারণত আমরা এই বুঝি, একটা কিছু যা আগে ছিল না, এখন সৃষ্টি হল। বেদান্তমতে শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয় না। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ এই জগৎ সৃষ্টি হল—বেদান্ত একথা বলে না। বেদান্তমতে এই জগৎ 'প্রকাশিত' হয়েছে। উপাদান আগে থেকে

ছিলই, শুধু নাম-রূপের পরিবর্তন হয়েছে এই যা। কুম্ভকার যখন একটা ঘট তৈরি করেন তখন কিছুটা মাটি নিয়ে তিনি ঘট গড়ার কাজ শুরু করেন। এক্ষেত্রে ঘটের উপাদান মাটি এবং কুম্ভকার দুটি পৃথক বস্তু। দুটি আলাদা সত্তা। কিন্তু জগতের প্রকাশ এইরকম কোন ব্যাপার নয়। ব্রহ্ম নিজেই কার্য এবং নিজেই কারণ। ব্রহ্ম নিজেই উপাদান কারণ এবং নিজেই নিমিত্ত কারণ। তত্ত্বটিকে বোঝাবার জন্য প্রায়ই বীজের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। আপনি একটা বিরাট বটগাছ দেখছেন। কিন্তু এটি কোথা থেকে এল? একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ থেকে। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে, ঐ বটগাছটা একটা ছোট্ট বীজের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে ঐ বীজ থেকে গাছটা জন্মেছে, বেড়েছে এবং কালে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মই এই মহাবিশ্বের বীজ। শুধু তাই নয়—সবকিছুই আবার সেই ব্রহ্মেই লীন হয়। সবকিছুই ব্রহ্ম থেকে আসে, ব্রহ্মেই সবকিছুর স্থিতি এবং সবকিছুই আবার ব্রহ্মে ফিরে যায়। বস্তুত আমরাই ব্রহ্ম। সত্যটা হয়তো আমরা জানি না; কিন্তু না জানার দরুন সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। আমরা সকলেই দেবস্বভাব। শুধু সে কথাটা আমরা জানি না। উপনিষদের একটাই চেষ্টা—অসহায়, বদ্ধ বলে নিজেদের সম্পর্কে আমাদের যে ভুল ধারণা আছে, তা দূর করা, তা থেকে আমাদের মুক্ত করা। আমরা রাজার রাজা। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি। আমরাই ব্রহ্ম। উপনিষদ এই সিদ্ধান্তটিকেই প্রতিষ্ঠা করতে চান, এবং তা করার জন্য যতকিছু যুক্তির অবতারণা।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥৩

অন্বয়: বিশ্বতঃ চক্ষুঃ (সব চোখই তাঁর চোখ); উত (এবং); বিশ্বতঃ মুখঃ (সব মুখই তাঁর মুখ); বিশ্বতঃ বাহুঃ (সব হাত তাঁরই হাত); উত (এবং); বিশ্বতঃ পাৎ (সব পা তাঁরই পা); একঃ দেবঃ (সেই এক দেবতা); দ্যাবাভূমী জনয়ন্ (আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করে [এবং তার অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে]); বাহুভ্যাম্ ([পুরুষ এবং নারীকে] হাতের সঙ্গে); সম্পতত্রৈঃ ([পাখীদের] দুটি ডানার সঙ্গে [আক্ষরিক অর্থে, যা কাউকে পতন থেকে রক্ষা করে—যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হাত এবং পাখীর ক্ষেত্রে দুটি ডানা]); সং-ধমতি (যুক্ত করেন)।

সরলার্থ: সব চোখ তাঁর চোখ, সব মুখই তার মুখ; সব হাত তাঁর হাত, সব পা-ই তাঁর পা। সেই এক দেবতা স্বর্গ, মর্ত (এবং তার অন্তর্বর্তী সব বস্তু) সৃষ্টি করে মানুষের দুটি হাত এবং

পাখীর দুটি ডানা যোগ করেছেন।

ব্যাখ্যা: যেখানেই চোখ, সে তাঁরই চোখ। যেখানেই মুখ, সে তাঁরই মুখ। যেখানেই হাত, সে তাঁরই হাত। যেখানেই পা, সে তাঁরই পা। এই বিশ্বকে তিনিই পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি সবকিছু দেখতে পান, সর্বত্র যেতে পারেন এবং সবকিছুই ধরতে পারেন।

গীতাও (১৩।১৪) বলছেন, 'সর্বতঃ পাণিপাদম্ ...' তাঁর হাত-পা সর্বত্র ছড়ানো ...। তিনি বিশ্বব্যাপী। একটি কলসী জলে ডোবালে কলসীটার ভিতরেও জল, বাইরেও জল। সেইরকম এই বিশ্বের ভিতরেও ব্রহ্ম, বাইরেও ব্রহ্ম। একইসঙ্গে তিনি বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত। একমাত্র তিনিই আছেন; আর তিনি আছেন বলেই এই বিশ্বও আছে। ব্রহ্মনিরপেক্ষ কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

আবার তিনিই সবকিছুর উৎস। তিনিই আমাদের পালন করেন। যাতে আমরা কাজ করতে পারি সেইজন্য তিনি হাত দিয়েছেন, পাখীদের উড়বার ডানা দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥৪

অন্বয়: যঃ দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবঃ চ (দেবতাদের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধির কারণ যিনি); বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ ([যিনি] রুদ্র, বিশ্বের ধারক); মহর্ষিঃ (সর্বজ্ঞ); পূর্বম্ (সৃষ্টির শুরুতে); হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস (হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করেছেন); সঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (তিনি [সেই রুদ্র] যেন আমাদের শুভবুদ্ধি [ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা] দেন)।

সরলার্থ: দেবতাদের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধির কারণ যিনি, যিনি রুদ্র, বিশ্বচরাচরের প্রভু এবং সর্বজ্ঞ, যিনি সৃষ্টির শুরুতে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন (অর্থাৎ, ভালো-মন্দ এবং নিত্য-অনিত্য বিচারের ক্ষমতা, যার দ্বারা শীঘ্র আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারি)।

ব্যাখ্যা: যেহেতু পরমেশ্বরই স্রষ্টা, সবকিছুর উৎস (প্রভবঃ) আমরা তাঁর কাছেই শুভবুদ্ধি এবং শুদ্ধ মনের জন্য প্রার্থনা জানাই। কিরকম মনকে শুদ্ধ মন বলা যায়? যে মন ব্রহ্ম অন্বেষী, যে মন পরম সত্তাকে অনুভব করার জন্য ব্যাকুল, সেই মনই শুদ্ধ মন। এই মন বলে : 'এই জগতের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি শুধু সেই পরম তত্ত্বকে

জানতে চাই।' তাই আমরা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি। এমন মন চাই যে ভালো ও মন্দ, নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝতে পারে।

রুদ্র বা পরমেশ্বরই বিভিন্ন দেবদেবীকে তাঁদের বিশেষ শক্তি দান করেন। আমরা সূর্যের দিকে চেয়ে বলি, 'আহা! কী আশ্চর্য জিনিস!' কিন্তু এই সূর্যের উৎস কি? ফুল কোথা থেকে তার সুগন্ধ, তার মনমাতানো অপূর্ব রঙ পায়? তিনিই 'উদ্ভবঃ', অর্থাৎ কোন কিছুর বিশেষ গুণ বা শক্তি—সে তাঁরই দান।

তাঁকে আবার এখানে 'মহর্ষি' বলা হয়েছে, কারণ তিনিই পরম 'ঋষি', ব্রহ্মজ্ঞ। তিনিই আবার হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা। 'হিরণ্য' কথাটার অর্থ 'সুবর্ণময়', এবং 'গর্ভ' অর্থাৎ 'জঠর'। এর আর এক অর্থ 'জ্ঞানের উৎস'। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। তাই শুদ্ধ জ্ঞানের জন্য এই ব্রহ্মের কাছে আমরা প্রার্থনা করি।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥৫

অন্বয়: রুদ্র (হে রুদ্র); গিরিশন্ত (হে গিরিশন্ত [গিরি শিখরে বসে যিনি সকলের যথার্থ সুখ ও মঙ্গলবিধান করেন]); যা তে (সেই [কৃপা কটাক্ষ]); শিবা (মঙ্গলময় [অবিদ্যার অতীত]); অঘোরা (ভয়াবহ নয় [শান্ত, জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ]); অপাপকাশিনী (পুণ্য প্রকাশক [যা স্মরণ করলেই পাপ ক্ষয় হয়]); তনূঃ (শরীর [রূপ, পরিচয়, উপস্থিতি]); তয়া শন্তময়া তনুবা (সেই মধুর, মঙ্গলময় রূপ দিয়ে [আনন্দে পূর্ণ]); নঃ অভিচাকশীহি (আমাদের দিকে চাও [আমাদের দেখ, বর্ষণ কর তোমার অনুগ্রহ])।

সরলার্থ: হে শৈলশিখরবাসী শান্ত, পবিত্র এবং মঙ্গলময় রুদ্র, আপনার করুণাঘন দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হোক (যাতে সঠিক পথ ধরে অন্তে আমরা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি)।

ব্যাখ্যা: 'নঃ অভিচাকশীহি'—আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন। কোন পুণ্যাত্মা, কোন মহাত্মা যখন আপনার দিকে তাকান তখন আপনার মনে হয় আপনি ধন্য হয়ে গেলেন। তাঁকে মুখ ফুটে বলতে হয় না, 'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, আমি তোমাকে রক্ষা করব, সবসময় আগলে রাখব।' কিন্তু যখন, যাঁর দিকেই তিনি তাকান না কেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে সকলের প্রতি ভালোবাসা, করুণা, শুভেচ্ছা ঝরে পড়ে। তাঁর দৃষ্টি 'অপাপকাশিনী'—অর্থাৎ 'পুণ্যময়ী', কল্যাণকারী। সে দৃষ্টি আপনার মনকে উন্নত করে, আপনাকে শক্তি দেয়। সে দৃষ্টি মঙ্গলময় ('অঘোরা') অর্থাৎ অভয়প্রদ। বস্তুত তাঁর মূর্তিটিই আনন্দঘন ও প্রেমময়।

এখানে তাঁকে ‘গিরিশন্ত’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ‘গিরিশন্ত’, অর্থাৎ যিনি হিমালয়ে থাকেন। শক্তিমান, বিশালায়তন হিমালয় হিন্দুর কাছে দেবতাত্মা, পুণ্য ও পবিত্রতার প্রতীক। অসংখ্য নদীর উৎস এই হিমালয়, সেই কারণে প্রাণদায়ীও বটে। তাই সহজেই আমরা পরমেশ্বরকে এক দেবতারূপে কল্পনা করে নিয়েছি যিনি হিমালয়ে থাকেন এবং যিনি প্রসন্ন ও করুণাঘন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। আমরা যাতে সঠিক পথটি চিনে নিয়ে অবশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারি সেইজন্য তাঁর আশীর্বাদ আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥৬

অন্বয়: গিরিশন্ত (হে হিমালয়বাসী); গিরিত্র (তুমি যে হিমালয়কে রক্ষা কর); যাম্ ইষুম্ (যে বজ্র [অথবা বাণ]); অস্তবে (মানুষের প্রতি উদ্যত); হস্তে বিভর্ষি ([তুমি] হাতে ধরে আছ); তাং শিবাং কুরু (তা মঙ্গলময় কর); পুরুষম্ (কাউকে [আমাদের মধ্যে]); জগৎ (এই বিশ্বকে); মা হিংসীঃ (দয়া করে আঘাত করো না)।

সরলার্থ: হে হিমালয়ের রক্ষক এবং দেবতা, আপনার হাতে বজ্র, সেই বজ্র যেন আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করতে উদ্যত। অনুগ্রহ করে ঐ বজ্রকে মঙ্গলময় করুন। দয়া করে ঐ বজ্র দিয়ে আপনি আমাদের মধ্যে কাউকে অথবা জগৎকে আঘাত করবেন না।

ব্যাখ্যা: হিমালয়বাসী এই দেবতা করুণাময় হতে পারেন, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় তাঁর হাতে মারাত্মক অস্ত্রও আছে। তাই দেবতার কাছে যখন আমরা ভালো ভালো জিনিস চাইব তখন এই প্রার্থনাও করতে হবে যেন কোন অশুভ আমাদের স্পর্শ না করে। এটাও লক্ষণীয় যে শুধু নিজের জন্যই প্রার্থনা করছি না, গোটা বিশ্বের (জগৎ) কল্যাণের জন্যও প্রার্থনা করছি।

এ জগতে বহু অশুভ বস্তু আছে। সেগুলোকে কিভাবে অতিক্রম করা যায়? সেগুলোকে ভালো করা যায় কি করে?

এর উত্তরে বলা যায়—এমন কিছু জিনিস আছে যাদের পরিবর্তন সম্ভব। যেমন ধরুন, দারিদ্র। আপনার যদি অভাব থাকে, আপনি একথা কখনো বলবেন না ‘জীবন এরকমই, আমাকে এটা মেনে নিতে হবে।’ একথা ঠিক নয়, এ তো পরাজিতের মনোবৃত্তি, এ কাপুরুষতা। দারিদ্র যদি থাকেই তবে সর্বশক্তি দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এবং আপনি তা করেও থাকেন। কিন্তু এমন কিছু বস্তু আছে যা অপরিবর্তনীয়। যেমন, মৃত্যু।

মৃত্যুকে আপনি কোনমতেই রোধ করতে পারবেন না। এটা অমোঘ সত্য। মৃত্যুকে অতিক্রম করার একমাত্র পথ তাকে স্বীকার করে নেওয়া, মৃত্যুর প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে ফেলা। মৃত শিশু কোলে নিয়ে একবার এক নারী বুদ্ধের কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার একমাত্র সন্তানকে আমি হারিয়েছি। আপনি একে বাঁচিয়ে দিন।' উত্তরে বুদ্ধ বললেন, 'মা, এটা এমন একটা ব্যাপার যে আমার কিছুই করার নেই। বস্তুত কারোরই কিছু করার নেই। মৃত্যু যে অনিবার্য।' কিন্তু শোকাতুরা মায়ের মন সেকথায় শান্ত হল না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'না, আপনি নিশ্চয় আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন এবং আমার মুখ চেয়ে আপনি এ অবশ্যই করবেন।' সব শুনে বুদ্ধ বললেন, 'বেশ। যে পরিবারে কখনো কারও মৃত্যু হয়নি এমন বাড়ি থেকে একমুঠো সরষে নিয়ে এস।' সেই নারী তখন দ্বারে দ্বারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'আপনাদের পরিবারে কখনো কি কারও মৃত্যু হয়েছে?' সর্বত্রই এক উত্তর, 'হ্যাঁ হয়েছে বৈকি। আমার পরিবারে অমুকের মৃত্যু হয়েছে।' এমন একটাও বাড়ি পাওয়া গেল না যেখানে কখনো মৃত্যু প্রবেশ করেনি। পরদিন সেই নারী বুদ্ধের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন বুদ্ধ তাঁকে বললেন, 'দেখলে তো! মৃত্যু অনিবার্য। একে মেনে নিতেই হবে।' এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে— 'আমি যদি অদ্বৈতবাদী হই, আমি যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করি, তাহলে কার কাছে প্রার্থনা করব? এবং কেনই বা করব?' এর উত্তর এই, আপনি আপনার কাছেই প্রার্থনা করছেন বা করবেন। কারণ সব শক্তির উৎস তো আপনার ভিতরেই রয়েছে। শুধু সাধনার সুবিধার জন্য সাময়িকভাবে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে আপনার আত্মা, যা সব শক্তির উৎস, তিনি হিমালয়ে আছেন।

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥৭

অন্বয়: ততঃ পরম্ (তার থেকেও শ্রেষ্ঠ [জগৎ, এমনকি বিরাট, যা সকল জগতের সমষ্টিরূপ তার থেকেও]); ব্রহ্ম পরম্ (ব্রহ্মার চেয়েও [হিরণ্যগর্ভ, যিনি ব্যবহারিক জগতে পরব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ, অথবা সকল মনের সমষ্টি]); বৃহন্তম্ (মহান, বিশাল, অনন্ত); যথানিকায়ম্ (সকল জীবের শরীরেই আছেন); সর্বভূতেষু গূঢ়ম্ (সর্বভূতের অন্তরে লুকিয়ে আছেন); বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ (সমস্ত জগৎকে যিনি নিজের মধ্যে ধরে আছেন); তম্

ঈশং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি (যাঁরা এই পরমাত্মাকে [পরমেশ্বরকে] জানেন, তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ: পরমাত্মা (পরমেশ্বর) এই বিশ্বের চেয়েও বিশাল (অর্থাৎ যে 'বিরাট' সকল জগতের সমষ্টিরূপ, তাঁর চেয়েও বড়)। এমনকি হিরণ্যগর্ভ (অর্থাৎ, সকল মনের সমষ্টি)-র থেকেও বড়। তিনি সর্বব্যাপী। জগতে যত রূপ আছে সব তাঁরই রূপ। তিনি সকলের হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন; অথচ তিনিই গোটা বিশ্বকে নিজের ভিতর ধারণ করে আছেন। যাঁরা এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁরাই অমরত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: সেই পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান। এই দৃশ্যমান জগতের সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে থেকেও তিনি আবার এই জগতের বাইরেও (ততঃ পরম্) আছেন। এটা যেন আমরা ভেবে না বসি তিনি এই জগতেই ফুরিয়ে গেছেন। না, তা নয়। তিনি হিরণ্যগর্ভেরও ঊর্ধ্বে (ব্রহ্ম পরম্)। বস্তুত ব্রহ্ম যে কত বড় তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা শুধু এইটুকু জানি, তিনি প্রকাণ্ড, 'বৃহৎ'। তিনি বিশ্বগত — এই জগতে বিভিন্নরূপে যা কিছু আছে সবার মধ্যেই তিনি (যথানিকায়ম্)। সবচাইতে ছোট যা, তার মধ্যেও তিনি, আবার সবচাইতে বড় যা, তার মধ্যেও তিনি। গোটা বিশ্বকে তিনি ঘিরে আছেন, জড়িয়ে আছেন। তাঁকে জানলেই মানুষ অমর হয়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান।

জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? বন্ধন এবং মুক্তির মধ্যে তফাতটা কোথায়? সত্যি বলতে কি, তফাত খুবই সামান্য এবং তা শুধু ব্রহ্মকে জানা আর না জানা এই নিয়ে। আপনি যদি উপলব্ধি করেন পরমাত্মার সঙ্গে আপনি অভিন্ন, যদি আপনি বোঝেন আপনিই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন, যদি আপনি একথা জানেন, এক পরম সত্তাই নানা নাম, নানা রূপ ধরে বিরাজ করছেন, তখনি আপনার ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়েছে বলতে হবে। আপনার বন্ধন খসে গেছে। এই সত্যই উপনিষদ আমাদের বোঝাতে চাইছেন।

নাম ও রূপের জন্যই—আমাদের মধ্যে যত পার্থক্য, যত বিভিন্নতা। কিন্তু নাম এবং রূপের তো পরিবর্তন হয়। এগুলি অনিত্য। নাম এবং রূপের সঙ্গে তাই আমাদের প্রকৃত সত্তার কোন সম্পর্ক নেই। ওগুলো আরোপিত বস্তু, চাপানো জিনিস। ইচ্ছা করলে ওগুলিকে বর্জন করা যায়, পালটানো যায়। বস্তুত আমাদের শরীর প্রতি মুহূর্তেই পালটে যাচ্ছে। হয় দেহ বাড়ছে, নয়তো ক্ষয় হচ্ছে। গোটা বিশ্ব যেন এক পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের পেছনে একটি অপরিবর্তনীয়, নিত্য সত্তা আছে এবং সেইটিই আমাদের প্রকৃত সত্তা। এই সত্তার পরিচয় জানলে কোনকিছুই আর আমাদের বিচলিত করতে পারে না। তখন শরীরে যাই ঘটুক না কেন, তার প্রতি আমাদের একটা

উপেক্ষার ভাব জেগে ওঠে। উপনিষদ চান আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয়কে জানি, এই পরিচয়কে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে একটা গৌরববোধ জেগে উঠুক। আমরাই আমাদের প্রভু, আমরা দাস নই— এটাই উপনিষদের বক্তব্য।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥৮

অন্বয়: অহম্ (আমি); তমসঃ পরস্তাৎ (অজ্ঞানের পার); আদিত্য-বর্ণম্ (সূর্যের মতো উজ্জ্বল); এতং মহান্তং পুরুষম্ (সেই মহান পুরুষকে); বেদ (জানি); তম্ এব বিদিত্বা (তাকে জেনেই); মৃত্যু অতি-এতি ([সাধক] মৃত্যুকে অতিক্রম করেন); অয়নায় (অমরত্বলাভের); অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে (অন্য কোন পথ নেই)।

সরলার্থ: (উপনিষদের ঋষি বলছেন) আমি সেই মহান পুরুষকে (সেই পরমাত্মাকে) জেনেছি। তিনি অজ্ঞানের পার, তিনি সূর্যের মতোই স্বপ্রকাশ। সাধক যদি সেই জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাকে জানেন, তবে তিনি (স্বতই) মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অমরত্ব লাভ করবার অন্য কোন পথ নেই।

ব্যাখ্যা: 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।' 'সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। আমার সেই জ্ঞান, সেই অভিজ্ঞতা আমি তোমাদের বিলিয়ে দিতে চাই।' উপলব্ধিমান পুরুষেরা সকলেই এই কথা বলেন যে যখন কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা জাগে। তাঁর মনে হয় : 'যে অনন্য অভিজ্ঞতা আমাকে অপরিমেয় আনন্দ এবং শান্তি দিয়েছে সে অভিজ্ঞতা এবং আনন্দ স্বার্থপরের মতো আমি একলা ভোগ করতে পারি না। আমি এখনি সেই আনন্দ সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাই দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ীর ছাতে উঠে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন আর বলতেন, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়।'

পরমাত্মাকে এখানে 'আদিত্যবর্ণম্' অর্থাৎ, সূর্যের মতো উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত, জ্যোতির্ময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেন তিনি উজ্জ্বল? কারণ তিনি শুদ্ধ। জ্ঞান সর্বদাই উজ্জ্বল। আর জ্ঞানের বিপরীত যে অজ্ঞান, তাকে সর্বদা অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। 'তমসঃ পরস্তাৎ'—এই জ্ঞান সব অন্ধকার, সব অজ্ঞান দূর করে। সূর্য উঠলে যেমন অন্ধকার থাকে না, ঠিক তেমনি জ্ঞান হলে অজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন :

'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালামাত্র অন্ধকার দূর হয়ে যায়, একটু একটু করে হয় না।'

আপনি যদি সেই পরম পুরুষকে জানতে পারেন, তবে আপনি মৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠে গেলেন। অর্থাৎ আপনার আর মৃত্যুভয় থাকে না। আপনি তখন জেনে গেছেন—আপনি কে। মৃত্যু যদি আসেই তবে তা দেহের, আপনার নয়। দেহ থাকল কি গেল তা নিয়ে তখন আর আপনার কোন মাথাব্যথা নেই। মৃত্যুকে অতিক্রম করা বলতে এইরকম একটা অবস্থার কথাই বোঝাচ্ছে। তখন আপনি মুক্ত। আপনার আর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানাই জীবনের পরম লক্ষ্য। মুক্তিলাভের অন্য কোন পথ নেই।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।।৯

অন্বয়: যস্মাৎ পরং ন অপরং কিঞ্চিৎ অস্তি (যাঁর [পরমাত্মা বা পরমেশ্বর] থেকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট আর কিছু নেই); যস্মাৎ অণীয়ঃ ন জ্যায়ঃ ন কশ্চিৎ অস্তি (যাঁর থেকে [পরমাত্মা বা পরমেশ্বর] ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর আর কিছুই নেই); বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ (বৃক্ষের মতোই নিশ্চল); দিবি তিষ্ঠতি একঃ (আপন মহিমায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন); তেন পুরুষেণ (সেই পুরুষের [পরমাত্মার] দ্বারা); ইদং সর্বং পূর্ণম্ (এইসব [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ] পূর্ণ হয়ে আছে)।

সরলার্থ: এই পরমাত্মার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। এই পরমাত্মার চেয়ে ছোট বা বড়ও আর কিছু নেই। এই আত্মা নিজের মহিমায় ভাস্বর, বিশাল বনস্পতির মতো একা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই জগৎকে পূর্ণ করে আছেন।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে আবার 'পুরুষ' বলা হচ্ছে। 'পুরুষ' বলতে সাধারণত আমরা মানুষই বুঝি। কিন্তু এখানে 'পুরুষ' মানে অন্তরাত্মা, কারণ প্রত্যেকের হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। এই আত্মাকে আবার 'পূর্ণম্' বলা হয়েছে কারণ একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত জগৎকে পূর্ণ করে আছেন। তিনি জগদ্ব্যাপী। ব্রহ্মের চেয়ে তাই ক্ষুদ্রতর কিছু নেই। কঠ উপনিষদ (১।২।২০) বলছেন, 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—(ব্রহ্ম) ছোটর থেকেও ছোট এবং বড়র চেয়েও বড়। কথাটা যদিও স্ববিরোধী বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। কারণ ব্রহ্ম সবকিছুর মধ্যেই আছেন। বড়, ছোট, ভালো, মন্দ, যা কিছু সবই তিনি। তিনিই আমাদের অন্তরতম আত্মা, সারাৎসার।

'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ'। ব্রহ্মকে এখানে গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চমৎকার উপমা। একটা বিশাল গাছের দিকে তাকান। দেখবেন সে শান্ত, নীরব, আত্মস্থ— যেন রাজকীয় মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন সংগ্রাম নেই, চঞ্চলতা নেই। আর আমরা? সবসময় ছটফট করছি, অস্থির, সংগ্রামে মত্ত। কিন্তু গাছটি? সে স্থির। তাই ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে—'দিবি', অর্থাৎ তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁর দীপ্তি কোনকিছুর উপর নির্ভর করে না। তিনি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥১০

অন্বয়: যৎ ততঃ উত্তরতরম্ (যিনি এই [বিশ্বের] কারণেরও [অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভেরও] কারণ); তৎ অরূপম্ অনাময়ম্ (তিনি নিরাকার এবং সব দুঃখের ঊর্ধ্বে); যে এতৎ বিদুঃ (যাঁরা এটা জানেন); তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁরা অমর হন); অথ ইতরে দুঃখম্ এব অপিয়ন্তি (আর অন্যেরা দুঃখই পান)।

সরলার্থ: সেই (পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম) হিরণ্যগর্ভের কারণ এবং হিরণ্যগর্ভ এই বিশ্বের কারণ। সেই পরমাত্মা নিরাকার। তাঁর শারীরিক বা অন্য কোন দুঃখ নেই। যাঁরা এই সত্য জানেন তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়, অন্যরা দুঃখ ভোগ করেন।

ব্যাখ্যা: 'উত্তর' শব্দটির অর্থ 'কারণ', অর্থাৎ আদি কারণ; সবকিছুর উৎস, সব কারণের কারণ। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ব্রহ্ম 'সর্ব কারণ কারণম্' —তিনি সকল কারণের মূল। তিনিই আদিকারণ এবং সবকিছুর উৎস। ব্রহ্ম কার্য-কারণের ঊর্ধ্বে কারণ তাঁর কোন স্রষ্টা নেই এবং তিনি স্বনির্ভর। তিনি কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত নন। পুরোপুরি স্বনির্ভর এমন কিছুর ধারণা করা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত। কারণ এই মুহূর্তেই আমরা একাধিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং এই অবস্থাগুলি না থাকলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। অনুকূল পরিবেশে একজন হয়তো খুবই সুখী; কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি যদি হঠাৎ পালটে যায়, তাহলে তার সুখ কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'এ তো দাসত্ব! তুমি যে দাস, সেকথা তুমি বোঝ না? তোমার সুখ, তোমার আনন্দ কতগুলো বাইরের বস্তু এবং অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তুমি কেমন করে তোমার প্রভু হবে?' উপনিষদ বলছেন, বাইরের কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর নির্ভর না করেও তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে পার। কারণ আনন্দ ভেতরেই আছে। বিষয়-নিরপেক্ষ এই আনন্দের অবস্থায় তখনি পৌঁছনো যায়

যখন কেউ বোঝেন তিনিই স্বরূপত ব্রহ্ম, তিনি ‘অরূপম্’, নিরাকার অর্থাৎ তাঁর শরীর নেই এবং ‘অনাময়ম্’, দুঃখবিহীন।

সাধারণত তিন রকমের দুঃখ আছে—‘আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক।’ আধ্যাত্মিক দুঃখ আসে শরীর থেকে; যেমন শরীরে হয়তো ফোঁড়া বা অন্য কোন অসুখ হল। এখন আমরা দেহসর্বস্ব। দেহ ছাড়া আর কিছুই জানি না। তাই শরীরের যন্ত্রণা হলে আমরা যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ি। আধিভৌতিক দুঃখ আসে জীবজন্তু বা কীটপতঙ্গ থেকে; যেমন কাউকে হয়তো সাপে কাটল, মশা কামড়াল বা বাঘে তাড়া করল। আধিদৈবিক দুঃখ আসে আগুন, জল ইত্যাদি পঞ্চভূত থেকে। যেমন হয়তো ভূমিকম্প বা বন্যা অথবা খুব গরম বা শীত পড়ল। এগুলি আধিদৈবিক। যতক্ষণ নিজেকে দেহ মনে করব, ততক্ষণ এইসব দুঃখ-কষ্টের ভোগ থাকবেই।

উপনিষদ বলছেন ‘তাঁকে জানলে তুমি অমর হবে।’ কিন্তু ‘তাঁকে জানা’, একথার অর্থ কি? এখানে আসলে ‘হওয়ার’ উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। জানার উপর নয়। আমরাই যে ব্রহ্ম, আমরাই যে পরম—এই সত্যকে আমাদের বোধে বোধ করতে হবে। নিছক জ্ঞানের বড় একটা মূল্য নেই। আমরা অনেকেই কিছু জানতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান যদি আমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করি, তাহলে তার মূল্য কি? আমরা হয়তো বুঝি যে আমাদের মধ্যে দেবত্ব আছে, আমরা শুধু একতাল মাংসপিণ্ডই নই। কিন্তু এই চিন্তাকে বাস্তব করে তুলতে হবে। এই চিন্তাকে কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য এটাও ঠিক, এইসব উচ্চচিন্তা করাও মন্দের ভালো। শাস্ত্র শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন—এই তিনটি জিনিসের কথা বলেছেন। বলা হচ্ছে, তুমি যে স্বরূপত দেবতা—এই কথা প্রথমে শোন (শ্রবণ)। তারপর এই সত্যটি তুমি গভীরভাবে চিন্তা কর (মনন)। সবশেষে এই তত্ত্ব নিয়ে ধ্যানে ডুবে যাও (নিদিধ্যাসন)। একাগ্রতার সাহায্যে তত্ত্বটিকে আঁকড়ে ধর এবং নিজেকে ধীরে ধীরে পালটে ফেল—একেবারে নতুন মানুষ হয়ে যাও। তত্ত্বচিন্তা—এ যেন একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহার, চরিত্র সবকিছুই একেবারে আমূল পালটে দেয়।

বেদান্ত এই উপলব্ধির উপরই জোর দেয়। উপলব্ধিই সার কথা। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ধর্ম হল অনুভূতি। এক ঝুড়ি কথা বললাম বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করলাম—সেটা ধর্ম নয়। ধর্ম হল উপলব্ধি বা অনুভূতি। ধর্ম হল হওয়া। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বোধ করলে, মানুষের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পালটে যায়। আমি দেহ নই, শুধু এইটুকু জানলেই গভীর আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়। বাস্তবিক, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এই শরীর আমাদের কতই না কষ্ট দেয়। শরীরের হাজার বায়নাক্কা! আমার কোন অসুখ থাকতেই পারে; কিন্তু আমি যদি দেহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলি তাহলে দেহের

ব্যাধি নিয়ে খামোকা উদ্বিগ্ন হব না। আমার মনে হবে যেন এ দেহ আমার নয়, অন্য কারও। এরকম ভাবতে পারলে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়।

আমরা যে দেবতা, এই সত্যের উপলব্ধি যতটা সহজ বলে মনে হয়, বাস্তবিক কিন্তু ততটা সহজ নয়। এই সত্য উপলব্ধির জন্য নিরন্তর সংগ্রামের প্রয়োজন। অনেকে একটু কিছু করেই নিরাশ হয়ে পড়েন। ভাবেন, 'অনেক সংগ্রামই তো করলাম; আর পারি না। লক্ষ্যে পৌঁছানো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এসব আমার জন্য নয়, অধিকারী পুরুষদের জন্য।' কিন্তু উপনিষদের বক্তব্য, এই সত্যে সকলেরই অধিকার। কারণ এই সত্যই তো আমার, আপনার প্রকৃত স্বরূপ। শুধু সেকথা আমরা জানি না, এই যা। যে কোন কারণেই হোক আমরা সম্মোহিত হয়ে আছি; এই সম্মোহনের ঘোর কাটিয়ে উঠতে হবে। কাজটি শক্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার সফল হলে সে আনন্দ রাখবার জায়গা থাকে না। যাঁরা ঋষি এবং মহাপুরুষ তাঁরা বলেন, এই আনন্দ অবর্ণনীয়। জগতের আর কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই পরমানন্দের তুলনা চলে না। এই যে অপার আনন্দের অভিজ্ঞতা, তার তুলনায় একটু সংগ্রাম, একটু ত্যাগ—ও কিছুই নয়।

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥১১

অন্বয়: [যস্মাৎ সঃ] সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ (যেহেতু সব মুখ, সব মাথা এবং সব ঘাড় তাঁরই [পরমাত্মার]); সর্বভূত-গুহাশয়ঃ (তিনি [সেই পরমাত্মাই] সকল জীবের বুদ্ধিতে আছেন); [তথা] সর্বব্যাপী (এবং সর্বব্যাপী ভগবান, ঈশ্বর [যিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী—সম্পদ, শক্তি, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য]); তস্মাৎ সঃ সর্বগতঃ (সেই কারণে তিনি [পরমাত্মা] সকল প্রাণীর অন্তর্যামী); শিবঃ (মঙ্গলময় [যেহেতু তিনি আনন্দস্বরূপ])।

সরলার্থ: যত প্রাণীর যত মুখ, ঘাড় ও মাথা—সবই তাঁর। প্রত্যেকের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) তাঁর অবস্থান। তিনি সর্বত্র ও সর্বব্যাপী। তিনিই ঈশ্বর (অর্থাৎ, আত্মাই সকলের চেয়ে বড়, সার্বভৌম)। এই কারণেই তিনি (আত্মা) সর্বভূতে বিরাজ করছেন। এই আত্মাই (ঈশ্বর) সকল কল্যাণের আকর।

ব্যাখ্যা: পরম সত্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করলেই যত দুঃখ-কষ্ট। এখন আমরা দেহকেন্দ্রিক। দেহ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। তাই আমরা ভাবি, আমি একজন মানুষ, আপনি আরেকজন। আমার এক রকম চেহারা, আপনার আরেক রকম। এইভাবে 'এক' না দেখে 'বহু' দেখি বলেই আমাদের মধ্যে হয় ভালোবাসা নাহয় ঘৃণার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ভালোবাসা ও ঘৃণা একই টাকার এপিঠ, ওপিঠ। আমরা আজ যাকে ভালোবাসি, কালই হয়তো তাকে ঘৃণা করতে শুরু করি। আমাদের ভালোবাসা ক্ষণিকের। এরকম যে ঘটে তার কারণ আমরা ভালোবাসতে জানি না। কেবল যখন আমরা দেহ-চেতনার উর্ধ্বে উঠে দেখি যে সবই সেই এক দৈবী সত্তা, তখনি আমরা সত্যিকারের ভালোবাসতে পারি। যখন আমরা বুঝতে পারি আমি আপনি আলাদা নই, আমিই ঘটে ঘটে বিরাজ করছি, তখন সকলের প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবেই আসে।

সব ঐশ্বর্য, সব মহিমা যাঁর ভিতর তিনিই 'ভগবান'। ভগবানের ছটি ঐশ্বর্য। প্রথম ঐশ্বর্য —সম্পদ, দ্বিতীয়—শক্তি, তৃতীয়—যশ, চতুর্থ—সৌন্দর্য, পঞ্চম—জ্ঞান, ষষ্ঠ— বৈরাগ্য। যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু শুভ তারই একটা রূপ হচ্ছেন ভগবান, তিনিই শিব। এই তাঁর যথার্থ স্বরূপ।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥১২

অন্বয়: মহান্ (সর্বব্যাপী); প্রভুঃ (সর্বশক্তিমান); বৈ (অবশ্যই); পুরুষঃ (সেই মহান সত্তা [যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন]); [তথা (এবং)]; সুনির্মলাম্ (বিশুদ্ধতা [যাতে অজ্ঞানতার লেশমাত্র নেই]); ইমাং প্রাপ্তিম্ (এই অবস্থা); সত্ত্বস্য (মনের); প্রবর্তকঃ (অনুপ্রাণিত করেন [লাভ করার জন্য]); এষঃ ঈশানঃ (এই পরমেশ্বর); জ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রভ); অব্যয়ঃ (অবিকারী [অক্ষয়])।

সরলার্থ: এই মহান প্রভু সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান। তিনিই মনকে শুদ্ধ হওয়ার জন্য (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের) প্রেরণা দেন। তিনিই পরমেশ্বর, স্বয়ংপ্রভ এবং অপরিবর্তনীয়।

ব্যাখ্যা: এখানে পরমাত্মাকে 'প্রবর্তক' বলা হচ্ছে। প্রবর্তক অর্থাৎ 'পরিচালক', 'প্রেরণাদাতা'। তিনি কাকে চালান? 'সত্ত্ব' অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে। মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান —একথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এই বুদ্ধি মানুষ কার কাছ থেকে পায়? ব্রহ্ম বা প্রবর্তকের কাছ থেকে। তিনি পরম 'প্রাপ্তি'লাভের জন্য বুদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করেন। 'প্রাপ্তি' আবার বহু রকমের, যেমন—অর্থ, সৌন্দর্য এবং পাণ্ডিত্য। কিন্তু উপনিষদ এখানে যে প্রাপ্তির কথা বলছেন তা 'সুনির্মলাং প্রাপ্তিম্'—শুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্তি। সেই অবস্থায় অবিদ্যার লেশমাত্র নেই। এই প্রাপ্তিকেই অধ্যাত্ম জ্ঞান, বোধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভব বলা হয়। একমাত্র আত্মজ্ঞানকেই 'সুনির্মলাম্ বলে। কঠ উপনিষদে নচিকেতা যমের কাছে এই জ্ঞান চেয়েছিলেন। যম নচিকেতাকে অর্থ, ক্ষমতা, দীর্ঘ পরমায়ু, এমনকি দেবতার পদ দেবার

প্রলোভন দেখিয়ে আত্মজ্ঞানের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু নচিকেতা অনড়। তিনি সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এ সমস্তই 'শ্বোভাবাঃ'—বিনাশশীল। এগুলি চিরস্থায়ী নয়। আমি সেই বস্তু চাই যা অবিনাশী। সেই বস্তুটি কি? আত্মজ্ঞান—যে জ্ঞান পূর্ণতা দেয়। যে জ্ঞান বলে দেয়, আমি কে। একমাত্র সেই জ্ঞানই 'অব্যয়ঃ'। সেই জ্ঞান কখনো নষ্ট হয় না।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥১৩

অন্বয়: অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ ([হৃদয়ে অনুভূত] বুড়ো আঙুলের মতো ছোট); পুরুষঃ (পরমাত্মা [যিনি বিশ্বচরাচর পূর্ণ করে আছেন]); অন্তরাত্মা (অন্তরতম সত্তা); জনানাং হৃদয়ে (সকলের হৃদয়ে); সদা সন্নিবিষ্টঃ (সর্বদা বিরাজমান); মন্বীশঃ (যিনি জ্ঞানাধীশ [পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের উৎস]); হৃদা (হৃদয়ের, সেই চেতনার [এবং যা মনের নানান বৃত্তিরূপে প্রকাশিত]); মনসা ([শুদ্ধ] মনের দ্বারা [যখন মন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়], তার দ্বারা); অভিক্লৃপ্তঃ (প্রকাশিত); যে এতৎ বিদুঃ (যাঁরা এই তত্ত্ব জানেন); তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁরা অমর হয়ে যান)।

সরলার্থ: তিনি বুড়ো আঙুলের মতোই ক্ষুদ্র, অথচ তিনি এই বিশ্বচরাচর পূর্ণ করে আছেন। তিনি অন্তরতম সত্তারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনিই জ্ঞানের উৎস। মনের নানান বৃত্তি, এমনকি শুদ্ধ মনের বিষয়শূন্য বুদ্ধিবৃত্তি হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যাঁরা একথা জানেন তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা: শাস্ত্রে অনেক জায়গাতেই পরমাত্মাকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের মতো বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না; কারণ পরমাত্মা স্থূলবস্তু নন যে তাঁকে আমরা ছোট বা বড় বলে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন আমরা ধ্যানে বসি তখন ভাবতে চেষ্টা করি পরমাত্মা হৃদয়ে বিরাজ করছেন। এরকম যে ভাবা হয় তারও একটা যুক্তি আছে। যুক্তিটা এই—হৃদয়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আর মনটি যেন হৃদয়ের অন্তর্গত। 'মনসা'—মনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। মনে করুন আপনার ঘরে একটা আলো জ্বলছে আর আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমি কেমন করে জানব যে আপনার ঘরে আলো জ্বলছে? যদি জানলা খোলা থাকে অথবা খড়খড়ি তোলা থাকে তবেই বাইরে থেকে ঘরের আলো আমি দেখতে পাব। ঠিক সেরকম,

ব্রহ্মজ্যোতি আমাদের অন্তরেই রয়েছে আর মনটি যেন জানলা। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও জানলার মতো, যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। তবে মনের মাধ্যমেই ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ।

'সন্নিবিষ্টঃ' অর্থাৎ 'সম্যক্ নিবিষ্টঃ'। 'সম্যক্' অর্থ ভালোভাবে এবং 'নিবিষ্ট' অর্থ প্রবিষ্ট, বসে আছেন। আমাদের ভিতর, হৃদয়ের মধ্যে তিনি ভালোভাবে বসে আছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি আমাদের অন্তরে নিত্য বিরাজিত। এমন নয়, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। আমাদের হৃদয়ে তাঁর নিত্যকালের আসন পাতা। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আমাদের ছেড়ে যান না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেবিষয়ে সচেতন নই।

সব মুনি-ঋষিদের একই কথা। সকলেই বলেন হৃদয় হচ্ছে ডঙ্কামারা জায়গা; সেখানেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়। বাইরের জগতে স্থূল জিনিস দেখে আমাদের যে অনুভূতি হয়, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা অনুভূতি ঠিক সেইরকম সর্বজনগ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা নয়। অথচ এই অনুভূতি এতটাই বাস্তব যে মনে হয় আমি যেন বাইরের কোন বস্তুই দেখছি। এইজন্য শাস্ত্র 'হস্তামলক'— এই শব্দটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ হাতের মুঠোয় যেন একটা আমলকী আছে। এর তাৎপর্য হল আমার হাতের মুঠোয় যদি একটা ফল থাকে, তবে আর কেউ না জানুক, আমি নিশ্চিত যে আমার হাতে ফলটা আছে। কারণ আমি যে ফলটাকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি। এরজন্য কোন প্রমাণ দরকার হয় না। এই অবস্থায় কেউ বলতে পারেন না, 'তোমার হাতে ফলটল কিছুই নেই। ও তোমার কল্পনা।' অনুরূপভাবে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হলেও আপনি তাকে কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না কারণ আপনি জানেন, এটি সত্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি নাহয় আপনার অনুভূতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন, কিন্তু আপনার যে সত্যিকারের অনুভূতি হয়েছে তা অন্য লোকে জানবে কি করে? তার উত্তরে বলা যায়, যখন কারও এইরকম অভিজ্ঞতা হয় তখন তাঁর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে যায়। এককথায় তিনি একেবারে অন্যরকম মানুষ হয়ে যান। তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, চরিত্র পালটে যায়। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম সবকিছুর মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতার দীপ্তি স্ফুরিত হয়, ঠিক যেমন করে ঘরের আলো জানলার খোলা পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্যান্সারের রোগী শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনও আনন্দে ও শান্তিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত থাকত। সেইজন্য তাঁকে যাঁরা দেখতে আসতেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখটা সত্য নয়। কোন না কোন কারণে তিনি বোধহয় রোগের ভান করছেন। কারণ সত্যিই যদি রোগ হত তাহলে সে যন্ত্রণা

মুখচোখে ফুটে উঠত না? আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। তিনি নিশিদিন এমন গভীর আনন্দে ডুবে থাকতেন যে তার তুলনায় দেহের যন্ত্রণা কিছুই না।

মনের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই পরমাত্মার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মনে কখনো কখনো অসৎ চিন্তার উদয় হয়। কিন্তু মন শুদ্ধ হলে সর্বদাই ভালো চিন্তার ফুট ওঠে। কিন্তু ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সব চিন্তারই উৎস পরমাত্মা। কারণ পরমাত্মা আছেন বলেই মন কাজ করে। আর সেই পরমাত্মা অন্তরে বিরাজ করছেন—এই তত্ত্বটি যখন আমরা জানতে পারি, তখনি অমৃতত্ব লাভ করি। জন্মমৃত্যুর পারে চলে যাই। দেহকে 'আমি' মনে করেই আমরা দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি এবং বারবার জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু একথা যদি জানতে পারি, আমি শুদ্ধ আত্মা, একবার যদি আমার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়, তাহলেই আমি মুক্ত। এ অনেকটা ঘুড়ির ভোকাট্টা হওয়ার মতো। আমরা দেখি একটি বালক ঘুড়ি উড়াচ্ছে। বাতাসে ভর করে স্বচ্ছন্দে ঘুড়িটি উপরে উঠে যাচ্ছে। ঘুড়িটি উপরে উঠছে ঠিকই কিন্তু তার টিকি লাটাই-এ বাঁধা। উড়তে উড়তে কখনো এক-আধটা ঘুড়ি কেটে যায়। তখন সেটি যেদিকে খুশি যেতে পারে। একইভাবে, এই দেহ-লাটাই এখন আমাদের অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। দেহের কোথাও একটু যন্ত্রণা হলেই আমরা মুষড়ে পড়ি। আবার ভালো খাবার পেলে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু এই যে স্থূল দেহচেতনা, আমরা এর ঊর্ধ্বে যেতে পারি। এর হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারি। মজাটা হচ্ছে, এখন আমরা মুক্ত নই, তা নয়। আমরা সবসময় মুক্ত, শুধু আমরা সেটা জানি না। চেতনা উন্নত বা দিব্যায়িত হওয়ার নামই উপলব্ধি।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥১৪

অন্বয়: পুরুষঃ (এই পুরুষ); সহস্রশীর্ষা (সহস্র মস্তকবিশিষ্ট [অর্থাৎ অসংখ্য]); সহস্রাক্ষঃ (সহস্র নয়নের অধিকারী); সহস্রপাৎ (সহস্র চরণযুক্ত); সঃ (তিনি); ভূমিম্ (ভুবনকে); বিশ্বতঃ (ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র); বৃত্বা পূর্ণ করে রেখেছেন); অতি (অতিক্রম করে [এই বিশ্বকে]); দশাঙ্গুলম্ (নাভির দশ আঙুল উপরে [অর্থাৎ হৃদয়ে]); অতিষ্ঠৎ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ: এই পরমপুরুষের সহস্র মাথা, সহস্র চোখ এবং সহস্র পা। এই বিশ্বকে তিনি ভিতরে বাহিরে পূর্ণ করে রেখেছেন। একই সঙ্গে আবার তিনি বিশ্বাতীত। নাভির দশ আঙুল উপরে—হৃদয়ে তাঁর অবস্থান।

ব্যাখ্যা: তিনি সমগ্র জগৎকে পূর্ণ করে আছেন। সব মাথাই তাঁর মাথা, সব চোখই তাঁর চোখ। সেই 'এক'ই বহু হয়েছেন। সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাই বিভিন্ন মাথা, বিভিন্ন চোখ, বিভিন্ন পা নিয়ে যেন ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন। বহুরূপে প্রতিভাত হলেও স্বরূপত তিনি এক।

'বিশ্বতঃ', সব ভাবে, সব রূপে। তিনি একই সঙ্গে অন্তরে এবং বাহিরে। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত। সকল বস্তুতে অনুস্যূত হয়েও তিনি সকল বস্তুর বাইরে। বেদান্তে কলসীর উপমা দেওয়া হয়। আপনি যদি একটা কলসী নিয়ে নদীতে ডোবান তাহলে কি হয়? তক্ষুণি কলসীটি জলে ভরে যাবে। কিন্তু একই সঙ্গে কলসীর বাইরেও জল থাকে। তখন কলসীর ভিতরেও জল, বাইরেও জল। ব্রহ্ম ঐরকম— একই সঙ্গে তিনি বিশ্বের ভিতরে এবং বাইরে আছেন। আগের শ্লোকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে ব্রহ্ম আমাদের অন্তরে, আমাদের হৃদয়ে (হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ)। কিন্তু এই শ্লোকে তিনি যে বিশ্বাতীত, সেই দিকটিই দেখানো হয়েছে।

সাধারণভাবে 'দশাঙ্গুলম্' বলতে দশটা আঙুল বোঝায়। আচার্য শঙ্করের ভাষ্যমতে এর অর্থ 'অনন্তম্ অপারম্', অনন্ত এবং অসীম। আগে ব্রহ্মকে বুড়ো আঙুলের মতো অর্থাৎ ছোট এবং খুব সূক্ষ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আবার বিশাল এবং সর্বব্যাপীও বটে। 'দশাঙ্গুলম্' কথাটির অর্থ এও হতে পারে যে ব্রহ্ম নাভির দশ আঙুল উপরে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজ করেন।

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥১৫

অন্বয়: যৎ ভূতম্ (যা অতীত); যৎ চ ভব্যম্ (যা ভবিষ্যৎ); যৎ অন্নেন অতিরোহতি (যা অন্নের দ্বারা প্রতিপালিত [অর্থাৎ, বর্তমান]); ইদং সর্বং পুরুষঃ এব (এ সমস্তই পুরুষ [পরমাত্মা]); অমৃতত্বস্য (মুক্তি বা অমৃতত্বের); উত (আরও); ঈশানঃ (ঈশ্বর [বিধাতা])।
সরলার্থ: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এ সমস্তই পুরুষ। তিনি অমরত্ব দান করেন।
ব্যাখ্যা: তিনি অতীতের দেবতা—'যৎ ভূতম্', যা অতীতে ছিল। তিনি ভবিষ্যতেরও দেবতা—'যৎ ভব্যম্', যা ভবিষ্যতে হবে। আবার তিনি বর্তমানেরও দেবতা—'যৎ অন্নেন অতিরোহতি', যা এখনও বাড়ছে, অর্থাৎ অন্নের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে। জীবিত মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। বেঁচে থাকতে গেলে খেতে হবে। অতএব এটাই দাঁড়াচ্ছে, তিনি এই তিন

কালের (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) অধীশ্বর। তিনি অমৃতের অধীশ্বর—'অমৃতত্বস্য'; এবং একমাত্র তিনিই অমৃতত্ব দিতে পারেন।

সময় বা কালের চিন্তা আমাদের যেন তাড়া করে ফিরছে। কিন্তু এই কালের বোধ আমাদের সীমিত করে। আমরা বলি 'আমি অমুক দিন জন্মেছি।' আবার ঘড়ি দেখে বলি 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।' এখনকার বিজ্ঞানীরাও বলতে শুরু করেছেন, সময়ের ধারণাটা আপেক্ষিক। আপনার সময়ের ধারণা আর আমার সময়ের ধারণা এক নয়। নিরপেক্ষ বা আত্যন্তিক কাল বলে কিছু নেই। কিন্তু অনেক আগে আমাদের ঋষিরা এইকথাই বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, পরম সত্তা বা ব্রহ্ম কালের অতীত। তিনি অমৃত।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৬

অন্বয়: তৎ (সেই [ব্রহ্ম]); সর্বতঃ পাণিপাদম্ (সর্বত্রই তাঁর হাত-পা ছড়ানো); সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখম্ (তাঁর চোখ, মাথা এবং মুখ সর্বত্র প্রসারিত); সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (তাঁর কান সর্বব্যাপী); লোকে (সকল জীবের অন্তরে বিরাজমান); সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি (তিনি সর্বব্যাপী)।

সরলার্থ: ঈশ্বরের হাত, পা সর্বত্র ছড়ানো; তাঁর চোখ, মুখ ও মাথা সর্বত্র প্রসারিত; তার কান সর্বত্রগামী। তিনি সকল জীবের অন্তরে বিরাজমান। তিনি সর্বব্যাপী।

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে উপনিষদ ব্রহ্মকে একই সঙ্গে কালের অতীত এবং কালের কর্তা বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে উপনিষদ বলছেন ব্রহ্ম দেশের অতীতও বটে। বেদান্তমতে দেশ এবং কাল নিছক কল্পনা। তাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। কিন্তু পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম দেশ এবং কাল এ দুয়েরই ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র আছেন। সবকিছু তাঁর দ্বারাই পূর্ণ হয়ে আছে।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ॥১৭

অন্বয়: সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ ([যদিও] তাঁর কোনও ইন্দ্রিয় নেই); সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসম্ ([পুরুষ] ইন্দ্রিয়গুলিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারেন); সর্বস্য প্রভুম্ ঈশানম্ (সকলের

প্রভু এবং নিয়ামক); সর্বস্য বৃহৎ শরণম্ (সকলের পরম আশ্রয়)।

সরলার্থ: যদিও তাঁর কোনও ইন্দ্রিয় নেই, তবু তাঁরই প্রভাবে সব ইন্দ্রিয় কাজ করে। তিনি প্রভু এবং সকলের নিয়ন্তা। তিনিই সকলের পরম আশ্রয়।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য। তিনি নির্গুণ, নিরাকার; তাঁর কোন নাম নেই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সবকিছুর উৎস। ব্রহ্ম আছেন তাই সব আছে। ব্রহ্মকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : 'এক লিখে তারপর একটা শূন্য দিলে দশ হবে। আরেকটা শূন্য দিলে, একশো। এইভাবে যতই শূন্য দেওয়া হবে সংখ্যাটি ততই বাড়বে। কিন্তু একেকে সরিয়ে নাও, তখন শুধু শূন্যই থাকবে।' ব্রহ্ম সবকিছুর উৎস, ব্রহ্মেই সব দাঁড়িয়ে আছে, আবার সবকিছুই ব্রহ্মতে মিশে যাবে। ব্রহ্ম নিজে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তিনিই সবকিছু ঘটান। শ্রীরামকৃষ্ণ চুম্বক ও লোহার উপমা দিতেন। চুম্বক কিছুই করে না, কিন্তু তবু লোহার টুকরোগুলো তার দিকেই ছুটে যায়।

এখানে উপনিষদ বলতে চাইছেন, ব্রহ্মের কোনও ইন্দ্রিয় নেই, তিনি নিরিন্দ্রিয়। তবুও তিনিই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালান। উপনিষদের বক্তব্য—ব্রহ্মকে যেন আমরা পরমাত্মা, প্রভু, ঈশ্বর এবং সর্বময় কর্তা বলে মনে করি। আসল কথাটা হল ব্রহ্ম নিজে কিছুই করেন না, যেহেতু তিনি আমাদের অন্তরাত্মা তাই আমাদের সকলের মধ্য দিয়েই তিনি কাজ করেন। যেমন কঠোপনিষদ (১।৩।৩-৪) বলছেন, জীবাত্মাই রথের রথী বা মালিক, ইন্দ্রিয়গুলি হল ঘোড়া। তেমনি প্রত্যগাত্মার বা অন্তরাত্মার আদেশেই ইন্দ্রিয় কাজ করে। যেহেতু তিনিই সবকিছুর পেছনে আছেন, তাই মনে হয় বুঝি তিনিই সব করছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রভু, তিনি নিয়ন্তা।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥১৮

অন্বয়: স্থাবরস্য (অচল [যেমন, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি]); চরস্য চ (এবং যা চলমান [মানুষ, পশু ইত্যাদি]); সর্বস্য লোকস্য বশী (সমস্ত লোকের নিয়ন্তা); হংসঃ (পরমাত্মা, যিনি অবিদ্যা দূর করেন); নবদ্বারে (নয়টি দ্বারযুক্ত [দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ এবং মল ও মূত্র ত্যাগের দুটি পথ যথাক্রমে উপস্থ ও পায়ু]); পুরে (দেহে); দেহী (জীবাত্মা); বহিঃ (বাইরের জগতে); লেলায়তে (দোলায়িত হয় [অর্থাৎ কাজ করে])।

সরলার্থ: স্থাবর এবং জঙ্গম সবকিছু নিয়ে এই যে বিশ্ব—পরমাত্মাই তার অধীশ্বর। নটি ছিদ্রযুক্ত দেহধারণ করে সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা হয়ে যান। তিনি তখন জাগতিক ব্যাপারে

জড়িয়ে পড়েন।

ব্যাখ্যা: এখানে পরমাত্মাকে 'হংস' বলা হয়েছে। তন্ত্রে 'হংস' শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কথাটার আক্ষরিক অর্থ—রাজহাঁস। আচার্য শঙ্কর বলছেন, যিনি বিনাশ করেন তিনিই হংস (হন্তি যঃ সঃ হংসঃ)। 'হন্তি' মানে 'হত্যা করে', 'বিনাশ করে', 'দূরীভূত করে'। কি বিনাশ করে? অবিদ্যা, অজ্ঞানতা। যেমন শুধু আলোই অন্ধকার দূর করতে পারে, তেমনি কেবল জ্ঞানই অজ্ঞানকে নাশ করে। কিরকম জ্ঞান? ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নয়। আমরা নিজেদের পরিচয় জানি না; আমরা স্বরূপত কে—তা আমরা জানি না। তাই যথার্থ জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায় যা আমাদের কাছে আমাদের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে। উপনিষদ বারবার একই কথা বলছেন। বলছেন, আমরা কে তা আমরা জানি না, এই অজ্ঞানতাই যত কষ্টের মূল। দেহ এবং মনের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলে আমরা ভাবি—আমরা ক্ষুদ্র, দুর্বল, অসহায়, পরমুখাপেক্ষী। অথচ আমরা স্বরূপত স্বাধীন এবং সর্বেসর্বা। আত্মজ্ঞান লাভ হলে বহুকালের সঞ্চিত অজ্ঞানতা দূর হয় এবং আমরা মুক্ত হয়ে যাই।

অজ্ঞানতার জন্যই পরমাত্মা যেন দেহধারণ করেন। বস্তুত তিনি নিরাকার। তাঁর কোন দেহ নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজ করছেন। কিন্তু যতক্ষণ আমার কাঁচা 'আমি'-র বোধ আছে ততক্ষণ আত্মা আমার দেহের মধ্যেই আছেন। এই দেহকে বলা হয়েছে 'নবদ্বার পুর'। দেহ যেন নটি ছিদ্রবিশিষ্ট একটা বাড়ি। নটি ছিদ্র কি কি? দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ এবং পায়ু। অন্তর্যামী আত্মা এইসব রন্ধ্রের সাহায্যে কাজ করেন। 'লেলায়তে বহিঃ'—তিনি বাইরে কাজ করেন, বা বলা যায় খেলা করেন। 'লেলায়তে'-র আক্ষরিক অর্থ 'উত্তেজিত করে' বা 'দোলায়'। তাহলে কি একথা বুঝতে হবে যে আত্মা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করলেও তাঁর স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় না? , তা হয় না। আর না হওয়ার কারণ আত্মা সততই 'বশী' অর্থাৎ প্রভু বা নিয়ন্তা। মানুষ, কীটপতঙ্গ, পশু থেকে শুরু করে পাহাড়-পর্বত, গাছপালা অর্থাৎ স্থাবর (যা নড়েচড়ে বেড়ায়) এবং জঙ্গম (যা নড়ে না) সবকিছু নিয়ে যে জগৎ তা আত্মার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও আমরা কল্পনা করি আত্মা আমার দেহের দ্বারা সীমিত হয়ে দেহের মধ্যেই আছেন। আসলে কিন্তু আত্মা অখণ্ড। তাঁকে টুকরো টুকরো করা যায় না। তিনি একই সঙ্গে দেহগত এবং দেহাতীত। আত্মাই পরম সত্তা।

এখানে আলোচনার ধারাটি লক্ষণীয়। উপনিষদ আমাদের প্রকৃত পরিচয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। উপনিষদ একথা বলছেন না—আমাদের দেহ নেই; উপনিষদের বক্তব্য দেহের গণ্ডী বা সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা কর। বাস্তবিক, আমাদের এই দেহ যেন মস্ত এক সহায়। যে কোন কারণেই হোক, হয়তো অবিদ্যার জন্যই আমরা মনুষ্যদেহ

পেয়েছি। কিন্তু অবিদ্যাকে তো দূর করতে হবে। আর কেবলমাত্র মানবদেহের মাধ্যমেই অবিদ্যা দূর করা যায়। সুতরাং এই দেহ আমাদের মস্ত সম্বল। মানবশরীরের আর এক নাম 'কর্ম্মক্ষেত্র'। এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা জন্মাই কেন? সংগ্রাম করব বলে। মানবদেহ পেয়েছি বলেই আমরা বুদ্ধিমান। আর বুদ্ধিমান বলেই আমরা চিন্তা করতে পারি, ভালো-মন্দ, নিত্য-অনিত্য বিচার করতে পারি। আমরা সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে পারি, অজ্ঞানতার ইতি করতে পারি। কিন্তু দেহ না থাকলে এই অগ্রগতি আদৌ সম্ভব হত না। দেহ তাই এত মূল্যবান। এই দেহের ভিতরেই আবার আত্মার বাস। দেহের ফাঁদে বন্দী এই আত্মা খাঁচার পাখীর মতো মুক্তির জন্য দিনরাত যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। এই দেহের বন্ধন থেকে আমরা সবাই মুক্ত হতে চাইছি। অবশ্য স্থূলভাবে নয়। অজ্ঞানতার জন্যই আমরা নিজেদের সীমিত বলে মনে করি, মনে করি আমরা দেহের কারাগারে বদ্ধ, আমরা পরাধীন! তাই অজ্ঞানতার হাত থেকে যেমন করেই হোক মুক্তি পেতে হবে। আর এই মুক্তির সংগ্রামে দেহই আমাদের বন্ধু, দেহের সাহায্য নিয়েই আমাদের দেহাতীত হবার সংগ্রাম চালাতে হয়। সংগ্রামে সফল হলে আমরা বুঝতে পারি আমরা কোনকালেই দেহের দ্বারা বদ্ধ নই। তাই দেহকে আমরা কোনমতেই উপেক্ষা করতে পারি না।

সার কথাটা এই যে আমরা মুক্ত হয়েই আছি। শুধু আমরা সেই সত্যটা জানি না। বেদান্ত কখনো কখনো এক রাজপুত্রের দৃষ্টান্ত দেন। রাজার ছেলে, কিন্তু কেমন করে যেন সে ভিখারী হয়েছে। সে যে রাজপুত্র সেকথা সে বেমালুম ভুলে গেছে। বেদান্ত বলছেন, রাজপুত্র নিজেকে ভিক্ষুক ভাবলেও তার প্রকৃত পরিচয়টি তো মিথ্যা হয়ে যায় না! সে জানুক বা নাই জানুক, তার পরনে ভিখারীর ছেঁড়া পোশাকই থাক অথবা জমকালো রাজবেশই থাক, সে রাজপুত্রই! বেদান্ত এই দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাই বলতে চাইছেন—তুমিই ব্রহ্ম, তুমি মুক্ত, তুমি পরম; শুধু তুমি সেকথা জান না। তুমি মনে করছ তুমি এই দেহের দ্বারা বদ্ধ, তুমি বিশেষ কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি কল্পনা করছ যে দেহের মধ্যে থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তুমি কাজ করে যাও; কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে তুমি বিশুদ্ধ আত্মা। তুমিই সেই পুরুষ যিনি দশদিক পরিপূর্ণ করে আছেন, সর্বত্র যাঁর চোখ, সর্বত্র যাঁর পা। তুমি এখন নিজেকে দেহ ভাবছ। ভাব। কিন্তু তাতে তোমার স্বরূপের হেরফের হচ্ছে না। তুমি সত্যি সত্যি পালটে যাচ্ছে না। তুমি কখনই বদ্ধ নও। যেন-তেন প্রকারেণ তোমার চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। নিজেকে শুনিয়ে তোমার বলতে হবে—আমি কখনই বদ্ধ নই, আমি মুক্ত, কারণ আমিই সেই পরমাত্মা।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥১৯

অন্বয়: সঃ (তিনি পরমাত্মা); অপাণিপাদঃ ([যদিও] হাত-পা বিহীন); জবনঃ (দূরে যেতে পারেন); গ্রহীতা (ধরতে পারেন [বা গ্রহণ করেন]); অচক্ষুঃ (চোখ না থেকেও); পশ্যতি (তিনি সবকিছু দেখতে পান); অকর্ণঃ (কান না থাকলেও); শৃণোতি (শুনতে পান); সঃ বেদ্যং বেত্তি (যা কিছু জানবার, তিনি সব জানেন [অর্থাৎ মন না থেকেও তিনি সর্বজ্ঞ); তস্য চ বেত্তা ন অস্তি (অথচ এমন কেউ নেই যিনি তাঁকে জানেন); তম্ (তাঁকে); আহুঃ ([ঋষিরা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞরা] উল্লেখ করেছেন [এই বলে]); পুরুষম্ অগ্র্যম্ (সকলের অগ্রণী বা প্রথম); মহান্তম্ (সর্বব্যাপী)।

সরলার্থ: তাঁর হাত নেই, তবু তিনি সবকিছু ধারণ করেন; তাঁর পা নেই, তবু তিনি দূরে যেতে পারেন। তাঁর চোখ নেই, তবু তিনি সব দেখতে পান। তাঁর কান নেই, তবু তিনি সব শুনতে পান। যা কিছু জানবার, তা তিনি জানেন যদিও তাঁকে কেউ জানে না। যাঁরা পরমাত্মাকে জানেন, তাঁরা বলেন—তিনিই সকলের অগ্রণী এবং তিনি সর্বব্যাপী।

ব্যাখ্যা: এই পরমাত্মাকে বর্ণনা করা যায় না। উপনিষদ বলছেন, তিনি 'নিরুপাধিক', নির্গুণ। কোন কিছুকে 'বড়' বলার অর্থ সেটি 'ছোট' নয়। কোন বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করার অর্থই সীমিত করা। কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। বড়, ছোট সবই তিনি। বস্তুত ব্রহ্মকে সবকিছুর সমষ্টি বললেও ঠিক বলা হল না। ব্রহ্ম তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। আসলে ব্রহ্ম অপরিমেয়। ব্রহ্ম আছেন বলেই সবকিছু আছে, সবকিছু চলছে। উপনিষদ এখানে বলছেন—ব্রহ্মের হাত নেই, তবু তিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন। তাঁর পা নেই, তবু তিনি চলেন। কিভাবে? কারণ, তিনি যে সর্বত্র আছেন। আমার শরীরের প্রয়োজন। কোন কিছু ধরতে গেলে আমার হাত দরকার, কোথাও যেতে হলে পা দরকার। কিন্তু এমন কোনও স্থান নেই যেখানে ব্রহ্ম নেই। সমগ্র জগৎকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, হাত-পায়ের আর কথা কি! তিনি কারও উপর নির্ভর করেন না। আসলে ব্রহ্মই সবকিছুর উৎস, সারাৎসার।

'অচক্ষুঃ পশ্যতি'। চোখ নেই, তবু তিনি দেখতে পান। যখন আপনি কিছু দেখেন, তখন দ্রষ্টা আপনি ও দ্রষ্টব্য, এই দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে, একটা দূরত্ব থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম এক ছাড়া দুই নেই। ব্রহ্ম দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য একাকার।

যা কিছু জ্ঞাতব্য, তা সবই তিনি জানেন। কি করে? কারণ তিনি স্বয়ং 'প্রজ্ঞান-ঘন', তিনি জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে সাধারণভাবে একটি প্রশ্ন ওঠে : জ্ঞাতা কে?

অর্থাৎ কে জানছেন? আর কিসের জ্ঞান? কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় বস্তু এবং তিনিই জ্ঞান। ব্যবহারিক জগতে আপনি জ্ঞাতা এবং কোন বিষয়ে আপনার জ্ঞান হয়। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুই নেই। সেখানে সব একাকার। সবকিছুই সেই ব্রহ্ম স্বয়ং। বেদান্তের ভাষায় ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ। তিনি 'সৎ', অর্থাৎ সৎস্বরূপ, তিনি 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ বলেই ত্রিকাল অবাধিত সত্তা। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—তিন কালেই একমাত্র তিনিই আছেন। আমরাও বুদ্ধির অধিকারী। তিনি আবার আনন্দস্বরূপ। আমাদের সকলেরই কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন সময় আনন্দের অনুভূতি হয়। সে আনন্দ স্থূল হতে পারে, যেমন ভালো খাবার খাওয়ার আনন্দ বা শরীর ভালো থাকার আনন্দ। সে আনন্দ আবার সূক্ষ্মও হতে পারে, যেমন ভালো গান শোনা বা ভালো বই পড়ার আনন্দ। কিন্তু সব আনন্দই সেই এক ব্রহ্ম থেকে আসছে।

ব্রহ্ম আছেন বলেই আমরা সবকিছু জানতে পারছি, বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্রহ্মকে জানা যায় না। কেন? কারণ ব্রহ্ম বাইরের বস্তু নন। তিনিই একাধারে জ্ঞাতা, আবার তিনিই জ্ঞেয়; অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। তাঁকে জানা যাবে কি করে? ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। কেন উপনিষদে একটি শ্লোক আছে— 'যস্যামতং তস্য মতম্', যিনি বলেন যে, তিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই তাঁকে জানেন। কেমন করে জানেন? কারণ তিনি জানেন জ্ঞাতা কখনো নিজেকে জ্ঞানের বিষয় করতে পারে না। 'মতং যস্য ন বেদ সঃ'—যিনি জানেন বলেন, তিনি আসলে জানেন না। তিনি জানেন না, কারণ তিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বস্তু হিসাবে তিনি জেনে গেছেন। ব্রহ্ম যে কেমন সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। ব্রহ্মকে চোখে দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। ব্রহ্ম ধরাছোঁয়ার বাইরে। ব্রহ্ম অসীম।

'পুরুষ' শব্দের দুটি অর্থ। এক, অন্তরাত্মা, যিনি হৃদয়গুহায় বিরাজ করছেন। দুই, 'তিনি পূর্ণ করেন।' ব্রহ্ম সমস্ত আকাশ, সমগ্র বিশ্ব পূর্ণ করে আছেন। একই সঙ্গে তিনি সর্বত্র আছেন।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥২০

অন্বয়: অণোঃ অণীয়ান্ (ক্ষুদ্রতমের চেয়েও ক্ষুদ্র); মহতঃ মহীয়ান্ (বৃহত্তমের চেয়েও বৃহৎ); আত্মা (এই আত্মা); অস্য জন্তোঃ গুহায়াম্ (এই সকল প্রাণীর হৃদয়ে); নিহিতঃ (লুকিয়ে

আছেন); [তত্ত্বজিজ্ঞাসু] ধাতুঃ প্রসাদাৎ (পরমেশ্বরের কৃপায়); তম্ (আত্মাকে); অক্রতুম্ (কামনাশূন্য); মহিমানম্ (বৃক্ষের সঙ্গে অভিন্ন); পশ্যতি (উপলব্ধি করেন); বীতশোকঃ (তিনি সব দুঃখেরও পারে চলে যান)।

সরলার্থ: পরমাত্মা সকল জীবের হৃদয়ে লুকিয়ে আছেন। যা সবচাইতে ছোট, তার চেয়েও তিনি ছোট, আবার যা সবচাইতে বড়, তার চেয়েও তিনি বড়। তাঁরই কৃপায় (অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় যদি আপনার অনুকূল হয়) সর্বকামনাশূন্য সেই মহান পরমাত্মার সঙ্গে আপনি নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারেন। তখন আপনি সব দুঃখের পার।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম, যিনি সবকিছুর সার, নির্মল, সকলের অন্তরতম সত্তা — তিনিই ছোট বড় সবকিছু হয়েছেন। যা কিছু আছে (জন্তবঃ) সকলের আত্মা তিনি। হৃদয়গুহায় তাঁর নিবাস। উপনিষদের প্রতিটি শব্দই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গুহা তেমনি একটা অর্থবহ শব্দ। গুহার ভিতরে অন্ধকার। সেখানে যদি কিছু থাকে তা সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। আপনি হয়তো প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ভিতরে কি আছে তা দেখার, কিন্তু পারছেন না। ঠিক সেইরকমভাবে হৃদয়গুহায় আত্মা লুকিয়ে আছেন।

'ক্রতুম্' বলতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা কাম্যকর্মকেই বোঝায়। নানা বাসনার বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। কেউ হয়তো টাকা-পয়সা চায়, কেউ সন্তান চায়, কেউ দীর্ঘায়ু কামনা করে, কেউ বা মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে চায়। সকলেরই একটা না একটা কামনা আছে। কিন্তু ব্রহ্ম 'অক্রতু'। তাঁর কোন কামনা নেই। সেজন্য তাঁকে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে হয় না। যদি আপনার অভাব থাকে, তবেই আপনার মনে বাসনার উদয় হবে। কিন্তু ব্রহ্মের কোনও অভাব নেই; তাই তাঁর কামনাও নেই।

এখানে 'পশ্যতি' শব্দের অর্থ 'দেখা' নয়, উপলব্ধি বা অনুভূতি। ব্রহ্ম উপলব্ধি হলে আপনি বীতশোক, আপনার তখন আর কোন দুঃখ থাকে না। অর্থাৎ তখন আপনি সুখ-দুঃখ এই দুয়ের পারে চলে যান। আপনি বলতে পারেন, 'আমি দুঃখ চাই না, শুধু সুখ চাই।' কিন্তু সেটা অসম্ভব। কারণ সুখ আর দুঃখ একটার পর আরেকটা আসে। 'বীতশোকঃ' বলতে মনের একটা প্রশান্ত অবস্থা বোঝায়। এই উপনিষদেই পরবর্তী অধ্যায়ে দুটি পাখীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। একটি পাখী ক্রমাগত গাছের ফল খেয়ে চলেছে—কখনো মিষ্টি ফল, কখনো টক ফল। মিষ্টি ফল খেয়ে পাখীটি কখনো সুখ পাচ্ছে, আবার টক ফল খেয়ে কখনো দুঃখ পাচ্ছে। অন্য পাখীটি কিন্তু কিছুই খাচ্ছে না। সে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চুপ করে গাছে বসে আছে। কিছু মানুষ ঠিক ঐ প্রথম পাখীটির মতো। তারা জাগতিক ভোগসুখে আকণ্ঠ ডুবে আছে। কখনো ভোগ করে তারা খুব আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই হয়তো নিদারুণ দুঃখ ভোগ করছে। জীবনের ধারাই এইরকম—কখনো সুখ, আবার কখনো দুঃখ। কিন্তু আদর্শ

অবস্থা সেইটি যেখানে আপনি নির্লিপ্ত, সাক্ষীমাত্র। এই অবস্থায় আপনি নিরাসক্তভাবে সবকিছু গ্রহণ করতে পারেন। এই অবস্থাতেই সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে যাকে আমরা সুখ বলি সে সুখ নয়। সুখের তবকে মোড়া ছদ্মবেশী দুঃখ।

এই অবস্থায় পৌঁছনো যায় কি করে? মন শান্ত হলে। শঙ্করাচার্য বলছেন, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের আয়ত্তে আসে অর্থাৎ যখন আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনি ঠিক ঠিক মন শান্ত হয়। 'প্রসাদাৎ' অর্থাৎ প্রসন্নতা, প্রশান্তি, স্থৈর্য। সব ইন্দ্রিয়গুলি তখন সংযত, স্তব্ধ।

মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত হলে অন্তরে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। যোগীরা বলেন, মন যেন একটা হ্রদ। সেই হ্রদের জল যদি নড়ে, তাতে যদি ঢেউ ওঠে, তাহলে জলের তলায় কি আছে দেখা যায় না। কিন্তু জল যদি স্থির থাকে, তাহলে জলের নীচে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সেইরকম পরমাত্মা আমাদের অন্তরেই আছেন, কিন্তু মন যদি চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হয়, মনে যদি হাজার রকমের বাসনার ঢেউ ওঠে, তাহলে আত্মাকে আমরা দেখতে পাব না। শুধুমাত্র মন স্থির ও শান্ত হলে তবেই আত্মার পূর্ণ মহিমা আমরা দেখতে পাই। তাই ধর্ম বা অধ্যাত্মজীবনে আত্মসংযমই সবকিছুর চাবিকাঠি।

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্।।২১

অন্বয়: অহম্ (আমি); অজরম্ (জরাহীন); পুরাণম্ (শাশ্বত); সর্বাত্মানম্ (সকলের অন্তরস্থিত আত্মা); বিভুত্বাৎ (সর্বব্যাপী); সর্বগতম্ (সর্বত্র এবং সকল বস্তুতে অনুস্যূত); এতং বেদ (এই [আত্মা]-কে জানি); ব্রহ্মবাদিনঃ যস্য জন্মনিরোধং প্রবদন্তি (যাঁরা এই ব্রহ্মকে [আত্মা] জানেন, তাঁরা বলেন এই আত্মা জন্ম [এবং মৃত্যু] রহিত); নিত্যং প্রবদন্তি (তাঁরা বলেন, ব্রহ্ম নিত্য)।

সরলার্থ: আমি এই আত্মাকে জানি, যাঁর জরা নেই, যিনি শাশ্বত এবং যিনি সকলের অন্তরাত্মা। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র এবং সব বস্তুতে অনুস্যূত। যাঁরা এই ব্রহ্ম (বা আত্মাকে) জানেন, তাঁরা বলেন এঁর জন্ম নেই (এবং সেই কারণে মৃত্যুও নেই)।

ব্যাখ্যা: আপনার ব্রহ্মজ্ঞান হল—তার মানে আপনার অজ্ঞানতার নাশ হল; আলো জ্বললে যেমন অন্ধকার পালিয়ে যায় ঠিক তেমনি। রসায়ন বা অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে

গেলে যেমন অনেক বই পড়তে হয়, ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেরকম কোন পড়াশুনার ব্যাপার নেই বা বুদ্ধির খেলা নেই। শুধু আপনি যখন ব্রহ্মকে জানবেন, তখন আপনি ব্রহ্মই হয়ে যাবেন। একটা পরদা যেন এতদিন আপনাকে আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে দিচ্ছিল না। হঠাৎ সেই পরদাটা সরে যেতেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কে। বুঝবেন আপনিই সেই ব্রহ্ম যাঁকে এতকাল খুঁজেছিলেন। আত্মজ্ঞান হওয়ামাত্রই আপনার আমূল রূপান্তর ঘটে গেল। বুঝতে পারলেন আপনি দেহ নন, মন নন, বুদ্ধি নন। দেহ, মন, বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম বোধ করার পালা আপনার সাঙ্গ হল।

এর আগে উপনিষদ ব্রহ্মকে 'অগ্র্যম্' অর্থাৎ আদিকারণ বা প্রথম জাত বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে আবার তাঁকে 'পুরাণম্' অর্থাৎ শাশ্বত, সনাতন এবং প্রথম বলে সম্বোধন করছেন। কিন্তু একই সঙ্গে বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম অজর — তাঁর পরিবর্তন হয় না, 'জরা' বা ক্ষয় নেই। অল্প বয়সে আমাদের দেহ সুস্থ, সবল থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ক্ষয় শুরু হয়। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। তিনি সবসময় একই থাকেন।

'সর্বাত্মানম্', তিনি সকলের আত্মা। একই আত্মা সর্বত্র বিরাজ করছেন। চাঁদ একটাই। কিন্তু তার অনেক প্রতিবিম্ব হতে পারে। ঠিক তেমনিই এক ব্রহ্ম বহু নামে, বহু রূপে প্রতিবিম্বিত হন। ছোট ছেলেমেয়েরা অনেকসময় মাটি দিয়ে নানারকম মূর্তি গড়ে। সে কখনো কুকুর, কখনো বাঘ, কখনো মানুষ তৈরি করে। প্রতিটি মূর্তির রূপ এবং নাম ভিন্ন —কিন্তু এক মাটি দিয়েই তৈরি। মাটিই সত্য। নাম এবং রূপ আরোপিত।

'সর্বগতম্', ব্রহ্ম সর্বত্র। তিনি বিভুরূপে সর্বব্যাপী, বিশ্বজোড়া তাঁর উপস্থিতি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্বামী বিবেকানন্দকে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন একদিন স্বামীজী বলে উঠলেন : 'আপনার এই বেদান্ত ও নাস্তিকতার মধ্যে তফাত কোথায়? ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর, আমরাও সব ঈশ্বর! এ কখনো হতে পারে?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম।' কিন্তু স্বামীজী তা মানবেন না। বললেন, 'এসব কথার কোন অর্থ হয় না। ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন, এমনকি এই ঘটিতেও?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : 'রোস, এখনি তোর আমার কথা মানতে হবে না। কিন্তু একদিন তুই নিজেই বুঝবি যে ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন।' খুব শীঘ্রই স্বামীজীর সেই উপলব্ধি হয়েছিল।

'জন্মনিরোধম্', ব্রহ্ম জন্মরহিত। যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও হয় না। অতএব ব্রহ্ম মৃত্যুরহিতও বটে। ব্রহ্ম দেশ, কাল, নিমিত্তের ঊর্ধ্বে। মৃত্যু বলে যদি কিছু থাকেই তবে তা দেহের মৃত্যু। এ যেন ছেঁড়া জামাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

এসব যে সত্য, তা জানা যাবে কি করে? শাস্ত্রে এসব কথা থাকতে পারে; কিন্তু শাস্ত্র যে আমাদের বোকা বানাচ্ছেন না, তার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আচার্যেরা একই কথা বলে আসছেন, একই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা নিজেরা এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা কখনো একথা বলেন না 'আমাদের কথা মেনে নাও।' তাঁরা বলছেন, তোমাকেও এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। বুদ্ধ তাঁর এক শিষ্যকে একবার বলেছিলেন : 'এই তোমাকে পথ বলে দিলাম। এই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। এই পথে গিয়ে যদি তুমি লক্ষ্যে না পৌঁছতে পার তাহলে ফিরে এসে আমাকে বলো, তুমি ভণ্ড। তুমি আমাদের ঠকিয়েছ।' আরেকবার কয়েকজন বুদ্ধের কাছে এসে বলেছিলঃ 'তুমিই আমাদের পরিত্রাতা।' উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন : 'না, আমি পরিত্রাতা নই। তোমাদের উদ্ধার করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের উদ্ধার তোমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমি শুধু তোমাদের পথ দেখাতে পারি, কিন্তু সেই পথে তোমাদেরই চলতে হবে।' এখানে ব্রহ্মবিদরাও সেই কথাই বলছেন, তোমাকে এই পরম সত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং সেটা করা সম্ভব। এই জোর দিয়ে তাঁরা বলছেন, এটা তাঁদের নিজেদের উপলব্ধির কথা।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥১

অন্বয়: যঃ (যিনি [পরমেশ্বর]); একঃ (অদ্বিতীয়); অবর্ণঃ (যাঁর কোন জাত নেই (অর্থাৎ, নির্বিশেষ]); নিহিতার্থঃ (কোন অজ্ঞাত কারণে); আদৌ (সৃষ্টির আগে); শক্তিযোগাৎ (নিজের শক্তি বলে [নিজের মায়াশক্তি দিয়ে]); অনেকান্ বর্ণান্ (অনেক বৈচিত্র); বহুধা (বহু রূপে); দধাতি (উপস্থাপিত করেন); অন্তে (শেষে [প্রলয়কালে]); বিশ্বম্ (বিশ্ব); বি-এতি (বিলীন হয়); সঃ দেবঃ (তিনি স্বয়ংজ্যোতি); [যেন] সঃ (সেই ঈশ্বর); নঃ (আমাদের); শুভয়া বুদ্ধ্যা (শুভবুদ্ধি); সংযুনক্তু (দান করুন [আক্ষরিক অর্থে, সংযুক্ত করা)।

সরলার্থ: ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। স্বরূপত নির্বিশেষ হয়েও কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি অনেক বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছেন। প্রলয়কালে আবার এইসব বৈচিত্র তাঁতেই লীন হয়। এই স্বয়ংপ্রভ ঈশ্বর যেন আমাদের শুভ বুদ্ধি দান করেন।

ব্যাখ্যা: আমাদের বুদ্ধি যাতে সঠিক পথে, ঠিকভাবে কাজ করে তার জন্যই এই প্রার্থনা। আমরা কখনো কখনো এমন মানুষের কথা শুনতে পাই যিনি কোন কারণে তাঁর চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। চিন্তাশক্তি না থাকলে সে মানুষ জড়। তাঁর শরীর হয়তো এমনিতে ভালোই, কিন্তু মন অকেজো হওয়ায় তিনি জীবন্মৃত। বুদ্ধি তাই খুবই প্রয়োজনীয়। আবার শুধু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, দেখতে হবে সেই বুদ্ধি যেন সঠিক পথে চালিত হয়। চোর ডাকাত খুবই চতুর—তাদের কাজকর্মের ধারা দেখেই তা বোঝা যায়। কিন্তু তাদের বুদ্ধি বিপথগামী। তাই প্রার্থনা— আমাদের মন এবং বুদ্ধি শুভপথে চালিত হোক।

ব্রহ্মকে এখানে আবার 'একঃ' বলা হচ্ছে। তিনি অদ্বিতীয়। বাস্তবিক সমস্ত জগতেরই এক সত্তা। যেমন গীতায় বলা হয়েছে (৭।৭) 'সূত্রে মণিগণা ইব', আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেখালেও আমরা মুক্তোর মতো একই সূত্রে গাঁথা। এই বৈচিত্র একের উপর আরোপিত মাত্র। ধরুন, একটা পুকুরের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটা বাঁশ ফেলে দিয়ে আপনি পাড়ে

দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনার কি মনে হবে? মনে হবে বাঁশটা জলকে দুভাগ করে দিয়েছে। বাঁশটা এখানে চাপানো জিনিস, আরোপিত। পুকুরের জলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। বাঁশটি তুলে নিলেই দেখা যাবে পুকুরের জল মোটেই ভাগ হয়নি। যেমন অখণ্ড,অবিভক্ত ছিল তেমনি আছে। অনুরূপ ভাবে এক ও অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের উপর নানা নাম, নানা রূপ চাপানো হয়েছে। উপনিষদ অক্লান্তভাবে এই একত্বের কথাই আমাদের বারবার বলে চলেছেন। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'বেদান্তের বাণীটি কি?' বেদান্ত বলবেন, 'একত্ব'। অর্থাৎ যা কিছু আছে সবই মূলত এক—এটাই বেদান্তের মূল সুর। এমনকি যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরাও ইদানীং মানুষ এবং জগতের মূলগত ঐক্যের কথা বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু বেদান্তের বক্তব্য, সমস্যার গভীরে যাও, তত্ত্বে ডুব দাও। তত্ত্ব হচ্ছে—'স্বরূপত আমরা সবাই এক।' একমাত্র এই সত্যটি উপলব্ধি করলেই প্রকৃত প্রেম, সহানুভূতি, সংহতি এবং শান্তি আসতে পারে। কেবলমাত্র তখনি আমরা বলতে পারি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—সমগ্র বিশ্বই একটি পরিবার। যতদিন আমরা নিজেদের আলাদা ব্যক্তি, আলাদা জাতি মনে করব, যতদিন ব্যক্তিস্বার্থ আমাদের মনকে গ্রাস করে রাখবে, ততদিন প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, হানাহানির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সমস্যার গভীরে গিয়ে বেদান্ত এই সিদ্ধান্তই করেছেন—আমরা সবাই ব্রহ্ম।।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনা দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। একদিন দূর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন দুটি লোক তুমুল ঝগড়া করছে। প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতি। হঠাৎ একজন আরেকজনকে মারতে শুরু করল। যেই না মারা, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর গায়ে মারের চিহ্ন পর্যন্ত ফুটে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি বিশেষ স্তরে উঠলে মানুষ গোটা বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তখন অন্যের কষ্ট, আপনার কষ্ট; অন্যের আনন্দ, আপনারই আনন্দ। তখন আর 'আমি' 'তুমি' ভেদ থাকে না। সকলের মধ্যেই আপনি আপনাকে দেখতে পান।

'অবর্ণঃ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ, যার কোন জাত নেই। কিন্তু লক্ষণার্থ বা প্রকৃত তাৎপর্য হল—ব্রহ্ম নির্বিশেষ, সমরস বা অপরিচ্ছিন্ন। তাঁকে কোনভাবেই সীমিত করা যায় না। অথচ সেই একই বহু হয়েছেন। যাঁর কোন জাত নেই, তিনিই বহু জাতের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজে নির্বিশেষ হয়েও কত না বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কিভাবে? বহুমুখী শক্তিপ্রয়োগ করে (শক্তিয়োগাৎ)। নিজের 'মায়াশক্তি'-প্রভাবেই তিনি বৈচিত্রময় এই মহাবিশ্বকে প্রকাশ করেছেন। যদি বলেন কেন? তার উত্তর কেউ জানে না। এ এক অপার

রহস্য। এই নামরূপাত্মক, বৈচিত্রময় জগৎ ব্যাখ্যার অতীত। এখানকার কোন দুটি জিনিস অবিকল এক নয়, অথচ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

জগৎ প্রকাশ করে, ব্রহ্ম তাকে পালন করেন এবং একসময় নিজের মধ্যে টেনে নেন। শুরুতে সেটা কিন্তু এক ঝাড়ের কলম। কত না রঙ, কত না বৈচিত্র তাতে! কিন্তু শেষে সব গুটিয়ে গিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়। একই শক্তি-তাতেই সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ হচ্ছে।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তবে শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥২

অন্বয়: তৎ [ব্রহ্ম] এব অগ্নিঃ (ব্রহ্মই অগ্নি); তৎ [এব] আদিত্যঃ ([তিনিই] সূর্য); তৎ [এব] বায়ুঃ ([তিনিই] বায়ু); তৎ চন্দ্রমাঃ উ (এবং তিনিই চন্দ্র); তৎ এব শুক্রম্ (তিনিই উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডল); তৎ ব্রহ্ম (তিনিই হিরণ্যগর্ভ [সমষ্টি-মনরূপ ব্রহ্ম]); তৎ আপঃ (তিনিই জল); তৎ প্রজাপতিঃ (তিনিই বিরাট (সমষ্টি-দেহরূপ ব্রহ্ম])।

সরলার্থ: ব্রহ্মই (পরমাত্মা) অগ্নি, সূর্য, বায়ু, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল, হিরণ্যগর্ভ, জল এবং বিরাট।

ব্যাখ্যা: এখানে ব্রহ্ম বলতে পরব্রহ্ম নয়, হিরণ্যগর্ভ বা সূক্ষ্ম সমষ্টি-শরীরকেই বোঝানো হচ্ছে। অনুরূপভাবে, 'প্রজাপতি' শব্দের অর্থ এখানে বিরাট বা স্থূল সমষ্টি-শরীর। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের দুই রকমের শরীর, 'সূক্ষ্মশরীর' এবং স্থূলশরীর'। মৃত্যুর সময় স্থূলশরীর পড়ে থাকে; জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীর নিয়ে চলে যায়। কিছুকাল পর এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর গ্রহণ করে অর্থাৎ জীবের আবার নতুন জন্ম হয়। জ্ঞান বা মুক্তিলাভ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই চলতে থাকে।

সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা, আগুন, বায়ু এবং জলের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। তাই সূক্ষ্মই হোক আর স্কুলই হোক—এই গোটা বিশ্ব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্রহ্মই আমার আত্মা। অর্থাৎ আমিই সব হয়েছি। আমিই সবকিছুর মধ্যে, আমি-ই বিশ্ব।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥৩

অন্বয়: ত্বং স্ত্রী (তুমি নারী); ত্বং পুমান্ অসি (তুমি পুরুষ); ত্বং কুমারঃ (তুমিই বালক [যুবক]); [ত্বং] কুমারী উত (বালিকাও তুমি [অবিবাহিতা যুবতী]); ত্বং জীর্ণঃ ([যখন] তুমি

বৃদ্ধ); দণ্ডেন বঞ্চসি (লাঠি নিয়ে চলাফেরা কর); ত্বং বিশ্বতোমুখঃ জাতঃ ভবসি (তুমিই নানারূপে জন্ম নাও)।

সরলার্থ: (ব্রহ্ম) তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ; তুমিই বালক এবং বালিকাও তুমি। তুমিই বৃদ্ধ, লাঠির উপর ভর দিয়ে চলাফেরা কর। তুমিই নানারূপে জন্ম নাও।

ব্যাখ্যা: যখন কোন মহিলাকে দেখছেন, তখন আপনি ব্রহ্মকেই দেখছেন। যখন কোন পুরুষকে দেখেন তখনও সেই ব্রহ্মকেই দেখছেন। রূপটা আসল নয়। সেটা ক্ষণিকের। ব্রহ্ম শাশ্বত, নিত্য। ভিন্ন ভিন্ন যত রূপ—তা ব্রহ্মেরই উপর আরোপিত বা অধ্যস্ত।

প্রশ্ন হতে পারে : ব্রহ্ম যে সর্বব্যাপী এবং আমিই যে ব্রহ্ম তা কিভাবে বুঝব? এর উত্তরে শাস্ত্র বলছেন, 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি', অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই মহাবাক্যটি বারবার নিজেকে শোনাতে হবে। ক্রমে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় হবে যে আপনিই ব্রহ্ম এবং তার ফলে জীবন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাই সম্পূর্ণ পালটে যাবে। আপনি যদি দিনরাত আপনার দিব্য স্বরূপের কথা ভাবতে থাকেন, ভাবতে থাকেন আপনি শুদ্ধ এবং মুক্ত, তাহলে আপনার গোটা চরিত্রই পালটে যাবে। আপনি নতুন মানুষ হয়ে যাবেন। অধ্যাত্মজীবনের যা কিছু রহস্য, তা হল এই মন বা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা সেটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। যদি অন্যের চোখ দিয়ে আপনি নিজেকে বিচার করেন, তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিছু লোক হয়তো স্তুতি করে আপনাকে আকাশে তুলে দেবে, আবার অন্য একদল হয়তো আপনার নিন্দা করবে। কিন্তু যে যাই বলুক, আপনি স্বরূপত দেবতা—নিজের এই বিশ্বাসকে কখনো ছাড়বেন না। প্রাণপণে এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকুন। হ্যাঁ, ঠিকই, কখনো কখনো হয়তো আপনি ভুল করবেন, কিন্তু তা নিয়ে রাতদিন হাহুতাশ করার দরকার নেই। কারণ এই ভুলভ্রান্তি আর যাই করুক,আপনার স্বরূপকে পালটাতে পারবে না। আপনি দেবতা—দেবতাই থাকবেন। দৈবী স্বরূপের ধারণা আমাদের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কাজকে অনুপ্রাণিত করুক। জীবনে চলার পথে এই সত্যই ধ্রুবতারার মতো আমাদের পথ দেখাক। আর যখন সত্য সত্যই এই চিন্তায় আপনি প্রতিষ্ঠিত হবেন,তখন আর আপনার বেতালে পা পড়বে না, আপনি আর কোন অন্যায় করতে পারবেন না। এটাই আপনার সাধনা। আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তবে কথা হচ্ছে—যা করার তা নিজেকেই করতে হবে। গুরু বা শাস্ত্র আপনাকে সাহায্য করবেন ঠিকই, কিন্তু শেষবেশ আপনার নিজের চেষ্টা এবং ঐকান্তিকতার উপরেই আপনার সাফল্য নির্ভর করবে।

আপনি ব্রহ্ম, শুধু এইটুকু ভাবলেই চলবে না; প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি বস্তুই ব্রহ্ম, একথাও আপনাকে মনে রাখতে হবে। সকলের সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গেই আপনি অভিন্ন।

যখনি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখি, তখন নিজেকে আয়নায় দেখার মতো, আমি আমাকেই দেখি। এটা ভুললে চলবে না যে আপনি আপনাকেই দেখছেন। যেমন আমরা আয়নায় নিজেদের দেখি—ঠিক সেইরকম।

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥৪

অন্বয়: [তুমি] নীলঃ পতঙ্গঃ (ভ্রমর); হরিতঃ লোহিতাক্ষঃ (রক্তচক্ষু সবুজ শুকপাখী); তড়িৎ-গর্ভঃ (বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ); ঋতবঃ (ঋতুসকল); সমুদ্রাঃ (সাগর-সমুদয়); অনাদিমৎ (তোমার শুরু নেই (সবকিছুর উৎস]); ত্বম্ (তুমি); বর্তসে (আছ); বিভুত্বেন (সর্বব্যাপীরূপে); যতঃ (যার [তোমার] থেকে); বিশ্বা ভুবনানি জাতানি (বিশ্বভুবন প্রকাশিত হয়েছে)।
সরলার্থ: তুমি ভ্রমর, তুমি রক্তচক্ষু সবুজ শুকপাখী, তুমি বজ্রগর্ভ মেঘ, তুমিই ঋতু এবং সমুদ্র-সমুদয়। তুমি সর্বব্যাপী। সেইজন্য তোমার কোন আদি নেই (অর্থাৎ, তুমি সবকিছুর উৎস)। তোমার থেকেই বিশ্বভুবন প্রকাশিত।
ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকটির মতো এই শ্লোকেও একত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্ম নির্গুণ বা উপাধিশূন্য। প্রশ্ন হতে পারে—তাহলে আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি, তাদের উপাধিগুলো এল কোথা থেকে? তার উত্তর এই—ওগুলো সব ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ব্রহ্ম থেকেই তারা আসে, ব্রহ্মেই থাকে আবার ব্রহ্মেই মিশে যায়। জগৎ-সংসার যেন সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউ-এর নিজস্ব কোন সত্তা নেই। ঢেউ সমুদ্রেরই আরেক রূপ। সমুদ্রই ঢেউ হয়েছে। সমুদ্র সমুদ্রই থাকে, শুধু ঢেউগুলো তার উপর আরোপিত। সোনার দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। সোনা দিয়ে হার, বালা, আংটি কতরকমের গয়নাই না গড়ানো যায়, কিন্তু এক সোনা। বিভিন্ন নাম এবং রূপ সোনার উপর চাপানো হলেও, সোনা সোনাই থাকে। তেমনি নাম-রূপের বিভিন্নতার জন্য বহু বস্তুর অভিজ্ঞতা আমাদের হলেও, তাদের প্রকৃত স্বরূপ যে এক সত্তা—তার কোন পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্ম সর্বদা ব্রহ্মই থাকেন। জগতের যতকিছু বৈচিত্র, সবই আপেক্ষিক; কোনটিই নিত্য সত্য নয়। স্বরূপে বৈচিত্র নেই, বৈচিত্র কেবল নাম-রূপে।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ॥৫

অন্বয়: সরূপাঃ (নিজের মতোই [প্রকৃতি]); বহ্বীঃ (অনেক); প্রজাঃ (সন্তান); সৃজমানাম্ (সৃষ্টি করেন); লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্ (লাল, সাদা ও কালো [অর্থাৎ, তিন রকমের ভূত—আগুন, জল এবং মাটি]); একম্ অজাম্ (এই প্রকৃতি [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ]); একঃ অজঃ (একজন [অজ্ঞ] ব্যক্তি); জুষমাণঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রভাবে); অনুশেতে (অনুসরণ করে [তার পেছন ছোটে]); অন্যঃ অজঃ (আরেকজন ব্যক্তি [একজন বুদ্ধিমান ও বিচারশীল ব্যক্তি]); ভুক্তভোগাম্ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্বরূপ জেনে [অর্থাৎ, এটা যে ক্ষণস্থায়ী তা জেনে]); এনাম্ (এই [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎকে]); জহাতি (ত্যাগ করেন)।
সরলার্থ: প্রকৃতি (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ) নিজের মতোই অনেক জীব সৃষ্টি করে। তারা কেউ বা লাল, কেউ বা সাদা আবার কেউ কালো (অর্থাৎ, তারা আগুন, জল আর মাটি দিয়ে তৈরি)। একজন অজ্ঞান জীব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তা ভোগ করে। কিন্তু আরেকজন বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল ব্যক্তি। পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন তিনি বুঝেছেন যে এই স্থূল জগৎ ক্ষণস্থায়ী; সেই কারণেই তিনি এই জগৎকে ত্যাগ করেন।
ব্যাখ্যা: প্রকৃতিকে এখানে 'অজাম্" অর্থাৎ অজাত এবং অনাদি বলা হয়েছে। হঠাৎ কোন এক বিশেষ মুহূর্তে এই জগতের উদ্ভব হয়েছে, একথা আমরা বলতে পারি না।। হিন্দুমতে, এই বিশ্ব চিরন্তন—সবসময়ই আছে। কখনো ব্যক্ত, কখনো বা অব্যক্তরূপে। পাখি আগে না ডিম আগে—তা কি আমরা বলতে পারি? ঠিক সেইরকম এই বিশ্বও মাঝে মাঝে বীজাকারে অর্থাৎ অব্যক্তরূপে ফিরে যায়। কিছুকাল পরে আবার সে তার ব্যক্তরূপে ফিরে আসে। কল্পে কল্পে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-র এই পালাবদল হলেও বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে অনাদি এবং অনন্ত।

বলা হয়েছে প্রকৃতি তিনটি রঙ সৃষ্টি করেন—'লোহিত' অর্থাৎ লাল, 'শুক্ল' অর্থাৎ সাদা এবং 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ কালো। এই তিনটি রঙ তিনটি গুণের প্রতীক। লাল রজোগুণ অর্থাৎ কর্মতৎপরতা এবং অস্থিরতার প্রতীক। সাদা সত্ত্বগুণ অর্থাৎ স্থৈর্য এবং প্রজ্ঞার প্রতীক। কালো তমোগুণ অর্থাৎ জড়তা এবং আলসেমির প্রতীক। সাংখ্যমতে এই তিনটি গুণ পরস্পর মিলেমিশে এই বিশ্ব এবং তার বৈচিত্রকে সৃষ্টি করেছে। এই তিন গুণের প্রভাবেই জগৎ আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয়। এই তিন গুণের প্রভাবেই এক সত্তা থেকে বহু

জীবের (বহ্বীঃ প্রজাঃ) প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতি তাঁর নিজের ভিতর থেকেই এই অনিন্দ্যসুন্দর জগৎকে প্রকাশ করেছেন।

আর এক মতে, তিনটি রঙ—আগুন, জল এবং পৃথিবী, এই তিনটি মহাভূতের প্রতীক। জল সাদা। সে সত্ত্বগুণের প্রতীক। মাটির রঙ কালো। তাই সে তমোগুণের প্রতীক। আগুনের রঙ লাল। তাই সে রজোগুণের প্রতীক। এই তিন গুণের সমন্বয়েই রকমারি বৈচিত্রের জন্ম। বাস্তবিক, এই জগতে বৈচিত্রের অন্ত নেই। কিন্তু সব বৈচিত্রই শেষে সেই পরম একে পর্যবসিত হয়। তাই বৈচিত্র দেখে যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। বেদান্তমতে বহু দেখাই অজ্ঞানতার লক্ষণ। বহু কোথায়? সত্তা একটাই। তারই উপর চাপানো নাম-রূপের উপাধিগুলো দেখে আমাদের বৈচিত্রের ভ্রম হচ্ছে। নাম এবং রূপ তো মিথ্যা। মিথ্যা কোন্ অর্থে? মিথ্যা এই অর্থে যে তারা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। বেদান্তমতে যা পরিবর্তনশীল তাই অনিত্য, তাই অসত্য। নিত্য অর্থাৎ সত্য একমাত্র তাই যার কোন বিকার নেই, পরিবর্তন নেই। একমাত্র ব্রহ্মই সেই ধ্রুব এবং সত্য বস্তু।

প্রশ্ন হচ্ছে : ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন বস্তু কি আছে? না। এক ব্রহ্মই বিভিন্ন নাম-রূপের সাহায্যে বহুরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। ব্রহ্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন। কিন্তু নাম-রূপকে সত্যি মনে করলে বিশ্বের এই ব্রহ্মসত্তাকে উপলব্ধি করা যাবে না। তাহলে আমরা অজ্ঞই থেকে যাব। একটা কথা কিন্তু আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। বেদান্ত কখনো একথা বলছেন না—'এই জগতের কোন মূল্য নেই; এই জগৎকে বর্জন কর।' বেদান্তের বক্তব্য-নাম-রূপের এই যে জগৎ , এটাই সব নয়। এর বাইরে আরও মূল্যবান কিছু আছে। যদি শান্তি ও আনন্দ পেতে চাও তবে তোমাকে অতি অবশ্যই এই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পারে যেতে হবে।

এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। অধিকাংশ মানুষই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত। উন্মত্তের মতো তারা দিনরাত ভোগের পেছনে ছুটে চলেছে। ভোগসুখ ছাড়া তারা আর কিছু জানে না। তারা মনে করে : 'এই জগতে যখন এসেছি তখন প্রাণের সাধ মিটিয়ে ভোগ করে নিই। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা তো আমি জানি না।' কিন্তু অল্প হলেও আরেক থাকের মানুষ আছেন যাঁরা কঠোপনিষদের নচিকেতার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁরা ঠেকে শিখেছেন অর্থাৎ ভোগ করে করে ভোগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ত্যাগের পথে এসেছেন; নাহয় তাঁরা দেখে শিখেছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের দুর্গতি, দুর্দশা দেখে তাঁদের জ্ঞান হয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন ইন্দ্রিয়সুখ 'শ্বোভাবাঃ' অর্থাৎ, আজ আছে, কাল নেই। তাঁরা বুঝেছেন এইসব সুখ ক্ষণস্থায়ী বা 'অনিত্য'। তাঁদের মনোভাব হল

—'ভোগ করতে হলে এমন জিনিস ভোগ করব যা কখনো হারাবে না, যা জলের মতো আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে না। আমি পারমার্থিক ব্রহ্মানন্দ পেতে চাই।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥৬

অন্বয়: সযুজা (পরস্পর ঘনিষ্ঠ); সখায়া (একই রকম); দ্বা সুপর্ণা (দুটি পাখি [একটি জীবাত্মা এবং অন্যটি পরমাত্মা]); সমান (একই); বৃক্ষম্ (গাছকে [অর্থাৎ, শরীরকে]); পরিষস্বজাতে (আশ্রয় করে আছে); তয়োঃ (তাদের [জীবাত্মা এবং পরমাত্মা] মধ্যে); অন্যঃ (একটি (জীবাত্মা]); স্বাদু (পাকা); পিপ্পলম্ (ফল [অর্থাৎ, ভালো ও মন্দ কাজের ফল]); অত্তি (খাচ্ছে [ভোগ করছে]); অন্যঃ (অপরটি [পরমাত্মা]); অনশ্নন্ (কিছুই না খেয়ে [অর্থাৎ, কিছুই করছে না]); অভিচাকশীতি (দেখছে দর্শকের মতো])।

সরলার্থ: একটি গাছে একই রকমের দুটি পাখি বসে আছে। তারা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ (আসলে তারা একই দেহাশ্রিত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা)। তাদের মধ্যে একটি পাখি পাকা ফল খাচ্ছে (অর্থাৎ, জীবাত্মা তার নিজ কর্মের ভালো এবং মন্দ ফল ভোগ করছে)। অন্য পাখিটি কিন্তু কোন ফলই খাচ্ছে না; শুধু সাক্ষীর মতো দেখছে (অর্থাৎ, পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, সাক্ষীমাত্র)।

দুটি পাখি একই গাছে বসে আছে। সেই গাছটি কি? জীবের শরীর। একটি পাখি জীবাত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। মনে হয় যেন দুটি পাখি, আসলে কিন্তু পাখি একটিই। যে নিজেকে দেহ মনে করছে সে জীবাত্মা। আর যিনি দেহাতীত, তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মা সর্বত্র আছেন। তিনি যুগপৎ সর্বগত এবং সর্বব্যাপী। শেষ বিচারে কিন্তু এই জীবাত্মাই পরমাত্মা। তারা পরস্পরের থেকে আলাদা নয়। তাই উপনিষদ বলছেন তারা 'সযুজা',অন্তরঙ্গ; অর্থাৎ তারা সবসময় একইসঙ্গে থাকে। তারা অবিচ্ছেদ্য। একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারে না। একই সত্তা—কখনো জীবাত্মা, আবার কখনো পরমাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় জীবাত্মা হচ্ছে। 'কাঁচা আমি' আর পরমাত্মা 'পাকা আমি'।

একটি পাখি গাছে বসে ফল খাচ্ছে। কতগুলো ফল মিষ্টি, কতগুলো তেতো। অর্থাৎ জীবাত্মা নিজেকে দেহ মনে করে সংসারে ভালো, মন্দ সবরকম কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে

এবং কৃতকর্ম অনুসারে কখনো সুখ,কখনো দুঃখ ভোগ করছে। দেহের প্রতি সে এমনি আসক্ত যে দেহের ভালোমন্দকে সে নিজের ভালো-মন্দ বলে মনে করে। সে যে দেহ নয়, এ বোধ তার নেই। জীবাত্মা তাই বদ্ধ।

দ্বিতীয় পাখিটি ঐ একই গাছে বসে আছে; কিন্তু কোন ফল স্পর্শ পর্যন্ত করছে না—খাওয়া তো দূরের কথা। সে নিরাসক্ত, সাক্ষীমাত্র। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ঐ দ্বিতীয় পাখিটিই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা, যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। সব হিন্দুশাস্ত্রই এই এক কথা বলেন: অনাসক্ত হও। কারণ এই সংসারে তোমাকে থাকতেই হবে; এখানে থেকে তুমি পালাতে পারবে না। তাহলে উপায় কি? উপায়—অনাসক্ত হওয়া। অনাসক্তির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'অনাসক্তি হল প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিবিড় বিশ্রাম।' আপনি হয়তো প্রচুর কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ আপনার মনে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। আপনি শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। আপনার মন আপনার হাতের মুঠোয়। ঈশ্বর বা আত্মা যন্ত্রী, আর আমি যন্ত্র, তিনি যেমন চালান তেমনি চলি—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই এই শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন অবস্থা লাভ করা যায়। গীতায় (৩।২৭) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে', যে নিজেকে কর্তা মনে করে সে মূঢ়, সে নির্বোধ। প্রশ্ন হতে পারে—নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা কিভাবে কাজ করেন? উপনিষদ বলছেন, না, তিনি নিজে কিছু করেন না। তিনি কেবল আছেন, আর তিনি আছেন বলেই যা ঘটবার তা ঘটে।

অনাসক্তির আরেক অর্থ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করা। আপনি হয়তো বলবেন : 'আমি সব কাজ সুষ্ঠু এবং সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করব—এ আশা কি করতে পারি না?' সেটা অবশ্যই করা উচিত, করবেন। কিন্তু কাজের ফল শেষপর্যন্ত কি দাঁড়াবে তাতো আপনি জানেন না। আপনার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো কোথাও একটু খুঁত রয়ে গেল, অথবা এমন কিছু ঘটল যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি। সেইজন্য অনাসক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মনোভাব এইরকম হওয়া উচিত, 'আমি কাজ করে যাব, কিন্তু আমি জানি কাজের ফল আমার হাতে নেই; আমার ইচ্ছামতো সবকিছু ঘটবে না।' বাস্তবিক, উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'উপায়কে নিখুঁত করে তুলতে পারলে উদ্দেশ্য আপনিই সিদ্ধ হবে।' সিদ্ধ মহাপুরুষরা তাই বলেন, অনাসক্ত হয়ে, সাক্ষীর মতো নির্লিপ্ত হয়ে কাজ করতে পারলে কাজ আরও ভালো হয়। যিনি সকামভাবে কাজ করেন, তাঁর পক্ষে সর্বদা উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হন তাহলে আপনার মন আরও একাগ্র হবে, আরও ভালোভাবে সে কাজ করতে পারবে। সে কাজের ফলও যথাসম্ভব ভালো হতে বাধ্য। কিন্তু মনের এই অনাসক্ত ভাব আসে কি করে? অনাসক্তি তখনি আসবে যখন আমি

জানব যে এই সংসার ছায়ার মতো, এ সংসার যেন এক স্বপ্ন। এই সংসারকে যদি একবার স্বপ্নের মতো অসত্য, ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য বলে বুঝতে পারি, তাহলে অনাসক্তি আপনিই আসবে।।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥৭

অন্বয়: পুরুষঃ (জীবাত্মা); সমানে বৃক্ষে ([পরমাত্মার সঙ্গে] একই গাছের উপর [শরীর]); নিমগ্নঃ (ডুবে রয়েছে এই অজ্ঞানতায়—সে (জীবাত্মা) হচ্ছে শরীর]); অনীশয়া (অসহায় ভেবে); মুহ্যমানঃ (অভিভূত); শোচতি ([এবং] শোক করে); [কিন্তু সেই একই জীবাত্মা]; যদা (যখন); জুষ্টম্ (অনুকূল অবস্থায় (আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা]); অন্যৎ ([সকল উপাধি) বর্জিত হয়ে); ঈশম্ (পরমেশ্বর [রূপে পরমাত্মা]); পশ্যতি (দেখে); বীতশোকঃ ([তখন সে] সব দুঃখের পারে চলে যায়); অস্য (এই [পরমাত্মার); মহিমানম্ (মহিমান্বিত স্বরূপ); ইতি ([সে] লাভ করে)।

সরলার্থ: জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একই বৃক্ষে (অর্থাৎ, দেহে) অধিষ্ঠিত। কিন্তু অজ্ঞানে নিমজ্জিত জীবাত্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার ফলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসহায় ও নিরানন্দ বোধ করে। কিন্তু সেই জীবাত্মাই অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা নিজেকে নিরুপাধিক পরমাত্মা বলে চিনতে পারে। নিজের মহিমান্বিত স্বরূপ উপলব্ধি করে তখন সে সব দুঃখের পারে চলে যায়।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা যেন একই রকমের, অন্তরঙ্গ দুটি পাখি। একই দেহরূপ গাছে তাদের বাস। পরমাত্মা যেন একটি পাখি। সুন্দর তুলনা! কারণ আত্মা এবং পাখি উভয়েই 'সুপর্ণা' অর্থাৎ দ্রুতগামী। 'সু' মানে ভালো, 'পর্ণা' মানে দুটি ডানা। আবার 'চলমান'-ও বলা যায়। দেহকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেননা দেহ গাছের মতোই স্বল্পায়ু।

জীবাত্মা অবিদ্যার শিকার, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। অবিদ্যার প্রভাবে জীবাত্মা নিজেকে দেহ মনে করে। আর এই কারণেই সে দেহের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করে। দেহ সুস্থ থাকলে সে সুখী আর দেহের একচুল এদিক-ওদিক হলেই সে অসুখী। জীবাত্মা যেন সেই পাখি যে একবার মিষ্টি, আরেকবার তেতো ফল খেয়ে চলেছে। মিষ্টি ফল খেলে

সে খুশি হচ্ছে, কিন্তু যেই তেতো ফল খাচ্ছে, দুঃখে ভেঙে পড়ছে। এইভাবেই অজ্ঞান জীবের জীবন কাটে। সে কখনো সুখী, কখনো দুঃখী। সে অবস্থার দাস, নিজের প্রভু নয়।

পরমাত্মার প্রকৃতি কেমন? তিনি যেন সেই পাখিটি যে নিস্পৃহ দ্রষ্টার মতো গাছে চুপ করে বসে আছে। সুস্বাদু অথবা বিস্বাদ কোন ফলেই তার স্পৃহা নেই। পরমাত্মা নিজেই নিজের প্রভু, সর্বেসর্বা। তিনি অদ্বিতীয়, সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তিনি শুদ্ধ, মুক্ত, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। এককথায় তিনি অনন্য, সদানন্দ।

জীবাত্মাকে যে চিরকাল দুঃখ-কষ্টে হাহুতাশ করে যেতে হবে, তা নয়। তার প্রয়োজন সৎগুরুর আশ্রয় লাভ করা এবং তাঁরই নির্দেশ মেনে অজ্ঞানতার যে আবরণ এখন চোখের সামনে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা। গুরুকৃপায় এবং তার আন্তরিক তপস্যার ফলে একদিন সেই আবরণ সরে যাবে এবং সে বুঝতে পারবে, সে নিজেই পরমাত্মা। এই সত্য একদিন না একদিন উদ্ভাসিত হবেই—তবে শুধু সময়ের অপেক্ষা। যতদিন না সেই শুভ মুহূর্ত আসে ততদিন আমাদের স্বাধ্যায়, ধ্যান এবং নিত্য-অনিত্য, শ্রেয়ো-প্রেয়োর বিচার করে যেতে হবে। সংযত জীবনযাপন ও নিরন্তর তপস্যার ফলে আপনার চিত্তশুদ্ধি হবে আর সেই শুদ্ধ মনই আপনাকে বলে দেবে আপনি কে, কি আপনার সত্যিকারের পরিচয়। যে সত্য একদিন আপনার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তা আপনার কাছে ধরা দেবে এবং আপনি আপনার পরমাত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।৮

অন্বয়: ঋচঃ (ঋগ্বেদ [কিন্তু এখানে সব কটি বেদের কথাই বলা হয়েছে]); অক্ষরে (অবিকারী); পরমে (সম্পূর্ণভাবে); ব্যোমন্ (ব্রহ্মে [যা আকাশের মতো]); যস্মিন্ (যাঁতে [ব্রহ্মে]); অধিবিশ্বে (বিশ্বের শ্রেষ্ঠ); দেবাঃ (অগ্নি এবং অন্যান্য পদার্থ); নিষেদুঃ (আশ্রয় লাভ করেছে); যঃ (যে); তম্ (এই [বিশ্বের আশ্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মকে]); ন বেদ (জানে না); ঋচা (বৈদিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা); কিং করিষ্যতি (তিনি কি লাভ করবেন?); যে (যাঁরা [সুসংযত]); ইৎ (সঠিকভাবে); তৎ (তাঁকে [পরমাত্মাকে]); বিদুঃ (জানেন); তে ইমে (যাঁরা [ঐভাবে জানেন]); সমাসতে (থাকেন [এই প্রত্যয় নিয়ে যে তাঁরা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন])।

সরলার্থ: অপরিবর্তনীয় এবং আকাশের মতো যে ব্রহ্ম তাঁরই উপরে বেদ প্রতিষ্ঠিত। এই মহাবিশ্বের সর্বোত্তম দেবতারাও (গ্রহ, তারা, মহাভূত ইত্যাদি) ব্রহ্মনির্ভর। ব্রহ্মকে আদৌ না জেনে যিনি শুধুমাত্র বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কি লাভ করবেন? অন্যদিকে যাঁরা ব্রহ্মকে ঠিক ঠিক জানেন, তাঁরা এই প্রত্যয় নিয়ে বাঁচেন যে তাঁরা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন।

ব্যাখ্যা: 'নিষেদুঃ'—সবকিছুই ব্রহ্মের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি আমাদের জ্ঞানও। 'ঋচঃ' বলতে সাধারণত ঋগ্বেদকেই বোঝায়। কিন্তু এখানে সবকটি বেদ অর্থাৎ, জাগতিক ও পারমার্থিক সব রকমের জ্ঞানকেই বোঝাচ্ছে। 'দেবঃ' শব্দটি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় বস্তুকে বোঝায়, যেমন গ্রহ, তারা, সূর্য—এককথায় গোটা সৌরজগৎ। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অতি সামান্য অংশই আমরা দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টির বাইরে আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু যাই থাকুক না কেন, সবই ব্রহ্মে আশ্রিত।

উপনিষদ বলেন, যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানে না, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম করে তার কি লাভ হবে? সব বৈদিক ক্রিয়াই সকাম কর্ম—কোন কিছু লাভের প্রত্যাশায় মানুষ ঐসব অনুষ্ঠান করে থাকে। যেমন আপনি হয়তো দীর্ঘজীবন চান, অথবা সন্তান, টাকাকড়ি বা স্বর্গলাভ করতে চান—সেক্ষেত্রে আপনি ঐসব যাগযজ্ঞ করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওগুলি সবই সকাম কর্ম। আবার এমন মানুষ আছেন যাঁরা নিষ্কাম কর্ম করেন; অর্থাৎ লাভের আশা বা প্রতিদানের আশা না করে কাজ করেন। মনে করুন আপনি ভগবানের ধ্যান করছেন। কেন ধ্যান করছেন? আপনি তাঁকে ভালোবাসেন তাই। আপনি কল্পনা করছেন, ভগবান আপনার সামনে বসে আছেন। তিনি যেন আপনার পিতা, আপনার পরম বন্ধু। তাঁর কাছে আপনি কিছুই চান না। শুধু তাঁর সান্নিধ্য পেয়েই আপনার আনন্দ। আপনি তাঁকে না ভালোবেসে পারেন না, তাই ভালোবাসেন। সে ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, কামগন্ধহীন। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ সকাম কর্মই করে থাকেন এবং তা শাস্ত্রবিহিতও বটে। বস্তুত সাধারণ মানুষের জন্যই বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির বিধান। হিন্দুমতে, নিজের উন্নতির জন্য কাজ করা কিছু দোষের নয়, তবে ধর্ম মেনে, নীতি মেনে ঐসব কাজ করতে হবে।

উপনিষদ আরও উচ্চ তত্ত্বের কথা বলছেন। বলা হচ্ছে, 'হ্যাঁ, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম করে তুমি অর্থ, ক্ষমতা, সন্তান, পরমায়ু, স্বর্গ এমনকি দেবত্ব পর্যন্ত লাভ করতে পার। কিন্তু তাতে তোমার কি হল?' সত্যি কথা। এ সবই তো দুদিনের। এর দ্বারা তো আপনার আত্মজ্ঞান হবে না, মুক্তি হবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সংলাপ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বিষয়-আশয়, ঘরবাড়ি সব ত্যাগ করে বনবাসী হবেন, এমন সময় মৈত্রেয়ী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি ধনসম্পদে পূর্ণ এই গোটা পৃথিবীর অধীশ্বরীও হই, তাহলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বললেন, 'না, তোমার

জীবন আর পাঁচজন ধনীর মতোই হবে; ঐশ্বর্য দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' তখন মৈত্রেয়ী বললেন, 'যা আমাকে অমৃতত্ব দেবে না, তা নিয়ে আমি কি করব? আপনি আমাকে অমৃতত্বলাভের পথ বলে দিন।'

আমরা সবাই জন্মমৃত্যুর আবর্তে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছি। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই। দিনের পর যেমন রাত আসে, তেমনি জন্মের পর একদিন না একদিন মৃত্যু এসে হাজির হবেই। তাই যেভাবেই হোক এই চক্রের বাইরে আসতেই হবে। একেই মুক্তি বলে। হিন্দুঋষিরা মুক্তিকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ বলেছেন। অনেকে বলেন, বারবার জন্মালেই বা ক্ষতি কি? হিন্দুধর্ম তার উত্তরে বলেন যে করুণাপরবশ হয়ে লোককল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করলে কোন দোষ নেই। কোন কোন মহাপুরুষ পরহিতার্থে আবার জন্মাতে চান। মুক্ত হয়েও তাঁরা স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করেন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যদি আপনাকে জন্মাতে হয়, তাহলে তো আপনি মুক্ত হলেন না; আপনি যে বদ্ধ সে বদ্ধই রয়ে গেলেন। আমরা সকলেই এমন জিনিস চাই যা অপরিবর্তনীয়,চিরন্তন, যার ধ্বংস নেই। কিন্তু অক্ষয়, অমর, চিরন্তন বস্তু বলে কিছু আছে কি? আছে। সেটি হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে 'অক্ষর' বলা হয়। অক্ষর অর্থাৎ যার কোন ক্ষয় বা পরিবর্তন নেই। একমাত্র ব্রহ্মকে পেলেই আমরা অমৃতত্ব লাভ করি, মুক্ত হয়ে যাই। উপনিষদ তাই বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মকে এইভাবে জানেন, তাঁরা ব্রহ্মেই লীন হয়ে যান। 'সমাসতে'—যেন তাঁরা বিশাল হয়ে যান, আনন্দে ভরপুর হয়ে যান। যেমন নদী সমুদ্রে মেশে তেমনি তাঁরা ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যান। (সমাসতে—সম্যক্ তিষ্ঠন্তি) সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেলে নদীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। সমুদ্র দেখে কেউ বলতে পারে না তার কোন্ অংশে নদীর জল আছে। সেইরকম ব্রহ্মসমুদ্রে মিশলেও আমাদের আর পৃথক সত্তা থাকে না। এখন আমার একটা নাম, একটা রূপ আছে এবং এই দুটোর প্রতিই আমি আসক্ত। আমার এই মনোভাবই বলে দিচ্ছে আমি বদ্ধ। বদ্ধ কেন? কারণ এই দেহ নশ্বর। একদিন না একদিন শুকনো পাতার মতো সে ঝরে পড়বে। কিন্তু দেহের প্রতি আমি এতটাই আসক্ত যে তাকে হারাবার কথা ভাবলে আমি ভয়ে শিউরে উঠি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে, আমি ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। তখন আমার ক্ষুদ্র, স্বতন্ত্র জাগতিক পরিচয় লুপ্ত হয়। তখন আমি বুঝি আমি দেহ নই, আমি অহঙ্কার নই। আমি এও বুঝি অন্যের থেকে আমি স্বতন্ত্র নই। এক গভীর ঐক্যের অনুভূতিতে তখন আমি আর মহাবিশ্ব একাকার, দ্রবীভূত। তখন শুধু আমিই বিরাজ করি।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি

ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥৯

অন্বয়: ছন্দাংসি (চারটি বেদ); যজ্ঞাঃ (বৈদিক যাগযজ্ঞ); ক্রতবঃ (উপাসনা); ব্রতানি (নানান ব্রত (সকাম]); ভূতং ভব্যম্ (অতীত, ভবিষ্যৎ [এবং বর্তমান]); যৎ চ বেদাঃ বদন্তি (এবং আর আর যা কিছু বেদসমূহে বলা হয়েছে); এতৎ বিশ্বম্ (এই জগৎকে); মায়ী (মায়াধীশ); অস্মাৎ ([নির্গুণ ব্রহ্ম] থেকে); সৃজতে (সৃষ্টি করেন [প্রকাশ করে]);অন্যঃ (অন্য [জীবাত্মা]); মায়য়া (মায়ার দ্বারা); তস্মিন্ (এই জগতে); সন্নিরুদ্ধঃ (বদ্ধ হয়েছেন)।
সরলার্থ: চারটি বেদ, বৈদিক যাগযজ্ঞ, সবরকমের উপাসনা এবং ধর্মীয় সাধনা, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ–সংক্ষেপে বেদে যা যা বলা হয়েছে তার সবকিছুই ব্রহ্ম থেকে এসেছে। নিজের মায়াশক্তি দিয়ে ব্রহ্ম এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেন। আবার সেই একই শক্তির প্রভাবে জীবাত্মা জগৎ-সংসারে বাঁধা পড়ে।
ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম 'মায়ী' অর্থাৎ মায়াধীশ। কিন্তু এই মায়া বস্তুটি কি? মায়া ঠিক যে কি তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। কেউ কেউ মায়া বলতে এক ধরনের জাদু বা 'সম্মোহন' বোঝেন। একদিক থেকে কথাটা ঠিকই; কারণ মায়া এক ধরনের জাদুই যা আমাদের মুগ্ধ করে, যার প্রভাবে মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হয়। এতটাই সত্য বলে মনে হয় যে সেই মিথ্যার পেছনে আমরা উন্মত্তের মতো ছুটে চলি। আমরা সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে আছি। মায়ার ফঁদে পড়ে আমরা এমনভাবে প্রতারিত হচ্ছি যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনিত্য জগতের পেছনে যে নিত্য সত্য আছে তা আমাদের চোখেও পড়ে না; সেই পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তাছাড়া এই মায়া আমাদের প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়ে দেয়। আমরা মনে করি আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র জীব। আমাদের অবস্থা সেই পাখিটির মতো যে একবার মিষ্টি, আরেকবার তেতো ফল খেয়ে চলেছে এবং নিজেকে কখনো সুখী, আবার কখনো দুঃখী ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। আমরা জানি না যে আমরা স্বরূপত ঐ দ্বিতীয় পাখিটির মতো যে শান্ত, অনাসক্ত হয়ে বসে আছে, যে কোন কিছুই খাচ্ছে না। সেইরকম জীবাত্মা এবং সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মা অভিন্ন। কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীবাত্মা নিজেকে সকলের থেকে পৃথক মনে করে অশেষ কষ্ট ভোগ করে।

ব্রহ্ম একইসঙ্গে এই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। সত্য এই– ব্রহ্ম জগৎ 'সৃষ্টি' করেন না। নিজের মায়াশক্তির প্রভাবেই তিনি জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম আর তাঁর মায়াও

সেইরকম অভিন্ন। কখনো এই শক্তি ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত। এই শক্তি যখন ব্যক্ত হয়, তখন তারই প্রভাবে আমরা এই বৈচিত্রময় জগৎ দেখতে পাই। কিন্তু এই শক্তি যখন অব্যক্ত, তখন কেবলমাত্র সেই এক ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্ম তখন বাক্য ও মনের অতীত। তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্ম 'কেবল'– তিনি একাই আছেন। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। এই অবস্থায় ব্রহ্ম কূটস্থ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে স্থিত। এটি শুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা। কিন্তু এই নির্বিশেষ ব্রহ্মই আবার নিজের শক্তিপ্রভাবে সগুণ, সাকার হতে পারেন। ঠিক যেমন গুটিপোকা নিজের লালা দিয়ে গুটি তৈরি করে তাতেই বদ্ধ হয়।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং চ মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥১০

অন্বয়: প্রকৃতিং তু মায়াং বিদ্যাৎ ([পূর্বে উল্লিখিত] প্রকৃতিকে মায়া বলেই জানবে); মহেশ্বরং চ মায়িনম্ (আর মহেশ্বর [পরমেশ্বর ব্রহ্ম]-কে মায়াধীশ); তস্য অবয়বভূতৈঃ (তাঁর শরীর); তু ইদং সর্বম্ (এই সবকিছুই); জগৎ ব্যাপ্তম্ ([যা] জগৎ পরিপূর্ণ করে রেখেছে।
সরলার্থ: ('প্রকৃতি'র কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃতি হল সেই উপাদান যা দিয়ে জগৎ নির্মিত। এই প্রকৃতির আর এক নাম মায়া।) প্রকৃতিকে মায়া বলে এবং মহেশ্বরকে (তথা ব্রহ্মকে) মায়াধীশ বলে জানবে। এই বিশ্বচরাচর মহেশ্বরের দেহ (অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বত্র এবং সর্বজীবে বিরাজিত)।
ব্যাখ্যা: মায়া আর প্রকৃতি অভিন্ন। এক শক্তিকেই কখনো মায়া, কখনো বা প্রকৃতি বলা হয়। যখন ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন তখন তিনি মায়া বা প্রকৃতির সাহায্যেই তা করে থাকেন। ব্রহ্মের দুটি অবস্থা— নির্গুণ ও সগুণ। যখন উপাধি নেই তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। এই নিরুপাধিক ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। এই আত্যন্তিক, শুদ্ধ অবস্থায় তিনি জগৎকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ব্রহ্ম যখন উপাধিযুক্ত অর্থাৎ সোপাধিক, তখন তিনি সগুণ। তখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় করেন। সেই অবস্থায় তিনি মায়াধীশ।

এই বিশ্বচরাচর যেন তাঁর শরীর। কেমন করে? বেদান্ত একে বলছেন 'অধ্যাস' বা 'অধ্যারোপ'। মনে করুন, রাতে আপনি একটা পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ আপনি দেখতে পেলেন আপনার চোখের সামনে একটি সাপ। ভয়ে আপনি চিৎকার করে উঠলেন। আপনার গলা শুনে একজন আলো নিয়ে ছুটে এলেন। সেই আলোয় আপনি দেখতে পেলেন সামনে যেটি পড়ে আছে সেটি সাপ নয়, একটুকরো দড়ি। ওখানে সাপ কখনই ছিল না। অন্ধকারে পড়ে থাকা দড়িটাকে সাপের মতো মনে হয়েছিল এই যা।

বেদান্তের ভাষায় এটা প্রাতিভাসিক সত্তা। ঠিক তেমনি মায়ার প্রভাবে আমরা যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকি, তখনি আমাদের চোখে এই জগৎ ভেসে ওঠে। কিন্তু আলো অর্থাৎ জ্ঞান হলে আমরা আর জগৎকে দেখতে পাই না। জগতের পরিবর্তে আমরা তখন সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে শুধু ব্রহ্মকেই দেখি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা ছোট ঘাসের ডগা থেকে শুরু করে বিরাট (সমষ্টিশরীর) পর্যন্ত সবই সেই এক ব্রহ্ম।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি।।১১

অন্বয়: যঃ একঃ (যে এক ও অদ্বিতীয় [ঈশ্বর]); যোনিং যোনিম্ (তিনিই উৎপত্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে); অধিতিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত); যস্মিন্ (যাঁতে [ঈশ্বর, যিনি পালন করেন]); ইদম্ (এই [জগৎ-সংসার]); সম্-এতি (সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে); বি-এতি (লয় হয়); তং বরদম (সেই ঈশ্বর, যিনি ভক্তদের বর দেন); ঈড্যম (পূজনীয়); দেবম্ (দেবতা [যিনি আলো দেন]); ঈশানম্ (ঈশ্বর [যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন]); নিচায্য (উপলব্ধি করে); অত্যন্তম্ (আত্যন্তিক বা শাশ্বত); শান্তিম্ (শান্তি); এতি (অর্জন করে)।
সরলার্থ: ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই সবকিছুর মূল। জগৎ প্রকাশিত হলে সেই জগৎকে তিনিই পালন করেন। আবার প্রলয়কালে জগৎ তাঁর কাছেই ফিরে যায়। তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা। একমাত্র তিনিই ভক্তদের বর দেন। তিনিই একমাত্র আরাধ্য। এই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হলে শাশ্বত শান্তি লাভ করা যায়।
ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম বৃহত্তম। তাঁর আর এক নাম 'পরমেশ্বর'। যেহেতু তিনি সবকিছুর কারণ, সেইহেতু তাঁকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা বলা হয়। 'আমিই ব্রহ্ম', এই জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ।

'বি-এতি' বলতে এখানে 'ফিরে যাওয়া' বা 'লীন হওয়া' বোঝাচ্ছে। 'সম-এতি' কথাটির অর্থ সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সবকিছুই ব্রহ্ম থেকে উৎসারিত। তিনি সবকিছুর কারণ এবং আকর। তিনি কারণেরও কারণ। তিনিই নিজেকে প্রকাশ করেন এবং বহুরূপে প্রতিভাত হন।

'নিচায্য' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আচার্য শঙ্করের মতে 'নিচায্য' শব্দটির অর্থ 'নিশ্চয়েন' অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে। 'ব্রহ্ম অহম্ অস্মি', আমিই ব্রহ্ম; 'ইতি', এই; 'অপরোক্ষ কৃত্য', প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করে। 'প্রত্যক্ষি কৃত্য', অর্থাৎ নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তুমি নিশ্চিতভাবে জানবে। নিজেকে অনুভব করতে হবে; অন্য কে অনুভব করেছে, তা দিয়ে হবে না। এখানে কোন্ অনুভূতির কথা বলা হচ্ছে? 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমি ব্রহ্ম এই উপলব্ধি, এই অনুভূতির কথাই এখানে বলা হচ্ছে। জ্ঞান বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, এ সেরকম জ্ঞান নয়। যেমন ধরুন, আজ হয়তো একটি নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পড়লাম এবং সেই বিষয়ে আমার জ্ঞান হল। কিন্তু আগামীকাল আরেকজন বৈজ্ঞানিক ঐ তত্ত্বটিকে হয়তো খণ্ডন করে দিলেন। আবার এই বিজ্ঞানী গবেষণা করে যে তত্ত্ব প্রচার করলেন,কোনদিন হয়তো আর একজন বিজ্ঞানী এসে প্রমাণ করে দেবেন—আগের তত্ত্বে ভুল আছে। এই হল প্রচলিত জ্ঞানের ধারা। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান সেইটি যা চিরকাল, সব অবস্থাতেই সত্য, যা অখণ্ডনীয়। ব্রহ্মজ্ঞান সেই রকমের জ্ঞান যা হলে সাধকের সব সংশয় দূর হয়ে যায়। তাঁর প্রত্যয় এমন দৃঢ় হয় যে, কোন অবস্থাতেই তাঁকে টলানো যায় না। এ বৌদ্ধিক প্রত্যয় নয়, তারও বেশি কিছু। এই জ্ঞান বা উপলব্ধির ফলে সাধকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব পালটে যায়। এই অনুভূতি এতই ব্যক্তিগত যে তা অন্যকে বলে বোঝানো যায় না। এই অনুভূতি নিজেকেই লাভ করতে হয়। একজন হয়তো জানতে চাইলেন, আপেল খেতে কেমন? কিন্তু আপনি কেমন করে তাকে আপেলের স্বাদ বোঝাবেন? আপনি বড়জোর বলবেন, আপেল খেতে কেমন, না আপেল খেতে যেমন। একমাত্র নিজে আপেল খেলে তবেই তিনি আপেলের স্বাদ বুঝবেন।

সারাজীবন আপনি হয়তো ঈশ্বর সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। কিন্তু নিজে ঈশ্বরকে উপলব্ধি না করলে আপনার কি লাভ হল? শুধু বক্তৃতায় কি হবে? একবার কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর উপলব্ধির সত্যতা যাচাই করতে লাগলেন। তাঁদের প্রশ্ন—'শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব অভিজ্ঞতা হয়, সেগুলি কি সত্য?' আমাদের মনে এ-জাতীয় সংশয় আসতেই পারে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাই, শ্রীরামকৃষ্ণের মন যে স্তরে উঠে থাকত, আমাদের মন তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারে না। আমাদের যে চেতনা,তা অনেক নীচু স্তরের। আমাদের মন যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীরামকৃষ্ণের মনের স্তরে উঠছে, ততক্ষণ আমরা কোনমতেই তাঁর অনুভূতির মর্ম বুঝতে পারব না। সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে গেলে সূক্ষ্ম মন চাই, শুদ্ধ বুদ্ধি চাই। কিন্তু কোথায় আমাদের সেই সূক্ষ্ম মন, শুদ্ধ বুদ্ধি? আমাদের মন, বুদ্ধি, অনুভব খুবই মোটা দাগের—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের তুলনাই চলে না। সেইজন্যই এইসব উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বুঝতে গিয়ে আমরা হিমশিম খাই।

এইজন্যই ‘শান্তিম্ অত্যন্তম্’ অর্থাৎ পরাশান্তি এবং ঈশ্বরীয় অনুভূতির বিমল আনন্দ আমরা কিছুতেই আস্বাদন করতে পারি না। একজন ওস্তাদ যেমন আরেকজন ওস্তাদের গানের ঠিক ঠিক সমঝদার হতে পারে, তেমনি তপস্যার মধ্য দিয়ে যখন আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, কেবল তখনি আমরা ভগবৎ অনুভূতি যে কি বস্তু তা বুঝতে পারি। আমিই ব্রহ্ম, এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা পরাশান্তি, অক্ষয় শান্তি লাভ করতে পারব না।

আচার্য শঙ্কর আরও বলছেন, জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। আমরা যে অজ্ঞানতার জন্যই কষ্ট পাচ্ছি, সেইটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সৎগুরুর প্রয়োজন। কিন্তু অজ্ঞানের পারে যাওয়ার চেষ্টা আমাকেই করতে হবে। কিন্তু কিভাবে অজ্ঞানতার পারে যাওয়া যায়? জ্ঞানের সাহায্যে। যেমন আলো জ্বললে অন্ধকার দূর হয়, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই অজ্ঞানতার হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়। আত্মজ্ঞানটা কি বস্তু? আমিই ব্রহ্ম—এই জ্ঞান। এই জ্ঞান ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞান হলে তবেই অবিদ্যার অবসান। সাধকের অন্তর তখন জ্ঞানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। আপনার, আমার সকলের অন্তরেই অন্তহীন আলোর নির্ঝর রয়েছে, রয়েছে শাশ্বত শান্তির প্রতিশ্রুতি। এই শান্তি কেমন? আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই শান্তি অনেকটা যেন সুষুপ্তির শান্তির মতো।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥১২

অন্বয়: যঃ (যিনি); দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবঃ চ (সব দেবতাদের উৎপত্তিস্থল এবং তাঁদের শক্তির উৎস); বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ ([যিনি] রুদ্র, বিশ্বপালক); মহর্ষিঃ ([যিনি] সর্বজ্ঞ বা মহাজাগতিক দৃষ্টিসম্পন্ন); হিরণ্যগর্ভং জায়মানং পশ্যত ([যিনি এমনকি] হিরণ্যগর্ভের জন্মও (সমষ্টিমন-রূপে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ] দেখেছেন); সঃ (তিনি [সেই রুদ্র]); নঃ (আমাদের); শুভয়া বুদ্ধ্যা (শুভবুদ্ধির সঙ্গে); সংযুনক্তু (যুক্ত করুন)।
সরলার্থ: ব্রহ্ম সকল দেবতা ও তাঁদের শক্তির উৎস। তাঁর এক নাম রুদ্র। তিনি এই বিশ্বের অধিপতি, এই বিশ্বের সবকিছুই তিনি দেখছেন। হিরণ্যগর্ভের জন্মও তিনি দেখেছেন (অর্থাৎ, তিনি সবকিছুর আদিকারণ, তিনিই নির্গুণ, নিরুপাধিক ব্রহ্ম)। এই রুদ্র আমাদের শুভবুদ্ধি দিন।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। আমাদের বুদ্ধি যেন যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলজনক তার প্রতি চালিত হয়— এখানে সেই প্রার্থনা করা হয়েছে। জর্জ বার্নার্ড শ-এর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, এমন মানুষও থাকতে পারে যিনি পণ্ডিত-মূখ। অর্থাৎ খুব বিদ্বান, খুব বুদ্ধিমান হয়েও দৈনন্দিন জীবনে তিনি মূর্খের মতো আচরণ করতে পারেন। এ এক প্রহেলিকা।

যদি কিছু চাইতেই হয় তাহলে যা সবচাইতে মূল্যবান তারজন্য প্রার্থনা করাই ভালো। ধরা যাক, আপনি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তা পেলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য তো চিরকাল সুস্থ থাকবে না। একদিন না একদিন তা নষ্ট হবেই। অর্থ, ক্ষমতা, দৈহিক সৌন্দর্য-—এগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এ সবই অনিত্য। আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আপনি শান্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বুদ্ধিই আপনাকে জ্ঞান ও সত্যের দিকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে শ্রেয় এবং যা চিরন্তন তার দিকে। শুদ্ধ মন, শুভবুদ্ধি আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান সহায়। তাই এই প্রার্থনা।

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥১৩

অন্বয়: যঃ (যে [পরমেশ্বর]); দেবানাম্ অধিপঃ ([ব্রহ্মাদি] দেবতাদের শাসন করেন); লোকাঃ (সকল লোক); যস্মিন্ (যাঁর উপর); অধিশ্রিতাঃ (অধ্যস্ত); যঃ অস্য দ্বিপদঃ (যিনি দুই-পা যুক্ত মানুষ); চতুষ্পদঃ (চার-পা যুক্ত পশুদের); ঈশে (নিয়ন্ত্রণ করেন); কস্মৈ (সেই [আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে]); দেবায় (সেই দেবতাকে); হবিষা (ঘৃতাহুতি দ্বারা); বিধেম (আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাই)।

সরলার্থ: তিনি সকল দেবতার নিয়ামক এবং সকল জগতের আশ্রয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ব্রহ্ম, তিনি আনন্দস্বরূপ। ঘৃতাহুতি দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ব্যাখ্যা: 'ক' মানে আনন্দ। ব্রহ্ম আনন্দের উৎস। অনিত্য বস্তুর পেছনে আমরা কেন ছুটি? ভালো খাবার, ভালো পোশাক, টাকাকড়ির প্রতি আমাদের এত টান কেন? কারণ এইসব পার্থিব বস্তু এবং ইন্দ্রিয়সুখেও ব্রহ্মের স্পর্শ বা ব্রহ্মানন্দের আভাস আছে। আসলে আমরা

সকলেই একটা জিনিসই চাই। সেটা হচ্ছে আনন্দ। আমরা মনে করি পার্থিব জিনিস পেলেই বোধহয় আমরা সুখী হব। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এইসব বস্তুনির্ভর পার্থিব আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, দেখতে দেখতে এ আনন্দ উবে যায়। যেমন কেউ খুব ভালো ভালো খাবার খেতে দিলে, খেতে খেতে আনন্দ এবং তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। কিন্তু যতক্ষণ খাচ্ছি, ততক্ষণই আনন্দ। খাওয়া শেষ হলে আনন্দও শেষ। আবার খুব বেশি খেলে শরীর খারাপ হতে পারে। তাই উপনিষদ বলছেন, যদি আনন্দ চাইতেই হয় তবে সেই আনন্দই চাইব যার ক্ষয় নেই, যার শেষ নেই। একমাত্র সেই অনন্ত, পরমব্রহ্মই আমাদের চিরস্থায়ী শান্তি, আনন্দ দিতে পারেন। তাই আমরা যেন শুধু ব্রহ্মকেই চাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ দেবতাদের অধীশ্বর এই ব্রহ্ম। যত রকমের লোক আছে সব তাতেই অধ্যস্ত। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর তিনিই ভাগ্যবিধাতা। তিনিই পরমানন্দ। এই ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥১৪

অন্বয়: সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্মের থেকেও সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সূক্ষ্মতম); কলিলস্য মধ্যে (জলবুদ্বুদের জন্মলগ্নের আগেও যা ছিল তার মধ্যেও); বিশ্বস্য (জগতের); স্রষ্টারম্ অনেক-রূপম্ (স্রষ্টা নানারূপে (কার্য এবং কারণরূপে] নিজেকে প্রকাশ করেছেন); [তথা (সেইসঙ্গে)]; বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ (জগতের একমাত্র নিয়ন্তা); শিবম্ (মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে); জ্ঞাত্বা (উপলব্ধি করে); অত্যন্তং শান্তিম্ এতি (অক্ষয় শান্তির অধিকারী হওয়া যায়)।

সরলার্থ: ঈশ্বর (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মতম। জলবুদ্বুদে জগৎ আভাসিত হবার আগেও যা ছিল, তার মধ্যেও তিনি ছিলেন (কারণ তিনিই আদিকারণ)। যা কিছু আছে তা তিনিই প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, তিনিই কারণ, তিনি কার্য, তিনিই পরমাত্মা এবং সকলের নিয়ন্তা। তিনি পরম মঙ্গলময় শিব। তাঁকে (নিজের আত্মারূপে) উপলব্ধি করতে পারলে অক্ষয় শান্তির অধিকারী হওয়া যায়।

ব্যাখ্যা: 'কলিল' শব্দটির অনেকরকম অর্থ হয়। একটা অর্থ হল, যে বুদ্বুদ দিয়ে সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল, ব্রহ্ম তার আগেও ছিলেন। অর্থাৎ তিনিই আদিকারণ। 'কলিল' শব্দের আরেকটি

অর্থ বিশৃঙ্খলা। কেউ কেউ মনে করেন সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু বিশৃঙ্খল, এলোমেলো অবস্থায় ছিল অথবা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ছিল। আবার 'কলিল'-এর আরেকটি অর্থ গহন সংসার। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এতই গহন ও রহস্যময় যে আমরা তাকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে বা বুঝতে পারি না। ব্রহ্ম এই জগতেই বিরাজ করছেন কিন্তু তিনি এতই সূক্ষ্ম যে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। 'অনেক রূপম্' অর্থাৎ, নানারূপে, নানাভাবে তিনি জগতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই বৈচিত্রের গোলক-ধাঁধায় আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। আমরা জগৎ দেখি কিন্তু জগৎ প্রকাশককে দেখতে পাই না; তাই তিনি অনির্বচনীয়, ব্যাখ্যার অতীত। বৈচিত্রের অন্তরালে যে ঐক্য তাকে যখন আমরা উপলব্ধি করি, যখন জানি তিনিই সকল বস্তুর অন্তরতম সত্তা, তখনি আমরা অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ লাভ করি।

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥১৫

অন্বয়: সঃ এব (তিনিই); বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বের অধিপতি); কালে (যতক্ষণ এটা আছে [থাকবে]); ভুবনস্য গোপ্তা (এই বিশ্বকে রক্ষা করেন); সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ (সব প্রাণীর ভিতর আত্মগোপন করে আছেন); যস্মিন্ (তাঁতে); ব্রহ্মর্ষয়ঃ (ব্রহ্মর্ষিরা [সিদ্ধ ঋষিরা]); দেবতাঃ চ যুক্তাঃ (এবং দেবতারাও তাঁরই মধ্যে); তম্ এবং জ্ঞাত্বা (তাঁকে জেনেই [নিজ আত্মারূপে]); মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি (মৃত্যু-শৃঙ্খল ছিন্ন করেন [অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়])।

সরলার্থ: ঈশ্বর যতক্ষণ এই জগৎকে ধরে আছেন ততক্ষণই এর অস্তিত্ব। তিনি সকলের অধিপতি এবং প্রত্যেকের অন্তরাত্মা। মহাত্মা এবং দেবতারা তাঁতেই অবস্থান করেন। তাঁর সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করলে জীবের মৃত্যু-শৃঙ্খল খসে পড়ে।

ব্যাখ্যা: 'কালে' বলতে কল্পের বা যুগের আরম্ভ বোঝানো হয়েছে। হিন্দুমতে এই মহাবিশ্বের প্রকাশ এবং প্রলয় চক্রাকারে হয়ে থাকে। জগৎ কখনো প্রকাশিত বা ব্যক্ত, আবার কখনো অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত। অব্যক্ত অবস্থায় জগৎ বীজাকারে, সম্ভাবনারূপে সুপ্ত থাকে। অতি ক্ষুদ্র একটা বীজ থেকে যেমন কালে বিশাল বটগাছ হয়, ঠিক তেমনিই অব্যক্ত অবস্থা থেকে এই মহাবিশ্ব প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মই জগৎকে প্রকাশ করেন, আবার তিনিই এই জগতের 'গোপ্তা—আশ্রয়। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত—দুই অবস্থাতেই এই জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত।

ব্রহ্মর্ষি বলতে অতি উচ্চ কোটির ঋষি অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমারকেই বোঝায়। তাঁরা অমর। ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়েও লোককল্যাণের জন্য তাঁরা মাঝে মাঝে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি তিনি 'সপ্তর্ষি'লোকে (যে লোকে সাতজন ঋষির বাস) গিয়ে একজন ঋষিকে পৃথিবীতে আসার জন্য অনুরোধ করছেন। স্বামী বিবেকানন্দই সেই সপ্তর্ষির এক ঋষি। বাস্তবিক, এমন কিছু আধিকারিক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা মুক্ত হয়েও ব্রহ্মে লীন হতে চান না। না চাইবার কারণ তাঁরা ঈশ্বরের কাজে সাহায্য করতে চান এবং সেইহেতু পৃথিবীতে এসে নতুন শরীর ধারণ করতেও পিছপা হন না। প্রত্যেক অবতারের সঙ্গেই তাঁরা আসেন। সব দেবদেবী, ঋষি-মুনি, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত সকলেই নিরাকার ব্রহ্ম থেকেই এসেছেন।

এখানে 'অবিদ্যা'কে মৃত্যু বলা হয়েছে। যখন আপনি বুঝলেন আপনি স্বরূপত ব্রহ্ম, তখনি আপনার জ্ঞান হল। কিন্তু সেই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আপনি মৃত্যুর নাগপাশে বাঁধা। মৃত্যু কেন? কারণ অজ্ঞানতাবশত এখন আমি নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করছি এবং দেহের কিছু ঘটলে আমিও তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি। আমি মনে করছি—আমার জন্ম হয়েছিল, আমার বয়স বাড়ছে, আমি একদিন মারা যাব। কিন্তু একবার যদি আমি বুঝি, আমিই সেই অক্ষয়, অবিনাশী পরমাত্মা, তাহলে আর আমার মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু যদি হয় তো সে দেহের মৃত্যু, আমাকে তা স্পর্শ করবে না। বেলুড়মঠের একটা ঘটনা বলি। একদিন আমগাছের শুকনো একটা ডাল মাটিতে খসে পড়তে দেখে একজন সাধু বলে উঠলেন, 'আমিও একদিন এর মতো ঝরে পড়ব। গাছটা যেভাবে শুকনো ডালকে ঝেড়ে ফেলে দিল, সেইভাবে আমিও যেদিন এই দেহটা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারব সেদিন আমার কত আনন্দ হবে বল দেখি!' বয়সের ভারে, রোগ-ব্যাধির কবলে পড়ে জীর্ণ, অশক্ত শরীর একসময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তখন এটি যত তাড়াতাড়ি চলে যায় ততই মঙ্গল। একথার অর্থ এই নয় যে আমি মৃত্যুকে ডাকছি। না, তা নয়। আমি কেবল দেহ সম্পর্কে উদাসীন, অনাসক্ত। এটাই প্রকৃত মুক্তি। স্বাভাবিক নিয়মেই দেহের পরিবর্তন হয়। শরীর এই ভালো, এই খারাপ। এইসব দেহের বিকার বা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালেই সর্বনাশ। তাহলে দেহ আর আমাদের এক দণ্ড স্থির থাকতে দেবে না। মনে করুন, আপনার মাথা ধরেছে। অমনি আপনার মেজাজ বিগড়ে গেল। আর যেই মেজাজ খারাপ হল, অমনি আপনি অন্যকে দু-কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান হলে মানুষ শান্ত হয়ে যায়; সব পরিস্থিতিতে তখন সে সংযত, স্থির থাকে। তখন আর সে আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোলে না। তখন সে সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। সব

অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে। এই হল প্রকৃত বীরের মনোভাব। মনে রাখতে হবে আমরা সবসময়ই প্রভু, দাস নই।

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥১৬

অন্বয়: ঘৃতাৎ পরম্ (ঘিয়ের উপর [ভাসে]); মণ্ডম্ (হালকা সরের মতো (সারবস্তু]); ইব অতিসূক্ষ্মম্ (ঠিক সেইরকম অতিসূক্ষ্ম); জ্ঞাত্বা (জেনে); বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বের একমাত্র কর্তা, যিনি কর্ম অনুসারে প্রতিটি জীবকে তার প্রাপ্য ফল দান করেন); সর্বভূতেষু গূঢ়ম্ (সকলের অন্তরাত্মা); দেবং শিবং জ্ঞাত্বা (করুণাঘন স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বর শিবকে জেনে); সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে ([অজ্ঞানতাজনিত] সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়)।
সরলার্থ: ঘিয়ের উপর হালকা সরের মতো একটা সারবস্তু ভেসে থাকে। ঈশ্বর সেই অতি সূক্ষ্ম সারবস্তুর মতো, যিনি বিশ্বের একমাত্র কর্তা, যিনি প্রতিটি জীবকে তার কর্ম অনুসারে প্রাপ্য ফল দান করেন। অন্তরাত্মা হয়ে এই পরমেশ্বর সকলের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। তিনিই করুণাঘন পরমেশ্বর শিব। সেই পরমেশ্বরকে (নিজের আত্মা বলে) জানতে পারলে সমস্ত বন্ধন (অজ্ঞানতাজনিত বন্ধন যা এখন আমাদের বেঁধে রেখেছে) থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
ব্যাখ্যা: 'পরম' শব্দের অর্থ উন্নত বা উৎকৃষ্ট। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ সূক্ষ্ম। যা কিছু উন্নত, যা কিছু মহান তা সবসময় সূক্ষ্মই হয়।।

ঘি জ্বাল দেবার সময় সূক্ষ্ম সরের মতো যে সারবস্তু উপরে ভেসে ওঠে তাকে বলে মণ্ড। ঘিয়ের চাইতে এই মণ্ড আরও সুস্বাদু। যারা ভোজনরসিক এটা তাদের বড়ই প্রিয়। উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্ম এই মণ্ডের মতো। মণ্ড যেমন ঘিয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, তেমনি ব্রহ্ম আমাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকেন। এত সূক্ষ্ম যে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। কিন্তু একবার সেই ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পেলে, অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করতে পারলে আমাদেরও আনন্দের সীমা থাকে না। কেউ কেউ এই আনন্দে এমনি আত্মহারা হয়ে যান যে কোনমতেই আনন্দের বেগ সামলাতে পারেন না। পথের ভিখিরি লটারীতে যদি হঠাৎ দশলাখ টাকা পেয়ে যায় তখন তার কি অবস্থা হয়? সে আনন্দে পাগল হয়ে যেতে পারে। ব্রহ্মানন্দে মানুষের মন তার চাইতেও কোটি গুণ উথালপাতাল করে। যেন আনন্দের বান

ডাকে, আর আপনি সেই আনন্দের তীব্র স্রোতে ভেসে যান, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অনেকসময় এই আনন্দের তোড় দেহ সহ্য করতে পারে না। বিষয়ানন্দ, সে যত বড়, যত তীব্রই হোক না কেন ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না।

ব্রহ্ম আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র তিনি বিরাজ করছেন। তিনি যেন আমাদের কোলে করে রয়েছেন। আপনার যখন এই উপলব্ধি হয় তখন আর আপনার কোন বন্ধন নেই। জাগতিক সব পাশ তখন ঝরা পাতার মতো খসে পড়ে।

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥১৭

অন্বয়: বিশ্বকর্মা (এই বিশ্বের স্রষ্টা); মহাত্মা (পরমাত্মা); সদা (সর্বদা); জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (জীবের হৃদয়ে লুকিয়ে আছেন); এষঃ দেবঃ (এই মহান ঈশ্বর [পরমাত্মা]); হৃদা ([নেতি, নেতি] বিচারের দ্বারা অর্থাৎ, এটা নয়, এটা নয়); মনীষা (এই বুদ্ধির সাহায্যে নিত্যকে অনিত্য থেকে আলাদা করে); মনসা (জীবাত্মাই যে পরমাত্মা, মননের দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে এলে); অভিক্লৃপ্তঃ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম প্রকাশিত হন); যে এতৎ বিদুঃ (যাঁরা এই সত্য জানেন); তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ: পরমাত্মা এই বিশ্বের স্রষ্টা (এই অর্থে যে তিনিই জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন)। তিনিই সেই মহান পুরুষ, তিনিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে সংবৃত। যাঁরা এই পরমাত্মাকে জানেন তাঁরা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন (অর্থাৎ তাঁদের মৃত্যুভয় চলে যায়)।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে বিশ্বকর্মাও বলা হয়। কারণ সমস্ত জগৎ তাঁর থেকেই এসেছে। বেদান্তে সৃষ্টির কথা নেই। বেদান্তের বক্তব্য ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাসিত হয়েছেন। জগৎ কেউ হঠাৎ সৃষ্টি করেছে, তা নয়। মহাত্মা শব্দের অর্থ এখানে সর্বব্যাপী। তিনি সদাসর্বদাই আমাদের হৃদয়ে আছেন। কখনো কখনো হৃদয়কে শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ বলা হয়। কেন তা আমরা জানি না। কিন্তু একটা জিনিস আমরা সকলেই দেখি, নিজেকে দেখাতে গিয়ে মানুষ আঙুল দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে। আবার হৃদয়েই আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়।

ব্রহ্ম কেমনভাবে হৃদয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন : সূর্য যেমন তার প্রতিবিম্বের মধ্যে ধরা পড়ে, ব্রহ্মও তেমনিভাবে আমাদের হৃদয়ে বিধৃত। আমরা যেন ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। কিন্তু প্রতিবিম্ব তো মিথ্যা। এখন খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে—মানুষ

যদি মিথ্যা প্রতিবিম্বই হবে, তাহলে সে কি করে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে? শঙ্কর বলেন : সূর্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, ব্রহ্মও ঠিক তেমনি মানুষের হৃদয়াকাশে প্রতিবিম্বিত হন। জল হল সূর্যের উপাধি, অর্থাৎ জল দিয়ে সূর্য বিশেষিত বা সীমিত হয়। উপাধি জলের জন্যই সূর্যকে আলাদা এবং বিচ্ছিন্ন দেখায়। ঠিক তেমনিই, দেহ আছে বলেই আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয়। নাম এবং রূপও আমাদের উপাধি। নাম-রূপের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম মনে করলেই আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন, পৃথক মনে করি। ভাবি, আমরা ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র। কিন্তু যখন একথা বুঝি যে প্রতিবিম্ব সত্য নয়, বিম্ব বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য , তখনি আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করি।

'হৃদা', যা প্রত্যাখ্যান করে। হৃদা বলতে বর্জন করা বা ত্যাগ করার পদ্ধতিকে বোঝায়। কি ত্যাগ করে? মিথ্যা বা অসত্যকে ত্যাগ করে। বেদান্তের পরিভাষায় 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ এটি নয়, এটি নয়—এইভাবে বিচার করে অনিত্য বস্তুকে বর্জন করতে হবে। এমনিতেই জীবনে আমাদের বহু জিনিস ত্যাগ করতে হয়। আর যদি আমরা পরম বা শ্রেষ্ঠকে পেতে চাই, তাহলে যা ক্ষুদ্র, যা তুচ্ছ তাকে তো ছাড়তেই হবে।

'মনীষা' মানে বিচার। প্রথমে ত্যাগ করতে হবে, পরে গ্রহণ। কি গ্রহণ? ব্রহ্মকে। আমাদের এমন একটা দৃঢ় সঙ্কল্প চাই যে আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবই করব,তার চেয়ে কম কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হব না। অনেকেই একটু কিছু করে মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু যিনি দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি বলেন, আমি হাল ছাড়ব না। লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি কিছুতেই থামব না।

'অভিক্লৃপ্তঃ' শব্দটির অর্থ প্রকাশমান। ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি নিজেই আমাদের কাছে ধরা দেন। কখন? ত্যাগ ও বিচারের দ্বারা যখন আমরা ব্রহ্মে তন্ময় হই, তখনি ব্রহ্ম নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মকে জানার অর্থ তাঁকে নিজের আত্মারূপে জানা। যে কোন কারণেই হোক এখন আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে আছি। আমাদের অবস্থা সেই সিংহশাবকের মতো যে ভেড়ার পালের মধ্যে বড় হয়ে নিজেকে ভেড়াই ভাবত। সে ঘাস খেত, ভেড়ার মতো ভ্যা ভ্যা করে ডাকত। তার আচার-আচরণ সবকিছুই ভেড়ার মতো। একদিন অন্য একটা সিংহ সেখানে এসে দেখে একটা বড়সড় সিংহ ভেড়ার মতো আচরণ করছে। সে তো হতবাক! সিংহ শাবকটিকে টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বলল : দেখ্, তোর মুখ ঠিক আমার মুখের মতো। তুই মোটেই ভেড়া নোস, তুই তো সিংহ। এই বলে যেই না তার মুখে একটুকরো মাংস গুঁজে দেওয়া, অমনি শাবকটি সিংহনাদ করে উঠল। গুরু ঠিক তাই করেন। তিনি আমাদের স্বরূপ বলে দেন, 'তত্ত্বমসি', তুমিই সেই। আমরা এখন নিজেদের

দুর্বল, অসহায়, নির্বোধ এবং পাপী মনে করি। এই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে হবে, এ মোহ দূর করতেই হবে। এইজন্যই উপনিষদ বলেন, যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন। মোহমুক্তির ফলে তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যান।

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥১৮

অন্বয়: যদা অতমঃ (যখন অন্ধকার [অজ্ঞানতা] ছিল না); তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ (তখন দিনও ছিল না, রাতও ছিল না); ন সৎ ন চ অসৎ (অস্তিও ছিল না, নাস্তিও ছিল না); কেবলঃ শিবঃ এব (মঙ্গলময় শিবই ছিলেন (অর্থাৎ কেবল আনন্দ]); তৎ অক্ষরম্ (যিনি নিত্য, শাশ্বত); তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্ (যাঁকে সূর্যমণ্ডলের দেবতাও পূজা করেন); তস্মাৎ চ (তা থেকেই); পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা (সনাতন প্রজ্ঞা উৎসারিত হয়ে এখন বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত)।

সরলার্থ: এমন একসময় ছিল যখন অজ্ঞানতা ছিল না এবং তার কুফলও ছিল না। তখন দিনও ছিল না, রাতও ছিল না; 'অস্তি'ও ছিল না, 'নাস্তি'ও ছিল না। কেবল সেই নির্বিশেষ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। সূর্যমণ্ডলের অধীশ্বর দেবতারাও এই ব্রহ্মের পূজা করেন। এই ব্রহ্ম থেকেই সেই সনাতন প্রজ্ঞা উৎসারিত, যা আমাদের সকলেরই কাম্য, যা গভীর মনন ও বিচারের ফল এবং যা পরম্পরাক্রমে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ জোর দিয়ে একথাই বোঝাতে চাইছেন যে ব্রহ্মকে বর্ণনা করার চেষ্টা বৃথা। বাস্তবিক, ব্রহ্ম কি বস্তু তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন যে ভালো করে দেখেশুনে তার বর্ণনা করলাম। ইদানীং বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করছেন যে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে গিয়ে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যাটা হচ্ছে এই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেহেতু মন-বুদ্ধির সাহায্যে করা হচ্ছে সেইহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ইন্দ্রিয়ের প্রভাব পড়ছে এবং তার ফলে গবেষণা তার বিশুদ্ধতা হারাচ্ছে। যে কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল হল শক্তি ও ইন্দ্রিয়বাহিত অভিজ্ঞতার যোগফল। সুতরাং একে কিভাবে বর্ণনা করা যাবে? অনেকের কাছেই তাই উপনিষদের ভাবনাগুলো অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় এ যেন শুধু কথার মারপ্যাঁচ। কিন্তু তা নয়। সহজে বোঝা না গেলেও উপনিষদের বাণী অত্যন্ত গভীর।

অন্ধকার অজ্ঞানের প্রতীক, তাই উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মে কোন অন্ধকার নেই। অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। আবার ব্রহ্ম দিন-রাত্রি, দেশ-কালের অতীত। দেশ এবং কাল, দিন এবং রাত্রি এ সবই আপেক্ষিক। আবার ব্রহ্ম 'ভালো' না 'মন্দ'—তা-ও বলা যায় না। কোন বিশেষণ দিয়েই তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। ব্রহ্ম অখণ্ড, পরম তত্ত্ব। এমনকি 'সৎ' বা 'অসৎ' বলেও তাঁকে বোঝানো যায় না। অস্তিত্বের সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সীমিত। মনে করুন, আপনার ঘরে একটা ফুল আছে। আপনি ফুলটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, তাই বলছেন—ফুলটা আছে। কিন্তু পরদিন যেই কেউ ফুলটা সরিয়ে নিয়ে গেল, তখনি আপনি বলবেন, ফুলটা কোথায় গেল? ফুলটা তো আর নেই। তাই বলছিলাম, আমাদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের ধারণা আপেক্ষিক; তা দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। তাই পরব্রহ্ম আছেন, একথাও যেমন বলা যাবে না, তেমনি আবার নেই, একথাও বলা যাবে না। প্রশ্ন ওঠে : 'তবে কি ব্রহ্ম শূন্য?' এই নিয়ে বৌদ্ধ ও বেদান্তবাদীদের তর্ক লেগেই আছে। বৌদ্ধদের মতে, শূন্যই পরম ব্রহ্ম। বেদান্ত বলেন, না। ব্রহ্ম শূন্য নয়, 'পূর্ণম্' অর্থাৎ পূর্ণ। নিত্য এবং অপরিবর্তনীয় এক সত্তা আছে, একথা স্বীকার না করলে পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থায়ী কিছু থাকলে তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনের ধারণা হয়। ব্রহ্ম সৎ-ও নন, অসৎ-ও নন, উপনিষদের এই বাণী শুনে পাছে লোকে ভেবে বসেন যে ব্রহ্ম শূন্য, তাই উপনিষদ এই কথাগুলি যোগ করে দিয়েছেন—'শিবঃ এব কেবলঃ', কেবলমাত্র শিব বা পরব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা যায়—তিনি আছেন এবং তিনি আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ তিনিই আনন্দ।

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ॥১৯

অন্বয়: এনম্ (এই [পরমাত্মাকে]); ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্বে); ন পরিজগ্রভৎ (কেউ দেখেনি); [তথা (সেইরকম)]; তির্যঞ্চং ন (পাশেও না); মধ্যে ন পিরিজগ্রভৎ] (এই দুই-এর মধ্যেও কেউ দেখেনি); তস্য (তাঁর কূটস্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার]); প্রতিমা (তুলনা বা উপমা); ন অস্তি (নেই); যস্য মহৎ (সবকিছু ছাড়িয়ে এবং সবকিছুর উর্ধ্বে); যশঃ নাম (তিনি যা তিনি তাই)।
সরলার্থ: এই পরমাত্মাকে কেউ উপরে দেখেনি, পাশেও দেখেনি, আবার এই দুয়ের মধ্যেও দেখেনি। তিনি সবকিছু ছাড়িয়ে এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাঁকে কোন ভাবে বর্ণনা করা যায় না। (শুধু এইটুকু বলা যায়। তিনি যা, তিনি তাই।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম সম্পর্কে কেবল এইটুকুই বলা যায়--তিনি যা তিনি তাই। তাঁকে বর্ণনা করার কোন উপায় নেই। তিনি অনন্ত, তিনি অনন্য। তিনি বাক্যমনের অতীত। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'সবকিছুই উচ্ছিষ্ট হয়েছে, একমাত্র ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট হননি।' অর্থাৎ ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। অসীম ব্রহ্ম সম্পর্কে সীমিত মানুষ কি-ই বা বলতে পারে।

ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। কেন? কারণ তাঁর কোন উপাধি নেই। তিনি ভালো কি মন্দ তা বলা যায় না। যদি বলেন, তিনি ভালো, তাহলে ব্রহ্মকে আপনি সীমিত করে ফেললেন। ব্রহ্ম বস্তুত অসীম।

একটা সুন্দর গল্প আছে। দুই ভাই বাবার আদেশে গুরুগৃহে পড়তে গেল। পড়াশুনা শেষ করে বাড়ি ফিরলে তাদের পরীক্ষা নেবার জন্য বাবা বড়ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো দেখি ব্রহ্ম কিরকম? সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে গড়গড় করে অনেক কথা বলে গেল। তার কথা শেষ হলে ছোট ছেলেকেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন। সে চুপ করে রইল। তাই দেখে বাবা খুব খুশি। বললেন, তুমি কেন চুপ করে আছ তা বুঝেছি। তুমি এটা জেনেছ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আমরা ভুল করে বসব। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত। তাঁর কোন নাম নেই। তিনি অদ্বিতীয়, অনন্য। যিনি অসীম তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তাঁকে ছোট করে ফেলা হয়।

এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, পরমাত্মাকে দেখা যায় না। উপরে, পাশে বা এই দুই-এর মাঝে কোথাও তাঁকে দেখা যায় না। কারণ তিনি অজোড়। তাঁর জুড়ি নেই, এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। তিনি অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। তাঁকে বর্ণনা করার একটিমাত্র উপায়। সেটি হল, তাঁর অনন্যতার কথা বলা। বস্তুত তাঁকে অনন্য বলা আর কিছু না বলা—এ দুই সমান। যদি বুদ্ধিমান ছোট ছেলেটির মতো মৌন থাকতে চান তো সে একরকম ভালো। আর যদি নিতান্তই কিছু বলতে চান তাহলে বড়জোর এইটুকু বলতে পারেন, তিনি যা, তিনি তাই।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥২০

অন্বয়: অস্য (এই [পরমেশ্বরের]); রূপম্ (রূপ [অর্থাৎ এঁর প্রকৃত পরিচয়, স্বরূপ]); সংদৃশে (দৃষ্টির মধ্যে); ন তিষ্ঠতি (থাকে না [অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে এঁকে দেখা বা জানা যায় না]);

কশ্চন এনং চক্ষুষা পশ্যতি (চোখ দিয়ে কেউ এঁকে দেখতে পায় না); যে হৃদিস্থম্ (যাঁর হৃদয়ে); এনম্ (এঁকে); এবম্ (যে উপায়ের কথা ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে সেইভাবে); হৃদা (অনিত্য সবকিছু বর্জন করে); মনসা (বিশুদ্ধ মনের সাহায্যে); বিদুঃ (জানে); তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ: এই ঈশ্বর (পরমাত্মা) আমাদের দৃষ্টিগোচর নন। ইন্দ্রিয় দিয়ে কেউ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু বিবেকবৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। আর এই উপলব্ধির ফলে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী হন।

ব্যাখ্যা: বিচারের প্রয়োজনীয়তার উপর উপনিষদ এখানে আবার জোর দিচ্ছেন, কারণ বিচারের দ্বারাই আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধিই গোলমেলে যা তাদের ভুল পথে চালিত করে। শুদ্ধবুদ্ধি কাকে বলে? যে বুদ্ধি নিত্য এবং অনিত্যের তফাত বুঝিয়ে মানুষকে নিত্যবস্তু-লাভের প্রেরণা দেয় সেটিই শুদ্ধবুদ্ধি। এই শুদ্ধবুদ্ধি হলে সাধক ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন।

মনে রাখতে হবে বেদান্তে পরাজ্ঞানকে অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান সর্বদাই রয়েছে। কিন্তু যার সাহায্যে আমরা জ্ঞান লাভ করব, সেই মন এবং বুদ্ধি যদি ঠিক ঠিক কাজ না করে তবে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারব না। মনে করুন, রেডিও স্টেশন থেকে অনবরত গান প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু আমার রেডিওসেটটি যদি অকেজো হয় তবে আমি গান শুনব কি করে? দোষ গানের নয়, দোষ আমার রেডিওসেটের। সেটটি ভালো হলে গান স্পষ্ট শোনা যাবে, আর তাতে যদি গণ্ডগোল থাকে, তবে হয় গান আদৌ শুনতে পাব না, নয়তো সুর বেসুরো হয়ে বাজবে। ঠিক তেমনিই পরাজ্ঞান সবসময়ই আছে; দরকার শুধু শুদ্ধবুদ্ধির। যদি আমার তা থাকে তবে আমরা এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি, তাকে নিজের করে নিতে পারি। চিত্তশুদ্ধি বা শুদ্ধবুদ্ধির উপর উপনিষদ খুব জোর দিচ্ছেন কারণ ঐটি ছাড়া তত্ত্বের সম্যক্ ধারণা হয় না। আমাদের নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এই চরম জ্ঞান ধারণ করবার জন্য মন এবং বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই জ্ঞান সর্বদাই আমাদের অন্তরে আছে এবং পরিপূর্ণভাবেই আছে। এই জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—সবসময় একই রকম। আসলে সত্য তো সনাতন, তার কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের শুধুমাত্র প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত হলেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান আপনিই আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে।

প্রস্তুতি বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? আচার্য শঙ্করের মতে চারটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন। এক—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, অর্থাৎ নিত্য এবং অনিত্য, শাশ্বত ও ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর মধ্যে থেকে বিচারের দ্বারা শুধুমাত্র নিত্য বস্তুকে গ্রহণ করার অভ্যাস। দুই-

ইহামূত্রফলভোগবিরাগঃ, অর্থাৎ, ইহলোক বা পরলোকে কোন রকম ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। তিন—ষট্‌সম্পদ, অর্থাৎ ছয়টি সাধনসম্পদ। কি কি? (ক) শম (মনঃসংযম); (খ) দম (ইন্দ্রিয় সংযম); (গ) উপরতি (অসার চিন্তা থেকে মনকে প্রত্যাহার করা); (ঘ) তিতিক্ষা (সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি বিপরীত অবস্থার মধ্যে অবিচল থাকা); (ঙ) শ্রদ্ধা (গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস); (চ) সমাধান (ব্রহ্মে মনোনিবেশ। চার-প্রস্তুতির চতুর্থ পর্ব হল মুমুক্ষুত্ব (মুক্তিলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা)।

এইভাবে সাধনার দ্বারা মন পবিত্র ও প্রস্তুত হলে চরম জ্ঞান লাভের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হতে হয়। এই চরম জ্ঞান কি? 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। এই জ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ, সরল; কিন্তু এই জ্ঞান আপনাকে পুরোপুরি পালটে দেবে। আপনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে যাবেন। যখন মন তৈরি ছিল না তখন হয়তো আপনি কথাটা বহুবার শুনেছেন, কিন্তু আপনার মনে তা এতটুকুও দাগ কাটেনি। কিন্তু আপনি যখন প্রস্তুত, মন যখন তৈরি তখন গুরুমুখে মহাবাক্য শোনা-মাত্রই হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আপনার ভিতরে কী যেন একটা ঘটে যায় এবং চকিতে যা জানবার তা আপনি জেনে যান। জ্ঞান আপনার ভিতরেই ছিল। আপনি যদি স্বভাবতই ব্রহ্ম না হতেন, তাহলে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে আপনার পক্ষে ব্রহ্ম হয়ে ওঠা সম্ভব হত না। আসলে জানুন আর নাই জানুন, আপনি সবসময় ব্রহ্মই। আমাদের এই আত্মস্বরূপের জ্ঞান যেন অজ্ঞানতার একটা অবগুণ্ঠনে ঢাকা আছে। আপনার মনের জমি প্রস্তুত হলে গুরু অজ্ঞানতার সেই আবরণটি সরিয়ে দেন এবং আপনি তখনি নিজেকে ব্রহ্ম বলে চিনতে পারেন, বুঝতে পারেন আপনি আগেও ঐ ব্রহ্মই ছিলেন।

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥২১

অন্বয়: রুদ্র (হে রুদ্র); কশ্চিৎ ভীরুঃ (একজন ভীতু মানুষ); অজাতঃ (জন্মরহিত [অমর]); ইতি (এই কারণে); এবং প্রপদ্যতে (শরণ নেয়); তে (তোমার); যৎ দক্ষিণং মুখম্ (তোমার প্রসন্ন মুখ); পাহি মাং নিত্যম্ (কৃপা করে আমাকে সর্বদা রক্ষা কর); তেন (তার দ্বারা)।

সরলার্থ: হে রুদ্র, তুমি মৃত্যুঞ্জয়। তাইতো মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ তোমার শরণ নেয়। তোমার প্রসন্ন মুখ আমার দিকে ফেরাও এবং সর্বদা আমাকে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যা: কিছু বুদ্ধিমান, বিবেকী অর্থাৎ বিচারশীল মানুষ আছেন যাঁরা জানেন ব্রহ্ম অজাতঃ অর্থাৎ ব্রহ্মের জন্ম নেই। আবার যাঁর জন্ম নেই তাঁর মৃত্যুও নেই। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ তাই

ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু তারা কেন ভয় পায়? কারণ তারা জানে যে তাদের মৃত্যু আসন্ন। জীবন যে দুদিনের সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একটা শুভ লক্ষণ। অধিকাংশ মানুষ তো মৃত্যুর চিন্তাই করে না। তারা অজ্ঞান। তাই তাদের মনে ভয়ডরও নেই। তারা সুখস্বপ্নে মশগুল—তাদের কোনদিন মৃত্যু হবে না। একবার রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : এই সংসারে সবথেকে আশ্চর্য কি? তিনি বলেছিলেন : 'সবচাইতে আশ্চর্য হল, চারপাশে অজস্র মানুষকে মরতে দেখেও আমরা ভাবি আমরা কোনদিনও মরব না।' একেই বলে মায়া। অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা বোঝেন এই সংসার ক্ষণস্থায়ী—সবকিছু জলের মতো হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে চায়। তাঁরা বোঝেন, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, আর মৃত্যুও ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তাই তাঁরা ভীত। তাঁরা সেই ধ্রুবসত্যকে জানতে চান, যা জানলে মানুষ অমর হয়। তাই তাঁরা ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা করেন—বলেন, রক্ষা কর। মায়ার কবল থেকে মুক্ত হবার পথ বলে দাও। দয়া করে তোমার কৃপাঘন, প্রসন্ন মুখ আমাদের দিকে ফেরাও। আমরা ভীত। সর্বদা আমাদের রক্ষা ও পালন কর।

আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ঈশ্বরের অনুধ্যান করলে, মনে খুব আনন্দ আসে। যতই ঈশ্বরচিন্তা করা যায় ততই আনন্দ। তাই যদি আমরা তাঁকে তুষ্ট করি, তাঁর ধ্যান করি, তাঁর বন্দনা করি ততই আনন্দে পূর্ণ হব।।

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা ন অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো-
বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে॥২২

অন্বয়: রুদ্র (হে রুদ্র); ভামিতঃ (ক্রুদ্ধ হয়ে); নঃ (আমাদের); তোকে (পুত্রদের); [তথা (এবং)] তনয়ে (পৌত্রদেরও); মা রীরিষঃ (বিনাশ করো না [এবং]); নঃ (আমাদের); আয়ুষি মা (এমনকি আমাদের বয়স একশো হলেও); নঃ গোষু মা (আমাদের গরুগুলিও না); নঃ অশ্বেষু মা (আমাদের ঘোড়াগুলিও না); নঃ বীরান্ মা বধীঃ (আমাদের শক্তিমান ভৃত্যদের হত্যা করো না); হবিষ্মন্তঃ (হবন বা যজ্ঞের সবরকম উপকরণ হাতে নিয়ে); সদমিৎ (সর্বদাই); হবামহে ত্বা (আমাদের রক্ষার জন্য তোমার অর্চনা করি)।

সরলার্থ: হে রুদ্র, তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না। শতায়ু হলেও তুমি আমাদের, আমাদের পুত্র বা পৌত্রদের বিনাশ করো না। আমাদের গরু, ঘোড়া এবং শক্তিমান ভৃত্যদের তুমি হত্যা করো না। যজ্ঞের সবরকম উপকরণ হাতে নিয়ে আমরা প্রার্থনা করছি।

ব্যাখ্যা: এই শ্লোকটিতে কিছুটা বিপরীত ভাবের কথা আছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরাজ্ঞানের জন্য, আত্মজ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেছি। কিন্তু এবার প্রার্থনায় পার্থিব কামনার ছায়া পড়েছে। বলা হচ্ছে, হে রুদ্র, আমাদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে। আমরা হয়তো ঠিকভাবে তোমাকে ডাকতে পারছি না, কিন্তু কৃপা করে তুমি আমাদের অপরাধ নিও না। আমাদের আত্মীয়-স্বজন,ভৃত্য বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি করো না। তোমার মহিমা আমরা কিছুই বুঝি না। হয়তো অজান্তে কত অপরাধই করেছি। কিন্তু তারজন্য তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না। তুমি যাতে প্রসন্ন হও তারজন্য তোমাকে আমরা অর্ঘ্য নিবেদন করছি।।

এখানে দ্বৈতভাব প্রবেশ করল কি করে? আসলে চরম জ্ঞান লাভের আগে পর্যন্ত আমাদের দেহবোধ থাকে; অর্থাৎ আমরা দ্বৈতভূমিতে থাকি। তাই দ্বৈতভাবের প্রভাব আমরা সম্পূর্ণভাবে কাটাতে পারি না। দেহের মায়া কাটাতে পারলে তো আমরা মুক্তই। কিন্তু যতক্ষণ দেহের প্রতি আসক্তি থাকবে, ততক্ষণ একথা বলার যো নেই—আমিই ব্রহ্ম। যতক্ষণ দ্বৈতভূমিতে থাকব ততক্ষণ দ্বৈতবাদের সাহায্য নিতেই হবে; পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের লক্ষ্য অদ্বৈতজ্ঞান। দ্বৈতবাদ সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার সোপানমাত্র।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ॥১

অন্বয়: দ্বে বিদ্যা-অবিদ্যে (দুই, জ্ঞান এবং অজ্ঞান); যত্র (যাতে); ব্রহ্মপরে (এমনকি হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর); অনন্তে (সকল সীমা বা পরিচ্ছিন্নতার অতীত); অক্ষরে (পরব্রহ্মে); নিহিতে গূঢ়ে (লুকিয়ে আছে); ক্ষরং তু (সংসারের কারণ); অবিদ্যা (অজ্ঞানতা); অমৃতং তু (অমরত্বের কারণ); বিদ্যা (জ্ঞান); যঃ তু (যিনি আবার); বিদ্যা-অবিদ্যে (জ্ঞান এবং অজ্ঞান); ঈশতে (নিয়মিত করেন); সঃ অন্যঃ (তিনি স্বতন্ত্র [পরম])।

সরলার্থ: পরব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম) হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুই-ই পরব্রহ্মে প্রচ্ছন্ন। অজ্ঞানতাই জন্মমৃত্যুর কারণ, কিন্তু জ্ঞান অমরত্বের দিকে নিয়ে যায়। যিনি জ্ঞান এবং অজ্ঞানের নিয়ামক তিনি নিজে এই দুই-এর থেকেই স্বতন্ত্র (অর্থাৎ শুদ্ধ এবং নিরুপাধিক)। ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব।

ব্যাখ্যা: 'অনন্ত' শব্দের অর্থ 'যার শেষ নেই।' কিন্তু যার শেষ নেই, তার শুরুও নেই। পার্থিব বস্তুর যেমন আদি অন্ত থাকে, ব্রহ্মের তেমন কিছুই নেই। এখানে অনন্ত বলতে এও বোঝানো হচ্ছে যে ব্রহ্ম দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন। যদি কোন বস্তুর শুরু এবং শেষ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই বস্তুটির কোন এক স্থানে, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে জন্ম বা আরম্ভ এবং কোন এক বিশেষ মুহূর্তে পরিসমাপ্তি। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যে তিনি একটি বিশেষ সময়ে এবং নির্দিষ্ট কোন একটি স্থানে জন্মেছেন। 'অনন্ত' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল হলেও তার ব্যঞ্জনাটি খুবই গভীর।

আমাদের কাছে জ্ঞানের খুবই মূল্য। যে কোন বিদ্বান মানুষকেই আমরা সম্মান করি, তাঁর প্রশংসা করি। আর কেউ যদি মূর্খ হয় তারজন্য আমরা দুঃখবোধ করি, নয়তো তাকে অবজ্ঞা করি। ব্রহ্ম কিন্তু জ্ঞান-অজ্ঞান—এই দুয়েরই পার। কথাটি আমাদের কাছে হেঁয়ালি মনে হয়। ব্রহ্ম অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে বললে তার একটা মানে বোঝা যায়; কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানেরও অতীত, এ কেমন কথা? তার উত্তরে উপনিষদ বলছেন, জ্ঞান, অজ্ঞান এইসব শব্দগুলি

আমরা ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ করি। জ্ঞানের কথা মনে হলেই আমরা ভাবি ঐটি অজ্ঞানের বিপরীত অবস্থা। আলোর বিপরীত যেমন অন্ধকার, তেমনি জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান—এই হল আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। জ্ঞান কাঁটার সাহায্যে, অজ্ঞান কাঁটাটি তুলে তারপর দুটিকেই ফেলে দিতে হয়। তখনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়।

'নিহিতে গূঢ়ে', জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই ব্রহ্মে নিহিত। অর্থাৎ, দুয়েরই উৎস ব্রহ্ম। খ্রীষ্টানধর্মে ঈশ্বর এবং শয়তান, এই দুটি ধারণাই প্রচলিত। ঈশ্বর দয়ালু, করুণাময়, মঙ্গলময় আর শয়তান হল অশুভ এবং দুষ্ট। কিন্তু বেদান্তমতে চূড়ান্ত সত্তা একটাই। ভালো-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান সবই সেই এক অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকেই আসে। কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, 'তাহলে কি ব্রহ্মই মন্দের উৎস?' বেদান্ত বলবেন— হ্যাঁ, দ্বৈতভূমি থেকে সেরকম বলা যেতে পারে বৈকি! কারণ সবকিছুর উৎসই যে ব্রহ্ম। কেউ আবার একথাও বলতে পারেন, 'আমরা তো সর্বত্র দুই-ই দেখছি। ব্রহ্ম যদি অদ্বৈত হন তাহলে তাঁর মধ্যে থেকে ভালো-মন্দ ইত্যাদি দ্বৈতভাব আসে কি করে?' বেদান্ত বলেন, এই দ্বৈতভাব আসে মায়া থেকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে মায়া ব্রহ্মেরই অংশ।

'অক্ষর', ব্রহ্মের ক্ষয় নেই। তিনি অবিনাশী এবং অব্যয় অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় সত্তা। স্থূলজগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাস। একমাত্র ব্রহ্মই সেই নিয়মের ব্যতিক্রম, তিনি সর্বদাই অপরিবর্তনীয়।

'ব্রহ্মপর' অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্রহ্মার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। কেন? তার উত্তর-ব্রহ্ম অব্যক্ত, কিন্তু ব্রহ্মা ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ এবং সগুণ বা সোপাধিক ব্রহ্মও বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁর কোন উপাধি নেই। তিনি নিরুপাধিক।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে বলা হয় 'ক্ষরম্' অর্থাৎ, যার ক্ষয় আছে। এই জগতের সবকিছুরই ক্ষয় হয়, কারণ অবিদ্যা থেকেই সবকিছুর জন্ম। অবিদ্যাই জগৎকে চালায়। তাই তাকে এই জগৎ-সংসার ও জন্মমৃত্যুর কারণ বলা হয়েছে। 'অমৃতং তু বিদ্যা', কিন্তু জ্ঞানই অমৃতত্বের কারণ। জ্ঞানই মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আপনি যদি অজ্ঞ হন তবে আপনি উন্নতি করতে পারবেন না। জাগতিক বা অপরা-জ্ঞান এবং পারমার্থিক বা পরাজ্ঞান—দুটিই প্রয়োজন। কিন্তু জাগতিক জ্ঞানে মুক্তি হয় না। তারজন্য দরকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে তাই অমৃতম্ বলা হয়। কারণ এই জ্ঞান আপনাকে জন্মমৃত্যুর পারে নিয়ে যায়, আপনাকে মুক্তি দেয়।

জ্ঞান এবং অজ্ঞান—এই দুটিকে কে নিয়ন্ত্রণ করেন? 'সঃ ঈশতে বিদ্যাবিদ্যে'—ব্রহ্ম জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সকলের প্রভু, সবকিছুর নিয়ন্তা। আপনি প্রশ্ন

করতে পারেন: ব্রহ্ম কি করে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন? আমি বুঝতে পারি আমার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তাছাড়া আমার কোন কাজে ব্রহ্ম তো কখনো হস্তক্ষেপ করেন না। কথা বলতে চাইলে আমি কথা বলতে পারি। না চাইলে চুপ করেও থাকতে পারি। এর মধ্যে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কোথায়? বেদান্ত বলবেন—ব্রহ্ম আছেন বলেই আপনি কথা বলতে পারছেন। ব্রহ্মই আমাদের কথা বলার অথবা চুপ করে থাকার শক্তি দিচ্ছেন। অবশ্য তিনি সবকিছুর উৎস হয়েও নিজে নিষ্ক্রিয়। তিনি সাক্ষী মাত্র। তিনি আছেন বলেই সবকিছু চলছে—আপনি আপনার কাজ করছেন, সূর্য তার কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। ফিরছে,যত কিছু কাজকর্ম চলছে, সবই ঐ ব্রহ্মচক্রের ভিতরে। চাকাটি ঘুরিয়ে দিয়ে ব্রহ্ম নিজে চুপ করে সবকিছু দেখে যাচ্ছেন। তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী; এই বিশাল কর্মকাণ্ডের এতটুকু তাঁকে স্পর্শ করছে না। তিনি নির্লিপ্ত। ভালো আর মন্দ যাই ঘটুক না কেন—তিনি নির্বিকার। কিন্তু তিনি যদি না থাকেন তবে কিছুই ঘটবে না। আবার অন্য আর এক স্তরে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল। তিনি মায়ার মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলেছেন, আমার, আপনার মধ্যে দিয়ে, সূর্যের মধ্যে দিয়ে, এককথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তিনিই কাজ করে চলেছেন। এই ব্রহ্ম কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নন; ইনি ব্যক্ত বা সগুণ ব্রহ্ম। সেইরকম এক অবস্থায় জীবাত্মারূপে আমি সব কাজকর্ম করছি, জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে আছি। আবার অন্য আর এক অবস্থায় আমিই সাক্ষী,পরমাত্মা। সেই অবস্থায় কোন কিছুতেই তখন আমি লিপ্ত নই।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ॥২

অন্বয়: যঃ একঃ (যিনি অদ্বিতীয়); যোনিং যোনিম্ (তবুও তিনি সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে আছেন); [তথা] বিশ্বানি রূপাণি (সব রূপ [রঙ] তাঁরই); সর্বাঃ যোনীঃ চ অধিতিষ্ঠতি (সব উৎপত্তিস্থানের তিনিই নিয়ন্তা); যঃ (যিনি); অগ্রে প্রসূতম্ (প্রথম জাত); তং ঋষিং কপিলম্ (পিঙ্গলবর্ণ, সর্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভকে); জ্ঞানৈঃ বিভর্তিঃ (জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করেন); জায়মানং চ পশ্যেৎ ([তিনি] হিরণ্যগর্ভকে জন্মাতেও দেখেছেন); [সেই পরমেশ্বর সকলের থেকে আলাদা]।

সরলার্থ: তিনি (পরমেশ্বর) অদ্বিতীয়, তবু তিনি সর্বব্যাপী এবং সকলের মধ্যে আছেন। প্রতিটি উৎপত্তিস্থানের তিনিই নিয়ন্তা। সৃষ্টির পূর্বে জাত যে হিরণ্যগর্ভ, তিনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু

তিনি (পরমেশ্বর) হিরণ্যগর্ভকে জন্মাতেও দেখেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করেছেন। এই পরমেশ্বর সকলের থেকে আলাদা।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মই সবকিছুর উৎস এবং কারণ। অন্যান্য অনেক গৌণ কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তিনিই মুখ্য তথা আদিকারণ। সেইজন্যই তাঁকে সবকিছুর নিয়ামক বলা হয়। মূল বা প্রথম কারণ থেকেই পরবর্তী কারণের উদ্ভব। সব রূপ (রূপাণি), সব বৈচিত্র তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। যখন কোন শিশু জন্মায়, তখন ঐরূপে তিনিই জন্মগ্রহণ করেন। যখন বীজ থেকে চারাগাছের উন্মেষ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনিই ঐরূপে প্রকাশিত হন। যখন বৃষ্টি হয়, তখন ঐ বৃষ্টিধারার মধ্যেও তিনি; তিনিই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়েন। এককথায় তিনি সর্বত্র এবং সকল বস্তুতে দীপ্যমান।

'কপিলম্' বলতে হিরণ্যগর্ভকে বোঝায়। হিরণ্য' এবং 'কপিল' এই দুই শব্দেরই অর্থ সোনালী বা বাদামী। প্রতীকী অর্থে জ্ঞানও স্বর্ণাভ। হিরণ্যগর্ভকে এখানে 'ঋষিম্' বলা হয়েছে, কারণ তিনি জানেন। ব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং হিরণ্যগর্ভ থেকেই আমরা পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান পেয়ে আসছি।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা।।৩

অন্বয়: এষঃ (এই [এক]); দেবঃ (ঈশ্বর); মহাত্মা (পরমাত্মা); অস্মিন্ ক্ষেত্রে (এই বিশ্বে); একৈকম্ (প্রত্যেক); জালম্ (জাল [কর্মফল]); বহুধা (নানা ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে [মানুষ, পশু বা দেবতার উপযোগী]); বিকুর্বন্ (বিস্তার করেছেন [সৃষ্টিকালে]); সংহরতি ([এবং] ধ্বংস করেন); ঈশঃ (পরমেশ্বর); ভূয়ঃ (আবার); পতয়ঃ (বিভিন্ন লোকের দেবতাদের [লোকপালকদের]); তথা (আগের মতোই); সৃষ্টা (সৃষ্টি করে); সর্বাধিপত্যম্ (সকলের উপর প্রভুত্ব); কুরুতে (করেন)।

সরলার্থ: পরমেশ্বর বহুরূপে সৃষ্টি করেছেন—দেবদেবী, পুরুষ এবং নারী, পশু, কীটপতঙ্গ এবং আরও কত কী! কর্মফল অনুসারে একেকটি রূপ যেন একটি বন্ধন বা জাল যা পরমেশ্বর এই সংসারে বিস্তার করেছেন। কল্প শেষ হলে তিনিই (আবার) এইসব রূপ ধ্বংস করেন। নতুন কল্পের সূচনায় এক পরমেশ্বরই আবার বিভিন্ন লোকের দেবতা বা লোকপালকদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে তিনি সকলের উপর প্রভুত্ব করেন।

ব্যাখ্যা: 'জালম্' কথাটির অর্থ জাল। আপনি একটা জালে আবদ্ধ, আমি আরেকটাতে। আমরা সকলেই রেশমকীটের মতো নিজের গুটিতে নিজেরাই আবদ্ধ। আমাদের এই ভয়াবহ বন্দীদশা ঘটালো কে? কে এই গুটি তৈরি করেছে? আমরাই। এই গুটি আর কিছু নয়—আমাদের কর্মফল। আমরা প্রত্যেকেই সযত্নে নিজেদের জাল নিজেরাই তৈরি করেছি। আমাদের বন্ধনের জন্য কেউ দায়ী নয়। প্রতিটি জাল আবার স্বতন্ত্র। এর মধ্যে কোন কোন জাল হয়তো দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু যত মনোহরই হোক না কেন, জাল জালই। বন্ধন কতরকম করেই না আসে! স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সোনার শেকলও শেকল; লোহার শেকলের মতো সেও তোমাকে বাঁধবে। সোনার শেকল বলতে কি বোঝাচ্ছে? এর তাৎপর্য হল, পুণ্যলাভের জন্য, ভবিষ্যতে লাভের আশায় আপনি যদি কিছু ভালো কাজ করেন তবে হয়তো মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে আপনি সুখভোগ করবেন। এমনকি আপনি হয়তো দেবদেবীর পদও পেয়ে যেতে পারেন। একেই সোনার শেকল বলা হচ্ছে। এও একধরনের বন্ধন, কারণ স্বর্গে আপনার সুখভোগ—সে তো ক্ষণিকের। ভালো কাজের ফল শেষ হয়ে গেলেই আবার আপনাকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। হিন্দুমতে মুক্তিলাভ বা মোক্ষই জীবনের লক্ষ্য। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই।

এই জালগুলি কি দিয়ে তৈরি? পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম দিয়ে। এই পঞ্চভূতের যোগ-বিয়োগে বা টানাপড়েনেই আমরা তৈরি, আবার যে জগৎ-সংসারের ফাঁদে আমরা বদ্ধ হয়ে আছি, সেও এই পঞ্চভূত দিয়েই তৈরি। আশার কথা এই, উপনিষদ বলে দিচ্ছেন, আমরা সতি সত্যি বদ্ধ নই। আমরা নিজেদের বদ্ধ মনে করি, এই যা। একবার যো-সো করে যদি আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে পারি তাহলে বুঝতে পারব আমরা কোনকালেই বদ্ধ ছিলাম না।

উপনিষদ বলছেন, এই সংসারকে আমরা 'জালম্' অর্থাৎ জাল মনে করি বলেই এটি জাল। আমরা নিজেদের দুর্বল, বদ্ধ বা দাস ভাবি। কিন্তু এই হীনম্মন্যতায় না ভুগে যদি আমরা নিজেদের শুদ্ধ, মুক্ত ভাবতে পারি তবে আমরা সত্যি সত্যি শুদ্ধ এবং মুক্ত হয়ে যাব। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, তিনি শুধু উপনিষদই প্রচার করেছেন। কারণ উপনিষদ মানুষকে শক্তি দেয়, আত্মবিশ্বাস ও সাহসে বলীয়ান করে তোলে। তিনি আরও বলতেন, যে মানুষ তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করে অথচ নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, সেই প্রকৃত নাস্তিক। আপনি যদি সব দেবদেবীকে ভুলেও যান, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের উপর আপনার বিশ্বাস আছে কি? যদি থাকে তাহলে আর আপনার ভয় নেই, আপনি উদ্ধার হয়ে যাবেন। এই হল অভীঃ মন্ত্র।

বেদান্তমতে সৃষ্টি এবং ধ্বংস, অর্থাৎ জগতের ব্যক্ত হওয়া এবং অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়া-— এ অনন্তকাল ধরেই চলছে। ব্রহ্ম একবার এই জগৎকে প্রকাশ করছেন আবার কিছুকাল পরে তাকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু গুটিয়ে নেওয়া মানে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা নয়-- এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়া। তাকে রূপান্তরও বলা যায়। জগৎ কখনো ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত, আবার কখনো অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত। কিন্তু প্রকৃত বিনাশ বলে কিছু নেই। তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন বলা যেতে পারে গাছ এবং তার বীজ, এ দুটি আলাদা বস্তু নয়। শুধু বাইরের রূপের তফাত—গাছটি ব্যক্ত, বীজটি অব্যক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পচ্ছলে বলতেন, বাড়ির বুড়ীদের একটা হাঁড়ি থাকে। তাতে তাঁরা সবরকম বীজ তুলে রাখেন। সময় বুঝে তাঁরা হাঁড়ি থেকে বীজগুলি বের করে জমিতে ছড়িয়ে দেন। সেইসব বীজ থেকে গাছ হয়, গাছে ফল ধরে, ফলের মধ্যে আবার বীজ থাকে। আবার সব বীজ সঞ্চয় করে তাঁরা হাঁড়িতে রেখে দেন যতক্ষণ না বীজ ছড়াবার উপযুক্ত সময় আসে। এই সৃষ্টিচক্র এইভাবেই ঘুরে চলেছে। ব্রহ্ম যেন এই বৃদ্ধার মতো সবকিছু দেখছেন আর সৃষ্টিচক্রটিকে সচল রাখছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই বিশ্ব ব্রহ্মের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনিই ভালো, তিনিই মন্দ। তিনিই সুন্দর, তিনিই অসুন্দর। তিনিই সব হয়েছেন।

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥৪

অন্বয়: যৎ উ (যেমন); অনড্বান্ (সূর্য); ঊর্ধ্বম্ (উপরে); অধঃ (নীচে); তির্যক্ চ (এবং সকল পার্শ্বে); সর্বাঃ দিশঃ (সকল দিকে); প্রকাশয়ন্ (আলো দিয়ে); ভ্রাজতে (কিরণ দেন); এবং (ঠিক একইভাবে); ভগবান্ (সর্বশক্তিমান); সঃ (তিনি); বরেণ্যঃ (পূজ্য); একঃ দেবঃ (সেই এক ঈশ্বর); যোনিস্বভাবান্ (কারণরূপে); অধিতিষ্ঠতি (নিয়ন্ত্রণ করেন)।
সরলার্থ: সূর্য যেমন তাঁর আলো দশদিকে ছড়িয়ে দেন, তেমনি ভগবানও সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ তিনিই সবকিছুর একমাত্র কারণ। তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের পরমেশ্বর।
ব্যাখ্যা: সূর্যকে প্রায়শই ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই তুলনা দেবার কারণ সূর্য বিশাল, তাঁর উপর আমরা কতভাবেই না নির্ভর করি। সূর্য যেন প্রাণের উৎস। তাই এখানে

সূর্যের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা করা হয়েছে। সূর্য না থাকলে ভুবন অন্ধকার। ঠিক তেমনিই ব্রহ্মের আলোতেই উঁচু-নীচু, ছোট-বড় সবকিছু দীপ্তিমান, তিনিই সবকিছু প্রকাশ করেন। তিনিই সকলের প্রভু, শাসক। তিনি সকলের এবং সবকিছুর কারণ।

'দেবঃ' শব্দের অর্থ জ্যোতির্ময়। ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রভ, স্বয়ং প্রকাশ। আলোর জন্য তিনি কারোর উপরে নির্ভর করেন না, বরং তিনিই সকলকে আলো দেন। তিনিই 'ভগবান' অর্থাৎ ঐশ্বর্যবান—তাঁর অনন্ত শক্তি। এই কারণেই তিনি'বরেণ্যঃ' অর্থাৎ পূজ্য। সকল পূজাই তাঁর প্রাপ্য, কারণ তিনিই সকলের চেয়ে বড়।

ব্রহ্মকে কে বর্ণনা করতে পারে? তিনি অনন্য, 'একঃ'—এক এবং অদ্বিতীয়। অদ্বিতীয় কোন কিছু আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ব্রহ্ম সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, অথচ তিনি নিষ্ক্রিয়। তিনি সাক্ষী। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের এই জগতের বোধ বা চেতনা থাকে ততক্ষণ সক্রিয় ব্রহ্মকে মানতেই হয়, তাঁকে স্বীকার না করে আমাদের কোন উপায় নেই। এই জগৎ-সংসার তাঁর লীলা। কিন্তু একই সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে, স্বরূপত ব্রহ্ম অপরিবর্তিত ও নির্লিপ্ত।।

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্বমেতদ্ বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥৫

অন্বয়: যৎ চ বিশ্বযোনিঃ (যিনি আবার সবকিছুর কারণ); স্বভাবং পচতি (যিনি সবকিছুকে তার স্বভাব দান করেন); যঃ সর্বান্ পাচ্যান্ চ পরিণাময়েৎ (যিনি সবকিছুকে তাদের পরিণতি লাভ করতে সাহায্য করেন); যঃ একঃ (যিনি একাকী); সর্বম্ এতৎ বিশ্বম্ (এই বিশ্বচরাচর); অধিতিষ্ঠতি (নিয়ন্ত্রণ করেন); সর্বান্ গুণান্ চ (এবং সব গুণ [সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ]); বিনিযোজয়েৎ (দান করেন)।

সরলার্থ: তিনি সবকিছুর কারণ এবং সবকিছুর নিজস্ব স্বভাব বা ধর্ম (যেমন, আগুনের ধর্ম তাপ এবং জলের ধর্ম শৈত্য) তাঁরই দান। প্রতিটি বস্তুর যে পরিণতি সেও তাঁরই দান। একা তিনিই সমগ্র জগৎকে চালান। এ জগতে তিনটি গুণ কাজ করে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। প্রতিটি গুণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁরই দেওয়া।

ব্যাখ্যা: 'স্বভাবম্' বলতে এখানে বস্তুর প্রকৃতি বোঝাচ্ছে। যেমন আমরা জানি আগুন সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এটাই আগুনের স্বভাব বা ধর্ম। কিন্তু আগুনকে এই শক্তি

কে দিল? ব্রহ্ম। তেমনি জল স্বভাবতই ঠাণ্ডা। সেইরকম ব্রহ্ম আমাদের সকলকেই কিছু না কিছু বিশেষ শক্তি দিয়েছেন। তিনি 'বিশ্বযোনিঃ' অর্থাৎ সবকিছুর উৎস, তিনিই কারণের কারণ,আদিকারণ।

'পাচ্যান' শব্দটির অর্থ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন এই জগতের স্বভাব। এখানে সবকিছুই পালটে যায়। বেদান্তমতে এ জগতে সবকিছুরই ষড়্‌বিকার অর্থাৎ ছয়রকম পরিবর্তন হয়। প্রথম—'জায়তে'। ব্যক্তির জন্ম হল। দ্বিতীয়—'অস্তি'। সে বেঁচে থাকে। তৃতীয়—'বর্ধতে'। সে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। চতুর্থ—'বিপরিণমতে'। সে পূর্ণবয়স্ক হয়। পঞ্চম—'অপক্ষীয়তে'। অর্থাৎ তার ক্ষয় শুরু হয়। ষষ্ঠ—'নশ্যতি'। তার নাশ বা মৃত্যু হয়। এই নিয়মেই জগৎ চলে। একমাত্র অকালমৃত্যু নাহলে প্রত্যেককেই এই ছটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কেউ একথা বলতে পারে না, 'আমার যৌবন চিরকাল অটুট থাকবে। আমার শরীরের ক্ষয় হবে না। আমি কখনো মরব না।' তবে এটা হওয়া সম্ভব, কারও কারও মৃত্যুর ঠিক আগেই শরীর দ্রুত ভাঙতে শুরু করে, আবার কারও শরীর ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয় হতে থাকে।

তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥৬

অন্বয়: বেদগুহ্যোপনিষৎসু (বেদের সবচাইতে গুহ্য, গোপনীয় উপনিষদগুলিতে); তৎ (এই [ব্রহ্মতত্ত্ব]); গূঢ়ম্ (নিহিত); ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ); তৎ (সেই); ব্রহ্মযোনিম্ (পরমাত্মাকে); বেদতে (জানেন); যে পূর্বদেবাঃ (যে প্রাচীন দেবতারা [যেমন রুদ্র]); ঋষয়ঃ চ (ঋষিরাও [যেমন বামদেব]); তৎ বিদুঃ (তাঁকে জানতেন); তে (তাঁরা); তন্ময়াঃ (পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে); অমৃতাঃ বৈ বভূবুঃ (অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন)।

সরলার্থ: পরমাত্মা-বিষয়ক অতি দুরূহ, সূক্ষ্ম এবং গুহ্য তত্ত্বটি উপনিষদে নিহিত আছে। উপনিষদই বেদের সার। বেদের উৎস আবার ব্রহ্ম। ব্রহ্মা (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) (পরমাত্মাকে) ব্রহ্মকে জানেন। রুদ্রাদি প্রাচীন দেবতারা এবং ঋষিরা (যেমন, বামদেব) তাঁকে জানতেন। তাঁরা ব্রহ্মকে নিজের আত্মারূপে জেনেই অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা: পরমতত্ত্ব বা চরম সত্যকে বোঝাতে উপনিষদ সাধারণত ব্রহ্ম শব্দটিই ব্যবহার করেন। কিন্তু ঋষিরা জানতেন 'ব্রহ্ম' শব্দটিও যথেষ্ট নয় কারণ শব্দ দিয়ে পরমসত্যের

স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায় না। বস্তুত কোন শব্দ দিয়েই সেই বিমূর্ত সত্যকে প্রকাশ করা বা বর্ণনা করা যায় না। সেজন্য অনেক সময়েই উপনিষদ ব্রহ্মকে বোঝাতে গিয়ে শুধুমাত্র 'তৎ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'তৎ' শব্দের অর্থ সেই। বেদের সার হল উপনিষদ। উপনিষদ গৃহ্য অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। উপনিষদ বোঝা খুব শক্ত, তাই উপনিষদ সকলের জন্য নয়। আচার্য শঙ্কর উপনিষদকে রহস্যময়ী বলেছেন। রহস্যময়ী অর্থাৎ অতি গৃহ্য, দুর্বোধ্য। সেখানে সবকিছু খুব ঠারেঠোরে বলা হয়েছে। উপনিষদ বুঝতে হলে তাই শিষ্যকে উপযুক্ত আচার্যের কাছে যেতে হবে—এমন আচার্য যাঁর অপরোক্ষ অনুভূতি হয়েছে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান হস্তামলকবৎ অনুভব করেছেন।

'ব্রহ্মা তৎ বেদতে।' ব্রহ্মা ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। তাঁকে হিরণ্যগর্ভও বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম এই পরমতত্ত্ব আয়ত্ত করেন এবং পরে দেবদেবীদের এই জ্ঞান দান করেন। তারও পরে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা এই জ্ঞান লাভ করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। হওয়ারই কথা, কারণ ব্রহ্মকে জানা মানে নিজে ব্রহ্ম হওয়া। আপনার ব্রহ্ম উপলব্ধি হলে আপনি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন, অমর হয়ে যাবেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে--আপনি ক্রমে ক্রমে অমৃতত্ব লাভ করেন না, কারণ এই অমৃতত্বের সঙ্গে কার্য-কারণ কোন সম্পর্ক নেই। কেউ আপনাকে অমর করতে পারবে না কারণ আপনি স্বভাবতই অমর-—শুধু এখন সেকথা জানেন না, এই যা।

গুণান্বয়ে যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা।
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥৭

অন্বয়: যঃ (যে জীব); গুণান্বয়ঃ (তিন গুণের [সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ] সঙ্গে যুক্ত); ফলকর্মকর্তা ([এই সংযোগের ফলে] জীবাত্মা মনে করে সেই কর্তা, যা করার সেই করছে এবং সেই কৃতকর্মের ফলভোগ করছে); সঃ (সে); তস্য এব কৃতস্য চ উপভোক্তা ([ফলে] সে যা কিছু করে সেই কাজের ফল তাকেই ভোগ করতে হয়); সঃ বিশ্বরূপঃ (কর্ম অনুসারে তাকে নানারকম দেহ ধারণ করতে হয়); ত্রিগুণঃ (তিন গুণের সঙ্গে সংযুক্ত); ত্রিবর্ত্মা (তিন পথে যাতায়াত করে [অর্থাৎ, মৃত্যুর পরে হয় সে দেবলোকে নয়তো মরলোকে যায়, অথবা জীবজন্তু বা কীটপতঙ্গ হয়ে আবার তার জন্ম হয়]); প্রাণাধিপঃ (পঞ্চপ্রাণের অধিপতি (অর্থাৎ, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান] প্রাণবায়ুর আলাদা আলাদা কাজ অনুসারে

এই নামগুলি দেওয়া হয়েছে); স্বকর্মভিঃ সঞ্চরতি (কৃতকর্ম অনুযায়ী জীব সংসারে যাওয়া-আসা করে)।

সরলার্থ: পরমাত্মা যখন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণের সঙ্গে যুক্ত হন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়। গুণান্বিত হলেই তখন জীবাত্মার কামনা-বাসনা এসে পড়ে এবং কামনার বশবর্তী হয়ে সে বহু কাজ করে। সেই কাজের ভালো, মন্দ ফল তাকে ভোগ করতে হয়। আর এইসব কর্মফল ভোগের উপযোগী নানা শরীরও সে লাভ করে। এই শরীর দেবদেবীর হতে পারে, আবার মানুষ অথবা কীটপতঙ্গেরও হতে পারে। কিন্তু যে শরীরই সে পাক না কেন—তা তিন গুণেরই ফল। অতএব পঞ্চপ্রাণের অধিপতি জীবাত্মা কৃতকর্ম অনুযায়ী সংসারে যাওয়া-আসা করে।

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক জীব বা জীবাত্মা 'গুণান্বয়ঃ' অর্থাৎ তিন গুণের অধিকারী। এই তিনটি গুণই বিভিন্নভাবে সমন্বিত হয়ে জীবের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। শান্তভাব এবং প্রজ্ঞা হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ। রজোগুণের লক্ষণ হল কর্মপ্রবণতা। আর তমোগুণ আলস্য বা কুঁড়েমির প্রতীক। আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশি এই তিন গুণের অধিকারী। এই তিন গুণের তারতম্যের জন্যই একজনের সঙ্গে আরেকজনের এত প্রভেদ। এমন কেউ নেই যিনি এই পার্থক্যের কথা অস্বীকার করতে পারেন। পরিবারের দুই ভাই বা দুই বোনের মধ্যে মেজাজ-মর্জি, অভ্যাস, রুচির কতই না তফাত। তিন গুণের দরুনই এই বৈচিত্র।

ভগবদ্গীতা (১৬ ।৬-৮) ত্রিগুণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : সত্ত্ব হল শুদ্ধ এবং জ্যোতির্ময়। এই গুণ কোন ক্ষতি করে না। সেকথা ঠিক। কিন্তু এও বন্ধনের কারণ। কেননা শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ায় সাত্ত্বিক মানুষ আনন্দ এবং জ্ঞানের অধিকারী হন; কিন্তু এই আনন্দ এবং জ্ঞান শেষপর্যন্ত তাঁর বন্ধনের কারণ হতে পারে। রজোগুণের বৈশিষ্ট্য আসক্তি। রাজসিক মানুষ বাসনাপরায়ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উদ্যমী। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁকে বদ্ধ করে। তমোর বৈশিষ্ট্য অজ্ঞানতা। তমোগুণী মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হন এবং ভুল করে বসেন। তিনি যেমন আলসে তেমনি ঘুমকাতর।

আপাতদৃষ্টিতে সত্ত্ব এবং তমঃ দেখতে অনেকটা একই রকম। কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। সাত্ত্বিক মানুষের কোনও উচ্চাভিলাষ থাকে না। তাঁর যা আছে তাতেই তিনি তুষ্ট। তিনি হয়তো গরীব, কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোন উদ্বেগ নেই কারণ তিনি জানেন এ সংসার দুদিনের। শুদ্ধমন এবং জ্ঞান এ দুটি জিনিস পেলেই তিনি খুশি। এর বেশি কিছু তিনি চান না। তামসিক মানুষেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু তার কারণ তিনি কুঁড়ে ও কর্মবিমুখ।

তিন গুণের চরিত্র বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন। গল্পটি হচ্ছে এই : এক ব্যক্তি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। পথে সে ডাকাতের হাতে পড়ে। দলে তিনটে ডাকাত। পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার পর এক ডাকাত বলল, 'এর যা ছিল তা তো সব লুটে নিয়েছি, এবার একে মেরে ফেলা যাক।' সেকথা শুনে অন্য আরেক ডাকাত বলল, 'মারার দরকার নেই; তার চেয়ে বরং একে এই গাছে বেঁধে রাখি।' তারপর লোকটিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ডাকাতগুলো পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাকাতদের একজন ফিরে এসে লোকটিকে বলল, 'ভাই, তোমার কি খুব লেগেছে? এস, আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি।' এই বলে লোকটির বাঁধন খুলে তাকে বনের বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দিল। স্বাভাবিকভাবেই কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে লোকটি বলল, 'ভাই, তুমি আমার অশেষ উপকার করেছ। একবার আমার বাড়ি যাবে না? আমার বাড়ি কাছেই।' পথিকের অনুরোধ শুনে ডাকাতটি বলল, 'না ভাই। অতদুর আমার যাওয়া চলবে না। আমাকে এখান থেকেই ফিরতে হবে।' প্রথম ডাকাতটি তমোগুণের দৃষ্টান্ত। 'মারো' 'কাটো'—এই হচ্ছে তমোগুণের ভাব। দ্বিতীয় ডাকাত রজোগুণের দৃষ্টান্ত। রজোগুণ মানুষকে সংসারে বেঁধে রাখে। তৃতীয় ডাকাত সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণ মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। পথ দেখিয়ে দেওয়া—বস্, ঐ পর্যন্তই। এর বেশি কিছু করতে পারে না। লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, কারণ মুক্তি তিন গুণের পার। মুক্তি পেতে গেলে সত্ত্বগুণের পারে যেতে হয়।

'ফলকর্মকর্তা' বলতে জীবাত্মাকেই বোঝায়, কারণ কিছু পাওয়ার আশাতেই সে কাজ করে। জীবকে আবার 'প্রাণাধিপঃ' বলা হচ্ছে। কারণ সে পঞ্চপ্রাণের কর্তা। 'ত্রিবর্ত্মা'—তিনটি পথ। মৃত্যুর পর কৃতকর্ম অনুযায়ী জীব তিনটি পথে যাতায়াত করে। মৃত্যুর পর কেউ কেউ 'দেবলোক' তথা স্বর্গে গিয়ে দেবদেবীর স্থান গ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ 'পিতৃলোক' অর্থাৎ যেখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা আছেন সেখানে যায়। আবার খুব নীচুস্তরের মানুষ, যারা বেঁচে থাকতে খুব হীন কাজ করেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তারা পশু অথবা কীট হয়ে এই সংসারেই আবার ফিরে আসে। কিন্তু তিনটি পথের যে পথেই আমাদের গতি হোক না কেন, এই মনুষ্য-সংসারে জীবকে শেষপর্যন্ত ফিরে আসতেই হয়। এ আসা-যাওয়া হয় আমাদের কর্মফলে। 'স্বকর্মভিঃ সঞ্চরতি', কর্ম অনুসারেই জীবের পুনর্জন্ম হয়। এখানে অদ্বৈতবাদী বলবেন, আত্মার জন্ম নেই। আত্মা অবিকারী, অপরিবর্তনীয়। তার আবার স্বর্গে যাওয়াই বা কি আর কীটজন্মই বা কি? এর উত্তরে বেদান্ত বলেন—আমরা যে সর্বদাই ব্রহ্ম এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অজ্ঞানতাবশত আমরা জীব ও ব্রহ্মকে আলাদা করে দেখি। আমরা ভাবি আমরা ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র। আর এই অজ্ঞানতার ফলেই আমরা ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ছুটি, অন্যকে কষ্ট দিই, বহু কুকর্ম করি। অবশ্য তারজন্য

আমাদের কম মূল্য দিতে হয় না। বারবার জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়ে আমাদের হাবুডুবু খেতে হয়। যদিও এখন আমরা তর্কের খাতিরে বলতে পারি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন। বাস্তবে কিন্তু দেখি 'আমরা ব্রহ্ম' একথা পড়া বা শোনার পরও আমরা এমন সব কাজ করি যা আমাদের করা উচিত নয়; অনুভব করি কে যেন আমাদের দিয়ে জোর করে নানা কুকর্ম করিয়ে নিচ্ছে! আমরা জানি তাতে আমাদের ক্ষতিই হবে—কিন্তু তবু না করে থাকতে পারি না। তাহলে এটা দেখছি, স্বরূপত আমরা মুক্ত হলেও, বাস্তবে যা করে চলেছি তাতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে আমরা স্বাধীন নই। সুতরাং যেটা সবথেকে দরকারী তা হল অজ্ঞানতাকে অতিক্রম করার পথ খুঁজে বের করা এবং জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে রেহাই পাওয়া। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করতেই হবে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥৮

অন্বয়: যঃ (যিনি); অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (বুড়ো আঙুলের মতো ছোট); রবিতুল্যরূপঃ (সূর্যের মতো উজ্জ্বল); সঙ্কল্প-অহঙ্কার-সমন্বিতঃ (নিজস্ব ইচ্ছা এবং অহংবোধের দ্বারা স্বতন্ত্র); বুদ্ধেঃ গুণেন আত্মগুণেন চ (এবং বুদ্ধি ও দেহবোধের দ্বারা); আরাগ্রমাত্রঃ (সূচের আগার মতো তীক্ষ); অপরঃ (যেন পরমাত্মার চেয়ে আলাদা); অপি দৃষ্টঃ এব হি (এবং অবশ্যই অনুভূত হন)।
সরলার্থ: হৃদয়-আকাশে আত্মাকে অনুভব করা যায়। এই আকাশ বুড়ো আঙুলের মতোই ছোট; কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মা সূর্যের মতো উজ্জ্বল। নিজস্ব ইচ্ছা এবং অহংবোধের দ্বারা তিনি স্বতন্ত্র। বুদ্ধি এবং দেহবোধ এই জীবাত্মার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবাত্মা জন্মমৃত্যুর নিগড়ে বাঁধা। ছুঁচের আগার মতো সূক্ষ্ম হলেও এই আত্মা বোধ করে সে নিশ্চিত পরমাত্মার থেকে আলাদা।
ব্যাখ্যা: উপনিষদ বলেন হৃদয়গুহায় আত্মাকে অনুভব করা যায়। হৃদয়ের এই জায়গাটা হাতের বুড়ো আঙুলের মতো ছোট। তাই আত্মাকেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' বা বুড়ো আঙুলের মতো ছোট বলা হয়েছে। কথাটা অবশ্য একেবারে আক্ষরিক অর্থে নেবার দরকার নেই। কারণ আত্মা যেমন খুব ছোট, তেমনি আবার তিনিই বিরাট হতে পারেন। আত্মার বর্ণনা দিতে গিয়ে এও বলা হয়েছে তিনি 'রবিতুল্যরূপঃ'—সূর্যের মতো দ্যুতিমান, সূর্যের মতোই

স্বয়ংপ্রভ। আলোর জন্য সূর্যকে কারও উপর নির্ভর করতে হয় না। সূর্য নিজের আলোতেই আলোকিত। সেইরকম স্বরূপত পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় জীবাত্মাও স্বয়ংপ্রভ বা স্বপ্রকাশ।

উপনিষদ এইবার জীবাত্মার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমত : সঙ্কল্প—জীবাত্মার নিজের ইচ্ছা আছে। আমরা দেখি ছোট্ট একটা পোকারও নিজস্ব ইচ্ছা আছে। মনে করুন একটা পিঁপড়ে স্বাধীনভাবে চলেফিরে বেড়াচ্ছে এবং তার চলার পথে আপনি বাধার সৃষ্টি করলে দেখবেন সে প্রাণপণে বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন—জীবন আর কি? জীবন হচ্ছে সংগ্রাম। একটা সচেতন জীবের এইটাই বৈশিষ্ট্য—সে লড়াই করতে পারে, তার প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। স্বামীজী একটা দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। বলেছেন—এমনিতে বিরাট স্টীম ইঞ্জিনকে দেখলে দারুণ শক্তিশালী মনে হয়, কিন্তু সে নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে না। চালক ইচ্ছেমতো তাকে চালায়। কিন্তু ছোট্ট একটা পোকারও আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে, সে আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে। সুতরাং এই প্রতিরোধের শক্তি এবং ইচ্ছাই জীবনের লক্ষণ। 'অহংকার' বলতে অহংবোধ বা আমিত্ব বোঝায় যেমন 'আমি শ্রীযুক্ত অমুক, এই আমার বংশ পরিচয়, আমি অমুক অফিসে কাজ করি ইত্যাদি।' এই অহংকারের ফলে আপনি নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে করেন। অতি সাধারণ মানুষেরও এই অহংবোধ আছে। 'সঙ্কল্প' এবং 'অহংকার' এই দুটো খুঁটির উপর জীবাত্মা যেন দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা এবং আমিত্ববোধই জীবাত্মাকে চালায়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উপনিষদ বলতে চাইছেন আমার উপরই সব নির্ভর করছে। আপনিই আপনার ভাগ্যবিধাতা। আপনি যা হয়েছেন এবং যা হবেন তারজন্য আপনিই দায়ী।

জীবাত্মার আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে—বুদ্ধি এবং শরীর। 'বুদ্ধেঃ-গুণেন', বুদ্ধির সঙ্গে আমরা নিজেদের অভিন্ন বলে মনে করি। বুদ্ধিমান হই বা না হই, আমরা সকলেই জানি আমাদের বুদ্ধি বলে একটা জিনিস আছে। আমরা যদি চালাক-চতুর বা বিদ্বান হই, আমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারি। আবার যদি বোকা হই, তাও বুঝতে পারি। এককথায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। শরীর সম্পর্কেও একই কথা—'আত্মগুণেন'। 'আত্ম' শব্দটি এখানে শরীরকে বোঝাচ্ছে। আমি হয়তো কালো এবং লম্বা, আরেকজন হয়তো বেঁটে এবং ফরসা। এইভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

'আর' হল জুতো সেলাই করার ছুঁচ। অঙ্কুশ, এই অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা চলে। 'আরাগ্র' বলতে ছুঁচ বা অঙ্কুশের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগকে বোঝাচ্ছে। উপনিষদ বলছেন, আত্মা খুব ছোট এবং সূক্ষ্ম। কিরকম সূক্ষ্ম? ঠিক যেন ছুঁচের আগার মতো।

সঙ্কল্প, অহংকার, বুদ্ধি এবং দেহ—এইসব গুণের জন্যই জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে পৃথক বলে মনে হয়। (অপরঃ অপি দৃষ্টঃ।) এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমার আপনার একটা স্বাতন্ত্র বোধ এসেছে। এবং তার দ্বারাই অন্যান্য সবকিছুর থেকে নিজেদের আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতক্ষণ যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল তার প্রত্যেকটিই পরমাত্মার উপর চাপানো উপাধিমাত্র। ঐ গুণ আরোপ করে যেন পরমাত্মাকে সীমিত বা খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, এ যেন 'জল সূর্যবৎ'। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যকে যেমন আসল সূর্য থেকে আলাদা বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে পৃথক বলে মনে হয়। 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ', জীব স্বরূপত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা; তার থেকে আলাদা কিছু নয়। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র মানুষ বলে মনে করি। আমরা যে আসলে অমৃতের পুত্র, অনন্ত আনন্দের সন্তান, সেকথা ভুলে যাই।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায়কল্পতে।।৯

অন্বয়: সঃ জীবঃ (এই জীবাত্মা); বালাগ্রশতভাগস্য (চুলের আগার একশো ভাগের এক ভাগকে); শতধা কল্পিতস্য চ ভাগঃ বিজ্ঞেয়ঃ (আবার শতভাগে ভাগ করা যায়); সঃ (সেই এক জীবাত্মা); আনন্ত্যায় কল্পতে চ (আবার অনন্তও বটে)।

সরলার্থ: জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র, যেন কেশাগ্রের শতভাগের একভাগের শতাংশ মাত্র। আবার এই জীবাত্মাই অনন্ত।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক, একটি চুলের আগাকে শতভাগে ভাগ করে তার একাংশকে আবার শতভাগে ভাগ করা হল। কল্পনা করুন সেটা কতটুকু হতে পারে। উপনিষদ বলছেন, জীবাত্মা সেইরকম ক্ষুদ্র। আবার একইসঙ্গে জীবাত্মা অনন্তও বটে, কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। জীবাত্মা ক্ষুদ্র বলে প্রতিভাত হয় মাত্র। আসলে আরোপিত গুণের জন্যই জীবাত্মাকে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ মনে হয়। পরমাত্মা কিন্তু সবসময় পরমাত্মাই আছেন। তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু চাপানো, মিথ্যা নাম আর রূপের জন্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়। দড়ি দড়িই থাকে। কিন্তু তাকে সাপের মতো দেখায়। কেন? অন্ধকারে দড়ির উপর সাপের সাদৃশ্য বা সমভাব আরোপিত হওয়ার ফলেই এই ভ্রম হয়। কিন্তু যেই আলো এল, অর্থাৎ অন্ধকার দূর হল, অমনি দড়িটির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেল। সেইভাবে জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হলেই নিজের আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে বোধ হয়।

**নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥১০**

অন্বয়: এষঃ ন এব স্ত্রী (এই (আত্মা] মহিলা নন); ন পুমান্ (পুরুষ নন); অয়ং ন চ এব নপুংসকঃ (এবং ইনি নপুংসকও নন); যৎ যৎ শরীরম্ আদত্তে (যে যে শরীর ধারণ করেন); তেন তেন সঃ রক্ষ্যতে (সেই সেই শরীর দ্বারা পরিচিত হন)।
সরলার্থ: আত্মা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, নপুংসকও নন। (কর্মের ফলে) আত্মা বিভিন্ন শরীর ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপেই তিনি পরিচিত হন।
ব্যাখ্যা: জীবাত্মা শরীর ধারণ করেন। সে শরীর নারীরও হতে পারে, পুরুষেরও হতে পারে অথবা নপুংসক, পশু কিংবা কীটপতঙ্গেরও হতে পারে। কিন্তু আসলে আত্মার কোন রূপই নেই। তিনি অরূপ। নারী, পুরুষ, অথবা নপুংসক হিসেবে তিনি প্রতিভাত হন মাত্র। শরীর যেন সরাইখানা। মরুভূমিতে সন্ধ্যার ছায়া ঘনালে ক্লান্ত পথিক যেমন রাতটুকুর জন্য সরাইখানায় আশ্রয় নেয়, তেমনি আমরাও যেন কিছুকালের জন্য আমাদের শরীরে আশ্রয় নিয়েছি। দেহগুলো যেন একটা বাড়ি। অনেকসময় আমরা বাড়ির সাহায্যেই কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করি—বলি, 'ঐ যে, ঐ বাড়িতে যে ভদ্রলোক থাকেন আমি তাঁরই কথা বলছি।' এখানে বাড়ি আর বাড়ির কর্তা যেন এক হয়ে গেছেন। মনে মনে কিন্তু আমরা জানি গৃহ আর গৃহকর্তা এক বস্তু নয়। ঠিক তেমনি আপনি সাময়িকভাবে একটি দেহ আশ্রয় করেছেন বটে, কিন্তু আপনি দেহ নন। আপনি দেহরূপ বাড়িতে দুদিনের ভাড়াটে। কিছুদিন পরেই এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে উঠে যাবেন। জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা এইভাবেই চলেছি।

**সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাচাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥১১**

অন্বয়: দেহী (জীবাত্মা [দেহবুদ্ধিসম্পন্ন]); গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা (খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে); আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম (দেহের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ধারণ করে); [সেইরকমভাবে] সঙ্কল্প (চিন্তা); স্পর্শ (স্পর্শ); দৃষ্টি (দৃষ্টি); মোহ (আসক্তি); স্থানেষু (বিভিন্ন জীব); অনুক্রমেণ (আসক্তির ক্রম অর্থাৎ তীব্রতা অনুসারে); কর্মানুগানি (তার আচরণ অনুসারে); রূপাণি (রূপ [পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক]); অভিসংপ্রপদ্যতে (লাভ করে)।

সরলার্থ: দেহবুদ্ধিসম্পন্ন জীবাত্মা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে দেহের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ধারণ করে। সেইরকমভাবে তার চিন্তা, স্পর্শ এবং দৃষ্টি থেকে আসক্তির জন্ম। এই আসক্তিই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই আচরণের ফলেই তাকে নানাবিধ (যথা স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক) রূপ ধারণ করতে হয়।

ব্যাখ্যা: কেন আমাদের নানারকম দেহ ধারণ করতে হয়? এই দেহের সৃষ্টিই বা কেন? উপনিষদ বলছেন— তোমার বাসনা বা 'সঙ্কল্প' এর জন্য দায়ী। বাস্তবিক বাসনাই আমাদের চালায় এবং বাসনাতাড়িত হয়েই আমরা নানা স্থূলবস্তুর সংস্পর্শে আসি (স্পর্শ), আর এই সংস্পর্শের মাধ্যমেই আমরা ভোগ করি (দৃষ্টি)। শেষে ভোগ থেকে আসে বন্ধন (মোহ)। আমরা ভোগ ছাড়তে পারি না; তার ফলেই আমাদের বন্ধনের দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

অন্ন, জল যেমন আমাদের দেহকে পুষ্ট করে, তেমনিই আমাদের কর্ম জীবাত্মাকে পুষ্ট করে। শারীরিকভাবেই হোক বা মানসিকভাবেই হোক, জীবাত্মা সর্বদাই কিছু না কিছু করে চলেছে। সে হয়তো কিছু চাইল এবং শেষ পর্যন্ত কাম্যবস্তুর সংস্পর্শে এল। তারপর বস্তুটিকে দেখে, ভোগ করে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। এইভাবেই জীবাত্মা কর্ম করে চলে আর এই কর্মই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। আমরা যা হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যা হব তা সবই আমাদের কর্মের দ্বারা নির্ধারিত। একটার থেকে আরেকটা এসে পড়ে এবং একটা আবর্ত সৃষ্টি করে তাতেই আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়। এইভাবেই জীবন এগিয়ে চলে। আমাদের যতকিছু অভিজ্ঞতা তা এই কর্মের ফলেই।

এই কর্মের ফলেই আমরা বিভিন্ন রকমের শরীর লাভ করি (রূপাণি অভিসম্প্রপদ্যতে)। আপনি দেবতা হয়ে জন্মাতে পারেন,মানুষ অথবা পশু হয়েও জন্মাতে পারেন। আবার দেখুন, মানুষের মধ্যেই বা কতরকমের বৈচিত্র। কেউ খুব ভালো, কেউ বা দুষ্ট প্রকৃতির। আপনার চেহারার মধ্যেই আপনার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে; আর এ সবই আপনার কর্মের দ্বারা অর্জিত। যেমন ভালো খেলে স্বাস্থ্য ভালো হয়, তেমনি ভালো কাজ করলে ভালো জন্ম হয়। আবার খারাপ কাজ করলে পশুজন্ম, এমনকি কীটপতঙ্গের জন্মও হতে পারে। মোটকথা আপনি যা হয়েছেন তা আপনারই কর্মগুণে। আমরা যা হয়েছি বা হব তারজন্য আমরাই দায়ী। কর্মফলের দরুনই আমরা সুখী হই, আবার কর্মফলের দরুনই দুঃখ পাই। আমরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। এ ব্যাপারে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং

সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥১২

অন্বয়: দেহী (জীবাত্মা); স্বগুণৈঃ (আগের কর্মহেতু); স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ এব (স্থূল এবং সূক্ষ্ম); বহুনি রূপাণি (নানাপ্রকার রূপ বা দেহ); বৃণোতি (ধারণ করে); তেষাম্ (তাদের); ক্রিয়াগুণৈঃ আত্মগুণৈঃ চ (অতীত কর্ম এবং মানসিক গুণাবলীর কারণে); সংযোগহেতুঃ (সেই এক আত্মা [একই গুণসম্পন্ন]); অপরঃ অপি দৃষ্টঃ (অন্য দেহ ধারণ করে এবং তাকে ভিন্ন মনে হয়)।

সরলার্থ: অতীত কর্ম এবং মানসিক প্রবণতা অনুসারে জীবাত্মা নানারকমের স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ বা দেহ ধারণ করে। সেই একই জীবাত্মা যখন আবার নতুন দেহ ধারণ করে তখন তাকে ভিন্ন বলে মনে হতে পারে। নতুন দেহ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই এইরকম মনে হয়।

ব্যাখ্যা: 'স্বগুণৈঃ', দায়িত্ব যে আমারই, এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমার জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার কর্ম অনুসারেই আমি এই দেহ পেয়েছি। অবশ্য কেবল বাইরের চেহারা দেখেই মানুষ বিচার করা যায় না। তাতে কখনো কখনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে হয়তো খুব ভালো বলে মনে হয়, বাস্তবে সে হয়তো ততটা ভালো নয়।

আমরা সকলেই কিছু না কিছু সংস্কার নিয়ে জন্মাই। আমাদের মেজাজ, প্রবৃত্তি, ব্যক্তিত্ব—সবই আমাদের কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার উপর এ জন্মে নতুন বাসনার ফলে আমরা হয়তো অনেক কিছু ভোগ করতে চাই। সব সাধ পূর্ণ হয় না। মৃত্যুর সময়েও বহু সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। ঐ অপূর্ণ বাসনার ফলে আবার নতুন দেহ ধারণ করতে হবে। এই বারবার জন্মানো বন্ধ হয় কেবল তখনি যখন আমরা নির্বাসনা হই, যখন আমাদের আর কোন বাসনা থাকে না। তাই উপনিষদ সাবধান করে দিয়ে বলছেন, তোমার বাসনাই তোমার ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। এখানে উপনিষদ আরও একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, আবার জন্ম হলে যে আমরা মানুষ হয়েই জন্মাব এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। পাথরের মতো স্থূলদেহ নিয়েও জন্মাতে পারি, আবার প্রেতাত্মার মতো সূক্ষ্মদেহও পেতে পারি।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥১৩

অন্বয়: অনাদ্যনন্তম্ (অনাদি এবং অনন্ত); কলিলস্য মধ্যে (রহস্যের গভীরে [সৃষ্টির আদিতে]); বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ (জগতের স্রষ্টা); অনেকরূপম্ (বহুরূপে প্রকাশিত); বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্ (জগৎ জুড়ে আছেন); একং দেবম্ (অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে); জ্ঞাত্বা ([নিজের আত্মা বলে] জেনে); সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়)।

সরলার্থ: ঈশ্বর অনাদি এবং অনন্ত। এক অপার রহস্যের আড়ালে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনিই এ জগতের স্রষ্টা, বহুরূপে প্রকাশিত। তিনিই আবার এই জগৎকে আবৃত করে আছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁকে (নিজের আত্মা বলে) জানলে মানুষ সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা: 'কলিল' কথাটির অর্থ গহন অর্থাৎ রহস্যময়, গোলমেলে। বাস্তবিক, এই জগৎ-ব্যাপার এক মস্ত প্রহেলিকা। একে আমরা বুঝে উঠতে পারি না। 'কলিল' কথাটির আর একটি অর্থ বিশৃঙ্খলা। এই জগতে এত বৈষম্য, এত উলটোপালটা কাণ্ড ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। কি ব্যষ্টির ক্ষেত্রে, কি সমষ্টির ক্ষেত্রে—সর্বত্রই এই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে। কিছু মানুষ দীন-দরিদ্র, পথের ভিখিরি, আবার কিছু মানুষ ধনী—এমন কেন হয়? জগতে এত বিবাদ-বিসংবাদ, এত হানাহানি কেন? আচ্ছা, জগতের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু আমার নিজের ভিতরেই বা এত অন্তর্দ্বন্দ্ব, এত সংগ্রাম, এত অশান্তি কেন? ভেবে ভেবে আমরা কোন কুল-কিনারা পাই না। কিন্তু এই আপাত বিশৃঙ্খলার আড়ালে আছেন 'বিশ্বস্য স্রষ্টারম্', পরমাত্মা, যিনি এই জগতের সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেন এক জাদুকর, নানান খেলা দেখিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করছেন। আপনি একে তাঁর লীলা বলতে পারেন; কৌতুকও বলতে পারেন। তিনি যেন অনেক রূপ ধারণ করে খেলছেন। তিনিই নিজেই চোর সেজেছেন, আবার তিনিই পুলিস হয়েছেন। তিনিই ভালো, তিনিই মন্দ। তিনি 'একং দেবম্'—অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী পরমাত্মা।

তবে এই বিভ্রান্তি, এই বৈচিত্র, সবই কিন্তু ব্যবহারিক জগতে। বহু দেখাই অজ্ঞান; আর বৈচিত্রের আড়ালে যে পরম এক, তাকে দেখাই যথার্থ জ্ঞান। আর সেই এককে নিজের আত্মারূপে দেখতে পারলেই সব বন্ধন থেকে মুক্তি (সর্ব-পাশৈঃ মচ্যতে)। তখন আপনি মুক্ত পুরুষ। 'বন্ধন' কথাটির মানে কি? বন্ধন মানে অজ্ঞানতাজনিত বিভ্রান্তি। এখন আমরা নাম-রূপের বৈচিত্র দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছি। এটা অজ্ঞানতা। বহুর মধ্যে একেকে দেখা এবং সেই এককেই নিজের সত্তা বলে চিনতে পারার নামই জ্ঞান। আমার মধ্যে যে আত্মা, সেই আত্মাই আপনার মধ্যে; তিনিই সর্বত্র এবং সর্বভূতে বিরাজ করছেন। কাজে-কাজেই

আপনাকে যদি আমি আঘাত করি, সেটা নিজেকেই আঘাত করা হল। এই জ্ঞান, এই চেতনাকেই আত্মজ্ঞান বলে।

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥১৪

অন্বয়: ভাবগ্রাহ্যম্ (শুদ্ধ মনের গোচর); অনীড়াখ্যম্ (নিরাকার, দেহহীন); ভাবাভাবকরম্ (সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কারণ); শিবম্ (মঙ্গলময়, যা কিছু ভালো তার উৎস); কলাসর্গকরম্ (সকল কলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের স্রষ্টা); দেবম্ (ঈশ্বরকে (যিনি জ্যোতির্ময়]); যে বিদুঃ (যাঁরা [নিজের আত্মা বলে] জানেন); তে জহুঃ তনুম্ (তাঁরা দেহত্যাগ করেন [এবং তাঁদের আর জন্ম হয় না])।

সরলার্থ: ঈশ্বর শুদ্ধ মনের গোচর। তিনি নিরাকার। তিনি সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ। যা কিছু ভালো তার উৎসও তিনি। তিনি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্যোতির্ময়। যাঁরা তাঁকে (নিজের আত্মারূপে)জানেন, তাঁরা দেহত্যাগের পর (আর জন্মান না)।

ব্যাখ্যা: কিন্তু কিভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়? তার উত্তর এই—চিত্ত শুদ্ধ হলে (ভাবগ্রাহ্যম্) ব্রহ্ম নিজেই সেখানে প্রতিভাত হন। প্রায় সব ধর্মেই শুদ্ধি বা পবিত্রতার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। হিন্দুমতে প্রথমেই দরকার 'বহির্শুদ্ধি' বা দৈহিক শুচিতা। তারপর আসে 'অন্তর্শুদ্ধি' বা মনের শুদ্ধতা। দৈহিক শুদ্ধির ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারি, যেমন, পরিচ্ছন্ন সুস্থ দেহ, পরিষ্কার জামাকাপড় ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। কিন্তু এটাই সব নয়। আমাদের অন্তরের শুচিতাও দরকার। বস্তুত দৈহিক শুচিতার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনের শুদ্ধতা, মনের পবিত্রতা। এখন প্রশ্ন—শুদ্ধ মন বলতে আমরা কি বুঝি? শুদ্ধ মন কাকে বলে? তাকেই শুদ্ধ মন বলে যে মনে দেহের চিন্তা নেই, যে মনে ইন্দ্রিয়সুখ বা স্থূল জাগতিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই। শুদ্ধ মনে কোনরকম আমিত্ব নেই। দেহের কথা ভাবলে বা বাসনার তরঙ্গ উঠলে মন স্বভাবতই নীচে নামে। মনের এই অবস্থাকেই অশুদ্ধ বলা হচ্ছে। কিন্তু যখন আপনি ঈশ্বরচিন্তা করেন, তখন আপনার মন শুদ্ধ অবস্থায় থাকে, কারণ তখন আপনি নিজের কথা ভাবছেন না, তখন আপনার অহংবোধ নেই, আপনার হৃদয় জুড়ে তখন শুধু ঈশ্বর বিরাজ করছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে অহঙ্কার বা আমিত্ববোধের ফলেই মন কলুষিত হয়। আপনার যদি কোন বাসনা থাকে তো বিচার করে দেখুন, দেখতে পাবেন আপনিই তার কেন্দ্রবিন্দু। আপনার যত উদ্বেগ-সেও আপনাকে নিয়েই। সর্বত্রই 'আমি', 'আমি', আর 'আমি'। 'আমি'-র জয়জয়কার। অহর্নিশ আমরা 'আমি'-র পতাকা

বয়ে বেড়াচ্ছি। এই আমিত্বই মস্ত বাধা; এই আমিত্বই আমাকে ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই আমিত্বের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে পারলেই ভগবান আর আমার মধ্যে যে দূরত্ব তা ঘুচে যায়। আমি বুঝতে পারি ভগবান আর আমি অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যার মন শুদ্ধ সে যেন ঈশ্বরের কোলে বসে আছে। অর্থাৎ ঈশ্বর তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। এখন আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আমাদের মন অশান্ত, বিক্ষিপ্ত। একটু চিন্তা, একটু উদ্বেগ, একটু সমস্যা হলেই মন একেবারে অস্থির। হ্রদের জল শান্ত, নিস্তরঙ্গ না হলে তলায় কি আছে তা দেখা যায় না। ঠিক সেইরকম আমাদের অন্তরেই ঈশ্বর আছেন; কিন্তু মন স্থির হলে তবেই তাঁকে দেখা যায়। মন কখন স্থির হয়? মন তখনি স্থির হয় যখন মনে কোনও বাসনা থাকে না, কোন আমিত্ব থাকে না। সেখানে শুধু তুমি; শুধু ভগবানই আছেন। তখন মনে কোন ঢেউ নেই। সেই শান্ত, অচঞ্চল মনেই ঈশ্বর নিজেকে ধরা দেন।

ব্রহ্মকে বলা হয় 'অনীড়', অর্থাৎ যাঁর কোন নীড় বা গৃহ নেই। এই দেহই আমাদের ঘরবাড়ি। জীবাত্মা যেন পাখি, আর এই দেহটা যেন তার বাসা। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপী; তাই তাঁর কোন গৃহের প্রয়োজন নেই। 'অনীড়' বলতে অশরীরও বোঝায়—অর্থাৎ যার দেহ নেই। দেহ থাকলেই আমরা সীমিত হয়ে গেলাম। দেহ থাকলেই দেহের যা কিছু তার সঙ্গে আমরা একাত্ম বোধ করি। লম্বা-চওড়া শরীর হলে গর্ব করে বলি, 'আমি বলবান'। গায়ের রঙ কালো হলে বলি, 'আমি কালো'। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মালে বলি, 'আমি ব্রাহ্মণ'। এ সবই দেহের দোষগুণ, দেহের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার দ্বারাই আমরা আমাদের অখণ্ড স্বরূপ থেকে বিযুক্ত, বিশ্লিষ্ট হয়ে সীমিত হয়ে যাই। বিশেষিত হওয়া মানেই ছোট হয়ে যাওয়া, নিজের চারপাশে একটা গণ্ডি টেনে দেওয়া। কিন্তু ব্রহ্ম স্বাধীন, নির্বিশেষ এবং নির্গুণ। দেহ থাকা মানেই খণ্ডিত হওয়া। তাই ব্রহ্ম 'অনীড়', 'অশরীর' অর্থাৎ নিরাকার।।

'ভাব' বলতে অস্তিত্ব এবং 'অভাব' বলতে নাস্তিত্ব বোঝায়। ব্রহ্ম এই দুই-এর কারণ। তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই ধ্বংস করেন। তিনিই বন্ধু, তিনিই শত্রু। কিন্তু তিনি সর্বদাই 'শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলময়।

'যে বিদুঃ, যাঁরা জানেন। কি জানেন? জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক, সেই তত্ত্ব তাঁরা জানেন। তাঁরা জানেন যে স্বরূপত তাঁরা ব্রহ্ম। এই জ্ঞানই আমাদের লক্ষ্য। উপনিষদ আমাদের সেই জ্ঞানই দিতে চান। কারণ এই জ্ঞান ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। এখন আমরা মুখোশটাই দেখি; মুখোশের আড়ালে যে এক রয়েছেন তা দেখতে পাই না কোন মানুষকে দেখে কি আমাদের ব্রহ্ম বলে মনে হয়? হয় না। আমরা শুধু তার দেহটা দেখি এবং সেটিকেই সত্য এবং স্বাধীন বলে মনে করি। কিন্তু দেহ তো সত্য এবং স্বতন্ত্র নয়। দেহ

পরতন্ত্র, অর্থাৎ অনেককিছুর উপর নির্ভরশীল। এ দেহ আবার অনিত্য—আজ আছে, কাল নেই। যেমন আপনার জামাটা আপনি নন; তেমনি আপনার দেহটাও আপনি নন; আপনার প্রকৃত স্বরূপ আপনি ব্রহ্ম———যা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, যাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই।

যখন মানুষ তার এই ব্রহ্মস্বরূপকে চিনতে পারে, তখন সে দেহ ছেড়ে দেয় (তে জহুঃ তনুম্)। অর্থাৎ তার আর জন্ম হয় না। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে সে চিরতরে রেহাই পায়। এখন আমরা বারবার জন্মাচ্ছি, আর বারবার আমাদের মৃত্যু হচ্ছে। বাসনাই এর একমাত্র কারণ। বাসনার জন্ম আবার দেহবোধ থেকে। দেহবোধ থেকেই দেহকে আরামে রাখার ইচ্ছা জাগে। আবার তারজন্য দরকার টাকাকড়ি আর ইন্দ্রিয়সুখ। নিরন্তর একটা চাওয়া তখন আমাদের পাগলের মতো ছুটিয়ে মারে। কিন্তু যখন এই উপলব্ধি হয়, আমরা ‘অনীড়’, ‘অশরীরী’ অর্থাৎ আমরা দেহ নই, তখন দেহের প্রতি আসক্তি একেবারে চলে যায়। তখন ছেঁড়া জামার মতো এই শরীর আমরা ত্যাগ করতে পারি। বেলুড়মঠে স্বামীজী যখন দেহত্যাগ করলেন তখন তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে। তিনি স্বামীজীর দেহত্যাগের কথা জানতেন না। কিন্তু স্বামীজী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ‘শশীভাই শশীভাই, শরীরটাকে থুথুর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।’ সত্যি কথা। আপনার মুখে নোংরা ঢুকলে আপনি কি করবেন? নিশ্চয় আপনি থুঃ-থুঃ করে তা ফেলে দেবেন। তেমনি আপনি যদি টের পান আপনি দেহ নন, তাহলে আপনি কখনো দেহের প্রতি আসক্ত হবেন না। স্বামী শিবানন্দের হাঁপানি ছিল। বৃদ্ধবয়সে তাঁর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হত। বালিশে ঠেস দিয়ে রাতের পর রাত তিনি জেগে কাটাতেন। এত কষ্ট যে চোখে দেখা যেত না। কিন্তু সকালে সন্ন্যাসীরা যখন তাঁকে প্রণাম করতে আসতেন তখন তাঁকে খুব হাসিখুশি দেখাত। এক দিব্য আনন্দে তিনি ঝলমল করতেন। কিন্তু সেই আনন্দ, সেই প্রশান্তির উৎসটি কি? আত্মজ্ঞান। তিনি জানতেন তিনি দেহ নন। দেহের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই, এই হল জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। বাঁচা, মরা দুই-ই তাঁর কাছে সমান। দেহ থাকলেও তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। আর পাঁচজন মানুষের মতো তিনি কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া সবই করেন, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে। বয়স হলে বার্ধক্যপীড়িত, জীর্ণ শরীর যখন ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়ে, তখন তিনি হাসিমুখে তাকে বিদায় জানান।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥১

অন্বয়: একে কবয়ঃ (কোন কোন পণ্ডিত); পরিমুহ্যমানাঃ (অজ্ঞতাবশত); স্বভাবম্ বদন্তি (মনে করেন এই জগৎ স্বাভাবিকভাবেই, আপনিই এসেছে); অন্যে কালম্ (অন্যরা ভাবেন কালই সৃষ্টির কারণ); লোকে (এই জগতে); এষঃ তু দেবস্য মহিমা (এটি ব্রহ্মেরই মহিমা); যেন ইদং ব্রহ্মচক্রং ভ্রাম্যতে (যার দ্বারা এই ব্রহ্মচক্র ঘুরছে)।

সরলার্থ: কোন কোন পণ্ডিতের মতে এ জগৎ স্বাভাবিকভাবেই, অর্থাৎ আপনিই এসেছে। তাঁদের এ ধারণা ভুল। আবার কারও মতে জগতের উৎপত্তি কাল থেকে,অর্থাৎ কালই জগৎস্রষ্টা। এই ধারণাও ভুল। বস্তুত ব্রহ্মের মহিমাতেই এই ব্রহ্মচক্র ঘুরছে।

ব্যাখ্যা: উপনিষদের শুরুতেই প্রশ্ন উঠেছিল—এই জগৎ কোথা থেকে এল? কে এই জগৎকে সৃষ্টি করেছে? তখন কেউ কেউ বলেছিলেন-বস্তুর আপন স্বভাবেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছিলেন কালই জগৎস্রষ্টা। অন্য আরেকদল আবার বলেছিলেন-সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই এই বিশ্বের উদ্ভব। কিন্তু এই প্রশ্নের সুমীমাংসা না হওয়ায় তাঁরা ধ্যানমগ্ন হয়ে উপলব্ধি করলেন (অপশ্যন্), ব্রহ্মই জগতের কারণ। 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' ব্রহ্ম তাঁর নিজের মায়াশক্তি দিয়ে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন।

এখন উপনিষদ আবার সেই প্রশ্নেই ফিরে যাচ্ছেন। বলছেন, যাঁরা বলেন বস্তুর স্বভাব অথবা কালই জগতের কারণ, তাঁরা পণ্ডিত হতে পারেন, তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা থাকতে পারে (কবয়ঃ), কিন্তু পারমার্থিক ব্যাপারে তাঁরা হয়তো অজ্ঞ এবং সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত (পরিমুহ্যমানাঃ)। বস্তুত পণ্ডিতেরা অনেক সময়ই উদ্ভট ভুল করে বসেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় রহস্য করে বলতেন : আমার পুঁথিগত বিদ্যা নেই, সেকথা ঠিক। কিন্তু সত্য কি তা আমি হৃদয় দিয়ে বুঝেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন, জ্ঞান আমাদের ভিতরেই আছে; মন শুদ্ধ হলে সেই জ্ঞান আপনা-আপনিই ভেসে ওঠে। ধ্যানের দ্বারা মন যখন শান্ত হয় তখন ভেতরের সুপ্ত জ্ঞান উপরে ভেসে ওঠে।

এই বিশ্বকে যে ব্রহ্মচক্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমরা আগেই দেখেছি। আমাদের সবাইকে নিয়ে এই চক্র নিরন্তর ঘুরে চলেছে (ভ্রাম্যতে)। এ যেন সেই রঙীন কাচের খেলনা যা ঘোরানো মাত্রই ভিতরের নকশা বদলে বদলে যায়। এই বিশ্বও সেইরকম নিয়ত পরিবর্তনশীল, অবিরত ঘুরে চলেছে। এ বিশ্ব ব্রহ্মেরই প্রকাশ।

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততেহ
পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥২

অন্বয়: যেন ইদং সর্বং নিত্যম্ আবৃতম্ (যাঁর দ্বারা এই জগৎ সর্বদা আবৃত); যঃ জ্ঞঃ (যিনি জ্ঞাতা); কালকারঃ (কালের কর্তা, প্রভু); গুণী (ভালো, শুদ্ধ); সর্ববিদ্ (সর্বজ্ঞ); তেন ঈশিতম্ (তাঁর ইচ্ছাতেই); পৃথিবী-অপ্-তেজোঽনিল-খানি (মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ); কর্ম হ বিবর্ততে (সব তাঁরই কাজ); [ইতি] চিন্ত্যম্ (এই তত্ত্ব বারবার মনন করা উচিত)।
সরলার্থ: ঈশ্বর সর্বদা এই জগৎকে আবৃত করে রেখেছেন। তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা এবং তিনিই সর্বজ্ঞ। কাল তাঁরই সৃষ্টি। তিনি শুদ্ধ। তাঁর ইচ্ছাতেই (তাঁর ভিতর থেকে) মাটি, জল, আগুন, বাতাস এবং আকাশ-এর আবির্ভাব। এই তত্ত্ব বারবার মনন করা উচিত।
ব্যাখ্যা: 'কালকারঃ (কালের স্রষ্টা)। কাল বা সময়ের যে বোধ তা ব্রহ্ম থেকেই এসেছে। বাস্তবিক, সময়ের এই ধারণা না থাকলে আমাদের জীবন অচল হয়ে যেত। আমরা কাজকর্ম কিছুই করতে পারতাম না।

তাঁকে আবার 'গুণী' বলা হচ্ছে। 'গুণী' শব্দের দুটি অর্থ। একটা অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই ব্রহ্মে অধ্যস্ত, ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্ম 'গুণাশ্রয়',অর্থাৎ এই তিন গুণের আশ্রয়। 'গুণী' শব্দের আরেকটা অর্থ, তিনি অমল, শুদ্ধ। আচার্য বলছেন,তিনি 'অপহতপাপ্মাদিমান্', সব পাপ থেকে মুক্ত। তাই তিনি অপাপবিদ্ধ এবং শুদ্ধ।

এই জগৎকে 'কর্ম বিবর্ততে' বলা হয়, অর্থাৎ এই জগৎ বিবর্তের প্রকাশ। 'বিবর্ত' কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। দুই রকমের কর্ম আছে ———পরিণাম ও বিবর্ত। 'পরিণাম' বলতে বোঝায় রূপান্তর বা পরিবর্তন। যেমন, ছিল দুধ, হয়ে গেল দই; ছিল কাঠ, হল টেবিল। প্রথমটির ক্ষেত্রে দই হল দুধের পরিণাম, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে টেবিল হল কাঠের পরিণাম। কিন্তু বিবর্ত তা নয়। বিবর্তে, বস্তুর সত্তার কোন পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় না। কেবল প্রমাদজনিত প্রতীতির ফলে একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তু বলে মনে হয়। যেমন, রজ্জুতে

সর্পভ্রম। অর্থাৎ একটা দড়ি পড়ে আছে, তাকে আমি সাপ ভেবে বসলাম। এই জগৎ সেইরকম ব্রহ্মের 'বিবর্ত'। মায়ার প্রভাবে আমরা ভাবি ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আসলে কিন্তু জগৎ নেই, অর্থাৎ জগতের পারমার্থিক সত্তা নেই। ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলে ভুল করছি, যেমন দড়িকে সাপ ভেবে বসি। যখন দড়ির বদলে সাপ দেখি, তখন একবারও মনে হয় না যে ভুল দেখছি। ভাবি এটা তো সাপই, আর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি। কিন্তু আসলে সেখানে কোন সাপই নেই। দড়িতে সাপ দেখার মতো এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই বিবর্ত।

এই জগৎ পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি—পৃথিবী (ক্ষিতি), জল (অপ্), আলো বা আগুন (তেজস্), অনিল (বায়ু), ও খ (আকাশ)।

'চিন্ত্যম্', এই তত্ত্বটি নিয়ে ধ্যান করতে হবে, গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান বা পশ্চাৎপট। তিনি নিজেকেই জগৎরূপে প্রকাশ করেছেন। এ জগৎ প্রতিভাস মাত্র—অর্থাৎ, যেন আছে। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সেই সত্যেই আমাদের মন স্থির করতে হবে, প্রতিভাসের দ্বারা বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥৩

অন্বয়: তৎ কর্ম কৃত্বা (সেই কাজ শেষ করে); ভূয়ঃ বিনিবর্ত্য (তার পুনর্বিন্যাস করলেন); তত্ত্বেন তত্ত্বস্য যোগং সমেত্য (ভূতপদার্থের সঙ্গে আত্মগুণ যুক্ত করে); একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ বা (এক, দুই, তিন বা আট মাত্রায়); কালেন চ (তার সঙ্গে কাল বা সময়কে যুক্ত করে); সূক্ষ্মৈঃ আত্মগুণৈঃ (এবং মনের সূক্ষ্ম গুণগুলিকেও)।

সরলার্থ: ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে তার পুনর্বিন্যাস করলেন। তারপর তিনি প্রকৃতির একটি, দুটি, তিনটি বা আটটি স্থূল পদার্থের সঙ্গে কাল বা সময় এবং মনের সূক্ষ্ম গুণগুলিকেও সংযুক্ত করলেন।

ব্যাখ্যা: স্থূল বা সূক্ষ্ম যেভাবেই প্রতিভাত হন না কেন, ব্রহ্ম ব্রহ্মই। অংশত স্থূল এবং অংশত সূক্ষ্ম এই জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম যখন জগৎ ব্যক্ত করেন, তখন তিনি তাঁর ভেতরের স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুটি জিনিসই প্রকাশ করেন। তিনি কেবল একটি প্রকাশ করলে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার প্রকাশ ঘটে। দুটিকে প্রকাশ করলে ধর্ম এবং অধর্ম,

এই দুইয়ের প্রকাশ ঘটে। যখন তিনি তিনটিকে প্রকাশ করেন তখন স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের প্রকাশ ঘটে। আটটিকে প্রকাশ করলে পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহংকারের উন্মেষ হয়। কালের প্রবাহে সূক্ষ্ম, স্থূল সমন্বিত হলে ব্রহ্মের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়।

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥৪

অন্বয়ঃ গুণান্বিতানি কর্মাণি আরভ্য (যখন কেউ কোন কাজ করেন, তখন তা গুণের অধিকারে [অর্থাৎ, তাঁর কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে]); সর্বান্ ভাবান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ (যদি তিনি সে উদ্দেশ্যের মোড় নিজের দিক থেকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন); তেষাম্ অভাবে (বিষয়ের প্রতি আসক্তির অভাবে); কৃতকর্মনাশঃ (তাঁর সমস্ত কর্মের নাশ হয়); কর্মক্ষয়ে (এইভাবে তাঁর সব কর্মক্ষয় হলে); সঃ তত্ত্বতঃ অন্যঃ যাতি (তিনি সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ হয়ে যান [অর্থাৎ, তাঁর অজ্ঞানতা দূর হয়])।

সরলার্থ: কেউ যখন কোন কাজ করেন তখন তা গুণের অধিকারে, অর্থাৎ তাঁর কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যে না করে তিনি যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজটি করেন তবে তা বন্ধনের কারণ হয় না। ভাবটা এই—তিনি যেন কিছুই করছেন না। এইরকম নিষ্কামভাবে কাজ করতে করতে তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে যান, অর্থাৎ তাঁর অজ্ঞানতা দূর হয়।

ব্যাখ্যা: 'গুণান্বিতানি কর্মাণি আরভ্য'। প্রথম প্রথম আমরা যখন কাজ করি তখন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সীমার মধ্যে থেকেই তা করি। কিন্তু ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারলে সব কর্মের অবসান হয়। তখন আমাদের আর কোন কর্ম থাকে না। ব্যাপারটাকে একটু স্পষ্ট করা যাক। সাধারণত আমরা যাই করি না কেন তার একটা ফল আছে। 'আমিই কর্তা, আমিই সবকিছু করছি'—এইরকম অহংবুদ্ধি নিয়ে যদি কাজ করি তবে সে কাজের সব ফলই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যখন আমি অকর্তা, আমি কিছু করছি না, ঈশ্বরই সব করছেন, অথবা যখন নিজের জন্য কাজ না করে ঈশ্বরের জন্য কাজ করি তখন আমার সব কাজই পূজা হয়ে যায়। ভগবদ্গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোকটি (৯।২৭) এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'তুমি যা কিছু করবে, যা খাবে, আগুনে যে আহুতি দেবে, যা কিছু দান করবে এবং যে-কোন কৃচ্ছ্রসাধন করবে সবই

আমাকে নিবেদন করছ এই জ্ঞানে করো।' গীতাতে বারবার এই ভাবটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাজ যখন করতেই হবে তখন পুজো করছি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করাই ভালো। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র হয়ে ওঠা উচিত। ভাবটা হবে—কাজ করছি কেননা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিচ্ছেন। এই নিষ্কাম কর্মের মর্মবাণী। অর্জুন প্রথমদিকে সকামভাবে কাজ করছিলেন। তাঁর উচ্চাশা ছিল, জয়ের, সাম্রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তবুও শত্রুপক্ষের দুর্জয় শক্তি দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। বললেন, আমি যুদ্ধ করতে চাই না। ওঁরা যে আমার আত্মীয়, কিভাবে আমি ওঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? কিন্তু যে মুহূর্তে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর হাতের যন্ত্র হয়ে নিষ্কামভাবে নিজের কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে গেলেন, তখনি আমরা তাঁর বীরত্বের দীপ্তি দেখতে পেলাম।

অবশ্য এটা ঠিক, নিজের অহংকারকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে ঈশ্বরকে প্রকৃত কর্তা বলে মনে করা সহজ কাজ নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, নিজেকে ঈশ্বরের দাস বলে মনে করতে চেষ্টা করো। বলতেন, মনে করবে এ ঘরবাড়ি আমার নয়, ঈশ্বরের। এরা আমার সন্তান নয়, ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরই প্রভু, আমি তাঁর দাস। এইভাবে যে কাজই করি না কেন সবই তাঁর পূজা হয়ে যায়। জাগতিক বলে কিছু নেই। সবই পারমার্থিক, সবই ঈশ্বরীয়। রামপ্রসাদের গানে আছে, 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।' খাচ্ছি, যেন মাকে আহুতি দিচ্ছি। শুচ্ছি, যেন জগন্মাতাকে প্রণাম করছি। ঘুমোচ্ছি, যেন তাঁর ধ্যান করছি। কী অপূর্ব ভাব!

উপনিষদ তাই বলছেন, নিষ্কাম কর্ম করলে কর্মের বন্ধন কেটে যায়। তখন আমরা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে যাই। তখন আমরা আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই।

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্॥৫

অন্বয়: সঃ (তিনিই); আদিঃ (আদিকারণ); সংযোগ-নিমিত্ত-হেতুঃ (অজ্ঞানের কারণে যার ফলে দেহধারণ করতে হয়); ত্রিকালাৎ পরঃ (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উর্ধ্বে); অকলঃ অপি (এবং কলা বা অংশ নেই, অখণ্ড); দৃষ্টঃ (অনুভূত হন); পূর্বম্ (জ্ঞানলাভের

আগে); বিশ্বরূপম্ (সর্বব্যাপী); ভবভূতম্ (কারণ এবং কার্য উভয়ই); ঈড্যম্ (আরাধনার বস্তু); স্বচিত্তস্থম্ (অন্তরাত্মারূপে); তং দেবম্ (সেই পরমেশ্বরকে); উপাস্য (ধ্যান কর)।

সরলার্থ: তিনিই আদিকারণ। যে অজ্ঞানের ফলে আমাদের বারবার জন্মাতে হয়, তিনিই সেই অজ্ঞানের কারণ। তিনি অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে। তিনি খণ্ড খণ্ড জিনিস দিয়ে তৈরি নন, তিনি এক এবং অখণ্ড। তিনিই কারণ এবং তিনিই কার্য। তিনিই আরাধনার উপযুক্ত বস্তু। সেই পরমেশ্বরকে অন্তরাত্মারূপে ধ্যান কর। তাহলেই মুক্তি।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে বর্ণনার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁকে কেউই বর্ণনা করতে পারে না। তবু এখানে তাঁকে বর্ণনা করবার চেষ্টা হচ্ছে। ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে 'আদিঃ'— অর্থাৎ মূল, উৎস অথবা প্রথম কারণ।

'সংযোগ-নিমিত্ত-হেতুঃ'। আমরা জন্মাই কেন? আমাদের এই দেহ কিসের জন্য? উপনিষদ বলছেন, এর কারণ অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা। কিন্তু এই অবিদ্যা এল কোথা থেকে? এই মায়ার অন্তরালেই বা কে রয়েছেন? এর উত্তর, ব্রহ্ম। তিনিই ভালো-মন্দ, সবকিছুর জন্য দায়ী।

'ত্রিকালাৎ পরঃ'। তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালের ঊর্ধ্বে। কোন বিশেষ কাল দিয়ে তাঁকে সীমায়িত করা যায় না। আমরা একথা বলতে পারি না 'অতীতে তিনি এই এই সময়ে ছিলেন অথবা ভবিষ্যতে অমুক সময়ে তিনি থাকবেন।' বস্তুত তিনি স্থান এবং কালের অতীত।

'অকলঃ', মানে যার কোন কলা বা অংশ নেই। তিনি অখণ্ড, সততই পূর্ণ। তিনি জোড়াতালি দিয়ে গড়া কোন বস্তু নন। মানুষের দেহের কথাই ধরা যাক। দেহ রক্ত, মাংস, হাড় ইত্যাদি নানা জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে। ব্রহ্মে এরকম কোন অংশ নেই। তিনি অখণ্ড, নির্বিশেষ।

'দৃষ্টঃ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ, যা দেখা গেছে। কিন্তু ব্রহ্মকে কি দেখা যায়? না। চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও তাঁকে অনুভব করা যায় না। একমাত্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হলে তবেই বোঝা যায় ব্রহ্ম কি বস্তু। যতক্ষণ না সেই অনুভব হচ্ছে ততক্ষণ ব্রহ্ম সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও আমাদের হয় না। এই অনুভব যাঁর হয়েছে কেবল তিনিই জানেন।

'বিশ্বরূপম্'। সবই ব্রহ্ম। সব রূপই তাঁর রূপ। সুন্দর, অসুন্দর—চারপাশে যা দেখি সবই তিনি। একমাত্র তিনিই আছেন।

'ভবভূতম্'। 'ভব' মানে অস্তিত্ব। তিনিই অস্তিত্বের কারণ। তিনি আছেন তাই সব আছে, তিনি না থাকলে কিছুই নেই। অর্থাৎ তার সত্তাতেই সবকিছু সত্তাবান। 'ভূতম্' অর্থাৎ,

অপরিবর্তনীয়। আপেক্ষিক স্তরে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। একটা পরিবর্তনের স্রোতে সবকিছু যেন ভেসে চলেছে। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে পরিবর্তন বলে কিছু নেই। তাই ব্রহ্ম নিত্য অর্থাৎ সনাতন।

'পূর্বম্' অর্থাৎ আগে। কার আগে? আত্মজ্ঞান লাভের আগে, নিজের আত্মাকে জানার আগে, 'উপাস্য'—তাঁর ধ্যান কর, তাঁর উপাসনা কর। কোথায় তাঁর ধ্যান করব? 'স্বচিত্তস্থম্'—তিনি হৃদয়ে আছেন। অর্থাৎ, আমি এবং তিনি ভিন্ন নয়। হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করলে ক্রমশ এই অনুভব হয় 'আমি' আর 'তিনি এক। তিনি বাইরে নন, অন্তরেই আছেন। প্রতিমাপূজার সময় পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেন : 'হে প্রভু, কৃপা করে আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণের জন্য এই বিগ্রহে বিরাজ কর,যাতে আমি তোমার পূজা করতে পারি।' পূজার শেষে পুরোহিত আবার প্রার্থনা করেন, 'এবার তুমি কৃপা করে আমার হৃদয়ে ফিরে যাও।' গুরুও শিষ্যকে হৃদয়ে ধ্যান করতে বলেন। ঈশ্বরের যে রূপ আপনার পছন্দ সেই রূপেরই ধ্যান করতে পারেন, তবে ধ্যানের সময় ভাবতে হবে তিনি আমার অন্তরেই আছেন। ধ্যানের সময় নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে শুধু ইষ্টের চিন্তা করতে হবে। ধীরে ধীরে দেখবেন আপনার অস্তিত্ব যেন কোথায় তলিয়ে গেছে। আপনি কে, তা আপনি ভুলে গেছেন, আপনার যে একটা দেহ আছে, তাও আর আপনার মনে নেই। আপনার মন জুড়ে তখন শুধু আপনার ইষ্ট বিরাজ করছেন। ক্রমশ আপনি অনুভব করতে পারবেন অন্তরে যে ইষ্টের চিন্তা আপনি করছেন, আপনিই সেই দেবতা। এই অনুভব একাগ্র ও নিবিড় হলে সমাধি হয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'বাক্যার্থ' অর্থাৎ শব্দার্থের ধ্যান কর। কি সেই শব্দ যার উপর মনকে নিবিষ্ট করতে হবে? এটি কোন সাধারণ শব্দ নয়। এ হল গুরুর দেওয়া মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। শুধুমাত্র এই চিন্তায় তন্ময় হলে আপনি উপলব্ধি করবেন, 'অয়ম অহম্ অস্মি ইতি'—আমিই এই। তখন আর 'তিনি' একটা আর 'আমি' একটা—এইরকম দ্বৈতভাব থাকে না। তখন 'তিনিই' 'আমি' হয়ে যান। ধ্যেয় বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে আমার পৃথক সত্তা নুনের পুতুলের মতো গলে একাকার হয়ে যায়। তখন আর আমি নেই—শুধু ব্রহ্মই আছেন।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মমমৃতং বিশ্বধাম॥৬

অন্বয়: সঃ (সেই পরমেশ্বর); বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ (বৃক্ষরূপ জগৎ ও কালের অতীত); অন্যঃ (পৃথক, স্বতন্ত্র); যস্মাৎ (পরমেশ্বর থেকে); অয়ং প্রপঞ্চঃ (এই জগৎ প্রপঞ্চ); পরিবর্ততে (চলছে); ধর্মাবহম্ (ধর্মের ধারক); পাপনুদম্ (অধর্মের নাশক); ভগেশম্ (যা কিছু ভালো ও মহৎ সেসবের অধিপতি); আত্মস্থম্ (অন্তরতম আত্মা); অমৃতম্ (অমর); বিশ্বধাম (জগতের আশ্রয়); [তম্ (পরমেশ্বরকে); জ্ঞাত্বা (জেনে [তোমার আত্মারূপে])।

সরলার্থ: জগৎ এবং কাল দুই-ই ব্রহ্মের মতো। (খুঁটিনাটি) পরমেশ্বর এই দুই-এর ঊর্ধ্বে। তাঁর মধ্যেই জগতের সৃষ্টি এবং লয়। তিনি ধর্মকে ধারণ করেন এবং অধর্মের নাশ করেন। যা কিছু ভালো ও মহৎ, তিনিই তাদের উৎস। তিনিই এই জগতের আশ্রয়। তিনি অমর এবং সকলের অন্তরতম আত্মা। তাঁকে নিজের আত্মারূপে জানলে (মানুষ মুক্ত হয়ে যায়)।

ব্যাখ্যা: এই বিশ্ব, এই জগৎ-সংসারকে এখানে গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গীতাতেও (১৫।১) এই বিশ্বকে অশ্বত্থাগাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অশ্বথ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাই—'অ', যার অর্থ 'না', 'শ্ব', যার অর্থ 'আগামীকাল' বা 'ভবিষ্যৎ', 'ত্থ' যার অর্থ 'যা আছে'। অর্থাৎ 'অশ্বথ' মানে যা কাল থাকবে না। এর ব্যঞ্জনা হল, অশ্বত্থ গাছ দেখতে বিশাল হলেও একদিন না একদিন তার মৃত্যু হবেই। এই মহাবিশ্বও অশ্বত্থ গাছের মতো। এত বিশাল এই বিশ্ব যে বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। কিন্তু ব্রহ্ম তার চেয়েও অনেক অনেক বড় এবং মহান। তিনি কাল এবং কালের অন্তর্গত সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

'অন্যঃ', অর্থাৎ স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত। জগৎ ব্রহ্মকে বাঁধতে পারে না। আমাদের চোখে এই বিশ্ব অসীম; কিন্তু এমন যে বিশাল বিশ্ব সেও ব্রহ্মকে ধারণ করতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম দেশ এবং কালের অতীত। 'পরিবর্ততে', এই বিশ্ব ব্রহ্মের মধ্যেই পরিক্রমা করছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা আছে। অর্জুন দেখলেন যে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছুই—কৃষ্ণের মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের বাইরে কিছুই নেই। তিনি সব পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আবার একই সঙ্গে ছোট একটি ঘাসের মধ্যেও তিনি। বিশ্বের ভেতরেও তিনি, বাইরেও তিনি।

ব্রহ্মকে 'ধর্মাবহম্' বলা হয়েছে; কারণ তিনিই ধর্মের অর্থাৎ যা কিছু মঙ্গলজনক, তার স্রষ্টা এবং আশ্রয় (আবহম)। তিনি 'ধর্মধর'—সকল পুণ্যের আধার। তিনি 'পাপনুদম্', সব অশুভের নাশক। অর্থাৎ তিনি ধর্মকে রক্ষা করেন এবং অধর্মকে বিনাশ করেন।

'জ্ঞাত্বা আত্মস্থম্।' ব্রহ্মকে নিজের অন্তরেই উপলব্ধি করতে হবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, তিনি আমাদের বুদ্ধিতে আছেন। কিন্তু তাঁকে আমরা কেমন করে উপলব্ধি করব? অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে। ঠিক কেমন করে ব্রহ্মানুভূতি হয় তা বোঝা দুষ্কর, কারণ এ তো আর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা নয়। এই অনুভূতির জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হয়

না। যাঁদের এরকম অনুভূতি হয়েছে তাঁরা বলেন শুদ্ধ মনেই এই জ্ঞান সহসা ভেসে ওঠে ———দিনক্ষণ জানিয়ে আসে না। বিদ্যুৎ চমকের মতো এক লহমায় অজ্ঞানতার মোহ আবরণটি সরে যায় এবং আপনি সত্যের মুখোমুখি। আপনাকে তখন আর বলে দিতে হয় না, চিনিয়ে দিতে হয় না আপনি কি পেলেন। আপনি জানেন আপনি যা পেয়েছেন তার নাম অমৃত। তখন আপনি জন্মমৃত্যুর পার। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করলে, আপনি বুঝতে পারেন আপনার কখনোই জন্ম হয়নি এবং জন্ম না হওয়ায় আপনার মৃত্যুও নেই। তিনি জানেন কখনো মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥৭

অন্বয়: তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ (সব দেবতাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ); তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ (এবং তিনি সকল দেবতাদের দেবতা); পতীনাং পরমং পতিম্ (সকল রাজার রাজা); পরস্তাৎ (ব্রহ্মার চেয়েও শ্রেষ্ঠ); ঈড্যম্ (আরাধ্য বস্তু); ভুবনেশম্ (তিনি জগৎপতি); [তম্] দেবং বিদাম (এই পরমেশ্বরকে আমরা [নিজের আত্মারূপে] জানি)।
সরলার্থ: দেবতাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি সকল দেবতাদের দেবতা, রাজার রাজা। তিনি ব্রহ্মার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তিনি জগৎপতি এবং সকলের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। আমরা নিজের আত্মারূপে এই পরমেশ্বরকে জানি।
ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম যে অনন্য, কারও সাথেই যে তাঁর তুলনা হয় না সেকথা বোঝাতেই বহু বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ‘ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু।’ প্রথমে এক না থাকলে শূন্যের কোন দাম নেই। অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন।

যেভাবেই হোক ব্রহ্মকে আমাদের জানতেই হবে। তাঁকে না জানলে কিছুই জানা হল না। জীবনে সুখী হবার উপায় হল ব্রহ্মকে নিজের আত্মা বলে জানা।

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥৮

অন্বয়: ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে (তাঁর দেহ এবং কোন ইন্দ্রিয় নেই); তৎ সমঃ (তাঁর সমান); অভ্যধিকঃ চ ন দৃশ্যতে (অথবা তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট কাউকে দেখা যায় না); অস্য বিবিধা এব পরা শক্তিঃ (বহু অসাধারণ গুণের অধিকারী তিনি); স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (স্বাভাবিকভাবেই তিনি জ্ঞান ও কর্মশক্তির অধিকারী); শ্রয়তে (শাস্ত্র এই কথাই বলেন)।

সরলার্থ: ঈশ্বরের দেহ নেই, কোন ইন্দ্রিয় নেই। তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। বহু অসাধারণ গুণের অধিকারী তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রভূত জ্ঞান ও কর্মশক্তির অধিকারী। শাস্ত্র এই কথাই বলেন।

ব্যাখ্যা: আমরা কেমন করে ব্রহ্মের স্বরূপ জানব? জানার একমাত্র উপায় উপলব্ধিমান আচার্যের মুখ থেকে তত্ত্বকথা শোনা। বস্তুত শাস্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি সে তো তাঁদেরই উপলব্ধির কথা। তাঁরা যে সত্য নিজেরা অনুভব করেছেন সেগুলিই নানান ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 'শ্রয়তে' অর্থ 'শ্রুতি বা বেদ মতে। এর আর এক অর্থ যা শোনা হয়। শুধুমাত্র যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না। তারজন্য চাই উপযুক্ত পথপ্রদর্শক, যিনি আমাদের পথ বলে দেবেন এবং যাঁর কথা প্রামাণ্য এবং অকাট্য। কে সেই পথপ্রদর্শক? বেদ। বেদ কিন্তু কতগুলি বই নয়। বেদ হল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সিদ্ধপুরুষদের উপলব্ধ সত্য যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আমাদের হাতে এসেছে। এই নয় যে দশহাজার বছর আগে কোন একজন একবার এই সত্যকে অনুভব করেছিলেন এবং আজ আমরা বইয়ে সেকথা পড়ছি। যুগে যুগে বিভিন্ন আচার্য এই সত্য অনুভব করেছেন এবং বারবার উপলব্ধির কষ্টিপাথরে সেই সত্য যাচাই হয়েছে। আপনি হয়তো বলবেন, যে কেউ এসেই তো দাবি করতে পারেন যে তাঁর ব্রহ্মানুভূতি হয়েছে। তিনি যে আমাদের বোকা বানাচ্ছেন না তার প্রমাণ কি? প্রমাণ তাঁর জীবন, তাঁর জীবনচর্যা, অন্যের প্রতি তাঁর ব্যবহার। তিনি শুদ্ধ এবং নির্লিপ্ত, তাঁর কোন বাসনা নেই, তিনি অহংশূন্য। তিনি নিঃস্বার্থ, সকলের প্রতি তাঁর সমান ভালবাসা। এমন মানুষকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, তিনি আর পাঁচজনের থেকে আলাদা, উচ্চকোটির মানুষ। বুঝবেন তাঁর বিশেষ অনুভূতি হয়েছে।

'স্বাভাবিকী' বলতে স্বাভাবিক বা স্বভাবগত বোঝায়। জ্ঞান, শক্তি (বল) এবং সৃজনশীলতা (ক্রিয়া)—এ সবই ব্রহ্মে নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে সকলেই অবাক হয়ে ভাবত—বইপত্র না পড়েও কি করে ইনি এত বড় জ্ঞানী হলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলতেন, 'আমার যখন যা দরকার সব মা যুগিয়ে দেন। মা-ই রাশ ঠেলে দেন।' এই জ্ঞানই 'স্বাভাবিকী'। অর্জিত জ্ঞান নয়, পুঁথিগত বিদ্যা নয়। ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানস্বরূপ আর সেই জ্ঞান আমাদের ভেতরেই আছে।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥৯

অন্বয়: লোকে (এই জগতে); তস্য ন কশ্চিৎ পতিঃ অস্তি (তাঁর প্রভু বলে কেউ নেই); ঈশিতা চ ন (শাসন করার মতো কেউ নেই); তস্য লিঙ্গং চ ন (কোন রূপ বা চিহ্ন নেই যা দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা যায়); সঃ কারণম্ (তিনিই সবকিছুর কারণ); করণাধিপাধিপঃ (জীবাত্মা [জীব] ইন্দ্রিয়দের প্রভু, আর তিনি জীবাত্মার প্রভু); কশ্চিৎ অস্য জনিতা চ ন (তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি); অধিপঃ চ ন (আবার তাঁর নিয়ন্তাও কেউ নেই)।

সরলার্থ: এই জগতে তাঁর প্রভু বলে কেউ নেই, তাঁকে শাসন করতে পারে এমন কেউ নেই, আবার এমন কোন রূপ বা চিহ্ন নেই যা দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা যায়। তিনিই সবকিছুর কারণ। যে জীবাত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তিনি সেই জীবাত্মারও প্রভু। তাঁর কোনও স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নেই।

ব্যাখ্যা: 'তস্য লিঙ্গং ন।' কোন রূপ বা চিহ্ন দিয়ে ব্রহ্মকে চিহ্নিত করা যায় না। বেদান্ত শাস্ত্রে প্রায়ই বলা হয়—'পাহাড়ে ধোঁয়া দেখা গেলেই বুঝতে হবে কাছেপিঠে কোথাও আগুন আছে।' আগুন চোখে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে; তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়—পাহাড়ে আগুন আছে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এরকম কোন চিহ্ন আছে কি? না। এইরকম কোন চিহ্ন দিয়ে ব্রহ্মকে চেনা যায় না।

'করণ' বলতে ইন্দ্রিয়গুলি বোঝায়। ইন্দ্রিয়গুলির অধিপতি কে (করণ অধিপঃ)? জীবাত্মা। আমরা যদি কোন কিছু দেখতে চাই তো সেক্ষেত্রে চোখ খুলি। আবার দেখতে না চাইলে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা ইন্দ্রিয়গুলির অধিপতি। কিন্তু সে শুধু সীমিত অর্থে। কারণ এই জীবাত্মার প্রভু আবার ব্রহ্ম। তাই ব্রহ্ম (করণ-অধিপ-অধিপঃ) ইন্দ্রিয়ের অধিপতির অধিপতি। সার কথা হচ্ছে—ব্রহ্মই আদিকারণ।

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতঃ।
দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্॥১০

অন্বয়: যঃ একঃ দেবঃ (তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর); [তবু]; তন্তুনাভঃ তন্তুভিঃ ইব (জালের ভিতর মাকড়সার মতো); স্বভাবতঃ (আপন স্বভাববশত); প্রধানজৈঃ (নাম, রূপ

এবং কর্মের আবরণে [মায়া বা প্রকৃতির সৃষ্টি]); স্বম্‌ (নিজেকে); আবৃণোৎ (ঢেকেছেন); সঃ (সেই ঈশ্বর); নঃ ব্রহ্মাপ্যয়ং দধাতু (আমাদের ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করুন)।

সরলার্থ: মাকড়সা যেমন জালের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরও তেমনি মায়ার সৃষ্টি নাম, রূপ এবং কর্মের আবরণে অনায়াসে নিজেকে ঢেকে রাখেন। মায়া বলতে নামের মায়া, রূপের মায়া, কর্মের মায়া বোঝায়। সেই ঈশ্বর কৃপা করে ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করুন।

ব্যাখ্যা: মাকড়সার আর এক নাম 'তন্তুনাভ', কারণ তার নাভিতে তন্তু থাকে। মাকড়সা যেমন নিজের তন্তু দিয়ে নিজের জাল তৈরি করে, ব্রহ্মও তেমনি নিজের মায়া দিয়ে নাম এবং রূপ সৃষ্টি করে এই বিশ্বকে প্রকাশ করেন। 'প্রধানজৈঃ', মানে মায়া, প্রকৃতি বা অবিদ্যা শক্তির দ্বারা। 'স্বভাবতঃ' অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে, অনায়াসে। কোন কারণের দ্বারা বাধ্য হয়ে যে ব্রহ্ম এই জগৎকে প্রকাশ করেন তা নয়; ইচ্ছামাত্র, অনায়াসেই তিনি তা করেন কারণ ব্রহ্ম এবং মায়া অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ 'মায়া' না বলে 'কালী' বলতেন। ব্রহ্ম এবং মায়া যে অভিন্ন তা বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তি, দুধ এবং তার ধবলত্ব, জল এবং তার আর্দ্রতার দৃষ্টান্ত দিতেন। বাস্তবিক, আগুনকে কি তার দাহিকাশক্তি থেকে আলাদা করা যায়? দুধকে তার ধবলত্ব থেকে অথবা জলকে তার আর্দ্রতা থেকে কি আলাদা করা যায়? যায় না। কারণ তারা অভিন্ন। সেইরকম ব্রহ্ম এবং কালীও অভিন্ন। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ সাপের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন—-কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার নড়তে-চড়লেও সাপ। দুটি অবস্থাতেই সেই এক সাপ। তেমনি ব্রহ্ম যখন অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয় তখন তিনি যেন শিব, আর যখন ব্যক্ত, সক্রিয় তখন তিনি কালী।

'আবৃণোৎ'—ব্রহ্ম নিজেকে আবৃত করেন। অর্থাৎ নাম এবং রূপের আড়ালে ব্রহ্ম নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। আপনিই ব্রহ্ম; কিন্তু দেহ এবং নামের আড়ালে আপনি নিজের প্রকৃত স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছেন। আমরা সকলেই ব্রহ্ম, কিন্তু কেমন করে যেন মায়ার ফাঁদে ধরা পড়েছি। 'সঃ নঃ ব্রহ্মাপ্যয়ং দধাতু', সেই পরমেশ্বর কৃপা করে আমাদের ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত করুন। আমরা যেন তোমাতে লীন হই, আমরা যেন তোমার সাথে এক হয়ে যাই। কথায় বলে সাগর নদীকে টানে, তাই নদী সাগর অভিমুখে ধেয়ে যায় এবং পরিণামে সাগরে গিয়ে মেশে। তেমনি ব্রহ্ম আমাদের আকর্ষণ করছেন এবং ব্রহ্মে লীন হওয়াই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়ে মিশলেই আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিসমাপ্তি। 'নাম-রূপ বিহায়', নাম এবং রূপ তখন পিছনে পড়ে থাকে। সাগরে মিশলে গঙ্গা আর নদী নয়, সাগর হয়ে যায়। তখন গঙ্গার আর আলাদা সত্তা থাকে না। সাগরের বিশেষ কোন অংশ দেখিয়েও তখন একথা বলা যাবে না যে 'এটি গঙ্গা'। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে

গেলে আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয় মুছে যায়। উপনিষদে কখনো কখনো 'ভূমা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভূমা মানে বৃহৎ। আমরা সকলেই বড় হতে চাই। এখন আমরা ছোট হয়ে আছি। ছোট এই অর্থে, এখন আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে মনে করি। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা যখন মুছে যায় তখন আমরা ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে যাই।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥১১

অন্বয়: একঃ দেবঃ (সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা); সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ (সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন); সর্বব্যাপী (সর্বব্যাপী); সর্বভূতান্তরাত্মা (সকলের অন্তরাত্মা); কর্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্মের ফলদাতা); সর্বভূতাধিবাসঃ (সকলকে পালন করছেন); সাক্ষী (দ্রষ্টা); চেতা (চৈতন্যদায়ক); কেবলঃ (নিরুপাধিক); নির্গুণঃ (গুণের অতীত); চ (এবং)।

সরলার্থ: তিনি অদ্বিতীয়, তবু তিনি সর্বভূতে নিহিত। তিনি সর্বব্যাপী, সকলের অন্তরাত্মা। তিনিই সকল কর্মের ফলদাতা, তিনিই সকলকে পালন করছেন, তিনিই চৈতন্যদায়ক, নিরুপাধিক এবং নির্গুণ ও মুক্ত।

ব্যাখ্যা: 'একঃ দেবঃ', ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এই উপনিষদ বারবার ব্রহ্মকে এইভাবেই সম্বোধন করছেন। 'দেবঃ' শব্দটির অর্থ জ্যোতির্ময়। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় এবং স্বয়ংজ্যোতি; এইজন্যই তাঁকে 'একঃ দেবঃ' বলা হয়েছে।

'গূঢ়ঃ' অর্থাৎ, প্রচ্ছন্ন। প্রায়ই বলা হচ্ছে ব্রহ্ম সর্বভূতের (সর্বভূতেষু) হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'দুষ্ট নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ, আর্ত নারায়ণ।' ভালোর মধ্যেও তিনি, মন্দের মধ্যেও তিনি। তবে ভালোর মধ্যেই তাঁর বেশি প্রকাশ। নিস্তরঙ্গ, কাকচক্ষু হ্রদের জলের একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু তরঙ্গায়িত, নোংরা জল হলে তার তলায় কি আছে কিছুই দেখা যায় না। তেমনি অসৎ ব্যক্তির চেয়ে সৎ ব্যক্তির মধ্যেই ব্রহ্মের বেশি প্রকাশ।

ব্রহ্ম 'সর্বভূতান্তরাত্মা', ব্রহ্মই সব বস্তুর সার, সকলের অন্তরতম সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা।' যখন দয়ার কথা বলি তখন মনে ধরে নিই আমি যেন সিংহাসনে বসে আছি আর কৃপা করে নীচুতলার মানুষগুলোকে কিছু দিয়ে তাদের কৃতার্থ করছি। না দিলেও পারতাম, তবে আমি মহৎ—তাই দিচ্ছি। দয়ার

মধ্যে এইরকম হামবড়া ভাব থাকে। কিন্তু ঈশ্বরবুদ্ধিতে যখন অন্যকে সেবা করি তখন আমি দীন, আমি যাঁর সেবা করছি তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছি। ঠিক ঠিক সেবা তাই পূজা হয়ে যায়। অন্যকে শুধু আমার সমান ভাবলেই চলবে না, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার মনোভাবও থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই বারবার বলেছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, অন্যকে সেবা করবার যে ঐতিহ্য আমাদের এককালে ছিল, তা থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি। মূল কথাটি এই যে সর্বভূতে আমাদের ব্রহ্মদর্শন করতে হবে।

'সর্বব্যাপী', অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বত্র আছেন। একবার জয়রামবাটীতে একজন ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই দেখে শ্রীমা সারদাদেবী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওকি! ওভাবে ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেললে কেন? যাও, ঝাঁটাটিকে ভালোভাবে রেখে এসো। ঝাঁটা স্থান পরিষ্কার করে। যার যা সম্মান তাকে তা দিতে হয়। জেনো ঐ ঝাঁটার মধ্যেও ব্রহ্ম আছেন।

'কর্মাধ্যক্ষঃ '। আমরা অনেক কিছু করি এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ করি। কিন্তু কে আমাদের এই কর্মফল দান করেন? ব্রহ্মই 'বিধাতা', তিনিই কর্মের ফল দেন। কাজ করলে আমরা মজুরি চাই। ব্রহ্মই আমাদের কাজের পারিশ্রমিক দেন।

'সাক্ষী', অর্থাৎ যিনি শুধু দেখেন। কেবল উপস্থিত থেকেই ব্রহ্ম সবকিছু ঘটাচ্ছেন। অথচ জগৎ-সংসারে যা ঘটছে তিনি তার সাক্ষী, দ্রষ্টা মাত্র। ভালো-মন্দ কোন ঘটনাই তাঁকে স্পর্শ করছে না। তিনি নির্লিপ্ত। সূর্য যেমন ভালো-মন্দ সকলকেই আলো দেয়, কিন্তু তাদের ভালো বা মন্দ কর্মের কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না, এই জগতের ক্ষেত্রেও ব্রহ্ম সেইরকম নির্লিপ্ত।

'চেতা' অর্থাৎ যিনি চৈতন্য দেন। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তা নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানেই তাঁকে ছোট করে ফেলা। তাঁর সম্পর্কে এইটুকুই ঠিক ঠিক বলা যায় যে তিনি শুদ্ধচৈতন্য, আর তাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য। এ যেন একটি প্রদীপ থেকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে নেওয়া।

'কেবলঃ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ একমাত্র বা শুধু। ব্রহ্ম 'একমাত্র' এই কারণে যে তিনি অনন্য—তাঁর আর দ্বিতীয় নেই। ব্রহ্মকে 'কেবলঃ' বলা হচ্ছে কারণ এছাড়া আর অন্য কোন ভাবে তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। তিনি যা—তিনি তাই। ব্রহ্মের কোন উপাধি নেই।।

'নির্গুণঃ'। সাধারণত কোন জিনিসকে আমরা তার গুণ দিয়ে চিনি। যেমন, আমরা বলি এটা ভালো, ওটা মন্দ, এটা কালো, ওটা সাদা, এটা লম্বা, ওটা বেঁটে ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ব্রহ্ম ব্রহ্মই। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ থেকেই অন্যান্য সব গুণের উৎপত্তি। এই তিন গুণের উৎস আবার 'প্রকৃতি' বা 'মায়া'।

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
মতাস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥১২

অন্বয়: যঃ (যিনি); বহুনাং নিষ্ক্রিয়াণাম্ একঃ বশী (বহু নিষ্ক্রিয় বস্তুর একমাত্র নিয়ন্তা); একং বীজং বহুধা করোতি (এক বীজকে বহুপ্রকার করেন); যে ধীরাঃ (সেইসব জ্ঞানীব্যক্তি যাঁরা); তম্ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি (তাঁকে নিজেদের মধ্যে দেখেন); তেষাং শাশ্বতং সুখম্ (তাঁদের শাশ্বত সুখ হয়); ইতরেষাং ন (অন্যদের হয় না)।

সরলার্থ: তিনি অদ্বিতীয়। তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা। তাঁরই প্রভাবে একটি বীজ থেকে বহু বীজের উৎপত্তি হয় (যেমন, পঞ্চভূত থেকে এই বিরাট বিশ্বের উদ্ভব)। যাঁরা প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ তাঁরা নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন। তাঁরাই চিরশান্তির অধিকারী হন, অন্যেরা নয়।

ব্যাখ্যা: আচার্য শঙ্কর শাস্ত্রকে ‘আদরবতী’ বলেছেন। আমাদের কিসে কল্যাণ হবে তা নিয়ে ঋষিদের চিন্তার অন্ত ছিল না। কোথায় আমাদের সমস্যা, কোথায় আমাদের অসুবিধা এ তাঁরা ভালোরকমই বুঝতেন; আর বুঝতেন বলেই তাঁরা একই কথা বারবার বলেছেন। এখানে তাই উপনিষদ আবার বলছেন ব্রহ্ম এক, বহু নয়। আমরা অনেক সময় নিজেদের অদ্বৈতবাদী বলে মনে করলেও আসলে আমরা একেশ্বরবাদী। তার কারণ আমরা হয়তো এক পরম সত্যে বিশ্বাস করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই পরম তত্ত্বের থেকে নিজেদের আলাদা বলেও মনে করি। আমরা ভাবি ঈশ্বর আমাদের থেকে আলাদা। কিন্তু যিনি প্রকৃত অদ্বৈতবাদী, তিনি তা মনে করেন না। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন আমরা সেই পরম তত্ত্ব। আমি মুখে বলছি ব্রহ্ম অনন্ত, সর্বব্যাপী, আর কাজের বেলায় নিজেকে ব্রহ্মের থেকে আলাদা ভাবছি—এ ভাবের ঘরে চুরি, এ অজ্ঞানতা। প্রকৃত জ্ঞান তখনি হবে যখন আমি বুঝব ব্রহ্মের সঙ্গে আমি অভিন্ন। আমরা যারা ভক্তিপথের পথিক, তারা সাধারণত নিজেদের ঈশ্বরের থেকে পৃথক বলে মনে করি। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক পাতিয়ে বলি, ‘আমি তোমার দাস’ অথবা ‘আমি তোমার সন্তান’। বেদান্ত আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, বাইরে ঈশ্বরকে খুঁজছ? ঈশ্বর বাইরে নেই, তিনি তোমার অন্তরে। তিনিই তোমার অন্তরাত্মা। অবশ্য ভক্ত হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ভালোবাসা এলে ভক্ত নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলে যান। ভক্ত আর ভগবান তখন একাকার। জ্ঞানের মধ্য দিয়েই হোক আর প্রেমের মধ্য দিয়েই হোক, ঐক্যের বোধ আনতেই হবে। এই বোধ না এলে মুক্তি নেই। দুঃখের বিষয় আমরা নিজেদের আলাদা ভাবতে, দুর্বল,

অসহায় ভাবতে ভালোবাসি। কিন্তু উপনিষদ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, নিজেকে দুর্বল ভেবো না, অক্ষম ভেবো না। তুমি অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করতে পার—শুধু নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখ। উপনিষদের বাণী একটাই—তুমি এবং ব্রহ্ম অভেদ।।

জীবাত্মাকে 'নিষ্ক্রিয়াণাম্' অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। এ আবার কি কথা? আমরা কি সত্যি সত্যি নিষ্ক্রিয়? হ্যাঁ, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাই। কারণ আমরা কাজ করছি। —এই ধারণাটাই অধ্যাস, অর্থাৎ একটা চাপানো জিনিস। স্বরূপত আমরা নিষ্ক্রিয়, কারণ আমরাই যে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্বদাই সাক্ষী। তিনি আছেন বলেই কর্মপ্রবাহ চলছে, কিন্তু তিনি নিজে কিছুই করেন না।

একটা বটগাছের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন দেখি তার কত অজস্র পাতা, কত শাখা-প্রশাখা,কতই না বৈচিত্র! কিন্তু সবই এসেছে ছোট্ট একটি বীজ থেকে। সেইরকম ব্রহ্মই সবকিছুর একমাত্র উৎস, একমাত্র বীজ (একং বীজ) এবং এই বীজই নাম-রূপের দ্বারা বহু (বহুধা) হয়েছে।

উপনিষদের প্রতিটি শব্দেই গভীর ব্যঞ্জনা, গম্ভীর রস। এইসব শব্দকে হালকাভাবে নিলে হবে না। যেমন—'ধীরাঃ'। 'ধীরাঃ' বলতে জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকেই বোঝায়। যাঁরা নিত্য অনিত্য বিচার করতে পারেন, যাঁরা সংযমী, যাঁরা সাধনা করেছেন এবং যাঁদের হৃদয় শুদ্ধ। 'অনুপশ্যন্তি'–এইরকম প্রজ্ঞাবান মানুষ দেখেন, উপলব্ধি করেন,অনুভব করেন। 'আত্মস্থম'—অন্তরাত্মাকে। এই ব্যক্তিরাই চিরশান্তির, চির আনন্দের অধিকারী। আমাদের সকলের জীবনেই কোন না কোন সময় আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আসতে না আসতেই সে আনন্দ উবে যায়। ভালো খাবার পেলে আমরা খুব খুশি কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণ? বস্তুত আমরা এমন আনন্দ চাই যা কখনো ফুরোবে না, যা নিত্য, শাশ্বত (শাশ্বতম্)। তাই উপনিষদ বলছেন যাঁরা ধীরা, যাঁরা সত্যিকারের জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করেন। 'ইতরেষাং ন', অন্যরা সেই আনন্দ পান না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আর পাঁচজনের থেকে একেবারেই আলাদা। আগুনের কাছে গেলে যেমন গায়ে তাপ লাগে, আর আপনি বুঝতে পারেন আপনি আগুনের কাছে এসেছেন,তেমনি মুক্ত পুরুষের কাছে। গেলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়। বোঝা যায় তিনি অ-সাধারণ।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥১৩

অন্বয়: নিত্যানাং নিত্যঃ ([যিনি] নিত্যের মধ্যে নিত্যত্ব দেন); চেতনানাং চেতনঃ (চেতন বস্তুর মধ্যে চেতনা); যঃ একঃ (যিনি এক); বহুনাং কামান্ বিদধাতি (মানুষের আকাঙ্ক্ষিত কাম্যবস্তু দান করেন); তৎ কারণম্ (সকল কারণের কারণ); সাংখ্যযোগাধিগম্যং দেবম্ (একমাত্র জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়); জ্ঞাত্বা ([তাকে] জেনে); সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে ([মানুষ] [অজ্ঞান) জনিত সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়)।

সরলার্থ: নিত্যের নিত্যত্ব, চেতনের চেতনা—সবই ঈশ্বরের দান। তিনি একা হয়েও সকলের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। কেবলমাত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়েই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়; আর এই উপলব্ধি হলে মানুষ অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়।

ব্যাখ্যা: 'বহুনাং কামান্ বিদধাতি।' বাসনা থাকাতেই এই সংসারে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়। অর্থ, সাফল্য, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য—এ সবই আমাদের চাই। কিন্তু কার সাহায্যে আমাদের বাসনাগুলি পূর্ণ হয়? ব্রহ্মের সাহায্যে। 'বিদধাতি', তিনিই দেন। উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার সামর্থ্য তিনিই আমাদের দেন।

'সাংখ্য' মানে এখানে জ্ঞান। জ্ঞানের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে জানা যায়। বিশেষ কিছু সাধনের মধ্য দিয়ে গেলে তবেই তাঁকে অনুভব করা যায়। তিনিই সাধকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। 'যোগ' মানে যুক্ত করা। জ্ঞানকে যোগ বলা হয়েছে তার কারণ জ্ঞান জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। মনকে সংযত এবং একাগ্র করতে পারলে এমন গভীর, দুর্লভ সব অনুভূতি হয় যা সাধারণভাবে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এখন আমরা নিজেদের সম্পর্কে কতটুকু জানি? সমুদ্রে ভেসে থাকা হিমশৈল-র বেশিরভাগটাই যেমন জলের তলায় লুকিয়ে থাকে, তেমনি আমাদের চেতনার খুব সামান্য অংশই আমাদের চোখে পড়ে। এই অন্তর্নিহিত চৈতন্য কত গভীর, কত মহান তার কোন ধারণাই আমাদের নেই। জ্ঞান হলে তখনি তা হৃদয়ঙ্গম হয়।

'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ'। ব্রহ্মকে জেনেই মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এখানে 'দেব' শব্দের অর্থ 'জ্যোতির্ময়'। জ্ঞানকেও প্রায়শই আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। আমরা প্রার্থনা করি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'—অন্ধকার থেকে আমাদের আলোয় নিয়ে চল, অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর করে আমাদের জ্ঞানের পথে নিয়ে চল। ব্রহ্মকে 'দেব' এবং 'জ্যোতি'—দুই-ই বলা হয়েছে কারণ তিনি স্বয়ংপ্রভ। 'পাশ' বা বন্ধন আসে তখনি যখন আমি ব্রহ্ম থেকে নিজেকে পৃথক বলে ভাবি, যখন। আমি নিজেকে সকলের থেকে ভিন্ন বলে মনে করি। এই ভ্রান্তিই আমাদের সকল দুঃখের মূল। আপনার সামনে যদি একটা

পরদা ঝোলে, তবে তার পিছনে কি আছে। আপনি দেখতে পাবেন না; কিন্তু পরদাটি যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অন্যদিকের সবকিছুই আপনি দেখতে পাবেন। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা হল সেই পরদা যা এখন আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে দিচ্ছে না। উপনিষদ এই অবিদ্যা দূর করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আর বলছেন, জেনো তুমিই ব্রহ্ম। এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। তখন সে 'জীবন্মুক্ত' অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই মুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আপ্তকাম সাধকের শরীরের মৃত্যু হয় না। প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর থাকে। প্রারব্ধ কর্ম কি? প্রারব্ধ কর্ম মানে যে কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে। একটা চাকা ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন কিছুদূর গিয়ে তবে সেটা থামে, তেমনি প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, দেহের প্রতি তাঁর তখন আর কোন টান বা আসক্তি থাকে না। তখন তিনি মুক্ত। হাঁসের পালক যেমন জলে ভেজে না, তেমনি এই সংসারের কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাই জীবন্মুক্ত পুরুষকে স্পর্শ করে না। হ্যাঁ, জগতে তিনি আছেন বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত সাক্ষী, দ্রষ্টা হয়ে আছেন। এখন সংসারে বড় বেশি আসক্ত বলে আমরা জীবনটাকে ঠিকমতো উপভোগ করতে পারি না। কিন্তু জীবন্মুক্ত হলে, দ্রষ্টার মতো থাকতে পারলে এই জগৎই মজার কুটি হয়ে ওঠে। তখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥১৪

অন্বয়: তত্র (সেখানে [অর্থাৎ, ব্রহ্ম যেখানে]); সূর্যঃ ন ভাতি (সূর্য কিরণ দেয় না); ন চন্দ্র তারকম্ (চাঁদ এবং তারারাও নয়); ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (বিদ্যুৎলতাও নয়); অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (এই অগ্নির কথাই নেই); তং ভান্তম্ এব (যখন তিনি দীপ্যমান); সর্বম্ অনুভাতি (অন্য সবকিছুও দীপ্তি পায়); তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি (তার দীপ্তির দ্বারা এই সব প্রকাশিত হয়)।

সরলার্থ: ব্রহ্মের উপস্থিতিতে সূর্য কিরণ দেয় না, চাঁদ আলো দেয় না, তারারা এবং বিদ্যুৎলতাও নিষ্প্রভ, আগুনের তো কথাই নেই। তাঁর দীপ্তি প্রকাশ পেলে তখন সবকিছুই দীপ্যমান হয়। তাঁর আলোতেই সবকিছু আলোকিত।

ব্যাখ্যা: সূর্য কী বিশাল, কী বিরাট! সকলকেই সে আলো দেয়। কিন্তু পরমাত্মাকে সে আলোকিত করতে পারে না, বরং সূর্যই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে আলো পায়। চাঁদ এবং তারাদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। রাতের অন্ধকারে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সবকিছু আলোয় ঝলমল করে ওঠে; একমাত্র ব্রহ্মই তার ব্যতিক্রম। এমনিতে বিদ্যুতের কত শক্তি, কিন্তু ব্রহ্মের সাহায্য ছাড়া সে আলো দিতে পারে না—সে দ্যুতিহীন। বস্তুত যা কিছু আলোকপ্রদ, তাদের সকলের আলোর উৎসই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বাদ দিলে তারা সকলেই নিষ্প্রভ। সূর্যই বলি, চাঁদই বলি, আর গ্রহ-নক্ষত্রই বলি, সকলের উৎস, আশ্রয় এবং অন্তরতম সত্তাই ব্রহ্ম। তিনিই সবকিছুর পরম গতি। তাঁর কাছ থেকেই সবকিছু আসে, শেষে তাঁর কাছেই সবকিছু ফিরে যায়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অসাধারণ রচনা। এত সুপরিকল্পিত এই বিশ্ব যে সবকিছুই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। প্রতিদিন ঠিক সময়ে সূর্য ওঠে, প্রতিদিনই আপন ছন্দে সে অস্ত যায়। বাস্তবিক, এ সৃষ্টি বড়ই সুন্দর। কিন্তু সৃষ্টি যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, এটা ভুললে চলবে না যে সবকিছুই ব্রহ্মের উপর ন্যস্ত বা অধ্যস্ত। উপনিষদ বলছেন, মনে রেখো, তুমিই সেই ব্রহ্ম, সেই পরম সত্তা। তুমি নিজের সম্পর্কে যা ভাব তা ভুল; তুমি দেহ নও। যে পরম সত্তা এই জগৎরূপে প্রকাশিত, তুমিও স্বরূপত সেই। বড়ও তিনি, ছোটও তিনি, ভালোও তিনি, মন্দও তিনি। ব্রহ্মই সব হয়েছেন। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ সত্তা। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে ব্রহ্মই আপেক্ষিক, বৈচিত্রপূর্ণ এই অনিত্য জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। এইজন্যই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। একই বহু হয়েছেন। এক এবং বহু আলাদা নয়,একই সত্তা। তবে যেটি আমাদের মনে রাখা দরকার সেটি এই-—এক ছাড়া বহু হতে পারে না।

একো হংসঃ ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিতা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥১৫

অন্বয়: অস্য ভুবনস্য মধ্যে (এই জগতের মধ্যে); একঃ হংসঃ (কেবল একটি হংসই আছেন [অর্থাৎ, পরমাত্মা]); সঃ এব (তিনিই); সলিলে সন্নিবিষ্টঃ (জলে [যা দেহে রূপান্তরিত]

আছেন); অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে); তম্ এব বিদিত্বা (তাঁকে জেনে); মৃত্যু অতি-এতি (মৃত্যুকে অতিক্রম করে); অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে (মুক্তির জন্য অন্য কোনও পথ নেই)।

সরলার্থ: এই জগতে একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। দেহ জল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং পরমাত্মা এই দেহরূপ জলে অগ্নিরূপে বিরাজ করছেন। অগ্নিরূপে তিনি অন্তরের অবিদ্যা দহন করেন। তাঁকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মুক্তির আর অন্য পথ নেই।

ব্যাখ্যা: যিনি হনন করেন, তিনিই হংস (যঃ হন্তি সঃ হংসঃ)। কি হনন করেন? অবিদ্যা। জ্ঞানের দ্বারাই আমরা অজ্ঞানতা নাশ করি। কোন্ জ্ঞান? আমাদের স্বরূপের জ্ঞান। কারণ আত্মজ্ঞানই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। বেদান্ত বলেন, তুমি অনেক কিছু জানতে পার—কিন্তু নিজের আত্মাকে না জানলে তুমি কখনই সুখী হবে না। মুণ্ডক উপনিষদ এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু হচ্ছে—'এমন কিছু আছে কি যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়?' এ জগতের সবকিছু জানা যে অসম্ভব তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। বাস্তবিক, এ পৃথিবীতে জানার কি শেষ আছে? জ্ঞান যে এক অনন্ত সমুদ্র। বড়জোর তার দু-চার ফোঁটা জল আমরা পেতে পারি। কিন্তু উপনিষদ বলছেন, নিজের আত্মাকে জানলে, ব্রহ্মকে জানলে অন্য সবকিছু আপনিই জানা হয়ে যায়। যেমন মাটি দিয়ে হয়তো কেউ কুকুর গড়েছে, হাতি গড়েছে আবার বাঘও গড়েছে। দেখতে আলাদা হলেও সবগুলোই এক উপাদান অর্থাৎ মাটি দিয়েই তৈরি। উপাদানকে জানাই আসল কথা। সেটি জানতে পারলে নাম-রূপের আর তত গুরুত্ব নেই।

ব্রহ্মের আরেক নাম অগ্নি। কারণ ব্রহ্ম দহন করেন অর্থাৎ, পুড়িয়ে দেন। কি পুড়িয়ে দেন? যা অশুদ্ধ, যা মলিন তাই পুড়িয়ে দেন। আর অজ্ঞানতাই হল নিকৃষ্ট মলিনতা। সলিল' মানে জল। কিন্তু এখানে মানুষের শরীরকে বোঝাচ্ছে। দেহকে সলিল বলা হয় এইজন্য যে দেহে পঞ্চভূতের মধ্যে জলেরই প্রাধান্য। 'সলিলে'—এর আরেকটি অর্থ 'বিশুদ্ধ হৃদয়ে'। সেই হৃদয়ই শুদ্ধ যেখানে অহংবুদ্ধির লেশ নেই। এক অহংবোধ থেকেই লোভ, অহংকার, স্বার্থপরতা, ক্রোধ ইত্যাদি মলিনতার জন্ম। ধর্মজীবনে উন্নতি করতে গেলে মনকে শুদ্ধ ও সংযত করতে হবে।

'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি।' ব্রহ্মকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মকে নিজের আত্মা বলে জানা। আমিই ব্রহ্ম—এই সত্য জানা। এইভাবেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে মৃত্যু বলে কিছু নেই। মৃত্যু আছে; তবে তা দেহের। রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া দেহের বিনাশ হবেই। মাটি থেকেই দেহের জন্ম আবার একদিন মাটিতেই সে মিশে যাবে। কিন্তু আপনি তো দেহ নন, আপনি পরমাত্মা। তাই আপনার বিনাশ নেই। আপনার যখন এইরকম একটা অটল প্রত্যয় হবে, তখন

আপনি মৃত্যুর ঊর্ধ্বে চলে যাবেন। কিন্তু একমাত্র জ্ঞানলাভ করলেই এই প্রত্যয় আসে। মৃত্যুকে জয় করবার, মৃত্যুকে এড়াবার আর অন্য কোন পথ নেই।

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনি-
র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥১৬

অন্বয়: সঃ বিশ্বকৃৎ (তিনি এই জগতের স্রষ্টা); বিশ্ববিৎ (এই জগতের সবকিছুই তিনি জানেন); আত্মযোনিঃ (তিনি স্বয়ম্ভু); জ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ); কাল-কারঃ (কালস্রষ্টা); গুণী (শুদ্ধ); সর্ববিৎ যঃ (যিনি সর্বজ্ঞ); প্রধান-ক্ষেত্র-পতিঃ (অবিদ্যা ও জীবাত্মার প্রভু); গুণেশঃ ([সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ] এই তিন গুণের নিয়ামক); সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ (অস্তিত্ব, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ)।

সরলার্থ: তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, এই জগতের সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি স্বয়ম্ভু এবং সর্বজ্ঞ। তিনিই কালের স্রষ্টা। তাঁর কোন মলিনতা নেই। তিনি সর্ববিদ্। অবিদ্যা এবং জীবাত্মা (অথবা প্রকৃতি এবং পুরুষ) উভয়কেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। (প্রকৃতি-সঞ্জাত) সকল গুণের তিনিই প্রভু। তিনিই জীবাত্মার অস্তিত্ব, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে কত বিশেষণই না প্রয়োগ করা হল; তবু কোন বিশেষণই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ ব্রহ্ম চিন্তার অতীত, বাক্যের অতীত। তিনি অনির্বচনীয়। কিন্তু এইসব বিশেষণ ব্যবহার না করলেও আবার আমরা ব্রহ্ম সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারব না।

'কাল-কারঃ' অর্থাৎ, ব্রহ্ম কালের স্রষ্টা। আমাদের মধ্যে সময়ের যে ধারণা তাও তাঁরই সৃষ্টি। সময়ের বোধ না থাকলে কাজকর্ম কিছুই হয় না। 'গুণী'—তিনি মালিন্যরহিত, শুদ্ধ। 'গুণী' মানে আবার গুণসম্পন্নও হয়। স্বরূপত ব্রহ্ম নির্গুণ। কিন্তু তাঁর উপর নিতান্তই যদি কোন গুণ আরোপ করতে হয় তো বলতে হয়—তাঁর গুণ হল জ্ঞান, শুদ্ধতা এবং প্রেম।

'সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ। তিনিই সংসার থেকে আমাদের মুক্তির (মোক্ষ) কারণ (হেতুঃ)। একমাত্র তিনিই এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন। এই জগতের এক নাম 'সংসার'। কারণ এই জগৎ প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, এ জগৎ নিত্য নয়। বহতা নদীর মতো সংসারের ধারাও অনবরত বয়েই চলেছে। আর আমরা সেই স্রোতে

ভেসে চলেছি। তিনিই আমাদের এই সংসারে রেখেছেন; তাই তিনিই আমাদের বন্ধনের কারণ, আবার এই বন্ধন ঘুচিয়ে তিনিই আমাদের মুক্তি দেন। তিনি তাই মুক্তিরও কারণ।

আচার্য শঙ্করের মতে, আপনি যদি মুক্তি চান তবে ব্রহ্মের মধ্য দিয়েই তা পেতে হবে। এই বিশেষ মাহাত্ম্যের জন্যই ব্রহ্মের কথা বারবার বলা হচ্ছে। উপনিষদে একই কথা বারবার ঘুরেফিরে আসে। কিন্তু তারও প্রয়োজন আছে। আচার্য শঙ্কর এই পুনরাবৃত্তি সমর্থন করে বলছেন—'সর্ববিৎ' (সর্বজ্ঞ) শব্দটি ব্রহ্ম সম্পর্কে আগেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শ্লোকে আবার 'বিশ্বকৃৎ', 'বিশ্ববিৎ', 'আত্মযোনিঃ' এবং 'জ্ঞঃ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। শঙ্করের মতে, এগুলি 'প্রপঞ্চ' বা পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এ-জাতীয় পুনরাবৃত্তির দরকার আছে।

এই শ্লোকে ব্রহ্মকে 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ' বলা হয়েছে। 'প্রধান' হল জগতের অব্যক্ত অবস্থা আর জীবাত্মা হচ্ছে 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। ব্রহ্ম উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি 'প্রধান-ক্ষেত্র-পতিঃ'। ব্রহ্ম আবার 'গুণেশঃ অর্থাৎ গুণের অধিপতি। গুণের উৎস মায়া বা অবিদ্যা; তাই গুণ আমাদের বদ্ধ করে। কিন্তু ব্রহ্ম যেহেতু গুণেরও নিয়ামক, তাই তিনি আমাদের বন্ধনও ঘুচিয়ে দিতে পারেন। তাই শঙ্কর সিদ্ধান্ত করেছেন, ব্রহ্ম 'সংসার-মোক্ষ -স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ কারণম্', অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্ব, বন্ধন এবং মুক্তি ব্রহ্মের উপরই নির্ভর করছে।

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতে নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়॥১৭

অন্বয়: সঃ (ঈশ্বর); তন্ময়ঃ (পরমাত্মা); অমৃতঃ (অমর); ঈশসংস্থঃ (ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রভুত্ব করেন [অর্থাৎ, তিনিই এই জগৎ শাসন করেন]); জ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ); সর্বগঃ (সর্বব্যাপী); অস্য ভুবনস্য গোপ্তা (এই জগতের রক্ষাকর্তা); যঃ নিত্যম্ এব (যিনি নিত্য); অস্য জগতঃ ঈশে (এই জগৎকে শাসন করেন); ঈশনায় অন্যঃ হেতুঃ ন বিদ্যতে (জগৎ শাসন করার আর অন্য কারণ নেই)।

সরলার্থ: তিনিই অমর পরমাত্মা, এই জগৎ শাসন করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং জগতের রক্ষক। তিনি শাশ্বত, নিত্য এবং সবকিছুর কারণ। তিনি ছাড়া এই জগতের আর কোন নিয়ামক নেই।

ব্যাখ্যা: 'ঈশসংস্থঃ', তিনি আপন কর্তৃত্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত; তাঁর উপর প্রভুত্ব করার কেউ নেই। তিনি নিজেই নিজের প্রভু। তিনি স্বরাজ—আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এই জগতের রাশ তাঁরই হাতে। 'ন অন্যঃ হেতুঃ বিদ্যতে ঈশনায়', তিনি ছাড়া এই জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বিতীয় কোন শক্তি নেই। কেন? কারণ কেবল তিনিই আছেন। একা। তিনি অদ্বিতীয়। তিনিই এই জগৎ হয়েছেন। তিনি স্বরাট্। বড়, ছোট, ভালো, মন্দ সব তিনিই হয়েছেন। তিনিই স্রষ্টা। আবার তিনিই বিনাশ করেন। তিনিই সবকিছুর উৎস এবং কারণ। তাঁর কর্তৃত্ব নিত্যকালের। এই নয় যে এখন তিনি সর্বেসর্বা। কিছুকাল পরে তাঁর পদে অন্য কেউ প্রতিষ্ঠিত হবেন। তিনি নিত্য, শাশ্বত, ত্রিকাল অবাধিত।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'তন্ময়' শব্দটির দুই রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, 'জগন্ময়'। দুই, 'জ্যোতির্ময়'! জগন্ময় অর্থাৎ জগৎজোড়া, সর্বব্যাপী। আর 'জ্যোতির্ময়' অর্থাৎ দীপ্তিমান। শঙ্করাচার্য দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণের পক্ষপাতী।

আগেই (এই অধ্যায়ের ১৪নং শ্লোকে) বলা হয়েছে যে সব জ্যোতির্ময় বস্তুই ব্রহ্মের থেকে আলো পায়। কারণ ব্রহ্মই জ্যোতির জ্যোতি। 'জ্যোতির্ময়'-কে 'তন্ময়' শব্দের অর্থ হিসেবে গ্রহণ করলে বর্তমান শ্লোকের সঙ্গে পূর্ববর্তী শ্লোকের সামঞ্জস্য হয়। 'অমৃত' শব্দের অর্থ আমরা জানি। অমৃত মানে মৃত্যুহীন। যাঁর মৃত্যু নেই, তার আবার জন্মও নেই। ব্রহ্ম অজ ও অমর। 'ঈশসংস্থ' অর্থাৎ সর্বময় কর্তৃত্ব। ব্রহ্ম নিজের কর্তৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি তাঁর মহিমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সেইভাবেই তিনি জগৎ শাসন করেন। 'জ্ঞ' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। ব্রহ্ম আবার 'সর্বগ', অর্থাৎ সর্বত্রগামী বা সর্বব্যাপী। তিনিই এ জগতের রক্ষাকর্তা, তাই তাঁকে 'গোপ্তা' বলা হয়েছে।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥১৮

অন্বয়: যঃ (যিনি [অর্থাৎ, ঈশ্বর]); পূর্বম্ (সৃষ্টির পূর্বে); ব্রহ্মাণম্ ([চতুর্মুখ] ব্রহ্মাকে); বিদধাতি (সৃষ্টি করেন); যঃ বৈ চ (এবং যিনি); বেদান্ প্রহিণোতি (বেদসমূহ প্রেরণ করেন (উপহার দেন]); তস্মৈ (তাঁকে [ব্রহ্মাকে]); মুমুক্ষুঃ ([আমি] মুক্তি কামনা করি); আত্মবুদ্ধি প্রকাশ (আত্মজ্ঞান প্রকাশক); তং হ দেবম্ (সেই জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরে); শরণম্ অহং প্রপদ্যে (আমি শরণ নিচ্ছি)।

সরলার্থ: তিনি প্রথম ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে বেদসমূহ উপহার দেন। একজন মুমুক্ষু হিসাবে আমি সেই আত্মজ্ঞান-প্রকাশক জ্যোতিস্বরূপের শরণ নিচ্ছি।

ব্যাখ্যা: এই জ্ঞান প্রথমে তিনি ব্রহ্মাকে দেন। ব্রহ্মার আরেক নাম 'প্রজাপতি' অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ। তাঁকে আবার পিতামহ বলা হয়। ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ কল্পনা করা হয়েছে। যেন এক একটি মুখ দিয়ে তিনি এক একটি বেদ আবৃত্তি করেন। ব্রহ্মের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান আবার ব্রহ্মা বেদ তথা উপনিষদের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

'শরণম্ অহং প্রপদ্যে', আমি আপনার শরণাগত। আমরা মুক্তি চাই তাই এই প্রার্থনা। আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের লক্ষ্য। জগতে জানবার জিনিস হয়তো আরও অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সে জ্ঞান মোক্ষ দিতে পারে না। মুক্তি দিতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞান।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন: ব্রহ্ম বন্ধন ও মুক্তি দুয়েরই কারণ। কাজেই মুক্তিলাভ করতে গেলে আপনাকে ব্রহ্মের কৃপা চাইতেই হবে। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্ম প্রথমে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন এবং শিক্ষার জন্য তাঁকে বেদসমূহ দান করেন। একমাত্র ব্রহ্মই আমাদের মনে আত্মার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। অতএব মুক্তি পেতে হলে তাঁর করুণালাভ করা চাই-ই চাই।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥১৯

অন্বয়: নিষ্কলম্ (নিরাকার); নিষ্ক্রিয়ম্ (নিষ্ক্রিয়); শান্তম্ (অনাসক্ত বা বিদ্বেষশূন্য); নিরবদ্যম্ (অনিন্দ্য); নিরঞ্জনম্ (অপাপবিদ্ধ); অমৃতস্য (অমৃতের বা মুক্তির); পরম্ (শ্রেষ্ঠ); সেতুম্ (সেতু); দগ্ধেন্ধনম্ অনলম্ (ধোঁয়াহীন আগুনের); ইব (মতো)।

সরলার্থ: তাঁর কোন আকার নেই, কোন কর্ম নেই, কোন আসক্তি বা বিদ্বেষও নেই। তিনি অনিন্দ্য ও অপাপবিদ্ধ। অমৃতের পথে তিনিই শ্রেষ্ঠ সেতু। ধোঁয়াহীন আগুনের মতোই তিনি উজ্জ্বল। (সেইজন্যই আমি তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছি।)।

ব্যাখ্যা: তার কোন কলা বা অংশ নেই। অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়াতালি দিয়ে তবে আমাদের এই দেহ। ব্রহ্ম কিন্তু নিরবয়ব, এক অখণ্ড সত্তা। তিনি সমপ্রকৃতির, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় কোন বস্তুর মিশেল নেই। তিনি আবার 'নিষ্ক্রিয়ম্' অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। যেখানে বাসনা সেখানেই কর্ম। কোথাও যেতে গেলে বা কিছু পেতে হলে আমাকে সক্রিয় হতে হয়।

কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষী, দ্রষ্টা। তিনি সর্বদাই 'পূর্ণম্', পূর্ণ হয়ে আছেন। তাঁর কামনাও নেই, শরীরও নেই।

'শান্তম্', সর্বদা শান্ত এবং নির্বিকার। যেখানেই আসক্তি, ঘৃণা, দম্ভ এবং অহঙ্কার আছে সেখানেই অস্থিরতা ও অসন্তোষ। ব্রহ্ম কিন্তু স্থির, শান্ত।

অমৃতত্বই আমাদের লক্ষ্য। আমরা জন্মমৃত্যুর পারে যেতে চাই। ব্রহ্মই সেই অমৃতত্বলাভের সেতু। শরীরের মৃত্যু হবেই। শরীরের যন্ত্রণা বা দুঃখ থাকবেই। কিন্তু দেহের মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়, শরীরের পরিবর্তন আমার সত্তাকে স্পর্শ করতে পারে না —এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার নামই অমৃতত্ব লাভ।

ব্রহ্মের সঙ্গে আগুনের তুলনা দিয়ে বলা হচ্ছে ব্রহ্ম সেই আগুন যে তার ইন্ধনকে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে (দগ্ধ-ইন্ধনম্ ইব অনলম্)। ব্রহ্ম যেন শুদ্ধ আগুন, তাতে এতটুকু ধোঁয়া নেই। উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন তার প্রকাশ। সে যেন আত্মতৃপ্ত। আগুনে প্রথমটায় কাঠ দিলে, সে যেন খিদেয় খেপে ওঠে। সে যেন আরও,আরও জ্বালানী চায়! কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলবার পর সেই আগুনকে অনেকটা শান্ত, তৃপ্ত দেখায়। তখন আর বেশি কাঠ দেবার দরকার হয় না। যেটুকু জ্বালানী তখনও অবশিষ্ট থাকে, আগুন শান্তভাবে সেটুকুই পোড়াতে থাকে। আমরা যেন প্রথম দিককার সেই ক্ষুধার্ত আগুন। আমাদের বাসনার অন্ত নেই। এক বাসনা থেকে অন্য বাসনায় আমাদের মন নিরন্তর ছুটে চলে। আমরা চির অতৃপ্ত। কিন্তু ছোটখাট জিনিস চাইতে চাইতে একটা সময় আসে যখন আমাদের মনে সবচেয়ে বড় জিনিস পাবার বাসনা জাগে। কি সেই পরম বাসনা? আত্মজ্ঞানের বাসনা। যখন জানতে পারলাম আমি কে, যখন জানতে পারলাম আমিই ব্রহ্ম, তখন আমার অবস্থা সেই আগুনের মতো যার ইন্ধনের আর কোন প্রয়োজন হয় না। বাসনামুক্ত হওয়ায় আমি তখন 'আত্মতৃপ্ত', নির্ধূম আগুনের মতোই তখন আমি শান্ত।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, ব্রহ্মের কিছু চাওয়ার নেই। তাই কাজ করারও দরকার নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তিনি প্রশান্ত। কোন কিছুর জন্যই তার নিন্দা করা যায় না। তাঁতে এতটুকু মলিনতা নেই, তিনি নিরঞ্জন।

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তথা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥২০

অন্বয়: মানবাঃ যদা (যখন মানুষ); আকাশম্ (আকাশকে); চর্মবৎ (চর্মের ন্যায়); বেষ্টয়িষ্যন্তি (আবৃত করতে পারবে); তদা (তখন); দেবম্ (জ্যোতির্ময় ঈশ্বরকে); অবিজ্ঞায় (না জেনে);

দুঃখস্য অন্তঃ ভবিষ্যতি (সকল দুঃখের অবসান হবে)।

সরলার্থ: মানুষের দেহ চামড়া দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সেইভাবে চামড়া দিয়ে কেউ কি কোনদিন আকাশকে ঢাকতে পারে? এমন জিনিস কল্পনাও করা যায় না। এমন অসম্ভব ঘটনা যদি কখনো ঘটে, কেবল তখনি বলা যাবে যে ব্রহ্মকে না জেনেও মানুষ আনন্দের অধিকারী হতে পারে।

ব্যাখ্যা: আকাশকে কি চামড়া দিয়ে ঢাকা যায়? অসম্ভব। এটা যেমন অবাস্তব এবং অসম্ভব ঠিক তেমনি আত্মাকে না জেনে সুখী হতে চাওয়াও আকাশকুসুম কল্পনা। এর অর্থ এও হয় — যেভাবে চামড়াকে হাত দিয়ে ধরা যায় সেভাবে আকাশকে ধরা যায় না। আকাশকে মুঠোয় আনা যেমন অসম্ভব তেমনি আত্মজ্ঞান ছাড়া দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানোও অসম্ভব। এইসব শ্লোকের মাধ্যমে উপনিষদ আমাদের আত্মজ্ঞান লাভের প্রেরণা দিচ্ছেন, উদ্বুদ্ধ করছেন যাতে জ্ঞানলাভের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি। এটা তো ঠিক, আমরা সকলেই আনন্দ চাই,সুখী হতে চাই। কিন্তু কিভাবে সুখী হব? তার উত্তরে উপনিষদ বলছেন, একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করেই তুমি চিরসুখী হতে পার,অন্য কোন রাস্তা নেই।

শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে প্রশ্ন তুলেছেন, একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভকেই মুক্তির পথ বলা হয়েছে কেন? কেন এই একঘেয়েমি? অন্য কোনভাবে মুক্তি লাভ করা যাবে নাই বা কেন? শঙ্কর নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যই আমাদের বারবার জন্মাতে হয়। জন্মমৃত্যুর এই পরম্পরা অন্তহীন দুঃখ ডেকে আনে। জন্মালে যে বারবার মানুষ হয়েই জন্মাব, তার নিশ্চয়তা কি? বন্যজন্তু, পাখি অথবা কীটপতঙ্গ হয়েও তো জন্মাতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি চরিত্র অনুযায়ী আমাদের দেহ হয়। দুর্দমনীয় কামনা এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমরা বন্যপশু হয়েই জন্মাব। যদি নির্বোধ হই, তবে কীটপতঙ্গরূপে জন্ম নেব। আবার আত্মসংযম অভ্যাস করে করে যদি চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে পারি তাহলে মানুষরূপেই জন্ম নেব। মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ কারণ একমাত্র এই মনুষ্যজন্মেই আমরা সদসৎ বা 'নেতি নেতি' বিচার করতে পারি, ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে আত্মজ্ঞানের সাধনায় একাগ্র হতে পারি। পরিণামে অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে আমরা ধন্য হয়ে যাই।

আত্মা সর্বদাই আমাদের অন্তরে আছেন। শুধু অজ্ঞানতার জন্য তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। যেমন, আলো এনে আমরা অন্ধকারকে দূর করি, ঠিক তেমনিই জ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানতাকে দূর করতে হবে। জ্ঞান হলে বুঝব আমিই পরমাত্মা। আর তখনি মুক্তি, জন্মমৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে মুক্তি। এই অবস্থা লাভ করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে

হবে,সর্বদা বিচার করে চলা, সংযম অভ্যাস, ধ্যানধারণা ও নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করার তৈলধারাবৎ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

তপঃপ্রভাবাদ্ দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্॥২১

অন্বয়: শ্বেতাশ্বতরঃ (শ্বেতাশ্বতর ঋষি); তপঃপ্রভাবাৎ (তপস্যার প্রভাবে); দেবপ্রসাদাৎ (ঈশ্বরের কৃপায় [নিষ্কাম সেবার দ্বারা তুষ্ট করে]); চ (এবং); ব্রহ্ম (পরমাত্মাকে); বিদ্বান্ (উপলব্ধি করে); অথ (তারপর); অত্যাশ্রমিভ্যঃ (সাধুদের); ঋষিসংঘজুষ্টম্ (ঋষিদের দ্বারা সেবিত); পরমম্ (সর্বোচ্চ); পবিত্রম্ (পবিত্র তত্ত্ব); সম্যক্ (সরাসরি); প্রোবাচ (শিক্ষা দিয়েছিলেন)।

সরলার্থ: একদিকে কঠোর তপস্যা, অন্যদিকে ঈশ্বরের কৃপায় (নিষ্কাম সেবার দ্বারা তুষ্ট করে) শ্বেতাশ্বতর আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি আবার তাঁর জ্ঞান (তাঁরই মতো) বৈরাগ্যবান সাধুদের দান করেন। আগে সনকাদি ঋষিরাও এই পরম জ্ঞানের অন্বেষণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা: ধর্মজীবনে সফল হতে গেলে দুটি জিনিস একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রথমে 'তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধন, কঠোর পরিশ্রম এবং চেষ্টা। প্রাণপাত করে খাটতে হবে। তারপর 'দেব-প্রসাদ' অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা। প্রশ্ন হতে পারে—অদ্বৈতবাদী, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তাঁর কি হবে? তার উত্তরে বলা যায়, 'দেব' শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ,অদ্বৈতবাদীর ক্ষেত্রে 'দেব-প্রসাদ'-এর অর্থ ধরতে হবে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের কৃপা। এর আরও একটা অর্থ হতে পারে। সেটি হল—গুরুকৃপায়। কারণ গুরুই আপনাকে শিক্ষা দেন এবং পথ দেখিয়ে অধ্যাত্মজীবনে সাহায্য করেন।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি পুরুষকার এবং ঈশ্বরকৃপায় এই পরম জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তারপর এই জ্ঞান তিনি অন্যদের দেন। তাঁরা কারা? 'অত্যাশ্রমিভ্যঃ'—তাঁরা অত্যাশ্রমী, অর্থাৎ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। হিন্দুমতে চতুরাশ্রম বা চারটি পর্যায়কে স্বীকার করা হয়। প্রথম—'ব্রহ্মচর্য' অর্থাৎ ছাত্রজীবন; দ্বিতীয়—'গার্হস্থ্য' অর্থাৎ গৃহস্থের জীবন; তৃতীয় —'বাণপ্রস্থ' অর্থাৎ অবসর জীবন; এবং চতুর্থ ও শেষ পর্যায় হল—'সন্ন্যাস' অর্থাৎ সন্ন্যাসীর জীবন। সন্ন্যাসকে এখানে 'অত্যাশ্রম' বলা হচ্ছে। 'অত্যাশ্রম' কেন? তার কারণ

এই,সন্ন্যাসী সব আশ্রমের পারে (অতি) চলে গেছেন। কি করে? সর্বস্ব ত্যাগ করে। আত্মজ্ঞানের জন্য যখন কেউ সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন তখনি তিনি 'অত্যাশ্রমিন' এবং এরকম মানুষই আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য। এ জ্ঞান সর্বসাধারণের জন্য নয়; কারণ এ জ্ঞানের মর্ম তাঁরা বুঝবেন না। রোখ করে, দৃঢ়তার সঙ্গে যিনি বলতে পারেন—'আমি জানি এই জ্ঞানই জীবনের পরম লক্ষ্য, আমি আর কিছুই চাই না, শুধু এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই'– তিনিই পরাজ্ঞান লাভের যথার্থ অধিকারী। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এইরকম মানুষদের, অর্থাৎ অত্যাশ্রমীদেরই ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছিলেন—'ঋষি-সঙ্ঘ জুষ্টম্'।'জুষ্টম্' শব্দটির অর্থ এখানে 'বাঞ্ছিত' বা 'ঈপ্সিত' অর্থাৎ সব ঋষিই এই জ্ঞান লাভ করতে চান। বৈরাগ্যবান, সর্বত্যাগীদের এই হল জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য। ত্যাগ, তপস্যা এবং সর্বোপরি ঈশ্বরকৃপায় তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, পিতার কাছ থেকে পুত্র, গুরুর কাছ থেকে শিষ্য—এই পরম্পরায় মানুষ আত্মজ্ঞান পেয়ে আসছে। এই জ্ঞানের উপযুক্ত হতে গেলে কঠোর তপস্যা চাই। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এই জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন দুটি কারণে : একদিকে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, অন্যদিকে নিষ্কাম কর্ম করে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন মানে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্রহ্ম অভিমুখী করা। শ্বেতাশ্বতর জন্ম-জন্ম ধরে এই একাগ্রতা অভ্যাস করেছিলেন কারণ তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান লাভ করা। এই সাধনায় তিনি গুরু এবং ঈশ্বর দুয়েরই কৃপা পেয়েছিলেন। অবশেষে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই সত্যের উপলব্ধি হল তাঁর। তাঁর আগে কেবল সনকের মতো অতি উচ্চকোটির তপস্বীরাই এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। শ্বেতাশ্বতর নিজে এই অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তা আবার সন্ন্যাসীদের দিয়েছিলেন। যাঁরা সম্যক্ভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন, তাঁরাই সন্ন্যাসী (সন্ন্যস্ত)। তাঁরা অবিদ্যার কবল থেকে মুক্ত।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥২২

অন্বয়: বেদান্তে (উপনিষদগুলিতে); পরমং গুহ্যম্ (পরম গোপনীয় [মোক্ষলাভের পথ]); পুরাকল্পে (প্রাচীনকালে); প্রচোদিতম্ (শিক্ষা দেওয়া হয়েছে); অপ্রশান্তায় (যাদের মন অসংযত, অস্থির); ন দাতব্যম্ (দেওয়া অনুচিত); অপুত্রায় (যে পুত্র নয় তাকে); অশিষ্যায় বা (অথবা যে শিষ্য নয় তাকে); পুনঃ ন [দাতব্যম্] (এই শিক্ষা দেওয়া অনুচিত (পুত্র বা কোন শিষ্যকেও, যদি তার মন সংযত না হয়)।

সরলার্থ: বেদান্ত (অর্থাৎ, উপনিষদ) মুক্তিলাভের গুহ্য তত্ত্বটি শিখিয়েছেন। প্রাচীনকালে এই গুহ্য তত্ত্ব শেখানো হত। কিন্তু যাদের মন অসংযত, তাদের এই শিক্ষা দেওয়া হত না। পুত্র অথবা শিষ্য ছাড়া এ জ্ঞান আর কাউকে দেওয়া হত না। কিন্তু পুত্র বা শিষ্য যদি অযোগ্য অর্থাৎ অসংযত হতেন তবে তাদেরও এ শিক্ষা দেওয়া হত না।

ব্যাখ্যা: উপনিষদ এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলছেন যে এই জ্ঞান সকলের জন্য নয়। বাছবিচার না করে এই জ্ঞান কখনই দেওয়া উচিত নয়। একমাত্র সন্তান বা শিষ্যকেই এই জ্ঞান দেওয়া যেতে—পারে তবে সেক্ষেত্রেও তাদের উপযুক্ত আধার বা অধিকারী হতে হবে। কেন এই সতর্কতা? সতর্কতার কারণ এই বেদান্ততত্ত্ব অতি গুহ্য, অতি পবিত্র, অতি সূক্ষ্ম—এই তত্ত্ব কখনই সকলের বোধগম্য হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে উপনিষদে একটি গল্প আছে। একবার দৈত্যরাজ বিরোচন এবং দেবরাজ ইন্দ্র, পিতামহ প্রজাপতির কাছে গিয়ে বললেন, 'দয়া করে আমাদের আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিন।' উত্তরে প্রজাপতি বললেন, 'বেশ তো, আগে তোমরা কিছু তপস্যা কর, সংযম অভ্যাস কর।' বহু বছর তপস্যার পর তাঁরা আবার প্রজাপতির কাছে এলেন। প্রজাপতি তখন বললেন, 'তোমরা নদীর ধারে গিয়ে জলের দিকে তাকাবে; সেখানে যা দেখতে পাবে, জেনো সেই তোমাদের আত্মা।' বিরোচন নদীর ধারে গিয়ে নিজ দেহের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন ও দৈত্যদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'আমি সেই গুহ্য তত্ত্ব জেনেছি। এই দেহই আত্মা।' ইন্দ্রও প্রথমে এইরকমই ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বিচার করে দেখলেন, 'এই দেহ কখনো আত্মা হতে পারে না কারণ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না; কিন্তু দেহের তো পরিবর্তন আছে।' ইন্দ্র বারবার প্রজাপতির কাছে ফিরে গেলেন এবং আরও অনেক বছর তপস্যা করলেন। অবশেষে একদিন তিনি প্রজাপতির উপদেশের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন, আত্মার প্রকৃতি কি তা বুঝতে পারলেন। পদার্থবিদ্যার দুরূহ তত্ত্ব যেমন সকলকে শেখানো যায় না, তেমনি আত্মতত্ত্বও সকলকে শেখানো যায় না। এর জন্য সর্বতোভাবে নিজেকে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করতে হবে।

যারা অপ্রশান্ত, অর্থাৎ যাদের মন চঞ্চল, যাদের চিত্তশুদ্ধি হয়নি—ব্রহ্মজ্ঞান তাদের জন্য নয়। উপনিষদ কেবলমাত্র নিজের সন্তান ও শিষ্যকে এই জ্ঞানদানের অনুমতি দিচ্ছেন। এই নির্দেশের তাৎপর্য আছে। উপনিষদ ধরে নিচ্ছেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ পাবার আগে সন্তান বা শিষ্যের মন উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা পরিশীলিত হয়ে শান্ত ও সংযত হয়েছে। উপনিষদের নির্দেশ—যদি তাঁরা 'অপ্রশান্ত' এবং অনুপযুক্ত হয়, তবে তাদেরও এই পবিত্রতম ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া যাবে না।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥২৩

অন্বয়: যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ (যার ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধা ভক্তি আছে); যথা দেবে তথা গুরৌ (ঈশ্বরের প্রতি যেমন, গুরুর প্রতিও সেইরকম ভক্তি আছে); তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার কাছে); এতে হি অর্থাঃ কথিতাঃ (যদি এইসব সত্য ব্যাখ্যা করা হয়); প্রকাশন্তে (তাদের অর্থ স্বয়ং প্রকাশিত হবে)।

সরলার্থ: ঈশ্বর এবং গুরুর প্রতি যাঁর অবিচল ভক্তি আছে, তিনিই যথার্থ মহাত্মা। এইরকম অধিকারীর মনেই সত্যের স্বরূপ স্বতই উন্মোচিত হয়।

ব্যাখ্যা: ঈশ্বর, নিজের আত্মা ও গুরুর প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভালোবাসা (পরাভক্তি) থাকতে হবে। এর তাৎপর্য—আপনার গভীর নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং দৃঢ় সঙ্কল্প থাকতে হবে। শেখার আগ্রহ না থাকলে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছবেন কি করে? এইসব গুণ তাই অতি অবশ্যই থাকতে হবে। তবেই পরম সত্য আপনার হৃদয়ে প্রতিভাত হবে।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, একথা ঠিক যে ঈশ্বর এবং আচার্য উভয়ের প্রতিই আপনার অচলা ভক্তি থাকতে হবে; কিন্তু সাথে সাথে তাঁদের প্রতি গভীর বিশ্বাসও থাকা চাই। আর প্রয়োজন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, লেগে থাকার মনোভাব। যদি আপনার ভক্তি ও বিশ্বাস দুই-ই থেকে থাকে তো আপনার মনে হবে আপনার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, ব্যাকুল হয়ে আপনি তখন জলের সন্ধান করবেন। অর্থাৎ তখন আপনার মন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আঁটুবাঁটু করবে, আপনি ছটফট করবেন আর ভাববেন আত্মজ্ঞান লাভ না করলে বুঝি আপনার প্রাণ বাঁচবে না। বহুদিনের উপবাসী মানুষ যেমন দুমুঠো অন্নের জন্য পাগল হয়, তেমনি আপনিও যেন সত্য লাভের জন্য উন্মত্ত হয়ে গুরুর পায়ে মাথা খোঁড়েন আর প্রার্থনা করেন যাতে তিনি আপনাকে ঈশ্বরলাভের পথ বলে দেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই যদি উপযুক্ত হন তাহলে বুঝতে হবে শিষ্যের সত্য লাভের আর দেরি নেই।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং
করবাবহৈ। তেজস্বি নাধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

দৃষ্টির অগোচর যে ব্রহ্ম তা সর্বদাই পূর্ণ। আর নাম এবং রূপ নিয়ে যে ব্রহ্ম দৃষ্টিগ্রাহ্য, তাও পূর্ণ। দৃষ্টির অগোচর যে ব্রহ্ম সেটি 'কারণ'; আর নাম-রূপাত্মক যে ব্রহ্ম সেটি 'কার্য'। পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উদ্ভব (অর্থাৎ, কারণ থেকেই কার্যের উদ্ভব)। কারণ-ব্রহ্ম যদি পূর্ণ হয় তো কার্য-ব্রহ্মও পূর্ণ। অন্যদিকে যদি দৃষ্টিগ্রাহ্য-ব্রহ্ম পূর্ণ— একথা স্বীকার করে নিই, তাহলে তাকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, স্বীকার করতে হবে তাও পূর্ণ।

ব্রহ্ম যেন আচার্য এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করেন। জ্ঞানের সুফল তিনি যেন সমানভাবেই আমাদের দান করেন। আমরা উভয়েই যেন জ্ঞানলাভের জন্য সমভাবে কঠোর শ্রমে ব্রতী হই। অর্জিত জ্ঞান যেন আমাদের উভয়ের পক্ষে সমভাবে ফলপ্রদ হয়। আমরা যেন পরস্পরকে হিংসা না করি।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

মন্ত্র সূচী

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত	কঃ	১।৩।১৪
উৎপত্তিমায়তিং স্থানম্	প্রঃ	৩।১২
উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু	শ্বেঃ	১।৭
উপনিষদং ভো ব্রূহীতি	কেঃ	৪।৭
উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ	কঃ	১।১।১
ঊর্ধ্ব মূলোঽবাক্শাখঃ	কঃ	২।৩।১
ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়তি	কঃ	২।২।৪
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্	শ্বেঃ	৪।৮
ঋগ্ ভিরেতং যজুর্ভিঃ	প্রঃ	৫।৭
ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ	তৈঃ	১।৯
ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য	কঃ	১।৩।১
একৈকং জালং বহুধা	শ্বেঃ	৫।৩
একো দেবঃ সর্বভূতেষু	শ্বেঃ	৬।১১
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং	শ্বেঃ	৬।১২
একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা	কঃ	২।২।১২
একো হংসো ভুবনস্যাস্য	শ্বেঃ	৬।১৫
একো হি রুদ্রো ন	শ্বেঃ	৩।২
এতচ্ছ্রু ত্বা সম্পরিগৃহ্য	কঃ	১।২।১৩
এতজ্ জ্ঞেয়ম্ নিত্যমেব	শ্বেঃ	১।১২
এতত্তু ল্যং যদি মন্যসে	কঃ	১।১।২৪
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্	কঃ	১।২।১৭
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম	কঃ	১।২।১৬
এতদ্বৈ সত্যকাম পরং	প্রঃ	৫।২
এতমানন্দময়মাত্মানম্	তৈঃ	২।৮।৫
”	তৈঃ	৩।১০।৫
এতং হ বাব ন তপতি	তৈঃ	২।৯
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো	মুঃ	২।১।৩
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু	”	১।২।৫

উপনিষদ • স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

www.anandapub.in

Table of Contents